# সেরা বিভূতি

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদনা

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ - কলিকাতা পুস্তকমেলা

—একশো পনেরো টাকা—

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন--গৌতম রায়
মুদ্রণ--ন্যাশনাল প্রসেস

**SERA-BIBHUTI**
A collection of best works by Bibhutibhusan Banerjee
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
10. Shyama Charan Dey Street, Calcutta 73.

**Price Rs. 115/-**

ISBN : 81-7293-084-4

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ১৫২ মানিকতলা মেন রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪ তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

# ভূমিকা

চারটি নির্বাচিত গ্রন্থ একসঙ্গে গ্রথিত করে অকস্মাৎ এই সংকলনটি প্রকাশ করার কি প্রয়োজন ছিল, এই বইখানি হাতে নিয়ে পাঠকের মনে সে প্রশ্ন জাগতেই পারে। এর উত্তর কিছুটা বোধহয় সংকলনের নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে। ইংরেজি 'representative' শব্দটির বাংলা হিসেবে 'সেরা' মন্দ পরিভাষা নয়, এবং সেক্ষেত্রে এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত রচনাগুলির নির্বাচনও যুক্তিযুক্ত হয়ে ওঠে। বিভূতিভূষণের মত লেখকের প্রতিভার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন পরিশ্রমসাধ্য পঠনপাঠনের অপেক্ষা রাখে। তাঁর বহুমুখী সৃজনশীলতার বিপুল সম্ভার থেকে বর্তমান সংকলনে এমন চারটি সাহিত্যকর্ম বাছাই করা হয়েছে, যা তাঁর ব্যক্তিত্ব, মনন এবং প্রজ্ঞার বিশেষ দিকগুলিকে সহজেই পাঠকের সামনে উন্মোচিত করে। যে কিশোর বা তরুণেরা প্রথম বিভূতি-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হতে চলেছেন, সে পরিচয়ের মাধ্যম রূপেও এই সংকলন সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস। বিভূতিভূষণের রচনার স্বাদ কেমন, কি কি বিষয়কে তিনি স্বীয় সাহিত্যরচনার উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছেন অথবা লেখকসত্তার আড়ালে ব্যক্তিমানুষটিই বা কেমন ছিলেন—এসবের মীমাংসা করার জন্য অন্ততঃ প্রাথমিকভাবে, অতঃপর সমগ্র বিভূতি-রচনা তোলপাড় না করে এই সংকলনটি পাঠ করলে চলবে। অবশ্য আমি গবেষক বা অভিসন্দর্ভ রচয়িতাদের প্রসঙ্গে এ কথা বলছি না, তাঁদের ক্ষেত্রে গভীরতর অধ্যয়নের প্রয়োজন হবে।

অনেক সমালোচক 'আরণ্যক'-এর সঙ্গে হাডসনের 'Green Mansions', কুট হামসনের 'Pan' বা থোরোর 'Walden'-এর মিল খুঁজে পেয়েছেন। বস্তুতপক্ষে অরণ্যই পটভূমি—এই সাধারণ শর্ত ছাড়া কথাবস্তুর দিক দিয়ে রচনাগুলি এতই ভিন্নপ্রকৃতির যে, তুলনামূলক কোনো আলোচনা করা বেশ কঠিন। 'আরণ্যক' বিশ্বসাহিত্যে এক অনন্য নির্মাণ। উত্তমপুরুষে রচিত হলেও এই আশ্চর্য উপন্যাসের মেজাজ রচয়িতার ব্যক্তিগত প্রকৃতিপ্রেম বা একান্ত প্রতিবেদনের ভূমি অতিক্রম করে বিশ্বজনীনতা অর্জন করেছে। ধ্রুপদের আলাপের মত প্রসন্নমধুর অথচ ভাবগম্ভীর রীতিতে 'আরণ্যক' প্রথম থেকেই অগ্রসর হতে থাকে, এবং পরিণতিতে জড়প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের যে আদিম ও মৌলিক সম্পর্ক বিদ্যমান, সেই সত্যটিকে তুলে ধরে। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়নির্ভর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যোপভোগ নয়, জীবন ও জাগতিকতানিরপেক্ষ নন্দনচেতনার যে পরম কেন্দ্র, তার ধ্যানরূপ মনে জাগিয়ে তুলে রসিককে উদ্বেল করে। জীবনে প্রথম 'আরণ্যক পাঠ' একটি ঈর্ষণীয় অভিজ্ঞতা।

'অনুবর্তন'-এর পটভূমি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন কোলকাতা শহর। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, প্রকৃতির পূজারী হিসেবে যাঁর নাম বাংলা সাহিত্যে প্রায় প্রবাদে পরিণত, সেই বিভূতিভূষণ কি অনায়াস-দক্ষতায় মহানগরীকে রচনার প্রেক্ষাপটরূপে ব্যবহার করেছেন।

'অপরাজিত'-তে আমরা অপুর নগরবাসের চিত্র পাই বটে, কিন্তু অপুর মন পড়ে থাকে নিশ্চিন্দিপুরে। শহরের উচ্চকিত জীবনযাত্রার চেয়ে সে ছিন্দওয়ারার জঙ্গল বা অমরকন্টক যাত্রাপথের ঘনশ্যাম অরণ্যস্থলীকেই আপন সত্তার সঙ্গে অধিকতর সমধর্মী বলে মনে করেছে। কিন্তু 'অনুবর্তন'-এর যদুবাবু কোলকাতা ছেড়ে দেশের বাড়িতে ছুটি কাটাতে গিয়ে স্বস্তি পান না। তাঁর হাঁফ ধরে। সেই চায়ের দোকান, সহকর্মীরা মিলে আড্ডা, দ্রুতগতি জীবনের বিষম ঘূর্ণাবর্ত —সেই তাঁর কাম্য। একটি বিদ্যালয়, তার শিক্ষক ও ছাত্রদল—এই নিয়ে মূল কাহিনী গড়ে উঠলেও প্রধানতঃ 'অনুবর্তন' মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনচর্যা ও মানসিকতা সম্পর্কে একটি মূল্যবান মানবিক দলিল।

সাধারণ উপন্যাসের ধারা থেকে 'দেবযান' একটি departure; এই গ্রন্থটি রচনা করার জন্য বিভূতিভূষণকে একদিকে যেমন কঠিন সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছে, আবার অন্যদিকে তাঁর বহুমুখী সৃজনক্ষমতার একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। যুক্তিবাদের প্রবল বিরোধিতার সামনে আমরা অনেকসময় নিজের বিশ্বাসকে মানুষের কাছে উপস্থাপিত করতে লজ্জা পাই। 'দেবযান'-এ বিভূতিভূষণ নির্ভীকভাবে স্বীয় প্রতীতিকে প্রচার করতে কুণ্ঠিত হননি--আর কিছু না হোক, অন্ততঃ এই সততার জন্য তাঁকে পুরস্কৃত করাই যায়। এ উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগণ প্রায় সকলেই দেহমুক্ত আত্মা, তাদের বিচরণ পৃথিবী ছাড়িয়েও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুদূরতম অজানা প্রান্তে। কিন্তু পরলোক বা after-life-এর বর্ণনায় ও গঠনে বিভূতিভূষণ কোথাও স্বীকৃত বিজ্ঞানের সূত্রকে অতিক্রম করেন নি। নায়ক যতীন দেহমুক্ত আত্মা হয়েও পৃথিবীকে ভালবাসে। মাটি-মায়ের টানে সে আবদ্ধ। ফলে কাহিনীর বিস্তার মৃত্যুপরবর্তী লোকে হলেও 'দেবযান' প্রকৃতপক্ষে বিভূতিভূষণের জীবননিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধের প্রতিচ্ছবি।

জর্নাল রাখার সনিষ্ঠ ধারাবাহিকতায় রবীন্দ্রনাথ ও Andre Gide ছাড়া বিভূতিভূষণের সমকক্ষ সাহিত্যিক কমই আছেন। তরুণ বয়েস থেকে শুরু করে মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব পর্যন্ত তিনি নিয়মিত দিনলিপি রচনা করেছেন। কোন কোন জায়গায় এগুলি উপন্যাসের মত সুখপাঠ্য এবং লেখকের অন্তরঙ্গ জগতকে জানবার পক্ষে সহায়ক। 'স্মৃতির রেখা' যখন রচিত তখন 'পথের পাঁচালী' লেখা হয়নি, বিশ্বপথিক বিভূতিভূষণের মনের ভেতরে ভাবী সাহিত্যিক-সত্তা অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে মাত্র। কর্মসূত্রে ভাগলপুরের নির্জন অরণ্যপ্রবাসে থাকাকালীন সভ্যতা, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং মহাকালের অত্যন্ত ব্যাপ্তি সম্বন্ধে তাঁর গভীর উপলব্ধির কাব্যিক প্রকাশ 'স্মৃতির রেখা'। মরমী পাঠকের কাছে এই গ্রন্থের মূল্য অসীম এই কারণে যে, এটি কোনদিন প্রকাশিত হবে বলে বিভূতিভূষণ রচনা করেন নি। এই গ্রন্থপাঠ এবং ঋষিতুল্য এক ব্যক্তিত্বের অন্তর্জগতে নিঃশব্দ প্রবেশ একই কথা।

এই গেল ভূমিকা। বাকি কথা বিভূতিভূষণ নিজেই বলবেন তাঁর রচনার মাধ্যমে। সে রচনা পাঠ করতে শুরু করলেই বোঝা যায় তার ভূমিকা কত নিষ্প্রয়োজন॥

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

# সেরা বিভূতি

# সূচীপত্র

# আরণ্যক



সমস্ত দিন আপিসের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে গড়ের মাঠে ফোর্টের কাছ ঘেঁষিয়া বসিয়া ছিলাম।

নিকটেই একটা বাদাম-গাছ, চুপ করিয়া খানিকটা বসিয়া বাদামগাছের সামনে ফোর্টের পরিখার ঢেউখেলানো জমিটা দেখিয়া হঠাৎ মনে হইল যেন লবটুলিয়ার উত্তর সীমানায় সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে সন্ধ্যাবেলায় বসিয়া আছি। পরক্ষণেই পলাশী গেটের পথে মোটর হর্ণের আওয়াজে সে ভ্রম ঘুচিল।

অনেক দিনের কথা হইলেও কালকার বলিয়া মনে হয়।

কলিকাতা-শহরের হৈ-চৈ কর্মকোলাহলের মধ্যে অহরহ ডুবিয়া থাকিয়া এখন যখন লবটুলিয়া বইহার কি আজমাবাদের সে অরণ্য-ভূভাগ, সে জ্যোৎস্না, সে তিমিরময়ী স্তব্ধ রাত্রি, ধু-ধু ঝাউবন আর কাশবনের চর, দিগ্বলয়লীন ধূসর শৈলশ্রেণী, গভীর রাত্রে বন্য নীল-গাইয়ের দলের দ্রুত পদধ্বনি, খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে সরস্বতী কুণ্ডীর জলের ধারে পিপাসার্ত বন্য মহিষ, সে অপূর্ব মুক্ত শিলাস্তৃত প্রান্তরে রঙীন বনফুলের শোভা, ফুটন্ত রক্তপলাশের ঘন অরণ্যের কথা ভাবি, তখন মনে হয় বুঝি কোন অবসর-দিনের শেষে সন্ধ্যায় ঘুমের ঘোরে এক সৌন্দর্যভরা জগতের স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, পৃথিবীতে তেমন দেশ যেন কোথাও নাই।

শুধু বনপ্রান্তর নয়, কত ধরণের মানুষ দেখিয়াছিলাম।

কুন্তা...মুসম্মত কুন্তার কথা মনে হয়। এখনও যেন সুংঠিয়া বইহারের বিস্তীর্ণ বন্যকুলের জঙ্গলে সে দরিদ্র মেয়েটি তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া বন্যকুল সংগ্রহ করিয়া তাহার দৈনন্দিন সংসার-যাত্রার ব্যবস্থায় ব্যস্ত।

নয়ত জ্যোৎস্না-ভরা গভীর শীতের রাত্রে সে আমার পাতের ভাত লইবার আশায় আজমাবাদ কাছারির প্রাঙ্গণের এক কোণে, ইঁদারাটার কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

মনে হয় ধাতুরিয়ার কথা...নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া!...

দক্ষিণ দেশে ধরমপুর পরগণার ফসল মারা যাওয়াতে ধাতুরিয়া নাচিয়া গাহিয়া পেটের ভাত জুটাইতে আসিয়াছিল, লবটুলিয়া অঞ্চলের জনবিরল বন্য গ্রামগুলিতে ...চীনা ঘাসের দানা ভাজা আর আখের গুড় খাইতে পাইয়া কি খুশীর হাসি দেখিয়াছিলাম তার মুখে! কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল, ডাগর চোখ, একটু মেয়েলি ধরণের ভাব-ভঙ্গী, বছর তের-চৌদ্দ বয়সের সুশ্রী ছেলেটি ; সংসারে বাপ নাই, মা নাই, কেহ কোথাও নাই, তাই সেই অল্প বয়সেই তাহাকে নিজের চেষ্টা নিজেকেই দেখিতে হয়...সংসারের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল আবার। মনে পড়ে সরল মহাজন ধাওতাল সাহুকে। আমার খড়ের বাংলোর কোণটাতে বসিয়া সে বড় বড় সুপারি জাঁতি দিয়া কাটিতেছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে ছোট কুঁড়েঘরের ধারে বসিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজু পাঁড়ে তিনটি মহিষ চরাইতেছে এবং আপন মনে গাহিতেছে—

দয়া হোই জী—

মহালিখারূপের পাহাড়ের পাদদেশে বিশাল বনপ্রান্তরে বসন্ত নামিয়াছে, লবটুলিয়া

বইহারের সর্বত্র হলুদ রঙের গোলগোল ফুলের মেলা, দ্বিপ্রহরে তাম্রাভ রৌদ্রদগ্ধ দিগন্ত বালির ঝড়ে ঝাপসা, রাত্রে দূরে মহালিখারূপের পাহাড়ে আগুনের মালা, শালবনে আগুন দিয়াছে। কত অতিদরিদ্র বালক-বালিকা, নরনারী, কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন, গায়ক, কাঠুরে, ভিখারীর বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। অন্ধকার প্রান্তরে খড়ের বাংলোয় বসিয়া বসিয়া বন্য শিকারীর মুখে অদ্ভুত গল্প শুনিতাম, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে গভীর রাত্রিতে বন্য মহিষ শিকার করিতে গিয়া ডালপালা ঢাকা গর্তের ধারে বিরাটকায় বন্য মহিষের দেবতাকে তারা দেখিয়াছিল।

ইহাদের কথাই বলিব। জগতের যে পথে সভ্য মানুষের চলাচল কম, কত অদ্ভুত জীবনধারার স্রোত আপন মনে উপলবিকীর্ণ অজানা নদীখাত দিয়া ঝিরঝির করিয়া বহিয়া চলে সে পথে, তাহাদের সহিত পরিচয়ের স্মৃতি আজও ভুলিতে পারি নাই।

কিন্তু আমার এ স্মৃতি আনন্দের নয়, দুঃখের। এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল, বনের দেবতারা সেজন্য আমায় কখনও ক্ষমা করিবেন না জানি। নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।

তাই এই কাহিনীর অবতারণা।



## প্রথম পরিচ্ছেদ

### ১

পনের-ষোল বছর আগেকার কথা। বি. এ. পাস করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছি। বহু জায়গায় ঘুরিয়াও চাকুরি মিলিল না।

সরস্বতী-পূজার দিন। মেসে অনেকদিন ধরিয়া আছি তাই নিতান্ত তাড়াইয়া দেয় না, কিন্তু তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া মেসের ম্যানেজার অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মেসে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হইতেছে—ধুমধামও মন্দ নয়, সকালে উঠিয়া ভাবিতেছি আজ সব বন্ধ, দু-একটা জায়গায় একটু আশা দিয়াছিল, তা আজ আর কোথাও যাওয়া কোন কাজের হইবে না, বরং তার চেয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াই।

মেসের চাকর জগন্নাথ এমন সময় একটুকরা কাগজ হাতে দিয়া গেল। পড়িয়া দেখিলাম ম্যানেজারের লেখা তাগাদার চিঠি। আজ মেসে পূজা-উপলক্ষে ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, আমার কাছে দু-মাসের টাকা বাকী, আমি যেন চাকরের হাতে অন্তত দশটি টাকা দিই। অন্যথা কাল হইতে খাওয়ার জন্য আমাকে অন্যত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কথা খুব ন্যায্য বটে, কিন্তু আমার সম্বল মোটে দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। কোন জবাব না দিয়াই মেস হইতে বাহির হইলাম। পাড়ার নানা স্থানে পূজার বাজনা বাজিতেছে, ছেলেমেয়েরা গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে, অভয় ময়রার খাবারের দোকানে অনেক রকম নতুন খাবার থালায় সাজানো—বড়রাস্তার ওপারে কলেজ হোস্টেলের ফটকে নহবৎ বসিয়াছে। বাজার হইতে দলে দলে লোক ফুলের মালা ও পূজার উপকরণ কিনিয়া ফিরিতেছে।

ভাবিলাম কোথায় যাওয়া যায়। আজ এক বছরের উপর হইল জোড়াসাঁকো স্কুলের

চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছি—অথবা বসিয়া ঠিক নাই, চাকুরির খোঁজে হেন মার্চেণ্ট আপিস নাই, হেন স্কুল নাই, হেন খবরের কাগজের আপিস নাই, হেন বড়লোকের বাড়ী নাই—যেখানে অন্ততঃ দশ বার না হাঁটাহাঁটি করিয়াছি, সকলেরই এক কথা, চাকুরি খালি নাই।

হঠাৎ পথে সতীশের সঙ্গে দেখা। সতীশের সঙ্গে হিন্দু হোস্টেলে একসঙ্গে থাকিতাম। বর্তমানে সে আলীপুরের উকীল, বিশেষ কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না, বালিগঞ্জের ওদিকে কোথায় একটা টিউশনি আছে, সেটাই সংসারসমুদ্রে বর্তমানে তাহার পক্ষে ভেলার কাজ করিতেছে। আমার ভেলা তো দূরের কথা, একখানা মাস্তুল-ভাঙা কাঠও নাই, যতদূর হাবুডুবু খাইবার তাহা খাইতেছি—সতীশকে দেখিয়া সে কথা আপাতত ভুলিয়া গেলাম। ভুলিয়া গেলাম তাহার আর একটা কারণ, সতীশ বলিল—এই যে, কোথায় চলেছ সত্যচরণ? চল হিন্দু হোস্টেলের ঠাকুর দেখে আসি—আমাদের পুরনো জায়গাটা। আর ওবেলা বড় জল্সা হবে—এসো। ওয়ার্ড সিক্সের সেই অবিনাশকে মনে আছে, সেই যে ময়মনসিংহের কোন্ জমিদারের ছেলে, সে যে আজকাল বড় গায়ক। সে গান গাইবে, আমায় আবার একখানা কার্ড দিয়েছে—তাদের এস্টেটের দু-একটা কাজ-কর্ম মাঝে মাঝে করি কিনা। এসো, তোমায় দেখলে সে খুশী হবে।

কলেজে পড়িবার সময়, আজ পাঁচ-ছয় বছর আগে, আমোদ পাইলে আর কিছু চাহিতাম না—এখনও সে মনের ভাব কাটে নাই দেখিলাম। হিন্দু হোস্টেলে ঠাকুর দেখিতে গিয়া সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলাম। কারণ আমাদের দেশের অনেক পরিচিত ছেলে এখানে থাকে, তাহারা কিছুতেই আসিতে চাহিল না। বলিলাম—বিকেলে জল্সা হবে, তা এখন কি! মেস থেকে খেয়ে আসব এখন।

তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না।

কর্ণপাত করিলে আমাকে সরস্বতী-পূজোর দিনটা উপবাসে কাটাইতে হইত। ম্যানেজারের অমন কড়া চিঠির পরে আমি গিয়া মেসের লুচি পায়েসের ভোজ খাইতে পারিতাম না—যখন একটা টাকাও দিই নাই। এ বেশ হইল—পেট ভরিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া বৈকালে জল্সার আসরে গিয়ে বসিলাম। আবার তিন বৎসর পূর্বের ছাত্র-জীবনের উল্লাস ফিরিয়া আসিল—কে মনে রাখে—যে চাকুরি পাইলাম কি না-পাইলাম, মেসের ম্যানেজার মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া আছে কি না-আছে। ঠুংরি ও কীর্তনের সমুদ্রে তলাইয়া গিয়া ভুলিয়া গেলাম যে দেনা মিটাইতে না পারিলে কাল সকাল হইতে বায়ু-ভক্ষণের ব্যবস্থা হইবে। জল্সা যখন ভাঙিল তখন রাত এগারটা। অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হইল, হিন্দু হোস্টেলে থাকিবার সময় সে আর আমি ডিবেটিং ক্লাবের চাঁই ছিলাম—একবার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা সভাপতি করিয়াছিলাম। বিষয় ছিল, "স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত"। অবিনাশ প্রস্তাবকর্তা আমি প্রতিবাদী-পক্ষের নায়ক। উভয় পক্ষের তুমুল তর্কের পরে সভাপতি আমাদের পক্ষে মত দিলেন। সেই হইতে অবিনাশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হইয়া যায়—যদিও কলেজ হইতে বাহির হইয়া এই প্রথম আবার তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ।

অবিনাশ বলিল—চল, আমার গাড়ী রয়েছে—তোমাকে পৌঁছে দিই। কোথায় থাক?

মেসের দরজায় নামাইয়া বলিল—শোন, কাল হ্যারিংটন স্ট্রীটে আমার বাড়ীতে চা খাবে বিকেল চারটের সময়। ভুলো না যেন। তেত্রিশের দুই। লিখে রাখো তো নোট-বইয়ে।

পরদিন খুঁজিয়া হ্যারিংটন স্ট্রীট বাহির করিলাম, বন্ধুর বাড়ীও বাহির করিলাম। বাড়ী খুব বড় নয়, তবে সামনে পিছনে বাগান। গেটে উইস্টারিয়া লতা, নেপালী দারোয়ান, ও পিতলের প্লেট। লাল সুরকীর বাঁকা রাস্তা—রাস্তার এক ধারে সবুজ ঘাসের বন, অন্য ধারে বড় বড় মুচুকুন্দ চাঁপা ও আমগাছ। গাড়ীবারান্দায় বড় একখানা মোটর গাড়ী। বড়লোকের বাড়ী নয় বলিয়া ভুল করিবার কোন দিক হইতে কোন উপায় নাই। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়াই বসিবার ঘর। অবিনাশ আসিয়া আদর করিয়া ঘরে বসাইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন দিনের কথাবার্তায় আমরা দুজনেই মশগুল হইয়া গেলাম। অবিনাশের বাবা ময়মনসিংহের একজন বড় জমিদার, কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার বাড়ীতে তাঁহারা কেহই নাই। অবিনাশের এক ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে গত অগ্রহায়ণ মাসে দেশে গিয়াছিলেন—এখনও কেহই আসেন নাই।

এ-কথা ও-কথার পর অবিনাশ বলিল—এখন কি করছ সত্য?

বলিলাম—জোড়াসাঁকো স্কুলে মাস্টারী করতুম, সম্প্রতি বসেই আছি একরকম। ভাবছি আর মাস্টারী করব না। দেখছি অন্য কোন দিকে যদি—দু-এক জায়গায় আশাও পেয়েছি।

আশা পাওয়ার কথা সত্য নয়, কিন্তু অবিনাশ বড়লোকের ছেলে, মস্তবড় এস্টেট ওদের। তাহার কাছে চাকুরির উমেদারী করিতেছি এটা না দেখায়, তাই কথাটা বলিলাম।

অবিনাশ একটুখানি ভাবিয়া বলিল—তোমার মত একজন উপযুক্ত লোকের চাকুরি পেতে দেরী হবে না অবিশ্যি। আমার একটা কথা আছে, তুমি তো আইনও পড়েছিলে—না?

বলিলাম—পাসও করেছি, কিন্তু ওকালতি করবার মতিগতি নেই।

অবিনাশ বলিল—আমাদের একটা জঙ্গল-মহাল আছে পূর্ণিয়া জেলায়। প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি। আমাদের সেখানে নায়েব আছে কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস করে অত জমি বন্দোবস্তের ভার দেওয়া চলে না। অমনি একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি। তুমি যাবে?

কান অনেক সময় মানুষকে প্রবঞ্চনা করে জানিতাম। অবিনাশ বলে কি! যে চাকুরির খোঁজে আজ একটি বছর কলিকাতার রাস্তাঘাট চষিয়া বেড়াইতেছি, চায়ের নিমন্ত্রণে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে সেই চাকুরির প্রস্তাব আপনা হইতে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল?

তবুও মান বজায় রাখিতে হইবে। অত্যন্ত সংযমের সহিত মনের ভাব চাপিয়া উদাসীনের মত বলিলাম—ও! আচ্ছা ভেবে বলব। কাল আছ তো?

অবিনাশ খুব খোলাখুলি ও দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বলিল—ভাবাভাবি রেখে দাও। আমি বাবাকে আজই পত্র লিখতে বসছি। আমরা একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছি। জমিদারীর ঘুণ কর্মচারী আমরা চাই নে—কারণ তারা প্রায়ই চোর। তোমার মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের সেখানে দরকার। জঙ্গল-মহাল আমরা নূতন প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। ত্রিশ হাজার বিঘের জঙ্গল। অত দায়িত্বপূর্ণ কাজ কি যার-তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়। তোমার সঙ্গে আজ আলাপ নয়, তোমার নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। তুমি রাজী হয়ে যাও—আমি এখুনি বাবাকে লিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আনিয়ে দিচ্ছি।

## ২

কি করিয়া চাকুরি পাইলাম তাহা বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। কারণ এ গল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে বলিয়া রাখি—অবিনাশের বাড়ীর চায়ের নিমন্ত্রণ খাইবার দুই সপ্তাহ পরে আমি একদিন নিজের জিনিসপত্র লইয়া বি এন্ ডব্লিউ রেলওয়ের একটা ছোট স্টেশনে নামিলাম।

শীতের বৈকাল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘন ছায়া নামিয়াছে, দূরে বনশ্রেণীর মাথায় মাথায় অল্প অল্প কুয়াশা জমিয়াছে। রেল-লাইনের দু-ধারে মটর-ক্ষেত, শীতল সান্ধ্য-বাতাসে তাজা মটরশাকের স্নিগ্ধ সুগন্ধে কেমন মনে হইল যে-জীবন আরম্ভ করিতে যাইতেছি তাহা বড় নির্জন হইবে, এই শীতের সন্ধ্যা যেমন নির্জন, যেমন নির্জন এই উদার প্রান্তর আর ওই দূরের নীলবর্ণ বনশ্রেণী, তেমনি।

গরুর গাড়ীতে প্রায় পনের-ষোল ক্রোশ চলিলাম সারারাত্রি ধরিয়া—ছইয়ের মধ্যে কলকাতা হইতে আনীত কম্বল র‍্যাগ ইত্যাদি শীতে জল হইয়া গেল—কে জানিত এ-সব অঞ্চলে ভয়ানক শীত! সকালে রৌদ্র যখন উঠিয়াছে, তখনও পথ চলিতেছি। দেখিলাম জমির প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে—প্রাকৃতিক দৃশ্যও অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে-ক্ষেতখামার নাই, বস্তি লোকালয়ও বড়-একটা দেখা যায় না—কেবল ছোটবড় বন, কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা, মাঝে মাঝে মুক্ত প্রান্তর, কিন্তু তাহাতে ফসলের আবাদ নাই।

কাছারিতে পৌঁছিলাম বেলা দশটার সময়। জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দশ-পনের বিঘা জমি পরিষ্কার করিয়া কতকগুলি খড়ের ঘর, জঙ্গলেরই কাঠ, বাঁশ ও খড় দিয়া তৈরী—ঘরে শুক্‌নো ঘাস ও বন-ঝাউয়ের সরু গুঁড়ির বেড়া, তাহার উপর মাটি দিয়া লেপা।

ঘরগুলি নতুন তৈরী, ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই টাট্‌কা-কাটা খড়, আধকাঁচা ঘাস ও বাঁশের গন্ধ পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আগে জঙ্গলের ওদিকে কোথায় কাছারি ছিল, কিন্তু শীতকালে সেখানে জলাভাব হওয়ায় এই ঘর নতুন বাঁধা হইয়াছে, কারণ পাশেই একটা ঝরণা থাকায় এখানে জলের কষ্ট নাই।

## ৩

জীবনের বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, লাইব্রেরী, থিয়েটার, সিনেমা, গানের আড্ডা—এ-সব ভিন্ন জীবন কল্পনা করিতে পারি না—এ অবস্থায় চাকুরির কয়েকটি টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জন স্থানের কল্পনাও কোনদিন করি নাই। দিনের পর দিন যায়, পূর্বাকাশে সূর্যের উদয় দেখি দূরের পাহাড় ও জঙ্গলের মাথায়, আবার সন্ধ্যায় সমগ্র বনঝাউ ও দীর্ঘ ঘাসের বনশীর্ষ সিঁদুরে রঙে রাঙাইয়া সূর্যকে ডুবিয়া যাইতে দেখি—ইহার মধ্যে শীতকালের যে এগার-ঘণ্টা ব্যাপী দিন, তা যেন খাঁ-খাঁ করে শূন্য, কি করিয়া তাহা পূরাইব, প্রথম প্রথম সেইটা আমার পক্ষে হইল মহাসমস্যা। কাজকর্ম করিলে অনেক করা যায় বটে, কিন্তু আমি

নিতান্ত নব আগন্তুক, এখনও ভাল করিয়া এখানকার লোকের ভাষা বুঝিতে পারি না, কাজের কোন বিলিব্যবস্থাও করিতে পারি না, নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া, যে কয়খানি বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা পড়িয়াই কোন রকমে দিন কাটাই। কাছারিতে লোকজন যারা আছে তারা নিতান্ত বর্বর, না বোঝে তাহারা আমার কথা, না আমি ভাল বুঝি তাহাদের কথা। প্রথম দিন-দশেক কি কষ্টে যে কাটিল! কতবার মনে হইল চাকুরিতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ-জীবন আমার জন্য নয়।

রাত্রিতে নিজের ঘরে বসিয়া এই সবই ভাবিতেছি, এমন সময় ঘরের দরজা ঠেলিয়া কাছারীর বৃদ্ধ মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন। এই একমাত্র লোক যাহার সহিত বাংলা কথা বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। গোষ্ঠবাবু এখানে আছেন অন্তত সতের-আঠার বছর। বর্ধমান জেলায় বনপাশ স্টেশনের কাছে কোন্ গ্রামে বাড়ী। বলিলাম বসুন গোষ্ঠবাবু—

গোষ্ঠবাবু অন্য একখানা চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন—আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম নিরিবিলি, এখানকার কোনও মানুষকে বিশ্বাস করবেন না। এ বাংলা দেশ নয়। লোকজন সব বড় খারাপ—

—বাংলা দেশের মানুষও সবাই যে খুব ভাল, এমন নয় গোষ্ঠবাবু—

—সে আর আমার জানতে বাকী নেই, ম্যানেজারবাবু। সেই দুঃখে আর ম্যালেরিয়ার তাড়নায় প্রথম এখানে আসি। প্রথম এসে বড় কষ্ট হত, এ জঙ্গলে মন হাঁপিয়ে উঠত—আজকাল এমন হয়েছে, দেশ তো দূরের কথা, পূর্ণিয়া কি পাটনাতে কাজে গিয়ে দু-দিনের বেশী থাকতে পারি নে।

গোষ্ঠবাবুর মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিলাম—বলে কি!

জিজ্ঞাসা করিলাম—থাকতে পারেন না কেন? জঙ্গলের জন্য মন হাঁপায় নাকি?

গোষ্ঠবাবু আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, ঠিক তাই, ম্যানেজার-বাবু। আপনিও বুঝবেন। নতুন এসেছেন কলকাতা থেকে, কলকাতার জন্যে মন উড়ু উড়ু করছে, বয়সও আপনার কম। কিছুদিন এখানে থাকুন। তারপর দেখবেন।

—কি দেখব?

—জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। কোন গোলমাল কি লোকের ভিড় ক্রমশ আর ভাল লাগবে না। আমার তাই হয়েছে মশাই। এই গত মাসে মুঙ্গের গিয়েছিলাম মোকদ্দমার কাজে—কেবল মনে হয় কবে এখান থেকে বেরুব।

মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান সে দুরবস্থার হাত থেকে আমায় উদ্ধার করুন। তার আগে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কোন্‌কালে কোলকাতায় ফিরিয়া গিয়াছি!

গোষ্ঠবাবু বলিলেন, বন্দুকটা রাত-বেরাত শিয়রে শিয়রে রেখে শোবেন. জায়গা ভাল নয়। এর আগে একবার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। তবে আজকাল এখানে আর টাকাকড়ি থাকে না, এই যা কথা।

কৌতূহলের সহিত বলিলাম, বলেন কি! কতকাল আগে ডাকাতি হয়েছিল?

—বেশী না। এই বছর আট-নয় আগে। কিছুদিন থাকুন, তখন সব কথা জানতে পারবেন। এ অঞ্চল বড় খারাপ। তা ছাড়া, এই ভয়নক জঙ্গলে ডাকাতি করে মেরে নিলে

দেখবেই বা কে?

গোষ্ঠবাবু চলিয়া গেলে একবার ঘরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে—আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিকায় আঁকাবাঁকা একটা বনঝাউয়ের ডাল, ঠিক যেন জাপানী চিত্রকর হাকুসাই-অঙ্কিত একখানি ছবি।

চাকুরি করিবার আর জায়গা খুঁজিয়া পাই নাই! এ-সব বিপজ্জনক স্থান, আগে জানিলে কখনই অবিনাশকে কথা দিতাম না।

দুর্ভাবনা সত্ত্বেও উদীয়মান চন্দ্রের সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।

৪

কাছারির অনতিদূরে একটা ছোট পাথরের টিলা, তার উপর প্রাচীন ও সুবৃহৎ একটা বটগাছ। এই বটগাছের নাম গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছ। কেন এই নাম হইল, তখন অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই। একদিন নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে বেড়াইতে বেড়াইতে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের শোভা দেখিতে টিলার উপরে উঠিলাম।

টিলার উপরকার বটতলায় আসন্ন সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত দূরে পর্যন্ত এক চমকে দেখিতে পাইলাম—কলুটোলার মেস, কপালীটোলার সেই ব্রিজের আড্ডাটি, গোলদীঘিতে আমার প্রিয় বেঞ্চখানা—প্রতিদিন এমন সময়ে যাহাতে গিয়া বসিয়া কলেজ স্ট্রীটের বিরামহীন জনস্রোত ও বাস্ মোটরের ভিড় দেখিতাম। হঠাৎ যেন কত-দূরে পড়িয়া রহিয়াছে মনে হইল তাহারা। মন হু-হু করিয়া উঠিল—কোথায় আছি! কোথাকার জনহীন অরণ্যে-প্রান্তরে খড়ের চালায় বাস করিতেছি চাকুরি খাতিরে! মানুষ এখানে থাকে? লোক নাই, জন নাই, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—একটা কথা কহিবার মানুষ পর্যন্ত নাই। এদেশের এই সব মূর্খ, বর্বর মানুষ, এরা একটা ভাল কথা বলিলে বুঝিতে পারে না—এদেরই সাহচর্যে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে? সেই দূরবিসর্পী দিগন্ত-ব্যাপী জনহীন সন্ধ্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া মন উদাস হইয়া গেল, কেমন ভয়ও হইল। তখন সংকল্প করিলাম, এ মাসের আর সামান্য দিনই বাকী, জামেরে মাসটা কোনরূপে চোখ বুজিয়া কাটাইব, তার পর অবিনাশকে একখানা লম্বা পত্র লিখিয়া চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া সভ্য বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা পাইয়া, সভ্য খাদ্য খাইয়া, সভ্য সুরের সঙ্গীত শুনিয়া, মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া, বহু মানবের আনন্দ-উল্লাসভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁচিব।

পূর্বে কি জানিতাম মানুষের মধ্যে থাকিতে এত ভালবাসি! মানুষকে এত ভাল-বাসি! তাহাদের প্রতি আমার যে কর্তব্য হয়ত সব সময় তাহা করিয়া উঠিতে পারি না —কিন্তু ভালবাসি তাহাদের নিশ্চয়ই। নতুবা এত কষ্ট পাইব কেন তাহাদের ছাড়িয়া আসিয়া?

প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে বই বিক্রী করে সেই যে বৃদ্ধ মুসলমানটি, কতদিন তাহার দোকানে দাঁড়াইয়া পুরনো বই ও মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইয়াছি—কেনা উচিত ছিল হয়ত, কিন্তু কেনা হয় নাই—সেও যেন পরম আত্মীয় বলিয়া মনে হইল—তাহাকে আজ কতদিন দেখি নাই!

কাছারিতে ফিরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া টেবিলে আলো জ্বালিয়া একখানা বই লইয়া



বসিয়াছি, সিপাহী মুনেশ্বর সিং আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম—কি মুনেশ্বর?

ইতিমধ্যে দেহাতি হিন্দী কিছু কিছু বলিতে শিখিয়াছিলাম।

মুনেশ্বর বলিল—হুজুর, আমায় একখানা লোহার কড়া কিনে দেবার হুকুম যদি দেন মুহুরী বাবুকে।

—কি হবে লোহার কড়া?

মুনেশ্বরের মুখ প্রাপ্তির আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বিনীত সুরে বলিল—একখানা লোহার কড়া থাকলে কত সুবিধে হুজুর। যেখানে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, ভাত রাঁধা যায়, জিনিসপত্র রাখা যায়, ওতে করে ভাত খাওয়া যায়, ভাঙবে না। আমার একখানাও কড়া নেই। কতদিন থেকে ভাবছি একখানা কড়ার কথা—কিন্তু হুজুর, বড় গরীব, একখানা কড়ার দাম ছ-আনা, অত দাম দিয়ে কড়া কিনি কেমন করে? তাই হুজুরের কাছে আসা, অনেক দিনের সাধ একখানা কড়া আমার হয়, হুজুর যদি মঞ্জুর করেন, হুজুর মালিক।

একখানা লোহার কড়াই যে এত গুণের, তাহার জন্য যে এখানে লোক রাত্রে স্বপ্ন দেখে, এ ধরণের কথা এই আমি প্রথম শুনিলাম। এত গরীব লোক পৃথিবীতে আছে যে ছ-আনা দামের একখানা লোহার কড়াই জুটিলে স্বর্গ হাতে পায়? শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরীব। এত গরীব তাহা জানিতাম না। বড় মায়া হইল।

পরদিন আমার সই করা চিরকুটের জোরে মুনেশ্বর সিং নউগাছিয়ার বাজার হইতে একখানা পাঁচ নম্বরের কড়াই কিনিয়া আনিয়া আমার ঘরের মেঝেতে নামাইয়া আমার সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

—হো গৈল, হুজুরকী কৃপা-সে—কড়াইয়া হো গৈল। তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া আমার এই একমাসের মধ্যে সর্বপ্রথম আজ মনে হইল—বেশ লোকগুলো! বড় কষ্ট তো এদের!

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### ১

কিছুতেই কিন্তু এখানকার এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে আমি খাপ খাওয়াতে পারিতেছি না। বাংলা দেশ হইতে সদ্য আসিয়াছি, চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছি, এই অরণ্য-ভূমির নির্জনতা যেন পাথরের মত বুকে চাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

এক-একদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেক দূর পর্যন্ত যাই। কাছারির কাছে তবুও লোকজনের গলা শুনিতে পাওয়া যায়, রশি দুই-তিন গেলেই কাছারি-ঘরগুলো যেমন দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশ জঙ্গলের আড়ালে পড়ে, তখন মনে হয় সমস্ত পৃথিবীতে আমি একাকী। তার পর যত দূরে যাওয়া যায়, চওড়া মাঠের দু-ধারে ঘন বনের সারি বহুদূর পর্যন্ত চলিয়াছে, শুধু বন আর ঝোপ, গজারি গাছ, বাবলা, বন্য কাঁটা-বাঁশ, বেত ঝোপ। গাছের ও ঝোপের মাথায় মাথায় অস্তোন্মুখ সূর্য সিঁদুর ছড়াইয়া দিয়াছে—সন্ধ্যার বাতাসে বন্যপুষ্প ও তৃণগুল্মের সুঘ্রাণ, প্রতি ঝোপ পাখীর কাকলীতে মুখর, তার মধ্যে হিমালয়ের বনটিয়াও আছে। মুক্ত দূরপ্রসারী তৃণাবৃত প্রান্তর ও শ্যামল বনভূমির মেলা।

এই সময় মাঝে মাঝে মনে হইত যে, এখানে প্রকৃতির যে রূপ দেখিতেছি, এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। যতদূর চোখ যায়, এ সব যেন আমার, আমি এখানে একমাত্র মানুষ, আমার নির্জনতা ভঙ্গ করিতে আসিবে না কেউ—মুক্ত আকাশতলে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দূর দিগন্তের সীমারেখা পর্যন্ত মনকে ও কল্পনাকে প্রসারিত করিয়া দিই!

কাছারি হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটা নাবাল জায়গা আছে, সেখানে ক্ষুদ্র কয়েকটি পাহাড়ী ঝরণা ঝির্ ঝির্ করিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহার দু-পারে জলজ লিলির বন, কলিকাতার বাগানে যাহাকে বলে স্পাইডার-লিলি। বন্য স্পাইডার-লিলি কখনও দেখি নাই, জানিতামও না যে, এমন নিভৃত ঝরণার উপল-বিছানো তীরে ফুটন্ত লিলি ফুলের এত শোভা হয় বা বাতাসে অহারা এত মৃদু কোমল সুবাস বিস্তার করে। কতবার গিয়া এখানটিতে চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ, সন্ধ্যা ও নির্জনতা উপভোগ করিয়াছি।

মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াই। প্রথম প্রথম ভাল চড়িতে পারিতাম না, ক্রমে ভালোই শিখিলাম। শিখিয়াই বুঝিলাম জীবনে এত আনন্দ আর কিছুতেই নাই। যে কখনও এমন নির্জন আকাশতলে দিগন্তব্যাপী বনপ্রান্তরে ইচ্ছামত ঘোড়া ছুটাইয়া না বেড়াইয়াছে, তাহাকে বোঝানো যাইবে না সে কি আনন্দ! কাছারি হইতে দশ পনের মাইল দূরবর্তী স্থানে সার্ভে পার্টি কাজ করিতেছে, প্রায়ই আজকাল সকালে এক পেয়ালা চা খাইয়া ঘোড়ার পিঠে জিন কষিয়া সেই যে ঘোড়ায় উঠি, কোনদিন ফিরি বৈকালে, কোনদিন বা ফিরিবার পথে জঙ্গলের মাথার উপর নক্ষত্র উঠে, বৃহস্পতি জ্বল্ জ্বল্ করে; জ্যোৎস্নারাতে বনপুষ্পের সুবাস জ্যোৎস্নার সহিত মেশে, শৃগালের রব প্রহর-ঘোষণা করে, জঙ্গলের ঝিঁঝিঁ পোকা দল বাঁধিয়া ডাকিতে থাকে।

যে কাজে এখানে আসা তার জন্য অনেক চেষ্টা করা যাইতেছে। এত হাজার বিঘা জমি, হঠাৎ বন্দোবস্ত হওয়াও সোজা কথা নয় অবশ্য। আর একটা ব্যাপার এখানে আসিয়া জানিয়াছি, এই জমি আজ ত্রিশ বছর পূর্বে নদীগর্ভে সিকস্তি হইয়া গিয়াছিল—বিশ বছর হইল বাহির হইয়াছে—কিন্তু যাহারা পিতৃপিতামহের জমি গঙ্গায় ভাঙিয়া যাওয়ার পরে অন্যত্র উঠিয়া গিয়া বাস করিয়াছিল, সেই পুরাতন প্রজাদিগকে জমিদার এই সব জমিতে দখল দিতে চাহিতেছেন না। মোটা সেলামী ও বর্ধিত হারে খাজনার লোভে নূতন প্রজাদের সঙ্গেই বন্দোবস্ত করিতে চান। অথচ যে-সব গৃহহীন, আশ্রয়হীন অতি-দরিদ্র পুরাতন প্রজাকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহারা বার বার অনুরোধ-উপরোধ কান্নাকাটি করিয়াও জমি পাইতেছে না।

আমার কাছেও অনেকে আসিয়াছিল। তাহাদের অবস্থা দেখিলে কষ্ট হয়, কিন্তু জমিদারের হুকুম, কোনও পুরাতন প্রজাকে জমি দেওয়া হইবে না। কারণ একবার চাপিয়া বসিলে তাহাদের পুরাতন স্বত্ব তাহারা আইনত দাবী করিতে পারে। জমিদারের লাঠির জোর বেশী, প্রজারা আজ বিশ বৎসর ভূমিহীন ও গৃহহীন অবস্থায় দেশে দেশে মজুরী করিয়া খায়, কেহ সামান্য চাষবাস করে, অনেকে মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের ছেলেপিলেরা নাবালক বা অসহায়—প্রবল জমিদারের বিরুদ্ধে স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়া যাইবে।

এদিকে নূতন প্রজা সংগ্রহ করা যায় কোথা হইতে? মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, ছাপরা প্রভৃতি নিকটবর্তী জেলা হইতে লোক যাহারা আসে, দর শুনিয়া পিছাইয়া যায়। দু-পাঁচজন কিছু কিছু লইতেছেও। এইরূপ মৃদু গতিতে অগ্রসর হইলে দশ হাজার বিঘা জঙ্গলী জমি প্রজাবিলি হইতে বিশ-পঁচিশ বৎসর লাগিয়া যাইবে।

আমাদের এক ডিহি কাছারি আছে—সেও ঘোর জঙ্গলময় মহাল—এখান থেকে উনিশ মাইল দূরে। জায়গাটার নাম লবটুলিয়া, কিন্তু এখানেও যেমন জঙ্গল, সেখানেও তেমনি, কেবল সেখানে কাছারি রাখার উদ্দেশ্য এই যে, সেই জঙ্গলটা প্রতি বছর গোয়ালাদের গরু-মহিষ চরাইবার জন্য খাজনা করিয়া দেওয়া হয়। এ বাদে সেখানে প্রায় দু'তিনশ' বিঘা জমিতে বন্যকুলের জঙ্গল আছে, লাক্ষা-কীট পুষিবার জন্য লোকে এই কুল-বন জমা লইয়া থাকে। এই টাকাটা আদায় করিবার জন্য সেখানে দশ টাকা মাহিনার একজন পাটোয়ারী ও তাহার একটা ছোট কাছারী আছে।

কুল-বন ইজারা দিবার সময় আসিতেছে, একদিন ঘোড়া করিয়া লবটুলিয়াতে রওনা হইলাম। আমার কাছারি ও লবটুলিয়ার মাঝখানে একটু উঁচু রাঙামাটির ডাঙা প্রায় সাত-আট মাইল লম্বা, এর নাম 'ফুলকিয়া বইহার'—কত ধরণের গাছপালা ও ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জায়গায় জায়গায় বন এত ঘন যে, ঘোড়ার গায়ে ডালপালা ঠেকে। ফুলকিয়া বইহার যেখানে নামিয়া গিয়া সমতল ভূমির সহিত মিশিল, চানন্ বলিয়া একটি পাহাড়ী নদী সেখানে উপলখণ্ডের উপর দিয়া ঝির্‌ঝির্ করিয়া বহিতেছে, বর্ষা-কালে সেখানে জল খুব গভীর—শীতকালে তত জল নাই।

লবটুলিয়ায় এই প্রথম আসিলাম। অতি ক্ষুদ্র এক খড়ের ঘর, তার মেজে জমির

সঙ্গে সমতল, ঘরের বেড়া পর্যন্ত শুকনো কাশের, বনঝাউয়ের ডালের পাতা দিয়া বাঁধা। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেখানে পৌঁছিলাম—এত শীত যেখানে থাকি সেখানে নাই, শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইলাম বেলা না পড়িতেই।

সিপাহীরা বনের ডালপালা জ্বালাইয়া আগুন করিল, সেই আগুনের ধারে ক্যাম্প-চেয়ারে বসিলাম, অন্য সবাই গোল হইয়া আগুনের চারিধারে বসিল।

কোথা হইতে সের পাঁচেক একটা রুই মাছ পাটোয়ারী আনিয়াছিল, এখন কথা উঠিল, রান্না করিবে কে? আমি সঙ্গে পাচক আনি নাই। নিজেও রান্না করিতে জানি না। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সাত-আটজন লোক লবটুলিয়াতে অপেক্ষা করিতেছিল—তাহাদের মধ্যে কন্টুমিশ্র নামে এক মৈথিল ব্রাহ্মণকে পাটোয়ারী রান্নার জন্য নিযুক্ত করিল।

পাটোয়ারীকে বলিলাম—এ-সব লোকেই কি ইজারা ডাকবে?

পাটোয়ারী বলিল—না হুজুর। ওরা খাবার লোভে এসেছে। আপনার আসবার নাম শুনে আজ দু-দিন ধরে কাছারিতে এসে বসে আছে। এদেশের লোকের ওই রকম অভ্যেস। আরও অনেকে বোধ হয় কাল আসবে।

এমন কথা কখনও শুনি নাই। বলিলাম—সে কি! আমি তো নিমন্ত্রণ করি নি এদের?

—হুজুর, এরা বড় গরীব; ভাত জিনিসটা খেতে পায় না। কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু, এই এরা বারোমাস খায়। ভাত খেতে পাওয়াটা এরা ভোজের সমান বিবেচনা করে। আপনি আসছেন, ভাত খেতে পাবে এখানে, সেই লোভে সব এসেছে! দেখুন না আরও কত আসে।

বাংলা দেশের লোকে বড় বেশী সভ্য হইয়া গিয়াছে ইহাদের তুলনায়, মনে হইল। কেন জানি না, এই অন্নভোজনলোলুপ সরল ব্যক্তিগুলিকে আমার সে-রাত্রে এত ভাল লাগিল! আগুনের চারিধারে বসিয়া তাহারা নিজেদের মধ্যে গল্প করিতেছিল, আমি শুনিতেছিলাম। প্রথমে তাহারা আমার আগুনে বসিতে চাহে নাই আমার প্রতি সম্মান-সূচক দূরত্ব বজায় রাখিবার জন্য—আমি তাহাদের ডাকিয়া আনিলাম। কন্টুমিশ্র কাছে বসিয়াই আসানকাঠের ডালপালা জ্বালাইয়া মাছ রাঁধিতেছে—ধুনা পুড়াইবার মত সুগন্ধ বাহির হইতেছে ধোঁয়া হইতে—আগুনের কুণ্ডের বাহিরে গেলে মনে হয়, যেন আকাশ হইতে বরফ পড়িতেছে—এত শীত।

খাওয়া-দাওয়া হইতে রাত্ত হইয়া গেল অনেক; কাছারিতে যত লোক ছিল, সকলেই খাইল। তারপর আবার আগুনের ধারে গোল হইয়া বসা গেল। শীতে মনে হইতেছে শরীরের রক্ত পর্যন্ত জমিয়া যাইবে। ফাঁকা বলিয়াই শীত বোধ হয় এত বেশী, কিংবা বোধ হয় হিমালয় বেশী দূর নয় বলিয়া।

আগুনের ধারে আমরা সাত-আটজন লোক, সামনে ছোট ছোট দুখানি খড়ের ঘর। একখানিতে থাকিব আমি, আর একখানিতে বাকী এতগুলি লোক। আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া অন্ধকার বন ও প্রান্তর, মাথার উপরে নক্ষত্র-ছড়ানো দূরপ্রসারী অন্ধকার আকাশ। আমার বড় অদ্ভুত লাগিল, যেন চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে নির্বাসিত হইয়া মহাশূন্যে এক গ্রহে অন্য এক অজ্ঞাত রহস্যময় জীবনধারার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছি।

একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের লোক এ-দলের মধ্যে আমার মনোযোগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। লোকটির নাম গনোরী তেওয়ারী, শ্যামবর্ণ; দোহারা চেহারা,

মাথায় বড় চুল, কপালে দুটি লম্বা ফোঁটা কাটা, এই শীতে গায়ে একখানা মোটা চাদর ছাড়া আর কিছু নাই, এ-দেশের রীতি অনুযায়ী গায়ে একটা মেরজাই থাকা উচিত ছিল, তা পর্যন্ত নাই। অনেকক্ষণ হইতে আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম, সে সকলের দিকে কেমন কুণ্ঠিতভাবে চাহিতেছিল, কারও কথায় কোনও প্রতিবাদ করিতেছিল না, অথচ কথা যে সে কম বলিতেছিল তা নয়।

আমার প্রতি কথার উত্তরে কেবল সে বলে—হুজুর।

এদেশের লোকে যখন কোন মান্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কথা মানিয়া লয়, তখন কেবল মাথা সামনের দিকে অল্প ঝাঁকাইয়া সসম্ভ্রমে বলে—হুজুর।

গনোরীকে বলিলাম—তুমি থাকো কোথায়, তেওয়ারীজি ?

আমি যে তাহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিব, এতটা সম্মান যেন তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, এভাবে সে আমার দিকে চাহিল। বলিল—ভীমদাসটোলা, হুজুর।

তারপর সে তাহার জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গেল, একটানা নয়, আমার প্রশ্নের উত্তরে টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে।

গনোরী তেওয়ারীর বয়স যখন বারো বছর, তার বাপ তখন মারা যায়। এক বৃদ্ধা পিসিমা তাহাকে মানুষ করে, সে পিসিমাও বাপের মৃত্যুর বছর-পাঁচ পরে যখন মারা গেলেন, গনোরী তখন জগতে ভাগ্য অন্বেষণে বাহির হইল। কিন্তু তাহার জগৎ পূর্বে পূর্ণিয়া শহর, পশ্চিমে ভাগলপুর জেলার সীমানা, দক্ষিণে এই নির্জন অরণ্যময় ফুল-কিয়া বইহার, উত্তরে কুশী নদী—ইহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহারই মধ্যে গ্রামে গ্রামে গৃহস্থের দুয়ারে ফিরিয়া কখনও ঠাকুরপুজো করিয়া, কখনও গ্রাম্য পাঠশালায় পণ্ডিতি করিয়া কায়ক্লেশে নিজের আহারের জন্য কলাইয়ের ছাতু ও চীনা ঘাসের দানার রুটির সংস্থান করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি মাস দুই চাকুরি নাই, পর্বতা গ্রামের পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে, ফুলকিয়া বইহারের দশ হাজার বিঘা অরণ্যময় অঞ্চলে লোকের বসতি নাই—এখানে যে মহিষ-পালকের দল মহিষ চরাইতে আনে জঙ্গলে, তাহাদের বাথানে বাথানে ঘুরিয়া খাদ্যভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল—আজ আমার আসিবার খবর পাইয়া অনেকের সঙ্গে এখানে আসিয়াছে।

আসিয়াছে কেন, সে কথা আরও চমৎকার।

—এখানে এত লোক এসেছে কেন তেওয়ারীজি ?

—হুজুর, সবাই বললে ফুলকিয়ার কাছারিতে ম্যানেজার এসেছেন, সেখানে গেলে ভাত খেতে পাওয়া যাবে, তাই ওরা এল, ওদের সঙ্গে আমিও এলাম।

—ভাত এখানকার লোকে কি খেতে পায় না ?

—কোথায় পাবে হুজুর। নউগাছিয়ায় মাড়োয়ারীরা রোজ ভাত খায়, আমি নিজে আজ ভাত খেলাম বোধ হয় তিন মাস পরে। গত ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল, সে বড়লোক, ভাত খাইয়েছিল। তার পর আর খাই নি।

যতগুলি লোক আসিয়াছিল, এই ভয়ানক শীতে কাহারও গাত্রবস্ত্র নাই, রাত্রে আগুন পোহাইয়া রাত কাটায়। শেষ-রাত্রে শীত যখন বেশী পড়ে, আর ঘুম হয় না শীতের চোটে—আগুনের খুব কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকে ভোর পর্যন্ত।

কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল। ইহাদের দারিদ্র্য, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবন-সংগ্রামে ইহাদের যুঝিবার ক্ষমতা—এই অন্ধকার আরণ্যভূমি ও হিমবর্ষী

মুক্ত আকাশ বিলাসিতার কোমল পুষ্পাস্তৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, কিন্তু ইহাদিগকে সত্যকার পুরুষমানুষ করিয়া গড়িয়াছে। দুটি ভাত খাইতে পাওয়ার আনন্দে যারা ভীমদাসটোলা ও পর্বতা হইতে ন' মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে বিনা নিমন্ত্রণে —তাহাদের মনের আনন্দ গ্রহণ করিবার শক্তি কত সতেজ ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম।

অনেক রাত্রে কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল—শীতে মুখ বাহির করাও যেন কষ্টকর, এমন যে শীত এখানে তা না-জানার দরুন উপযুক্ত গরম কাপড় ও লেপ-তোশক আনি নাই। কলিকাতায় যে-কম্বল গায়ে দিতাম সেখানাই আনিয়াছিলাম—শেষরাত্রের শীতে সে যেন ঠাণ্ডা জল হইয়া যায় প্রতিদিন। যে-পাশে শুইয়া থাকি, শরীরের গরমে সে-দিকটা তবুও থাকে এক রকম, অন্য কাতে পাশ ফিরিতে গিয়া দেখি বিছানা কন্‌কন্‌ করিতেছে সে-পাশে—মনে হয় যেন ঠাণ্ডা পুকুরের জলে পৌষ মাসের রাত্রে ডুব দিলাম। পাশেই জঙ্গলের মধ্যে কিসের যেন সম্মিলিত পদশব্দ—কাহারা যেন দৌড়িতেছে—গাছপালা, শুকনো বনঝাউয়ের গাছ মট্‌ মট্‌ শব্দে ভাঙিয়া উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িতেছে।

কি ব্যাপারখানা, কিছু বুঝিতে না পারিয়া সিপাহী বিষ্ণুরাম পাঁড়ে ও স্কুলমাস্টার গনোরী তেওয়ারীকে ডাক দিলাম। তাহারা নিদ্রাজড়িত চোখে উঠিয়া বসিল—কাছারির মেঝেতে যে-আগুন জ্বালা হইয়াছিল, তাহারই শেষ দীপ্তিটুকুতে ওদের মুখে আলস্য সম্ভ্রম ও নিদ্রালুতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। গনোরী তেওয়ারী কান পাতিয়া একটু শুনিয়াই বলিল—কিছু না হুজুর, নীলগাইয়ের জেরা দৌড়চ্ছে জঙ্গলে—

কথা শেষ করিয়াই সে নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরিয়া শুইতে যাইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম—নীলগাইয়ের দলের হঠাৎ এত রাত্রে অমন দৌড়ুবার কারণ কি?

বিষ্ণুরাম পাঁড়ে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—হয়তো কোনও জানোয়ারে তাড়া করে থাকবে হুজুর—এ ছাড়া আর কি।

—কি জানোয়ার?

—কি আর জানোয়ার হুজুর, জঙ্গলের জানোয়ার। শের হতে পারে—নয় তো ভালু—

—যে-ঘরে শুইয়া আছি, নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার কাশডাঁটায় বাঁধা আগড়ের দিকে নজর পড়িল। সে আগড়ও এত হালকা যে, বাহির হইতে একটি কুকুরে ঠেলা মারিলেও তাহা ঘরের মধ্যে উল্টাইয়া পড়ে—এমন অবস্থায় ঘরের সামনেই জঙ্গলে নিস্তব্ধ নিশীথরাত্রে বাঘ বা ভালুকে বন্য নীলগাইয়ের দল তাড়া করিয়া লইয়া চলিয়াছে—এ সংবাদটিতে যে বিশেষ আশ্বস্ত হইলাম না, তাহা বলাই বাহুল্য।

একটু পরেই ভোর হইয়া গেল।

## ৩

দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল। এর নির্জনতা ও অপরাহ্ণের সিঁদুর-ছড়ানো বনঝাউয়ের জঙ্গলের কি আকর্ষণ আছে বলিতে পারি না—আজকাল ক্রমশ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদপোড়া মাটির তাজা সুগন্ধ, এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।



এ মনের ভাব একদিনে হয় নাই। কত রূপে কত সাজেই যে বন্যপ্রকৃতি আমার মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া আমায় ভুলাইল!—কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব রক্ত-মেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরতর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবরণী সুরসুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশ-ভরা তারার মালা গলায়—অন্ধকার রজনীতে কাল-পুরুষের আগুনের খড়্গ হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্তিতে।

## ৪

একদিনের কথা জীবনে কখনও ভুলিব না। মনে আছে সেদিন দোল-পূর্ণিমা। কাছারির সিপাহীরা ছুটি চাহিয়া লইয়া সারাদিন ঢোল বাজাইয়া হোলি খেলিয়াছে। সন্ধ্যার সময়েও নাচগানের বিরাম নাই দেখিয়া আমি নিজের ঘরে টেবিলে আলো জ্বালাইয়া অনেক রাত পর্যন্ত হেড আপিসের জন্য চিঠিপত্র লিখিলাম। কাজ শেষ হইতেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, রাত প্রায় একটা বাজে। শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছি। একটা সিগারেট ধরাইয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকে উঁকি মারিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যে-জিনিসটা আমাকে মুগ্ধ করিল তাহা পূর্ণিমা-নিশীথিনীর অবর্ণনীয় জ্যোৎস্না।

হয়তো যতদিন আসিয়াছি, শীতকাল বলিয়া গভীর রাত্রে কখনো বাহিরে আসি নাই কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হউক, ফুলকিয়া বইহারের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-রাত্রির রূপ এই আমি প্রথম দেখিলাম।

দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কেহ কোথাও নাই, সিপাহীরা সারাদিন আমোদ-প্রমোদের পরে ক্লান্তদেহে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিঃশব্দ অরণ্যভূমি, নিস্তব্ধ জনহীন নিশীথরাত্রি। সে জ্যোস্না-রাত্রির বর্ণনা নাই। কখনও সে-রকম ছায়াবিহীন

জ্যোৎস্না জীবনে দেখি নাই। এখানে খুব বড় বড় গাছ নাই, ছোটখাটো বনঝাউ ও কাশবন —তাহাতে তেমন ছায়া হয় না। চক্‌চকে সাদা বালি মিশানো জমি ও শীতের রৌদ্রে অর্ধশুষ্ক কাশবনে জ্যোৎস্না পড়িয়া এমন এক অপার্থিব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা দেখিলে মনে কেমন ভয় হয়। মনে কেমন যেন একটা উদাস বাঁধনহীন মুক্ত ভাব—মন হু হু করিয়া ওঠে, চারিধারে চাহিয়া সেই নীরব নিশীথরাত্রে জ্যোৎস্নাভরা আকাশতলে দাঁড়াইয়া মনে হইল এক অজানা পরীরাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি—মানুষের কোন নিয়ম এখানে খাটিবে না। এই সব জনহীন স্থান গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নালোকে পরীদের বিচরণভূমিতে পরিণত হয়, আমি অনধিকার-প্রবেশ করিয়া ভাল করি নাই।

তাহার পর ফুলকিয়া বইহারের জ্যোৎস্নারাত্রি কতবার দেখিয়াছি—ফাল্গুনের মাঝামাঝি যখন দুধলি ফুল ফুটিয়া সমস্ত প্রান্তরে যেন রঙীন ফুলের গালিচা বিছাইয়া দেয়, তখন কত জ্যোৎস্নাশুভ্র রাত্রে বাতাসে দুধলি ফুলের মিষ্ট সুবাস প্রাণ ভরিয়া আঘ্রাণ করিয়াছি—প্রত্যেক বারেই মনে হইয়াছে জ্যোৎস্না যে এত অপরূপ হইতে পারে, মনে এমন ভয়মিশ্রিত উদাস ভাব আনিতে পারে, বাংলা দেশে থাকিতে তাহা তো কোনদিন ভাবিও নাই। ফুলকিয়ার সে জ্যোৎস্না-রাত্রির বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিব না, সেরূপ সৌন্দর্যালোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যতদিন না হয় ততদিন শুধু কানে শুনিয়া বা লেখা পড়িয়া তাহা উপলব্ধি করা যাইবে না—করা সম্ভব নয়। অমন মুক্ত আকাশ, অমন নিস্তব্ধতা, অমন নির্জনতা, অমন দিগ্‌দিগন্ত-বিসর্পিত বনানীর মধ্যেই শুধু অমনতর রূপলোক ফুটিয়া উঠে। জীবনে একবারও সে জ্যোৎস্নারাত্রি দেখা উচিত ; যে না দেখিয়াছে, ভগবানের সৃষ্টির একটি অপূর্ব রূপ তাহার নিকট চির-অপরিচিত রহিয়া গেল।

## ৫

একদিন ডিহি আজমাবাদের সার্ভে-ক্যাম্প হইতে ফিরিবার সময় সন্ধ্যার মুখে বনের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলিলাম। বনের ভূমি সর্বত্র সমতল নয়, কোথাও উঁচু জঙ্গলাবৃত বালিয়াড়ি টিলা, তার পরই দুটি টিলার মধ্যবর্তী ছোটখাটো উপত্যকা। জঙ্গলের কিন্তু কোথাও বিরাম নাই—টিলার মাথায় উঠিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম যদি কোন দিকে কাছারির মহাবীরের ধ্বজার আলো দেখা যায়—কোন দিকে আলোর চিহ্নও নাই—শুধু উঁচুনীচু টিলা ও ঝাউবন আর আকাশবন—মাঝে মাঝে শাল ও আসান গাছের বনও আছে। দুই ঘণ্টা ঘুরিয়াও যখন জঙ্গলের কূলকিনারা পাইলাম না, তখন হঠাৎ মনে পড়িল নক্ষত্র দেখিয়া দিক ঠিক করি না কেন। গ্রীষ্মকাল, কালপুরুষ দেখি প্রায় মাথার উপর রহিয়াছে। বুঝিতে পারিলাম না কোন্ দিক হইতে আসিয়া কালপুরুষ মাথার উপর উঠিয়াছে—সপ্তর্ষিমণ্ডল খুঁজিয়া পাইলাম না। সুতরাং নক্ষত্রের সাহায্যে দিক্‌-নিরূপণের আশা পরিত্যাগ করিয়া ঘোড়াকে ইচ্ছামত ছাড়িয়া দিলাম। মাইল দুই গিয়া জঙ্গলের মধ্যে একটা আলো দেখা গেল। আলো লক্ষ্য করিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, জঙ্গলের মধ্যে কুড়ি বর্গহাত আন্দাজ পরিষ্কার স্থানে একটা খুব নীচু ঘাসের খুপরি। কুঁড়ের সামনে গ্রীষ্মের দিনেও আগুন জ্বালানো। আগুনের নিকট হইতে একটু দূরে একটা লোক বসিয়া কি করিতেছে।

আমার ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া লোকটি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—কে? তার পরেই আমায় চিনিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিল ও আমাকে খুব খাতির করিয়া ঘোড়া হইতে নামাইল।

পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, প্রায় ছ-ঘণ্টা আছি ঘোড়ার উপর, কারণ সার্ভে-ক্যাম্পেও আমিনের পিছু পিছু ঘোড়ায় টো টো করিয়া জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিয়াছি। লোকটার প্রদত্ত একটা ঘাসের চেটাইয়ে বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার নাম কি? লোকটা বলিল—গনু মাহাতো, জাতি গাঙ্গোতা। এ অঞ্চলে গাঙ্গোতা জাতির উপজীবিকা চাষ-বাস ও পশুপালন, তাহা আমি এতদিনে জানিয়াছিলাম—কিন্তু এ লোকটা এই জনহীন গভীর বনের মধ্যে একা কি করে?

বলিলাম—তুমি এখানে কি করো? তোমাব বাড়ী কোথায়?

—হুজুর, মহিষ চরাই। আমার ঘর এখান থেকে দশ ক্রোশ উত্তরে ধরমপুর, লছমনিয়াটোলা।

—নিজের মহিষ? কতগুলো আছে?

লোকটা গর্বের সুরে বলিল—পাঁচটা মহিষ আছে হুজুর।

পাঁচটা মহিষ? দস্তুরমত অবাক হইলাম। দশ ক্রোশ দূরের গ্রাম হইতে পাঁচটা মাত্র মহিষ সম্বল করিয়া লোকটি এই বিজন বনের মধ্যে মহিষচরির খাজনা দিয়া একা খুপরি বাঁধিয়া মহিষ চরায়—দিনের পর দিন, মাসেব পর মাস, এই ছোট্ট খুপরিটাতে কি করিয়া সময় কাটায়—কলিকাতা হইতে নূতন আসিয়াছি, শহরের থিয়েটার-বায়োস্কোপে লালিত যুবক আমি—বুঝিতে পারিলাম না।

কিন্তু এদেশের অভিজ্ঞতা আরও বেশী হইলে বুঝিয়াছিলাম, কেন গনু মাহাতো ওভাবে থাকে। তাহার অন্য কোন কারণ নাই ইহা ছাড়া যে, গনু মাহাতোর জীবনের ধারণাই এইরূপ। যখন তাহার পাঁচটি মহিষ তখন তাহাদের চরাইতে হইবে, এবং যখন চরাইতে হইবে, তখন জঙ্গলে কুঁড়ে বাঁধিয়া একা থাকিতেই হইবে। এ অত্যন্ত সাধারণ কথা, ইহার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কি আছে।

গনু কাঁচা শালপাতার একটি লম্বা পিকা বা চুরুট তৈরী করিয়া আমার হাতে সসম্ভ্রমে দিয়া আমার অভ্যর্থনা করিল। আগুনের আলোতে উহার মুখ দেখিলাম—বেশ চওড়া কপাল, উঁচু নাক, রং কালো—মুখশ্রী সরল, শান্ত চোখের দৃষ্টি। বয়স ষাটের উপর হইবে, মাথার চুল একটিও কালো নাই। কিন্তু শরীর এমন সুগঠিত যে, এই বয়সেও প্রত্যেকটি মাংসপেশী আলাদা করিয়া গুনিয়া লওয়া যায়।

গনু আগুনে আরও বেশী কাঠ ফেলিয়া দিয়া নিজেও একটি শালপাতার পিকা ধরাইল। আগুনের আভায় খুপরির মধ্যে এক-আধখানা পিতলের বাসন চক্ চক্ করিতেছে। আগুনের কুণ্ডের মণ্ডলীর বাহিরে ঘোরতর অন্ধকার ও ঘন বন। বলিলাম—গনু, একা এখানে থাক, জন্তু-জানোয়ারের ভয় করে না? গনু বলিল—ভয়ডর করলে কি আমাদের চলে হুজুর? আমাদের যখন এই ব্যবসা! সেদিন তো রাত্রে আমার খুপরির পেছনে বাঘ এসেছিল। মহিষের দুটো বাচ্চা আছে, ওদের ওপর তাক্। শব্দ শুনে রাত্রে উঠে টিন বাজাই, মশাল জ্বালি, চীৎকার করি! রাত্রে আর ঘুম হল না হুজুর; শীত-কালে তো সারারাত এই বনে ফেউ ডাকে।

—খাও কি এখানে? দোকান-টোকান তো নেই, জিনিসপত্র পাও কোথায়? চাল ডাল—

—হুজুর, দোকানে জিনিস কেনবার মত পয়সা কি আমাদের আছে, না আমরা বাঙালী বাবুদের মত ভাত খেতে পাই? এই জঙ্গলের পেছনে আমার দু-বিঘে খেড়ী ক্ষেত আছে। খেড়ীর দানা সিদ্ধ, আর জঙ্গলে বাথুয়া শাক হয়, তাই সিদ্ধ, আর একটু নুন, এই খাই। ফাগুন মাসে জঙ্গলে গুড়মী ফল ফলে, নুন দিয়ে কাঁচা খেতে বেশ লাগে—লতানে গাছ, ছোট ছোট কাঁকুড়ের মত ফল হয়; সে সময় এক মাস এ-অঞ্চলের যত গরিব লোক গুড়মী ফল খেয়ে কাটিয়ে দেয়। দলে দলে ছেলেমেয়ে আসবে জঙ্গলের গুড়মী তুলতে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—রোজ রোজ খেড়ীর দানা সিদ্ধ আর বাথুয়া শাক ভাল লাগে?

—কি করব হুজুর, আমরা গরীব লোক, বাঙালী বাবুদের মত ভাত খেতে পাব কোথায়? ভাত এ অঞ্চলের মধ্যে কেবল রাসবিহারী সিং আর নন্দলাল পাঁড়ে খায় দুবেলা। সারাদিন মহিষের পেছনে ভূতের মত খাটি হুজুর, সন্ধ্যের সময় ফিরি যখন, তখন এত ক্ষিদে পায় যে, যা পাই খেতে তাই ভাল লাগে।

গনুকে বলিলাম—কলকাতা শহর দেখেছ গনু?

—না হুজুর। কানে শুনেছি। ভাগলপুর শহরে একবার গিয়েছি, বড় ভারী শহর। ওখানে হাওয়ার গাড়ী দেখেছি, বড় তাজ্জব চিজ হুজুর। ঘোড়া নেই কিছু নেই, আপনা-আপনি রাস্তা দিয়ে চলছে।

এই বয়সে উহার স্বাস্থ্য দেখিয়া অবাক হইলাম। সাহসও যে আছে, ইহা মনে মনে স্বীকার করিতে হইল।

গনুর জীবিকানির্বাহের একমাত্র অবলম্বন মহিষ কয়টি। তাদের দুধ অবশ্য এ-জঙ্গলে কে কিনিবে, দুধ হইতে মাখন তুলিয়া ঘি করে ও দু'তিন মাসের ঘি একত্রে জমাইয়া ন-মাইল দূরবর্তী ধরমপুরের বাজারে মাড়োয়ারীদের নিকট বিক্রয় করিয়া আসে। আর থাকিবার মধ্যে ওই দু-বিঘা খেড়ী অর্থাৎ শ্যামাঘাসের ক্ষেত, যার দানা সিদ্ধ এ-অঞ্চলের প্রায় সকল গরীব লোকেরই একটা প্রধান খাদ্য। গনু সে-রাত্রে আমাকে কাছারিতে পৌঁছাইয়া দিল, কিন্তু গনুকে আমার এত ভাল লাগিল যে, কত বার শান্ত বৈকালে তাহার খুপরির সামনে আগুন পোহাইতে পোহাইতে গল্প করিয়া কাটাইয়াছি। ওদেশের নানারূপ তথ্য গনুর কাছে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, অত কেউ দিতে পারে নাই।

গনুর মুখে কত অদ্ভুত কথা শুনিতাম। উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথর ও আঁতুড়ে ছেলের হাঁটিয়া বেড়াইবার কথা, ইত্যাদি। ওই নির্জন জঙ্গলের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে গনুর যে-সব গল্প অতি উপাদেয় ও অতি রহস্যময় লাগিত—আমি জানি কলিকাতা শহরে বসিয়া সে-সব গল্প শুনিলে তাহা আজগুবী ও মিথ্যা মনে হইতে বাধ্য। যেখানে-সেখানে যে-কোন গল্প শোনা চলে না, গল্প শুনিবার পটভূমি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর উহার মাধুর্য যে কতখানি নির্ভর করে, তাহা গল্পপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। গনুর সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে আমার আশ্চর্য বলিয়া মনে হইয়াছিল বন্যমহিষের দেবতা টাঁড়বারোর কথা।

কিন্তু, যেহেতু এই গল্পের একটি অদ্ভুত উপসংহার আছে—সেজন্য সে-কথা এখন না বলিয়া যথাস্থানে বলিব। এখানে বলিয়া রাখি, গনু আমাকে যে-সব গল্প বলিত—তাহা রূপকথা নহে, তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়। গনু জীবনকে দেখিয়াছে তবে অন্যভাবে। অরণ্য-প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আজীবন কাটাইয়া সে অরণ্য-প্রকৃতি

সম্বন্ধে একজন রীতিমত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তাহার কথা হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মিথ্যা বানাইয়া বলিবার মত কল্পনাশক্তিও গনুর আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### ১

গ্রীষ্মকাল পড়িতে গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের মাথায় পীরপৈঁতি পাহাড়ের দিক হইতে একদল বক উড়িয়া আসিয়া বসিল, দূর হইতে মনে হয় যেন বটগাছের মাথা সাদা থোকা থোকা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

একদিন অর্ধশুষ্ক কাশের বনের ধারে টেবিল-চেয়ার পাতিয়া কাজ করিতেছি, মুনেশ্বর সিং সিপাহী আসিয়া বলিল—হুজুর, নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

একটু পরে প্রায় পঞ্চাশ বছরের একটি বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার সামনে আসিয়া সেলাম করিল ও আমার নির্দেশমত একটা টুলের উপর বসিল। বসিয়াই সে একটি পশমের থলি বাহির করিল। তাহার পর থলেটির ভিতর হইতে খুব ছোট একখানি জাঁতি ও দুইটি সুপারি বাহির করিয়া সুপারি কাটিতে আরম্ভ করিল। পরে কাটা সুপারি হাতে রাখিয়া দুই হাত একত্র করিয়া আমার সামনে মেলিয়া ধরিয়া সসম্ভ্রমে বলিল—সুপারি লিজিয়ে, হুজুর।

সুপারি ও-ভাবে খাওয়া অভ্যাস না থাকিলেও ভদ্রতার খাতিরে লইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা হতে আসা হচ্ছে, কি কাজ?

তাহার উত্তরে লোকটি বলিল, তাহার নাম নন্দলাল ওঝা, মৈথিল ব্রাহ্মণ। জঙ্গলের উত্তর-পূর্ব-কোণে কাছারি হইতে প্রায় এগার মাইল দূরে সুংঠিয়াদিয়ারাতে তাহার বাড়ী। বাড়ীতে চাষবাস আছে, কিছু সুদের কারবারও আছে—সে আসিয়াছে তার বাড়ীতে আগামী পূর্ণিমার দিন আমায় নিমন্ত্রণ করিতে—আমি কি তাহার বাড়ীতে দয়া করিয়া পদধূলি দিতে রাজী আছি? এ সৌভাগ্য কি তাহার হইবে?

এগার মাইল দূরে এই রৌদ্রে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার লোভ আমার ছিল না—কিন্তু নন্দলাল ওঝা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করাতে অগত্যা রাজী হইলাম—তা ছাড়া এদেশের গৃহস্থ-সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার লোভও সংবরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্ণিমার দিন দুপুরের পরে দীর্ঘ কাশের জঙ্গলের মধ্য দিয়া কাহাদের একটি হাতী আসিতেছে দেখা গেল। হাতী কাছারিতে আসিলে মাহুতের মুখে শুনিলাম হাতীটি নন্দলাল ওঝার নিজের—আমাকে লইয়া যাইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। হাতী পাঠাইবার আবশ্যক ছিল না—কারণ আমার নিজের ঘোড়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পৌঁছিতে পারিতাম।

যাহাই হউক, হাতীতে চড়িয়াই নন্দলালের বাড়ীতে রওনা হইলাম। সবুজ বনশীর্ষ আমার পায়ের তলায়, আকাশ যেন আমার মাথায় ঠেকিয়াছে—দূর, দূর-দিগন্তের নীল শৈলমালার রেখা বনভূমিকে ঘিরিয়া যেন মায়ালোক রচনা করিয়াছে—আমি সে-মায়া-লোকের অধিবাসী—বহু দূর স্বর্গের দেবতা। কত মেঘের তলায় তলায় পৃথিবীর কত

শ্যামল বনভূমির উপরকার নীল বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া যেন আমার অদৃশ্য যাতায়াত।

পথে চাম্‌টার বিল পড়িল, শীতের শেষেও সিল্লী আর লাল হাঁসের ঝাঁকে ভর্তি। আর একটু গরম পড়িলেই উড়িয়া পলাইবে। মাঝে মাঝে নিতান্ত দরিদ্র পল্লী। ফণী-মনসা-ঘেরা তামাকের ক্ষেত ও খোলায় ছাওয়া দীন-কুটীর।

সুংঠিয়া গ্রামে হাতী ঢুকিলে দেখা গেল পথের দু-ধারে সারবন্দী লোক দাঁড়াইয়া আছে আমায় অভ্যর্থনা করিবার জন্য। গ্রামে ঢুকিয়া অল্পদূর পরেই নন্দলালের বাড়ী।

খোলায় ছাওয়া মাটির ঘর আট-দশখানা—সবই পৃথক পৃথক, প্রকাণ্ড উঠানের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো। আমি বাড়ীতে ঢুকিতেই দুই বার হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল। চমকাইয়া গিয়াছি—এমন সময়ে সহাস্যমুখে নন্দলাল ওঝা আসিয়া আমায় অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়া একটা বড় ঘরের দাওয়ায় চেয়ারে বসাইল। চেয়ারখানি এদেশের শিশুকাঠের তৈয়ারী এবং এদেশের গ্রাম্য মিস্ত্রীর হাতেই গড়া। তাহার পর দশ-এগার বছরের একটি ছোট মেয়ে আসিয়া আমার সামনে একখানা থালা ধরিল—থালায় গোটাকতক আস্ত পান, আস্ত সুপারি, একটা মধুপর্কের মত ছোট বাটিতে সামান্য একটু আতর, কয়েকটি শুষ্ক খেজুর ; ইহা লইয়া কি করিতে হয় আমার জানা নাই—আমি আনাড়ির মত হাসিলাম ও বাটী হইতে আঙুলের আগায় একটু আতর তুলিয়া লইলাম মাত্র। মেয়েটিকে দু'একটি ভদ্রতাসূচক মিষ্ট কথাও বলিলাম। মেয়েটি থালা আমার সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল।

তার পর খাওয়ানোর ব্যবস্থা। নন্দলাল যে ঘটা করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা আমার ধারণা ছিল না। প্রকাণ্ড কাঠের পিঁড়ির আসন পাতা—সম্মুখে এমন আকারের একখানি পিতলের থালা আসিল, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশে দুর্গাপূজার বড় নৈবেদ্য সাজায়। থালায় হাতীর কানের মত পুরী, বাথুয়া শাক ভাজা, পাকা শশার রায়তা, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল, মহিষের দুধের দই, পেঁড়া। খাবার জিনিসের এমন অদ্ভুত যোগাযোগ কখনও দেখি নাই। আমায় দেখিবার জন্য উঠানে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে ও আমার দিকে এমন ভাবে চাহিতেছে যে, আমি যেন এক অদৃষ্টপূর্ব জীব। শুনিলাম ইহারা সকলেই নন্দলালের প্রজা।

সন্ধ্যার পূর্বে উঠিয়া আসিবার সময় নন্দলাল একটি ছোট থলি আমার হাতে দিয়া বলিল—হুজুরের নজর। আশ্চর্য হইয়া গেলাম। থলিতে অনেক টাকা, পঞ্চাশের কম নয়। এত টাকা কেহ কাহাকেও নজর দেয় না, তাছাড়া নন্দলাল আমার প্রজাও নয়। নজর প্রত্যাখ্যান করাও গৃহস্থের পক্ষে নাকি অপমানজনক—সুতরাং আমি থলি খুলিয়া একটা টাকা লইয়া থলিটা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—তোমার ছেলেপুলেদের পেঁড়া খাইতে দিও।

নন্দলাল কিছুতেই ছাড়িবে না—আমি সে-কথায় কান না দিয়াই বাহিরে আসিয়া হাতীর পিঠে চড়িলাম।

পরদিনই নন্দলাল ওঝা আমার কাছারিতে গেল, সঙ্গে তাহার বড় ছেলে। আমি তাহাদিগকে সমাদর করিলাম—কিন্তু খাইবার প্রস্তাবে তাহারা রাজী হইল না। শুনিলাম মৈথিল ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণের হস্তের প্রস্তুত কোন খাবারই খাইবে না। অনেক বাজে কথার পরে নন্দলাল একান্তে আমার নিকট কথা পাড়িল, তাহার বড় ছেলে ফুলকিয়া বই-হারের তহশীলদারীর জন্য উমেদার—তাহাকে আমায় বাহাল করিতে হইবে। আমি বিস্মিত

হইয়া বলিলাম—কিন্তু ফুলকিয়ার তহশীলদার তো আছে—সে পোস্ট তো খালি নেই। তাহার উত্তরে নন্দলাল আমাকে চোখ ঠারিয়া ইশারা করিয়া বলিল, হুজুর, মালিক তো আপনি। আপনি মনে করলে কি না হয়?

আমি আরও অবাক্ হইয়া গেলাম। সে কি রকম কথা! ফুলকিয়ার তহশীলদার ভালই কাজ করিতেছে—তাহাকে ছাড়াইয়া দিব কোন্ অপরাধে?

নন্দলাল বলিল—কত রুপেয়া হুজুরকে পান খেতে দিতে হবে বলুন, আমি আজ সাঁজেই হুজুরকে পৌঁছে দেব। কিন্তু আমার ছেলেকে তহশীলদারী দিতে হবেই হুজুরের। বলুন কত, হুজুর। পাঁচ-শ'?...এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলাম, নন্দলাল যে আমাকে কাল নিমন্ত্রণ করিয়াছিল তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। এদেশের লোক যে এমন ধড়িবাজ, তাহা জানিলে কখনো ওখানে যাই? আচ্ছা বিপদে পড়িয়াছি বটে!

নন্দলালকে স্পষ্ট কথা বলিয়াই বিদায় করিলাম। বুঝিলাম নন্দলাল আশা ছাড়িল না।

আর একদিন দেখি, ঘন বনের ধারে নন্দলাল আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

কি কুক্ষণেই উহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলাম—দুখানা পুরী খাওয়াইয়া সে যে আমার জীবন এমন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে—তাহা আগে জানিলে কি উহার ছায়া মাড়াই?

নন্দলাল আমাকে দেখিয়া মিষ্টি মোলায়েম হাসিয়া বলিল—নোমোস্কার হুজুর।

—হুঁ। তার পর এখানে কি মনে করে?

—হুজুর সবই জানেন। আমি আপনাকে বারো-শ' টাকা নগদ দেব। আমার ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দিন।

—তুমি পাগল নন্দলাল? আমি বাহাল করবার মালিক নই। যাদের জমিদারী, তাদের কাছে দরখাস্ত করতে পারো। তাছাড়া বর্তমানে যে রয়েছে—তাকে ছাড়াব কোন্ অপরাধে?

বলিয়াই বেশী কথা না বাড়াইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

ক্রমে আমার কড়া ব্যবহারে নন্দলালকে আমি আমার ও স্টেটের মহাশত্রু করিয়া তুলিলাম। তখনও বুঝি নাই, নন্দলাল কিরূপ ভয়ানক প্রকৃতির মানুষ। ইহার ফল আমাকে ভাল করিয়াই ভুগিতে হইয়াছিল।

## ২

উনিশ মাইল দূরবর্তী ডাকঘর হইতে ডাক আনা এখানকার এক অতি আবশ্যক ঘটনা। অতদূরে প্রতিদিন লোক পাঠানো চলে না বলিয়া সপ্তাহে দুবার মাত্র ডাকঘরে লোক যাইত। মধ্য-এশিয়ার জনহীন, দুস্তর ও ভীষণ টাক্লামাকান মরুভূমির তাঁবুতে বসিয়া বিখ্যাত পর্যটক সোয়েন হেডিনও বোধ হয় এমনি আগ্রহে ডাকের প্রতীক্ষা করিতেন। আজ আট-নয় মাস এখানে আসিবার ফলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই জনহীন বন-প্রান্তরে সূর্যাস্ত, নক্ষত্ররাজি, চাঁদের উদয়, জ্যোৎস্না ও বনের মধ্যে নীলগাইয়ের দৌড় দেখিতে দেখিতে যে-বহির্জগতের সঙ্গে সকল যোগ হারাইয়া ফেলিয়াছি—ডাকের চিঠি কয়খানির মধ্য দিয়া আবার তাহার সহিত একটা সংযোগ স্থাপিত হইত।

নির্দিষ্ট দিনে জওয়াহিরলাল সিং ডাক আনিতে গিয়াছে। আজ দুপুরে সে আসিবে। আমি ও বাঙালী মুহুরী বাবুটি ঘন ঘন জঙ্গলের দিকে চাহিতেছি। কাছারি হইতে

মাইল দেড় দূরে একটা উঁচু ঢিবির উপর দিয়া পথ। ওখানে আসিলে জওয়াহিরলাল সিংকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

বেলা দুপুর হইয়া গেল। জওয়াহিরলালের দেখা নাই। আমি ঘন ঘন ঘর-বাহির করিতেছি। এখানে আপিসের কাজের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বিভিন্ন আমিনের রিপোর্ট দেখা, দৈনিক ক্যাশবই সই করা, সদরের চিঠি-পত্রের উত্তর লেখা, পাটোয়ারী ও তহশীলদারদের আদায়ের হিসাব-পরীক্ষা, নানাবিধ দরখাস্তের ডিগ্রী ডিস্‌মিস্ করা, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে নানা আদালতে নানাপ্রকার মামলা ঝুলিতেছে—ঐ সকল স্থানের উকীল ও মামলা-তম্বিরকারকদের রিপোর্ট পাঠ ও তার উত্তর দেওয়া-- আরও নানা প্রকার বড় ও খুচরা কাজ প্রতিদিন নিয়ম মত না করিলে দু-তিনদিনে এত জমিয়া যায় যে, তখন কাজ শেষ করিতে প্রাণান্ত হইয়া উঠে। ডাক আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একরাশি কাজ আসিয়া পড়ে। শহরের নানা ধরণের চিঠি, নানা ধরণের আদেশ, অমুক জায়গায় যাও, অমুকের সঙ্গে অমুক মহালের বন্দোবস্ত কর, ইত্যাদি।

বেলা তিনটার সময় জওয়াহিরলালের সাদা পাগড়ী রৌদ্রে চক্‌চক্ করিতেছে দেখা গেল। বাঙালী মুহুরীবাবু হাঁকিলেন—ম্যানেজারবাবু, আসুন, ডাকপেয়াদা আসছে—ঐ যে—

আপিসের বাহিরে আসিলাম। ইতিমধ্যে জওয়াহিরলাল আবার ঢিবি হইতে নামিয়া জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আমি অপেরাগ্লাস আনাইয়া দেখিলাম, দূরে জঙ্গলের মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের ও বনঝাউয়ের মধ্যে সে আসিতেছে বটে। আর আপিসের কাজে মন বসিল না। সে কি আকুল প্রতীক্ষা! যে জিনিস যত দুষ্প্রাপ্য, মানুষের মনের কাছে তাহার মূল্য তত বেশী। এ কথা খুবই সত্য যে, এই মূল্য মানুষের মন-গড়া একটি কৃত্রিম মূল্য, প্রার্থিত জিনিসের সত্যকার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু জগতের অধিকাংশ জিনিসের উপরই একটা কৃত্রিম মূল্য আরোপ করিয়াই তো আমরা তাকে বড় বা ছোট করি।

জওয়াহিরলালকে কাছারির সামনে একটা অপরিসর বালুময় নাবাল জমির ও-পারে দেখা গেল। আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম। মুহুরীবাবু আগাইয়া গেলেন। জওয়াহিরলাল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল এবং পকেট হইতে চিঠির তাড়া বাহির করিয়া মুহুরী বাবুর হাতে দিল।

আমারও খান-দুই পত্র আছে—অতি পরিচিত হাতের লেখা। চিঠি পড়িতে পড়িতে চারিপাশের জঙ্গলের দিকে চাহিয়া নিজেই অবাক্ হইয়া গেলাম। কোথায় আছি, কখনও ভাবি নাই আমি এখানে কোনদিন থাকিব, কলিকাতার আড্ডা ছাড়িয়া এমন জায়গায় দিনের পর দিন কাটাইব। একখানা বিলাতী ম্যাগাজিনের গ্রাহক হইয়াছি, আজ সেখানা আসিয়াছে। মোড়কের উপরে লেখা "উড়ো জাহাজের ডাকে"। জনাকীর্ণ কলিকাতা শহরের বুকে বসিয়া বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুখ কি বুঝা যাইবে? এখানে —এই নির্জন বন-প্রদেশে—সকল বিষয়েই ভাবিবার ও অবাক্ হইবার অবকাশ আছে —এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সে-অনুভূতি আনয়ন করে।

যদি সত্য কথা বলিতে হয়, জীবনে ভাবিয়া দেখিবার শিক্ষা এইখানে আসিয়াই পাইয়াছি। কত কথা মনে জাগে, কত পুরনো কথা মনে হয়—নিজের মনকে এমন করিয়া কখনও উপভোগ করি নাই। এখানে সহস্র প্রকার অসুবিধার মধ্যেও সেই আনন্দ আমাকে

যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিতেছে দিন দিন।

অথচ সত্যই আমি প্রশান্ত মহাসমুদ্রের কোনও জনহীন দ্বীপে একা পরিত্যক্ত হই নাই। বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশ মাইলের মধ্যে রেল স্টেশন। সেখানে ট্রেনে চাড়িয়া এক ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণিয়া যাইতে পারি—তিন ঘণ্টার মধ্যে মুঙ্গের যাইতে পারি। কিন্তু প্রথম তো রেল-স্টেশনে যাইতেই বেজায় কষ্ট—সে-কষ্ট স্বীকার করিতে পারি, যদি পূর্ণিয়া বা মুঙ্গের শহরে গিয়া কিছু লাভ থাকে। এমনি দেখিতেছি কোনও লাভই নাই, না আমাকে সেখানে কেউ চেনে, না আমি কাউকে চিনি। কি হইবে গিয়া?

কলিকাতা হইতে আসিয়া বই আর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প ও আলোচনার অভাব এত বেশী অনুভব করি যে কতবার ভাবিয়াছি এ জীবন আমার পক্ষে অসহ্য। কলি-কাতাতেই আমার সব, পূর্ণিয়া বা মুঙ্গেরে কে আছে যে সেখানে যাইব? কিন্তু সদর-আপিসের বিনা অনুমতিতে কলিকাতায় যাইতে পারি না—তাছাড়া অর্থব্যয়ও এত বেশী যে দু-পাঁচ দিনের জন্য যাওয়া পোষায় না।

৩

কয়েক মাস সুখে-দুঃখে কাটিবার পর চৈত্র মাসের শেষ হইতে এমন একটা কাণ্ডের সূত্রপাত হইল, যাহা আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে কখনও ছিল না। পৌষ মাসে কিছু কিছু বৃষ্টি পড়িয়াছিল, তার পর হইতেই ঘোর অনাবৃষ্টি দেখা দিল। মাঘ মাসে বৃষ্টি নাই, ফাল্গুনে না, চৈত্রে না, বৈশাখে না। সঙ্গে সঙ্গে যেমন অসহ্য গ্রীষ্ম, তেমনি নিদারুণ জলকষ্ট।

সাদা কথায় গ্রীষ্ম বা জলকষ্ট বলিলে এ বিভীষিকাময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্বরূপ কিছুই বোঝানো যাইবে না। উত্তরে আজমাবাদ হইতে দক্ষিণে কিষণপুর—পূর্বে ফুল-কিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হইতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা পর্যন্ত সারা জঙ্গল-মহালের মধ্যে যেখানে যত খাল, ডোবা, কুণ্ডী অর্থাৎ বড় জলাশয় ছিল—সব গেল শুকাইয়া। কুয়া খুঁড়িলে জল পাওয়া যায় না—যদিবা বালির উনুই হইতে কিছু কিছু জল ওঠে, ছোট এক বাল্‌তি জল কুয়ায় জমিতে এক ঘণ্টার উপর সময় লাগে। চারি-ধারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে একমাত্র কুশী নদী ভরসা—সে আমাদের মহালের পূর্বতম প্রান্ত হইতে সাত আট মাইল দূরে বিখ্যাত মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের ওপারে। আমাদের জমিদারী ও মোহনপুরা অরণ্যের মধ্যে একটা ছোট পাহাড়ী নদী নেপালের তরাই অঞ্চল হইতে বহিয়া আসিতেছে—কিন্তু বর্তমানে শুধু শুষ্ক বালুময় খাতে তাহার উপলঢাকা চরণচিহ্ন বিদ্যমান। বালি খুঁড়িলে যে জলটুকু পাওয়া যায়, তাহারই লোভে কত দূরের গ্রাম হইতে মেয়েরা কলসী লইয়া আসে ও সারা দুপুর বালি-কাদা ছানিয়া আধ-কলসীটাক ঘোলা জল লইয়া বাড়ী ফিরে।

কিন্তু পাহাড়ী নদী—স্থানীয় নাম মিছি নদী—আমাদের কোনও কাজে আসে না—কারণ আমাদের মহাল হইতে বহু দূরে। কাছারিতেও কোন বড় ইঁদারা নাই—ছোট যে বালির পাতকুয়াটি আছে, তাহা হইতে পানীয় জলের সংস্থান হওয়াই বিষম সমস্যার কথা দাঁড়াইল। তিন বাল্‌তি জল সংগ্রহ করিতে দুপুর ঘুরিয়া যায়।

দুপুরে বাহিরে দাঁড়াইয়া তাম্রাভ অগ্নিবর্ষী আকাশ ও অর্ধশুষ্ক বনঝাউ ও লম্বা

ঘাসের বন দেখিতে ভয় করে—চারিধারে যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে আগুনের হল্‌কার মত তপ্ত বাতাস সর্বাঙ্গ ঝল্‌সাইয়া বহিতেছে—সূর্যের এ রূপ, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের এ ভয়ানক রুদ্র রূপ কখনও দেখি নাই, কল্পনাও করি নাই। এক-এক দিন পশ্চিম দিক হইতে বালির ঝড় বয়—এ সব দেশে চৈত্র-বৈশাখ মাস পশ্চিমে বাতাসের সময়—কাছারি হইতে এক-শ' গজ দূরের জিনিস ঘন বালি ও ধূলিরাশির আড়ালে ঢাকিয়া যায়।

অর্ধেক দিন রামধনিয়া টহলদার আসিয়া জানায়—কূঁয়ামে পানি নেই ছে, হুজুর। কোন-কোন দিন ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ছানিয়া ছানিয়া বালির ভিতর হইতে আধ বাল্‌তি তরল কর্দম স্নানের জন্য আমার সামনে আনিয়া ধরে। সে ভয়ানক গ্রীষ্মে তাহাই তখন অমূল্য।

একদিন দুপুরের পরে কাছারির পিছনে একটা হরীতকী গাছের তলায় স্বল্প ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছি—হঠাৎ চারিধারে চাহিয়া মনে হইল দুপুরের এমন চেহারা কখনও দেখি তো নাই-ই, এ জায়গা হইতে চলিয়া গেলে আর কোথাও দেখিবও না। আজন্ম বাংলা দেশের দুপুর দেখিয়াছি—জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রভরা দুপুর দেখিয়াছি—কিন্তু এ রুদ্র-মূর্তি তাহার নাই। এ ভীম-ভৈরব রূপ আমাকে মুগ্ধ করিল। সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড—ক্যাল্‌সিয়াম পুড়িতেছে, হাইড্রোজেন পুড়িতেছে, লোহা পুড়িতেছে, নিকেল পুড়িতেছে, কোবাল্ট পুড়িতেছে—জানা অজানা শত শত রকমের গ্যাস ও ধাতু কোটি যোজন ব্যাসযুক্ত দীপ্ত ফার্নেসে একসঙ্গে পুড়িতেছে—তারই ধূ-ধূ আগুনের ঢেউ অসীম শূন্যের ঈথারের স্তর ভেদ করিয়া ফুলকিয়া বইহার ও লোধাইটোলার তৃণভূমিতে বিস্তীর্ণ অরণ্যে আসিয়া লাগিয়া, প্রতি তৃণপত্রের শিরা উপশিরার সব রসটুকু শুকাইয়া ঝামা করিয়া, দিগ্‌দিগন্ত ঝল্‌সাইয়া পুড়াইয়া শুরু করিয়াছে ধ্বংসের এক তাণ্ডব-লীলা। চাহিয়া দেখিলাম দূরে দূরে প্রান্তরের সর্বত্র কম্পমান তাপ-তরঙ্গ ও তাহার ওধারে তাপজনিত একটি অস্পষ্ট কুয়াশা। গ্রীষ্ম-দুপুরে কখনও এখানে আকাশ নীল দেখিলাম না—তাম্রাভ, কটা—শূন্য, একটি চিল-শকুনিও নাই—পাখির দল দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কি অদ্ভুত সৌন্দর্য ফুটিয়াছে এই দুপুরের! খর উত্তাপকে অগ্রাহ্য করিয়া সেই হরীতকীতলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম কতক্ষণ। সাহারা দেখি নাই, সোয়েন হেডিনের বিখ্যাত টাক্‌লামাকান্‌ মরুভূমি দেখি নাই, গোবি দেখি নাই—কিন্তু এখানে মধ্যাহ্নের এই রুদ্রভৈরব রূপের মধ্যে সে-সব স্থানের অস্পষ্ট আভাস ফুটিয়া উঠিল।

কাছারি হইতে তিন মাইল দূরে একটি বনে-ঘেরা ক্ষুদ্র কুণ্ডীতে সামান্য একটু জল ছিল, কুণ্ডীটাতে গত বর্ষার জলে খুব মাছ হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম—খুব গভীর বলিয়া এই অনাবৃষ্টিতেও তাহার জল একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। কিন্তু সে জলে কাহারও কোন কাজ হয় নাই—প্রথমত, তার কাছাকাছি অনেক দূর লইয়া কোন মানুষের বসতি নাই—দ্বিতীয়ত, জল ও তীরভূমির মধ্যে কাদা এত গভীর যে, কোমর পর্যন্ত বসিয়া যায়—কলসীতে জল পুরিয়া পুনরায় তীরে উত্তীর্ণ হইবার আশা বড়ই কম। আর একটি কারণ এই যে, জলটা খুব ভাল নয়—স্নান বা পানের আদৌ উপযুক্ত নয়, জলের সঙ্গে কি জিনিস মিশানো আছে জানি না—কিন্তু কেমন একটা অপ্রীতিকর ধাতব গন্ধ।

একদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমে বাতাস ও উত্তাপ কম পড়িয়া গেলে ঘোড়ায় বাহির হইয়া ঐ কুন্ডীটার পাশের উঁচু বালিয়াড়ি ও বন-ঝাউয়ের জঙ্গলের পথে উপস্থিত হইয়াছি। পিছনে গ্র্যান্ট সাহেবের সেই বড় বটগাছের আড়ালে সূর্য অস্ত যাইতেছিল। কাছারির খানিকটা জল বাঁচাইবার জন্য ভাবিলাম, এখানে ঘোড়াটাকে একবার জল খাওয়াইয়া লই। যত কাদা হোক, ঘোড়া ঠিক উঠিতে পারিবে। জঙ্গল পার হইয়া কুন্ডীর ধারে গিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। কুন্ডীর চারিধারে কাদার উপর আট-দশটা ছোট বড় সাপ, অন্য দিকে তিনটা প্রকাণ্ড মহিষ একসঙ্গে জল খাইতেছে। সাপগুলি প্রত্যেকটা বিষাক্ত, করাত ও শঙ্খচিতি শ্রেণীর, যাহা এদেশে সাধারণত দেখা যায়।

মহিষ দেখিয়া মনে হইল, এ ধরনের মহিষ আমি আর কখনও দেখি নাই। প্রকাণ্ড এক জোড়া শিং, গায়ে লম্বা লম্বা লোম—বিপুল শরীর। কাছেও কোনো লোকালয় বা মহিষের বাথান নাই—তবে এ মহিষ কোথা হইতে আসিল বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, চরির খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে কেহ লুকাইয়া হয়ত জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বা বাথান করিয়া থাকিবে। কাছারির কাছাকাছি আসিয়াছি, মুনেশ্বর সিং চাকলাদারের সহিত দেখা। তাহাকে কথাটা বলিতেই সে চমকিয়া উঠিল—আরে সর্বনাশ! বলেন কি হুজুর! হনুমানজী খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন আজ! ও পোষা ভঁইস্ নয়, ও হ'ল আড়ন, বুনো ভঁইস্ হুজুর, মোহনপুরা জঙ্গল থেকে এসেছে জল খেতে। ও অঞ্চলে কোথাও জল নেই তো? জলকষ্টে পড়ে এসেছে।

কাছারিতে কথাটা তখনই রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই এক বাক্যে বলিল—উঃ, হুজুর খুব বেঁচে গিয়েছেন। বাঘের হাতে পড়লে বরং রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, বুনো মহিষের হাতে পড়লে নিস্তার নেই। আর এই সন্ধ্যাবেলা ওই নির্জন জায়গায় যদি একবার আপনাকে ওরা তাড়া করত, ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁচতে পারতেন না হুজুর।

তারপর হইতে জঙ্গলে-ঘেরা ওই ছোট কুন্ডীটা বন্য জানোয়ারের জলপানের একটা প্রধান আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল। অনাবৃষ্টি যত হইতে লাগিল, রৌদ্রের ক্রমবর্ধমান প্রখরতায় দিক্‌দিগন্তে দাবদাহ যত প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে লাগিল,—খবর আসিতে লাগিল সেই জঙ্গলের মধ্যে কুন্ডীতে লোকে বাঘকে জল খাইতে দেখিয়াছে, বন-মহিষকে জল খাইতে দেখিয়াছে, হরিণের পালকে জল খাইতে দেখিয়াছে, নীল গাই ও বুনো শুয়োর তো আছেই—কারণ শেষের দুই প্রকার জানোয়ার এ জঙ্গলে অত্যন্ত বেশী। আমি নিজে আর একদিন জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘোড়ায় করিয়া কুন্ডীতে যাই শিকারের উদ্দেশ্যে—সঙ্গে তিন-চারজন সিপাহী ছিল—দু-তিনটি বন্দুকও ছিল। সে যা দৃশ্য দেখিয়াছিলাম সে রাত্রে, জীবনে ভুলিবার নয়। তাহা বুঝিতে হইলে কল্পনায় দৃষ্টি আঁকিয়া লইতে হইবে এক জনহীন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি ও বিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের। আরও কল্পনা করিয়া লইতে হইবে সারা বনভূমি ব্যাপিয়া এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতার, অভিজ্ঞতা না থাকিলে যদিও সে নিস্তব্ধতা কল্পনা করা অসম্ভব।

উষ্ণ বাতাস অর্ধশুষ্ক কাশ-ডাঁটার গন্ধে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, লোকালয় হইতে বহুদূরে আসিয়াছি, দিগ্-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি।

কুন্ডীতে প্রায় নিঃশব্দে জল খাইতেছে একদিকে দুটি নীল গাই, অন্য দিকে দুটি হায়েনা, নীল গাই দুটি একবার হায়েনাদের দিকে চাহিতেছে, হায়েনারা একবার নীল গাই দুটির দিকে চাহিতেছে—আর দু-দলের মাঝখানে দু-তিন মাস বয়সের এক ছোট

নীল গাইয়ের বাচ্চা। অমন করুণ দৃশ্য কখনও দেখি নাই—দেখিয়া পিপাসার্ত বন্য জন্তুদের নিরীহ শরীরে অতর্কিতে গুলি মারিবার প্রবৃত্তি হইল না।

এদিকে বৈশাখও কাটিয়া গেল। কোথাও একফোঁটা জল নাই। আরো এক বিপদ দেখা দিল। এই সুবিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের মাঝে মাঝে লোকে দিক হারাইয়া আগেও পথ ভুলিয়া যাইত—এখন এই সব পথহারা পথিকদের জলাভাবে প্রাণ হারাইবার সমূহ আশংকা দাঁড়াইল, কারণ ফুলকিয়া বইহার হইতে গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছ পর্যন্ত বিশাল তৃণভূমির মধ্যে কোথাও একবিন্দু জল নাই। এক-আধটা শুষ্কপ্রায় কুন্ডী যেখানে আছে, অনভিজ্ঞ দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকদের পক্ষে সে সব খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। একদিনের ঘটনা বলি।

## ৪

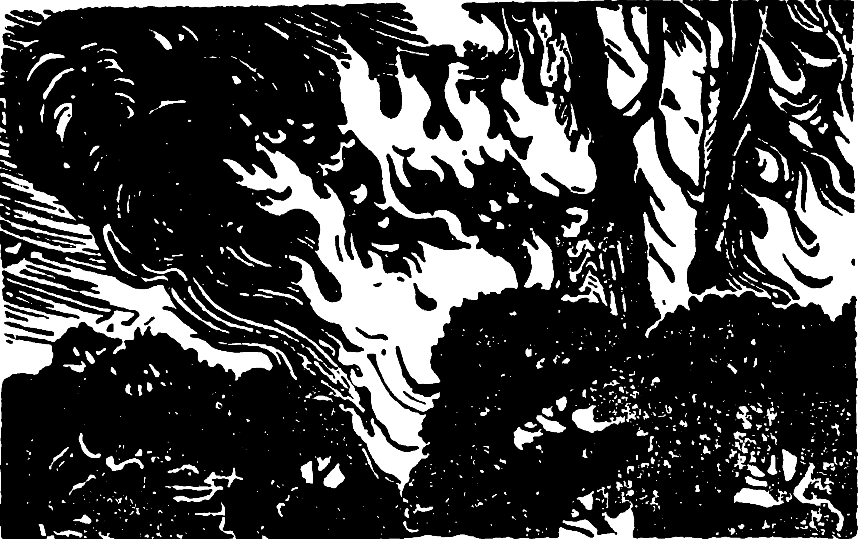
সেদিন বেলা চারটার সময় অত্যন্ত গরমে কাজে মন বসাইতে না পারিয়া একখানা কি বই পড়িতেছি, এমন সময় রামবিরিজ সিং আসিয়া এত্তেলা করিল, কাছারির পশ্চিমদিকে উঁচু ডাঙার উপরে একজন কে অদ্ভুত ধরণের পাগলা লোক দেখা যাইতেছে—সে হাত-পা নাড়িয়া দূর হইতে কি যেন বলিতেছে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম সত্যই দূরের ডাঙাটার উপরে কে একজন দাঁড়াইয়া—মনে হইল মাতালের মত টলিতে টলিতে এদিকেই আসিতেছে। কাছারিসুদ্ধ লোক জড় হইয়া সেদিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া আমি দুজন সিপাহী পাঠাইয়া দিলাম লোকটাকে এখানে আনিতে।

লোকটাকে যখন আনা হইল, দেখিলাম তাহার গায়ে কোন জামা নাই—পরনে মাত্র একখানা ফর্সা ধুতি, চেহারা ভাল, রং গৌরবর্ণ। কিন্তু তাহার মুখের আকৃতি অতি ভীষণ, গালের দুই কশ বাহিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চোখদুটি জবাফুলের মত লাল, চোখে উন্মাদের মত দৃষ্টি। আমার ঘরের দাওয়ায় একটা বালতিতে জল ছিল—তাই দেখিয়া সে পাগলের মত ছুটিয়া বালতির দিকে গেল। মুনেশ্বর সিং চাক্‌লাদার ব্যাপারটা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বালতি সরাইয়া লইল। তাহার পর তাহাকে বসাইয়া হাঁ করাইয়া দেখা গেল জিভ ফুলিয়া বীভৎস ব্যাপার হইয়াছে। অতি কষ্টে জিভটা মুখের এক পাশে সরাইয়া একটু একটু করিয়া তার মুখে জল দিতে দিতে আধ ঘণ্টা পরে লোকটা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। কাছারিতে লেবু ছিল, লেবুর রস ও গরম জল এক গ্লাস তাহাকে খাইতে দিলাম। ক্রমে ঘণ্টাখানেক পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। শুনিলাম তার বাড়ী পাটনা। গালার চাষ করিবার উদ্দেশ্যে সে এ-অঞ্চলে কুলের জঙ্গলের অনুসন্ধান করিতে পূর্ণিয়া হইতে রওনা হইয়াছে আজ দুই দিন পূর্বে। তার পর দুপুরের সময় আমাদের মহালে ঢুকিয়াছে, এবং একটু পরে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এ রকম একঘেয়ে একই ধরণের গাছে-ভরা জঙ্গলে দিক্‌ ভুল করা খুব সোজা, বিশেষত বিদেশী লোকের পক্ষে। কালকার ভীষণ উত্তাপে ও গরম পশ্চিমে বাতাসের দমকার মধ্যে সারা বৈকালে ঘুরিয়াছে—কোথাও একফোঁটা জল পায় নাই, একটা মানুষের সঙ্গে দেখা হয় নাই--রাত্রে অবসন্ন অবস্থায় এক গাছের তলায় শুইয়া ছিল—আজ সকাল হইতে আবার ঘোরা শুরু করিয়াছে—মাথা ঠাণ্ডা রাখিলে সূর্য দেখিয়া দিক্‌ নির্ণয় করা হয়তো তার পক্ষে খুব কঠিন হইত না—অন্তত পূর্ণিয়ায়ও ফিরিয়া যাইতে পারিত—কিন্তু ভয়ে দিশাহারা হইয়া একবার এদিক একবার ওদিক ছুটাছুটি করিয়াছে আজ সারা দুপুর,

তাহার উপর খুব চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবার চেষ্টা করিয়াছে—কোথায় লোক? ফুলকিয়া বইহারের কুলের জঙ্গল যেদিকে, সেদিক হইতে লবটুলিয়া পর্যন্ত দশ-বারো বর্গমাইল-ব্যাপী বনপ্রান্তর সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য, সুতরাং আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তাহার চীৎকার কেহ শোনে নাই। আরও তাহার আতঙ্ক হইবার কারণ, সে ভাবিয়াছিল তাহাকে জঙ্গলের মধ্যে জিনপরীতে পাইয়াছে—মারিয়া না ফেলিয়া ছাড়িবে না। তাহার গায়ে একটা জামা ছিল, কিন্তু আজ অসহ্য পিপাসায় দুপুরের পরে এমন গা-জ্বলুনি শুরু হইয়াছিল যে, জামাটা খুলিয়া কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে। এ অবস্থায় দৈবক্রমে আমাদের কাছারির হনুমানের ধ্বজার লাল নিশানটা দূর হইতে তাহার চোখে না পড়িলে লোকটা আজ বেঘোরে মারা পড়িত।

একদিন এই ঘোর উত্তাপ ও জলকষ্টের দিনে ঠিক দুপুর বেলা সংবাদ পাইলাম, নৈর্ঋত কোণে মাইল-খানেক দূরের জঙ্গলে ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে এবং আগুন কাছারির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সবাই মিলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখিলাম প্রচুর ধূমের সঙ্গে রাঙা অগ্নিশিখা লক্‌লক্ করিয়া বহুদূর আকাশে উঠিতেছে। সেদিন আবার দারুণ পশ্চিমে বাতাস, লম্বা লম্বা ঘাস ও বন-ঝাউয়ের জঙ্গল সূর্যতাপে অর্ধশুষ্ক হইয়া বারুদের মত হইয়া আছে, এক-এক স্ফুলিঙ্গ পড়িবা-মাত্র গোটা ঝাড় জ্বলিয়া উঠিতেছে—সেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলবর্ণ ধূমরাশি ও অগ্নিশিখা—আর চটপট শব্দ। ঝড়ের মুখে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বাঁকা আগুনের শিখা ঠিক যেন ডাক-গাড়ীর বেগে ছুটিয়া আসিতেছে আমাদের কয়খানা খড়ের বাংলোর দিকেই। সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল, এখানে থাকিলে আপাতত তো বেড়া-আগুনে ঝলসাইয়া মরিতে হয়—দাবানল তো আসিয়া পড়িল!

ভাবিবার সময় নাই। কাছারির দরকারী কাগজপত্র, তহবিলের টাকা, সরকারী দলিল ম্যাপ, সর্বস্ব মজুত—এ বাদে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিস যার যার তো আছেই।



এ সব তো যায়! সিপাহীরা শুষ্কমুখে ভীতকণ্ঠে বলিল—আগ তো আ গৈল, হুজুর! বলিলাম—সব জিনিস বার কর। সরকারী তহবিল ও কাগজপত্র আগে।

জনকতক লোক লাগিয়া গেল আগুন ও কাছারির মধ্যে যে জঙ্গল পড়ে তাহারই যতটা পারা যায় কাটিয়া পরিষ্কার করিতে। জঙ্গলের মধ্যে বাথান হইতে আগুন দেখিয়া বাথানওয়ালা চরির প্রজা দু-দশ জন ছুটিয়া আসিল কাছারি রক্ষা করিতে, কারণ পশ্চিমা-বাতাসের বেগ দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে কাছারি ঘোর বিপন্ন।

কি অদ্ভুত দৃশ্য! জঙ্গল ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে নীল-গাইয়ের দল প্রাণভয়ে দৌড়িতেছে, শিয়াল দৌড়িতেছে, কান উঁচু করিয়া খরগোস দৌড়িতেছে, একদল বন্যশূকর তো ছানাপোনা লইয়া কাছারির উঠান দিয়াই দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটিয়া গেল—ও অঞ্চলের বাথান হইতে পোষা মহিষের দল ছাড়া পাইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে, একঝাঁক বনটিয়া মাথার উপর দিয়া সোঁ করিয়া উড়িয়া পলাইল, পিছনে পিছনে একটা বড় ঝাঁক লাল হাঁস। আবার এক ঝাঁক বনটিয়া, গোটা-কতক সিল্লি। রামবিরিজ সিং চাকলাদার অবাক হইয়া বলিল—পানি কাঁহা নেই ছে··· আরে এ লাল হাঁসকা জেরা কাঁহাসে আয়া, ভাই রামলগন? গোষ্ঠ মুহুরী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ বাপু রাখ্‌! এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, লাল হাঁস কোথা থেকে এল তার কৈফিয়তে কি দরকার?

আগুন বিশ মিনিটের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তার পরে দশ-পনের জন লোক মিলিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক আগুনের সঙ্গে সে কি যুদ্ধ! জল কোথাও নাই—আধকাঁচা গাছের ডাল ও বালি এইমাত্র অস্ত্র। সকলের মুখচোখ আগুনের ও রৌদ্রের তাপে দৈত্যের মত বিভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গে ছাই ও কালি, হাতের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, অনেকেরই গায়ে হাতে ফোস্কা—এদিকে কাছারির সব জিনিসপত্র, বাক্স, খাট, দেরাজ, আলমারি তখনও টানাটানি করিয়া বাহির করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে উঠানে ফেলা হইতেছে। কোথাকার জিনিস যে কোথায় গেল, কে তার ঠিকানা রাখে! মুহুরীবাবুকে বলিলাম—ক্যাশ আপনার জিম্মায় রাখুন, আর দলিলের বাক্সটা।

কাছারির উঠান ও পরিষ্কৃত স্থানে বাধা পাইয়া আগুনের স্রোত উত্তর ও দক্ষিণ বাহিয়া নিমেষের মধ্যে পূর্বমুখে ছুটিল—কাছারিটা কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া গেল এযাত্রা। জিনিসপত্র আবার ঘরে তোলা হইল, কিন্তু বহুদূরে পূর্বাকাশ লাল করিয়া লোল-জিহ্বা প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা সারারাত্রি ধরিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সকালের দিকে মোহন-পুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমানায় গিয়া পৌঁছিল।

দু-তিন দিন পরে খবর পাওয়া গেল কারো ও কুশী নদীর তীরবর্তী কর্দমে আট-দশটা বন্য মহিষ, দুটি চিতা বাঘ, কয়েকটি নীলগাই হাবড়ে পড়িয়া পুঁতিয়া রহিয়াছে। ইহারা আগুন দেখিয়া মোহনপুরা জঙ্গল হইতে প্রাণভয়ে নদীর ধার দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হাবড়ে পড়িয়া গিয়াছে—যদিও রিজার্ভ ফরেস্ট হইতে কুশী ও কারো নদী প্রায় আট-ন' মাইল দূরে।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### ১

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কাটিয়া গিয়া আষাঢ় পড়িল। আষাঢ় মাসে প্রথমেই কাছারির পুণ্যাহ উৎসব। এ জায়গায় মানুষের মুখ বড় একটা দেখিতে পাই না বলিয়া আমার একটা শখ ছিল কাছারির পুণ্যাহের দিনে অনেক লোক নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইব। নিকটে কোন গ্রাম না থাকায় আমরা গনোরী তেওয়ারীকে পাঠাইয়া দূরে-দূরের বস্তির লোকদের নিমন্ত্রণ করিলাম। পুণ্যাহের পূর্বদিন হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিয়াছিল, পুণ্যাহের দিন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এদিকে দুপুর হইতে না হইতে দলে দলে লোক নিমন্ত্রণ খাওয়ার লোভে ধারাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া কাছারিতে পৌঁছিতে লাগিল, এমন মুস্কিল যে, তাহাদের বসিবার জায়গা দিতে পারা যায় না। দলের মধ্যে অনেক মেয়ে ছেলেপুলে লইয়া খাইতে আসিয়াছে, কাছারির দপ্তর-খানায় তাহাদের বসিবার ব্যবস্থা করিলাম, পুরুষেরা যে যেখানে পারে আশ্রয় লইল।

এ-দেশের খাওয়ানোর কোন হাঙ্গামা নেই, এত গরীব দেশ যে থাকিতে পারে তাহা আমার জানা ছিল না। বাংলা দেশ যতই গরীব হোক্, এদের দেশের সাধারণ লোকদের তুলনায় বাংলা দেশের গরীব লোকেও অনেক বেশী অবস্থাপন্ন। ইহারা এই মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করিয়া খাইতে আসিয়াছে চীনা ঘাসের দানা, টক দই, ভেলি গুড় ও লাড্ডু। কারণ ইহাই এখানে সাধারণ ভোজের খাদ্য।

দশ-বারো বছরের একটি অচেনা ছোকরা সকাল হইতেই খুব খাটিতেছিল, গরীব লোকের ছেলে, নাম বিশুয়া, দূরের কোন বস্তি হইতে আসিয়া থাকিবে। বেলা দশটার সময় সে কিছু জলখাবার চাহিল। ভাঁড়ারের ভার ছিল লবটুলিয়ার পাটোয়ারীর উপর, সে এক খুচি চীনার দানা ও একটু নুন তাহাকে আনিয়া দিল।

আমি পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। ছেলেটি কালো কুচকুচে, সুশ্রী মুখটা, যেন পাথরের কৃষ্ণঠাকুর। সে যখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া মলিন মোটা মার্কিনী আট-হাতি থান কাপড়ের খুঁট পাতিয়া সেই তুচ্ছ জলখাবার লইল তখন তাহার মুখের সে কি খুশীর হাসি! আমি বলিতে পারি অতি গরীব অবস্থারও কোনও বাঙালী ছেলে চীনার দানা কখনও খাইবেই না, খুশী হওয়া তো দূরের কথা। কারণ একবার শখ করিয়া চীনার দানা খাইয়া যে স্বাদ পাইয়াছি, তাহাতে মুখরোচক সুখাদ্যের হিসাবে তাহাকে উল্লেখ কখনই করিতে পারিব না।

বৃষ্টির মধ্যে কোনও রকমে তো ব্রাহ্মণভোজন একরকম চুকিয়া গেল। বৈকালের দিকে দেখি ঘোর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে অনেকক্ষণ হইতে তিনটি স্ত্রীলোক উঠোনে পাতা পাতিয়া বসিয়া ভিজিয়া ঝুপসি হইতেছে—সঙ্গে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েও। তাহাদের পাতে চীনার দানা আছে, কিন্তু দই বা ভেলি গুড় কেহ দিয়া যায় নাই, তাহারা হাঁ করিয়া কাছারি ঘরের দিকে চাহিয়া আছে। পাটোয়ারীকে ডাকিয়া বলিলাম—এদের কে দিচ্ছে? এরা বসে আছে কেন? আর এদের এই বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে বসিয়েছেই বা কে?

পাটোয়ারী বলিল—হুজুর, ওরা জাতে দোষাদ। ওদের ঘরের দাওয়ায় তুললে ঘরের

সব জিনিসপত্র ফেলা যাবে, কোনও ব্রাহ্মণ, ছত্রী কি গাঙ্গোতা সে জিনিস খাবে না। আর জায়গাই বা কোথায় আছে বলুন?

ওই গরীব দোষাদদের মেয়ে কয়টির সামনে আমি গিয়া নিজে বৃষ্টিতে ভিজিয়া দাঁড়াইতে লোকজনেরা ব্যস্ত হইয়া তাহাদের পরিবেশন করিতে লাগিল। সামান্য চীনার দানা, গুড় ও জলো টক দই এক একজন যে পরিমাণে খাইল, চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করিবার কথা নহে। এই ভোজ খাইবার জন্য এত আগ্রহ দেখিয়া ঠিক করিলাম, দোষাদদের এই মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন খুব ভাল করিয়া সত্যকার সভ্য খাদ্য খাওয়াইব। সপ্তাহখানেক পরেই পাটোয়ারীকে দিয়া দোষাদপাড়ার মেয়ে কয়টি ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করিলাম, সেদিন তাহারা যাহা খাইল—লুচি, মাছ, মাংস, ক্ষীর, দই, পায়েস, চাট্‌নি—জীবনে কোনও দিন সেরকম ভোজ খাওয়ার কল্পনাও করে নাই। তাদের বিস্মিত ও আনন্দিত চোখ-মুখের সে হাসি কতদিন আমার মনে ছিল! সেই ভব-ঘুরে গাঙ্গোতা ছোকরা বিশুয়াও সে দলে ছিল।

২

সার্ভে-ক্যাম্প থেকে একদিন ঘোড়া করিয়া ফিরিতেছি, বনের মধ্যে একটা লোক কাশ-ঘাসের ঝোপের পাশে বসিয়া কলাইয়ের ছাতু মাখিয়া খাইতেছে। পাত্রের অভাবে ময়লা থান কাপড়ের প্রান্তেই ছাতুটা মাখিতেছে—এত বড় একটা তাল যে, একজন লোকে-হলই বা হিন্দুস্থানী, মানুষ তো বটে—কি করিয়া অত ছাতু খাইতে পারে এ আমার বুদ্ধির অগোচর। আমায় দেখিয়া লোকটা সসম্ভ্রমে খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম ঠুকিয়া বলিল—ম্যানেজার সাহেব! থোড়া জলখাই করতে হেঁ হুজুর, মাফ কিজিয়ে।

একজন ব্যক্তি নির্জনে বসিয়া, শান্ত ভাবে জলখাবার খাইতেছে, ইহার মধ্যে মাপ করিবার কি আছে খুঁজিয়া পাইলাম না। বলিলাম—খাও, খাও, তোমায় উঠতে হবে না। নাম কি তোমার?

লোকটা তখনও বসে নাই, দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সসম্ভ্রমে বলিল—গরীব কা নাম ধাওতাল সাহু, হুজুর।

চাহিয়া দেখিয়া মনে হইল লোকটার বয়স যাটের উপর হইবে। রোগা লম্বা চেহারা, গায়ের রং কালো, পরনে অতি মলিন থান ও মেরজাই, পা খালি।

ধাওতাল সাহুর সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ।

কাছারিতে আসিয়া রামজোত পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ধাওতাল সাহুকে চেন?

রামজোত বলিল—জী হুজুর। ধাওতাল সাহুকে এ অঞ্চলে কে না জানে? সে মস্ত বড় মহাজন, লক্ষপতি লোক, এদিকে সবাই তার খাতক। নওগাছিয়ায় তার ঘর। পাটোয়ারীর কথা শুনিয়া খুব আশ্চর্য হইয়া গেলাম। লক্ষপতি লোক বনের মধ্যে বসিয়া ময়লা উড়ানির প্রান্তে এক তাল নিরুপকরণ কলাইয়ের ছাতু খাইতেছে—এ দৃশ্য কোন বাঙালী লক্ষপতির সম্বন্ধে অন্তত কল্পনা করা অতীব কঠিন। ভাবিলাম পাটোয়ারী বাড়াইয়া বলিতেছে, কিন্তু কাছারিতে যাহাকে জিজ্ঞাসা করি, সে-ই ঐ কথা বলে, ধাওতাল সাহু? তার টাকার লেখা-জোখা নেই।

ইহার পরে নিজের কাজে ধাওতাল সাহু অনেকবার কাছারিতে আমার সহিত দেখা

করিয়াছে, প্রতিবার একটু একটু করিয়া তাহার সহিত আলাপ জমিয়া উঠিলে বুঝিলাম. একটি অতি অদ্ভুত লোকোত্তর চরিত্রের মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে এ ধরণের লোক যে আছে, না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না।

ধাওতালের বয়স যাহা আন্দাজ করিয়াছিলাম, প্রায় তেষট্টি-চৌষট্টি। কাছারির পূর্ব-দক্ষিণ দিকের জঙ্গলের প্রান্ত হইতে বারো-তেরো মাইল দূরে নওগছিয়া নামে গ্রামে তাহার বাড়ী। এ অঞ্চলে প্রজা, জোতদার, জমিদার, ব্যবসাদার প্রায় সকলেই ধাওতাল সাহুর খাতক। কিন্তু তাহার মজা এই যে, টাকা ধার দিয়া সে জোর করিয়া কখনও তাগাদা করিতে পারে না। কত লোকে যে কত টাকা তাহার ফাঁকি দিয়াছে! তাহার মত নিরীহ, ভালমানুষ লোকের মহাজন হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু লোকের উপরোধ সে এড়াইতে পারে না। বিশেষত সে বলে, যখন সকলেই মোটা সুদ লিখিয়া দিয়াছে, তখন ব্যবসা হিসাবেও তো টাকা দেওয়া উচিত। একদিন ধাওতাল আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, উড়ানিতে বাঁধা এক বাণ্ডিল পুরনো দলিলপত্র। বলিল—হুজুর, মেহেরবানি করে একটু দেখবেন দলিলগুলো?

পরীক্ষা করিয়া দেখি প্রায় আট-দশ হাজার টাকার দলিল ঠিক সময়ে নালিশ না-করার দরুণ তামাদি হইয়া গিয়াছে।

উড়ানির আর এক মুড়ো খুলিয়া সে আরও কতকগুলি জরাজীর্ণ কাগজ বাহির করিয়া বলিল—এগুলো দেখুন দেখি হুজুর! ভাবি একবার জেলায় গিয়ে উকীলদের দেখাই, তা মামলা কখনো করিনি, করা পোষায় না। তাগাদা করি, দিচ্চি দেব করে টাকা দেয় না অনেকে।

দেখিলাম, সবগুলিই তামাদি দলিল। সবসুদ্ধ জড়াইয়া সেও চার-পাঁচ হাজার টাকা। ভালোমানুষকে সবাই ঠকায়। বলিলাম—সাহুজী, মহাজনী করা তোমার কাজ নয়। এ-অঞ্চলে মহাজনী করতে পারবে রাসবিহারী সিং রাজপুতের মত দুঁদে লোকেরা, যাদের সাত-আটটা লাঠিয়াল আছে, খাতকের ক্ষেতে নিজে ঘোড়া করে গিয়ে লাঠিয়াল মোতায়েন করে আসে, ফসল ক্রোক করে টাকা আর সুদ আদায় করে। তোমার মত ভালমানুষ লোকের টাকা শোধ করবে না কেউ। দিও না কাউকে আর।

ধাওতালকে বুঝাইতে পারিলাম না, সে বলিল—সবাই ফাঁকি দেয় না হুজুর। এখনও চন্দ্র-সূর্য উঠছে, মাথার উপর দীন-দুনিয়ার মালিক এখনও আছেন। টাকা কি বসিয়ে রাখলে চলে, সুদে না বাড়ালে চলে না হুজুর। এই আমাদের ব্যবসা।

তাহার এ-যুক্তি আমি বুঝিতে পারিলাম না, সুদের লোভে আসল টাকা নষ্ট হইতে দেওয়া কেমনতর ব্যবসা জানি না। ধাওতাল সাহু আমার সামনেই অম্লান বদনে পনর-ষোল হাজার টাকার তামাদি দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিল—এমন ভাবে ছিঁড়িল যেন সেগুলো বাজে কাগজ—অবশ্য বাজে কাগজের পর্যায়েই তাহারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বটে। তাহার হাত কাঁপিল না, গলার সুর কাঁপিল না।

বলিল—রাইচি আর রেড়ির বীজ বিক্রী করে টাকা করেছিলাম হুজুর, নয়তো আমার পৈতৃক আমলের একটা ঘষা পয়সাও ছিল না। আমি করেছি, আবার আমিই লোকসান দিচ্ছি। ব্যবসা করতে গেলে লাভ-লোকসান আছেই হুজুর।

তা আছে স্বীকার করি, কিন্তু কয়জন লোক এত বড় ক্ষতি এমন শান্তমুখে উদাসীনভাবে সহ্য করিতে পারে, সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। তাহার বড়মানুষী গর্ব

লাম মাত্র একটি ব্যাপারে; একটা লাল কাপড়ের বটুয়া হইতে সে মাঝে মাঝে ছোট্ট না জাঁতি ও সুপারি বাহির করিয়া কাটিয়া মুখে ফেলিয়া দেয়। আমার দিকে য়া হাসিমুখে একবার বলিয়াছিল—রোজ এক কনোয়া করে সুপুরি খাই বাবুজী। ুরির বড় খরচ আমার। বিত্তে নিস্পৃহতা ও বৃহৎ ক্ষতিকে তাচ্ছিল্য করিবার ক্ষমতা দার্শনিকতা হয়, তবে ধাওতাল সাহুর মত দার্শনিক আমি তো অন্তত দেখি নাই।

৩

কিয়ার ভিতর দিয়া যাইবার সময় আমি প্রতিবারই জয়পাল কুমারের মকাইয়ের া ছাওয়া ছোট্ট ঘরখানার সামনে দিয়া যাইতাম। কুমার অর্থে কুম্ভকার নয়, ভুঁইহার ন।

খুব বড় একটা প্রাচীন পাকুড় গাছের নীচেই জয়পালের ঘর। সংসারে সে সম্পূর্ণ , বয়সেও প্রাচীন, লম্বা রোগা চেহারা, মাথায় লম্বা সাদা চুল। যখনই যাইতাম, ই দেখিতাম কুঁড়েঘরের দোরের গোড়ায় সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। জয়পাল াক খাইত না, কখনও তাকে কোন কাজ করিতে দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না, গাহিতে শুনি নাই—সম্পূর্ণ কর্মশূন্য অবস্থার মানুষ কি ভাবে যে এমন ঠায় চুপ য়া বসিয়া থাকিতে পারে, জানি না। জয়পালকে দেখিয়া বড় বিস্ময় ও কৌতূহল া করিতাম। প্রতিবারই উহার ঘরের সামনে ঘোড়া থামাইয়া উহার সহিত দুটা কথা বলিয়া যাইতে পারিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—জয়পাল, কি কর বসে?

—এই, বসে আছি হুজুর।

—বয়েস কত হল?

—তা হিসেব রাখিনি, তবে যেবার কুশীনদীর পুল হয়, তখন আমি মহিষ চরাতে র।

—বিয়ে করেছিলে? ছেলেপুলে ছিল?

—পরিবার মরে গিয়েছে আজ বিশ-পঁচিশ বছর। দুটো মেয়ে ছিল, তারাও মারা ন। সেও তের-চোদ্দ বছর আগে। এখন একাই আছি।

—আচ্ছা, এই যে একা এখানে থাক, কারো সঙ্গে কথা বলো না, কোথাও যাও না, ছু করও না—এ ভাল লাগে? একঘেয়ে লাগে না?

জয়পাল অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিত—কেন খারাপ লাগবে হুজুর? ণ থাকি। কিছু খারাপ লাগে না।

জয়পালের এই কথাটা আমি কিছুতে বুঝিতে পারিতাম না। আমি কলিকাতার লজে পড়িয়া মানুষ হইয়াছি, হয় কোন কাজ, নয়তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা, বই, নয় সিনেমা, নয় বেড়ানো—এ ছাড়া মানুষ কি করিয়া থাকে বুঝি না। ভাবিয়া খিতাম, দুনিয়ার কত কি পরিবর্তন হইয়া গেল, গত বিশ বৎসর জয়পাল কুমার ওর রর দোরটাতে ঠায় চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া তার কতটুকু খবর রাখে? আমি যখন লেবেলায় স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়িতাম, তখনও জয়পাল এমনি বসিয়া থাকিত, বি.এ. ন পাস করিলাম তখনও জয়পাল এমনি করিয়া বসিয়া থাকে। আমার জীবনেরই

নানা ছোট বড় ঘটনা যা আমার কাছে পরম বিস্ময়কর বস্তু, তারই সঙ্গে মিলাইয়া জয়পালের এই বৈচিত্র্যহীন নির্জন জীবনের অতীত দিনগুলির কথা ভাবিতাম।

জয়পালের ঘরখানা গ্রামের একেবারে মাঝখানে হইলেও, কাছে অনেকটা পতিত জমি ও মকাই-খেত, কাজেই আশে-পাশে কোন বসতি নাই। ফুলকিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রাম, দশ-পনের ঘর লোকের বাস, সকলেই চতুর্দিকব্যাপী জঙ্গল-মহলে মহিষ চরাইয়া দিন গুজরান করে। সারাদিন ভূতের মত খাটে আর সন্ধ্যার সময় কলাইয়ের ভূষির আগুন জ্বালাইয়া তার চারিপাশে পাড়াসুদ্ধ বসিয়া গল্পগুজব করে. খৈনি খায় কিংবা শাল-পাতার পিকার ধূমপান করে। হুঁকায় তামাক খাওয়ার চলন এদেশে খুবই কম। কিন্তু কখনও কোন লোককে জয়পালের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখি নাই।

প্রাচীন পাকুড় গাছটার মগডালে বকেরা দল বাঁধিয়া বাস করে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, গাছের মাথায় থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটিয়াছে। স্থানটা ঘন ছায়াভরা, নির্জন, আর সেখানটাতে দাঁড়াইয়া যে দিকেই চোখ পড়ে, সেদিকেই নীল নীল পাহাড় দূরদিগন্তে হাত ধরাধরি করিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের মত মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া। আমি পাকুড় গাছের ঘন ছায়ায় দাঁড়াইয়া যখন জয়পালের সঙ্গে কথা বলিতাম, তখন আমার মনে এই সুবৃহৎ বৃক্ষতলের নিবিড় শান্তি ও গৃহস্বামীর অনুদ্বিগ্ন, নিস্পৃহ, ধীর জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে কেমন একটা প্রভাব বিস্তার করিত। ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া লাভ কি? কি সুন্দর ছায়া এই শ্যাম বংশী-বটের, কেমন মন্থর যমুনাজল, অতীতের শত শতাব্দী পায়ে পায়ে পার হইয়া সময়ের উজানে চলিয়া যাওয়া কি আরামের!

কিছু জয়পালের জীবনযাত্রার প্রভাব ও কিছু চারিধারের বাধা-বন্ধনশূন্য প্রকৃতি আমাকেও ক্রমে ক্রমে যেন ঐ জয়পাল কুমারের মত নির্বিকার, উদাসীন ও নিস্পৃহ করিয়া তুলিতেছে। শুধু তাই নয়, আমার যে চোখ কখনও এর আগে ফুটে নাই সে চোখ যেন ফুটিয়াছে, যে-সব কথা কখনও ভাবি নাই তাহাই ভাবাইতেছে। ফলে এই মুক্ত প্রান্তর ও ঘনশ্যামা অরণ্য-প্রকৃতিকে এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি যে, একদিন পূর্ণিয়া কি মুঙ্গের শহরে কার্য উপলক্ষে গেলে মন উড়ু উড়ু করে, মন টিকিতে চায় না। মনে হয়, কতক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে ফিরিয়া যাইব, কতক্ষণে আবার সেই ঘন নির্জনতার মধ্যে, অপূর্ব জ্যোৎস্নার মধ্যে, সূর্যাস্তের মধ্যে, দিগন্তব্যাপী কালবৈশাখীর মেঘের মধ্যে, তারাভরা নিদাঘ-নিশীথের মধ্যে ডুব দিব!

ফিরিবার সময় সভ্য লোকালয়কে বহুদূর পিছনে ফেলিয়া, মুকুন্দি চাক্‌লাদারের হাতের বাবলাকাঠের খুঁটির পাশ কাটাইয়া যখন নিজের জঙ্গলের সীমানায় ঢুকি, তখন সুদূরবিসর্পী নিবিড়শ্যাম বনানী, প্রান্তর, শিলাস্তূপ, বনটিয়ার ঝাঁক, নীল গাইয়ের জেরা, সূর্যালোক, ধরণীর মুক্ত প্রসার আমায় একেবারে একমুহূর্তে অভিভূত করিয়া দেয়।

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

## ১

খুব জ্যোৎস্না, তেমনি হাড়কাঁপানো শীত। পৌষ মাসের শেষ। সদর কাছারি হইতে লবটুলিয়ার ডিহি কাছারিতে তদারক করিতে গিয়াছি। লবটুলিয়ার কাছারিতে রাত্রে রান্না শেষ হইয়া সকলের আহারাদি হইতে রাত এগারটা বাজিয়া যাইত। একদিন খাওয়া শেষ করিয়া রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখি, তত রাত্রে আর সেই কন্‌কনে হিম-বর্ষী আকাশের তলায় কে একটি মেয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় কাছারির কম্পাউণ্ডের সীমানায় দাঁড়াইয়া আছে। পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

পাটোয়ারী বলিল—ও কুন্তা। আপনার আসবার কথা শুনে আমায় কাল বলছিল—ম্যানেজারবাবু আসবেন, তাঁর পাতের ভাত আমি গিয়ে নিয়ে আসবো। আমার ছেলে-পুলের বড় কষ্ট। তাই বলেছিলাম—যাস্।

কথা বলিতেছি, এমন সময় কাছারির টহলদার বলোয়া আমার পাতের ডালমাখা ভাত, ভাঙা মাছের টুকরো, পাতের গোড়ায় ফেলা তরকারি ও ভাত, দুধের বাটির ভুক্তাবশিষ্ট দুধ-ভাত—সব লইয়া গিয়া মেয়েটির আনীত একটা পেতলের কানাউঁচু থালায় ঢালিয়া দিল। মেয়েটি চলিয়া গেল।

আট-দশ দিন সেবার লবটুলিয়া কাছারিতে ছিলাম, প্রতি রাত্রে দেখিতাম ইঁদারার পাড়ে সেই মেয়েটি আমার পাতের ভাতের জন্য সেই গভীর রাত্রে আর সেই ভয়ানক শীতের মধ্যে বাহিরে শুধু আঁচল গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে একদিন কৌতূহলবশে পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুন্তা—যে রোজ ভাত নিয়ে যায়, ও কে, আর জঙ্গলে থাকেই বা কোথায়? দিনে তো কখনও দেখিনে ওকে?

পাটোয়ারী বলিল—বলছি হুজুর।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা হইতে কাঠের গুঁড়ি জ্বালাইয়া গন্‌গনে আগুন করা হইয়াছে—তারই ধারে চেয়ার পাতিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া কিস্তির আদায়ী হিসাব মিলাইতে-ছিলাম। আহারাদি শেষ করিয়া আসিয়া মনে হইল একদিনের পক্ষে কাজ যথেষ্টই করিয়াছি। কাগজপত্র গুটাইয়া পাটোয়ারীর গল্প শুনিতে প্রস্তুত হইলাম।

—শুনুন হুজুর। বছর দশেক আগে এ অঞ্চলে দেবী সিং রাজপুতের বড় রবরবা ছিল। তার ভয়ে যত গাঙ্গোতা আর চাষী ও চরির প্রজা জুজু হয়ে থাকত। দেবী সিং-এর ব্যবসা ছিল খুব চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া এই সব লোককে—আর তার পর লাঠিবাজি করে সুদ ও আসল টাকা আদায় করা। তার তাঁবে আট-ন' জন লাঠিয়াল পাইকই ছিল। এখন যেমন রাসবিহারী সিং রাজপুত এ অঞ্চলের মহাজন, তখন ছিল দেবী সিং।

দেবী সিং জৌনপুর জেলা থেকে এসে পূর্ণিয়ায় বাস করে। তার পর টাকা ধার দিয়ে জোর-জবরদস্তি করে এ দেশের যত ভীতু গাঙ্গোতা প্রজাদের হাতের মুঠোয় পুরে ফেললে। এখানে আসবার বছর কয়েক পরে সে কাশী যায় এবং সেখানে এক বাইজীর

বাড়ী গান শুনতে গিয়ে তার চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়ের সঙ্গে দেবী সিং-এর খুব ভাব হয়। তার পর তাকে নিয়ে দেবী সিং পালিয়ে এখানে আসে। দেবী সিং-এর বয়স সাতাশ-আটাশ হবে। এখানে এসে দেবী সিং তাকে বিয়ে করে। কিন্তু বাইজীর মেয়ে বলে সবাই যখন জেনে ফেললে, তখন দেবী সিং-এর নিজের জাতভাই রাজপুতেরা ওর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে ওকে একঘরে করলে। পয়সার জোরে দেবী সিং সে সব গ্রাহ্য করত না। তার পর বাবুগিরি আর অযথা ব্যয় করে এবং এই রাসবিহারী সিং-এর সঙ্গে মকদ্দমা করতে গিয়ে দেবী সিং সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। আজ বছর চারেক হল সে মারা গিয়েছে।

ঐ কুন্তাই দেবী সিং রাজপুতের সেই বিধবা স্ত্রী। এক সময়ে ও লবটুলিয়া থেকে কিংখাবের ঝালর-দেওয়া পালকি চেপে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরী খেয়ে জল খেত—আজ ওর ওই দুর্দশা! আরও মুশকিল এই যে, বাইজীর মেয়ে সবাই জানে বলে ওর এখানে জাত নেই, তা কি ওর স্বামীর আত্মীয়-বন্ধু রাজপুতদের মধ্যে, কি দেশওয়ালী গাঙ্গোতাদের মধ্যে। ক্ষেত থেকে গম কাটা হয়ে গেলে যে গমের গুঁড়ো শীষ পড়ে থাকে, তাই টুকরি করে ক্ষেতে ক্ষেতে বেড়িয়ে কুড়িয়ে এনে বছরে দু-এক মাস ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আধপেটা খাইয়ে রাখে। কিন্তু কখনও হাত পেতে ভিক্ষে করতে ওকে দেখি নি হুজুর। আপনি এসেছেন জমিদারের ম্যানেজার, রাজার সমান, আপনার এখানে প্রসাদ পেলে ওর তাতে অপমান নেই।

বলিলাম—ওর মা, সেই বাইজী, ওর খোঁজ করে নি তারপর কখনও?

পাটোয়ারী বলিল—দেখি নি তো কখনও হুজুর। কুন্তাও কখনও মায়ের খোঁজ করে নি। ও-ই দুঃখ-ধান্দা করে ছেলেপুলেকে খাওয়াচ্ছে। এখন ওকে কি দেখছেন, ওর এক সময় যা রূপ ছিল, এ অঞ্চলে সে রকম কখনও কেউ দেখে নি। এখন বয়েসও হয়েছে, আর বিধবা হওয়ার পরে দুঃখে-কষ্টে সে চেহারার কিছু নেই। বড় ভাল আর শান্ত মেয়ে কুন্তা। কিন্তু এদেশে ওকে কেউ দেখতে পারে না, সবাই নাক সিঁটকে থাকে,



নীচু চোখে দেখে, বোধ হয় বাইজীর মেয়ে বলে।

বলিলাম—তা বুঝলাম, কিন্তু এই রাত বারোটার সময় এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ও একা লবটুলিয়া বস্তিতে যাবে—সে তো এখান থেকে প্রায় তিন পোয়া পথ?

—ওর কি ভয় করলে চলে হুজুর? এই জঙ্গলে হরবখ্‌ত্‌ ওকে একলা ফিরতে হয়। নইলে কে আছে ওর, যে চালাবে?

তখন ছিল পৌষ মাস, পৌষ-কিস্তির তাগাদা শেষ করিয়াই চলিয়া আসিলাম। মাঘ মাসের মাঝামাঝি আর একবার একটা ক্ষুদ্র চরি মহাল ইজারা দিবার উদ্দেশ্যে লবটুলিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল।

তখনও শীত কিছুমাত্র কমে নাই, তার উপরে সারাদিন পশ্চিমা বাতাস বহিবার ফলে প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে শীত দ্বিগুণ বাড়িতে লাগিল। একদিন মহালের উত্তর সীমানায় বেড়াইতে বেড়াইতে কাছারি হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছি—সেদিকটাতে বহুদূর পর্যন্ত শুধু কুলগাছের জঙ্গল। এই সব জঙ্গল জমা লইয়া ছাপরা ও মজঃফরপুর জেলার কালোয়ার-জাতীয় লোকে লাক্ষার চাষ করিয়া বিস্তর পয়সা উপার্জন করে। কুলের জঙ্গলের মধ্যে প্রায় পথ ভুলিবার উপক্রম করিয়াছি, এমন সময় হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠে আর্তক্রন্দনের শব্দ, বালক-বালিকার গলার চীৎকার ও কান্না এবং কর্কশ পুরুষ-কণ্ঠে গালিগালাজ শুনিতে পাইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, একটি মেয়েকে লাক্ষার ইজারাদারের চাকরেরা চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিতেছে। মেয়েটির পরনে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, সঙ্গে দু'তিনটি ছোট ছোট রোরুদ্যমান বালক-বালিকা, দুজন ছত্রি চাকরের মধ্যে একজনের হাতে একটা ছোট ঝুড়িতে আধঝুড়ি পাকা কুল। আমাকে দেখিয়া ছত্রি দুজন উৎসাহ পাইয়া যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, তাহাদের ইজারা করা জঙ্গলে এই গাঙ্গোতীন চুরি করিয়া কুল পাড়িতেছিল বলিয়া তাহাকে কাছারিতে পাটোয়ারীর বিচারার্থ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, হুজুর আসিয়া পড়িয়াছেন, ভালই হইয়াছে।

প্রথমেই ধমক দিয়া মেয়েটিকে তাহাদের হাত হইতে ছাড়াইলাম। মেয়েটি তখন ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হইয়া একটি কুলঝোপের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার দুর্দশা দেখিয়া এত কষ্ট হইল!

ইজারাদারের লোকেরা কি সহজে ছাড়িতে চায়! তাহাদের বুঝাইলাম—বাপু, গরীব মেয়েমানুষ যদি ওর ছেলেপুলেকে খাওয়াইবার জন্য আধঝুড়ি টক কুল পাড়িয়াই থাকে, তাহাতে তোমাদের লাক্ষাচাষের বিশেষ কি ক্ষতিটা হইয়াছে! উহাকে বাড়ী যাইতে দাও।

একজন বলিল—জানেন না হুজুর, ওর নাম কুন্তা, এই লবটুলিয়াতে ওর বাড়ী, ওর অভ্যেস চুরি করে কুল পাড়া। আরও একবার আর-বছর হাতে হাতে ধরেছিলাম-- ওকে এবার শিক্ষা না দিয়ে দিলে—

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম। কুন্তা! তাহাকে তো চিনি নাই? তাহার একটা কারণ, দিনের আলোতে কুন্তাকে তো দেখি নাই, যাহা দেখিয়াছি রাত্রে। ইজারাদারের লোকজনকে তৎক্ষণাৎ শাসাইয়া কুন্তাকে মুক্ত করিলাম। সে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া ছেলেপুলেদের লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময় কুলের ধামাটি ও আঁকশিগাছটা সেখানেই ফেলিয়া গেল। বোধ হয় ভয়ে ও সঙ্কোচে। আমি উপস্থিত লোকগুলির মধ্যে একজনকে সেগুলি কাছারিতে লইয়া যাইতে বলাতে তাহারা খুব খুশী হইয়া ভাবিল ধামা ও আঁকশি সরকারে নিশ্চয়ই বাজেয়াপ্ত হইবে। কাছারিতে আসিয়া পাটোয়ারীকে বলিলাম—তোমাদের দেশের

লোক এত নিষ্ঠুর কেন বনোয়ারীলাল? বনোয়ারী পাটোয়ারী খুব দুঃখিত হইল। বনোয়ারী লোকটা ভাল, এদেশের তুলনায় সত্যিই তার হৃদয়ে দয়ামায়া আছে। কুন্তার ধামা ও আঁকুশি সে তখনই পাইক দিয়া লবটুলিয়াতে কুন্তার বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

সেই রাত্রি হইতে কুন্তা বোধ হয় লজ্জায় আর কাছারিতেও ভাত লইতে আসে নাই।

২

শীত শেষ হইয়া বসন্ত পড়িয়াছে।

আমাদের এ জঙ্গল-মহালের পূর্ব-দক্ষিণ সীমানা হইতে সাত-আট ক্রোশ দূরে অর্থাৎ সদর কাছারি হইতে প্রায় চোদ্দ-পনের ক্রোশ দূরে ফাল্গুন মাসে হোলির সময় একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম্য মেলা বসে, এবার সেখানে যাইব বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম। বহু লোকের সমাগম অনেকদিন দেখি নাই, এদেশের মেলা কি রকম জানিবার একটা কৌতূহলও ছিল। কিন্তু কাছারির লোকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিল, পথ দুর্গম ও পাহাড়-জঙ্গলে ভর্তি, উপরন্তু গোটা পথটার প্রায় সর্বত্রই বাঘের ও বন্যমহিষের ভয়, মাঝে মাঝে বস্তি আছে বটে, কিন্তু সে বড় দূরে দূরে, বিপদে পড়িলে তাহারা বিশেষ কোন উপকারে আসিবে না, ইত্যাদি।

জীবনে কখনও এতটুকু সাহসের কাজ করিবার অবকাশ পাই নাই, এই সময়ে এই সব জায়গায় যতদিন আছি যাহা করিয়া লইতে পারি, বাংলা দেশে ও কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে কোথায় পাইব জঙ্গল, কোথায় পাইব বাঘ ও বন্য মহিষ? ভবিষ্যতের দিনে আমাব মুখে গল্পশ্রবণনিরত পৌত্র-পৌত্রীদের মুখ ও উৎসুক তরুণ দৃষ্টি কল্পনা করিয়া মুনেশ্বর মাহাতো, পাটোয়ারী ও নবীনবাবু মুহুরীর সকল আপত্তি উড়াইয়া দিয়া মেলার দিন খুব সকালে ঘোড়া করিয়া রওনা হইলাম। আমাদের মহালের সীমানা ছাড়াইতেই ঘণ্টা-দুই লাগিয়া গেল, কারণ পূর্ব-দক্ষিণ সীমানাতেই আমাদের মহালের জঙ্গল বেশী, পথ নাই বলিলেও চলে, ঘোড়া ভিন্ন অন্য কোন যান-বাহন সে পথে চলা অসম্ভব, যেখানে সেখানে ছোট-বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো, শাল-জঙ্গল, দীর্ঘ কাশ ও বন-ঝাউ-এর বন, সমস্ত পথটা উঁচু-নীচু, মাঝে মাঝে উঁচু বালিয়াড়ি, রাঙা মাটির ডাঙা, ছোট পাহাড়, পাহাড়ের উপর ঘন কাঁটা-গাছের জঙ্গল। আমি যদৃচ্ছাক্রমে কখনও দ্রুত, কখনও ধীরে অশ্বচালনা করিতেছি, ঘোড়াকে কদম চালে ঠিক চালানো সম্ভব হইতেছে না—খারাপ রাস্তা ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের দরুণ কিছুদূর অন্তর অন্তর ঘোড়ার চাল ভাঙিয়া যাইতেছে, কখনও গ্যালপ, কখনও দুলকি, কখনও বা পায়চারি করিবার মত মৃদু গতিতে শুধু হাঁটিয়া যাইতেছে।

আমি কিন্তু কাছারি ছাড়িয়া পর্যন্তই আনন্দে মগ্ন হইয়া আছি, এখানে চাকুরি লইয়া আসার দিনটি হইতে এদেশের এই ধু-ধু মুক্ত প্রান্তর ও বনভূমি আমাকে ক্রমশ দেশ ভুলাইয়া দিতেছে, সভ্য জগতের শত প্রকারের আরামের উপকরণ ও অভ্যাসকে ভুলাইয়া দিতেছে, বন্ধু-বান্ধব পর্যন্ত ভুলাইবার যোগাড় করিয়া তুলিয়াছে। যাক্ না ঘোড়া আস্তে বা জোরে, শৈলসানুতে যতক্ষণ প্রথম বসন্তে প্রস্ফুটিত রাঙা পলাশ ফুলের মেলা বসিয়াছে, পাহাড়ের নীচে, উপরে, মাঠের সর্বত্র ঝুপ্সি গাছের ডাল ঝাড় ঝাড় ধাতুপফুলের ভারে অবনত, গোলগোলি ফুলের নিষ্পত্র দুগ্ধশুভ্র কাণ্ডে হলুদ

রঙের বড় বড় সূর্যমুখী ফুলের মত ফুল মধ্যাহ্নের রৌদ্রকে মৃদু সুগন্ধে অলস করিয়া তুলিয়াছে—তখন কতটা পথ চলিল, কে রাখে তাহার হিসাব?

কিন্তু হিসাব খানিকটা যে রাখিতেই হইবে, নতুবা দিগ্‌ভ্রান্ত ও পথভ্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, আমাদের জঙ্গলের সীমানা অতিক্রম করিবার পূর্বেই এ সত্যটি ভাল করিয়া বুঝিলাম। কিছুদূর তখন অন্যমনস্ক ভাবে গিয়াছি, হঠাৎ দেখি সম্মুখে বহু-দূরে একটা খুব বড় অরণ্যানীর ধূম্রনীল শীর্ষদেশ রেখাকারে দিগ্‌বলয়ের সে-অংশে এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কোথা হইতে আসিল এত বড় বন এখানে? কাছারিতে কেহ তো একথা বলে নাই যে, মৈষণ্ডির মেলার কাছাকাছি কোথাও অমন বিশাল অরণ্য বর্তমান? পরক্ষণেই ঠাহর করিয়া বুঝিলাম, পথ হারাইয়াছি, সম্মুখের বনরেখা মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট না হইয়া যায় না—যাহা আমাদের কাছারি হইতে খাড়া উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। এসব দিকে চলতি বাঁধা-পথ বলিয়া কোন জিনিস নাই, লোকজনও কেহ বড় একটা হাঁটে না। তাহার উপর চারদিক দেখিতে ঠিক একই রকম, সেই এক ধরণের ডাঙা, এক ধরণের পাহাড়, এক ধরণের গোলগোলি ও ধাতুপ ফুলের বন, সঙ্গে সঙ্গে আছে চড়া রৌদ্রের কম্পমান তাপ-তরঙ্গ। দিক্‌ভুল হইতে বেশী-ক্ষণ লাগে না আনাড়ি লোকের পক্ষে।

ঘোড়ার মুখ আবার ফিরাইলাম। হুঁশিয়ার হইয়া গন্তব্যস্থানের অবস্থান নির্ণয় করিয়া একটা দিক্‌চিহ্ন দূর হইতে আন্দাজ করিয়া বাছিয়া লইলাম। অকূল সমুদ্রে জাহাজ ঠিক পথে চালনা, অনন্ত আকাশে এরোপ্লেনের পাইলটের কাজ করা আর এই সব অজানা সুবিশাল পথহীন বনপ্রান্তরে অশ্বচালনা করিয়া তাহাকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাওয়া প্রায় একই শ্রেণীর ব্যাপার। অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের এ কথার সত্যতা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

আবার রৌদ্রদগ্ধ নিষ্পত্র গুল্মরাজি, আবার বনকুসুমের মৃদুমধুর গন্ধ, আবার অনাবৃত শিলাস্তূপসদৃশ প্রতীয়মান গণ্ডশৈলমালা, আবার রক্তপলাশের শোভা। বেলা বেশ চড়িল; জল খাইতে পাইলে ভাল হইত, ইহার মধ্যেই মনে হইল, কারো নদী ছাড়া এ পথে কোথাও জল নাই জানি, এখনও আমাদের জঙ্গলেরই সীমা কতক্ষণে ছাড়াইব ঠিক নাই, কারো নদী তো বহুদূর—এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা যেন হঠাৎ বাড়িয়া উঠিল।

মুকুন্দি চাক্‌লাদারকে বলিয়া দিয়াছিলাম আমাদের মহালের সীমানায় সীমানাজ্ঞাপক বাবলা কাঠের খুঁটি বা মহাবীরের ধ্বজার অনুরূপ যাহা হয় কিছু পুঁতিয়া রাখে। এ সীমানায় কখনও আসি নাই, দেখিয়া বুঝিলাম চাক্‌লাদার সে আদেশ পালন করে নাই; ভাবিয়াছে, এই জঙ্গল ঠেলিয়া কলিকাতার ম্যানেজারবাবু আর সীমানা পরিদর্শনে আসিয়াছেন, তুমিও যেমন! কে খাটিয়া মরে? যেমন আছে তেমনি থাকুক।

পথের কিছুদূরে আমাদের সীমানা ছাড়াইয়া এক জায়গায় ধোঁয়া উঠিতেছে দেখিয়া সেখানে গেলাম। জঙ্গলের মধ্যে একদল লোক কাঠ পুড়াইয়া কয়লা করিতেছে—এই কয়লা তাহারা গ্রামে গ্রামে শীতকালে বেচিবে। এদেশের শীতে গরীব লোকে মালসায় কয়লার আগুন করিয়া শীত নিবারণ করে; কাঠকয়লা চার সের পয়সায় বিক্রি হয়, তাও কিনিবার পয়সা অনেকের জোটে না, আর এত পরিশ্রম করিয়া কাঠকয়লা পুড়াইয়া পয়সায় চার সের দরে বেচিয়া কয়লাওয়ালাদের মজুরিই বা কি ভাবে পোষায়, তাও বুঝি না। এদেশে পয়সা জিনিসটা বাংলা দেশের মত সস্তা নয়, এখানে আসিয়া পর্যন্ত তা দেখিতেছি।

শুকনো কাশ ও সাবাই ঘাসের ছোট্ট একটা ছাউনি কেঁদ ও আমলকীর বনে, সেখানে বড় একটা মাটির হাঁড়িতে মকাই সিদ্ধ করিয়া কাঁচা শালপাতায় সকলে একত্রে খাইতে বসিয়াছে, আমি যখন গেলাম। লবণ ছাড়া অন্য কোন উপকরণই নাই। নিকটে বড় বড় গর্তের মধ্যে ডালপালা পুড়িতেছে, একটা ছোকরা সেখানে বসিয়া কাঁচাশালের লম্বা ডাল দিয়া আগুনে ডালপালা উল্টাইয়া দিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ও গর্তের মধ্যে, কি পুড়ছে?

তাহারা খাওয়া ছাড়িয়া সকলে একযোগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভীতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া থতমত খাইয়া বলিল—লকড়ি কয়লা হুজুর।

আমার ঘোড়ায় চড়া মুর্তি দেখিয়া লোকগুলা ভয় পাইয়াছে, বুঝিলাম আমাকে বন-বিভাগের লোক ভাবিয়াছে। এসব অঞ্চলের বন গবর্ণমেণ্টের খাসমহলের অন্তর্ভুক্ত, বিনা অনুমতিতে বন কাটা কি কয়লা পোড়ানো বে-আইনী।

তাহাদের আশ্বস্ত করিলাম। আমি বন-বিভাগের কর্মচারী নই, কোন ভয় নাই তাদের, যত ইচ্ছা কয়লা করুক। একটু জল পাওয়া যায় এখানে? খাওয়া ফেলিয়া একজন ছুটিয়া গিয়া মাজা ঝকঝকে জামবাটিতে পরিষ্কার জল আনিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কাছেই বনের মধ্যে ঝরণা আছে, তার জল।

ঝরণা?—আমার কৌতূহল হইল। ঝরণা কোথায়? শুনি নাই তো এখানে ঝরণা আছে!

উহারা বলিল—ঝরণা নাই হুজুর, উনুই! পাথরের গর্তে একটু একটু করে জল জমে, এক ঘণ্টায় আধ সের জল হয়, খুব সাফা পানি, ঠাণ্ডাও বহুৎ।

জায়গাটা দেখিতে গেলাম। কি সুন্দর ঠাণ্ডা বনবীথি! পাখীরা বোধ হয় এই নির্জন অরণ্যে শিলাতলে শরৎ বসন্তের দিনে, কি গভীর নিশীথ রাত্রে জলকেলি করিতে নামে। বনের খুব ঘন অংশে বড় বড় পিয়াল ও কেঁদের ডালপালা দিয়া ঘেরা একটা নাবাল জায়গা, তলাটা কালো পাথরের, একখানা খুব বড় প্রস্তর-বেদী যেন কালে ক্ষয় পাইয়া ঢেঁকির গড়ের মত হইয়া গিয়াছে। যেন খুব একটা বড় প্রাকৃতিক পাথরের খোরা। তার উপর সপুষ্প পিয়াল শাখা ঝুপসি হইয়া পড়িয়া ঘন ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। পিয়াল ও শাল মঞ্জরীর সুগন্ধ বনের ছায়ায় ভুরভুর করিতেছে। পাথরের খোলে বিন্দু বিন্দু জল জমিতেছে, এইমাত্র জল তুলিয়া লইয়া গিয়াছে, এখনও আধ ছটাক জলও জমে নাই।

উহারা বলিল—এ ঝরণার কথা অনেকে জানে না হুজুর, আমরা বনে জঙ্গলে হর-বখত্ বেড়াই, আমরা জানি।

আরও মাইল-পাঁচেক গিয়া কারো নদী পড়িল, খুব উঁচু বালির পাড় দু-ধারে, অনেকটা খাড়া নীচে নামিয়া গেলে তবে নদীর খাত, বর্তমানে খুব সামান্যই জল আছে, দু-পারে অনেক দূর পর্যন্ত বালুকাময় তীর ধু-ধু করিতেছে। যেন পাহাড় হইতে নামিতেছি মনে হইল; ঘোড়ায় জল পার হইয়া যাইতে যাইতে এক জায়গায় ঘোড়ার জিন পর্যন্ত আসিয়া ঠেকিল, রেকাবদলসুদ্ধ পা মুড়িয়া অতি সন্তর্পণে পার হইলাম। ওপারে ফুটন্ত রক্তপলাশের বন, উঁচু-নীচু রাঙা-রাঙা শিলাখণ্ড, আর শুধুই পলাশ, আর পলাশ, সর্বত্র পলাশ ফুলের মেলা। একবার দূরে একটা বুনো মহিষকে ধাতুপফুলের বন হইতে বাহির হইতে দেখিলাম—সেটা পাথরের উপর দাঁড়াইয়া পায়ের খুর দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। ঘোড়ার মুখের লাগাম কষিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম; ত্রিসীমানায় কোথাও

জন-মানব নাই, যদি শিং পাতিয়া তাড়া করিয়া আসে? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সেটা আবার পথের পাশের বনের মধ্যে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

নদী ছাড়াইয়া আরও কিছুদূর গিয়া পথের দৃশ্য কি চমৎকার! তবুও তো ঠিক-দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, অপরাহ্ণের ছায়া নাই, রাত্রির জ্যোৎস্নালোক নাই—কিন্তু সেই নিস্তব্ধ খররৌদ্র-মধ্যাহ্নে বাঁ-দিকে বনাবৃত দীর্ঘ শৈলমালা, দক্ষিণে লৌহপ্রস্তর ও পাইয়োরাইট ছড়ানো উঁচু-নীচু জমিতে শুধুই শুভ্রকান্ড গোলগোলি ফুলের গাছ ও রাঙা ধাতুপফুলের জঙ্গল। সেই জায়গাটা সত্যিই একেবারে অদ্ভুত; অমন রুক্ষ অথচ সুন্দর, পুষ্পাকীর্ণ অথচ উদ্দাম ও অতিমাত্রায় বন্য ভূমিশ্রী দেখিই নাই কখনও জীবনে। আর তার উপর ঠিক দুপুরের খাঁ-খাঁ রৌদ্র। মাথার উপরের আকাশ কি ঘন নীল! আকাশে কোথাও একটা পাখী নাই, শূন্য—মাটিতে বন্য-প্রকৃতির বুকে কোথাও একটা মানুষ বা জীবজন্তু নাই—নিঃশব্দ, ভয়ানক নিরালা। চারিদিকে চাহিয়া প্রকৃতির এই বিজন রূপ-লীলার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম—ভারতবর্ষে এমন জায়গা আছে জানিতাম না তো! এ যেন ফিল্মে দেখা দক্ষিণ-আমেরিকার আরিজোনা বা নাভাজো মরুভূমি কিংবা হড্সনের পুস্তকে বর্ণিত গিলা নদীর অববাহিকা-অঞ্চল।

মেলায় পৌঁছিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। প্রকান্ড মেলা, যে দীর্ঘ শৈলশ্রেণী পথের বাঁ-ধারে আমার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোশ-তিনেক ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, তারই সর্বদক্ষিণ প্রান্তে ছোট্ট একটা গ্রামের মাঠে, পাহাড়ের ঢালুতে চারিদিকে শাল পলাশের বনের মধ্যে এই মেলা বসিয়াছে। মহিষারডি, কড়ারী, তিনটাঙা, লছমনিয়াটোলা, ভীমদাসটোলা, মহালিখারূপ প্রভৃতি দূরের নিকটের নানা স্থান হইতে লোকজন, প্রধানত মেয়েরা আসিয়াছে। তরুণী বন্য মেয়েরা আসিয়াছে চুলে পিয়াল ফুল কি রাঙা ধাতুপ-ফুল গুঁজিয়া; কারো কারো মাথায় বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরুনি আটকানো, বেশ সুঠাম, সুলিলত, লাবণ্যভরা দেহের গঠন প্রায় অনেক মেয়েরই—তারা আমোদ করিয়া খেলো পুঁতির দানার মালা, সস্তা জাপানী কি জার্মানীর সাবানের বাক্স, বাঁশি, আয়না, অতি বাজে এসেন্স কিনিতেছে, পুরুষেরা এক পয়সায় দশটা কালী সিগারেট কিনিতেছে, ছেলেমেয়েরা তিলুয়া, রেউড়ি, রামদানার লাড্ডু ও তেলে-ভাজা খাজা কিনিয়া খাইতেছে।

হঠাৎ মেয়েমানুষের গলায় আর্ত কান্নার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। একটা উঁচু পাহাড়ী ডাঙ্গায় যুবক-যুবতীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া হাসি-খুশী গল্পগুজব আদর-আপ্যায়নে মত্ত ছিল—কান্নাটা উঠিল সেখান হইতেই। ব্যাপার কি? কেহ কি হঠাৎ পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইল? একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তা নয়, কোনও একটি বধূর সহিত তার পিত্রালয়ের গ্রামের কোনও মেয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে—এদেশের রীতিই নাকি এইরূপ, গ্রামের মেয়ে বা কোনও প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ার সঙ্গে অনেক-দিন পরে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দিবে। অনভিজ্ঞ লোকে ভাবিতে পারে উহাদের কেহ মরিয়া গিয়াছে, আসলে ইহা আদর-আপ্যায়নের একটা অঙ্গ। না কাঁদিলে নিন্দা হইবে। মেয়েরা বাপের বাড়ীর মানুষ দেখিয়া কাঁদে না—অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমাণ হয় যে, স্বামীগৃহে বড় সুখেই আছে—মেয়েমানুষের পক্ষে ইহা নাকি বড়ই লজ্জার কথা।

এক জায়গায় বইয়ের দোকানে চটের থলের উপর বই সাজাইয়া বসিয়াছে—হিন্দী গোলেবকাউলী, লয়লা-মজনু, বেতাল পঁচিশী, প্রেমসাগর ইত্যাদি। প্রবীণ লোকে কেহ

কেহ বই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছে—বুঝিলাম বুকস্টলে দণ্ডায়মান পাঠকের অবস্থা আনাতোল ফ্রাঁসের প্যারিসেও যেমন, এই বন্য দেশে কড়ারী তিনটাঙার হোলির মেলাতেও তাহাই। বিনা পয়সায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া লইতে পারিলে কেহ বড়-একটা বই কেনে না। দোকানীর ব্যবসাবুদ্ধি কিন্তু বেশ প্রখর, সে জনৈক তন্ময়চিত্ত পাঠককে জিজ্ঞাসা করিল —কেতাব কিনবে কি? না হয় তো রেখে দিয়ে অন্য কাজ দেখ। মেলার স্থান হইতে কিছুদূরে একটা শালবনের ছায়ায় অনেক লোক রাঁধিয়া খাইতেছে—ইহাদের জন্য মেলার এক অংশে তরিতরকারীর বাজার বসিয়াছে, কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় শুট্‌কী কুচো চিংড়ী ও নালসে পিঁপড়ের ডিম বিক্রয় হইতেছে। লাল পিঁপড়ের ডিম এখানকার একটি প্রিয় সুখাদ্য। তা ছাড়া আছে কাঁচা পেঁপে, শুকনো কুল, কেঁদ-ফল, পেয়ারা ও বুনো শিম।

হঠাৎ কাহার ডাক কানে গেল—ম্যানেজারবাবু,—

চাহিয়া দেখি ভিড় ঠেলিয়া লবটুলিয়ার পাটোয়ারীর ভাই ব্রহ্মা মাহাতো আগাইয়া আসিতেছে।—হুজুর, আপনি কখন এলেন? সঙ্গে কে?

বলিলাম—ব্রহ্মা এখানে কি মেলা দেখতে?

—না হুজুর, আমি মেলার ইজারাদার। আসুন, আসুন, আমার তাঁবুতে চলুন, একটু পায়ের ধুলো দেবেন।

মেলার একপাশে ইজারাদারের তাঁবু, সেখানে ব্রহ্মা খুব খাতির করিয়া আমায় লইয়া গিয়া একখানা পুরনো বেণ্টউড চেয়ারে বসাইল। সেখানে একজন লোক দেখিলাম, অমন লোক বোধ হয় পৃথিবীতে আর দেখিব না। লোকটি কে জানি না, ব্রহ্মা মাহাতোর কোন কর্মচারী হইবে। বয়স পঞ্চাশ-ষাট বছর, গা খালি, রং কালো, মাথার চুল কাঁচা-পাকায় মেশানো। তাহার হাতে একটা বড় থলিতে এক থলি পয়সা, বগলে একখানা খাতা, সম্ভবত মেলার খাজনা আদায় করিয়া বেড়াইতেছে, ব্রহ্মা মাহাতোকে হিসাব বুঝাইয়া দিবে।

মুগ্ধ হইলাম তাহার চোখের দৃষ্টির ও মুখের অসাধারণ দীন নম্র-ভাব দেখিয়া। যেন কিছু ভয়ের ভাবও মেশানো ছিল সে দৃষ্টিতে। ব্রহ্মা মাহাতো রাজা নয়, ম্যাজিস্ট্রেট নয়, কাহারও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নয়, গভর্ণমেণ্টের খাসমহলের জনৈক বর্ধিষ্ণু প্রজা মাত্র —লইয়াছেই না হয় মেলার ইজারা,—এত দীন ভাব কেন ও লোকটার তার কাছে? তারও পরে আমি যখন তাঁবুতে গেলাম, স্বয়ং ব্রহ্মা মাহাতো আমাকে অত খাতির করিতেছে দেখিয়া লোকটা আমার দিকে অতিরিক্ত সম্ভ্রম ও দীনতার দৃষ্টিতে ভয়ে ভয়ে এক-আধ বারের বেশী চাহিতে ভরসা পাইল না। ভাবিলাম লোকটার অত দীনহীন দৃষ্টি কেন? খুব কি গরীব? লোকটার মুখে কি যেন ছিল, বার-বার আমি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, Blessed are the meek for theirs is the Kingdom of Heaven. এমন ধারা সত্যিকার দীন-বিনম্র মুখ কখনও দেখি নাই।

ব্রহ্মা মাহাতোকে লোকটার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তার বাড়ী কড়ারী তিন-টাঙা, যে গ্রামে ব্রহ্মা মাহাতোর বাড়ী ; নাম গিরিধারীলাল, জাতি গাঙ্গোতা। উহার এক ছোট ছেলে ছাড়া আর সংসারে কেহই নাই। অবস্থা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম—অতি গরীব। সম্প্রতি ব্রহ্মা তাহাকে মেলায় দোকানের আদায়কারী কর্মচারী বহাল করিয়াছে —দৈনিক চার আনা বেতন ও খাইতে দিবে।

গিরিধারীলালের সঙ্গে আমার আরও দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে শেষবারের সাক্ষাতের সময়কার অবস্থা বড় করুণ, পরে সে-সব কথা বলিব। অনেক ধরণের মানুষ দেখিয়াছি, কিন্তু গিরিধারীলালের মত সাচ্চা মানুষ কখনও দেখি নাই। কত কাল হইয়া গেল, কত লোককে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু যাহাদের কথা চিরকাল মনে আঁকা আছে ও থাকিবে, সেই অতি অল্প কয়েকজন লোকের মধ্যে গিরিধারীলাল একজন।

৩

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। এখনই রওনা হওয়া দরকার, ব্রহ্মা মাহাতোকে সে কথা বলিয়া বিদায় চাহিলাম। ব্রহ্মা মাহাতো তো একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, তাঁবুতে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। অসম্ভব! এই ত্রিশ মাইল রাস্তা অবেলায় ফেরা! হুজুর কলিকাতার মানুষ, এ অঞ্চলের পথের খবর জানা নাই তাই একথা বলিতেছেন। দশ মাইল যাইতে সূর্য যাইবে ডুবিয়া, না হয় জ্যোৎস্নারাত্রিই হইল, ঘন পাহাড়-জঙ্গলের পথ, মানুষ-জন কোথাও নাই, বাঘ বাহির হইতে পারে, বুনো মহিষ আছে, বিশেষত পাকা কুলের সময়, এখন ভালুক তো নিশ্চয়ই বাহির হইবে, কারো নদীর ওপারে মহালিখারূপের জঙ্গলে এই তো সেদিনও এক গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে বাঘে লইয়াছে, বেচারী জঙ্গলের পথে একা গাড়ী চালাইয়া আসিতেছিল। অসম্ভব, হুজুর। রাত্রে এখানে থাকুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, যখন দয়া করিয়া আসিয়াছেন গরীবের ডেরায়। কাল সকালে তখন ধীরে-সুস্থে গেলেই হইবে।

এ বাসন্তী পূর্ণিমায় পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রে জনহীন পাহাড় জঙ্গলের পথে একা ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়ার প্রলোভন আমার কাছে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। জীবনে আর কখনও হইবে না, এই হয়ত শেষ, আর যে অপূর্ব বন-পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি পথে! জ্যোৎস্নারাত্রে—বিশেষত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় তাহাদের রূপ একবার দেখিব না যদি, তবে এতটা কষ্ট করিয়া আসিবার কি অর্থ হয়?

সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইয়া রওনা হইলাম। ব্রহ্মা মাহাতো ঠিকই বলিয়াছিল, কারো নদীতে পৌঁছিবার কিছু পূর্বেই টকটকে লাল সুবৃহৎ সূর্যটা পশ্চিম দিক্‌চক্রবালে একটা অনুচ্চ শৈলমালার পিছনে অস্ত গেল। কারো নদীর তীরের বালিয়াড়ির উপর যখন ঘোড়াসুদ্ধ উঠিয়াছি, এইবার এখান হইতে ঢালু বালির পথে নদীগর্ভে নামিব—হঠাৎ সেই সূর্যাস্তের দৃশ্য এবং ঠিক পূর্বে বহু দূরে কৃষ্ণ রেখার মত পরিদৃশ্যমান মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মাথায় নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের দৃশ্য—যুগপৎ এই অস্ত ও উদয়ের দৃশ্যে থমকিয়া ঘোড়াকে লাগাম কষিয়া দাঁড় করাইলাম। সেই নির্জন অপরিচিত নদীতীরে সমস্তই যেন একটা অবাস্তব ব্যাপারের মত দেখাইতেছে—

পথে সর্বত্র পাহাড়ের ঢালুতে ও ডাঙায় ছাড়া-ছাড়া জঙ্গল, মাঝে মাঝে সরু পথটাকে যেন দুই দিক হইতে চাপিয়া ধরিতেছে, আবার কোথাও কিছুদূরে সরিয়া যাইতেছে। কি ভয়ংকর নির্জন চারিদিক, দিনমানে যা-হয় একরূপ ছিল, জ্যোৎস্না উঠিবার পর মনে হইতেছে যেন অজানা ও অদ্ভুত সৌন্দর্যময় পরীরাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ভয়ও হইল, মনে পড়িল মেলায় ব্রহ্মা মাহাতো এবং কাছারিতে প্রায় সকলেই রাত্রে এপথে একা আসিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিল, মনে পড়িল নন্দকিশোর গোসাঁই

নামে আমাদের একজন বাথানদার প্রজা আজ মাস দুই-তিন আগে কাছারিতে বসিয়া গল্প করিয়াছিল এই মহালিখারূপের জঙ্গলে সেই সময় কাহাকে বাঘে খাওয়ার ব্যাপার। জঙ্গলের এখানে-ওখানে বড় বড় কুলগাছে কুল পাকিয়া ডাল নত হইয়া আছে—তলায় বিস্তর শুকনো ও পাকা কুল ছড়ানো—সুতরাং ভালুক বাহির হইবারও সম্ভাবনা খুবই। বুনো মহিষ এ বনে না থাকিলেও মোহনপুরা জঙ্গল হইতে ওবেলার মত এক-আধটা ছিটকাইয়া আসিতে কতক্ষণ! সম্মুখে এখনও পনের মাইল নির্জন বনপ্রান্তরের উপর দিয়া পথ।

ভয়ের অনুভূতি চারি পাশের সৌন্দর্যকে যেন আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক এক স্থানে পথ দক্ষিণ হইতে খাড়া উত্তরে ও উত্তর হইতে পূর্বে ঘুরিয়া গিয়াছে, পথের খুব কাছে বাম দিকে সর্বত্রই একটানা অনুচ্চ শৈলমালা, তাদের ঢালুতে গোলগোলি ও পলাশের



জঙ্গল, উপরের দিকে শাল ও বড় বড় ঘাস। জ্যোৎস্না এবার ফুটফুট করিতেছে, গাছের ছায়া হ্রস্বতম হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা বন্য-ফুলের সুবাসে জ্যোৎস্নাশুভ্র প্রান্তর ভরপুর, অনেক দূরে পাহাড়ে সাঁওতালেরা জুম চাষের জন্য আগুন দিয়াছে, সে কি অভিনব দৃশ্য, মনে হইতেছে পাহাড়ে পাহাড়ে আলোর মালা কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে।

কখনও যদি এসব দিকে না আসিতাম, কেহ বলিলেও বিশ্বাস করিতাম না যে, বাংলা দেশের এত নিকটেই এরূপ সম্পূর্ণ জনহীন অরণ্যপ্রান্তর ও শৈলমালা আছে, যাহা সৌন্দর্যে আরিজোনার পাথুরে মরুদেশ বা রোডেসিয়ার বুশভেল্ডের অপেক্ষা কম নয় কোন অংশে—বিপদের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এসব অঞ্চল নিতান্ত পুতুপুতু বলা চলে না, সন্ধ্যার পরেই যেখানে বাঘ-ভালুকের ভয়ে লোকে পথ হাঁটে না।

এই মুক্ত জ্যোৎস্নাশুভ্র বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতেছিলাম, এ এক আলাদা জীবন, যারা ঘরের দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে না, সংসার করা যাদের রক্তে নাই, সেই সব বারমুখো, খাপছাড়া প্রকৃতির মানুষের পক্ষে এমন জীবনই

তো কাম্য। কলিকাতা হইতে প্রথম প্রথম আসিয়া এখানকার এই ভীষণ নির্জনতা ও সম্পূর্ণ বন্য জীবনযাত্রা কি অসহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এখন আমার মনে হয় এই ভাল, এই বর্বর রুক্ষ বন্য প্রকৃতি আমাকে তার স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, শহরের খাঁচার মধ্যে আর দাঁড়ে বসিয়া থাকিতে পারিব কি? এই পথহীন প্রান্তরের শিলাখন্ড ও শালপলাশের বনের মধ্য দিয়া এই রকম মুক্ত আকাশতলে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় হু-হু ঘোড়া ছুটাইয়া চলার আনন্দের সহিত আমি দুনিয়ার কোন সম্পদ বিনিময় করিতে চাই না।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য, চারিধারে চাহিয়া মনে হয় এ সে পৃথিবী নয় এতদিন যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু, বনের ফুল যারা ভালবাসে না, সুন্দরকে চেনে না, দিগ্বলয়রেখা যাদের কখনও হাতছানি দিয়া ডাকে নাই, তাদের কাছে এ পৃথিবী ধরা দেয় না কোন কালেই।

মহালিখারূপের জঙ্গল শেষ হইতেই মাইল চার গিয়া আমাদের সীমানা শুরু হইল। রাত প্রায় নটার সময়ে কাছারি পৌঁছিলাম।

## ৪

কাছারিতে ঢোলের শব্দ শুনিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি একদল লোক কাছারির কম্পাউণ্ডে কোথা হইতে আসিয়া ঢোল বাজাইতেছে। ঢোলের শব্দে কাছারির সিপাহী কর্মচারীরা আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কাহাকেও ডাকিয়া ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় জমাদার মুক্তিনাথ সিং দরজার কাছে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—একবার বাইরে আসবেন মেহেরবানি করে?

—কি জমাদার, কি ব্যাপার?

—হুজুর, দক্ষিণ দেশে এবার ধান মরে যাওয়াতে অজন্মা হয়েছে, লোকে চালাতে না পেরে দেশে দেশে নাচের দল নিয়ে বেরিয়েছে। ওরা কাছারিতে হুজুরের সামনে নাচবে বলে এসেছে, যদি হুকুম হয় তবে নাচ দেখায়।

নাচের দল আমার আপিস-ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুক্তিনাথ সিং জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ নাচ তাহারা দেখাইতে পারে। দলের মধ্যে একজন ষাট-বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ সেলাম করিয়া বিনীতভাবে বলিল—হুজুর, হো হো নাচ আর ছক্কর-বাজি নাচ।

দলটি দেখিয়া মনে হইল নাচের কিছু জানুক না-জানুক, পেটে দুটি খাইবার আশায় সব ধরণের, সব বয়সের লোক ইহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহারা নাচিল ও গান গাহিল। বেলা পড়িবার সময় তাহারা আসিয়াছিল, ক্রমে আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিল, তখনও তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত ধরিয়া নাচিতেছে ও গান গাহিতেছে। অদ্ভুত ধরণের নাচ ও সম্পূর্ণ অপরিচিত সুরের গান। এই মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রসার ও এই সভ্য জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত নিভৃত বন্য আবেষ্টনীর মধ্যে, এই দিগন্ত-পরিপ্লাবী ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নালোকে এই নাচ-গানই চমৎকার খাপ খায়। একটি গানের অর্থ এইরূপ:—

শিশুকালে বেশ ছিলাম।

আমাদের গ্রামের পিছনে যে পাহাড়, তার মাথায় কেঁদ-বন, সেই বনে কুড়িয়ে বেড়াতাম পাকা ফল, গাঁথতাম পিয়াল ফুলের মালা।

দিন খুব সুখেই কাট্‌ত, ভালবাসা কাকে বলে, তা তখন জানতাম না।

পাঁচ-নহরী ঝরণার ধারে সেদিন কররা পাখী মারতে গিয়েছি।

হাতে আমার বাঁশের নল ও আঠা-কাঠি।

তুমি কুসুম-রঙে ছাপানো শাড়ী পরে এসেছিলে জল ভরতে।

দেখে বললে—ছিঃ, পুরুষমানুষে কি সাত-নলি দিয়ে বনের পাখী মারে!

আমি লজ্জায় ফেলে দিলাম বাঁশের নল, ফেলে দিলাম আঠা-কাঠির তাড়া।

বনের পাখী গেল উড়ে, কিন্তু আমার মন-পাখী তোমার প্রেমের ফাঁদে চিরদিনের মত যে ধরা পড়ে গেল!

আমায় সাত-নলি চেলে পাখী মারতে বারণ করে এ-কি করলে তুমি আমার! কাজটা কি ভাল হল, সখি?'

ওদের ভাষা কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না। গানগুলি সেই জন্যই বোধ হয় আমার কাছে আরও অদ্ভুত লাগিল। এই পাহাড় ও পিয়ালবনের সুরে বাঁধা এদের গান, এখানেই ভাল লাগিবে।

ইহাদের দক্ষিণা মাত্র চার আনা পয়সা। কাছারির আমলারা একবাক্যে বলিল—হুজুর, তাই অনেক জায়গায় পায় না, বেশী দিয়ে ওদের লোভ বাড়াবেন না, তাছাড়া বাজার নষ্ট হবে। যা রেট্ তার বেশী দিলে গরীব গেরস্তরা নিজেদের বাড়ীতে নাচ করাতে পারবে না হুজুর।

অবাক হইলাম—দু-তিন ঘণ্টা প্রাণপণে খাটিয়াছে, কম্‌সে কম সতর-আঠারজন লোক —চার আনায় ইহাদের জন-পিছু একটা করিয়া পয়সাও তো পড়িবে না। আমাদের কাছারিতে নাচ দেখাইতে এই জনহীন প্রান্তর ও বন পার হইয়া এতদূর আসিয়াছে। সমস্ত দিনের মধ্যে ইহাই রোজগার। কাছে আর কোনও গ্রাম নাই যেখানে আজ রাত্রে নাচ দেখাইবে।

রাত্রে কাছারিতে তাহাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সকালে তাহাদের দলের সর্দারকে ডাকাইয়া দুইটি টাকা দিতে লোকটা অবাক হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নাচ দেখিয়া খাইতে কেহই দেয় না, তাহার উপর আবার দু-টাকা দক্ষিণা!

তাহাদের দলে বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে আছে, ছেলেটির চেহারা যাত্রাদলের কৃষ্ণঠাকুরের মত। এক-মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ভারী শান্ত, সুন্দর চোখ-মুখ, কুচকুচে কালো গায়ের রং। দলের সামনে দাঁড়াইয়া সে-ই প্রথমে সুর ধরে ও পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচে যখন—ঠোঁটের কোণে হাসি মিলাইয়া থাকে। সুন্দর ভঙ্গিতে হাত দুলাইয়া মিষ্ট সুরে গায়—

রাজা লিজিয়ে সেলাম ম্যয় পরদেশিঁয়া।

শুধু দুটি খাইবার জন্য ছেলেটি দলের সঙ্গে ঘুরিতেছে। পয়সার ভাগ সে বড়-একটা পায় না। তাও সে খাওয়া কি! চীনা ঘাসের দানা, আর নুন। বড় জোর তার সঙ্গে একটু তরকারি—আলুপটল নয়, জংলী গুড়মি ফল ভাজা, নয়ত বাথুয়া শাক সিদ্ধ, কিংবা ধুধুল ভাজা। এই খাইয়াই মুখে হাসি তার সর্বদা লাগিয়া আছে। দিব্য স্বাস্থ্য,

অপূর্ব লাবণ্য সারা অঙ্গে।

দলের অধিকারীকে বলিলাম, ধাতুরিয়াকে রেখে যাও এখানে। কাছারিতে কাজ করবে, আর থাকবে খাবে।

অধিকারী সেই দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লোকটি, সে-ও এক অদ্ভুত ধরণের লোক। এই বাষট্টি বছরেও সে একেবারে বালকের মত।

বলিল—ও থাকতে পারবে না হুজুর। গাঁয়ের সব লোকের সঙ্গে একসঙ্গে আছে, তাই ও আছে ভাল। একলা থাকলে মন কেমন করবে, ছেলেমানুষ কি থাকতে পারে? আবার আপনার সামনে ওকে নিয়ে আসব হুজুর।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

### ১

জঙ্গলের বিভিন্ন অংশ সার্ভে হইতেছিল। কাছারি হইতে তিন ক্রোশ দূরে বোমাইবুরুর জঙ্গলে আমাদের এক আমীন রামচন্দ্র সিং এই উপলক্ষে কিছুদিন ধরিয়া আছে। সকালে খবর পাওয়া গেল রামচন্দ্র সিং হঠাৎ আজ দিন দুই-তিন হইল পাগল হইয়া গিয়াছে।

শুনিয়া তখনই লোকজন লইয়া সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। বোমাইবুরুর জঙ্গল খুব নিবিড় নয়, খুব ফাঁকা উঁচু-নীচু প্রান্তরে মাঝে মাঝে ঘনসন্নিবদ্ধ বনঝোপ। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ, ডাল হইতে সরু দড়ির মত লতা ঝুলিতেছে, যেন জাহাজের উঁচু মাস্তুলের সঙ্গে দড়াদড়ি বাঁধা। বোমাইবুরুর জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে লোকবসতি-শূন্য।

গাছপালার নিবিড়তা হইতে দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে কাশে-ছাওয়া ছোট্ট দুখানা কুঁড়ে। একখানা একটু বড়, এখানাতে রামচন্দ্র আমীন থাকে, পাশের ছোটখানায় তার পেয়াদা আসরফি টিণ্ডেল থাকে। রামচন্দ্র নিজের কাঠের মাচার উপর চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। আমাদের দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে রামচন্দ্র? কেমন আছ?

রামচন্দ্র হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু আসরফি টিণ্ডেল সে-কথার উত্তর দিল। বলিল—বাবু, একটা বড় আশ্চর্য কথা। আপনি শুনলে বিশ্বাস করবেন না। আমি নিজেই কাছারিতে গিয়ে খবর দিতাম, কিন্তু আমীনবাবুকে ফেলে যাই বা কি করে? ব্যাপারটা এই, আজ ক'দিন থেকে আমীনবাবু বলছেন একটা কুকুর এসে রাত্রে তাঁকে বড় বিরক্ত করে। আমি শুই এই ছোট ঘরে, আমীনবাবু শুয়ে থাকেন এখানে। দু-তিনদিন এই রকম গেল। রোজই উনি বলেন—আরে কোত্থেকে একটা সাদা কুকুর আসে রাত্রে। মাচার ওপর বিছানা পেতে শুই, কুকুরটা এসে মাচার নীচে কেঁউ কেঁউ করে। গায়ে ঘেঁষ দিতে আশে। শুনি, বড়-একটা গা করি নে। আজ চারদিন আগে উনি অনেক রাত্রে বললেন—আসরফি, শীগগির এসো বেরিয়ে, কুকুরটা এসেছে। আমি তার লেজ চেপে ধরে রেখেছি। লাঠি নিয়ে এস।

আমি ঘুম ভেঙে উঠে লাঠি আলো নিয়ে ছুটে যেতে যেতে দেখি—বললে বিশ্বাস করবেন না হুজুর, কিন্তু হুজুরের সামনে মিথ্যে বলব এমন সাহস আমার নেই—একটি মেয়ে ঘরের ভিতর থেকে বার হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি প্রথমটা থতমত খেয়ে

গেলাম। তারপরে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি আমীনবাবু বিছানা হাতড়ে দেশলাই খুঁজছেন। উনি বললেন—কুকুরটা দেখলে?

আমি বললাম—কুকুর কই বাবু, একটা কে মেয়ে তো বার হয়ে গেল।

উনি বললেন—উল্লুক, আমার সঙ্গে বেয়াদবি? মেয়েমানুষ কে আসবে এই জঙ্গলে দুপুর রাতে? আমি কুকুরটার লেজ চেপে ধরেছিলাম, এমন কি তার লম্বা কান আমার গায়ে ঠেকেছে। মাচার নীচে ঢুকে কেঁউ কেঁউ করছিল। নেশা করতে শুরু করেছ বুঝি? রিপোর্ট করে দেবো সদরে।

পরদিন রাত্রে আমি সজাগ হয়ে ছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত। যেই একটু ঘুমিয়েছি অমনি আমীনবাবু ডাকলেন। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে আমার ঘরের দোর পর্যন্ত গিয়েছি, এমন সময় দেখি একটি মেয়ে ওঁর ঘরের উত্তর দিকের বেড়ার গা বেয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। তখনি হুজুর আমি নিজে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। অতটুকু সময়ের মধ্যে লুকোবে কোথায়, যাবেই বা কত দূর? বিশেষ করে আমরা জঙ্গল জরীপ করি, অন্ধি-সন্ধি সব আমাদের জানা। কত খুঁজলাম বাবু, কোথাও তার চিহ্নটি পাওয়া গেল না। শেষে আমার কেমন সন্দেহ হল, মাটিতে আলো ধরে দেখি কোথাও পায়ের দাগ নেই, আমার নাগরা জুতোর দাগ ছাড়া।

আমীনবাবুকে আমি একথা বললাম না আর সেদিন। একা দুটি প্রাণী থাকি এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে হুজুর। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আর বোমাইবুরু জঙ্গলের একটু দুর্নামও শোনা ছিল। ঠাকুরদাদার মুখে শুনেছি, বোমাইবুরু পাহাড়ের উপর ওই যে বটগাছটা দেখছেন দূরে—একবার তিনি পূর্ণিয়া থেকে কলাই বিক্রির টাকা নিয়ে জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘোড়ায় ক'রে জঙ্গলের পথে ফিরছিলেন—ওই বটতলায় এসে দেখেন একদল অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে হাত-ধরাধরি করে জ্যোৎস্নার মধ্যে নাচছে। এদেশে বলে ওদের 'ডামাবাণু'—এক ধরণের জীনপরী, নির্জন জঙ্গলের মধ্যে থাকে। মানুষকে বেঘোরে পেলে মেরেও ফেলে।

হুজুর, পরদিন রাত্রে আমি নিজে আমীনবাবুর তাঁবুতে শুয়ে জেগে রইলাম সারারাত। সারারাত জেগে জরীপের থাকবন্দীর হিসেব কষতে লাগলাম। বোধ হয় শেষ রাতের দিকে একটু তন্দ্রা এসে থাকবে—হঠাৎ কাছেই একটা কিসের শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইলাম—দেখি আমীন সাহেব ঘুমুচ্ছেন ওঁর খাটে, আর খাটের নীচে কি একটা ঢুকেছে। মাথা নীচু করে খাটের নীচে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলাম। আধ-আলো আধ-অন্ধকারে প্রথমটা মনে হল একটি মেয়ে যেন গুটি-সুটি মেরে খাটের তলায় বসে আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছে—স্পষ্ট দেখলাম হুজুর, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি। এমন কি, তার মাথায় বেশ কালো চুলের গোছা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখেছি। লণ্ঠনটা ছিল, যেখানটাতে বসে হিসেব কষছিলাম সেখানে—হাত ছ'সাত দূরে। আরও ভাল করে দেখব বলে লণ্ঠনটা যেমন আনতে গিয়েছি, কি একটা প্রাণী ছুটে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে পালাতে গেল—দোরের কাছে লণ্ঠনের আলোটা বাঁকা ভাবে পড়েছিল, সেই আলোতে দেখলাম একটা বড় কুকুর, কিন্তু তার আগাগোড়া সাদা, হুজুর, কালোর চিহ্ন কোথাও নেই তার গায়ে।

আমীন সাহেব জেগে বললেন—কি, কি? বললাম—ও কিছু নয়, একটা শেয়াল কি কুকুর ঘরে ঢুকেছিল। আমীন সাহেব বললেন—কুকুর? কি রকম কুকুর? বললাম—সাদা

কুকুর। আমীন সাহেব যেন একটা নিরাশার সুরে বললেন—সাদা ঠিক দেখেছ? না কালো? বললাম—না, সাদাই হুজুর।

আমি একটু বিস্মিত যে না হয়েছিলাম এমন নয়—সাদা না হয়ে কালো হলেই বা আমীনবাবুর কি সুবিধা হবে তাতে বুঝলাম না। উনি ঘুমিয়ে পড়লেন—কিন্তু আমার যে কেমন একটা ভয় ও অস্বস্তি বোধ হল কিছুতেই চোখের পাতা বোজাতে পারলাম না। খুব সকালে উঠে খাটের নীচেটা একবার কি মনে করে ভাল করে খুঁজতে গিয়ে সেখানে একগাছা কালো চুল পেলাম। এই সে চুলও রেখেছি, হুজুর। মেয়েমানুষের মাথার চুল। কোথা থেকে এল এ চুল? দিব্যি কালো কুচকুচে নরম চুল! কুকুর—বিশেষতঃ সাদা কুকুরের গায়ে এত বড়, নরম কালো চুল হয় না। এ হল গত রবিবার অর্থাৎ আজ তিন দিনের কথা। এই তিন দিন থেকে আমীন সাহেব তো এক রকম উন্মাদ হয়েই উঠেছেন। আমার ভয় করছে হুজুর—এবার আমার পালা কিনা তাই ভাবছি।

গল্পটা বেশ আষাঢ়ে-গোছের বটে। সে চুলগাছি হাতে করিয়া দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মেয়েমানুষের মাথার চুল, সে-বিষয়ে আমারও কোনো সন্দেহ রহিল না। আসরফি টিণ্ডেল ছোকরা মানুষ, সে যে নেশা-ভাঙ করে না, একথা সকলেই একবাক্যে বলিল।

জনমানবশূন্য প্রান্তর ও বনঝোপের মধ্যে একমাত্র তাঁবু এই আমীনের। নিকটতম লোকালয় হইতেছে লবটুলিয়া—ছয় মাইল দূরে। মেয়েমানুষই বা কোথা হইতে আসিতে পারে অত গভীর রাত্রে—বিশেষ যখন এই সব নির্জন বনপ্রান্তরে বাঘ ও বুনোশুয়োরের ভয়ে সন্ধ্যার পরে আর লোকে পথ চলে না?

যদি আসরফি টিণ্ডেলের কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লই, তবে ব্যাপারটা খুব রহস্যময়। অথবা এই পান্ডববর্জিত দেশে, এই জনহীন বনজঙ্গল ও ধু-ধু প্রান্তরের মধ্যে বিংশ শতাব্দী তো প্রবেশের পথ খুঁজিয়া পায়ই নাই—ঊনবিংশ শতাব্দীও পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অতীত যুগের রহস্যময় অন্ধকারে এখনও এসব অঞ্চল আচ্ছন্ন—এখানে সবই সম্ভব।

সেখানকার তাঁবু উঠাইয়া রামচন্দ্র আমীন ও আসরফি টিণ্ডেলকে সদর কাছারিতে লইয়া আসিলাম। রামচন্দ্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল, ক্রমশ সে ঘোর উন্মাদ হইয়া উঠিল। সারারাত্রি চীৎকার করে, বকে, গান গায়। ডাক্তার আনিয়া দেখাইলাম, কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে তাহার এক দাদা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

এই ঘটনার একটা উপসংহার আছে, যদিও তাহা ঘটিয়াছিল বর্তমান ঘটনার সাত-আট মাস পরে, তবুও এখানেই তাহা বলিয়া রাখি।

এ ঘটনার ছ-মাস পরে চৈত্র মাসের দিকে দুটি লোক কাছারিতে আমার সঙ্গে দেখা করিল। একজন বৃদ্ধ, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়, অন্যটি তার ছেলে, বয়স কুড়ি-বাইশ। তাদের বাড়ী বালিয়া জেলায়, আমাদের এখানে আসিয়াছে চরি-মহাল ইজারা লইতে, অর্থাৎ আমাদের জঙ্গলে খাজনা দিয়া তাহারা গরু-মহিষ চরাইবে।

অন্য সব চরি-মহাল তখন বিলি হইয়া গিয়াছে, বোমাইবুরুর জঙ্গলটা তখনও খালি পড়িয়া ছিল, সেইটাই বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। বৃদ্ধ ছেলেকে সঙ্গে লইয়া একদিন মহাল দেখিয়াও আসিল। খুব খুশী, বলিল, খুব বড় বড় ঘাস হুজুর, বহুৎ আচ্ছা জঙ্গল। হুজুরের মেহেরবানি না হলে অমন জঙ্গল মিলত না।

রামচন্দ্র ও আসরফি টিণ্ডেলের কথা তখন আমার মনে ছিল না, থাকিলেও বৃদ্ধের নিকট তাহা হয়ত বলিতাম না। কারণ, ভয় পাইয়া সে ভাগিয়া গেলে জমিদারের লোকসান। স্থানীয় লোকেরা কেহই ও জঙ্গল ইজারা লইতে ঘেঁষে না, রামচন্দ্র আমীনের সেই ব্যাপারের পরে।

মাসখানেক পরে বৈশাখের গোড়ায় একদিন বৃদ্ধ লোকটি কাছারিতে আসিয়া হাজির, মহা রাগত ভাব, তার পিছনে সেই ছেলেটি কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়াইয়া।

বলিলাম—কি ব্যাপার?

বৃদ্ধ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—এই বাঁদরটাকে নিয়ে এলাম হুজুরের কাছে দরবার করতে। ওকে আপনি পা থেকে খুলে পঁচিশ জুতো মারুন, ও জব্দ হয়ে যাক্।

—কি হয়েছে কি?

—হুজুরের কাছে বলতে লজ্জা করে। এই বাঁদর এখানে এসে পর্যন্ত বিগড়ে যাচ্ছে। আমি সাত-আট দিন আজ প্রায়ই লক্ষ্য করছি—লজ্জা করে বলতে হুজুর—প্রায়ই মেয়েমানুষ ঘর থেকে বার হয়ে যায়। একটা মাত্র খুপরি হাত-আস্টেক লম্বা, ঘাসে ছাওয়া, ও আর আমি দু-জনে শুই। আমার চোখে ধুলো দিতে পারাও সোজা কথা নয়। দু-দিন যখন দেখলাম, তখন ওকে জিগ্যেস করলাম. ও একেবারে গাছ থেকে পড়ল হুজুর। বলে—কই, আমি তো কিছুই জানি নে! আরও দু-দিন যখন দেখলাম, তখন একদিন দিলাম আচ্ছা করে ওকে মার। চোখের সামনে বিগড়ে যাবে ছেলে? কিন্তু তার পরেও যখন দেখলাম, এই পরশু রাত্রেই হুজুর—তখন ওকে আমি হুজুরের দরবারে নিয়ে এসেছি, হুজুর শাসন করে দিন।

হঠাৎ রামচন্দ্র আমীনের ব্যাপারটা মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কত রাত্রে দেখেছ?

—প্রায়ই শেষরাত্রের দিকে হুজুর। এই রাতের দু-এক ঘড়ি বাকি থাকতে।

—ঠিক দেখেছ, মেয়েমানুষ?

—হুজুর, আমার চোখের তেজ এখনও তত কম হয়নি। জরুর মেয়েমানুষ, বয়সেও কম, কোনদিন পরনে সাদা ধোয়া শাড়ী, কোনদিন বা লাল, কোনদিন কালো। একদিন মেয়েমানুষটা বেরিয়ে যেতেই আমি পেছন পেছন গেলাম। কাশের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় পালিয়ে গেল, টের পেলুম না। ফিরে এসে দেখি, ছেলে আমার যেন খুব ঘুমের ভান করে পড়ে রয়েছে. ডাকতেই ধড়মড় করে ঠেলে উঠল, যেন সদ্য ঘুম ভেঙে উঠল। এ রোগের ওষুধ কাছারি ভিন্ন হবে না বুঝলাম, তাই হুজুরের কাছে—

ছেলেটিকে আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এ সব কি শুনছি তোমার নামে?

ছেলেটি আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমার কথা বিশ্বাস করুন হুজুর। আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানি না। সমস্ত দিন জঙ্গলে মহিষ চরিয়ে বেড়াই—রাতে মড়ার মত ঘুমুই, ভোর হলে তবে ঘুম ভাঙে। ঘরে আগুন লাগলেও আমার হুঁশ থাকে না।

বলিলাম—তুমি কোনদিন কিছু ঘরে ঢুকতে দেখনি?

—না, হুজুর। আমার ঘুমুলে হুঁশ থাকে না।

এ-বিষয়ে আর কোনো কথা হইল না। বৃদ্ধ খুব খুশী হইল, ভাবিল আমি আড়ালে লইয়া গিয়া ছেলেকে খুব শাসন করিয়া দিয়াছি। দিন-পনের পরে একদিন ছেলেটি আমার কাছে আসিল। বলিল—হুজুর, একটা কথা আছে। সেবার যখন আমি, বাবার সঙ্গে

কাছারিতে এসেছিলাম, তখন আপনি ও-কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন যে আমি কোনও কিছু ঘরে ঢুকতে দেখেছি কি না?

—কেন বল তো?

—হুজুর, আমার ঘুম আজকাল খুব সজাগ হয়েছে—বাবা ওই রকম করেন বলে আমার মনে কেমন একটা ভয়ের দরুণই হোক বা যার দরুণই হোক। তাই আজ ক-দিন থেকে দেখছি, রাত্রে একটা সাদা কুকুর কোথা থেকে আসে—অনেক রাত্রে আসে, ঘুম ভেঙে এক-একদিন দেখি সেটা বিছানার কাছেই কোথায় ছিল—আমি জেগে শব্দ করতেই পালিয়ে যায়—কোনও দিন জেগে উঠলেই পালায়। সে কেমন বুঝতে পারে যে, এইবার আমি জেগেছি। এ রকম তো ক-দিন দেখলাম—কিন্তু কাল রাতে হুজুর, একটা ব্যাপার ঘটেছে। বাপজী জানে না—আপনাকে চুপি চুপি বলতে এলাম। কাল অনেক রাতে ঘুম ভেঙে দেখি, কুকুরটা ঘরে কখন ঢুকেছিল দেখিনি—আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হয়ে যাচ্ছে। সেদিকের কাশের বেড়ায় জানলার মাপে কাটা ফাঁক। কুকুর বেরিয়ে যাওয়ার পরে—বোধ হয় পলক ফেলতে যতটা দেরি হয়, তার পরেই আমার সামনের জানালা দিয়ে দেখি একটি মেয়ে-মানুষ জানালার পাশ দিয়ে ঘরের পেছনের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি তখুনি বাইরে ছুটে গেলাম—কোথাও কিছু না। বাবাকেও জানাইনি, বুড়োমানুষ ঘুমুচ্ছে। ব্যাপারটা কি হুজুর বুঝতে পারছিনে।

আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম—ও কিছু নয়, চোখের ভুল। বলিলাম, যদি তাহাদের ওখানে থাকিতে ভয় করে, তাহারা কাছারিতে আসিয়া শুইতে পারে। ছেলেটি নিজের সাহস-হীনতায় বোধ করি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু আমার অস্বস্তি দূর হইল না, ভাবিলাম এইবার কিছু শুনিলে কাছারি হইতে দুইজন সিপাহী পাঠাইব রাত্রে ওদের কাছে শুইবার জন্য।

তখনও বুঝিতে পারি নাই জিনিসটা কত সঙ্গীন। দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল অতি অকস্মাৎ এবং অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে।

দিন-তিনেক পরে।

সকালে সবে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছি, খবর পাইলাম কাল রাত্রে বোমাইবুরু জঙ্গলে বৃদ্ধ ইজারাদারের ছেলেটি মারা গিয়াছে। ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা তখনই রওনা হইলাম। গিয়া দেখি তাহারা যে ঘরটাতে থাকিত তাহারই পিছনে কাশ ও বনঝাউ জঙ্গলে ছেলেটির মৃতদেহ তখনও পড়িয়া আছে। মুখে তাহার ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন—কি একটা বিভীষিকা দেখিয়া আঁৎকাইয়া যেন মারা গিয়াছে। বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম, শেষ রাত্রির দিকে উঠিয়া ছেলেকে সে বিছানায় না দেখিয়া তখনি লণ্ঠন ধরিয়া খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে—কিন্তু ভোরের পূর্বে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, সে হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া কোনো-কিছুর অনুসরণ করিয়া বনের মধ্যে ঢোকে--কারণ, মৃতদেহের কাছেই একটা মোটা লাঠি ও লণ্ঠন পড়িয়া ছিল, কিসের অনুসরণ করিযা সে বনের মধ্যে রাত্রে একা আসিয়াছিল তাহা বলা শক্ত। কারণ নরম বালিমাটির উপরে ছেলেটির পায়ের দাগ ছাড়া অন্য কোনও পায়ের দাগ নাই—না মানুষ, না জানোয়ারের। মৃতদেহেও কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন ছিল না। বোমাইবুরু জঙ্গলের এই রহস্যময় ব্যাপারের কোনো মীমাংসাই হয় নাই, পুলিস আসিয়া কিছু করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেল, লোকজনের মনে এমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিল ঘটনাটি যে, সন্ধ্যার বহু পূর্বে

হইতে ও অঞ্চলে আর কেহ যায় না। দিনকতক তো এমন হইল যে, কাছারিতে একলা নিজের ঘরটিতে শুইয়া বাহিরের ধপধপে সাদা, ছায়াহীন, উদাস, নির্জন জ্যোৎস্না-রাত্রির দিকে চাহিয়া কেমন একটা অজানা আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, মনে হইত কলিকাতায় পালাই, এ-সব জায়গা ভাল নয়, এর জ্যোৎস্নাভরা নৈশ-প্রকৃতি রূপকথার রাক্ষসী রাণীর মত, তোমাকে ভুলাইয়া বেঘোরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিবে। যেন এ-সব স্থান মানুষের বাসভূমি নয় বটে, কিন্তু ভিন্ন লোকের রহস্যময়. অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য, বহুকাল ধরিয়া তাহারাই বসবাস করিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাদের সেই গোপন রাজ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই. সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইতে ছাড়িবে না।

## ২

প্রথম রাজু পাঁড়ের সঙ্গে যেদিন আলাপ হইল, সেদিনটা আমার বেশ মনে হয় আজও। কাছারিতে বসিয়া কাজ করিতেছি, একটি গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্রাহ্মণ আমাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তাহার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হইবে, কিন্তু তাহাকে বৃদ্ধ বলিলে ভুল করা হয়, কারণ তাহার মত সুগঠিত দেহ বাংলা দেশে অনেক যুবকেরও নাই। কপালে তিলক, গায়ে একখানি সাদা চাদর, হাতে একটা ছোট পুঁটুলি।

আমার প্রশ্নের উত্তরে লোকটি বলিল, সে বহুদূর হইতে আসিতেছে, এখানে কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ করিতে চায়। অতি গরীব, জমির সেলামী দিবার ক্ষমতা তাহার নাই, আমি সামান্য কিছু জমি স্টেটের সঙ্গে আধা বখরায় বন্দোবস্ত দিতে পারি কিনা ?

এক ধরণের মানুষ আছে, নিজের সম্বন্ধে বেশী কথা বলিতে জানে না, কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব দেখিলেই মনে হয় যে, সত্যই বড় দুঃখী। রাজু পাঁড়েকে দেখিয়া আমার মনে হইল এ অনেক আশা করিয়া ধরমপুর পরগণা হইতে এতদূর আসিয়াছে জমির লোভে, জমি না পাইলে কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া যাইবে বটে, কিন্তু বড়ই আশা-ভঙ্গ ও ভরসাহারা হইয়া ফিরিবে।

রাজুকে দু-বিঘা জমি লবটুলিয়া বইহারের উত্তরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বন্দোবস্ত দিলাম, একরকম বিনামূল্যেই। বলিয়া দিলাম, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সে আবাদ করুক, প্রথমে দু বৎসর কিছু লাগিবে না, তৃতীয় বৎসর হইতে চার আনা বিঘাপিছু খাজনা দিতে হইবে। তখনও বুঝি নাই কি অদ্ভুত ধরণের মানুষকে জমিদারীতে বসাইলাম!

রাজু আসিল ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে, জমি পাইয়া চলিয়াও গেল, তাহার কথা বহু কাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গেলাম। পর বৎসর শীতের শেষে হঠাৎ একদিন লবটুলিয়া কাছারি হইতে ফিরিতেছি, দেখি একটি গাছতলায় কে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া লোকটি বই মুড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি চিনিলাম, সেই রাজু পাঁড়ে। কিন্তু আর-বছর জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পর লোকটা একবারও কাছারিমুখো হইল না, এর মানে কি? বলিলাম—কি রাজু পাঁড়ে, তুমি আছ এখানে? আমি ভেবেছি তুমি জমি ছেড়ে-ছুড়ে চলে গিয়েছ বোধ হয়। চাষ কর নি?

দেখিলাম, ভয়ে রাজুর মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। আমতা আমতা করিয়া বলিল হ্যাঁ,

হুজুর,—চাষ কিছু—এবার হুজুর—

আমার কেমন রাগ হইয়া গেল। এই সব লোকের মুখ বেশ মিষ্টি, লোক ঠকাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া কাজ আদায় করিতে বেশ পটু। বলিলাম—দেড় বছর তোমার চুলের টিকি তো দেখা যায় নি। দিব্যি স্টেট্‌কে ঠকিয়ে ফসল ঘরে তুলছ—কাছারির ভাগ দেওয়ার যে কথা ছিল, তা বোধ হয় তোমার মনে নেই?

রাজু এবার বিস্ময়পূর্ণ বড় বড় চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ফসল হুজুর? কিন্তু সে তো ভাগ দেবার কথা আমার মনেই ওঠে নি—সে চীনা ঘাসের দানা—

কথাটা বিশ্বাস হইল না। বলিলাম—চীনার দানা খাচ্ছ এই ছ-মাস? অন্য ফসল নেই? কেন, মকাই কর নি?

—না হুজুর, বড্ড গজার জঙ্গল। একা মানুষ, ভরসা করে উঠতে পারি নি। পনের কাঠা জমি অতিকষ্টে তৈরি করেছি। আসুন না হুজুর, একবার দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়ে যান।

রাজুর পিছনে পিছনে গেলাম। এত ঘন জঙ্গল মাঝে মাঝে যে, ঘোড়ার ঢুকিতে কষ্ট হইতেছিল। খানিক দূর গিয়া জঙ্গলের মধ্যে গোলাকার পরিষ্কার জায়গা প্রায় বিঘাখানেক, মাঝখানে জংলী ঘাসেরই তৈরী ছোট নীচু দুখানা খুপরি। একখানাতে রাজু থাকে, আর একখানায় তার ক্ষেতের ফসল জমা আছে। থলে কি বস্তা নাই, মাটির নীচু মেঝেতে রাশীকৃত চীনা ঘাসের দানা স্তূপীকৃত করা। বলিলাম—রাজু, তুমি এত আলসে কুঁড়ে লোক তা তো জানতুম না, দেড় বছরের মধ্যে দু-বিঘের জঙ্গল কাটতে পারলে না?

রাজু ভয়ে ভয়ে বলিল—সময় হুজুর বড় কম যে!

—কেন, কি কর সারাদিন?

রাজু লাজুক মুখে চুপ করিয়া রহিল। রাজুর বাসস্থান খুপরির মধ্যে জিনিস-পত্রের বাহুল্য আদৌ নাই। একটা লোটা ছাড়া অন্য তৈজস চোখে পড়িল না। লোটাটা বড়গোছের, তাতেই ভাত রান্না হয়। ভাত নয়, চীনা ঘাসের বীজ। কাঁচা শালপাতায় ঢালিয়া সিদ্ধ চীনার বীজ খাইলে তৈজসপত্রের কি দরকার? জলের জন্য নিকটেই কুণ্ডী অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। আর কি চাই?

কিন্তু খুপরির একধারে সিঁদুরমাখানো ছোট কালো পাথরের রাধাকৃষ্ণমূর্তি দেখিয়া বুঝিলাম, রাজু ভক্তমানুষ! ক্ষুদ্র পাথরের বেদী বনের ফুলে সাজাইয়া রাখিয়াছে, বেদীর এক পাশে দু-একখানা পুঁথি ও বই। অর্থাৎ, তাহার সময় নাই মানে সে সারাদিন পূজা-আচ্চা লইয়াই বোধ হয় ব্যস্ত থাকে। চাষ করে কখন?

এই রাজুকে প্রথম বুঝিলাম।

রাজু পাঁড়ে হিন্দী লেখাপড়া ভাল জানে, সংস্কৃতও সামান্য জানে। তাও সে সর্বদা পড়ে না, মাঝে মাঝে অবসর সময়ে গাছতলায় কি একখানা হিন্দী বই খুলিয়া একটু বসে—অধিকাংশ সময় দূরের আকাশ ও পাহাড়ের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। একদিন দেখি, একটা ছোট খাতায় খাগের কলমে, বসিয়া কি লিখিতেছে। ব্যাপার কি? পাঁড়ে কবিতাও লেখে নাকি? কিন্তু সে এতই লাজুক, নীরব চাপা মানুষটি, তাহার নিকট হইতে কোনো কথা বাহির করিয়া লওয়া বড় কঠিন। নিজের সম্বন্ধে সে কিছুই বলিতে চায় না।

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—পাঁড়েজী, তোমার বাড়ীতে আর কে আছে?

—সবাই আছে হুজুর, আমার তিন ছেলে, দুই লেড়কী, বিধবা বহিন।

—তাদের চলে কিসে?

রাজু আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিল—ভগবান চালাচ্ছেন। তাদের দু'মুঠো খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব বলেই তো হুজুরের আশ্রয়ে এসে জমি নিয়েছি। জমিটা তৈরি করে ফেলতে পারলে—

—কিন্তু দু-বিঘে জমির ফসলে অত বড় একটা সংসার চলবে? আর তাই বা তুমি উঠে-পড়ে চেষ্টা করছ কই?

রাজু কথার জবাব প্রথমটা দিল না। তার পর বলিল—জীবনের সময়টাই বড় কম হুজুর। জঙ্গল কাটতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ে, বসে বসে ভাবি। এই যে বন-জঙ্গল দেখছেন, বড় ভাল জায়গা। ফুলের দল কত কাল থেকে ফুটছে আর পাখী ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন এখানে। টাকার লোভ, পাওনা-দেনার কাজ যেখানে চলে, সেখানকার বাতাস বিষিয়ে ওঠে। সেখানে ওঁরা থাকেন না। কাজেই এখানে দা-কুড়ুল হাতে করলেই দেবতারা এসে হাত থেকে কেড়ে নেন—কানে চুপি চুপি এমন কথা বলেন, যাতে বিষয়-সম্পত্তি থেকে মন অনেক দূরে চলে যায়।

দেখিলাম, রাজু কবি বটে দার্শনিকও বটে।

বলিলাম—কিন্তু রাজু, দেবতারা এমন কথা বলেন না যে, বাড়ীতে খরচ পাঠিও না, ছেলেপুলে উপোস করুক। ওসব কথাই নয় রাজু, কাজে লাগো। নইলে জমি কেড়ে নেব।

আরও কয়েক মাস গেল। রাজুর ওখানে মাঝে মাঝে যাই। ওকে কি ভালই লাগে। সেই গভীর নির্জন লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলে একা ছোট একটা ঘাসের খুপরিতে সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন বাস করে, এ আমি ভাবিয়া উঠিতে পারি না।

সত্যকার সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক রাজু। অন্য কোনো ফসল জন্মাইতে পারে নাই, চীনা ঘাসের দানা ছাড়া। সাত-আট মাস হাসিমুখে তাই খাইয়াই চালাইতেছে। কারও সঙ্গে দেখা হয় না, গল্পগুজবের লোক নাই, কিন্তু তাহাতে ওর কিছুই অসুবিধা হয় না, বেশ আছে। দুপুরে যখনই রাজুর জমির উপর দিয়া গিয়াছি, তখনই দুপুর রোদে ওকে জমিতে কাজ করিতে দেখিয়াছি। সন্ধ্যার দিকে ওকে প্রায়ই চুপ করিয়া হরীতকী গাছটার তলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি—কোনদিন হাতে খাতা থাকে, কোনদিন থাকে না।

একদিন বলিলাম—রাজু, আরও কিছু জমি তোমায় দিচ্ছি, বেশী করে চাষ কর, তোমার বাড়ীর লোক না খেয়ে মরবে যে! রাজু অতি শান্ত প্রকৃতির লোক, তাহাকে কোন কিছু বুঝাইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। জমি সে লইল বটে, কিন্তু পরবর্তী পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যে জমি পরিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিল না। সকালে উঠিয়া তাহার পূজা ও গীতাপাঠ করিতে বেলা দশটা বাজে, তার পর কাজে বার হয়। ঘণ্টা-দুই কাজ করিবার পরে রান্না-খাওয়া করে, সারা দুপুরটা খাটে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। তার পরই আপন মনে গাছতলায় চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবে। সন্ধ্যার পরে আবার পূজাপাঠ আছে।

সে-বছর রাজু কিছু মকাই করিল, নিজে না খাইয়া সেগুলি সব দেশে পাঠাইয়া দিল, বড় ছেলে আসিয়া লইয়া গেল। কাছারিতে ছেলেটা দেখা করিতে আসিয়াছিল,

তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম—বুড়ো বাপকে এই জঙ্গলে একা ফেলে রেখে বাড়ীতে বসে দিব্যি ফুর্তি করছ, লজ্জা করে না? নিজেরা রোজগারের চেষ্টা কর না কেন?

৩

সেবার শুয়োরমারি বস্তিতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হইল, কাছারিতে বসিয়া খবর পাইলাম। শুয়োরমারি আমাদের এলাকার মধ্যে নয়, এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূরে, কুশী ও কলবলিয়া নদীর ধারে। প্রতিদিন এত লোক মরিতে লাগিল যে, কুশী নদীর জলে সর্বদা মড়া ভাসিয়া যাইতেছে, দাহ করিবার ব্যবস্থা নাই। একদিন শুনিলাম, রাজু পাঁড়ে সেখানে চিকিৎসা করিতে বাহির হইয়াছে। রাজু পাঁড়ে যে চিকিৎসক তাহা জানিতাম না। তবে আমি কিছুদিন হোমিওপ্যাথি ওষুধ নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম বটে, ভাবিলাম এই সব ডাক্তার-কবিরাজশূন্য স্থানে দেখি যদি কিছু উপকার করিতে পারি। কাছারি হইতে আমার সঙ্গে আরও অনেকে গেল। গ্রামে পোঁছিয়া রাজু পাঁড়ের সঙ্গে দেখা হইল। সে একটা বাটুয়াতে শিকড়-বাকড় জড়ি-বুটি লইয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী রোগী দেখিয়া বেড়াইতেছে। আমায় নমস্কার করিয়া বলিল—হুজুর, আপনার বড্ড দয়া, আপনি এসেছেন, এবার লোকগুলো যদি বাঁচে। এমন ভাবটা দেখাইল যেন আমি জেলার সিবিল সার্জন কিংবা ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী। সে-ই আমাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে রোগীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইল।

রাজু ওষুধ দেয়, সবই দেখিলাম ধারে। সারিয়া উঠিলে দাম দিবে এই নাকি কড়াব হইয়াছে। কি ভয়ানক দারিদ্র্যের মূর্তি কুটীরে কুটীরে। সবই খোলার কিংবা খড়ের বাড়ী, ছোট্ট ছোট্ট ঘর, জানালা নাই, আলো-বাতাস ঢোকে না কোনো ঘরে। প্রায় সব ঘরেই দু-একটি রোগী, ঘরের মেঝেতে ময়লা বিছানায় শুইয়া। ডাক্তার নাই, ওষুধ নাই, পথ্য নাই। অবশ্য রাজু সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে, না ডাকিলেও সব রোগীর কাছে গিয়া তাহার জড়ি-বুটির ওষুধ খাওয়াইয়াছে, একটা ছোট ছেলের রোগশয্যার পাশে বসিয়া কাল নাকি সারা রাত সেবাও করিয়াছে। কিন্তু মড়কের তাহাতে কিছুমাত্র উপশম দেখা যাইতেছে না, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে।

রাজু আমায় ডাকিয়া একটা বাড়ীতে লইয়া গেল। একখানা মাত্র খড়ের ঘর, মেঝেতে রোগী তালপাতার চেটাইয়ে শুইয়া, বয়েস পঞ্চাশের কম নয়। সতের-আঠারো বছরের একটি মেয়ে দোরের গোড়ায় বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। রাজু তাহাকে ভরসা দিয়া বলিল—কাঁদিস নে বেটি, হুজুর এসেছেন, আর ভয় নেই, রোগ সেরে যাবে।

বড়ই লজ্জিত হইলাম নিজের অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া। জিজ্ঞাসা করিলাম—মেয়েটি বুঝি রোগীর মেয়ে?

রাজু বলিল—না হুজুর, ওর বৌ। কেউ নেই সংসারে মেয়েটার, বিধবা মা ছিল, বিয়ে দিয়ে মারা গিয়েছে। একে বাঁচান হুজুর, নইলে মেয়েটা পথে বসবে।

রাজুর কথার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছি এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়িল রোগীর শিয়রের দিকে দেওয়ালে মেঝে থেকে হাত তিনেক উঁচুতে একটা কাঠের তাকের প্রতি। দেখি তাকের উপর একটা আঢাকা পাথরের খোরায় দুটি পান্তা ভাত। ভাতের উপর দু-দশটা মাছি বসিয়া আছে। কি সর্বনাশ! ভীষণ এশিয়াটিক কলেরার রোগী ঘরে, আর

রোগীর নিকট হইতে তিন হাতের মধ্যে ঢাকাবিহীন খোরায় ভাত!

সারাদিন রোগীর সেবা করার পরে দরিদ্র ক্ষুধার্ত বালিকা হয়তো পাথরের খোরাটি পাড়িয়া পান্তা ভাত দুটি নুন লঙ্কা দিয়া আগ্রহের সহিত খাইতে বসিবে। বিষাক্ত অন্ন, যার প্রতি গ্রাসে নিষ্ঠুর মৃত্যুর বীজ। বালিকার সরল অশ্রুভরা চোখ দুটির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। রাজুকে বলিলাম—এ ভাত ফেলে দিতে বল ওকে। এ-ঘরে খাবার রাখে!

মেয়েটি ভাত ফেলিয়া দিবার প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিল। ভাত ফেলিয়া দিবে কেন? তবে সে খাইবে কি? ওঝাজীদের বাড়ী থেকে কাল রাতে ঐ ভাত দুটি তাহাকে খাইতে দিয়া গিয়াছিল।

আমার মনে পড়িল ভাত এ-দেশে সুখাদ্য বলিয়া গণ্য, আমাদের দেশে যেমন লুচি কি পোলাও। কিন্তু একটু কড়া সুরেই বলিলাম—উঠে এখুনি ভাত ফেলে দাও আগে।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া খোরার ভাত ফেলিয়া দিল।

তাহার স্বামীকে কিছুতেই বাঁচানো গেল না। সন্ধ্যার পরেই বৃদ্ধ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মেয়েটির কি কান্না! রাজুও সেই সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল।

আর একটি বাড়ীতে রাজু আমায় লইয়া গেল। সেটা রাজুর এক দূরসম্পর্কীয় শালার বাড়ী। এখানে প্রথম আসিয়া এই বাড়ীতেই রাজু উঠিয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া এখানেই করিত। এখানে মা ও ছেলের একসঙ্গে কলেরা, পাশাপাশি ঘরে দুই রোগী থাকে, এ উহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল, ও ইহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। সাত-আট বছরের ছোট ছেলে।

ছেলে প্রথমে মারা গেল। মাকে জানিতে দেওয়া হইল না। আমার হোমিওপ্যাথি ঔষধে মায়ের অবস্থা ভাল হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল ক্রমশ। মা কেবলই ছেলের খবর নেয়, ও-ঘরে ছেলের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? কেমন আছে সে?

আমরা বলি—তাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে—ঘুমোচ্ছে।

চুপি চুপি ছেলের মৃতদেহ ঘর হইতে বাহির করা হইল।

গ্রামের লোক স্বাস্থ্যের নিয়ম একেবারে জানে না। একটি মাত্র পুকুর, সেই পুকুরেই কাপড় কাচে, সেখানেই স্নান করে। স্নান করা আর জল পান করা যে একই কথা ইহা কিছুতেই তাহাদের বুঝাইতে পারিলাম না। কত লোক কত লোককে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে। একটা ঘরের মধ্যে একটা রোগী দেখিলাম, সে বাড়ীতে আর লোক নাই। রোগ-গ্রস্ত লোকটি ঐ বাড়ীর ঘর-জামাই, স্ত্রী আর-বছর মারা গিয়াছে। তত্রাচ লোকটার অবস্থা খারাপ বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, শ্বশুরবাড়ীর লোকে তাহাকে ফেলিয়া পলাইয়াছে। রাজু তাহাকে দিনরাত সেবা করিতে লাগিল। আমি ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। লোকটা শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া গেল। বুঝিলাম, শ্বশুরবাড়ীর অন্নদাস হিসাবে তাহার অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ আছে।

রাজুকে থলি বাহির করিয়া চিকিৎসার মোট উপার্জন গণনা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কত হল, রাজু?

রাজু গুনিয়া-গাঁথিয়া বলিল—এক টাকা তিন আনা।

ইহাতেই সে বেশ খুশী হইয়াছে। এদেশের লোক একটা পয়সার মুখ সহজে দেখিতে পায় না, এক টাকা তিন আনা উপার্জন এখানে কম নহে। রাজুকে আজ পনের-ষোল দিন,

ডাক্তারকে ডাক্তার, নার্সকে নার্স, কি খাটুনিটাই খাটিতে হইয়াছে।

অনেক রাত্রে গ্রামের মধ্যে কান্নাকাটির রব শোনা গেল। আবার একজন মরিল। রাত্রে ঘুম হইল না। গ্রামের অনেকেই ঘুমায় নাই. ঘরের সামনে বড় বড় কাঠ জ্বালাইয়া আগুন করিয়া গন্ধক পোড়াইতেছে ও আগুনের চারিধারে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছে। রোগের গল্প, মৃত্যুর খবর ছাড়া ইহাদের মুখে অন্য কোন কথা নাই—সকলেরই মুখে একটা ভয়, আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট। কাহার পালা আসে!

দুপুর রাত্রে সংবাদ পাইলাম. ওবেলার সেই সদ্য-বিধবা বালিকাটির কলেরা হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, তাহার স্বামীগৃহের পাশে এক বাড়ীর গোয়ালে সে শুইয়া আছে। ভয়ে নিজের ঘরে আসিয়া শুইতে পারে নাই, অথচ তাহাকে কেহ স্থান দেয় নাই সে কলেরার রোগী ছুঁইয়াছিল বলিয়া। গোয়ালের এক পাশে কয়েক আঁটি গমের বিচালির উপর পুরানো চট পাতা, তাতেই বালিকা শুইয়া ছটফট করিতেছে। আমি ও রাজু বহু চেষ্টা করিলাম হতভাগিনীকে বাঁচাইবার। একটি লণ্ঠন, একটু জল কোথাও পাওয়া যায় না। উঁকি মারিয়া কেহ দেখিতে পর্যন্ত আসিল না। আজকাল এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে যে, কলেরা কাহারও হইলে তাহার ত্রিসীমানায় লোক ঘেঁষে না।

রাত ফরসা হইল।

রাজুর খুব নাড়ীজ্ঞান, হাত দেখিয়া বলিল—এ হুজুর সুবিধে নয় গতিক।

আমি আর কি করিব, নিজে ডাক্তার নয়, স্যালাইন দিতে পারিলে হইত, এ অঞ্চলে তেমন ডাক্তার কোথাও নাই।

সকাল ন'টায় বালিকা মারা গেল।

আমরা না থাকিলে তাহার মৃতদেহ কেহ বাহির করিতে আসিত কি না সন্দেহ, আমাদের অনেক তম্বির ও অনুরোধে জন-দুই আহীর চাষী বাঁশ লইয়া আসিয়া মৃতদেহ বাঁশের সাহায্যে ঠেলিতে ঠেলিতে নদীর দিকে লইয়া গেল।

রাজু বলিল—বেঁচে গেল হুজুর। বিধবা বেওয়া অবস্থায়, তাতে ছেলেমানুষ, কি খেত, কে ওকে দেখত!

বলিলাম—তোমাদের দেশ বড় নিষ্ঠুর, রাজু।

আমার মনে কষ্ট রহিয়া গেল যে. আমি তাহাকে তাহার মুখের অত সাধের ভাত দুটি খাইতে দিই নাই।

## ৪

নিস্তব্ধ দুপুরে দূরে মহালিখারূপের পাহাড় ও জঙ্গল অপূর্ব রহস্যময় দেখাইত। কতবার ভাবিয়াছি একবার গিয়া পাহাড়টা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিব. কিন্তু সময় হইয়া উঠে নাই। শুনিতাম মহালিখারূপের পাহাড় দুর্গম বনাকীর্ণ, শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা, বন-মোরগ, দুষ্প্রাপ্য বন্য চন্দ্রমল্লিকা, বড় বড় ভাল্লুকঝোড়ে ভর্তি। পাহাড়ের উপরে জল নাই বলিয়া. বিশেষত ভীষণ শঙ্খচূড় সাপের ভয়ে, এ অঞ্চলের কাঠুরিয়ারাও কখনও ওখানে যায় না।

দিক্‌চক্রবালে দীর্ঘ নীলরেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। একে তো এদিকের সারা অঞ্চলটাই আজকাল আমার

কাছে পরীর দেশ বলিয়া মনে হয়, এর জ্যোৎস্না, এর বন-বনানী, এর নির্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর সৌন্দর্য, এর মানুষজন, পাখীর ডাক, বন্য ফুলশোভা—সবই মনে হয় অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কোথাও কখনও পাই নাই। তার উপরে বেশী করিয়া অদ্ভুত লাগে ওই মহালিখারূপের শৈলমালা ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা। কি রূপলোক যে ইহারা ফুটাইয়া তোলে দুপুরে, বৈকালে, জ্যোৎস্নারাত্রে—কি উদাস চিন্তার সৃষ্টি করে মনে!

একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম। নমাইল ঘোড়ায় গিয়া দুই দিকের দুই শৈল শ্রেণীর মাঝের পথ ধরিয়া চলি। দুই দিকের শৈলসানু বনে ভরা, পথের ধারে দুই দিকের বিচিত্র ঘন বন-ঝোপের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, কখনও উঁচু-নীচু, মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্বত্য ঝরণা উপলাস্তৃত পথে বহিয়া চলিয়াছে, বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই, কারণ তখন শরৎকাল, চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয় কিন্তু কি অজস্র বন্য শেফালিবৃক্ষ বনের সর্বত্র, ফুলের খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে বৃক্ষতলে, শিলাখণ্ডে, ঝরণার উপলাকীর্ণ তীরে। আরও কত কি বিচিত্র বন্যপুষ্প ফুটিয়াছে বর্ষাশেষে, পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বন, অর্জুন ও পিয়াল, নানাজাতীয় লতা ও অর্কিডের ফুল—বহুপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ একত্র মিলিত হইয়া মৌমাছিদের মত মানুষকেও নেশায় মাতাল করিয়া তুলিতেছে।

এতদিন এখানে আছি, এ সৌন্দর্যভূমি আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। মহালিখারূপের জঙ্গল ও পাহাড়কে দূর হইতে ভয় করিয়া আসিয়াছি, বাঘ আছে, সাপ আছে, ভালুকের নাকি লেখাজোখা নাই—এ পর্যন্ত তো একটা ভালুকঝোড় কোথাও দেখিলাম না। লোকে যতটা বাড়াইয়া বলে, ততটা নয়।

ক্রমে পথটার দু-ধারে বন ঘনাইয়া পথটাকে যেন দু-দিক হইতে চাপিয়া ধরিল। বড় বড় গাছেব ডালপালা পথের উপর চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করিল। ঘনসন্নিবিষ্ট কালো কালো গাছের গুঁড়ি, তাদের তলায় কেবলই নানাজাতীয় ফার্ণ, কোথাও বড় গাছেরই চারা। সামনে চাহিয়া দেখিলাম পথটা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে, বন আরও কৃষ্ণায়মান, সামনে একটা উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া, তাহার অনাবৃত শিখরদেশের অল্প নীচেই যে-সব বন্য-পাদপ, এত নীচু হইতে সেগুলি দেখাইতেছে যেন ছোট ছোট শেওড়া গাছের ঝোপ। অপূর্ব, গম্ভীর শোভা এই জায়গাটায়। পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপরে অনেক দূর উঠিলাম, আবার পথটা নামিয়া গড়াইয়া গিয়াছে, কিছুদূর নামিয়া আসিয়া একটা পিয়ালতলায় ঘোড়া বাঁধিয়া শিলাখণ্ডে বসিলাম—উদ্দেশ্য, শ্রান্ত অশ্বকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া।

সেই উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া হঠাৎ কখন বামদিকে গিযা পড়িয়াছে ; পার্বত্য অঞ্চলের এই মজাব ব্যাপার কতবার লক্ষ্য করিয়াছি, কোথা দিয়া কোনটা ঘুরিয়া গিয়া আধ রশি পথের ব্যবধানে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যের সৃষ্টি করে, এই যাহাকে ভাবিতেছি খাড়া উত্তরে অবস্থিত, হঠাং দু-কদম যাইতে-না-যাইতে সেটা কখন দেখি পশ্চিমে ঘুরিযা দাঁড়াইয়াছে।

চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝরণার কলমর্মর সেই শৈলমালাবেষ্টিত বনানীর গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চাবিধারেই উঁচু উঁচু শৈলচূড়া, তাদের মাথায় শরতের নীল আকাশ। কতকাল

হইতে এই বন পাহাড় এই এক রকমই আছে। সুদূর অতীতের আর্যেরা খাইবার গিরি-বর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখনও এই রকমই ছিল, বুদ্ধদেব নববিবাহিতা তরুণী পত্নীকে ছাড়িয়া যে-রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেন, সেই অতীত রাত্রিতে এই গিরিচূড়া গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকে আজকালের মতই হাসিত, তমসাতীরের পর্ণকুটীরে কবি বাল্মীকি একমনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী, তমসার কালো জলে রক্তমেঘস্তূপের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, আশ্রমমৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে, সেদিনটিতেও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙা আলোয় মহালিখারূপের শৈলচূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, আজ আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে। সেই কতকাল আগে যেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরোহণ করেন, গ্রীক্‌রাজ হেলিওডোরাস্ গরুড়ধ্বজ-স্তম্ভ নির্মাণ করেন : রাজকন্যা সংযুক্তা যেদিন স্বয়ংম্বর-সভায় পৃথ্বীরাজের মূর্তির গলায় মাল্যদান করেন ; সামুগড়ের যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে-রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে দিল্লী পলাইলেন ; চৈতন্যদেব যেদিন শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্তন করেন ; যেদিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল—মহালিখারূপে ঐ শৈলচূড়া, এই বনানী ঠিক এমনি ছিল। তখন কাহারা বাস করিত এই সব জঙ্গলে ? জঙ্গলের অনতিদূরে একটা গ্রামে দেখিয়া আসিয়া-ছিলাম কয়েকখানি মাত্র খড়ের ঘর আছে, মহুয়াবীজ ভাঙিয়া তৈল বাহির করিবার জন্য দু-খণ্ড কাঠের তৈরি একটা ঢেঁকির মত কি আছে, আর এক বুড়ীকে দেখিয়াছিলাম, তাহার বয়স আশী-নব্বুই হইবে, শনের-নুড়ি চুল, গায়ে খড়ি উড়িতেছে, রৌদ্রে বসিয়া বোধ করি মাথার উকুন বাছিতেছিল—ভারতচন্দ্রের জরতীবেশধারিণী অন্নপূর্ণার মত। এখানে বসিয়া সেই বুড়িটার কথা মনে পড়িল—এ অঞ্চলের বন্য সভ্যতার প্রতীক ওই প্রাচীন বৃদ্ধা—পূর্বপুরুষেরা এই বনজঙ্গলে বহু সহস্র বছর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। যীশুখ্রীষ্ট যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেদিনও উহারা মহুয়াবীজ ভাঙিয়া যেরূপ তৈল বাহির করিত, আজ সকালেও সেইরূপ করিয়াছে। হাজার হাজার বছর ধরিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অতীতের ঘন কুজ্ঝটিকায়, উহারা আজও সাতনলি ও আঠাকাঠি দিয়া সেইরূপই পাখী শিকার করিতেছে—ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে উহাদের চিন্তাধারা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। ঐ বুড়ির দৈনন্দিন চিন্তাধারা কি, জানিবার জন্য আমি আমার এক বছরের উপার্জন দিতে প্রস্তুত আছি।

বুঝি না কেন এক-এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কী বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাহারা যত দিন যায় তত উন্নতি করে—আবার অন্য জাতি হাজার বছর ধরিয়াও সেই একস্থানে স্থাণুবৎ নিশ্চল হইযা থাকে কেন ? বর্বর আর্যজাতি চার-পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চরক-সুশ্রুত লিখিল, দেশ জয় করিল, সাম্রাজ্য পত্তন করিল, ভেনাস দ্য মিলোর মূর্তি, পার্থেনন, তাজমহল, কোলোঁ ক্যাথিড্রাল গড়িল, দরবাড়ী কানাড়া ও ফিফ্‌থ্ সিম্‌ফোনির সৃষ্টি করিল—এরোপ্লেন, জাহাজ, রেলগাড়ী, বেতার, বিদ্যুৎ আবিষ্কার করিল—অথচ পাপুয়া, নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা আমাদের দেশের ওই মুণ্ডা, কোল, নাগা, কুকিগণ যেখানে সেখানেই কেন রহিয়াছে এই পাঁচ হাজার বছর ?

অতীত কোন দিনে, এই যেখানে বসিয়া আছি, এখানে ছিল মহাসমুদ্র—প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্বিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে—

এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিলাম।

পুরা যতঃ স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্।

এই বালু-প্রস্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্মৃত অতীতের মহাসমুদ্র বিক্ষুব্ধ ঊর্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সে চিহ্ন—ভূতত্ত্ববিদের চোখে ধরা পড়ে। মানুষ তখন ছিল না, এ ধরণের গাছপালাও ছিল না, যে ধরণের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথরের বুকে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে, যে-কোনো মিউজিয়মে গেলে দেখা যায়।

বৈকালের রোদ রাঙা হইয়া আসিয়াছে মহালিখারূপ পাহাড়ের মাথায়। শেফালিবনের গন্ধভরা বাতাসে হেমন্তের হিমের ঈষৎ আমেজ, আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হইবে না, সম্মুখে কৃষ্ণা-একাদশীর অন্ধকার রাত্রি. বনমধ্যে কোথায় একদল শেয়াল ডাকিয়া উঠিল। ভালুক বা বাঘ পথ না আটকায়।

ফিরিবার পথে এইদিন প্রথম বন্য ময়ূর দেখিলাম বনান্তস্থলীতে শিলাখণ্ডের উপর। একজোড়া ছিল, আমার ঘোড়া দেখিয়া ভয় পাইয়া ময়ূরটা উড়িয়া গেল, তাহার সঙ্গিনী কিন্তু নড়িল না। বাঘের ভয়ে আমার তখন দেখিবার অবকাশ ছিল না, তবু একবার সেটার সামনে থমকিয়া দাঁড়াইলাম। বন্য ময়ূর কখনও দেখি নাই, লোকে বলিত এ অঞ্চলে ময়ূর আছে, আমি বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু বেশীক্ষণ বিলম্ব করিতে ভরসা হইল না, কি জানি মহালিখারূপের বাঘের গুজবটাও যদি এ রকম সত্য হইয়া যায়!

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### ১

দেশের জন্য মন কেমন করা একটি অতি চমৎকার অনুভূতি। যারা চিরকাল এক জায়গায় কাটায়, স্বগ্রাম ও তাহার নিকটবর্তী স্থান ছাড়িয়া নড়ে না—তাহারা জানে না ইহার বৈচিত্র্য। দূরপ্রবাসে আত্মীয়-স্বজনশূন্য স্থানে দীর্ঘদিন যে বাস করিয়াছে. সে জানে বাংলা দেশের জন্য, বাঙালীর জন্য, নিজের গ্রামের জন্য, দেশের প্রিয় আত্মীয়স্বজনের জন্য মন কি রকম হু-হু করে, অতি তুচ্ছ পুরাতন ঘটনাও তখন অপূর্ব বলিয়া মনে হয়—মনে হয় যাহা হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর তাহা হইবার নহে—পৃথিবী উদাস হইয়া যায়, বাংলা দেশের প্রত্যেক জিনিসটা অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে।

এখানে বছরের পর বছর কাটাইয়া আমারও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। কতবার সদরে ছুটির জন্য চিঠি লিখিব ভাবিয়াছি. কিন্তু কাজ এত বেশী সব সময়েই হাতে আছে যে, ছুটি চাহিতে সংকোচ বোধ হয়। অথচ এই জনশূন্য পাহাড়-জঙ্গলে, বাঘ ভালুক নীলগাইয়ের দেশে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একা কাটানো যে কি কষ্ট! প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে এক-এক সময়. বাংলা দেশ ভুলিয়া গিয়াছি, কত কাল দুর্গোৎসব দেখি নাই, চড়কের ঢাক শুনি নাই, দেবালয়ের ধুনাগুগ্গুলের সৌরভ পাই নাই, বৈশাখী প্রভাতে পাখীর কলকূজন উপভোগ করি নাই—বাংলার গৃহস্থালির সে শান্ত পূত ঘরকন্না, জলচৌকিতে পিতল-কাঁসার তৈজসপত্র. পিঁড়িতে আলপনা, কুলুঙ্গীতে লক্ষ্মীর কড়ির চুপড়ি—সে সব যেন বিস্মৃত অতীত এক জীবন-স্বপ্ন!

শীত গিয়া যখন বসন্ত পড়িয়াছে তখন আমার এই ভাবটা অত্যন্ত বেশী বাড়িল।

সেই অবস্থায় ঘোড়ায় চড়িয়া সরস্বতী কুণ্ডীর ওদিকে বেড়াইতে গেলাম। একটা নীচু উপত্যকায় ঘোড়া হইতে নামিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। আমার চারিদিক ঘিরিয়া উঁচু মাটির পাড়, তাহার উপর দীর্ঘ দীর্ঘ কাশ ও বনঝাউয়ের ঘন জঙ্গল। ঠিক আমার মাথার উপরে খানিকটা নীল আকাশ। একটা কণ্টকময় গাছে বেগুনী রঙের ঝাড় ঝাড় ফুল ফুটিয়াছে, বিলাতী কর্ণফ্লাওয়ার ফুলের মত দেখিতে। একটা ফুলের বিশেষ কোনো শোভা নাই, অজস্র ফুল একত্র দলবদ্ধ হইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া দেখাইতেছে ঠিক বেগুনী রঙের একখানি শাড়ীর মত। বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন অর্ধশুষ্ক কাশ-জঙ্গলের তলায় ইহারা খানিকটা স্থানে বসন্তোৎসবে মাতিয়াছে—ইহাদের উপরে প্রবীণ, বিরাট বনঝাউয়ের স্তব্ধ রুক্ষ অরণ্য এদের ছেলেমানুষিকে নিতান্ত অবজ্ঞা ও উপেক্ষার চোখে দেখিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রবীণতার ধৈর্যে তাহা সহ্য করিতেছে। সেই বেগুনী রঙের জংলী ফুল-গুলিই আমার কানে শুনাইয়া দিল বসন্তের আগমন-বাণী। বাতাবী লেবুর ফুল নয়, ঘেঁটুফুল নয়, আম্রমুকুল নয়, কামিনীফুল নয়, রক্তপলাশ বা শিমুল নয়, কি একটা নামগোত্রহীন রূপহীন নগণ্য জংলী কাঁটাগাছের ফুল। আমার কাছে কিন্তু তাহাই কাননভরা বনভরা বসন্তের কুসুমরাজির প্রতীক হইয়া দেখা দিল। কতক্ষণ সেখানে এক-মনে দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাংলা দেশের ছেলে আমি, কতকগুলি জংলী কাঁটার ফুল যে ডালি সাজাইয়া বসন্তের মান রাখিয়াছে এ দৃশ্য আমার কাছে নূতন। কিন্তু কি গম্ভীর শোভা উঁচু ডাঙার উপরকার অরণ্যের! কি ধ্যানস্তিমিত, উদাসীন, বিলাসহীন, সন্ন্যাসীর মত রুক্ষ বেশ তার, অথচ কি বিরাট! সেই অর্ধশুষ্ক, পুষ্পপত্রহীন বনের নিস্পৃহ আত্মার সহিত ও নিম্নের এই বন্য, বর্বর, তরুণদের বসন্তোৎসবের সকল নিরাড়ম্বর প্রচেষ্টার উচ্ছ্বসিত আনন্দের সহিত আমার মন এক হইয়া গেল।

সে আমার জীবনের এক পরম বিচিত্র মুহূর্ত। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি, দু-একটা নক্ষত্র উঠিল মাথার উপরকার সেই নীল আকাশের ফালিটুকুতে. এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া দেখি, আমীন পূরণচাঁদ নাড়া বইহারের পশ্চিম সীমানার জরীপের কাজ শেষ করিয়া কাছারি ফিরিতেছে। আমায় দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া বলিল—হুজুর এখানে? তাহাকে বলিলাম, বেড়াইতে আসিয়াছি।

সে বলিল—একা এখানে থাকবেন না সন্ধ্যাবেলা, চলুন কাছারিতে। জায়গাটা ভাল নয়, আমার টিণ্ডেল স্বচক্ষে দেখেছে হুজুর। খুব বড় বাঘ, ওধারের ওই কাশের জঙ্গলে—আসুন, হুজুর।

পিছনে অনেক দূরে পূরণচাঁদের টিণ্ডেল গান ধরিয়াছে:—

দয়া হোই জী—

সেই দিন হইতে ঐ কাঁটার ফুল দেখিলেই আমার মন হু-হু করিয়া উঠিত বাংলা দেশের জন্য। আর ঠিক কি পূরণচাঁদের টিণ্ডেল ছটুলাল প্রতি সন্ধ্যায় নিজের ঘরে রুটি সেঁকিতে সেঁকিতে ঐ গানই গাহিবে—

দয়া হোই জী—

ভাবিতাম, আসন্ন ফাল্গুন-বেলায় আম্রবউলের গন্ধভরা ছায়ায় শিমুলফুলফোটা নদী-চরের এপারে দাঁড়াইয়া কোকিলের কূজন শুনিবার সুযোগ এ জীবনে বুঝি আর মিলিবে না, এই বনেই বেঘোরে বাঘ বা বন্যমহিষের হাতে কোন্‌দিন প্রাণ হারাইতে হইবে।

বনঝাউ-বন তেমনই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, দূরে বনলীন দিগ্বলয় তেমনই

ধূসর, উদাসীন দেখাইত।

এমনি এক দেশের-জন্য-মন-কেমন-করা দিনে রাসবিহারী সিংএর বাড়ী হইতে হোলির নিমন্ত্রণ পাইলাম। রাসবিহারী সিং এ অঞ্চলের দুর্দান্ত মহাজন, জাতিতে রাজপুত, কারো নদীর তীরবর্তী গবর্ণমেণ্ট খাসমহালের প্রজা। তাহার গ্রাম কাছারি হইতে বারো-চৌদ্দ মাইল উত্তরপূর্ব কোণে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের গায়ে।

নিমন্ত্রণ না রাখিলেও ভাল দেখায় না, কিন্তু রাসবিহারী সিং-এর বাড়ীতে যাইতে আমার নিতান্ত অনিচ্ছা। এ-অঞ্চলের যত গরীব গাঙ্গোতা জাতীয় প্রজার মহাজন হইল সে। গরীবকে মারিয়া তাদের রক্ত চুষিয়া নিজে বড়লোক হইয়াছে। তাহার কড়া শাসন ও অত্যাচারে কাহারও টুঁ শব্দটি করিবার যো নাই। বেতন বা জমিভোগী লাঠিয়াল পাইকের দল লাঠিহাতে সর্বদা ঘুরিতেছে, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনিয়া হাজির করিবে। যদি কোন রকমে রাসবিহারীর মনে হইল অমুক বিষয়ে অমুক তাহাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয় নাই বা তাহার প্রাপ্য সম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তাহা হইলে সে হতভাগ্যের আর রক্ষা নাই। রাসবিহারী সিং ছলে-বলে-কৌশলে তাহাকে জব্দ করিয়া রীতিমত শিক্ষা দিয়া ছাড়িবেই।

আমি আসিয়া দেখি রাসবিহারী সিং-ই এদেশের রাজা। তাহার কথায় গরীব গৃহস্থ প্রজা থরহরি কাঁপে, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকেও কিছু বলিতে সাহস করে না, কেননা রাসবিহারীর লাঠিয়াল-দল বিশেষ দুর্দান্ত, মারধর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাহারা বিশেষ পটু। পুলিসও নাকি রাসবিহারীর হাতে আছে। খাসমহালের সার্কেল অফিসার বা ম্যানেজার আসিয়া রাসবিহারী সিং-এর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় সে কাহাকে গ্রাহ্য করিবে এ জঙ্গলের মধ্যে?

আমার প্রজার উপর রাসবিহারী সিং প্রভুত্ব জাহির করিবার চেষ্টা করে—তাহাতে আমি বাধা দিই। আমি স্পষ্ট জানাইয়া দিই, তোমাদের নিজেদের এলাকার মধ্যে যা হয় করিও, কিন্তু আমার মহালের কোনও প্রজার কেশাগ্র স্পর্শ করিলে আমি তাহা সহ্য করিব না। গত বৎসর এই ব্যাপার লইয়া রাসবিহারী সিং-এর লাঠিয়াল-দলের সঙ্গে আমার কাছারির মুকুন্দি চাকলাদার ও গণপৎ তহশীলদারের সিপাহীদের একটা ক্ষুদ্র রকমের মারামারি হইয়া যায়। গত শ্রাবণ মাসেও আবার একটা গোলমাল বাধিয়াছিল। তাহাতে ব্যাপার পুলিস পর্যন্ত গড়ায়। পুলিসের দারোগা আসিয়া সেটা মিটাইয়া দেয়। তাহার পর কয়েক মাস যাবৎ রাসবিহারী সিং আমার মহালের প্রজাদের কিছু বলে না।

সেই রাসবিহারী সিং-এর নিকট হইতে হোলির নিমন্ত্রণ পাইয়া বিস্মিত হইলাম।

গণপৎ তহশীলদারকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসি। গণপৎ বলিল—কি জানি হুজুর, ও লোকটাকে বিশ্বাস নেই। ও সব পারে, কি মতলবে আপনাকে নিয়ে যেতে চায় কে জানে? আমার মতে না যাওয়াই ভাল।

আমার কিন্তু এ-মত মনঃপূত হইল না। হোলির নিমন্ত্রণে না গেলে রাসবিহারী অত্যন্ত অপমান বোধ করিবে। কারণ হোলির উৎসব রাজপুতদের একটি প্রধান উৎসব। হয়ত ভাবিতে পারে যে, ভয়ে আমি গেলাম না। তা যদি ভাবে, সে আমার পক্ষে ঘোর অপমানের বিষয়। ন', যাইতেই হইবে, যা থাকে অদৃষ্টে।

কাছারির প্রায় সকলেই আমায় নানা-মতে বুঝাইল। বৃদ্ধ মুনেশ্বর সিং বলিল—হুজুর, যাচ্ছেন বটে, কিন্তু আপনি এ-সব দেশের গতিক জানেন না। এখানে হট্ বলতে খুন করে বসে। জাহিল আদমির দেশ, লেখাপড়া-জানা লোক তো নেই। তা ছাড়া

রাসবিহারী অতি ভয়ানক মানুষ। কত খুন করেছে জীবনে, তার লেখাজোখা আছে হুজুর? ওর অসাধ্য কাজ নেই—খুন, ঘর-জ্বালানি, মিথ্যে মকদ্দমা খাড়া করা, ও সব-তাতেই মজবুত।

ও-সব কথা কানে না তুলিয়াই খাসমহালে রাসবিহারীর বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম। খোলায় ছাওয়া ইটের দেওয়ালওয়ালা ঘর, যেমন এ-দেশে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী হইয়া থাকে। বাড়ীর সামনে বারান্দা, তাতে কাঠের খুঁটি আলকাতরা-মাখানো। দুখানা দড়ির চারপাই, তাতে জনদুই লোক বসিয়া ফর্সিতে তামাক খাইতেছে।

আমার ঘোড়া উঠানের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতেই কোথা হইতে গুড়ুম গুড়ুম করিয়া দুটি বন্দুকের আওয়াজ হইল। রাসবিহারী সিং-এর লোক আমায় চেনে, তাহারা স্থানীয় রীতি অনুসারে বন্দুকের আওয়াজ দ্বারা আমাকে অভ্যর্থনা করিল, ইহা বুঝিলাম। কিন্তু গৃহস্বামী কোথায়? গৃহস্বামী না আসিয়া দাঁড়াইলে ঘোড়া হইতে নামিবার প্রথা নাই।

একটু পরে রাসবিহারী সিং-এর বড় ভাই রাসউল্লাস সিং আসিয়া বিনীত সুরে দুই হাত সামনে তুলিয়া বলিল—আইয়ে জনাব, গরীবখানামে তস্‌রিফ লেতে আইয়ে—। আমার মনের অস্বস্তি ঘুচিয়া গেল। রাজপুত জাতি অতিথি বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার অনিষ্ট করে না। কেহ আসিয়া অভ্যর্থনা না করিলে ঘোড়া হইতে না নামিয়া ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া দিতাম কাছারির দিকে।

উঠানে বহু লোক। ইহারা অধিকাংশই গাঙ্গোতা প্রজা। পরনের মলিন ছেঁড়া কাপড় আবীর ও রঙে ছোপানো, নিমন্ত্রণে বা বিনা-নিমন্ত্রণে মহাজনের বাড়ী হোলি খেলিতে আসিয়াছে।

আধ-ঘণ্টা পরে রাসবিহারী সিং আসিল এবং আমায় দেখিয়া যেন অবাক হইয়া গেল। অর্থাৎ আমি যে তাহার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইব, ইহা যেন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। যাহা হউক, রাসবিহারী আমায় যথেষ্ট খাতির-যত্ন করিল।

পাশের যে-ঘরে সে আমায় লইয়া গেল, সেটায় থাকিবার মধ্যে আছে খান-দুই-তিন সিসম কাঠের দেশী ছুতারের হাতে তৈরী খুব মোটা মোটা পায়া ও হাতলওয়ালা চেয়ার এবং একখানা কাঠের বেঞ্চি। দেওয়ালে সিন্দুর-চন্দন-লিপ্ত একটি গণেশমূর্তি।

একটু পরে একটি বালক একখানা বড় থালা লইয়া আমার সামনে ধরিল। তাহাতে কিছু আবীর, কিছু ফুল, কয়েকটি টাকা, গোটাকতক চিনির এলাচদানা ও মিছরিখণ্ড, একছড়া ফুলের মালা। রাসবিহারী সিং আমার কপালে কিছু আবীর মাখাইয়া দিল, আমিও তাহার কপালে আবীর দিলাম, ফুলের মালাগাছি তুলিয়া লইলাম। আর কি করিতে হইবে না বুঝিতে পারিয়া আনাড়ি ভাবে থালার দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া রাসবিহারী সিং বলিল—আপনার নজর, হুজুর। ও আপনাকে নিতে হবে। আমি পকেট হইতে আর কিছু টাকা বাহির করিয়া থালার টাকার সংগে মিশাইয়া বলিলাম—সকলকে মিষ্টিমুখ করাও এই দিয়ে।

রাসবিহারী সিং তার পর আমাকে তাহার ঐশ্বর্য দেখাইয়া লইয়া বেড়াইল। গোয়ালে প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টিটি গরু। সাত-আটটি ঘোড়া আস্তাবলে—দুটি ঘোড়া নাকি অতি সুন্দর নাচিতে পারে, একদিন নাচ আমায় সে দেখাইবে। হাতী নাই কিন্তু শীঘ্র কিনিবার ইচ্ছা আছে। এ-দেশে হাতী না থাকিলে সে সম্ভ্রান্ত লোক হয় না। আট-শ মণ গম

চাষে উৎপন্ন হয়, দু-বেলায় আশী-পঁচাশীজন লোক খায়, সে নিজে সকালে নাকি দেড় সের দুধ ও এক সের বিকানীর মিছরি স্নানান্তে জলযোগ করে। বাজারের সাধারণ মিছরি সে কখনও খায় না, বিকানীর মিছরি ছাড়া। মিছরি খাইয়া জলযোগ যে করে, সে এ-দেশে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়—বড়লোকের উহা আর একটি লক্ষণ।

তার পর রাসবিহারী একটা ঘরে আমায় লইয়া গেল, সে ঘরের আড়া হইতে দু-হাজার আড়াই-হাজার ছড়া ভুট্টা ঝুলিতেছে। এগুলি ভুট্টার বীজ, আগামী বৎসরের চাষের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। একখানা লোহার কড়া আমায় দেখাইল, লোহার চাদর গুল্-বসানো পেরেক দিয়া জুড়িয়া কড়াখানা তৈরি, তাতে দেড় মণ দুধ একসঙ্গে জ্বাল দেওয়া হয় প্রত্যহ। তাহার সংসারে প্রত্যহই ঐ পরিমাণ দুধ খরচ হয়। একটা ছোট ঘরে লাঠি, ঢাল, সড়কি, বর্শা, টাঙি, তলোয়ার এত অগুন্তি যে সেটাকে রীতিমত অস্ত্রাগার বলিলেও চলে।

রাসবিহারী সিং-এর ছয়জন ছেলে—জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বয়স ত্রিশের কম নয়। প্রথম চারটি ছেলে বাপের মতই দীর্ঘকায়, জোয়ান, গোঁফ ও গালপাট্টার বহর এরই মধ্যে বেশ। তাহার ছেলেদের ও তাহার অস্ত্রাগার দেখিয়া মনে হইল, দরিদ্র, অনাহারজীর্ণ গাঙ্গোতা প্রজাগণ যে ইহাদের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিবে ইহা আর বেশী কথা কি!

রাসবিহারী অত্যন্ত দাম্ভিক ও রাশভারী লোক। তাহার মানের জ্ঞানও বিলক্ষণ সজাগ। পান হইতে চুন খসিলেই রাসবিহারী সিং-এর মান যায়, সুতরাং তাহার সহিত ব্যবহার করিতে গেলে সর্বদা সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। গাঙ্গোতা প্রজাগণ তো সর্বদা তটস্থ অবস্থায় আছে, কি জানি কখন মনিবের মানের ত্রুটি ঘটে।

বর্বর প্রাচুর্য বলিতে যা বুঝায়, তাহার জাজ্বল্যমান চিত্র দেখিলাম রাসবিহারীর সংসারে। যথেষ্ট দুধ, যথেষ্ট গম, যথেষ্ট ভুট্টা, যথেষ্ট বিকানীর মিছরি, যথেষ্ট মান, যথেষ্ট লাঠিসোঁটা। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? ঘরে একখানা ভাল ছবি নাই, ভাল বই নাই, ভাল কৌচ-কেদারা দূরের কথা, ভাল তাকিয়া-বালিস-সাজানো বিছানাও নাই। দেওয়ালে চুনের দাগ, পানের দাগ, বাড়ীর পিছনের নর্দমা অতি কদর্য নোংরা জল ও আবর্জনায় বোজানো, গৃহ-স্থাপত্য অতি কুশ্রী। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না, নিজেদের পরিচ্ছদ ও জুতা অত্যন্ত মোটা ও আধময়লা। গত বৎসর বসন্ত রোগে বাড়ীর তিন-চারটি ছেলে-মেয়ে এক মাসের মধ্যে মারা গিয়াছে। এ বর্বর প্রাচুর্য তবে কোন্ কাজে লাগে? নিরীহ গাঙ্গোতা প্রজা ঠেঙাইয়া এ প্রাচুর্য অর্জন করার ফলে কাহার কি সুবিধা হইতেছে? অবশ্য রাসবিহারী সিং-এর মান বাড়িতেছে।

ভোজ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য দেখিয়া কিন্তু তাক্ লাগিল। এত কি একজনে খাইতে পারে? হাতীর কানের মত বৃহদাকার পুরী খান-পনের, খুরিতে নানা রকম তরকারি, দই, লাড্ডু, মালপোয়া, চাটনি, পাঁপর। আমার তো এ চার বেলার খোরাক। রাসবিহারী সিং নাকি একা এর দ্বিগুণ আহার্য উদরস্থ করিয়া থাকে একবারে।

আহার শেষ করিয়া যখন বাহিরে আসিলাম, তখন বেলা আর নাই। গাঙ্গোতা প্রজার দল উঠানে পাতা পাতিয়া দই ও চীনা ঘাসের ভাজা দানা মহা আনন্দে খাইতে বসিয়াছে। সকলের কাপড় লাল রঙে রঞ্জিত, সকলের মুখে হাসি। রাসবিহারীর ভাই গাঙ্গোতাদের খাওয়ানোর তদারক করিয়া বেড়াইতেছে। ভোজনের উপকরণ অতি সামান্য, তাতেই ওদের খুশি ধরে না।

অনেক দিন পরে এখানে সেই বালক-নর্তক ধাতুরিয়ার নাচ দেখিলাম। ধাতুরিয়া আর একটু বড় হইয়াছে, নাচেও আগের চেয়ে অনেক ভাল। হোলি-উৎসবে এখানে নাচিবার জন্য তাহাকে বায়না করিয়া আনা হইয়াছে।

ধাতুরিয়াকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম—চিনতে পার ধাতুরিয়া?

ধাতুরিয়া হাসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—জী হুজুর। আপনি ম্যানেজারবাবু। ভাল আছেন হুজুর?

ভারী সুন্দর হাসি ওর মুখে। আর ওকে দেখিলেই মনে কেমন একটা অনুকম্পা ও করুণার উদ্রেক হয়। সংসারে আপন বলিতে কেহ নাই, এই বয়সে নাচিয়া গাহিয়া পরের মন যোগাইয়া পয়সা রোজগার করিতে হয়, তাও রাসবিহারী সিং-এর মত ধনগর্বিত অরসিকদের গৃহ-প্রাঙ্গণে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে তো অর্ধেক রাত পর্যন্ত নাচতে গাইতে হবে, মজুরী কি পাবে?

ধাতুরিয়া বলিল—চার আনা পয়সা হুজুর, আর খেতে দেবে পেট ভরে।

—কি খেতে দেবে?

—মাড়া, দই, চিনি। লাড্ডুও দেবে বোধ হয়, আর-বছর তো দিয়েছিল।

আসন্ন ভোজ খাইবার লোভে ধাতুরিয়া খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম--সব জায়গায় কি এই মজুরী?

ধাতুরিয়া বলিল—না হুজুর, রাসবিহারী সিং বড়মানুষ, তাই চার আনা দেবে আর খেতেও দেবে। গাঙ্গোতাদের বাড়ী নাচলে দেয় দু আনা, খেতে দেয় না; তবে আধ সের মকাইয়ের ছাতু দেয়।

—এতে চলে?

—বাবু, নাচে কিছু হয় না, আগে হত। এখন লোকের কষ্ট, নাচ দেখবে কে? যখন নাচের বায়না না থাকে, ক্ষেতে-খামারে কাজ করি। আর-বছর গম কেটেছিলাম। কি করি হুজুর, খেতে তো হবে। এত শখ করে ছক্করবাজি নাচ শিখেছিলাম গয়া থেকে—কেউ দেখতে চায় না, ছক্করবাজি নাচের মজুরী বেশী।

ধাতুরিয়াকে আমি কাছারিতে নাচ দেখাইবার নিমন্ত্রণ করিলাম। ধাতুরিয়া শিল্পী লোক—সত্যিকার শিল্পীর নিস্পৃহতা ওর মধ্যে আছে।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না খুব ফুটিলে রাসবিহারী সিং-এর নিকট বিদায় লইলাম। রাসবিহারী সিং পুনরায় দুটি বন্দুকের আওয়াজ করিল, আমার ঘোড়া উহাদের উঠান পার হইবার সঙ্গে সঙ্গে, আমার সম্মানের জন্য।

দোল-পূর্ণিমার রাত্রি। উদার, মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে সাদা বালির রাস্তা জ্যোৎস্না-সম্পাতে চিক্‌চিক্ করিতেছে। দূরে একটা সিল্লী পাখী জ্যোৎস্নারাতে কোথায় ডাকিতেছে—যেন এই বিশাল, জনহীন প্রান্তরের মধ্যে পথহারা কোনো বিপন্ন নৈশ-পথিকের আকুল কণ্ঠস্বর!

পিছন হইতে কে ডাকিল—হুজুর, ম্যানেজারবাবু—

চাহিয়া দেখি ধাতুরিয়া আমার ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটিতেছে।

ঘোড়া থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ধাতুরিয়া?

ধাতুরিয়া হাঁপাইতেছিল। একটুখানি দাঁড়াইয়া দম লইয়া, একটু ইতস্তত করিয়া

পরিশেষে লাজুক মুখে বলিল—একটা কথা বলছিলাম, হুজুর—

তাহাকে সাহস দিবার সুরে বলিলাম—কি, বল না?

—হুজুরের দেশে কলকাতায় আমায় একবার নিয়ে যাবেন?

—কি করবে সেখানে গিয়ে?

—কখনও কলকাতায় যাই নি, শুনেছি সেখানে গাওনা-বাজনা নাচের বড় আদব। ভাল ভাল নাচ শিখেছিলাম, কিন্তু এখানে দেখবার লোক নেই, তাতে বড় দুঃখ হয়। ছক্করবাজি নাচটা না নেচে ভুলে যেতে বসেছি। উঃ, কি করেই ওই নাচটা শিখি! সে কথা শোনার জিনিস।

গ্রামটা ছাড়াইয়াছিলাম। ধু-ধু জ্যোৎস্নালোকিত মাঠ। ভাবে বোধ হইল ধাতুরিয়া লুকাইয়া আমার সহিত দেখা করিতে চায়, রাসবিহারী সিং টের পাইলে শাসন করিবে এই ভয়ে। নিকটেই মাঠের মধ্যে একটা ফুলে-ভর্তি শিমুল চারা। ধাতুরিয়ার কথা শুনিয়া শিমুল গাছটার তলায় ঘোড়া হইতে নামিয়া একখণ্ড পাথরের উপর বসিলাম। বলিলাম —বল তোমার গল্প।

—সবাই বলত গয়া জেলায় এক গ্রামে ভিটলদাস বলে একজন গুণীলোক আছে, সে ছক্করবাজি নাচের মস্ত ওস্তাদ। আমার ঝোঁক ছিল ছক্করবাজি যে করে হোক শিখবই। গয়া জেলাতে চলে গেলাম, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি আর ভিটলদাসের খোঁজ করি। কেউ বলতে পারে না। শেষকালে একদিন সন্ধ্যার সময় একটা আহীরদের মহিষের বাথানে আশ্রয় নিয়েছি, সেখানে শুনলাম ছক্করবাজি নাচ নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। অনেক রাত তখন, শীতও খুব। আমি বিচালি পেতে বাথানের এক কোণে শুয়ে ছিলাম, যেমন ছক্করবাজির কথা কানে যাওয়া অমনি লাফিয়ে উঠেছি। ওদের কাছে এসে বসি। কি খুশীই যে হলাম বাবুজী সে আর কি বলব! যেন একটা কি তালুক পেয়ে গিয়েছি: ওদের কাছে ভিটলদাসের সন্ধান পেলাম। ওখান থেকে সতের ক্রোশ রাস্তা তিনটাঙা বলে গ্রামে তাঁর বাড়ী।

বেশ লাগিতেছিল একজন তরুণ শিল্পীর শিল্পশিক্ষার আকুল আগ্রহের গল্প। বলিলাম, তার পর?

—হেঁটে সেখানে গেলাম। ভিটলদাস দেখি বুড়ো মানুষ। একমুখ সাদা দাড়ি। আমায় দেখে বললেন—কি চাই? আমি বললাম—আমি ছক্করবাজি নাচ শিখতে এসেছি। তিনি যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আজকালকার ছেলেরা এ পছন্দ করে? এ তো লোকে ভুলেই গিয়েছে। আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললাম—আমায় শেখাতে হবে, বহুদূর থেকে আসছি আপনার নাম শুনে। তাঁর চোখ দিয়ে জল এল। বললেন—আমার বংশে সাতপুরুষ ধরে এই নাচের চর্চা। কিন্তু আমার ছেলে নেই, বাইরের কেউ এসে শিখতেও চায় নি আমার এত বয়স হয়েছে, এর মধ্যে। আজ তুমি প্রথম এলে। আচ্ছা, তোমায় শেখাব।—তা বুঝলেন হুজুর, এত কষ্ট করে শেখা জিনিস। এখানে গাঙ্গো-তাদের দেখিয়ে কি করব? কলকাতায় গুণের আদর আছে। সেখানে নিয়ে যাবেন, হুজুর?

বলিলাম—আমার কাছারিতে একদিন এসো ধাতুরিয়া, এ-সম্বন্ধে কথা বলব।

ধাতুরিয়া আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

আমার মনে হইল উহার এত কষ্ট করিয়া শেখা গ্রাম্য নাচ কলিকাতায় কে-ই বা দেখিবে, আর ও বেচারী একা সেখানে কি-ই বা করিবে?

# অষ্টম পরিচ্ছেদ

## ১

প্রকৃতি তাঁর নিজের ভক্তদের যা দেন, তা অতি অমূল্য দান। অনেক দিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না। আর কি ঈর্ষার স্বভাব প্রকৃতিরাণীর— প্রকৃতিকে যখন চাহিব, তখন প্রকৃতিকে লইয়াই থাকিতে হইবে, অন্য কোনো দিকে মন দিয়াছি যদি, অভিমানিনী কিছুতেই তাঁর অবগুণ্ঠন খুলিবেন না।

কিন্তু অনন্যমনা হইয়া প্রকৃতিকে লইয়া ডুবিয়া থাকো, তাঁর সর্ববিধ আনন্দের বর, সৌন্দর্যের বর, অপূর্ব শান্তির বর তোমার উপর অজস্রধারে এত বর্ষিত হইবে, তুমি দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিবে, দিনরাত মোহিনী প্রকৃতিরাণী তোমাকে শতরূপে মুগ্ধ করিবেন, নূতন দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, মনের আয়ু বাড়াইয়া দিবেন, অমরলোকের আভাসে অমরত্বের প্রান্তে উপনীত করাইবেন।

কয়েক বারের কথা বলি। সে অমূল্য অনুভূতিরাজির কথা বলিতে গেলে লিখিয়া পাতার পর পাতা ফুরাইয়া যায়, কিন্তু তবু বলা শেষ হয় না, যা বলিতে চাহিতেছি তাহার অনেকখানিই বাকি থাকিয়া যায়। এসব শুনিবার লোকও সংখ্যায় অত্যন্ত কম, ক'জন মনে-প্রাণে প্রকৃতিকে ভালবাসে?

অরণ্য-প্রান্তরে লবটুলিয়ার মাঠে মাঠে দুধলি ঘাসের ফুল ফুটাইয়া জানাইয়া দেয় যে বসন্ত পড়িয়াছে। সে ফুলও বড় সুন্দর, দেখিতে নক্ষত্রের মত আকৃতি, রং হলদে, লম্বা লম্বা সরু লতার মত ঘাসের ডাঁটাটা অনেকখানি জমি জুড়িয়া মাটি আঁকড়াইয়া থাকে, নক্ষত্রাকৃতি হলদে ফুল ধরে তার গাঁটে গাঁটে। ভোরে মাঠ, পথের ধার সর্বত্র আলো করিয়া ফুটিয়া থাকিত—কিন্তু সূর্যের তেজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সব ফুল কুঁকড়াইয়া পুনরায় কুঁড়ির আকার ধারণ করিত—পরদিন সকালে আবার সেই কুঁড়িগুলিই দেখিতাম ফুটিয়া আছে।

রক্তপলাশের বাহার আছে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টে ও আমাদের সীমানার বাহিরের জঙ্গলে কিংবা মহালিখারূপের শৈলসানুপ্রদেশে। আমাদের মহাল হইতে সে-সব স্থান অনেক দূরে, ঘোড়ায় তিন-চার ঘণ্টা লাগে। সে-সব জায়গায় চৈত্রে শালমঞ্জরীর সুবাসে বাতাস মাতাইয়া রাখে, শিমুল বনে দিগন্তরেখা রাঙাইয়া দেয়, কিন্তু কোকিল, দোয়েল, বৌ-কথা-কও প্রভৃতি গায়ক পাখীরা ডাকে না, এ-সব জনহীন অরণ্য-প্রান্তরের যে ছন্ন-ছাড়া রূপ, বোধহয় তাহারা তাহা পছন্দ করে না।

এক-এক দিন বাংলা দেশে ফিরিবার জন্য মন হাঁপাইয়া উঠিত, বাংলা দেশের পল্লীর সে সুমধুর বসন্ত কল্পনায় দেখিতাম, মনে পড়িত বাঁধানো পুকুরঘাটে স্নানান্তে আর্দ্র-বস্ত্রে গমনরতা কোন তরুণী বধূর ছবি, মাঠের ধারে ফুলফোটা ঘেঁটুবন, বাতাবীলেবু ফুলের সুগন্ধে মোহময় ঘন ছায়া-ভরা অপরাহ্ণ। দেশকে কী ভাল করিয়াই চিনিলাম বিদেশে গিয়া! দেশের জন্য এই মনোবেদনা দেশে থাকিতে কখনও অনুভব করি নাই, জীবনে এ একটা বড় অনুভূতি, যে ইহার আস্বাদ না পাইল, সে হতভাগ্য একটা শ্রেষ্ঠ

অনুভূতির সহিত অপরিচিত রহিয়া গেল।

কিন্তু যে-কথাটা বার-বার নানা ভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোনো বারই ঠিকমত বুঝাইতে পারিতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছম-ছম-করানো সৌন্দর্যের দিকটা। না দেখিলে কি করিয়া বুঝাইব সে কী জিনিস!

জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তব্যাপী দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশের বনে নিস্তব্ধ অপরাহ্নে একা ঘোড়ার উপর বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে একটা নিস্পৃহ, উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশ-বিদেশের নর-নারীর বেদনার রূপে। সে যেন খুব উচ্চদরের নীরব সংগীত—নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তার লয়-সঙ্গতি।

সে-রূপ তাহার না দেখাই ভাল, যাহাকে ঘরদুয়ার বাঁধিয়া সংসার করিতে হইবে। প্রকৃতির সে মোহিনীরূপের মায়া মানুষকে ঘরছাড়া করে, উদাসীন ছন্নছাড়া ভবঘুরে হ্যারি জনস্টন, মার্কো পোলো, হাড্‌সন, শ্যাকল্‌টন করিয়া তোলে—গৃহস্থ সাজিয়া ঘরকন্না করিতে দেয় না—অসম্ভব তাহার পক্ষে ঘরকন্না করা একবার সে-ডাক যে শুনিয়াছে, সে অনবগুণ্ঠিতা মোহিনীকে একবার যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে একা আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, অন্ধকার প্রান্তরের অথবা ছায়াহীন ধূ-ধূ জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রির রূপ। তার সৌন্দর্যে পাগল হইতে হয়—একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না—আমার মনে হয় দুর্বলচিত্ত মানুষ যাহারা, তাহাদের পক্ষে সে-রূপ না দেখাই ভাল, সর্বনাশী রূপ সে, সকলের পক্ষে তার টাল সামলানো বড় কঠিন।

তবে একথাও ঠিক, প্রকৃতিকে সে-রূপে দেখাও ভাগ্যের ব্যাপার। এমন বিজন বিশাল উন্মুক্ত আরণ্য-প্রান্তর, শৈলমালা, বনঝাউ আর কাশের বন কোথায় যেখানে-সেখানে? তার সঙ্গে যোগ চাই গভীর নিশীথিনীর নীরবতার ও তার অন্ধকার বা জ্যোৎস্নার—এত যোগাযোগ সুলভ হইলে পৃথিবীতে কবি আর পাগলে দেশ ছাইয়া যাইত না?

একদিন প্রকৃতির সে-রূপ কিভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সে-ঘটনা বলি।

পূর্ণিয়া হইতে উকিলের 'তার' পাইলাম পরদিন সকাল দশটার মধ্যে আমায় সেখানে হাজির হইতে হইবে। অন্যথায় স্টেটের একটা বড় মোকদ্দমায় আমাদের হার সুনিশ্চিত।

আমাদের মহাল হইতে পূর্ণিয়া পঞ্চান্ন মাইল দূরে। রাত্রের ট্রেন মাত্র একখানি, যখন 'তার' হস্তগত হইল তখন সতের মাইল দূরবর্তী কাটারিয়া স্টেশনে গিয়া সে-ট্রেন ধরা অসম্ভব।

ঠিক হইল এখনই ঘোড়ায় রওনা হইতে হইবে।

কিন্তু পথ সুদীর্ঘ বটে, বিপদসঙ্কুলও বটে, বিশেষ করিয়া এই রাত্রিকালে, এই আরণ্য-অঞ্চলে। সুতরাং তহশীলদার সুজন সিং আমার সঙ্গে যাইবে ইহাও ঠিক হইল।

সন্ধ্যায় দুজনে ঘোড়া ছাড়িলাম। কাছারি ছাড়িয়া জঙ্গলে পড়িতেই কিছু পরে কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ উঠিল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় বন-প্রান্তর আরও অদ্ভুত দেখাইতেছে। পাশাপাশি দুজনে চলিয়াছি—আমি আর সুজন সিং। পথ কখনও উঁচু, কখনও নীচু,

সাদা বালির উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া চক্‌চক্‌ করিতেছে। ঝোপঝাপ মাঝে মাঝে, আর শুধু কাশ আর ঝাউবন চলিয়াছে, সুজন সিং গল্প করিতেছে। জ্যোৎস্না ক্রমেই ফুটিতেছে—বনজঙ্গল, বালুচর ক্রমশ স্পষ্টতর হইতেছে। বহুদূর পর্যন্ত নীচু জঙ্গলের শীর্ষদেশ একটানা সরল রেখায় চলিয়া গিয়াছে—যতদূর দৃষ্টি যায় ধু-ধু প্রান্তর একদিকে, অন্য দিকে জঙ্গল। বাঁ দিকে দূরে অনুচ্চ শৈলমালা। নির্জন, নীরব, মানুষের বসতি কুত্রাপি নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই, যেন অন্য কোন অজানা গ্রহের মধ্যে নির্জন বনপথে দুটি মাত্র প্রাণী আমরা।

এক জায়গায় সুজন সিং ঘোড়া থামাইল। ব্যাপার কি? পাশের জঙ্গল হইতে একটি ধাড়ী বন্যশূকর একদল ছানাপোনা লইয়া আমাদের পথ পার হইয়া বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকিতেছে। সুজন সিং বলিল—তবুও ভাল হুজুর, ভেবেছিলাম বুনো মহিষ। মোহনপুরা জঙ্গলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, বুনো মহিষের ভয় এখানে খুব। সেদিনও একজন লোক মারিয়াছে মহিষে।

আরও কিছুদূর গিয়া জ্যোৎস্নায় দূর হইতে কালোমত সত্যই কি একটা দেখা গেল।

সুজন বলিল—ঘোড়া ভয় পাবে হুজুর, ঘোড়া রুখুন।

শেষে দেখা গেল সেটা নড়েও না চড়েও না। একটু একটু করিয়া কাছে গিয়া দেখা গেল, সেটা একটা কাশের খুপরি। আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। মাঠ-ঘাট-বন, ধু-ধু জ্যোৎস্না-ভরা বিশ্ব—কি একটা সঙ্গীহারা পাখী আকাশের গায়ে কি বনের মধ্যে কোথায় ডাকিতেছে টি-টি-টি-টি—ঘোড়ার খুরে বড় বালি উঠিতেছে, ঘোড়া এক মুহূর্ত থামাইবার উপায় নাই—উড়াও, উড়াও—

অনেকক্ষণ একভাবে বসিয়া পিঠ টন টন করিতেছে, জিনের বসিবার জায়গাটা গরম হইয়া উঠিয়াছে, ঘোড়া ছাড়তোক ভাঙিয়া দুলকি চাল ধরিয়াছে, আমার ঘোড়াটা আবার বড্ড ভয় পায়, এজন্য সতর্কতার সঙ্গে সামনের পথে অনেক দূর পর্যন্ত নজর রাখিয়া চলিয়াছি—হঠাৎ থমকিয়া ঘোড়া দাঁড়াইয়া গেলে ঘোড়া হইতে ছিটকাইয়া পড়া অনিবার্য।

কাশের মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, রাস্তা বলিয়া কিছু নাই, এই কাশের ঝুঁটি দেখিয়া এই গভীর জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া লইতে হয়। একবার সুজন সিং বলিল—হুজুর, এ-পথটা যেন নয়, পথ ভুলেছি আমরা।

আমি সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিয়া ধ্রুবতারা ঠিক করিলাম—পূর্ণিয়া আমাদের মহাল হইতে খাড়া উত্তরে, তবে ঠিকই আছি, সুজনকে বুঝাইয়া বলিলাম।

সুজন বলিল—না হুজুর, কুশীনদীর খেয়া পেরুতে হবে যে, খেয়া পার হয়ে তবে সোজা উত্তরে যেতে হবে। এখন উত্তর-পূব কোণ কেটে বেরুতে হবে।

অবশেষে পথ মিলিল।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে—সে কি জ্যোৎস্না! কি রূপ রাত্রির! নির্জন বালুর চরে, দীর্ঘ বনঝাউয়ের জঙ্গলের পাশের পথে জ্যোৎস্না যাহারা কখনও দেখে নাই, তাহারা বুঝিবে না এ জ্যোৎস্নার কি চেহারা! এমন উন্মুক্ত আকাশ-তলে ছায়াহীন উদাস গভীর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রিতে, বন-পাহাড়-প্রান্তরের পথের জ্যোৎস্না, বালুচরের জ্যোৎস্না—ক'জন দেখিয়াছে? উঃ, সে কি ছুট! পাশাপাশি চলিতে চলিতে দুই ঘোড়াই হাঁপাইতেছে, শীতেও ঘাম দেখা দিয়াছে আমাদের গায়ে।

এক জায়গায় বনের মধ্যে একটা শিমুলগাছের তলায় আমরা ঘোড়া থামাইয়া একটু

বিশ্রাম করি, সামান্য মিনিট-দশেক। একটা ছোট নদী বহিয়া গিয়া অদূরে কুশীনদীর সঙ্গে মিশিয়াছে, শিমুলগাছটাতে ফুল ফুটিয়াছে, বনটা সেখানে চারিধার হইতে আসিয়া আমাদের এমন ঘিরিয়াছে যে, পথের চিহ্নমাত্র নাই, অথচ খাটো খাটো গাছপালার বন—শিমুলগাছটাই সেখানে খুব উঁচু—বনের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুজনেরই জল-পিপাসা পাইয়াছে দারুণ।

জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসে। অন্ধকার বনপথ, পশ্চিম দিগন্তের দূর শৈলমালার পিছনে শেষরাত্রির চন্দ্র ঢলিয়া পড়িয়াছে। ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসিল, পাখী-পাখালির শব্দ নাই কোন দিকে, শুধু ছায়া-ছায়া, অন্ধকার মাঠ, অন্ধকার বন। শেষরাত্রির বাতাস বেশ ঠান্ডা হইয়া উঠিল। ঘড়িতে রাত প্রায় চারটা। ভয় হয় শেষরাত্রের অন্ধকারে বুনো হাতীর দল সামনে না আসে! মধুবনীর জঙ্গলে এক পাল বুনো হাতীও আছে।

এবার আশে-পাশে ছোট ছোট পাহাড়, তার মধ্য দিয়া পথ, পাহাড়ের মাথায় নিষ্পত্র শুভ্রকান্ড গোলগোলি ফুলের গাছ, কোথাও রক্তপলাশের বন। শেষরাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারে বন-পাহাড় অদ্ভুত দেখায়। পূর্ব দিকে ফর্সা হইয়া আসিল—ভোরের হাওয়া বহিতেছে, পাখীর ডাক কানে গেল। ঘোড়ার সর্বাঙ্গ দিয়া দর-দর-ধারে ঘাম ছুটিতেছে, ছুট্ ছুট্, খুব ভাল ঘোড়া তাই এই পথে সমানে এত ছুটিতে পারে। সন্ধ্যায় কাছারি ছাড়িয়াছি—আর ভোর হইয়া গেল। সম্মুখে এখনও যেন পথের শেষ নাই, সেই একঘেয়ে বন, পাহাড়।

সামনের পাহাড়ের পিছন থেকে টকটকে লাল সিঁদুরের গোলার মত সূর্য উঠিতেছে। পথের ধারে এক গ্রামে ঘোড়া থামাইয়া কিছু দুধ কিনিয়া দুজনে খাইলাম। পরে আরো ঘণ্টা-দুই চলিয়াই পূর্ণিয়া শহর।

পূর্ণিয়ায় স্টেটের কাজ তো শেষ করিলাম, সে যেন নিতান্ত অন্যমনস্কতার সহিত, মন পড়িয়া রহিল পথের দিকে। আমার সঙ্গীর ইচ্ছা, কাজ শেষ করিয়াই বাহির হইয়া পড়ে—আমি তাহাকে বাধা দিলাম, জ্যোৎস্না-রাত্রে এতটা পথ অশ্বারোহণে যাইবার বিচিত্র সৌন্দর্যের পুনরাস্বাদনের লোভে।

গেলামও তাই। পরদিন চাঁদ একটু দেরিতে উঠিলেও ভোর পর্যন্ত জ্যোৎস্না পাওয়া গেল। আর কি সে জ্যোৎস্না! কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিতালোক চন্দ্রের জ্যোৎস্না বনে-পাহাড়ে যেন এক শান্ত, স্নিগ্ধ, অথচ এক আশ্চর্য রূপে অপরিচিত স্বপ্নজগতের রচনা করিয়াছে—সেই খাটো খাটো কাশ-জঙ্গল, সেই পাহাড়ের সানুদেশে পীতবর্ণ গোলগোলি ফুল, সেই উঁচু-নীচু পথ—সব মিলিয়া যেন কোন্ বহুদূরের নক্ষত্রলোক—মৃত্যুর পরে অজানা কোন্ অদৃশ্য লোকে অশরীরী হইয়া উড়িয়া চলিয়াছি—ভগবান বুদ্ধের সেই নির্বাণ-লোকে, যেখানে চন্দ্রের উদয় হয় না, অথচ অন্ধকারও নাই।

অনেক দিন পরে যখন এই মুক্ত জীবন ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ করি, তখন কলিকাতা শহরের ক্ষুদ্র গলির বাসাবাড়ীতে বসিয়া স্ত্রীর সেলাইয়ের কল চালনার শব্দ শুনিতে শুনিতে অবসর-দিনের দুপুরে কতবার এই রাত্রির কথা, এই অপূর্ব আনন্দের কথা, এই জ্যোৎস্নামাখা রহস্যময় বনশ্রীর কথা, শেষরাত্রের চাঁদডোবা অন্ধকারে পাহাড়ের উপর শুভ্রকান্ড গোলগোলি গাছের কথা, শুকনো কাশ-জঙ্গলের সোঁদা সোঁদা তাজা গন্ধের কথা ভাবিয়াছি—কতবার কল্পনায় আবার ঘোড়ায় চড়িয়া জ্যোৎস্নারাত্রে পূর্ণিয়া গিয়াছি।

২

চৈত্রমাসের মাঝামাঝি একদিন খবর পাইলাম সীতাপুর গ্রামে রাখালবাবু নামে একজন বাঙালী ডাক্তার ছিলেন, তিনি কাল রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছেন।

ইঁহার নাম পূর্বে কখনও শুনি নাই। তিনি যে ওখানে ছিলেন, তাহা জানিতাম না। শুনিলাম আজ বিশ-বাইশ বৎসর তিনি সেখানে ছিলেন। ও-অঞ্চলে তাঁহার পসার ছিল, ঘর-বাড়ীও নাকি করিয়াছিলেন ঐ গ্রামেই। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র সেখানেই থাকে।

এই অবাঙালীর দেশে একজন বাঙালী ভদ্রলোক মারা গিয়াছেন হঠাৎ, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের কি দশা হইতেছে, কে তাহাদের দেখাশুনা করিতেছে, তাঁহার সৎকার বা শ্রাদ্ধ-শান্তির কি ব্যবস্থা হইতেছে, এসব জানিবার জন্য মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম আমার প্রথম কর্তব্য হইতেছে সেখানে গিয়া সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারের খোঁজখবর লওয়া।

খবর লইয়া জানিলাম গ্রামটি এখান হইতে মাইল-কুড়ি দূরে, কড়ারী খাস-মহালের সীমানায়। বৈকালের দিকে সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখালবাবুর বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিলাম। দুখানা বড় বড় খোলার ঘর, খান-তিনেক ছোট ছোট ঘর। বাহিরে এ-দেশের ধরণে একখানা বসিবার ঘর, তার তিন দিকে দেওয়াল নাই। বাঙালীর বাড়ী বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় নাই, বসিবার ঘরে দড়ির চারপাই হইতে উঠানের হনুমান-ধ্বজাটি পর্যন্ত সব এদেশী।

আমার ডাকে একটি বারো-তের বছরের ছেলে বাহির হইয়া আসিল। আমায় ঠেঁট্ হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে খুঁজছেন?

তাহার চেহারা দেখিয়া মনে হয় না যে সে বাঙালীর ছেলে। মাথায় লম্বা টিকি, গলায় অবশ্য বর্তমানে কাচা—সবই বুঝিলাম, কিন্তু মুখের ভাব পর্যন্ত হিন্দুস্থানী বালকের মত কি করিয়া হয়?

আমার পরিচয় দিয়া বলিলাম—তোমাদের বাড়ীতে এখন বড় লোক কে আছেন, তাঁকে ডাক।

ছেলেটি বলিল, সে-ই বড় ছেলে। তার আর দুটি ছোট ছোট ভাই আছে। বাড়ীতে আর কোন অভিভাবক নাই।

বলিলাম—তোমার মায়ের সঙ্গে আমি একবার কথা কইতে চাই। জিজ্ঞেস করে এস।

খানিকটা পরে ছেলেটি আসিয়া আমায় বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। রাখালবাবুর স্ত্রীকে দেখিয়া মনে হইল বয়স অল্প, ত্রিশের মধ্যে, সদ্য-বিধবার বেশ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলিয়াছে। ঘরের আসবাবপত্র নিতান্ত দরিদ্রের গৃহস্থালির মত। এক দিকে একটা ছোট গোলা, ঘরের দাওয়ায় খান-দুই চারপাই, ছেঁড়া লেপ-কাঁথা, এদেশী পিতলের ঘয়লা, একটা গুড়গুড়ি, পুরনো টিনের তোরঙ্গ। বলিলাম—আমি বাঙালী, আপনার প্রতিবেশী। আমার কানে গেল রাখালবাবুর কথা, তাই এলাম। আমার এখানে একটা কর্তব্য আছে বলে মনে করি। আমার কোনো সাহায্য যদি দরকার হয়, নিঃসঙ্কোচে বলুন। রাখালবাবুর স্ত্রী কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বুঝাইয়া শান্ত করিয়া পুনরায় আমার আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। রাখালবাবুর স্ত্রী এবার আমার সামনে

বাহির হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—আপনি আমার দাদার মত, আমাদের এই ঘোর বিপদের সময় ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন।

ক্রমে কথায় কথায় জানা গেল, এই বাঙালী পরিবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও অসহায় এই ঘোর বিদেশে। রাখালবাবু গত এক বৎসরের উপর শয্যাগত ছিলেন। তাঁর চিকিৎসা ও সংসার-খরচে সঞ্চিত অর্থ সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—এখন এমন উপায় নাই যে তাঁর শ্রাদ্ধের যোগাড় হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা রাখালবাবু তো অনেকদিন ধরে এ অঞ্চলে আছেন, কিছু করতে পাবেন নি?

রাখালবাবুর স্ত্রীর সঙ্কোচ ও লজ্জা অনেকটা দূর হইয়াছিল। তিনি যেন এই প্রবাসে, এই দুর্দিনে একজন বাঙালীর মুখ দেখিয়া অকূলে কূল পাইয়াছেন, মুখের ভাবে মনে হইল।

বলিলেন—আগে কি রোজগার করতেন জানি নে। আমার বিয়ে হয়েছে এই পনের বছর—আমার সতীন মারা যেতে আমায় বিয়ে করেন। আমি এসে পর্যন্ত দেখছি কোন রকমে সংসার চলে। এখানে ভিজিটের টাকা বড় একটা কেউ দেয় না, গম দেয়, মকাই দেয়। গত বছর মাঘ মাসে উনি অসুখে পড়লেন, সেই থেকে আর একটি পয়সা ছিল না। তবে এদেশের লোক খারাপ নয়, যার কাছে যা পাওনা ছিল, বাড়ী বয়ে সে-সব গম মকাই কলাই দিয়ে গিয়েছে। তাই চলেছে, নয়ত না খেয়ে মরত সবাই।

—আপনার বাপের বাড়ী কোথায়? সেখানে খবর দেওয়া হয়েছে?

রাখালবাবুর স্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—খবর দেবার কিছু নেই। আমার বাপের বাড়ী কখনও দেখি নি। শুনেছিলুম ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। ছেলে-বেলা থেকে আমি সাহেবগঞ্জে ভগ্নীপতির বাড়ীতে মানুষ। মা-বাবা কেউ ছিলেন না। আমার সে-দিদি আমার বিয়ের পর মারা যান। ভগ্নীপতি আবার বিয়ে করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

—রাখালবাবুর কোন আত্মীয়স্বজন কোথাও নেই?

—দেশে জ্ঞাতি ভাইয়েরা আছে শুনতাম বটে, কিন্তু তারা কখনও সংবাদ নেয় নি, উনিও দেশে যাতায়াত করতেন না। তাদের সঙ্গে সদ্ভাবও নেই, তাদের খবর দেওয়া-না-দেওয়া সমান। এক মামাশ্বশুর আছেন আমার শুনতাম, কাশীতে। তা-ও তাঁর ঠিকানা জানিনে।

ভয়ানক অসহায় অবস্থা। আপনার জন কেহ নাই, এই বন্ধুহীন বিদেশে দুই-তিনটি নাবালক ছেলে লইয়া সহায়সম্পদশূন্য বিধবা মহিলাটির দশা ভাবিয়া মন রীতিমত দমিয়া গেল। তখনকার মত যাহা করা উচিত করিয়া আমি কাছারিতে ফিরিয়া আসিলাম, সদরে লিখিয়া স্টেট্ হইতে আপাতত এক শত টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখালবাবুর শ্রাদ্ধও কোন রকমে শেষ করিয়া দিলাম।

ইহার পর আরও বারকয়েক রাখালবাবুর বাড়ীতে গিয়াছি। স্টেট্ হইতে মাসে দশটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করাইয়া লইয়া প্রথম বারের টাকাটা নিজেই দিতে গিয়াছিলাম। দিদি খুব যত্ন করিতেন, অনেক স্নেহ-আত্মীয়তার কথা বলিতেন। সেই বিদেশে তাঁর স্নেহ-যত্ন আমার বড় ভাল লাগিত। তারই লোভে অবসর পাইলেই সেখানে যাইতাম।

৩

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হ্রদের মত। এরকম জলাশয়কে এদেশে বলে কুণ্ডী। এই হ্রদটার নাম সরস্বতী কুণ্ডী।

সরস্বতী কুণ্ডীর পাড়ের তিনদিকে নিবিড় বন। এ ধরণের বন আমাদের মহালে বা লবটুলিয়াতে নাই। এ বনে বড় বড় বনস্পতিদের নিবিড় সমাবেশ—জলের সান্নিধ্য-বশতই হোক বা যে-জন্যই হোক, বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা, বন্যপুষ্পের ভিড়। এই বন বিশাল সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জলকে তিনদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, একদিকে ফাঁকা—সেখান হইতে পূর্বদিকে বহুদূর-প্রসারিত নীল আকাশ ও দূরের শৈল-মালা চোখে পড়ে। সুতরাং পূর্ব-পশ্চিম কোণের তীরের কোন এক জায়গায় বসিয়া দক্ষিণ ও বাম দিকে চাহিয়া দেখিলে সরস্বতী কুণ্ডীর সৌন্দর্যের অপূর্বতা ঠিক বোঝা যায়। বামে চাহিলে গভীর হইতে গভীবতর বনের মধ্যে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া ঘন নিবিড় শ্যামলতাব মধ্যে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে, দক্ষিণে চাহিলে স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে সুদূরবিসর্পী আকাশ ও অস্পষ্ট শৈলমালার ছবি মনকে বেলুনের মত ফুলাইয়া পৃথিবীর মাটি হইতে উড়াইয়া লইয়া চলে।

এখানে একখানা শিলাখণ্ডের উপর কতদিন গিয়া একা বসিয়া থাকিতাম। কখনও বনের মধ্যে দুপুরবেলা আপন মনে বেড়াইতাম। কত বড় বড় গাছের ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতাম। মাঝে মাঝে গাছপালা, বন্যলতার ফুল সংগ্রহ করিতাম। এখানে যত রকমের পাখীর ডাক শোনা যায়, আমাদের মহালে অত পাখী নাই। নানা রকমেব বন্য ফল খাইতে পায় বলিয়া এবং সম্ভবত উচ্চ বনস্পতিশিরে বাসা বাঁধিবার সুযোগ ঘটে বলিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বনে পাখীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। বনে ফুলও অনেক রকমের ফোটে।

হ্রদের তীরের নিবিড় বন প্রায় তিন মাইলের উপর লম্বা, গভীরতায় প্রায় দেড় মাইল। জলের ধার দিয়া বনের মধ্যে গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় একটা সুঁড়ি পথ বনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আসিয়াছে—এই পথ ধরিয়া বেড়াইতাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সরস্বতীর নীল জল, তার উপর উপুড়-হইয়া-পড়া দূরের আকাশটা এবং দিগন্তলীন শৈলশ্রেণী চোখে পড়িত। ঝির্‌ঝির্ করিয়া স্নিগ্ধ হাওয়া বহিত, পাখী গান গাহিত, বন্য ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যাইত।

একদিন একটা গাছের ডালে উঠিয়া বসিলাম। সে-আনন্দের তুলনা হয় না। আমার মাথার উপরে বিশাল বনস্পতিদলের ঘন সবুজ পাতার রাশি, তার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুক্‌রা, প্রকাণ্ড একটা লতায় থোকা থোকা ফুল দুলিতেছে। পায়ের দিকে অনেক নীচে ভিজা মাটিতে বড় বড় ব্যাঙের ছাতা গজাইয়াছে। এখানে আসিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতে ইচ্ছা হয়। কত ধরণের কত নব অনুভূতি মনে আসিয়া জোটে। এক প্রকাব অতল-সমাহিত অতিমানস চেতনা ধীরে ধীরে গভীর অন্তস্তল হইতে বাহিরের মনে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এ আসে গভীর আনন্দের মূর্তি ধরিয়া। প্রত্যেক বৃক্ষলতাব হৃৎস্পন্দন যেন নিজের বুকের রক্তের শান্ত স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করা যায়।

আমাদের যেখানে মহাল, সেখানে পাখীর এত বৈচিত্র্য নাই। সেখানটা যেন অন্য

জগৎ, তার গাছপালা জীবজন্তু অন্য ধরণের। পরিচিত জগতে বসন্ত যখন দেখা দিয়াছে, লবটুলিয়ায় তখন একটা কোকিলের ডাক নাই, একটা পরিচিত বসন্তের ফুল নাই। সে যেন রুক্ষ কর্কশ ভৈরবী মূর্তি; সৌম্য, সুন্দর বটে, কিন্তু মাধুর্যহীন—মনকে অভিভূত করে ইহার বিশালতায়, রুক্ষতায়। কোমল বর্জিত খাড়ব সুর, মালকোষ কিংবা চৌতালের ধ্রুপদ, মিষ্টত্বের কোন পর্দার ধার মাড়াইয়া চলে না—সুরের গম্ভীর উদাত্ত রূপে মনকে অন্য এক স্তরে লইয়া পৌঁছাইয়া দেয়।

সরস্বতী কুণ্ডী সেখানে ঠুংরী, সুমিষ্ট সুরের মধুর ও কোমল বিলাসিতায় মনকে আর্দ্র ও স্বপ্নময় করিয়া তোলে। স্তব্ধ দুপুরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখানে তীর-তরুর ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতে শুনিতে মন কত দূরে কোথায় চলিয়া যাইত, বন্য নিমগাছের সুগন্ধ নিমফুলের সুবাস ছড়াইত বাতাসে, জলে জলজ লিলির দল ফুটিত। কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার পর সেখান হইতে উঠিয়া আসিতাম।

নাঢ়া বইহার জরীপ হইতেছে প্রজাদের মধ্যে বিলির জন্য, আমীনদের কাজ দেখাইবার জন্য প্রায়ই সেখানে যাইতে হয়। ফিরিবার পথে মাইল দুই পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটু ঘুরিয়া যাই, শুধু সরস্বতী কুণ্ডীর এই বনভূমিতে ঢুকিয়া বনের ছায়ায় খানিকটা বেড়াইবার লোভে।

সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা তিনটার সময়। খর রৌদ্রে বিস্তীর্ণ রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর পার হইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে বনের মধ্যে ঢুকিয়া ঘন ছায়ায় ছায়ায় জলের ধার পর্যন্ত গেলাম--প্রান্তরসীমা হইতে জলের কিনারা প্রায় দেড় মাইলের কম নয়, কোন কোন স্থানে আরও বেশী। একটা গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলক্লথ পাতিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঘন ঝোপের ডালপালা চারিধার হইতে এমন ভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে বাহির হইতে আমায় কেউ দেখিতে পাইবে না। হাত-দুই উপরেই গাছপালা, মোটা মোটা কাঠের মত শক্ত গুঁড়িওয়ালা কি একপ্রকার বন্যলতা জড়াজড়ি করিয়া ছাদ রচনা করিয়াছে—একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় বন-সিমের মত সবুজ সবুজ ফল আমার প্রায় বুকের উপর দুলিতেছে। আর একটা কি গাছ, তার ডালপালা প্রায় অর্ধেক ঝোপটা জুড়িয়া, তাহাতে কুচো কুচো ফুল ধরিয়াছে, ফুলগুলি এত ছোট যে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না—কিন্তু কি ঘন নিবিড় সুবাস সে-ফুলের! ঝোপের নিভৃত তল ভারাক্রান্ত সেই অজানা বনপুষ্পের সুবাসে।

পূর্বেই বলিয়াছি সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখীর আড্ডা। এত পাখীও আছে এখানকার বনে! কত ধরণের, কত রং-বেরঙের পাখী—শ্যামা, শালিক, হরটিট্‌, বনটিয়া, ফেজান্ট-ক্রো, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো--সরস্বতীর নীল জলে বক, সিল্লী, রাঙা হাঁস, মাণিকপাখী, কাঁক প্রভৃতি জলচর পাখী--পাখীর কাকলীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, কি বিরক্তই করে তারা, তাদের উল্লাস-ভরা অবাক কূজনে কান পাতা দায়। অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছে, আমার চারি পাশে হাত-দেড়-দুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালায় লতায় বসিয়া কিচ্‌ কিচ্‌ করিতেছে—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই।

পাখীদের এই অসংকোচ সঞ্চরণ আমার বড় ভাল লাগিত। উঠিয়া বসিয়াও দেখিয়াছি তাহারা ভয় পায় না, একটু উড়িয়া গেল, কিন্তু একেবারে দেশছাড়া হইয়া পালায় না। খানিক পরে নাচিতে নাচিতে বকিতে বকিতে আবার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।

এখানেই একদিন প্রথম বন্য হরিণ দেখিলাম। জানিতাম বন্য হরিণ আমাদের মহালের জঙ্গলে আছে, কিন্তু এর আগে কখনও চোখে পড়ে নাই। শুইয়া আছি—হঠাৎ কিসেব পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি ঝোপের নিভৃততর দুর্গমতর অঞ্চলে নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা হরিণ। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, বড় হরিণ নয়, হরিণশাবক। সে আমায় দেখিতে পাইয়া অবোধ-বিস্ময়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে—ভাবিতেছে, এ আবার কোন্ অদ্ভুত জীব!



খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল, দুজনেই নির্বাক, নিস্পন্দ।

আধ মিনিট পরে হরিণ-শিশুটা যেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আবার একটু আগাইয়া আসিল। তার চোখে ঠিক যেন মনুষ্যশিশুর মত সাগ্রহ কৌতূহলের দৃষ্টি। আরও কাছে আসিত কি না জানি না, আমার ঘোড়াটা সে-সময় হঠাৎ পা নাড়িয়া গা-ঝাড়া দিয়া ওঠাতে হরিণশিশু চকিত ও সন্ত্রস্ত ভাবে ঝোপের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া তাহার মায়ের কাছে সংবাদটা দিতে গেল।

তার পর কতক্ষণ ঝোপের তলায় বসিয়া রহিলাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জল অর্ধচন্দ্রাকারে দূর শৈলমালার পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত, আকাশ নীল, মেঘের লেশ নাই কোন দিকে—কুণ্ডীর জলচর পাখীর দল ঝগড়া, কলরব, তুমুল দাঙ্গা শুরু করিয়াছে—একটা গম্ভীর ও প্রবীণ মানিক-পাখী তীরবর্তী এক উচ্চ বনস্পতির শীর্ষে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার বিরক্তি জ্ঞাপন করিতেছে। জলের ধারে ধারে বড় বড় গাছের মাথায় বকের দল এমন ঝাঁক বাঁধিয়া আছে, দূর হইতে মনে হয় যেন সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল ফুটিয়াছে।

রোদ ক্রমশঃ রাঙা হইয়া আসিল।

ওপারে শৈলচূড়ায় যেন তামার রং ধরিয়াছে। বকের দল ডানা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। গাছপালার মগডালে রোদ উঠিয়া গেল।

পাখীর কূজন বাড়িল, আর বাড়িল অজানা বনকুসুমের সেই সুঘ্রাণটা। অপরাহ্নের ছায়ায় গন্ধটা যেন আরও ঘন, আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা বেঁজি খানিকদূর হইতে মাথা উঁচু করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে।

কি নিভৃত শান্তি! কি অদ্ভুত নির্জনতা! এতক্ষণ তো এখানে আছি, সাড়ে তিন ঘণ্টার কম নয়—বন্য পাখীর কাকলী ছাড়া অন্য কোন শব্দ শুনি নাই, আর পাখীদেব পায়ে পায়ে ডালপাতার মচ্‌মচানি, শুষ্কপত্র বা লতার টুক্‌রা পতনের শব্দ। মানুষের চিহ্ন নাই কোন দিকে।

নানা বিচিত্র ও বিভিন্ন গড়ন বনস্পতিদের শীর্ষদেশের। এই সন্ধ্যার সময় রাঙা রোদ পড়িয়া তাদের শোভা হইয়াছে অদ্ভুত। তাদের কত গাছের মগডাল জড়াইয়া লতা উঠিয়াছে, এক ধরণের লতাকে এদেশে বলে ভিঁয়োরা লতা—আমি তাহার নাম দিয়াছি ভোম্‌রা লতা—সে লতা যে গাছের মাথায় উঠিবে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। এই সময় ভোম্‌রা লতায় ফুল ফোটে—ছোট ছোট বনজুঁইয়ের মত সাদা সাদা ফুলে কত বড় বড় গাছের মাথা আলো করিয়া রাখিয়াছে। অতি চমৎকার সুঘ্রাণ, অনেকটা যেন প্রস্ফুটিত সর্ষে ফুলের মত—তবে অতটা উগ্র নয়।

সরস্বতী কুণ্ডীর বনে কত বন্য শিউলি গাছ--শিউলি গাছের প্রাচুর্য এক এক জায়গায় এত বেশী, যেন মনে হয় শিউলির বন। বড় বড় শিলাখণ্ডের উপর শরতের প্রথমে সকালবেলা রাশি রাশি শিউলি ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছিল—দীর্ঘ এক রকম কর্কশ ঘাস সেই সব পাথরের আশে-পাশে—বড় বড় ময়না-কাঁটার গাছ তার সংগে জড়াইয়াছে—কাঁটা, ঘাস, শিলাখণ্ড সব তাতেই রাশি রাশি শিউলি ফুল—আর্দ্র ছায়াগহন স্থান, তাই সকালের ফুল এখনও শুকাইয়া যায় নাই।

সরস্বতী হ্রদকে কত রূপেই দেখিলাম! লোকে বলে সরস্বতী কুণ্ডীর জংগলে বাঘ আছে, জ্যোৎস্না-রাত্রে সরস্বতীর বিস্তৃত জলরাশির কৌমুদীস্নাত শোভা দেখিবার লোভে রাসপূর্ণিমার দিন তহশীলদার বনোয়ারীলালের চোখে ধুলো দিয়া আজমাবাদের সদর কাছারি আসিবার ছুতায় লবটুলিয়া ডিহি কাছারি হইতে লুকাইয়া একা ঘোড়ায় এখানে আসিয়াছি।

বাঘ দেখি নাই বটে, কিন্তু সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল এখানে মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নাস্নাত হ্রদের জলে জলকেলি করিতে নামে। চারিধার নীবব নিস্তব্ধ—পূর্ব তীরের ঘন বনে কেবল শৃগালের ডাক শোনা যাইতেছিল—দূরের শৈল-মালা ও বনশীর্ষ অস্পষ্ট দেখাইতেছে—জ্যোৎস্নার হিম বাতাসে গাছপালা ও ভোমরা লতার নৈশ-পুষ্পের মৃদু সুবাস∴আমার সামনে বন ও পাহাড় বেষ্টিত নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ হ্রদের বুকে হৈমন্তী পূর্ণিমার থৈ থৈ জ্যোৎস্না...পরিপূর্ণ, ছায়াহীন, জলের উপর পড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় প্রতিফলিত হওয়া অপার্থিব দেবলোকের জ্যোৎস্না...ভোমরা লতার সাদা-ফুলে-ছাওয়া বড় বড় বনস্পতিশীর্ষে জ্যোৎস্না পড়িয়া মনে হইতেছে, গাছে গাছে পরীদের শুভ্র বস্ত্র উড়িতেছে...

আর এক ধরণের পোকা একঘেয়ে ডাকিতেছিল—ঝিঁঝিঁ পোকার মতই। দু-একটা পত্র পতনের শব্দ বা খস্ খস্ করিয়া শুষ্ক পত্ররাশির উপর দিয়া বন্য জন্তুর পলায়নেব শব্দ...

বনদেবীরা আমরা থাকিতে তো আর আসে না। কত গভীর রাত্রে আসে কে জানে।

আমি বেশী রাত পর্যন্ত হিম সহ্য করিতে পারি নাই। ঘণ্টাখানেক থাকিয়াই ফিরি।

সরস্বতী কুণ্ডীর এই পরীদের প্রবাদ এখানেই শুনিয়াছিলাম।

শ্রাবণ মাসে একদিন আমাকে উত্তর সীমানার জরীপের ক্যাম্পে রাত্রি যাপন করিতে হয়। আমার সঙ্গে ছিল আমীন রঘুবর প্রসাদ। সে আগে গবর্ণমেণ্টের চাকুরি করিয়াছে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট ও এ-অঞ্চলের বনের সঙ্গে তার পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পরিচয়।

তাহার কাছে সরস্বতী কুণ্ডীর কথা তুলিতেই সে বলিল—হুজুর, ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাত্রে হুরী-পরীরা নামে; জ্যোৎস্নারাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ঐ সব পাথরের উপর, রেখে জলে নামে। সে-সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মত জেগে আছে। আমি দেখি নি কখনও, হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন। একদিন তারপর তিনি গভীর রাত্রে একা ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন সার্ভে-তাঁবুতে—পরদিন সকালে তাঁর লাস কুণ্ডীর জলে ভাসতে দেখা যায়। বড় মাছে তাঁর একটা কান খেয়ে ফেলেছিল। হুজুর, ওখানে আপনি ও-রকম যাবেন না।

এই সরস্বতী কুণ্ডীর ধারে একদিন দুপুরে এক অদ্ভুত লোকের সন্ধান পাইলাম।

সার্ভে-ক্যাম্প হইতে ফিরিবার পথে একদিন হ্রদের তীরের বনপথ দিয়া আস্তে আস্তে আসিতেছি, বনের মধ্যে দেখি একটি লোক মাটি খুঁড়িয়া কি যেন করিতেছে। প্রথমে ভাবিলাম লোকটা ভুঁই-কুমড়া তুলিতে আসিয়াছে। ভুঁই-কুমড়া লতাজাতীয় উদ্ভিদ, মাটির মধ্যে লতার নীচে চালকুমড়ার আকারের প্রকাণ্ড কন্দ জন্মায়—উপর হইতে বোঝা যায় না। কবিরাজী ঔষধে লাগে বলিয়া বেশ দামে বিক্রয় হয়। কৌতূহলবশতঃ ঘোড়া হইতে নামিয়া কাছে গেলাম, দেখি ভুঁই-কুমড়া নয়, কিছু নয়, লোকটা কিসের যেন বীজ পুঁতিয়া যাইতেছে।

আমায় দেখিয়া সে থতমত খাইয়া অপ্রতিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। বয়স হইয়াছে, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সঙ্গে একটা চটের থলে, তার ভিতর হইতে ছোট একখানা কোদালের আগাটুকু দেখা যাইতেছে, একটা শাবল পাশে পড়িয়া, ইতস্তত কতকগুলি কাগজের মোড়ক ছড়ানো।

বলিলাম—তুমি কে? এখানে কি করছ?

সে বলিল—হুজুর কি ম্যানেজারবাবু?

—হ্যাঁ। তুমি কে?

—নমস্কার। আমার নাম যুগলপ্রসাদ। আমি আপনাদের লবটুলিয়ার পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই।

তখন আমার মনে পড়িল, বনোয়ারী পাটোয়ারী একবার কথায় কথায় তাহার চাচাতো ভাইয়ের কথা তুলিয়াছিল। উঠাইবার কারণ, আজমবাদের সদর কাছারিতে—অর্থাৎ আমি যেখানে থাকি—সেখানে একজন মুহুরীর পদ খালি ছিল। বলিয়াছিলাম একটা ভাল লোক দেখিয়া দিতে। বনোয়ারী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, লোক তো তাহার সাক্ষাৎ চাচাতো ভাই-ই ছিল, কিন্তু লোকটা অদ্ভুত মেজাজের, এক রকম খামখেয়ালী উদাসীন ধরণের। নইলে কায়েথী হিন্দীতে অমন হস্তাক্ষর, অমন পড়ালেখার এলেম্ এ-অঞ্চলের বেশী লোকের নাই।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেন, সে কি করে?

বনোয়ারী বলিয়াছিল—তার নানা বাতিক হুজুর, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো এক বাতিক। কিছু করে না, বিয়ে-সাদি করেছে, সংসার দেখে না, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অথচ সাধু-সন্নিসিও নয়, ঐ এক ধরণের মানুষ।

এই তাহা হইলে বনোয়ারীলালের সেই চাচাতো ভাই?

কৌতূহল বাড়িল, বলিলাম—ও কি পুঁতছ ওখানে?

লোকটা বোধ হয় গোপনে কাজটা করিতেছিল, যেন ধরা পড়িয়া লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে এমন সুরে বলিল—কিছু না, এই—একটা গাছের বীজ—

আমি আশ্চর্য হইলাম। কি গছের বীজ? ওর নিজের জমি নয়, এই ঘোর জঙ্গল. ইহার মাটিতে কি গাছের বীজ ছড়াইতেছে—তাহার সার্থকতাই বা কি? কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বলিল—অনেক রকম বীজ আছে হুজুর, পূর্ণিয়ায় দেখেছিলাম একটা সাহেবের বাগানে ভারী চমৎকার বিলিতি লতা—বেশ রাঙা রাঙা ফুল। তারই বীজ, আরও অনেক রকম বনের ফুলের বীজ আছে. দূরে দূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছি, এখানকার জঙ্গলে ও-সব লতা-ফুল নেই। তাই পুঁতে দিচ্ছি. গাছ হয়ে দু-বছরের মধ্যে ঝাড় বেঁধে যাবে, বেশ দেখাবে।

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। লোকটা সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে. যে বনে তাহার নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই—কি অদ্ভুত লোকটা!

যুগলপ্রসাদকে ডাকিয়া এক গাছের তলায় দুজনে বসিলাম। সে বলিল—আমি এর আগেও এ কাজ করেছি হুজুর. লবটুলিয়াতে যত বনের ফুল দেখেন, ফুলের লতা দেখেন, ও-সব আমি আজ দশ-বারো বছর আগে কতক পূর্ণিয়ার বন থেকে, কতক দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এনে লাগিয়েছিলাম। এখন একেবারে ও-সব ফুলের জঙ্গল বেঁধে গিয়েছে।

—তোমার কি এ কাজ খুব ভাল লাগে?

—লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলটা ভারী চমৎকার জায়গা—ওই সব ছোটখাটো পাহাড়ের গায়ে কি এখানকার বনে ঝোপে নতুন নতুন ফুল ফোটাব. এ আমার বহুদিনের শখ।

—কি ফুল নিয়ে আসতে?

—কি করে আমার এদিকে মন গেল, তা একটু আগে হুজুরকে বলি। আমার বাড়ী ধরমপুর অঞ্চলে। আমাদের দেশে বুনো ভাণ্ডীর ফুল একেবারেই ছিল না। আমি মহিষ চরিয়ে বেড়াতাম ছেলেবেলায় কুশীনদীর ধারে ধারে, আমার গাঁ থেকে দশ-পনেরো কোশ দূরে। সেখানে দেখতাম বনে-জঙ্গলে, মাঠে বুনো ভাণ্ডীর ফুলের বড় শোভা। সেখানে থেকে বীজ নিয়ে গিয়ে দেশে লাগাই, এখন আমাদের অঞ্চলের পথের ধারে বন-ঝোপে কি লোকের বাড়ীর পেছনে পোড়ো জমিতে ভাণ্ডারী ফুলের একেবারে জঙ্গল; সেই থেকে আমার এই দিকে মাথা গেল। যেখানে যে ফুল নেই, সেখানে সেই ফুল, গাছ, লতা নিয়ে পুঁতব, এই আমার শখ। সারাজীবন ওই করে ঘুরেছি। এখন আমি ও-কাজে ঘুণ হয়ে গেছি।

যুগলপ্রসাদ দেখিলাম এদেশের বহু বনের ফুল ও সুদৃশ্য বৃক্ষলতার খবর রাখে। এ বিষয়ে সে যে একজন বিশেষজ্ঞ, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। বলিলাম

—তুমি এরিস্টলোকিয়া লতা চেন?

তাহাকে ফুলের গড়ন বলিতেই সে বলিল, হংস-লতা? হাঁসের-মত-চেহারার ফুল হয় তো? ও তো এদেশের গাছ নয়। পাটনায় দেখেছি বাবুদের বাগানে।

তাহার জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। নিছক সৌন্দর্যের এমন পূজারীই বা ক'টা দেখিয়াছি? বনে বনে ভাল ফুল ও লতার বীজ ছড়াইয়া তাহার কোন স্বার্থ নাই, এক পয়সা আয় নাই, নিজে সে নিতান্তই গরীব, অথচ শুধু বনের সৌন্দর্য-সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ।

আমায় বলিল—সরস্বতী কুন্ডীর মত চমৎকার বন এ অঞ্চলে কোথাও নেই বাবুজী। কত গাছপালা যে আছে, আর কি দেখেছেন জলের শোভা! আচ্ছা, আপনি কি বিবেচনা করেন এতে পদ্ম হবে পুঁতে দিলে? ধরমপুরের পাড়াগাঁ অঞ্চলে পদ্ম আছে অনেক পুকুরে। ভাবছিলাম গেঁড় এনে পুঁতে দেব।

আমি তাহাকে সাহায্য করিতে মনে মনে সংকল্প করিলাম। দুজনে মিলিয়া এ বনকে নানা নতুন বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাইব, সেদিন হইতে ইহা আমাকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিল। যুগলপ্রসাদ খাইতে পায় না, সংসারে বড় কষ্ট, ইহা আমি জানিতাম। সদরে লিখিয়া তাহাকে দশ টাকা বেতনে একটা মুহুরীর চাকুরি দিলাম আজমাবাদ কাছারিতে।

সেই বছরে আমি কলিকাতা হইতে সাটনের বিদেশী বন্য পুষ্পের বীজ আনিয়া ও ডুয়ার্সের পাহাড় হইতে বন্য জুঁইয়ের লতার কাটিং আনিয়া যথেষ্ট পরিমাণে রোপণ করিলাম সরস্বতী হ্রদের বনভূমিতে। কি আহ্লাদ ও উৎসাহ যুগলপ্রসাদের! আমি তাহাকে শিখাইয়া দিলাম এ উৎসাহ ও আনন্দ যেন সে কাছারির লোকের কাছে প্রকাশ না করে। তাহাকে তো লোকে পাগল ভাবিবেই, সেই সঙ্গে আমাকেও বাদ দিবে না। পর বৎসর বর্ষার জলে আমাদের রোপিত গাছ ও লতার ঝাড় অদ্ভুতভাবে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। হ্রদের তীরের জমি অত্যন্ত উর্বর, গাছপালাগুলিও যাহা পুঁতিয়াছিলাম, এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী। কেবল সাটনের বীজের প্যাকেট লইয়া গোলমাল বাধিয়াছিল। প্রত্যেক প্যাকেটের উপর তাহারা ফুলের নাম ও কোন কোন স্থলে এক লাইনে ফুলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়াছিল। ভাল রং ও চেহারা বাছিয়া বাছিয়া যে বীজগুলি লাগাইলাম, তাহার মধ্যে 'হোয়াইট বিম' ও 'রেড ক্যাম্পিয়ন্' এবং 'স্টিচওয়ার্ট' অসাধারণ উন্নতি দেখাইল। 'ফক্সগ্লাভ' ও 'উড অ্যানিমোন্' মন্দ হইল না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও 'ডগ রোজ' বা 'হনিসাক্‌ল্'-এর চারা বাঁচাইতে পারা গেল না।

হলদে ধুতুরা-জাতীয় এক প্রকার গাছ হ্রদের ধারে ধারে পুঁতিয়াছিলাম। খুব শীঘ্রই তাহার ফুল ফুটিল। যুগলপ্রসাদ পূর্ণিয়ার জঙ্গল হইতে বন্য বয়ড়া লতার বীজ আনিয়াছিল, চারা বাহির হইবার সাত মাসের মধ্যেই দেখি কাছাকাছি অনেক ঝোপের মাথা বয়ড়া লতায় ছাইয়া যাইতেছে। বয়ড়া লতার ফুল যেমন সুদৃশ্য, তেমনি তাহার গন্ধ সুবাস।

হেমন্তের প্রথমে একদিন দেখিলাম বয়ড়া লতায় অজস্র কুঁড়ি ধরিয়াছে।

যুগলপ্রসাদকে খবরটা দিতেই সে কলম ফেলিয়া আজমাবাদ কাছারি হইতে সাত মাইল দূরবর্তী সরস্বতী হ্রদের তীরে প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতেই আসিল।

আমায় বলিল—লোকে বলেছিল হুজুর, বয়ড়া লতা জন্মাবে, বাড়বেও বটে, কিন্তু

ওর ফুল ধরবে না। সব লতায় নাকি ফুল ধরে না। দেখুন কেমন কুঁড়ি এসেছে!

হ্রদের জলে 'ওয়াটার ক্রোফ্ট' বলিয়া এক প্রকার জলজ ফুলের গেঁড় পুঁতিয়াছিলাম! সে গাছ হু হু করিয়া এত বাড়িতে লাগিল যে, যুগলপ্রসাদের ভয় হইল জলে পদ্মের স্থান বুঝি ইহারা বেদখল করিয়া ফেলে!

বোগেনভিলিয়া লতা লাগাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শহরের শৌখীন পার্ক বা উদ্যানের সঙ্গে এতই ওর সম্পর্কটা জড়ানো যে আমার ভয় হইল সরস্বতী কুণ্ডীর বনে ফুলে-ভরা বোগেনভিলিয়ার ঝোপ ইহার বন্য আকৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যুগলপ্রসাদেরও এসব বিষয়ে মত আমার ধরণের। সেও বারণ করিল।

অর্থব্যয়ও কম করি নাই। একদিন গনোরী তেওয়ারীর মুখে শুনিলাম, কারো নদীর ওপারে জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গলে এক প্রকার অদ্ভুত ধরনের বন্যপুষ্প হয়—ওদেশে তার নাম দুধিয়া ফুল। হলুদ গাছের মত পাতা, অত বড়ই গাছ—খুব লম্বা একটা ডাঁটা ঠেলিয়া উঁচুদিকে তিন-চার হাত ওঠে। একটা গাছে চার-পাঁচটা ডাঁটা হয়, প্রত্যেক ডাঁটায় চারটি করিয়া হলদে রঙের ফুল ধরে—দেখিতে খুব ভাল তো বটেই, ভারি সুন্দর তার সুবাস। রাত্রে অনেক দূর পর্যন্ত সুগন্ধ ছড়ায়। সে ফুলের একটা গাছ যেখানে একবার জন্মায়, দেখিতে দেখিতে এত হু-হু বংশবৃদ্ধি হয় যে, দু-তিন বছরে রীতিমত জঙ্গল বাঁধিয়া যায়।

শুনিয়া পর্যন্ত আমার মনের শান্তি নষ্ট হইল। ঐ ফুল আনিতেই হইবে। গনোরী বলিল, বর্ষাকাল ভিন্ন হইবে না ; গাছের গেঁড় আনিয়া পুঁতিতে হয়—জল না পাইলে মরিয়া যাইবে।

পয়সা-কড়ি দিয়া যুগলপ্রসাদকে পাঠাইলাম। সে বহু অনুসন্ধানে জয়ন্তী পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গল হইতে দশ-বারো গণ্ডা গেঁড় যোগাড় করিয়া আনিল।

## নবম পরিচ্ছেদ

### ১

প্রায় তিন বছর কাটিয়া গিয়াছে।

এই তিন বছরে আমার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য প্রকৃতি কি মায়া-কাজল লাগাইয়া দিয়াছে আমার চোখে—শহরকে একরকম ভুলিয়া গিয়াছি। নির্জনতার মোহ, নক্ষত্রভরা উদার আকাশের মোহ আমাকে এমনি পাইয়া বসিয়াছে যে, মধ্যে একবার কয়েকদিনের জন্য পাটনায় গিয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিলাম কবে পিচ-ঢালা বাঁধা-ধরা রাস্তার গণ্ডি এড়াইয়া চলিয়া যাইব লবটুলিয়া বইহারে—পেয়ালার মত উপুড়-করা নীল আকাশের তলে মাঠের পর মাঠ, অরণ্যের পর অরণ্য, যেখানে তৈরী রাজপথ নাই, ইটের ঘরবাড়ী নাই, মোটর-হর্ণের আওয়াজ নাই, ঘন ঘুমের ফাঁকে যেখানে কেবল দূর অন্ধকার বনে শেয়ালের দলের প্রহর-ঘোষণা শোনা যায়, নয়তো ধাবমান নীল-গাইয়ের দলের সম্মিলিত পদধ্বনি, নয়তো বন্য মহিষের গম্ভীর আওয়াজ।

আমার উপরওয়ালারা ক্রমাগত আমাকে চিঠি লিখিয়া তাগাদা করিতে লাগিলেন,

কেন আমি এখানকার জমি প্রজাবিলি করিতেছি না। আমি জানি আমার তাহাই একটি প্রধান কাজ বটে, কিন্তু এখানে প্রজা বসাইয়া প্রকৃতির এমন নিভৃত কুঞ্জবনকে নষ্ট করিতে মন সরে না। যাহারা জমি ইজারা লইবে, তাহারা তো জমিতে গাছপালা বনঝোপ সাজাইয়া রাখিবার জন্য কিনিবে না—কিনিয়াই তাহারা জমি সাফ করিয়া ফেলিবে, ফসল রোপণ করিবে, ঘর-বাড়ী বাঁধিয়া বসবাস শুরু করিবে—এই নির্জন শোভাময় বন্য প্রান্তর, অরণ্য, কুন্ডী, শৈলমালা জনপদে পরিণত হইবে, লোকের ভিড়ে ভয় পাইয়া বনলক্ষ্মীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাইবেন—মানুষ ঢুকিয়া মায়াকাননের মায়াও দূর করিবে, সৌন্দর্যও ঘুচাইয়া দিবে।

সে জনপদ আমি মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

পাটনা, পূর্ণিয়া কি মুঙ্গের যাইতে তেমন জনপদ এদেশের সর্বত্র। গায়ে গায়ে কুশ্রী, বেঢপ খোলার একতলা কি দোতলা মাঠকোঠা, চালে চালে বসতি, ফণিমনসার ঝাড়, গোবরস্তূপের আবর্জনার মাঝখানে গরু-মহিষের গোয়াল—ইঁদারা হইতে রহট্ দ্বারা জল উঠানো হইতেছে, ময়লা কাপড়-পরা নর-নারীর ভিড়, হনুমানজীর মন্দিরে ধ্বজা উড়িতেছে, রূপার হাঁসুলি গলায় উলঙ্গ বালক-বালিকার দল ধূলা মাখিয়া রাস্তার উপর খেলা করিতেছে।

কিসের বদলে কি পাওয়া যাইবে!

এমন বিশাল ছেদহীন, বাধাবন্ধনহীন, উদ্দাম সৌন্দর্যময়ী আরণ্যভূমি দেশের একটা বড় সম্পদ—অন্য কোন দেশ হইলে আইন করিয়া এখানে ন্যাশনাল্ পার্ক করিয়া রাখিত। কর্মক্লান্ত শহরের মানুষ মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া প্রকৃতির সাহচর্যে নিজেদের অবসন্ন মনকে তাজা করিয়া লইয়া ফিরিত। তাহা হইবার জো নাই, যাহার জমি সে প্রজাবিলি না করিয়া জমি ফেলিয়া রাখিবে কেন?

আমি প্রজা বসাইবার ভার লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম—সেই আরণ্য-প্রকৃতিকে ধ্বংস করিতে আসিয়া এই অপূর্ব সুন্দরী বন্য নায়িকার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। এখন আমি ক্রমশ সে-দিন পিছাইয়া দিতেছি—যখন ঘোড়ায় চড়িয়া ছায়াগহন বৈকালে কিংবা মুক্তা-শুভ্র জ্যোৎস্নারাত্রে একা বাহির হই, তখন চারিদিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবি, আমার হাতেই ইহা নষ্ট হইবে? জ্যোৎস্নালোকে উদাস আত্মহারা, শিলাস্তৃত ধূ ধূ নির্জন বন্য প্রান্তর! কি করিয়াই আমার মন ভুলাইয়াছে চতুরা সুন্দরী!

কিন্তু কাজ যখন করিতে আসিয়াছি, করিতেই হইবে। মাঘ মাসের শেষে পাটনা হইতে ছটু সিং নামে এক রাজপুত আসিয়া হাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইতে চাহিয়া দরখাস্ত দিতেই আমি বিষম চিন্তায় পড়িলাম—হাজার বিঘা জমি দিলে তো অনেকটা জায়গাই নষ্ট হইয়া যাইবে—কত সুন্দর বনঝোপ, লতাবিতান নির্মমভাবে কাটা পড়িবে যে!

ছটু সিং ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল—আমি তাহার দরখাস্ত সদরে পাঠাইয়া দিয়া ধ্বংসলীলাকে কিছু বিলম্বিত করিবার চেষ্টা করিলাম।

## ২

একদিন লবটুলিয়া জঙ্গলের উত্তরে নাঢ়া বইহারের মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া দুপুরের পরে আসিতেছি—দেখিলাম, একখানা পাথরের উপর কে বসিয়া আছে পথের ধারে।

তাহার কাছে আসিয়া ঘোড়া থামাইলাম। লোকটির বয়স ষাটের কম নয়, পরনে ময়লা

কাপড়, একটা ছেঁড়া চাদর গায়ে।

এ জনশূন্য প্রান্তরে লোকটা কি করিতেছে একা বসিয়া?

সে বলিল—আপনি কে বাবু?

বলিলাম—আমি এখানকার কাছারির কর্মচারী।

—আপনি কি ম্যানেজারবাবু?

—কেন বল তো? তোমার কোন দরকার আছে? হ্যাঁ, আমিই ম্যানেজার।

লোকটা উঠিয়া আমার দিকে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলিল। বলিল—হুজুর, আমার নাম মটুকনাথ পাঁড়ে, ব্রাহ্মণ। আপনার কাছেই যাচ্ছি।

—কেন?

—হুজুর, আমি বড় গরীব। অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি হুজুরের নাম শুনে। তিন দিন থেকে হাঁটছি পথে পথে। যদি আপনার কাছে চলাচলতির কোন একটা উপায় হয়—

আমার কৌতূহল হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম—এ ক'দিন জঙ্গলের পথে তুমি কি খেয়ে আছ?

মটুকনাথ তাহার মলিন চাদরের একপ্রান্তে বাঁধা পোয়াটাক কলাইয়ের ছাতু দেখাইয়া বলিল—সেরখানেক ছাতু ছিল এতে বাঁধা, এই নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম। তাই ক'দিন খাচ্ছি। রোজগারের চেষ্টায় বেড়াচ্ছি, হুজুর—আজ ছাতু ফুরিয়ে এসেছে, ভগবান জুটিয়ে দেবেন আবার।

আজমাবাদ ও নাঢ়া বইহারের এই জনশূন্য বনপ্রান্তরে উড়ানির খুঁটে ছাতু বাঁধিয়া লোকটা কি রোজগারের প্রত্যাশায় আসিয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম—বড় বড় শহর ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, পাটনা, মুঙ্গের ছেড়ে এ জঙ্গলের মধ্যে এলে কেন পাঁড়েজী? এখানে কি হবে? লোক কোথায় এখানে? তোমাকে দেবে কে?

মটুকনাথ আমার মুখের দিকে নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—এখানে কিছু রোজগার হবে না বাবু? তবে আমি কোথায় যাব? ও-সব বড় শহরে আমি কাউকে চিনি নে, রাস্তাঘাট চিনি নে, আমার ভয় করে। তাই এখানে যাচ্ছিলাম—

লোকটাকে বড় অসহায়, দুঃখী ও ভালমানুষ বলিয়া মনে হইল। সঙ্গে করিয়া কাছারিতে লইয়া আসিলাম।

কয়েকদিন চলিয়া গেল। মটুকনাথকে কোন কাজ করিয়া দিতে পারিলাম না—দেখিলাম, সে কোন কাজ জানে না—কিছু সংস্কৃত পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কাজ করিতে পারে। টোলে ছাত্র পড়াইত, আমার কাছে বসিয়া সময়ে অসময়ে উদ্ভট শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বোধ হয় আমার অবসর-বিনোদনের চেষ্টা করে।

একদিন আমায় বলিল—আমায় কাছারির পাশে একটু জমি দিয়ে একটা টোল খুলিয়ে দিন হুজুর।

বলিলাম—কে পড়বে টোলে পণ্ডিতজী, বুনো মহিষ ও নীলগাইয়ের দল কি ভট্টি বা রঘুবংশ বুঝবে?

মটুকনাথ নিপাট ভালমানুষ—বোধ হয় কিছু না ভাবিয়া দেখিয়াই টোল খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। ভাবিলাম, বুঝিবা এবার সে নিরস্ত হইবে। কিন্তু দিন-কতক চুপ করিয়া থাকিয়া আবার সে কথাটা পাড়িল।

বলিল—দিন দয়া ক'রে একটা টোল আমায় খুলে। দেখি না চেষ্টা ক'রে কি হয়। নয়ত আর যাব কোথায় হুজুর?

ভাল বিপদে পড়িয়াছি, লোকটা কি পাগল! ওর মুখের দিকে চাহিলেও দয়া হয়, সংসারের ঘোরপেঁচ বোঝে না, নিতান্ত সরল, নির্বোধ ধরণের মানুষ—অথচ একরাশ নির্ভর ও ভরসা লইয়া আসিয়াছে—কাহার উপর কে জানে?

তাহাকে কত বুঝাইলাম, আমি জমি দিতে রাজী আছি, সে চাষবাস করুক, যেমন রাজু পাঁড়ে করিতেছে। মটুকনাথ মিনতি করিয়া বলিল, তাহারা বংশানুক্রমে শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, চাষকাজের সে কিছুই জানে না, জমি লইয়া কি করিবে?

তাহাকে বলিতে পারিতাম, শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত-মানুষ এখানে মরিতে আসিয়াছে কেন, কিন্তু কোন কঠিন কথা বলিতে মন সরিল না। লোকটাকে বড় ভাল লাগিয়াছিল। অবশেষে তাহার নির্বন্ধাতিশয্যে একটা ঘর বাঁধিয়া দিয়া বলিলাম, এই তোমার টোল, এখন ছাত্র যোগাড় হয় কি না দেখ।

মটুকনাথ পূজার্চনা করিয়া দু-তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া টোল প্রতিষ্ঠা করিল। এ জঙ্গলে কিছুই মেলে না, সে নিজের হাতে মকাইয়ের আটার মোটা মোটা পুরী ভাজিল এবং জংলী ধুঁধুলের তরকারী। বাথান হইতে মহিষের দুধ আনাইয়া দই পাতিয়া রাখিয়াছিল। নিমন্ত্রিতের দলে অবশ্য আমিও ছিলাম।

টোল খুলিয়া কিছুদিন মটুকনাথ বড় মজা করিতে লাগিল।

পৃথিবীতে এমন মানুষও সব থাকে!

সকালে স্নানাহ্নিক সারিয়া সে টোলঘরে একখানা বন্য খেজুরপাতায় বোনা আসনের উপর গিয়া বসে এবং সম্মুখে মুগ্ধবোধ খুলিয়া সূত্র আবৃত্তি করে, ঠিক যেন কাহাকে পড়াইতেছে। এমন চেঁচাইয়া পড়ে যে, আমি আমার আপিসঘরে বসিয়া কাজ করিতে করিতে শুনিতে পাই।

তহশীলদার সজ্জন সিং বলে—পণ্ডিতজী লোকটা বদ্ধ পাগল! কি করছে দেখুন হুজুর!

মাস-দুই এইভাবে কাটে। শূন্য ঘরে মটুকনাথ সমান উৎসাহে টোল করিয়া চলিয়াছে। একবার সকালে, একবার বৈকালে। ইতিমধ্যে সরস্বতী পূজা আসিল। কাছারিতে দোয়াত-পূজার দ্বারা বাগ্দেবীর অর্চনা নিষ্পন্ন করা হয় প্রতি বৎসর, এ জঙ্গলে প্রতিমা কোথায় গড়ানো হইবে? মটুকনাম তার টোলে শুনিলাম আলাদা পূজা করিবে, নিজের হাতে নাকি প্রতিমা গড়িবে।

ষাট বছরের বৃদ্ধের কি ভরসা, কি উৎসাহ!

নিজের হাতে ছোট প্রতিমা গড়িল মটুকনাথ। টোলে আলাদা পূজা হইল।

বৃদ্ধ হাসিমুখে বলিল—বাবুজী, এ আমাদের পৈতৃক পূজো। আমার বাবা চিরকাল তাঁর টোলে প্রতিমা গড়িয়ে পূজো ক'রে এসেছেন, ছেলেবেলায় দেখেছি। এখন আবার আমার টোলে—

কিন্তু টোল কই?

মটুকনাথকে একথা বলি নাই অবশ্য।

সরস্বতী পূজার দিন-দশ-বারো পরে মটুকনাথ পণ্ডিত আমাকে আসিয়া জানাইল, তাহার টোলে একজন ছাত্র আসিয়া ভর্তি হইয়াছে। আজই সে নাকি কোথা হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

মটুকনাথ ছাত্রটিকে আমার সামনে হাজির করাইল। চৌদ্দ-পনেরো বছরের কালো, শীর্ণকায় বালক, মৈথিলী ব্রাহ্মণ, নিতান্ত গরীব, পরনের কাপড়খানি ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র পর্যন্ত নাই।

মটুকনাথের উৎসাহ দেখে কে! নিজে খাইতে পায় না, সেই মুহূর্তে সে ছাত্রটির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়া বসিল। ইহাই তাহার কুলপ্রথা, টোলের ছাত্রের সকল প্রকার অভাব-অনটন এতদিন তাহাদের টোল হইতে নির্বাহ হইয়া আসিয়াছে, বিদ্যা শিখিবার আশায় যে আসিয়াছে, তাহাকে সে ফিরাইতে পারিবে না।

মাস দুইয়ের মধ্যে দেখিলাম, আরও দু-তিনটি ছাত্র জুটিল টোলে। ইহারা এক বেলা খায়, এক বেলা খায় না। সিপাহীরা চাঁদা করিয়া মকায়ের ছাতু, আটা, চীনার দানা দেয়, কাছারি হইতে আমিও কিছু সাহায্য করি। জঙ্গল হইতে বাথুয়া শাক তুলিয়া আনে ছাত্রেরা—তাহাই সিদ্ধ করিয়া খাইয়া হয়ত একবেলা কাটাইয়া দেয়। মটুকনাথেরও সেই অবস্থা।

রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত মটুকনাথ শুনি ছাত্র পড়াইতেছে টোলঘরের সামনে একটা হরীতকী গাছের তলায়। অন্ধকারেই অথবা জ্যোৎস্নালোকে—কারণ আলো জ্বালাইবার তেল জোটে না।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইয়াছি। মটুকনাথ টোলঘরের জন্য জমি ও ঘর বাঁধিয়া দেওয়ার প্রার্থনা ছাড়া আমার কাছে কোন দিন কোন আর্থিক সাহায্য চায় নাই। কোন দিন বলে নাই, আমার চলে না, একটা উপায় করুন। কাহাকেও সে কিছু জানায় না, সিপাহীরা নিজের ইচ্ছায় যা দেয়।

বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে মটুকনাথের টোলের ছাত্রসংখ্যা বেশ বাড়িল। দশ-বারোটি বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো গরীব বালক বিনা পয়সায় অল্প আয়াসে খাইতে পাইবার লোভে নানা জায়গা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে। কারণ এ-সব দেশে কাকের মুখে একথা ছড়ায়। ছাত্রগুলিকে দেখিয়া মনে হইল ইহারা পূর্বে মহিষ চরাইত ; কারও মধ্যে এতটুকু বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নাই—ইহারা পড়িবে কাব্য-ব্যাকরণ? মটুকনাথকে নিরীহ মানুষ পাইয়া পড়িবার ছুতায় তাহার ঘাড়ে বসিয়া খাইতে আসিয়াছে। কিন্তু মটুকনাথের এসব দিকে খেয়াল নাই, সে ছাত্র পাইয়া মহা খুশী।

একদিন শুনিলাম, টোলের ছাত্রগণ কিছু খাইতে না পাইয়া উপবাস করিয়া আছে। সেই সঙ্গে মটুকনাথও।

মটুকনাথকে ডাকাইয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলাম।

কথাটা ঠিকই। সিপাহীরা চাঁদা করিয়া যে আটা ও ছাতু দিয়াছিল, তাহা ফুরাইয়াছে, কয়েক দিন রাত্রে শুধু বাথুয়া শাক সিদ্ধ আহার করিয়া চলিতেছিল, আজ তাহাও

পাওয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া উহা খাইয়া অনেকের অসুখ হওয়াতে কেহ খাইতে চাহিতেছে না।

—তা এখন কি করবে পণ্ডিতজী?

—কিছু তো ভেবে পাচ্ছিনে হুজুর। ছোট ছোট ছেলেগুলো না খেয়ে থাকবে—

আমি উহাদের সকলের জন্য সিধা বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলাম। দু-তিন দিনের উপযুক্ত চাল, ডাল, ঘি, আটা। বলিলাম—টোল কি ক'রে চালাবে, পণ্ডিতজী? ও উঠিয়ে দাও। খাবে কি, খাওয়াবে কি?

দেখিলাম, আমার কথায় সে আঘাত পাইয়াছে। বলিল—তাও কি হয় হুজুর? টোল কি ছাড়তে পারি? ঐ আমার পৈতৃক ব্যবসায়।

মটুকনাথ সদানন্দ লোক। তাহাকে এ-সব বুঝাইয়া ফল নাই। সে ছাত্র কয়টি লইয়া বেশ মনের সুখেই আছে দেখিলাম।

আমার এই বনভূমির একপ্রান্ত যেন সেকালের ঋষিদের আশ্রম হইয়া উঠিয়াছে মটুকনাথের কৃপায়। টোলের ছাত্ররা কলরব করিয়া পড়াশুনা করে, মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়ায়, কাছারির লাউ-কুমড়ার মাচা হইতে ফল চুরি করে, ফুলগাছের ডাল পাতা ভাঙিয়া ফুল লইয়া যায়, এমন কি মাঝে মাঝে কাছারির লোকজনের জিনিসপত্রও চুরি যাইতে লাগিল —সিপাহীরা বলাবলি করিতে লাগিল, টোলের ছাত্রদের কাজ।

একদিন নায়েবের ক্যাশবাক্স খোলা অবস্থায় তাহার ঘরে পড়িয়া ছিল। কে তাহার মধ্য হইতে কয়েকটি টাকা ও নায়েবের একটি ঘষা মরা-সোনার আংটি চুরি করিল। তাহা লইয়া খুব হৈ হৈ করিল সিপাহীরা। মটুকনাথের এক ছাত্রের কাছে কয়েকদিন পরে আংটিটা পাওয়া গেল। সে কোমরের ঘুনসিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কে দেখিতে পাইয়া কাছারিতে আসিয়া বলিয়া দিল। ছাত্র বামাল-সুদ্ধ ধরা পড়িল।

আমি মটুকনাথকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। সে সত্যই নিরীহ লোক, তাহার ভালমানুষির সুযোগ গ্রহণ করিয়া দুর্দান্ত ছাত্রেরা যাহা খুশি করিতেছে। টোল ভাঙিবার দরকার নাই, অন্তত কয়েকজন ছাত্রকে তাড়াইতেই হইবে। বাকি যাহারা থাকিতে চায়, আমি জমি দিতেছি, উহারা নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জমিতে কিছু কিছু মকাই, চীনাঘাস ও তরকারির চাষ করুক। খাদ্য শস্য যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহাতেই উহাদের চলিবে।

মটুকনাথ এ-প্রস্তাব ছাত্রদের কাছে করিল। বারোজন ছাত্রের মধ্যে আটজন শুনিবামাত্র পালাইল। চারজন রহিয়া গেল, তাও আমার মনে হয় বিদ্যানুরাগের জন্য নয়, নিতান্ত কোথাও উপায় নাই বলিয়া। পূর্বে মহিষ চরাইত, এখন না-হয় চাষ করিবে। সেই হইতে মটুকনাথের টোল চলিতেছে মন্দ নয়।

## ৪

ছটু সিং ও অন্যান্য প্রজাদের জমি বিলি হইয়া গিয়াছে। সর্বসুদ্ধ প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি। নাঢ়া বইহারের জমি অত্যন্ত উর্বর বলিয়া ঐ অংশেই দেড় হাজার বিঘা জমি একসঙ্গে উহাদের দিতে হইয়াছে। সেখানকার প্রান্তরসীমার বনানী অতি শোভাময়ী, কতদিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ায় আসিবার সময়ে সে বন দেখিয়া মনে হইয়াছে, জগতের

মধ্যে নাঢ়া বইহারের এই বন একটা বিউটি স্পট—গেল সে বিউটি স্পট!

দূর হইতে দেখিতাম বনে আগুন দিয়াছে, খানিকটা পোড়াইয়া না ফেলিলে ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গল কাটা যায় না। কিন্তু সব জায়গায় তো বন নাই, দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের ধারে ধারে নিবিড় বন, হয়ত প্রান্তরের মাঝে মাঝে বনঝোপ, কত কি লতা, কত কি বনকুসুম।...

চট্ চট্ শব্দ করিয়া বন পুড়িতেছে, দূর হইতে শুনি—কত শোভাময় লতাবিতান ধ্বংস হইয়া গেল, বসিয়া বসিয়া ভাবি। কেমন একটা কষ্ট হয় বলিয়া ওদিকে যাই না। দেশের একটা এত বড় সম্পদ, মানুষের মনে যাহা চিরদিন শান্তি ও আনন্দ পরিবেষণ করিতে পারিত—একমুষ্টি গমের বিনিময়ে তাহা বিসর্জন দিতে হইল।

কার্তিক মাসের প্রথমে একদিন জায়গাটা দেখিতে গেলাম। সমস্ত মাঠটাতে সরিষা বপন করা হইয়াছে—মাঝে মাঝে লোকজনেরা ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে, ইহার মধ্যেই গরু-মহিষ, স্ত্রী-পুত্র আনিয়া গ্রাম বসাইয়া ফেলিয়াছে।

শীতকালের মাঝামাঝি যখন সর্ষেক্ষেত হলুদ ফুলে আলো করিয়াছে, তখন যে দৃশ্য চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল, তাহার তুলনা নাই। দেড় হাজার বিঘা ব্যাপী একটা বিরাট প্রান্তর দূর দিগ্‌বলয়সীমা পর্যন্ত হলুদ রঙের গালিচায় ঢাকা—এর মধ্যে ছেদ নাই, বিরাম নাই—উপরে নীল আকাশ, ইন্দ্রনীলমণির মত নীল—তার তলায় হলুদ—হলুদ রঙের ধরণী, যতদূর দৃষ্টি যায়। ভাবিলাম, এও একরকম মন্দ নয়।

একদিন নূতন গ্রামগুলি পরিদর্শন করিতে গেলাম। ছটু সিং বাদে সকলেই গরীব প্রজা। তাহাদের জন্য একটি নৈশ স্কুল করিয়া দিব ভাবিলাম—অনেক ছোট ছোট ছেলে-মেয়েকে সর্ষেক্ষেতের ধারে ধারে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে দেখিয়া আমার নৈশ স্কুলের কথা আগে মনে পড়িল।

কিন্তু শীঘ্রই নূতন প্রজারা ভয়ানক গোলমাল বাধাইল। দেখিলাম ইহারা মোটেই শান্তিপ্রিয় নয়। একদিন কাছারিতে বসিয়া আছি, খবর আসিল নাঢ়া বইহারের প্রজারা নিজেদের মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা শুরু করিয়াছে। জমির আল নির্দিষ্ট কিছু না থাকাতেই এই গোলমাল বাধিয়াছে, যাহার পাঁচ-বিঘা জমি সে দশ-বিঘা জমির ফসল দখল করিতে বসিয়াছে। আরও শুনিলাম সর্ষে পাকিবার কিছুদিন আগে ছটু সিং নিজের দেশ হইতে বহু রাজপুত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা গোপনে আনিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আসল উদ্দেশ্য এখন বোঝা যাইতেছে। নিজের তিন-চার-শ বিঘা আবাদী জমির ফসল বাদে সে লাঠির জোরে সমস্ত নাঢ়া বইহারের দেড় হাজার বিঘা (বা যতটা পারে) জমির ফসল দখল করিতে চায়।

কাছারির আমলারা বলিল—এ-দেশের এই নিয়ম হুজুর। লাঠি যার ফসল তার।

যাহাদের লাঠির জোর নাই, তাহারা কাছারিতে আসিয়া আমার কাছে কাঁদিয়া পড়িল। তাহারা নিরীহ গরীব গাঙ্গোতা প্রজা—সামান্য দু-দশ বিঘা জমি জঙ্গল কাটিয়া চাষ করিয়াছিল, স্ত্রী-পুত্র আনিয়া জমির ধারেই ঘর-বাড়ী করিয়া বাস করিতেছিল—এখন সারা বছরের পরিশ্রমের ও আশার সামগ্রী প্রবলের অত্যাচারে যাইতে বসিয়াছে!

কাছারির দুইজন সিপাহীকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়াছিলাম ব্যাপার কি দেখিতে। তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া জানাইল—ভীমদাস টোলার উত্তর সীমায় ভয়ানক দাঙ্গা বাধিয়াছে।

তখনই তহশীলদার সজ্জন সিং ও কাছারির সমস্ত সিপাহীদের লইয়া ঘোড়ায় করিয়া ঘটনাস্থলে রওনা হইলাম। দূর হইতেই একটা হৈ হৈ গোলমাল কানে আসিল। নাঢ়া বইহারের মাঝখান দিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী বহিয়া গিয়াছে—গোলমালটা যেন সেদিকেই বেশী।

নদীর ধারে গিয়া দেখি নদীর দুই পারেই লোক জড় হইয়াছে—প্রায় ষাট-সত্তর জন এপারে, ওপারে ত্রিশ-চল্লিশ জন ছটু সিং-এর রাজপুত লাঠিয়াল। ওপারের লোক এপারে আসিতে চায়, এপারের লোকেরা বাধা দিতে দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যে জন-দুই লোক জখমও হইয়াছে—তাহারা এপারের দলের। জখম হইয়া নদীর জলে পড়িয়াছিল, সেই সময় ছটু সিং-এর লোকেরা টাঙি দিয়া একজনের মাথা কাটিতে চেষ্টা করে—এ-পক্ষ ছিনাইয়া নদী হইতে উঠাইয়া আনিয়াছে। নদীতে অবশ্য পা ডোবে না এমনি জল, পাহাড়ী নদী তার উপর শীতের শেষ।

কাছারির লোকজন দেখিয়া উভয় পক্ষ দাঙ্গা থামাইয়া আমার কাছে আসিল। প্রত্যেক পক্ষ নিজেদের যুধিষ্ঠির এবং অপর পক্ষকে দুর্যোধন বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল। সে হৈ-হৈ কলরবের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। উভয় পক্ষকে কাছারিতে আসিতে বলিলাম। আহত লোক দুটির সামান্য লাঠির চোট লাগিয়াছিল, এমন গুরুতর জখম কিছু নয়। তাহাদেরও কাছারিতে লইয়া আসিলাম।

ছটু সিং-এর লোকেরা বলিল, দুপুরের পরে তাহারা কাছারিতে আসিয়া দেখা করিবে। ভাবিলাম, সব মিটিয়া গেল। কিন্তু তখনও আমি এদেশের লোক চিনি নাই। দুপুরের অল্প পরেই আবার খবর আসিল নাঢ়া বইহারে ঘোর দাঙ্গা বাধিয়াছে। আমি পুনরায় লোকজন লইয়া ছুটিলাম। একজন ঘোড়সওয়ার পনের মাইল দূরবর্তী নও-গাছিয়া থানায় রওনা করিয়া দিলাম। গিয়া দেখি ঠিক ও-বেলার মতই ব্যাপার। ছটু সিং এবেলা আরও অনেক লোক জড় করিয়া আনিয়াছে। শুনিলাম রাসবিহারী সিং রাজপুত ও নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা ছটু সিংকে সাহায্য করিতেছে। ছটু সিং ঘটনাস্থলে ছিল না, তাহার ভাই গজাধর সিং ঘোড়ায় চাপিয়া কিছুদূরে দাঁড়াইয়াছিল—আমায় আসিতে দেখিয়া সরিয়া পড়িল। এবার দেখিলাম রাজপুতদলের দুজনের হাতে বন্দুক রহিয়াছে।

ওপার হইতে রাজপুতেরা হাঁকিয়া বলিল—হুজুর, সরে যান আপনি, আমরা একবার এই বাঁদীর বাচ্চা গাঙ্গোতাদের দেখে নিই।

আমার দলবল গিয়া আমার হুকুমে উভয় দলের মাঝখানে দাঁড়াইল। আমি তাহা-দিগকে জানাইলাম নওগাছিয়া থানায় খবর গিয়াছে, এতক্ষণ পুলিস অর্ধেক রাস্তা আসিয়া পড়িল। ওসব বন্দুক কার নামে? বন্দুকের আওয়াজ করিলে তার জেল অনিবার্য! আইন ভয়ানক কড়া।

বন্দুকধারী লোক দুজন একটু পিছাইয়া পড়িল।

আমি এপারের গাঙ্গোতা প্রজাদের ডাকিয়া বলিলাম—তাহাদের দাঙ্গা করিবার কোনো দরকার নাই। তাহারা যে যার জায়গায় চলিয়া যাক্। আমি এখানে আছি। আমার সমস্ত আমলা ও সিপাহীরা আছে। ফসল লুঠ হয় আমি দায়ী।

গাঙ্গোতা-দলের সর্দার আমার কথার উপর নির্ভর করিয়া নিজের লোকজন হটাইয়া কিছুদূরে একটা বকাইন গাছের তলায় দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—ওখানেও না। একেবারে সোজা বাড়ী গিয়ে ওঠো। পুলিস আসছে।

রাজপুতেরা অত সহজে দমিবার পাত্রই নয়। তাহারা ওপারে দাঁড়াইয়া নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। তহশীলদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার সজ্জন সিং? আমাদের উপর চড়াও হবে নাকি?

তহশীলদার বলিল, হুজুর, ওই যে নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা জুটেছে, ওকেই ভয় হয়। ও বদ্‌মাসটা আস্ত ডাকাত।

—তাহলে তৈরী হয়ে থাকো। নদী পার কাউকে হতে দেবে না। ঘণ্টা দুই সামলে রাখো, তার পরেই পুলিস এসে পড়বে।

রাজপুতেরা পরামর্শ করিয়া কি ঠিক করিল জানি না, একদল আগাইয়া আসিয়া বলিল—হুজুর, আমরা ওপারে যাব।

বলিলাম, কেন?

—আমাদের কি ওপারে জমি নেই?

—পুলিসের সামনে সে কথা বোলো। পুলিস তো এসে পড়ল। আমি তোমাদের এপারে আসতে দিতে পারিনে।

—কাছারিতে একরাশ টাকা সেলামী দিয়ে জমি বন্দোবস্ত নিয়েছি কি ফসল লোক-সান করবার জন্যে? এ আপনার অন্যায় জুলুম।

—সে কথাও পুলিসের সামনে বোলো।

—আমাদের ওপারে যেতে দেবেন না?

—না, পুলিস আসবার আগে নয়। আমার মহালে আমি দাঙ্গা হ'তে দেবো না।

ইতিমধ্যে কাছারির আরও লোকজন আসিয়া পড়িল। ইহারা আসিয়া রব উঠাইয়া দিল, পুলিস আসিতেছে। ছটু সিং-এর দল ক্রমশ দু-একজন করিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল। তখনকার মত দাঙ্গা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু মারপিট, পুলিস-হাঙ্গামা, খুন-জখমের সেই যে সূত্রপাত হইল, দিন দিন তাহা বাড়িয়া চলিতে লাগিল বই কমিল না। আমি দেখিলাম ছটু সিং-এর মত দুর্দান্ত রাজপুতকে একসঙ্গে অতটা জমি বিলি করিবার ফলেই যত গোলমালের সৃষ্টি। ছটু সিংকে একদিন ডাকাইলাম। সে বলিল, এসবের বিন্দুবিসর্গ সে জানে না। সে অধিকাংশ সময় ছাপরায় থাকে। তার লোকেরা কি করে না-করে তার জন্য সে কি করিয়া দায়ী?

বুঝিলাম লোকটা পাকা ঘুঘু। সোজা কথায় এখানে কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইহাকে জব্দ করিতে হইলে অন্য পথ দেখিতে হইবে।

সেই হইতে আমি গাঙ্গোতা প্রজা ভিন্ন অন্য কোন লোককে জমি দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কিন্তু যে-ভুল আগেই হইয়া গিয়াছে, তাহার কোন প্রতিকার আর হইল না। নাঢ়া বইহারের শান্তি চিরদিনের জন্য ঘুচিয়া গেল।

## ৫

আমাদের বারো মাইল দীর্ঘ জংলী-মহালের উত্তর অংশে প্রায় পাঁচ-ছ'শ' একর জমিতে প্রজা বসিয়া গিয়াছে। পৌষ মাসের শেষে একদিন সেদিকে যাইবার দরকার হইয়াছিল—গিয়া দেখি এরা এ-অঞ্চলের চেহারা বদলাইয়া দিয়াছে।

ফুলকিয়ার জঙ্গল হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া চোখে পড়িল সামনে দিগন্তবিস্তীর্ণ

ফুল-ফোটা সর্ষেক্ষেত—যতদূর চোখ যায়, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, একটানা হলদে-ফুল-তোলা একখানা সুবিশাল গালিচা কে যেন পাতিয়া গিয়াছে—এর কোথাও বাধা নাই, ছেদ নাই, জঙ্গলের সীমা হইতে একেবারে বহু, বহু দূরের চক্রবাল-রেখায় নীল শৈলমালার কোলে মিশিয়াছে। মাথার উপরে শীতকালের নির্মেঘ নীল আকাশ। এই অপরূপ শস্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে প্রজাদের কাশের খুপরি। স্ত্রী-পুত্র লইয়া এই দুরন্ত শীতে কি করিয়া তাহারা যে এই কাশ-ডাঁটার বেড়া-ঘেরা কুটিরে এই উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে বাস করে!

ফসল পাকিবার সময়ের আর বেশী দেরি নাই। ইহার মধ্যে কাটুনী মজুরের দল নানাদিক হইতে আসিতে শুরু করিয়াছে। ইহাদের জীবন বড় অদ্ভুত,—পূর্ণিয়া, তরাই ও জয়ন্তীর পাহাড়-অঞ্চল ও উত্তর ভাগলপুর হইতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফসল পাকিবার সময় ইহারা আসিয়া ছোট ছোট কুঁড়েঘর নির্মাণ করিয়া বাস করে ও জমির ফসল কাটে—ফসলের একটা অংশ মজুরিস্বরূপ পায়। আবার ফসল কাটা শেষ হইয়া গেলে কুঁড়েঘর ফেলিয়া রাখিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া চলিয়া যায়। আবার আর বছর আসিবে। ইহাদের মধ্যে নানা জাতি আছে—বেশীর ভাগই গাঙ্গোতা কিন্তু ছত্রী, ভূমিহার ব্রাহ্মণ, মৈথিল ব্রাহ্মণ পর্যন্ত আছে।

এ-অঞ্চলের নিয়ম, ফসল কাটিবার সময়ে ক্ষেতে বসিয়া খাজনা আদায় করিতে হয়—নয়ত এত গরীব প্রজা, ফসল ক্ষেত হইতে উঠিয়া গেলে আর খাজনা দিতে পারে না। খাজনা আদায় তদারক করিবার জন্য দিনকতক আমাকে ফুলকিয়া বইহারের দিগন্ত-বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে থাকিবার দরকার হইল।

তহশীলদার বলিল—ওখানে তাহলে ছোট তাঁবুটা খাটিয়ে দেব?

—একদিনের মধ্যেই ছোট একটি কাশের খুপরি করে দাও না?

—এই শীতে তাতে কি থাকতে পারবেন, হুজুর?

—খুব। তুমি তাই কর।

তাহাই হইল। পাশাপাশি তিন-চারটা ছোট ছোট কাশের কুটির, একটা আমার শয়ন-ঘর, একটা রান্নাঘর, একটাতে দুজন সিপাহী ও পাটোয়ারী থাকিবে। এ-ধরনেব ঘরকে এদেশে বলে 'খুপরি'—দরজা-জানালার বদলে কাশের বেড়ার খানিকটা করিয়া কাটা—বন্ধ করিবার উপায় নাই—হু-হু হিম আসে রাত্রে। এত নীচু যে হামাগুড়ি দিয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়। মেঝেতে খুব পুরু করিয়া শুকনো কাশ ও বন-ঝাউয়ের সুঁটি বিছানো—তাহার উপর শতরঞ্জি, তাহার উপর তোশক-চাদর পাতিয়া ফরাস করা। আমার খুপবিটি দৈর্ঘ্যে সাত হাত, প্রস্থে তিন হাত। সোজা হইয়া দাঁড়ানো অসম্ভব ঘরের মধ্যে, কাবণ উচ্চতায় মাত্র তিন হাত।

কিন্তু বেশ লাগে এই খুপরি। এত আরাম ও আনন্দ কলিকাতায় তিন-চারতলা বাড়ীতে থাকিয়াও পাই নাই। তবে বোধ হয় আমি দীর্ঘদিন এখানে থাকিবার ফলে বন্য হইয়া যাইতেছিলাম, আমার রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাল-মন্দ লাগা সবেরই উপর এই মুক্ত অরণ্য-প্রকৃতির অল্প-বিস্তর প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই এমন হইতেছে কিনা কে জানে?

খুপরিতে ঢুকিয়া প্রথমেই আমার ভাল লাগিল সদ্য-কাটা কাশ-ডাঁটার তাজা সুগন্ধটা, যাহা দিয়া খুপরির বেড়া বাঁধা। তাহার 'পর ভাল লাগিল আমার মাথার কাছেই এক বর্গহাত পরিমিত ঘুলঘুলিপথে দৃশ্যমান, অর্ধশায়িত অবস্থায় আমার দুটি চোখের

দৃষ্টির প্রায় সমতলে অবস্থিত ধু-ধু বিস্তীর্ণ সর্ষেক্ষেতের হলুদে ফুলরাশি। এ-দৃশ্যটা একেবারে অভিনব, আমি যেন একটা পৃথিবীজোড়া হলুদে কার্পেটের উপরে শুইয়া আছি। হু-হু হাওয়ায় তীব্র ঝাঁঝালো সর্ষেফুলের গন্ধ।

শীতও যা পড়িতে হয় পড়িয়াছিল। পশ্চিমে হাওয়ার একদিনও কামাই ছিল না, অমন কড়া রৌদ্র যেন ঠান্ডা জল হইয়া যাইত কনকনে পশ্চিমা হাওয়ার প্রাবল্যে। বই-হারের বিস্তৃত কুল-জঙ্গলের পাশ দিয়া ঘোড়ায় করিয়া ফিরিবার সময় দেখিতাম দূরে তিরাশী-চৌকার অনুচ্চ নীল পাহাড়-শ্রেণীর ওপারে শীতের সূর্যাস্ত। সারা পশ্চিম আকাশ অগ্নিকোণ হইতে নৈর্ঋত কোণ পর্যন্ত রাঙা হইয়া যায়, তরল আগুনের সমুদ্র. হু-হু করিয়া প্রকান্ড অগ্নিগোলকের মত বড় সূর্যটা নামিয়া পড়ে—মনে হয় পৃথিবীর আহ্নিক গতি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি, বিশাল ভূপৃষ্ঠ যেন পশ্চিম দিক হইতে পূর্বে ঘুরিয়া আসিতেছে, অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হইত, সত্যই মনে হইত যেন পশ্চিম দিক্‌চক্রবাল-প্রান্তের ভূপৃষ্ঠ আমার অবস্থিতি-বিন্দুর দিকে ঘুরিয়া আসিতেছে।

রোদটুকু মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেজায় শীত পড়িত, আমরাও সারাদিনের গুরুতর পরিশ্রম ও ঘোড়ায় ইতস্তত ছুটাছুটির পরে সন্ধ্যাবেলা প্রতিদিন আমার খুপরির সামনে আগুন জ্বালিয়া বসিতাম।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাবৃত বনপ্রান্তরের ঊর্ধ্বাকাশে অগণ্য নক্ষত্রালোক কত দূরের বিশ্বরাজির জ্যোতির দূতরূপে পৃথিবীর মানুষের চক্ষুর সম্মুখে দেখা দিত। আকাশে নক্ষত্ররাজি জ্বলিত যেন জ্বলজ্বলে বৈদ্যুতিক বাতির মত—বাংলা দেশে অমন কৃত্তিকা. অমন সপ্তর্ষিমন্ডল কখনও দেখি নাই। দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। নীচে ঘন অন্ধকার বনানী, নির্জনতা, রহস্যময়ী রাত্রি, মাথার উপরে নিত্যসঙ্গী অগণ্য জ্যোতির্লোক। এক-একদিন এক ফালি অবাস্তব চাঁদ অন্ধকারের সমুদ্রে সুদূর বাতিঘরের আলোর মত দেখাইত। আর সেই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারকে আগুনের তীক্ষ্ণ তীর দিয়া সোজা কাটিয়া এদিকে ওদিকে উল্কা খসিয়া পড়িতেছে। দক্ষিণে, উত্তরে. ঈশানে, নৈর্ঋতে, পূর্বে. পশ্চিমে. সর্বদিকে। এই একটা, ওই একটা, ওই দুটো, এই আবার একটা—মিনিটে মিনিটে, সেকেন্ডে সেকেন্ডে।

এক-একদিন গনোরী তেওয়ারী ও আরও অনেকে তাঁবুতে আসিয়া জোটে। নানা রকম গল্প হয়। এইখানেই একদিন একটা অদ্ভুত গল্প শুনিলাম। কথায় কথায় সেদিন শিকারের গল্প হইতেছিল। মোহনপুরা জঙ্গলের বন্য-মহিষের কথা উঠিল। দশরথ সিং ঝান্ডাওয়ালা নামে এক রাজপুত সেদিন লবটুলিয়া কাছারিতে চরের ইজারা ডাকিতে উপস্থিত ছিল। লোকটা এক সময়ে খুব বনে জঙ্গলে ঘুরিয়াছে. দুঁদে শিকারী বলিযা তার নাম আছে। দশরথ ঝান্ডাওয়ালা বলিল—হুজুর, ওই মোহনপুরা জঙ্গলে বুনো মহিষ শিকার করতে আমি একবার টাঁড়বারো দেখি।

মনে পড়িল গনু মাহাতো একবার এই টাঁড়বারোর কথা বলিয়াছিল বটে। বলিলাম —ব্যাপারটা কি?

—হুজুর, সে অনেক দিনের কথা। কুশী নদীর পুল তখনও তৈরী হয় নি। কাটারিয়ায় জোড়া খেয়া ছিল, গাড়ীর প্যাসেঞ্জার খেয়ায় মালসুদ্ধ পারাপার হত। আমরা তখন ঘোড়ার নাচ নিয়ে খুব উন্মত্ত. আমি আর ছাপ্‌রার ছটু সিং। ছটু সিং হরিহর-

ছত্র মেলা থেকে ঘোড়া নিয়ে আসত, আমরা দুজন সেই সব ঘোড়াকে নাচ শেখাতাম, তার পর বেশী দামে বিক্রী করতাম। ঘোড়ার নাচ দু-রকম, জমৈতি আর ফনৈতি। জমৈতিতে যে-সব ঘোড়ার তালিম বেশী, তারা বেশী দামে বিক্রী হয়। ছটু সিং ছিল জমৈতি নাচ শেখাবার ওস্তাদ। দুজনে তিন-চার বছরে অনেক টাকা করেছিলাম।

একবার ছটু সিং পরামর্শ দিলে ঢোলবাজ্যা জঙ্গলে লাইসেন্স নিয়ে বুনো মহিষ ধরে ব্যবসা করতে। সব ঠিকঠাক হল, ঢোলবাজ্যা দ্বারভাঙ্গা মহারাজের রিজার্ভ ফরেস্ট। আমরা কিছু টাকা খাইয়ে বনের আমলাদের কাছ থেকে পোরমিট্ আনালাম। তারপর ক'দিন ধরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বুনো মহিষের যাতায়াতের পথের সন্ধান করে বেড়াই। অত বড় বন হুজুর, একটা বুনো মহিষের দেখা যদি কোন দিন মেলে! শেষে এক বুনো সাঁওতাল লাগালাম। সে একটা বাঁশবনের তলা দেখিয়ে বললে, গভীর রাত্রে এই পথ দিয়ে বুনো মহিষের জেরা (দল) জল খেতে যাবে। সেই পথের মধ্যে গভীর খানা কেটে তার ওপর বাঁশ ও মাটি বিছিয়ে ফাঁদ তৈরী করলাম। রাত্রে মহিষের জেরা যেতে গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়বে।

সাঁওতালটা দেখে-শুনে বললে—কিন্তু সব করছিস বটে তোরা, একটা কথা আছে। ঢোলবাজ্যা জঙ্গলের বুনো মহিষ তোরা মারতে পারবি নে। এখানে টাঁড়বারো আছে।

আমরা তো অবাক্। টাঁড়বারো কি?

সাঁওতাল বুড়ো বললে—টাঁড়বারো হ'ল বুনো মহিষের দলের দেবতা। সে একটাও বুনো মহিষের ক্ষতি করতে দেবে না।

ছটু সিং বললে—ওসব ঝুট্ কথা। আমরা মানি নে। আমরা রাজপুত, সাঁওতাল নই।

তার পর কি হ'ল শুনলে অবাক হয়ে যাবেন হুজুর। এখনও ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। গহিন রাতে আমরা নিকটেই একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি, বুনো মহিষের দলের পায়ের শব্দ শুনলাম, তারা এদিকে আসছে। ক্রমে তারা খুব কাছে এল, গর্ত থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। হঠাৎ দেখি গর্তের ধারে, গর্তের দশ হাত দূরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা সে-মূর্তি, যেন মনে হল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে। বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তারপরে ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাল, ফাঁদের ত্রিসীমানাতে এল না একটাও। বিশ্বাস করুন আর না করুন, নিজের চোখে দেখা।

তারপর আরও দু-একজন শিকারীকে কথাটা জিজ্ঞেস করেছি, তারা আমাদের বললে, ও-জঙ্গলে বুনো মহিষ ধরবার আশা ছাড়। টাঁড়বারো একটা মহিষও মারতে ধরতে দেবে না। আমাদের টাকা দিয়ে পোরমিট্ আনানো সার হ'ল, একটা বুনো মহিষও সেবার ফাঁদে পড়ল না।

দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালার গল্প শেষ হইলে লবটুলিয়ার পাটোয়ারীও বলিল—আমরাও ছেলেবেলা থেকে টাঁড়বারোর গল্প শুনে আসছি। টাঁড়বারো বুনো মহিষের দেবতা—বুনো মহিষের দল বেঘোরে প'ড়ে প্রাণ না হারায়, সে দিকে তাঁর সর্বদা দৃষ্টি।

গল্প সত্য কি মিথ্যা আমার সে-সব দেখিবার আবশ্যক ছিল না, আমি গল্প শুনিতে শুনিতে অন্ধকার আকাশে জ্যোতির্ময় খড়্গধারী কালপুরুষের দিকে চাহিতাম, নিস্তব্ধ ঘন বনানীর উপর অন্ধকার আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দূরে কোথায় বনের মধ্যে

বন্য কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল, অন্ধকার ও নিঃশব্দ আকাশ, অন্ধকার ও নিঃশব্দ পৃথিবী শীতের রাত্রে পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়া কি যেন কানাকানি করিতেছে—অনেক দূরে মোহনপুরা অরণ্যের কালো সীমারেখার দিকে চাহিয়া এই অশ্রুতপূর্ব বনদেবতার কথা মনে হইয়া শরীর যেন শিহরিয়া উঠিত। এই সব গল্প শুনিতে ভাল লাগে, এই রকম নির্জ্জন অরণ্যের মাঝখানে ঘন শীতের রাত্রে এই রকম আগুনের ধারেই বসিয়া।

## দশম পরিচ্ছেদ

### ১

পনের দিন এখানে একেবারে বন্য-জীবন যাপন করিলাম, যেমন থাকে গাঙ্গোতারা কি গরীব ভুঁইহার বামুনরা। ইচ্ছা করিয়া নয়, অনেকটা বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইল এ ভাবে। এ জঙ্গলে কোথা হইতে কি আনাইব? খাই ভাত ও বন-ধুঁধুলের তরকারি, বনের কাঁকরোল কি মিষ্টি আলু তুলিয়া আনে সিপাহীরা, তাই ভাজা বা সিদ্ধ। মাছ দুধ ঘি—কিছু নাই।

অবশ্য, বনে সিল্লি ও ময়ূরের অভাব ছিল না, কিন্তু পাখী মারিতে তেমন যেন মন সরে না বলিয়া বন্দুক থাকা সত্ত্বেও নিরামিষই খাইতে হইত।

ফুলকিয়া বইহারে বাঘের ভয় আছে। একদিনের ঘটনা বলি।

হাড়ভাঙা শীত সেদিন। রাত দশটার পরে কাজকর্ম মিটাইয়া সকাল সকাল শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, হঠাৎ কত রাত্রে জানি না, লোকজনের চীৎকারে ঘুম ভাঙিল। জঙ্গলের ধারের কোন্ জায়গায় অনেকগুলি লোক জড় হইয়া চীৎকার করিতেছে। উঠিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিলাম। আমার সিপাহীরা পাশের খুপরি হইতে বাহির হইয়া আসিল। সবাই মিলিয়া ভাবিতেছি ব্যাপারটা কি, এমন সময়ে একজন লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—ম্যানেজারবাবু, বন্দুকটা নিয়ে শীগগির চলুন—বাঘে একটা ছোট ছেলে নিয়ে গিয়েছে খুপরি থেকে।

জঙ্গলের ধার হইতে মাত্র দু-শ' হাত দূরে ফসলের ক্ষেতের মধ্যে ডোমন বলিয়া একজন গাঙ্গোতা প্রজার একখানা খুপরি। তাহার স্ত্রী ছ-মাসের শিশু লইয়া খুপরির মধ্যে শুইয়াছিল—অসম্ভব শীতের দরুন খুপরির মধ্যেই আগুন জ্বালানো ছিল, এবং ধোঁয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য ঝাঁপটা একটু ফাঁক ছিল। সেই পথে বাঘ ঢুকিয়া ছেলেটিকে লইয়া পলাইয়াছে।

কি করিয়া জানা গেল বাঘ? শিয়ালও তো হইতে পারে। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া আর কোন সন্দেহ রহিল না, ফসলের ক্ষেতের নরম মাটিতে স্পষ্ট বাঘের থাবার দাগ।

আমার পাটোয়ারী ও সিপাহীরা মহালের অপবাদ রটিতে দিতে চায় না, তাহারা জোর গলায় বলিতে লাগিল—এ আমাদের বাঘ নয় হুজুর, এ মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের বাঘ। দেখুন না কত বড় থাবা!

যাহাদেরই বাঘ হউক, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। বলিলাম, সব লোক জড় কর মশাল তৈরী কর—চল জঙ্গলের মধ্যে দেখি। সেই রাত্রে অত বড় বাঘের পায়ের সদ্য

থাবা দেখিয়া ততক্ষণ সকলেই ভয়ে কাঁপিতে শুরু করিয়াছে—জঙ্গলের মধ্যে কেহ যাইতে রাজী নয়। ধমক ও গালমন্দ দিয়া জন-দশেক লোক জুটাইয়া মশালহাতে টিন পিটাইতে পিটাইতে সবাই মিলিয়া জঙ্গলের নানা স্থানে বৃথা অনুসন্ধান করা গেল।

পরদিন বেলা দশটার সময় মাইল-দুই দূরে দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা বড় আসান-গাছের তলায় শিশুটির রক্তাক্ত দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইল।

কৃষ্ণপক্ষের কি ভীষণ অন্ধকার রাত্রিগুলিই নামিল তাহার পরে!

সদর কাছারি হইতে বাঁকে সিং জমাদারকে আনাইলাম। বাঁকে সিং শিকারী, বাঘের গতিবিধির অভ্যাস তার ভালই জানা। সে বলিল, হুজুর, মানুষখেকো বাঘ বড় ধূর্ত হয়। আর ক'টা লোক মরবে। সাবধান হয়ে থাকতে হবে।

ঠিক তিনদিন পরেই বনের ধারে সন্ধ্যার সময় একটা রাখালকে বাঘে লইয়া গেল। ইহার পর লোকে ঘুম বন্ধ করিয়া দিল। রাত্রে এক অপরূপ ব্যাপার! বিস্তীর্ণ বইহারের বিভিন্ন খুপরি হইতে সারা রাত টিনের ক্যানেস্ত্রা পিটাইতেছে, মাঝে মাঝে কাশের ডাঁটার আঁটি জ্বালাইয়া আগুন করিয়াছে, আমি ও বাঁকে সিং প্রহরে প্রহরে বন্দুকের দ্যাওড় করিতেছি। আর শুধুই কি বাঘ? ইহার মধ্যে একদিন মোহনপুরা ফরেস্ট হইতে বন্য-মহিষের দল বাহির হইয়া অনেকখানি ক্ষেতের ফসল তচনচ করিয়া দিল।

আমার কাশের খুপরির দরজার কাছেই সিপাহীরা খুব আগুন করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে উঠিয়া তাহাতে কাঠ ফেলিয়া দিই। পাশের খুপরিতে সিপাহীরা কথাবার্তা বলিতেছে—খুপরির মেঝেতেই শুইয়া আছি, মাথার কাছের ঘুলঘুলি দিয়া দেখা যাইতেছে ঘন অন্ধকারে-ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে ক্ষীণ তারার আলোয় পরিদৃশ্যমান জঙ্গলের আবছায়া সীমারেখা। অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইল, যেন মৃত নক্ষত্রলোক হইতে তুষারবর্ষী হিমবাতাস তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে পৃথিবীর দিকে—লেপ-তোশক হিমে ঠান্ডা জল হইয়া গিয়াছে, আগুন নিবিয়া আসিতেছে, কি দুরন্ত শীত! আর সেই সঙ্গে উন্মুক্ত প্রান্তরের অবাধ হু-হু তুষারশীতল নৈশ হাওয়া!

কিন্তু কি করিয়া থাকে এখানকার লোকেরা এই শীতে, এই আকাশের তলায় সামান্য কাশের খুপরির ঠান্ডা মেঝের উপর, কি করিয়া রাত্রি কাটায়? তাহার উপর ফসল চৌকি দিবার এই কষ্ট, বন্য-মহিষের উপদ্রব, বন্য-শূকরের উপদ্রব কম নয়—বাঘও আছে। আমাদের বাংলা দেশের চাষীরা কি এত কষ্ট করিতে পারে? অত উর্বর জমিতে, অত নিরুপদ্রব গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে ফসল করিয়াও তাহাদের দুঃখ ঘোচে না।

আমার ঘরের দু-তিন-শ' হাত দূরে দক্ষিণ-ভাগলপুর হইতে আগত জনকতক কার্টুনি মজুর স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফসল কাটিতে আসিয়াছে। একদিন সন্ধ্যায় তাহাদের খুপরির কাছ দিয়া আসিবার সময় দেখি কুঁড়ের সামনে বসিয়া সবাই আগুন পোহাইতেছে।

এদের জগৎ আমার কাছে অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞাত। ভাবিলাম, সেটা দেখি না কেমন!

গিয়া বলিলাম—বাবাজী, কি করা হচ্ছে?

একজন বৃদ্ধ ছিল দলে, তাহাকেই এই সম্বোধন। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমায় সেলাম করিল, বসিয়া আগুন পোহাইতে অনুরোধ করিল। ইহা এদেশের প্রথা। শীতকালে আগুন পোহাইতে আহ্বান করা ভদ্রতার পরিচয়।

গিয়া বসিলাম। খুপরির মধ্যে উঁকি দিয়া দেখি বিছানা বা আসবাবপত্র বলিতে ইহাদের কিছু নাই। কুঁড়েঘরের মেঝেতে মাত্র কিছু শুকনো ঘাস বিছানো। বাসনকোসনের

মধ্যে খুব বড় একটা কাঁসার জামবাটি আর একটা লোটা। কাপড় যার যা পরনে আছে—আর এক টুকরা বস্ত্রও বাড়তি নাই। কিন্তু তাহা তো হইল, এই নিদারুণ শীতে ইহাদের লেপ-কাঁথা কই? রাত্রে গায়ে দেয় কি?

কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

বৃদ্ধের নাম নক্‌ছেদী ভকত। জাতি গাঙ্গোতা। সে বলিল—কেন, খুপরির কোণে ঐ যে কলাইয়ের ভূষি দেখছেন না রয়েছে টাল করা?

বুঝিতে পারিলাম না। কলাইয়ের ভূষির আগুন করা হয় রাত্রে?

নক্‌ছেদী আমার অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিল।

—তা নয় বাবুজী। কলাইয়ের ভূষির মধ্যে ঢুকে ছেলেপিলেরা শুয়ে থাকে, আমরাও কলাইয়ের ভূষি গায়ে চাপা দিয়ে শুই। দেখছেন না, অন্তত পাঁচ মণ ভূষি মজুত রয়েছে। ভারী ওম্ কলাইয়ের ভূষিতে। দুখানা কম্বল গায়ে দিলেও অমন ওম্ হয় না। আর আমরা পাবই বা কোথায় কম্বল বলুন না?

বলিতে বলিতে একটা ছোট ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার মা খুপরির কোণের ভূষির গাদার মধ্যে তাহার পা হইতে গলা পর্যন্ত ঢুকাইয়া কেবলমাত্র মুখখানা বাহির করিয়া শোওয়াইয়া রাখিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিলাম, মানুষে মানুষের খোঁজ রাখে কতটুকু? কখনও কি জানিতাম এসব কথা? আজ যেন সত্যিকার ভারতবর্ষকে চিনিতেছি।

অগ্নিকুণ্ডের অপর পার্শ্বে বসিয়া একটি মেয়ে কি রাঁধিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কি রান্না হচ্ছে?

নক্‌ছেদী বলিল—ঘাটো।

—ঘাটো কি জিনিস?

এবার বোধ হয় রন্ধনরতা মেয়েটি ভাবিল, এ বাংগালী বাবু সন্ধ্যাবেলা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। এ দেখিতেছি নিতান্ত বাতুল। কিছুই খোঁজ রাখে না দুনিয়ার। সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ঘাটো জান না বাবুজী? মকাই-সেদ্ধ। যেমন চাল সেদ্ধ হ'লে বলে ভাত, মকাই সেদ্ধ করলে বলে ঘাটো।

মেয়েটি আমার অজ্ঞতার প্রতি কৃপাবশতঃ কাঠের খুন্তির আগায় উক্ত দ্রব্য একটু-খানি হাঁড়ি হইতে তুলিয়া দেখাইল।

—কি দিয়ে খায়?

এবার হইতে যত কথাবার্তা মেয়েটিই বলিল। হাসি-হাসি মুখে বলিল—নুন দিয়ে, শাক দিয়ে—আবার কি দিয়ে খাবে বল না!

—শাক রান্না হয়েছে?

—ঘাটো নামিয়ে শাক চড়াব। মটরশাক তুলে এনেছি।

মেয়েটি খুবই সপ্রতিভ। জিজ্ঞাসা করিল—কলকাতায় থাক বাবুজী?

—হ্যাঁ।

—কি রকম জায়গা? আচ্ছা, কলকাতায় নাকি গাছ নেই? ওখানকার সব গাছপালা কেটে ফেলেছে?

—কে বললে তোমায়?

—একজন ওখানে কাজ করে আমাদের দেশের। সে একবার বলেছিল। কি রকম জায়গা দেখতে বাবুজী?

এই সরলা বন্য মেয়েটিকে যতদূর সম্ভব বুঝাইবার চেষ্টা পাইলাম আধুনিক যুগের একটা বড় শহরের ব্যাপারখানা কি। কতদূর বুঝিল জানি না, বলিল—কলকাত্তা শহর দেখতে ইচ্ছে হয়—কে দেখাবে?

তাহার পর আরও অনেক কথা বলিলাম তাহার সঙ্গে। রাত বাড়িয়া গিয়াছে, অন্ধকার ঘন হইয়া আসিল। উহাদের রান্না শেষ হইয়া গেল। খুপরির ভিতর হইতে সেই বড় জাম-বাটিটা আনিয়া তাহাতে ফেন-ভাতের মত জিনিসটা ঢালিল। উপর উপর একটু নুন ছড়াইয়া বাটিটা মাঝখানে রাখিয়া ছেলেমেয়েরা সবাই মিলিয়া চারিদিকে গোল হইয়া বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

আমি বলিলাম—তোমরা এখান থেকে বুঝি দেশে ফিরবে?

নক্‌ছেদী বলিল—দেশে এখন ফিরতে অনেক দেরি। এখান থেকে ধরমপুর অঞ্চলে ধান কাটতে যাব—ধান তো এদেশে হয় না—ওখানে হয়। ধান কাটার কাজ শেষ হ'লে আবার যাব গম কাটতে মুঙ্গের জেলায়। গমের কাজ শেষ হ'তে জ্যৈষ্ঠ মাস এসে পড়বে। তখন আবার খেড়ী কাটা শুরু হবে আপনাদেরই এখানে। তার পর কিছুদিন ছুটি! শ্রাবণ-ভাদ্রে আবার মকাই ফসলের সময় আসবে। মকাই শেষ হলেই কলাই এবং ধরমপুর-পূর্ণিয়া অঞ্চলে কার্তিকশাল ধান। আমরা সারা বছর এই রকম দেশে দেশেই ঘুরে বেড়াই। যেখানে যে সময়ে যে ফসল, সেখানে যাই। নইলে খাব কি?

—বাড়ী-ঘর বলে তোমাদের কিছু নেই?

এবার মেয়েটি কথা বলিল। মেয়েটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, খুব স্বাস্থ্যবতী, বার্ণিশ-করা কালো রং, নিটোল গড়ন। কথাবার্তা বেশ বলিতে পারে, আর গলার সুরটা দক্ষিণ-বিহারের দেহাতী হিন্দীতে বড় চমৎকার শোনায়।

বলিল—কেন থাকবে না বাবুজী? সবই আছে। কিন্তু সেখানে থাকলে আমাদের তো চলে না। সেখানে যাব গরমকালের শেষে, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকব। তার পর আবার বেরুতে হবে বিদেশে—বিদেশেই যখন আমাদের চাকরি। তা ছাড়া বিদেশে কত কি মজা দেখা যায়—এই দেখবেন ফসল কাটা হয়ে গেলে আপনাদের এখানেই কত দেশ থেকে কত লোক আসবে। কত বাজিয়ে, গাইয়ে, নাচনেওয়ালী, কত বহুরূপী সং—আপনি বোধ হয় দেখেন নি এসব? কি ক'রে দেখবেন, আপনাদের এ অঞ্চল তো ঘোর জঙ্গল হয়ে প'ড়ে ছিল—সবে এইবার চাষ হয়েছে। এই দেখুন না আসে আর পনের দিনের মধ্যেই। এই তো সবারই রোজগারের সময় আসছে।

চারিদিক নির্জ্জন। দূরের বস্তিতে কারা টিন পিটাইতেছে অন্ধকারের মধ্যে। মনে ভাবিলাম, এই অর্গলহীন কাশডাঁটার বেড়ার আগড়-দেওয়া কুঁড়েতে ইহারা রাত কাটাইবে এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের ধারে, ছেলেপুলে লইয়া—সাহসও আছে বলিতে হইবে। এই তো মাত্র দিন-কয়েক আগে এদেরই মত আর একটা খুপরি হইতে বাঘে ছেলে লইয়া গিয়াছে মায়ের কোল হইতে—এদেরই বা ভরসা কিসের? অথচ একটা ব্যাপার দেখিলাম, ইহারা যেন ব্যাপারটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। তত সন্ত্রস্ত ভাবও নাই। এই তো এত রাত পর্যন্ত উন্মুক্ত আকাশের তলায় বসিয়া গল্পগুজব, রান্নাবান্না করিল। বলিলাম—তোমরা একটু সাবধানে থাকবে। মানুষ-খেকো বাঘ বেরিয়েছে, জান তো? মানুষ-খেকো বাঘ বড় ভয়ানক জানোয়ার, আর বড় ধূর্ত। আগুন রাখো খুপরির সামনে, আর ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়। ঐ তো কাছেই বন, রাত-বেরাতের ব্যাপার—

মেয়েটি বলিল—বাবুজী, ও আমাদের সয়ে গিয়েছে। পূর্ণিয়া জেলায় যেখানে ফি-বছর ধান কাটতে যাই, সেখানে পাহাড় থেকে বুনো হাতী নামে। সে জঙ্গল আরও ভয়ানক। ধানের সময় বিশেষ ক'রে বুনো হাতীর দল এসে উপদ্রব করে।

মেয়েটি আগুনের মধ্যে আর কিছু শুক্‌নো বনঝাউয়ের ডাল ফেলিয়া দিয়া সামনের দিকে সরিয়া আসিয়া বসিল।

বলিল—সেবার আমরা অখিলকুচা পাহাড়ের নীচে ছিলাম। একদিন রাত্রে এক খুপরির বাইরে রান্না করছি, চেয়ে দেখি পঞ্চাশ হাত দূরে চার-পাঁচটা বুনো হাতী—কালো কালো পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে অন্ধকারে—যেন আমাদের খুপরির দিকেই আসছে। আমি ছোট ছেলেটাকে বুকে নিয়ে বড় মেয়েটার হাত ধরে রান্না ফেলে খুপরির মধ্যে তাদের রেখে এলাম। কাছে আর কোনো লোকজন নেই, বাইরে এসে দেখি তখন হাতী ক'টা একটু থমকে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে আমার গলা কাঠ হয়ে গিয়েছে। হাতীতে খুব দেখতে পায় না তাই রক্ষে—ওরা বাতাসে গন্ধ পেয়ে দূরের মানুষ বুঝতে পারে। তখন বোধ হয় বাতাস অন্য দিকে বইছিল, যাই হোক, তারা অন্য দিকে চলে গেল। ওঃ, সেখানেও এমনি বাবুজী সারারাত টিন পেটায় আর আলো জ্বালিয়ে রাখে হাতীর ভয়ে। এখানে বুনো মহিষ, সেখানে বুনো হাতী। ওসব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

রাত বেশী হওয়াতে নিজের বাসায় ফিরিলাম।

দিন পনেরোর মধ্যে ফুলকিয়া বইহারের চেহারা বদলাইয়া গেল। সরিষার গাছ শুকাইয়া মাড়িয়া বীজ বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে দলে দলে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, ছাপরা প্রভৃতি স্থান হইতে মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা দাঁড়িপাল্লা ও বস্তা লইয়া আসিল মাল কিনিতে। তাদের সঙ্গে কুলির ও গাড়োয়ানের কাজ করিতে আসিল এক দল লোক। হালুইকররা আসিয়া অস্থায়ী কাশের ঘর তুলিয়া মিঠাইয়ের দোকান খুলিয়া সতেজে পুরী, কচৌরি, লাড্ডু, কালাকন্দ্ বিক্রয় করিতে লাগিল। ফিরিওয়ালারা নানা রকম সস্তা ও খেলো মনোহারী জিনিস, কাচের বাসন, পুতুল, সিগারেট, ছিটের কাপড়, সাবান ইত্যাদি লইয়া আসিল।

এ বাদে আসিল রং-তামাশা দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিতে কত ধরনের লোক। নাচ দেখাইতে, রামসীতা সাজিয়া ভক্তের পূজা পাইতে, হনুমানজীর সিঁদুরমাখা মূর্তি হাতে পাণ্ডাঠাকুর আসিল প্রণামী কুড়াইতে। এ সময় সকলেরই দু-পয়সা রোজগারের সময় এসব অঞ্চলে।

আর-বছরও যে জনশূন্য ফুলকিয়া বইহারের প্রান্তর ও জঙ্গল দিয়া, বেলা পড়িয়া গেলে ঘোড়ায় যাইতেও ভয় করিত—এ-বছর তাহার আনন্দোৎফুল্ল মূর্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। চারিদিকে বালক-বালিকার হাস্যধ্বনি, কলরব, সস্তা টিনের ভেঁপুর পিঁপিঁ বাজনা, ঝুমঝুমির আওয়াজ, নাচিয়েদের ঘুঙুরের ধ্বনি—সমস্ত ফুলকিয়ার বিরাট প্রান্তর জুড়িয়া যেন একটা বিশাল মেলা বসিয়া গিয়াছে।

লোকসংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে অত্যন্ত বেশী। কত নূতন খুপরি, কাশের লম্বা চালা-ঘর চারিদিকে রাতারাতি উঠিয়া গেল। ঘর তুলিতে এখানে কোন খরচ নাই, জঙ্গলে আছে কাশ ও বনঝাউ কি কেঁদ-গাছের গুঁড়ি ও ডাল। শুকনো কাশের ডাঁটার খোলা পাকাইয়া এদেশে একরকম ভারি শক্ত রশি তৈরি করে, আর আছে ওদের নিজেদের শারীরিক

পরিশ্রম।

ফুলকিয়ার তহশীলদার আসিয়া জানাইল, এই সব বাহিরের লোক, যাহারা এখানে পয়সা রোজগার করিতে আসিয়াছে, ইহাদের কাছে জমিদারের খাজনা আদায় করিতে হইবে।

বলিল—আপনি রীতিমত কাছারি করুন হুজুর, আমি সব লোক একে একে আপনার কাছে হাজির করাই—আপনি ওদের মাথাপিছু একটা খাজনা ধার্য ক'রে দিন।

কত রকমের লোক দেখিবার সুযোগ পাইলাম এই ব্যাপারে!

সকাল হইতে দশটা পর্যন্ত কাছারি করিতাম, বৈকালে আবার তিনটার পর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

তহশীলদার বলিল—এরা বেশী দিন এখানে থাকবে না, ফসল মাড়া ও বেচাকেনা শেষ হয়ে গেলেই সব পালাবে। এর আগে এদের পাওনা আদায় ক'রে নিতে হবে।

একদিন দেখিলাম একটি খামারে মাবোয়াড়ী মহাজনেরা মাল মাপিতেছে। আমার মনে হইল ইহারা ওজনে নিরীহ প্রজাদের ঠকাইতেছে। আমার পাটোয়ারী ও তহশীলদারদের বলিলাম সমস্ত ব্যবসায়ীর কাঁটা ও দাঁড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে। দু-চারজন মহাজনকে ধরিয়া মাঝে মাঝে আমার সামনে আনিতে লাগিল—তাহারা ওজনে ঠকাইয়াছে, কাহারও দাঁড়ির মধ্যে জুয়াচুরি আছে। সে-সব লোককে মহাল হইতে বাহির করিয়া দিলাম। প্রজাদের এত কষ্টের ফসল আমার মহালে অন্তত কেহ ফাঁকি দিয়া লইতে পারিবে না।

দেখিলাম শুধু মহাজনে নয়, নানা শ্রেণীর লোকে ইহাদের অর্থের ভার লাঘব করিবার চেষ্টায় ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে।

এখানে নগদ পয়সার কারবার খুব বেশী নাই। ফিরিওয়ালাদের কাছে কোন জিনিস কিনিলে ইহারা পয়সার বদলে সরিষা দেয়, জিনিসের দামের অনুপাতে অনেক বেশী সরিষা দিয়া দেয়—বিশেষত মেয়েরা। তাহারা নিতান্ত নিরীহ ও সরল, যা তা বুঝাইয়া তাহাদের নিকট হইতে ন্যায্যমূল্যের চতুর্গুণ ফসল আদায় করা খুবই সহজ।

পুরুষেরাও বিশেষ বৈষয়িক নয়।

তাহারা বিলাতী সিগারেট কেনে, জুতা-জামা কেনে। ফসলের টাকা ঘরে আসিলে ইহাদের ও বাড়ীর মেয়েদের মাথা ঘুরিয়া যায়—মেয়েরা ফরমাস করে রঙীন কাপড়ের, কাচের ও এনামেলের বাসনের, হালুইকরের দোকান হইতে ঠোঙা ঠোঙা লাড্ডু-কচৌরী আসে, নাচ দেখিয়া, গান শুনিয়াই কত পয়সা উড়াইয়া দেয়। ইহার উপর রামজী, হনুমানজীর প্রণামী ও পূজা তো আছেই। তাহার উপরেও আছে জমিদার ও মহাজনের পাইক-পেয়াদারা। দুর্দান্ত শীতে রাত জাগিয়া বন্য-শূকর ও বন্য-মহিষের উপদ্রব হইতে কত কষ্টে ফসল বাঁচাইয়া, বাঘের মুখে, সাপের মুখে নিজেদের ফেলিতে দ্বিধা না করিয়া সারা বছরের ইহাদের যাহা উপার্জন,—এই পনের দিনের মধ্যে খুশীর সহিত তাহা উড়াইয়া দিতে ইহাদের বাধে না দেখিলাম।

কেবল একটা ভালর দিক দেখা গেল, ইহারা কেহ মদ বা তাড়ি খায় না। গাঙ্গোতা বা ভূঁইহার ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ-সব নেশার রেওয়াজ নাই—সিদ্ধিটা অনেকে খায়, তাও কিনিতে হয় না, বনসিদ্ধির জঙ্গল হইয়া আছে লবটুলিয়া ও ফুলকিয়ার প্রান্তরে, পাতা ছিঁড়িয়া আনিলেই হইল—কে দেখিতেছে?

একদিন মুনেশ্বর সিং আসিয়া জানাইল, একজন লোক জমিদারের খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইতেছে—হুকুম হয় তো ধরিয়া আনে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—পালাচ্ছে কি রকম? দৌড়ে পালাচ্ছে?

—ঘোড়ার মত দৌড়ুচ্ছে হুজুর, এতক্ষণে বড় কুণ্ডী পার হয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে পৌঁছল।

দুর্বৃত্তকে ধরিয়া আনিবার হুকুম দিলাম।

এক ঘণ্টার মধ্যে চার-পাঁচজন সিপাহী পলাতক আসামীকে আমার সামনে আনিয়া হাজির করিল।

লোকটাকে দেখিয়া আমার মুখে কথা সরিল না। তাহার বয়স ষাটের কম কোনমতেই হইবে বলিয়া আমার তো মনে হইল না—মাথার চুল সাদা, গালের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় সে কতকাল বুভুক্ষু ছিল, এইবার ফুলকিয়া বইহারের খামারে আসিয়া পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছে।

শুনিলাম সে নাকি 'ননীচোর নাটুয়া' সাজিয়া আজ কয়দিনে বিস্তর পয়সা রোজগার করিয়াছে, গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের তলায় একটা খুপরিতে থাকিত, আজ কয়দিন ধরিয়া সিপাহীরা তাহার কাছে খাজনার তাগাদা করিতেছে, কারণ এদিকে ফসলের সময়ও ফুরাইয়া আসিল। আজ তাহার খাজনা মিটাইবার কথা ছিল। হঠাৎ দুপুরের পরে সিপাহীরা খবর পায় সে লোকটা তল্পিতল্পা বাঁধিয়া রওয়ানা হইয়াছে। মুনেশ্বর সিং ব্যাপার কি জানিতে গিয়া দেখে যে আসামী বইহার ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে পূর্ণিয়া অভিমুখে—মুনেশ্বরের হাঁক শুনিয়া সে নাকি দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার পরই এই অবস্থা।

সিপাহীদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে কিন্তু আমার সন্দেহ জন্মিল। প্রথমত 'ননীচোর নাটুয়া' মানে যদি বালক শ্রীকৃষ্ণ হয় তবে ইহার সে সাজিবার বয়স আর আছে কি? দ্বিতীয়ত, এ লোকটা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছিল, এ কথাই বা কি করিয়া সম্ভব!

কিন্তু উপস্থিত সকলেই হলফ করিয়া বলিল—উভয় কথাই সত্য।

তাহাকে কড়া সুরে বলিলাম—তোমার এ দুর্বুদ্ধি কেন হ'ল, জমিদারের খাজনা দিতে হয় জান না? তোমার নাম কি?

লোকটা ভয়ে বাতাসের মুখে তালপাতার মত কাঁপিতেছিল। আমার সিপাহীরা একে চায় তো আরে পায়, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে। তাহারা যে এই বৃদ্ধ নটের প্রতি খুব বিনয় ও মোলায়েম ব্যবহার করে নাই ইহার অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝিতে দেরি হইল না।

লোকটা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল তাহার নাম দশরথ।

—কি জাত? বাড়ী কোথায়?

—আমরা ভুঁইহার বাভন হুজুর। বাড়ী মুঙ্গের জেলা—সাহেবপুর কামাল।

—পালাচ্ছিলে কেন?

—কই না, পালাব কেন, হুজুর?

—বেশ, খাজনা দাও।

—কিছুই পাই নি, খাজনা দেব কোথা থেকে? নাচ দেখিয়ে সর্ষে পেয়েছিলাম, তা বেচে ক'দিন পেটে খেয়েছি। হনুমানজীর কিরিয়া।

সিপাহীরা বলিল—সব মিথ্যে কথা। শুনবেন না হুজুর। ও অনেক টাকা রোজগার করেছে। ওর কাছেই আছে। হুকুম করেন তো ওর কাপড়চোপড় সন্ধান করি।

লোকটা ভয়ে হাতজোড় করিয়া বলিল—হুজুর, আমি বলছি আমার কাছে কত আছে।

পরে কোমর হইতে একটা গেঁজে বাহির করিয়া উপুড় করিয়া ঢালিয়া বলিল—এই দেখুন হুজুর, তের আনা পয়সা আছে। আমার কেউ নেই, এই বুড়ো বয়সে কে-ই বা আমায় দেবে? আমি নাচ দেখিয়ে এই ফসলের সময় খামারে খামারে বেড়িয়ে যা রোজগার করি। আবার সেই গমের সময় পর্যন্ত এতেই চালাব; তার এখনও তিন মাস দেরি। যা পাই পেটে দুটো খাই, এই পর্যন্ত। সিপাহীরা বলছে, আমায় নাকি আট আনা খাজনা দিতে হবে—তা হলে আমার আর রইল মোটে পাঁচ আনা। পাঁচ আনায় তিন মাস কি খাব?

বলিলাম—তোমার হাতে ও পোঁটলাতে কি আছে? বার কর।

লোকটা পোঁটলা খুলিয়া দেখাইল তাহাতে আছে ছোট্ট একখানা টিনমোড়া আর্সি, একটা রাংতার মুকুট—ময়ূরপাখা সমেত, গালে মাখিবার রং, গলায় পরিবার পুঁতির মালা ইত্যাদি—কৃষ্ণঠাকুর সাজিবার উপকরণ।

বলিল—দেখুন তবুও বাঁশী নেই হুজুর। একটা টিনের বড় বাঁশী আট আনার কম হবে না। এখানে নলখাগড়ার বাঁশীতে কাজ চালিয়েছি। এরা গাঙোতা জাত, এদের ভুলানো সহজ। কিন্তু আমাদের মুঙ্গের জেলার লোক সব বড় এলেমদার। বাঁশী না হ'লে হাসবে। কেউ পয়সা দেবে না।

আমি বলিলাম—বেশ, তুমি খাজনা দিতে না পার, নাচ দেখিয়ে যাও, খাজনার বদলে।

বৃদ্ধ হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছে এমন ভাব দেখাইল। তাহার পর গালেমুখে রং মাখিয়া ময়ূরপাখা মাথায় ঐ বয়সে সে যখন বারো বছরের বালকের ভঙ্গিতে হেলিয়া দুলিয়া হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিল—তখন হাসিব কি কাঁদিব স্থির করিতে পারিলাম না।

আমার সিপাহীরা তো মুখে কাপড় দিয়া বিদ্রূপের হাসি চাপিতে প্রাণপণ করিতেছে। তাহাদের চক্ষে 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ এক মারাত্মক ব্যাপারে পরিণত হইল। বেচারীরা ম্যানেজারবাবুর সামনে না পারে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে, না পারে দুর্দমনীয় হাসির বেগ সামলাইতে।

সে-রকম অদ্ভুত নাচ কখনও দেখি নাই, ষাট বছরের বৃদ্ধ কখনও বালকের মত অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কাল্পনিক জননী যশোদার নিকট হইতে দূরে চলিয়া আসিতেছে, কখনও একগাল হাসিয়া সঙ্গী রাখাল বালকগণের মধ্যে চোরা-ননী বিতরণ করিতেছে, যশোদা হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া কখনও জোড়-হাতে চোখের জল মুছিয়া খুঁৎ খুঁৎ করিয়া বালকের সুরে কাঁদিতেছে। সমস্ত জিনিস দেখিলে হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়। দেখিবার মত বটে।

নাচ শেষ হইল। আমি হাততালি দিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

বলিলাম—এমন নাচ কখনও দেখি নি, দশরথ। বড় চমৎকার নাচো। আচ্ছা তোমার খাজনা মাপ ক'রে দিলাম—আর আমার নিজ থেকে এই দু টাকা বখশিশ দিলাম খুশি হয়ে। ভারি চমৎকার নাচ।

আর দিন-দশ-বারোর মধ্যে ফসল কেনাবেচা শেষ হইয়া গেলে বাড়তি লোক সব যে

যার দেশে চলিয়া গেল। রহিল মাত্র যাহারা এখানে জমি চষিয়া বাস করিতেছে তাহারাই। দোকান-পসার উঠিয়া গেল, নাচওয়ালা, ফিরিওয়ালারা অন্যত্র রোজগারের চেষ্টায় গেল। কাটুনি জনমজুরের দল এখনও পর্যন্ত ছিল শুধু এই সময়ের আমোদ তামাশা দেখিবার জন্য—এইবার তাহারাও বাসা উঠাইবার যোগাড় করিতে লাগিল।

## ২

একদিন বেড়াইয়া ফিরিবার সময় আমি আমার পরিচিত সেই নক্‌ছেদী ভকতের খুপরিতে দেখা করিতে গেলাম।

সন্ধ্যার বেশী দেরি নাই, দিগন্তব্যাপী ফুলকিয়া বইহারের পশ্চিম প্রান্তে একেবারে সবুজ বনরেখার মধ্যে ডুবিয়া টক্‌টকে রাঙা প্রকাণ্ড বড় সূর্যটা অস্ত যাইতেছে। এখানকার এই সূর্যাস্তগুলি—বিশেষতঃ এই শীতকালে—এত অদ্ভুত সুন্দর যে এই সময়ে মাঝে মাঝে আমি মহালিখারূপের পাহাড়ে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে উঠিয়া বিস্ময়জনক দৃশ্যের প্রতীক্ষা করি।

নক্‌ছেদী তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপালে হাত দিয়া আমায় সেলাম করিল। বলিল—ও মঞ্চী, বাবুজীকে বসবার একটা কিছু পেতে দে।

নক্‌ছেদীর খুপরিতে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আছে. সে যে নক্‌ছেদীর স্ত্রী তাহা অনুমান করা কিছু শক্ত নয়। কিন্তু সে প্রায়ই বাহিরের কাজকর্ম অর্থাৎ কাঠ ভাঙা, কাঠ কাটা, দূরবর্তী ভীমদাসটোলার পাতকুয়া হইতে জল আনা ইত্যাদি লইয়া থাকে। মঞ্চী সেই মেয়েটি. যে আমাকে বুনো হাতীর গল্প বলিয়াছিল। সে আসিয়া শুষ্ক কাশের ডাঁটায় বোনা একখানা চেটাই পাতিয়া দিল।

তার সেই দক্ষিণ-বিহারের দেহাতী 'ছিকাছিকি' বুলির সুন্দর টানের সঙ্গে মাথা দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন দেখলেন বাবুজী বইহারের মেলা ? বলেছিলাম না. কত নাচ-তামাশা-আমোদ হবে, কত জিনিস আসবে, দেখলেন তো ? অনেক দিন আসেন নি বাবুজী, বসুন। আমরা যে শীগগির চলে যাচ্ছি।

ওদের খুপরির দোরের কাছে লম্বা আধশুকনো ঘাসের উপর চেটাই পাতিয়া বসিলাম. যাহাতে সূর্যাস্তটা ঠিক সামনাসামনি দেখিতে পাই। চারিদিকের জঙ্গলের গায়ে একটা মৃদু-রাঙা আভা পড়িয়াছে, একটা অবর্ণনীয় শান্তি ও নীরবতা বিশাল বইহার জুড়িয়া।

মঞ্চীর কথার উত্তর দিতে বোধ হয় একটু দেরি হইল। সে আবার কি একটা প্রশ্ন করিল, কিন্তু ওর 'ছিকাছিকি' বুলি আমি খুব ভাল বুঝি না. কি বলিল না বুঝিতে পারিয়া অন্য একটা প্রশ্ন দ্বারা সেটা চাপা দিবার জন্য বলিলাম—তোমরা কালই যাবে ?

—হ্যাঁ, বাবুজী।

—কোথায় যাবে ?

—পূর্ণিয়া কিষণগঞ্জ অঞ্চলে যাব।

পরে বলিল—নাচ-তামাশা কেমন দেখলেন বাবু ? বেশ ভাল ভাল লোক গাইয়ে এবার এসেছিল। একদিন ঝল্লুটোলায় বড় বকাইন গাছের তলায় একটা লোক মুখে ঢোলক বাজিয়েছিল, শুনেছিলেন ? কি চমৎকার বাবুজী! দেখিলাম মঞ্চী নিতান্ত বালিকার মতই নাচ-তামাশায় আমোদ পায়। এবার কত রকম কি দেখিয়াছে, মহা উৎসাহ ও খুশির

সুবে তাহারই বর্ণনা করিতে বসিয়া গেল।

নকছেদী বলিল—নে নে, বাবুজী কলকাতায় থাকেন, তোর চেয়ে অনেক কিছু দেখেছেন। ও এ-সব বড় ভালবাসে বাবুজী, ওরই জন্যে আমরা এতদিন এখানে রয়ে গেলাম। ও বল্লে—না, দাঁড়াও, খামারের নাচ-তামাশা, লোকজন দেখে তবে যাব। বড্ড ছেলেমানুষ এখনও !

মঞ্চী যে নকছেদীর কে হয় তাহা এতদিন জিজ্ঞাসা করি নাই, যদিও ভাবিতাম বৃদ্ধের মেয়েই হইবে। আজ ওর কথায় আমার আর কোনো সন্দেহ রহিল না।

বলিলাম—তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছ কোথায় ?

নকছেদী আশ্চর্য হইয়া বলিল—আমার মেয়ে! কোথায় আমার মেয়ে হুজুর ?

—কেন, এই মঞ্চী তোমার মেয়ে নয় ?

আমার কথায় সকলের আগে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল মঞ্চী। নকছেদীর প্রৌঢ়া স্ত্রীও মুখে আঁচল চাপা দিয়া খুপরির ভিতর ঢুকিল।

নকছেদী অপমানিত হওয়ার সুরে বলিল—মেয়ে কি হুজুর ! ও যে আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী।

বলিলাম—ও !

অতঃপর খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি তো এমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম যে, কথা খুঁজিয়া পাই না।

মঞ্চী বলিল—আগুন ক'রে দিই, বড্ড শীত।

শীত সত্যই বড় বেশী। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন হিমালয় পাহাড় নামিয়া আসে। পূর্ব-আকাশের নীচের দিকটা সূর্যাস্তের আভায় রাঙা, উপরটা কৃষ্ণাভ নীল।

খুপরি হইতে কিছু দূরে একটা শুকনো কাশ-ঝাড়ে মঞ্চী আগুন লাগাইয়া দিতে দশ-বারো ফুট দীর্ঘ ঘাস দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমরা জ্বলন্ত কাশঝোপের কাছে গিয়া বসিলাম।

নকছেদী বলিল—বাবুজী, এখনও ও ছেলেমানুষ আছে, ওর জিনিসপত্র কেনার দিকে বেজায় ঝোঁক। ধরুন এবার প্রায় আট-দশ মণ সর্ষে মজুরী পাওয়া গিয়েছিল—তার মধ্যে তিন মণ ও খরচ করে ফেলেছে সখের জিনিসপত্র কেনবার জন্যে। আমি বললাম, গতর-খাটানো মজুরীর মাল দিয়ে তুই ওসব কেন কিনিস্ ? তা ছেলেমানুষে শোনে না। কাঁদে, চোখের জল ফেলে। বলি, তবে কেন্।

মনে ভাবিলাম, তরুণী স্ত্রীর বৃদ্ধ স্বামী, না বলিয়াই বা আর কি উপায় ছিল ?

মঞ্চী বলিল—কেন, তোমায় তো বলেছি, গম কাটানোর সময় যখন মেলা হবে, তখন আর কিছু কিনব না। ভালো জিনিসগুলো সস্তায় পাওয়া গেল—

নকছেদী রাগিয়া বলিল—সস্তা! বোকা মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে কেঁয়ে দোকানদার আর ফিরিওয়ালা—সস্তা ? পাঁচ সের সর্ষে নিয়ে একখানা চিরুনি দিয়েছে, বাবুজী। আর-বছর তিরাশি রতনগঞ্জের গমের খামারে—

মঞ্চী বলিল—আচ্ছা বাবুজী, নিয়ে আসছি জিনিসগুলো, আপনিই বিচার ক'রে বলুন সস্তা কি না—

কথা শেষ করিয়াই মঞ্চী খুপরির দিকে ছুটিল এবং কাশডাঁটায়-বোনা ডালা আঁটা একটা ঝাঁপি হাতে করিয়া ফিরিল। তারপর সে ডালা তুলিয়া ঝাঁপির ভিতর হইতে

জিনিসগুলি একে একে বাহির করিয়া আমার সামনে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল।

—এই দেখুন কত বড় কাঁকই, পাঁচ সের সর্ষের কমে এমনিতরো কাঁকই হয় ? দেখেছেন কেমন চমৎকার রং! শৌখীন জিনিস না? আর এই দেখুন একখানা সাবান, দেখুন কেমন গন্ধ, এও নিয়েছে পাঁচ সের সর্ষে। সস্তা কি না বলুন বাবুজী ?

সস্তা মনে করিতে পারিলাম কই ? এমন একখানা বাজে সাবানের দাম কলিকাতার বাজারে এক আনার বেশী নয়, পাঁচ সের সর্ষের দাম নয়াদিল্লি মুখেও অন্তত সাড়ে-সাত আনা। এই সরলা বন্য মেয়েরা জিনিসপত্রের দাম জানে না, খুবই সহজ এদের ঠকানো।

মঞ্চী আরও অনেক জিনিস দেখাইল। আহ্লাদের সহিত একবার এটা দেখায়, একবার ওটা দেখায়। মাথার কাঁটা, ঝুটো পাথরের আংটি, চীনামাটির পুতুল, এনামেলের ছোট ডিশ খানিকটা চওড়া লাল ফিতে—এই সব জিনিস। দেখিলাম মেয়েদের প্রিয় জিনিসের তালিকা সব দেশেই সব সমাজেই অনেকটা এক। বন্য মেয়ে মঞ্চী ও তাহার শিক্ষিতা ভগ্নীর মধ্যে বেশী তফাৎ নাই। জিনিসপত্র সংগ্রহ ও অধিকার করার প্রবৃত্তি উভয়েরই প্রকৃতিদত্ত। বুড়ো নকছেদী রাগিলে কি হইবে!

কিন্তু সব চেয়ে ভাল জিনিসটি মঞ্চী সর্বশেষে দেখাইবে বলিয়া চাপিয়া রাখিয়া দিয়াছে তাহা কি তখন জানি!

এইবার সে গর্বমিশ্রিত আনন্দের ও আগ্রহের সহিত সেটা বাহির করিয়া আমার সামনে মেলিয়া ধরিল।



একছড়া নীল ও হলদে হিংলাজের মালা।

সত্যি, কি খুশী ও গর্বের হাসি দেখিলাম ওর মুখে! ওর সভ্য বোনেদের মত ও মনের ভাব গোপন করিতে তো শেখে নাই, একটি অনাবিল নির্ভেজাল নারী-আত্মা ওর এই সব সামান্য জিনিসের অধিকারের উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। নারী-মনের এমন স্বচ্ছ প্রকাশ দেখিবার সুযোগ আমাদের সভ্য-সমাজে বড়-একটা ঘটে না।

—বলুন দিকি কেমন জিনিস?

—চমৎকার!

—কত দাম হতে পারে এর বাবুজী? কলকাতায় আপনারা পরেন তো?

কলিকাতায় আমি হিংলাজের মালা পরি না, আমরা কেহই পরি না, তবুও আমার মনে হইল ইহার দাম খুব বেশী হইলেও ছ-আনার বেশী নয়। বলিলাম—কত নিয়েছে বল না?

—সতের সের সর্ষে নিয়েছে। জিতি নি?

বলিয়া লাভ কি যে, সে ভীষণ ঠকিয়াছে! এ-সব জায়গায় এ রকম হইবেই। কেন মিথ্যা আমি নক্ছেদীর কাছে বকুনি খাওয়াইয়া ওর মনের এ অপূর্ব আহ্লাদ নষ্ট করিতে যাইব?

আমারই অনভিজ্ঞতার ফলে এ বছর এমন হইতে পারিয়াছে। আমার উচিত ছিল ফিরিওয়ালাদের জিনিসপত্রের দরের উপরে কড়া নজর রাখা। কিন্তু আমি নতুন লোক এখানে, কি করিয়া জানিব এদেশের ব্যাপার? ফসল মাড়িবার সময় মেলা হয় তাহাই তো জানিতাম না। আগামী বৎসর যাহাতে এমনধারা না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরদিন সকালে নক্ছেদী তাহার দুই-স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা লইয়া এখান হইতে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে আমার খুপরিতে নক্ছেদী খাজনা দিতে আসিল, সঙ্গে আসিল মঞ্চী। দেখি মঞ্চী গলায় সেই হিংলাজের মালাছড়াটি পরিয়া আসিয়াছে। হাসিমুখে বলিল—আবার আসব ভাদ্র মাসে মকাই কাটতে। তখন থাকবেন তো বাবুজী? আমরা জংলী হর্তুকির আচার করি শ্রাবণ মাসে—আপনার জন্যে আনব।

মঞ্চীকে বড় ভাল লাগিয়াছিল, চলিয়া গেলে দুঃখিত হইলাম।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### ১

এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইল।

মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণে মাইল পনের-কুড়ি দূরে একটা বিস্তৃত শাল ও বিড়ির পাতার জঙ্গল সেবার কালেক্টরীর নীলামে ডাক হইবে খবর পাওয়া গেল। আমাদের হেড আপিসে তাড়াতাড়ি একটা খবর দিতে তারযোগে আদেশ পাইলাম, বিড়ির পাতার জঙ্গল যেন আমি ডাকিয়া লই।

কিন্তু তাহার পূর্বে জঙ্গলটা একবার আমার নিজের চোখে দেখা আবশ্যক। কি আছে না-আছে না জানিয়া নীলাম ডাকিতে আমি প্রস্তুত নই। এদিকে নীলামের দিনও নিকটবর্তী, 'তার' পাওয়ার পরদিনই সকালে রওনা হইলাম।

আমার সঙ্গের লোকজন খুব ভোরে বাক্স-বিছানা ও জিনিসপত্র মাথায় রওনা হইয়াছিল, মোহনপুরা ফরেস্টের সীমানায় কারো নদী পার হইবার সময়ে তাহাদের সহিত দেখা হইল। সঙ্গে ছিল আমাদের পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল।

কারো ক্ষীণকায়া পার্বত্য স্রোতস্বিনী—হাঁটুখানেক জল ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া উপল-রাশির মধ্য দিয়া প্রবাহিত। আমরা দুজনে ঘোড়া হইতে নামিলাম, নয়ত পিছল পাথরেব নুড়িতে ঘোড়া পা হড়কাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে। দু-পারে কটা বালির চড়া। সেখানেও ঘোড়ায় চাপা যায় না, হাঁটু পর্যন্ত বালিতে এমনিই ডুবিয়া যায়। অপর পারের কড়ারী জমিতে যখন পৌছিলাম্‌, তখন বেলা এগারটা। বনোয়ারী পাটোয়ারী বলিল--এখানে বান্নাবান্ন করে নিলে হয় হুজুর, এর পরে জল পাওয়া যায় কি না ঠিক নেই।

নদীর দু-পারেই জনহীন আরণ্যভূমি, তবে বড় জঙ্গল নয়, ছোটখাটো কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল—খুব ঘন ও প্রস্তরাকীর্ণ, লোকজনের চিহ্ন কোন দিকে নাই।

আহারাদির কাজ খুব সংক্ষেপে সারিলেও সেখান হইতে রওনা হইতে একটা বাজিয়া গেল।

বেলা যখন যায়-যায়, তখনও জঙ্গলের কূলকিনারা নাই, আমার মনে হইল আর বেশী দূরে অগ্রসর না হইয়া একটা বড় গাছের তলায় আশ্রয় লওয়া ভাল। অবশ্য বনের মধ্যে ইহার পূর্বে দুইটি বন্য গ্রাম ছাড়াইয়া আসিযাছি--একটার নাম কুলপাল, একটার নাম বুরুডি, কিন্তু সে প্রায় বেলা তিনটার সময়। তখন যদি জানা থাকিত যে, সন্ধ্যার সময়ও জংগল শেষ হইবে না তাহা হইলে সেখানেই রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করা যাইত।

বিশেষ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে জঙ্গল বড় ঘন হইয়া আসিল। আগে ছিল ফাঁকা জঙ্গল, এখন যেন ক্রমেই চারিদিক হইতে বড় বড় বনস্পতির দল ভিড় করিয়া সরু সুঁড়ি-পথটা চাপিয়া ধরিতেছে—এখন যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, সেখানটাতে তো চারিদিকেই বড় বড় গাছ, আকাশ দেখা যায় না, নৈশ অন্ধকার ইতিমধ্যেই ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এক এক জায়গায় ফাঁকা জংগলের দিকে বনের কি অনুপম শোভা! কি এক ধরনের থোকা থোকা সাদা ফুল সারা বনের মাথা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে ছায়াগহন অপরাহ্নের নীল আকাশের তলে। মানুষের চোখের আড়ালে সভ্য জগতের সীমা হইতে বহু দূরে এত সৌন্দর্য কার জন্য যে সাজানো! বনোয়ারী বলিল—ও বুনো তেউড়ির ফুল, এই সময় জংগলে ফোটে, হুজুর। এক রকমের লতা।

যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই গাছের মাথা, ঝোপের মাথা, ঈষৎ নীলাভ শুভ্র বুনো তেউড়ির ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে—ঠিক যেন রাশি রাশি পেঁজা নীলাভ কাপাস তুলা কে ছড়াইয়া রাখিয়াছে বনের গাছের মাথায় সর্বত্র। ঘোড়া থামাইয়া মাঝে মাঝে কতক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছি—এক এক জায়গার শোভা এমনই অদ্ভুত যে, সেদিকে চাহিয়া যেন একটা ছন্নছাড়া মনের ভাব হইয়া যায়—যেন মনে হয়, কত দূরে কোথায় আছি, সভ্য জগৎ হইতে বহু দূরে এক জনহীন অজ্ঞাত জগতের উদাস, অপরূপ বন্য সৌন্দর্যের মধ্যে—যে জগতের সংগে মানুষের কোনও সম্পর্ক নাই, প্রবেশের অধিকারও নাই, শুধু বন্য জীবজন্তু, বৃক্ষলতার জগৎ।

বোধ হয় আরও দেরি হইয়া গিয়াছিল আমার এই বার বার জঙ্গলের দৃশ্য হাঁ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিবার ফলে। বেচারী বনোয়ারী পাটোয়ারী আমার তাঁবে কাজ করে, সে জোর করিয়া আমায় কিছু বলিতে না পারিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবিতেছে —এ বাঙালী বাবুটির মাথায় নিশ্চয় দোষ আছে! এ'কে দিয়া জমিদারীর কাজ আর কত দিন চলিবে? একটি বড় আসান-গাছের তলায় সবাই মিলিয়া আশ্রয় লওয়া গেল। আমরা আছি সবসুদ্ধ আট-দশজন লোক।

বনোয়ারী বলিল—বড় একটা আগুন কর আর সবাই কাছাকাছি ঘেঁষে থাকো। ছড়িয়ে থেকো না, নানা রকম বিপদ এ জঙ্গলে রাত্রিকালে।

গাছের নীচে ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া বসিয়াছি, মাথার উপর অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা আকাশ, এখনও অন্ধকার নামে নাই, দূরে নিকটে জঙ্গলের মাথায় বুনো তেউড়ির সাদা ফুল ফুটিয়া আছে রাশি রাশি, অজস্র। আমার ক্যাম্প-চেয়ারের পাশেই দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস আধ-শুকনো, সোনালী রঙের। রোদ-পোড়া মাটির সোঁদা গন্ধ, শুক্‌নো ঘাসের গন্ধ, কি একটা বন-ফুলের গন্ধ, যেন দুর্গা-প্রতিমার রাঙতার ডাকের সাজের গন্ধের মত। মনের মধ্যে এই উন্মুক্ত, বন্য জীবন আনিয়া দিয়াছে একটা মুক্তি ও আনন্দের অনুভূতি—যাহা কোথাও কখনও আসে না, এই রকম বিরাট নির্জন প্রান্তর ও জনহীন অঞ্চল ছাড়া। অভিজ্ঞতা না থাকিলে বলিয়া বোঝানো বড়ই কঠিন সে মুক্ত-জীবনের উল্লাস।

এমন সময় আমাদের এক কুলি আসিয়া পাটোয়ারীর কাছে বলিল, একটু দূরে জঙ্গলের শুষ্ক ডালপালা কুড়াইতে গিয়া সে একটা কি জিনিস দেখিয়াছে। জায়গাটা ভাল নয়, ভূত বা পরীর আড্ডা, এখানে না তাঁবু ফেলিলেই হইত।

পাটোয়ারী বলিল—চলুন হুজুর, দেখে আসি কি জিনিসটা।

কিছুদূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গা দেখাইয়া কুলিটা বলিল—ঐখানে নিকটে গিয়ে দেখুন হুজুর। আর কাছে যাব না।

বনের মধ্যে কাঁটা-লতা ঝোপ হইতে মাথা উঁচু স্তম্ভের মাথায় একটা বিকট মুখ খোদাই-করা, সন্ধ্যাবেলা দেখিলে ভয় পাইবার কথা বটে।

মানুষের হাতের তৈরি এ-বিষয়ে ভুল নাই, কিন্তু এ জনহীন জঙ্গলের মধ্যে এ স্তম্ভ কোথা হইতে আসিল বুঝিতে পারিলাম না। জিনিসটা কত দিনের প্রাচীন তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।

সে-রাত্রি কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া বেলা ন'টার মধ্যে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গেলাম।

সেখানে পৌঁছিয়া জঙ্গলের বর্তমান মালিকের জনৈক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হইল। সে আমায় জঙ্গল দেখাইয়া বেড়াইতেছে—হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা শুষ্ক নালার ওপারে ঘন বনের মধ্যে দেখি একটা প্রস্তরস্তম্ভের শীর্ষ জাগিয়া আছে—ঠিক কাল সন্ধ্যাবেলার সেই স্তম্ভটার মত। সেই রকমের বিকট মুখ খোদাই করা।

আমার সঙ্গে বনোয়ারী পাটোয়ারী ছিল, তাহাকেও দেখাইলাম। মালিকের কর্মচারী স্থানীয় লোক, সে বলিল—ও আরও তিন-চারটা আছে এ-অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে। এ-দেশে আগে অসভ্য বুনো জাতির রাজ্য ছিল, ও তাদেরই হাতের তৈরি। ওগুলো সীমানার নিশানদিহি থাম্বা।

বলিলাম—থাম্বা কি ক'রে জানলে?

সে বলিল—চিরকাল শুনে আসছি বাবুজী, তা ছাড়া সেই রাজার বংশধর এখনও বর্তমান।

বড় কৌতূহল হইল।

—কোথায়?

লোকটা আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই জঙ্গলের উত্তর সীমানায় একটা ছোট বস্তি আছে—সেখানে থাকেন। এ-অঞ্চলে তাঁর বড় খাতির। আমরা শুনেছি উত্তরে

হিমালয় পাহাড় আর দক্ষিণে ছোটনাগপুরের সীমানা, পূর্বে কুশী নদী, পশ্চিমে মুঙ্গের —এই সীমানার মধ্যে সমস্ত পাহাড়-জঙ্গলের রাজা ছিল ওঁর পূর্বপুরুষ।

মনে পড়িল, পূর্বেও আমার কাছারিতে একবার গনোরী তেওয়ারী স্কুলমাস্টার গল্প করিয়াছিল বটে যে, এ অঞ্চলের আদিম-জাতীয় রাজা তাদের বংশধর এখনও আছে। এদিকের যত পাহাড়ী জাতি—তাহাকে এখনও রাজা বলিয়া মানে। এখন সে কথা মনে পড়িল। জঙ্গলের মালিকের সেই কর্মচারীর নাম বুদ্ধু সিং, বেশ বুদ্ধিমান, এখানে অনেককাল চাকুরি করিতেছে, এই সব বন-পাহাড় অঞ্চলের অনেক ইতিহাস সে জানে দেখিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—মুঘল বাদ্‌শাহের আমলে এরা মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে — এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তারা যখন বাংলা দেশে যেত—এরা উপদ্রব করত তীর-ধনুক নিয়ে। শেষে রাজমহলে যখন মুঘল সুবাদারেরা থাকতেন, তখন এদের রাজ্য যায়। ভারী বীরের বংশ এরা, এখন আর কিছুই নেই। যা কিছু বাকি ছিল, ১৮৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে সব যায়। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা এখনও বেঁচে আছেন। তিনি বর্তমান রাজা। নাম দোবরু পান্না বীরবর্দী। খুব বৃদ্ধ আর খুব গরীব। কিন্তু এ দেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে।

রাজার সঙ্গে দেখা করিবার বড়ই ইচ্ছা হইল।

রাজসন্দর্শনে যাইতে হইলে, কিছু নজর লইয়া যাওয়া উচিত। যার যা প্রাপ্য সম্মান, তাকে তা না দিলে কর্তব্যের হানি ঘটে।

কিছু ফলমূল, গোটা দুই বড় মুরগী—বেলা একটার মধ্যে নিকটবর্তী বস্তি হইতে কিনিয়া আনিলাম। এ-দিকের কাজ শেষে করিয়া বেলা দুইটার পরে বুদ্ধু সিংকে বলিলাম —চল, রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।

বুদ্ধু সিং তেমন উৎসাহ দেখাইল না। বলিল—আপনি সেখানে কি যাবেন! আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার উপযুক্ত নয়। পাহাড়ী অসভ্য জাতদের রাজা, তাই ব'লে কি আর আপনাদের সমান সমান কথা বলবার যোগ্য বাবুজী? সে তেমন কিছু নয়।

তাহার কথা না শুনিয়াই আমি ও বনোয়ারীলাল রাজধানীর দিকে গেলাম। তাহাকেও সঙ্গে লইলাম।

রাজধানীটা খুব ছোট, কুড়ি-পঁচিশ ঘর লোকের বাস।

ছোট ছোট মাটির ঘর, খাপরার চাল—বেশ পরিষ্কার করিয়া লেপাপোঁছা দেওয়ালের গায়ে মাটির সাপ, পদ্ম, লতা প্রভৃতি গড়া। ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম করিতেছে। কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের সুঠাম গড়ন ও নিটোল স্বাস্থ্য, মুখে কেমন সুন্দর একটা লাবণ্য প্রত্যেকেরই। সকলেই আমাদের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বুদ্ধু সিং একজন স্ত্রীলোককে বলিল—রাজা ছে রে?

স্ত্রীলোকটি বলিল, সে দেখে নাই। তবে কোথায় আর যাইবে, বাড়ীতেই আছে।

## ২

আমরা গ্রামে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, বুদ্ধু সিং-এর ভাবে মনে হইল এইবার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে নীত হইয়াছি। অন্য ঘরগুলির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের পার্থক্য এই মাত্র

লক্ষ্য করিলাম যে, ইহার চারিপাশ পাথরের পাঁচিলে ঘেরা—বস্তির পিছনেই অনুচ্চ পাহাড়, সেখান হইতেই পাথর আনা হইয়াছে। রাজবাড়ীতে ছেলেমেয়ে অনেকগুলি—কতকগুলি খুব ছোট। তাদের গলায় পুঁতির মালা ও নীল ফলের বীজের মালা। দু-একটি ছেলে-মেয়ে দেখিতে বেশ সুশ্রী। ষোল-সতের বছরের একটি মেয়ে বুদ্ধু সিং-এর ডাকে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়াই আমাদের দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, তাহার চোখের চাহনি দেখিয়া মনে হইল কিছু ভয়ও পাইয়াছে।



বুদ্ধু সিং বলিল—রাজা কোথায়?

—মেয়েটি কে? বুদ্ধু সিংকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—রাজার নাতির মেয়ে।

রাজা বহুদিন জীবিত থাকিয়া নিশ্চয়ই বহু যুবক ও প্রৌঢ়কে রাজসিংহাসনে বসিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

মেয়েটি বলিল—আমার সঙ্গে এস। জ্যাঠামশায় পাহাড়ের নীচে পাথরে বসে আছেন।

মানি বা নাই মানি, মনে মনে ভাবিলাম যে-মেয়েটি আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে, সে সত্যই রাজকন্যা—তাহার পূর্বপুরুষেরা এই আরণ্য-ভূভাগ বহুদিন ধরিয়া শাসন করিয়াছিল—সেই বংশের সে মেয়ে।

বলিলাম—মেয়েটির নাম কি জিজ্ঞেস কর।

বুদ্ধু সিং বলিল—ওর নাম ভানুমতী!

বাঃ, বেশ সুন্দর—ভানুমতী! রাজকন্যা ভানুমতী!

ভানুমতী নিটোল স্বাস্থ্যবতী, সুঠাম মেয়ে। লাবণ্যমাখা মুখশ্রী—তবে পরনের কাপড় সভ্যসমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়। মাথার চুল রুক্ষ, গলায় কড়ি ও পুঁতির দানা। দূর হইতে একটা বড় বকাইন্ গাছ দেখাইয়া দিয়া ভানুমতী বলিল—তোমরা যাও, জ্যাঠামশায় ওই গাছতলায় ব'সে গরু চরাচ্ছেন।

গরু চরাইতেছেন কি রকম! প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলাম বোধ হয়। এই সমগ্র অঞ্চলের

রাজা সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না বীরবর্দী গরু চরাইতেছেন!

কিছু জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই মেয়েটি চলিয়া গেল এবং আমরা আর কিছু অগ্রসর হইয়া বকাইন্ গাছের তলায় এক বৃদ্ধকে কাঁচা শালপাতায় তামাক জড়াইয়া ধূমপানরত দেখিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—সেলাম, রাজাসাহেব।

রাজা দোবরু পান্না কানে শুনিতে পাইলেও চোখে খুব ভাল দেখিতে পান বলিয়া মনে হইল না।

বলিল—কে? বুদ্ধু সিং? সঙ্গে কে?

বুদ্ধু বলিল—একজন বাঙালী বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। উনি কিছু নজর এনেছেন—আপনাকে নিতে হবে।

আমি নিজে গিয়া বৃদ্ধের সামনে মুরগী ও জিনিস কয়টি নামাইয়া রাখিলাম।

বলিলাম—আপনি দেশের রাজা, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বহুৎ দূর থেকে এসেছি।

বৃদ্ধের দীর্ঘায়ত চেহারার দিকে চাহিয়া আমার মনে হইল যৌবনে রাজা দোবরু পান্না খুব সুপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। মুখশ্রীতে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। বৃদ্ধ খুব খুশী হইলেন। আমার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—কোথায় ঘর?

বলিলাম—কলকাতা।

—উঃ, অনেক দূর। বড় ভারী জায়গা শুনেচি কল্‌কাতা।

—আপনি কখনও যান নি?

—না, আমরা কি শহরে যেতে পারি? এই জঙ্গলেই আমরা থাকি ভাল। বোসো। ভান্‌মতী কোথায় গেল, ও ভান্‌মতী?

মেয়েটি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—কি জ্যাঠামশায়?

—এই বাঙালী বাবু ও তাঁর সঙ্গের লোকজন আজ আমার এখানে থাকবেন ও খাওয়া-দাওয়া করবেন।

আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—না, না, সে কি! আমরা এখুনি চলে যাব, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রেই—আমাদের থাকার বিষয়ে—

কিন্তু দোবরু পান্না বলিলেন—না, তা হতে পারে না। ভান্‌মতী, এই জিনিসগুলো নিয়ে যা এখান থেকে।

আমার ইঙ্গিতে বনোয়ারীলাল পাটোয়ারী নিজে জিনিসগুলি বহিয়া অদূরবর্তী রাজার বাড়ীতে লইয়া গেল, ভানুমতীর পিছু পিছু। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না, বৃদ্ধের দিকে চাহিয়াই আমার সম্ভ্রমে মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা, প্রাচীন অভিজাত-বংশীয় বীর দোবরু পান্না (হইলই বা বন্য আদিম জাতি) আমাকে থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন—এ অনুরোধ আদেশেরই সামিল।

রাজা দোবরু পান্না অত্যন্ত দরিদ্র, দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম। তাঁহাকে গরু চরাইতে দেখিয়া প্রথমটা আশ্চর্য হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরে মনে ভাবিয়া দেখিলাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা দোবরু পান্নার অপেক্ষা অনেক বড় রাজা অবস্থাবৈগুণ্যে গোচারণ অপেক্ষাও হীনতর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রাজা নিজের হাতে শালপাতার একটা চুরুট গড়িয়া আমার হাতে দিলেন। দেশলাই

নাই—গাছের তলায় আগুন করাই আছে—তাহা হইতে একটা পাতা জ্বালাইয়া সম্মুখে ধরিলেন।

বলিলাম—আপনারা এ-দেশের প্রাচীন রাজবংশ, আপনাদের দর্শনে পুণ্য আছে।

দোবরু পান্না বলিলেন—এখন আর কি আছে! আমাদের বংশ সূর্যবংশ। এই পাহাড়-জঙ্গল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবন বয়সে কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়স অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তারপর আর কিছু নেই।

এই আরণ্য ভূভাগের বহিঃস্থিত অন্য কোনও পৃথিবীর খবর দোবরু পান্না রাখেন বলিয়া মনে হইল না। তাঁহার কথার উত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছি, এমন সময় একজন যুবক আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

রাজা দোবরু বলিলেন—আমার ছোট নাতি, জগরু পান্না। ওর বাবা এখানে নেই, লছমীপুরের রাণী-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। ওরে জগরু, বাবুজীর জন্যে খাওয়ার যোগাড় কর।

যুবক যেন নবীন শালতরু, পেশীবহুল সবল নধর দেহ। সে বলিল—বাবুজী, সজারুর মাংস খান?

পরে তাহার পিতামহের দিকে চাহিয়া বলিল—পাহাড়ের ওপারের বনে ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম, কাল রাত্রে দুটো সজারু পড়েছে।

শুনিলাম রাজার তিনটি ছেলে, তাহাদের আট-দশটি ছেলেমেয়ে। এই বৃহৎ রাজ-পরিবারের সকলেই এই গ্রামে একত্র থাকে। শিকার ও গোচারণ প্রধান উপজীবিকা। এ বাদে বনের পাহাড়ী জাতিদের বিবাদ-বিসংবাদে রাজার কাছে বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিলে কিছু কিছু ভেট্ ও নজরানা দিতে হয়—দুধ, মুরগী, ছাগল, পাখীর মাংস বা ফলমূল।

বলিলাম—আপনার চাষবাস আছে?

দোবরু পান্না গর্বের সুরে বলিলেন—ওসব আমাদের বংশে নিয়ম নেই। শিকার করার মান সকলের চেয়ে বড়, তাও এক সময়ে ছিল বর্শা নিয়ে শিকার সব চেয়ে গৌরবের। তীর-ধনুকের শিকার দেবতার কাজে লাগে না, ও বীরের কাজ নয়। তবে এখন সবই চলে। আমার বড় ছেলে মুঙ্গের থেকে একটা বন্দুক কিনে এনেছে, আমি কখনও ছুঁই নি। বর্শা ধ'রে শিকার আসল শিকার।

ভানুমতী আবার আসিয়া একটা পাথরের ভাঁড় আমাদের কাছে রাখিয়া গেল।

রাজা বলিলেন—তেল মাখুন। কাছেই চমৎকার ঝরণা—স্নান ক'রে আসুন সকলে।

আমরা স্নান করিয়া আসিলে রাজা আমাদের রাজবাড়ীর একটা ঘরে লইয়া যাইতে বলিলেন।

ভানুমতী একটা ধামায় চাল ও মেটে আলু আনিয়া দিল। জগরু সজারু ছাড়াইয়া মাংস আনিয়া রাখিল কাঁচা শালপাতার পাত্রে।

ভানুমতী আর একবার গিয়া দুধ ও মধু আনিল। আমার সঙ্গে ঠাকুর ছিল না, বনোয়ারী মেটে আলু ছাড়াইতে বসিল, আমি রাঁধিবার চেষ্টায় উনুন ধরাইতে গেলাম। কিন্তু শুধু বড় বড় কাঠের সাহায্যে উনুন ধরানো কষ্টকর। দু-একবার চেষ্টা করিয়া পারিলাম না, তখন ভানুমতী তাড়াতাড়ি একটা পাখীর শুকনো বাসা আনিয়া উনুনের মধ্যে পুরিয়া দিতে আগুন বেশ জ্বলিয়া উঠিল। দিয়াই দূরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতী রাজকন্যা বটে, কিন্তু বেশ অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা। অথচ দিব্য সহজ,

সবল মর্যাদাজ্ঞান।

রাজা দোবরু পান্না সব সময় রান্নাঘরের দুয়ারটির কাছে বসিয়া রহিলেন। আতিথ্যের এতটুকু ত্রুটি না ঘটে। আহারাদির পর বলিলেন—আমার তেমন বেশী ঘরদোরও নেই, আপনাদের বড় কষ্ট হ'ল। এই বনের মধ্যে পাহাড়ের উপরে আমার বংশের রাজাদের প্রকান্ড বাড়ীর চিহ্ন এখনও আছে। আমি বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি বহু প্রাচীনকালে ওখানে আমার পূর্ব-পুরুষেরা বাস করতেন। সে দিন কি আর এখন আছে! আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত দেবতা এখনও সেখানে আছেন।

আমার বড় কৌতূহল হইল, বলিলাম—যদি আমরা একবার দেখতে যাই তাতে কি কোনও আপত্তি আছে, রাজাসাহেব?

—এর আবার আপত্তি কি! তবে দেখবার এখন বিশেষ কিছু নেই। আচ্ছা চলুন, আমি যাব। জগরু আমাদের সঙ্গে এস।

আমি আপত্তি করিলাম—বিরানব্বই বছরের বৃদ্ধকে আর পাহাড়ে উঠাইবার কষ্ট দিতে মন সরিল না। সে আপত্তি টিকিল না, রাজাসাহেব হাসিয়া বলিলেন—ও পাহাড়ে আমায় তো প্রায়ই উঠতে হয়, ওর গায়েই আমার বংশের সমাধিস্থান। প্রত্যেক পূর্ণিমায় আমায় সেখানে যেতে হয়। চলুন সে-জায়গাও দেখাব।

উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে অনুচ্চ শৈলমালা (স্থানীয় নাম ধন্‌ঝরি) এক স্থানে আসিয়া যেন হঠাৎ ঘুরিয়া পূর্বমুখী হওয়ার দরুণ একটা খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে, এই খাঁজের নীচে একটা উপত্যকা, শৈলসানুর অরণ্য সারা উপত্যকা ব্যাপিয়া যেন সবুজের ঢেউয়ের মত নামিয়া আসিয়াছে, যেমন ঝরণা নামে পাহাড়ের গা বাহিয়া। অরণ্য এখানে ঘন নয়, ফাঁকা ফাঁকা—বনের গাছের মাথায় মাথায় সুদূর চক্রবালরেখায় নীল শৈলমালা, বোধ হয় গয়া কি রামগড়ের দিকের—যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই বনের শীর্ষ, কোথাও উঁচু, বড় বড় বনস্পতিসঙ্কুল, কোথাও নীচু, চারা শাল ও চারা পলাশ। জঙ্গলের মধ্যে সরু পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলাম।

এক জায়গায় খুব বড় পাথরের চাঁই আড়ভাবে পোঁতা, ঠিক যেন একখানা পাথরের কড়ি বা ঢেঁকির আকারের। তার নীচে কুম্ভকারদের হাঁড়ি-কলসী পোড়ানো পণ-এর গর্তের মত কিংবা মাঠের মধ্যে খেঁকশিয়ালী যেমন গর্ত কাটে—ওই ধরনের প্রকান্ড একটা বড় গর্তের মুখ। গর্তের মুখে চারা শালের বন।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই গর্তের মধ্যে ঢুকতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে। কোনো ভয় নেই। জগরু আগে যাও।

প্রাণ হাতে করিয়া গর্তের মধ্যে ঢুকিলাম। বাঘ ভালুক তো থাকিতেই পারে, না থাকে সাপ তো আছেই।

গর্তের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া খানিকদূরে গিয়া তবে সোজা হইয়া দাঁড়ানো যায়। ভয়ানক অন্ধকার ভিতরে প্রথমটা মনে হয়, কিন্তু চোখ অন্ধকারে কিছুক্ষণ অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর তত অসুবিধা হয় না, জায়গাটা প্রকান্ড একটা গুহা, কুড়ি-বাইশ হাত লম্বা, হাত পনের চওড়া—উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে আবার একটা খেঁক-শিয়ালীর মত গর্ত দিয়া খানিক দূর গেলে দেওয়ালের ওপারে ঠিক এই রকম নাকি আর একটা গুহা আছে—কিন্তু সেটাতে আমার ঢুকিবার আগ্রহ দেখাইলাম না। গুহার ছাদ বেশী উঁচু নয়, একটা মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত উঁচু করিলে ছাদ ছুঁইতে

পারে। চামসে ধরণের গন্ধ গুহার মধ্যে—বাদুড়ের আড্ডা—এ ছাড়া ভাম, শৃগাল, বন-বিড়াল প্রভৃতি থাকে শোনা গেল। বনোয়ারী পাটোয়ারী চুপি চুপি বলিল—হুজুর, চলুন বাইরে, এখানে আর বেশী দেরি করবেন না।

ইহাই নাকি দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের দুর্গ-প্রাসাদ।

আসলে ইহা একটি বড় প্রাকৃতিক গুহা—প্রাচীন কালে পাহাড়ের উপর দিকে মুখ-ওয়ালা এ গুহায় আশ্রয় লইলে শত্রুর আক্রমণ হইতে সহজে আত্মরক্ষা করা যাইত।

রাজা বলিলেন—এর আর একটা গুপ্ত মুখ আছে—সে কাউকে বলা নিয়ম নয়। সে কেবল আমার বংশের লোক ছাড়া কেউ জানে না। যদিও এখন এখানে কেউ বাস করে না, তবুও এই নিয়ম চলে আসছে বংশে।

গুহাটা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল।

তারপর আরও খানিকটা উঠিয়া এক জায়গায় প্রায় এক বিঘা জমি জুড়িয়া বড় বড় সরু মোটা ঝুরি নামাইয়া, পাহাড়ের মাথার অনেকখানি ব্যাপিয়া এক বিশাল বটগাছ।

রাজা দোবরু পান্না বলিলেন—জুতো খুলে চলুন মেহেরবানি করে।

বটগাছতলায় যেন চারিধারে বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের আকারের পাথর ছড়ানো।

রাজা বলিলেন—ইহাই তাঁহার বংশের সমাধিস্থান। এক-একখানা পাথরের তলায় এক-একটা রাজবংশীয় লোকের সমাধি। বিশাল বটতলার সমস্ত স্থান জুড়িয়া সেই রকম বড় বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো—কোনো কোনো সমাধি খুবই প্রাচীন, দু'দিক হইতে ঝুরি নামিয়া যেন সেগুলিকে সাঁড়াশির মত আটকাইয়া ধরিয়াছে, সে সব ঝুড়ি আবার গাছের গুঁড়ির মত মোটা হইয়া গিয়াছে—কোনো কোনো শিলাখণ্ড ঝুরির তলায় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে সেগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই বটগাছ আগে এখানে ছিল না। অন্য অন্য গাছের বন ছিল। একটি ছোট বটচারা ক্রমে বেড়ে অন্য অন্য গাছ মেরে ফেলে দিয়েছে। এই বট-গাছটাই এত প্রাচীন যে, এর আসল গুঁড়ি নেই। ঝুরি নেমে যে গুঁড়ি হয়েছে, তারাই এখন রয়েছে। গুঁড়ি কেটে উপড়ে ফেললে দেখবেন ওর তলায় কত পাথর চাপা পড়ে আছে। এইবার বুঝুন কত প্রাচীন সমাধিস্থান এটা।

সত্যই বটগাছতলাটায় দাঁড়াইয়া আমার মনে এমন একটা ভাব হইল, যাহা এতক্ষণ কোথাও হয় নাই, রাজাকে দেখিয়াও না (রাজাকে তো মনে হইয়াছে জনৈক বৃদ্ধ সাঁওতাল কুলীর মত), রাজকন্যাকে দেখিয়াও নয় (একজন স্বাস্থ্যবতী হো কিংবা মুণ্ডা তরুণীর সহিত রাজকন্যার কোনো প্রভেদ দেখি নাই), রাজপ্রাসাদ দেখিয়া তো নয়ই (সেটাকে একটা সাপখোপের ও ভূতের আড্ডা বলিয়া মনে হইয়াছে)। কিন্তু পাহাড়ের উপরে এই সুবিশাল, প্রাচীন বটতরুতলে কতকালের এই সমাধিস্থল আমার মনে এই অননুভূত, অপরূপ অনুভূতি জাগাইল।

স্থানটির গাম্ভীর্য, রহস্য ও প্রাচীনত্বের ভাব অবর্ণনীয়। তখন বেলা প্রায় হেলিয়া পড়িয়াছে, হলদে রোদ পত্ররাশির গায়ে, ডাল ও ঝুড়ির অরণ্যে ধনুঝুরির অন্য চূড়ায়, দূর বনের মাথায়। অপরাহ্ণের সেই ঘনায়মান ছায়া এই সুপ্রাচীন রাজ-সমাধিকে যেন আরও গম্ভীর, রহস্যময় সৌন্দর্য দান করিল।

মিশরের প্রাচীন সম্রাটদের সমাধিস্থল থিব্স নগরের অদূরবর্তী 'ভ্যালি অব্ দি কিংস' আজ পৃথিবীর টুরিস্টদের লীলাভূমি, পাবলিসিটি ও ঢাক পিটানোর অনুগ্রহে

সেখানকার বড় বড় হোটেলগুলি মরশুমের সময় লোকে গিজ্‌গিজ করে—'ভ্যালি অব্‌ দি কিংস' অতীত কালের কুয়াসায় যত না অন্ধকার হইয়াছিল, তার অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া যায় দামী সিগারেট ও চুরুটের ধোঁয়ায়—কিন্তু তার চেয়ে কোনো অংশে রহস্যে ও স্বপ্রতিষ্ঠ মহিমায় কম নয় সুদূর অতীতের এই অনার্য নৃপতিদের সমাধিস্থল, ঘন অরণ্যভূমির ছায়ায় শৈলশ্রেণীর অন্তরালে যা চিরকাল আত্মগোপন করিয়া আছে ও থাকিবে। এদের সমাধিস্থলে আড়ম্বর নাই, পালিশ নাই, ঐশ্বর্য নাই মিশরীয় ধনী ফ্যারাওদের কীর্তির মত—কারণ এরা ছিল দরিদ্র. এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল মানুষের আদিম যুগের অশিক্ষিতপটু সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নিতান্ত শিশু-মানবের মন লইয়া ইহারা রচনা করিয়াছে ইহাদের গুহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাধি, সীমানাজ্ঞাপক খুঁটি। সেই অপরাহ্নের ছায়ায় পাহাড়ের উপরে সে বিশাল তরুতলে দাঁড়াইয়া যেন সর্বব্যাপী শাশ্বত কালের পিছন দিকে বহুদূরে অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ দেখিতে পাইলাম—পৌরাণিক ও বৈদিক যুগও যার তুলনায় বর্তমানের পর্যায়ে পড়িয়া যায়।

দেখিতে পাইলাম যাযাবর আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মত অনার্য আদিমজাতি-শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন...ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস—এই আর্যসভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই—কিংবা সে লেখা আছে এই সব গুপ্ত গিরিগুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে. চূর্ণায়মান অস্থি কঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্যজাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না। আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতিব প্রতিনিধি, বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি—উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি—সভ্যতার গর্বে উন্নতনাসিক আর্যকান্তির গর্বে আমি প্রাচীন অভিজাতবংশীয় দোবরু পান্নাকে বৃদ্ধ সাঁওতাল ভাবিতেছি, রাজকন্যা ভানুমতীকে মুণ্ডা কুলী-রমণী ভাবিতেছি—তাদের কত আগ্রহের ও গর্বের সহিত প্রদর্শিত রাজ-প্রাসাদকে অনার্যসুলভ আলো-বাতাসহীন গুহাবাস, সাপ ও ভূতের আড্ডা বলিয়া ভাবিতেছি। ইতিহাসের এই বিরাট ট্র্যাজেডি যেন আমার চোখের সম্মুখে সেই সন্ধ্যায় অভিনীত হইল—সে নাটকের কুশীলবগণ এক দিকে বিজিত উপেক্ষিত দরিদ্র অনার্য নৃপতি দোবরু পান্না, তরুণী অনার্য রাজকন্যা ভানুমতী, তরুণ রাজপুত্র জগরু পান্না—এক দিকে আমি, আমার পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল ও আমার পথপ্রদর্শক বুদ্ধু সিং।

ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজসমাধি ও বটতরুতল আবৃত হইবার পূর্বেই আমরা সেদিন পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম।

নামিবার পথে একস্থানে জঙ্গলের মধ্যে একখানা খাড়া সিঁদুরমাখা পাথর। আশে-পাশে মানুষের হস্তরোপিত গাঁদাফুলের ও সন্ধ্যামণি-ফুলের গাছ। সামনে আর একখানা বড় পাথর, তাতেও সিঁদুর মাখা। বহুকাল হইতে নাকি এই দেবস্থান এখানে প্রতিষ্ঠিত, রাজবংশের ইনি কুলদেবতা। পূর্বে এখানে নরবলি হইত—সম্মুখের বড় পাথরখানিই যূপ-রূপে ব্যবহৃত হইত। এখন পায়রা ও মুরগী বলি প্রদত্ত হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ঠাকুর ইনি?

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো, বুনো মহিষের দেবতা।

মনে পড়িল গত শীতকালে গনু মাহাতোর মুখে শোনা সেই গল্প।

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকলে শিকারীরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়বার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দেন—কত লোক দেখেছে।

এই অরণ্যচারী আদিম সমাজের দেবতাকে সভ্য জগতে কেউই মানে না, জানেও না—কিন্তু ইহা যে কল্পনা নয়, এবং এই দেবতা যে সত্যই আছেন—তাহা স্বতঃই মনে উদয় হইয়াছিল সেই বিজন বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অরণ্য ও পর্বত অঞ্চলের নিবিড় সৌন্দর্য ও রহস্যের মধ্যে বসিয়া।

অনেক দিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া একবার দেখিয়াছিলাম বড়বাজারে, জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ গরমের দিনে এক পশ্চিমা গাড়োয়ান বিপুল বোঝাই গাড়ীর মহিষ দুটাকে প্রাণপণে চামড়ার পাঁচন দিয়া নির্মমভাবে মারিতেছে—সেই দিন মনে হইয়াছিল, হায় দেব টাঁড়বারো, এ তো ছোটনাগপুর কি মধ্যপ্রদেশের আরণ্যভূমি নয়, এখানে তোমার করুণাময় হস্ত এই নির্যাতিত পশুকে কি করিয়া রক্ষা করিবে? এ বিংশ শতাব্দীর আর্য সভ্যতাদৃপ্ত কলিকাতা। এখানে বিজিত আদিম রাজা দোবরু পান্নার মতই তুমি অসহায়।

আমি নওযাদা হইতে মোটর বাস ধরিয়া গয়ায় আসিব বলিয়া সন্ধ্যার পরেই রওনা হইলাম। বনোয়ারী আমাদের ঘোড়া লইয়া কাছারিতে ফিরিল। আসিবার সময় আর একবার রাজকুমারী ভানুমতীর সহিত দেখা হইয়াছিল। সে এক বাটি মহিষের দুধ লইয়া আমাদের জন্য দাঁড়াইয়া ছিল রাজবাড়ীর দ্বারে।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### ১

একদিন রাজু পাঁড়ে কাছারিতে খবর পাঠাইল যে বুনো শুওরের দল তাহার চীনা ফসলের ক্ষেতে প্রতি রাত্রে উপদ্রব করিতেছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি দাঁতওয়ালা ধাড়ী শুকরের ভয়ে সে ক্যানেস্ত্রা পিটানো ছাড়া অন্য কিছু করিতে পারে না—কাছারি হইতে ইহার প্রতিকার না করিলে তাহার সমুদয় ফসল নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

শুনিয়া নিজেই বৈকালের দিকে বন্দুক লইয়া গেলাম। রাজুর কুটীর ও জমি নাঢ়া-বইহারের ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সেদিকে এখনও লোকের বসবাস হয় নাই, ফসলের ক্ষেতের পত্তনও খুব কম হইয়াছে, কাজেই বন্য জন্তুর উপদ্রব বেশী।

দেখি রাজু নিজের ক্ষেতে বসিয়া কাজ করিতেছে। আমায় দেখিয়া কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। আমার হাত হইতে ঘোড়ার লাগাম লইয়া নিকটের একটা হরীতকী গাছে ঘোড়া বাঁধিল।

বলিলাম—কই রাজু, তোমায় যে আর দেখি নে, কাছারির দিকে যাও না কেন?

রাজুর খুপরির চারিদিকে দীর্ঘ কাশের জঙ্গল, মাঝে মাঝে কেঁদ ও হরীতকী গাছ।

কি করিয়া যে এই জনশূন্য বনে সে একা থাকে! এ জঙ্গলে কাহারও সহিত দিনান্তে একটি কথা বলিবার উপায় নাই—অদ্ভুত লোক বটে!

রাজু বলিল—সময় পাই কই যে কোথাও যাব হুজুর, ক্ষেতের ফসল চৌকি দিতেই প্রাণ বেরিয়ে গেল। তার ওপর মহিষ আছে।

তিনটি মহিষ চরাইতে ও দেড়-বিঘা জমির চাষ করিতে এত কি ব্যস্ত থাকে যে সে লোকালয়ে যাইবার সময় পায় না, একথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম—কিন্তু রাজু আপনা হইতেই তাহার দৈনন্দিন কার্যের যে তালিকা দিল, তাহাতে দেখিলাম তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ না থাকার কথা। ক্ষেতখামারের কাজ, মহিষ চরানো, দুধ দোয়া, মাখন-তোলা, পূজো-অর্চনা, রামায়ণ-পাঠ, রান্না-খাওয়া—শুনিয়া যেন আমারই হাঁপ লাগিল। কাজের লোক বটে রাজু! ইহার উপর নাকি সারারাত জাগিয়া ক্যানেস্তা পিটাইতে হয়।

বলিলাম—শূকর কখন বেরোয়?

—তার তো কিছু ঠিক নেই হুজুর। তবে রাত হ'লেই বেরোয় বটে। একটু বসুন, দেখবেন কত আসে।

কিন্তু আমার কাছে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয়—রাজু একা এই জনশূন্য স্থানে কি করিয়া বাস করে। কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

রাজু বলিল—অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, বাবুজী। বহুদিন এমনি ভাবেই আছি—কষ্ট তো হয়ই না, বরং আপন মনে বেশ আনন্দে থাকি। সারাদিন খাটি, সন্ধ্যাবেলা ভজন গাই, ভগবানের নাম নিই, বেশ দিন কেটে যায়।

রাজু, কি গনু মাহাতো, কি জয়পাল—এ ধরনের মানুষ আরও অনেক আছে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে—ইহাদের মধ্যে একটি নূতন জগৎ দেখিতাম, যে জগৎ আমার পরিচিত নয়।

আমি জানি রাজুর একটি সাংসারিক বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি আছে, সে চা খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে। অথচ এই জঙ্গলের মধ্যে চায়ের উপকরণ সে কোথায় পায়, এই ভাবিয়া আমি নিজে চা ও চিনি লইয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম—রাজু, একটু চা করো তো। আমার কাছে সব আছে।

রাজু মহা আনন্দে একটি তিন-সেরী লোটাতে জল চড়াইয়া দিল। চা প্রস্তুত হইল, কিন্তু একটি মাত্র ছোট কাঁসার বাটি ব্যতীত অন্য পাত্র নাই। তাহাতেই আমায় চা দিয়া সে নিজে বড় লোটাটি লইয়া চা খাইতে বসিল।

রাজু হিন্দী লেখাপড়া জানে বটে, কিন্তু বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাহার কোনো জ্ঞান নাই। কলিকাতা নামটা শুনিয়াছে, কোন্ দিকে জানে না। বোম্বাই বা দিল্লীর বিষয়ে তার ধারণা চন্দ্রলোকের ধারণার মত সম্পূর্ণ অবাস্তব ও কুয়াশাচ্ছন্ন। শহরের মধ্যে সে দেখিয়াছে পূর্ণিয়া, তাও অনেক বছর আগে এবং মাত্র কয়েক দিনের জন্য সেখানে গিয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—মোটরগাড়ী দেখেছ রাজু?

—না হুজুর, শুনেছি বিনা গরুতে বা ঘোড়ায় চলে, ধোঁয়া বেরোয়, আজকাল পূর্ণিয়া শহরে অনেক নাকি এসেছে। আমার তো সেখানে অনেক কাল যাওয়া নেই, আমরা গরীব লোক, শহরে গেলেই তো পয়সা চাই।

রাজুকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কলিকাতা যাইতে চায় কি না। যদি চায়, আমি তাহাকে

একবার ঘুরাইয়া আনিব, পয়সা লাগিবে না।

রাজু বলিল—শহর বড় খারাপ জায়গা, চোর গুণ্ডা জুয়াচোরের আড্ডা শুনেছি। সেখানে গেলে শুনেছি যে জাত থাকে না। সব লোক সেখানকার বদ্‌মাইশ। আমার এ-দেশের একজন লোক কোন্ শহরের হাসপাতালে গিয়েছিল, তার পায়ে কি হয়েছিল সেই জন্যে। ডাক্তার ছুরি দিয়ে পা কাটে আর বলে, তুমি আমাকে কত টাকা দেবে? সে বললে—দশ টাকা দেব। তখন ডাক্তার আরও কাটে। আবার বললে—এখনও বল কত টাকা দেবে? সে বললে—আরও পাঁচ টাকা দেব, ডাক্তারসাহেব, আর কেটো না। ডাক্তার বললে—ওতে হবে না—ব'লে আবার পা কাটতে লাগল। সে গরীব লোক, যত কাঁদে, ডাক্তার ততই ছুরি দিয়ে কাটে—কাটতে কাটতে গোটা পা-খানাই কেটে ফেললে। উঃ, কি কাণ্ড ভাবুন তো হুজুর!

রাজুর কথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করা দায় হইয়া উঠিল। মনে পড়িল এই রাজুই একবার আকাশে রামধনু উঠিতে দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিল—রামধনু যে দেখছেন বাবুজী, ও ওঠে উইয়ের ঢিবি থেকে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

রাজুর খুপরির সামনের উঠানে একটি বড় খুব উঁচু আসান গাছ আছে, তারই তলায় বসিয়া আমরা চা খাইতেছিলাম—যেদিকে চাই সেদিকেই ঘন বন—কেঁদ, আমলকী, পুষ্পিত বহেড়া লতার ঝোপ, বহেড়া ফুলের একটি মৃদু সুগন্ধ সান্ধ্য বাতাসকে মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। আমার মনে হইল এসব স্থানে বসিয়া এমন ভাবে চা খাওয়া জীবনের একটা সৌন্দর্যময় অভিজ্ঞতা। কোথায় এমন অরণ্যপ্রান্তর, কোথায় এমন জঙ্গলে-ঘেরা কাশের কুটীর, রাজুর মত মানুষই বা কোথায়? এ অভিজ্ঞতা যেমন বিচিত্র, তেমনই দুষ্প্রাপ্য।

বলিলাম—আচ্ছা রাজু, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এস না কেন? তোমার আর তা হ'লে কষ্ট ক'রে রেঁধে খেতে হয় না।

রাজু বলিল—সে বেঁচে নেই হুজুর। আজ সতের-আঠারো বছর মারা গিয়েছে, তার পর থেকে বাড়ীতে মন বসাতে পারি নে আর।

রাজুর জীবনে রোমান্স ঘটিয়াছিল, এ ভাবিতে পারাও কঠিন বটে, কিন্তু অতঃপর রাজু যে গল্প করিল, তাহাকে ও-ছাড়া অন্য নামে অভিহিত করা চলে না।

রাজুর স্ত্রীর নাম ছিল সর্জু (অর্থাৎ সরযূ), রাজুর বয়স যখন আঠারো ও সরযূর চোদ্দ—তখন উত্তর-ধরমপুর, শ্যামলালটোলাতে সরযূর বাপের টোলে রাজু দিনকতক ব্যাকরণ পড়িতে যায়।

রাজুকে বলিলাম—কতদিন পড়েছিলে?

—কিছু না বাবুজী, বছরখানেক ছিলাম, কিন্তু পরীক্ষা দিই নি। সেখানে আমাদের প্রথম দেখাশুনো এবং ক্রমে ক্রমে—

আমাকে সমীহ করিয়া রাজু অল্প কাশিয়া চুপ করিল।

আমি উৎসাহ দিবার সুরে বলিলাম—তার পর ব'লে যাও—

—কিন্তু হুজুর, ওর বাবা আমার অধ্যাপক। আমি কি ক'রে তাঁকে এ-কথা বলি? একদিন কার্তিক মাসে ছট্ পরবের দিন সরযূ ছোপানো হলদে শাড়ী পরে কুশী নদীতে একদল মেয়ের সঙ্গে নাইতে যাচ্ছে, আমি—

রাজু কাশিয়া আবার চুপ করিল।

পুনরায় উৎসাহ দিয়া বলিলাম—বল, বল, তাতে কি?

—ওকে দেখবার জন্যে আমি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। এর কারণ এই যে ইদানীং ওর সঙ্গে আমার আর তত দেখাশুনো হ'ত না—এক জায়গায় ওর বিয়ের কথাবার্তাও চলছিল। যখন দলটি গাইতে গাইতে—আপনি তো জানেন ছট্ পরবের সময় মেয়েরা গান করতে করতে নদীতে ছট্ ভাসাতে যায়!—তারপর যখন ওরা গাইতে গাইতে আমার সামনে এল, ও আমায় দেখতে পেয়েছে গাছের আড়ালে। ও-ও হাসলে, আমিও হাসলাম। আমি হাত নেড়ে ইশারা করলাম, একটু পেছিয়ে পড়—ও হাত নেড়ে বললে, এখন নয়, ফেরবার সময়ে।

রাজুর বাহান্ন বছর বয়েসের মুখমণ্ডলে বিংশবর্ষীয় তরুণ প্রেমিকের লাজুকতা ও চোখে একটি স্বপ্নভরা সুদূর দৃষ্টি ফুটিল এ-কথা বলিবার সময়—যেন জীবনের বহু পিছনে প্রথম যৌবনের পুণ্য দিনগুলিতে যে কল্যাণী তরুণী ছিল চতুর্দশ বর্ষদেশে—তাহাকেই খুঁজিতে বাহির হইয়াছে ওর সঙ্গীহারা প্রৌঢ় প্রাণ। এই ঘন জঙ্গলে একা বাস করিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন যাহার কথা ভাবিতে তাহার ভাল লাগে, যাহার সাহচর্যের জন্য তার মন উন্মুখ—সে হইল বহু কালের সেই বালিকা সরযূ, পৃথিবীতে যে কোথাও আজ আর নাই।

বেশ লাগিতেছিল ওর গল্প। আগ্রহের সঙ্গে বলিলাম, তার পর?

—তার পর ফেরবার পথে দেখা হ'ল। ও একটু পিছিয়ে পড়ল দলের থেকে। আমি বললাম—সরযূ, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, তোমার সঙ্গে দেখাশোনাও বন্ধ, আমার লেখা-পড়া হবে না জানি, কেন মিছে কষ্ট পাই, ভাবছি টোল ছেড়ে চলে যাব এ মাসের শেষেই। সরযূ কেঁদে ফেললে। বললে—বাবাকে বলো না কেন? সরযূর কান্না দেখে আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। এমনি হয়ত যে কথা কখনও আমার অধ্যাপককে বলতে পারতাম না, তাই ব'লে ফেললাম একদিন।

বিয়ে হওয়ার কোনো বাধা ছিল না, স্বজাতি, স্বঘর। বিয়ে হয়েও গেল।

খুব সহজ ও সাধারণ রোমান্স হয়ত—হয়ত শহরের কোলাহলে বসিয়া শুনিলে এটাকে নিতান্ত ঘরোয়া গ্রাম্য বৈবাহিক ব্যাপার, সামান্য একটু পুতুপুতু ধরনের পূর্ব-রাগ বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। ওখানে ইহার অভিনবত্ব ও সৌন্দর্যে মন মুগ্ধ হইল। দুইটি নরনারী কি করিয়া পরস্পরকে লাভ করিয়াছিল তাহাদের জীবনে, এ-ইতিহাস যে কতখানি রহস্যময়, তাহা বুঝিয়াছিলাম সেদিন।

চা-পান শেষ করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া আকাশে পাতলা জ্যোৎস্না ফুটিল। ষষ্ঠী কি সপ্তমী তিথি।

আমি বন্দুক লইয়া বলিলাম—চল রাজু, দেখি তোমার ক্ষেতে কোথায় শুওর।

একটা বড় তুঁতগাছ ক্ষেতের এক পাশে। রাজু বলিল—এই গাছের ওপর উঠতে হবে হুজুর। আজ সকালে একটা মাচা বেঁধেছি ওর একটা দো-ডালায়।

আমি দেখিলাম, বিষম মুশকিল। গাছে ওঠা অনেক দিন অভ্যাস নাই। তার উপর এই রাত্রিকালে। কিন্তু রাজু উৎসাহ দিয়া বলিল—কোনো কষ্ট নেই হুজুর। বাঁশ দেওয়া আছে, নীচেই ডালপালা, খুব সহজ ওঠা।

রাজুর হাতে বন্দুক দিয়া ডালে উঠিয়া মাচায় বসিলাম। রাজু অবলীলাক্রমে আমার পিছু পিছু উঠিল। দুজনে জমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মাচার উপর বসিয়া রহিলাম

পাশাপাশি।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিল। তুঁতগাছের দো-ডালা হইতে জ্যোৎস্নালোকে কিছু স্পষ্ট, কিছু অস্পষ্ট জঙ্গলের শীর্ষদেশ ভারি অদ্ভুত ভাব মনে আনিতেছিল। ইহাও জীবনের এক নূতন অভিজ্ঞতা বটে।

একটু পরে চারিপাশের জঙ্গলে শিয়ালের পাল ডাকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কালোমত কি জানোয়ার দক্ষিণ দিকের ঘন জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া রাজুর ক্ষেতে ঢুকিল।

রাজু বলিল—ঐ দেখুন হুজুর—

আমি বন্দুক বাগাইয়া ধরিলাম, কিন্তু আরও কাছে আসিলে জ্যোৎস্নালোকে দেখা গেল সেটা শূকর নয়, একটা নীলগাই।

নীলগাই মারিবার প্রবৃত্তি হইল না, রাজু মুখে 'দূর দূর' বলিতে সেটা ক্ষিপ্রপদে জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল। আমি একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলাম।

ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল। দক্ষিণ দিকের সে জঙ্গলটার মধ্যে বনমোরগ ডাকিয়া উঠিল। ভাবিয়াছিলাম দাঁতওয়ালা ধাড়ী শুওরটা মারিব, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র শূকর-শাবকেরও টিকি দেখা গেল না। নীলগাইয়ের পিছনে ফাঁকা আওয়াজ করা অত্যন্ত ভুল হইয়াছে।

রাজু বলিল—নেমে চলুন হুজুর, আপনার আবার ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি বলিলাম—কিসের ভোজন? আমি কাছারিতে যাব—রাত এখনও দশটা বাজে নি—থাকবার জো নেই। কাল সকালে সার্ভে ক্যাম্পে কাজ দেখতে বেরুতে হবে।

—খেয়ে যান হুজুর।

—এর পর আর নাঢ়া-বইহারের জঙ্গল দিয়ে একা যাওয়া ঠিক হবে না। এখনই যাই। তুমি কিছু মনে করো না।

ঘোড়ায় উঠিবার সময় বলিলাম—মাঝে মাঝে তোমার এখানে চা খেতে যদি আসি বিরক্ত হবে না তো?

রাজু বলিল—কি যে বলেন! এই জঙ্গলে একা থাকি, গরীব মানুষ, আমায় ভালবাসেন তাই চা-চিনি এনে তৈরি করিয়ে একসঙ্গে খান। ও কথা ব'লে আমায় লজ্জা দেবেন না, বাবুজী।

সে সময়ে রাজুকে দেখিয়া মনে হইল রাজু এই বয়সেই বেশ দেখিতে, যৌবনে যে সে খুবই সুপুরুষ ছিল, অধ্যাপক-কন্যা সরযূ পিতার তরুণ, সুন্দর ছাত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নিজের সুরুচিরই পরিচয় দিয়াছিল।

রাত্রি গভীর। একা প্রান্তর বাহিয়া আসিতেছি। জ্যোৎস্না অস্ত গিয়াছে। কোনো দিকে আলো দেখা যায় না, এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—এ যেন পৃথিবী হইতে জনহীন কোনো অজানা গ্রহলোকে নির্বাসিত হইয়াছি—দিগন্তরেখায় জ্বলজ্বলে বৃশ্চিকরাশি উদিত হইতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে অগণিত দ্যুতিলোক, নিম্নে লবটুলিয়া বইহারের নিস্তব্ধ অরণ্য, ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে পাতলা অন্ধকারে বনঝাউয়ের শীর্ষ দেখা যাইতেছে—দূরে কোথায় শিয়ালের দল প্রহর ঘোষণা করিল—আরও দূরে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা অন্ধকারে দীর্ঘ কালো পাহাড়ের মত দেখাইতেছে—অন্য কোন শব্দ নাই কেবল এক ধরনের পতঙ্গের একঘেয়ে একটানা কি-র্-র্-র্ শব্দ ছাড়া ; কান পাতিয়া ভাল করিয়া শুনিলে ঐ শব্দের সঙ্গে মিশানো আরও দু-তিনটি পতঙ্গের

আওয়াজ শোনা যাইবে। কি অদ্ভুত রোমান্স এই মুক্ত জীবনে, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয়ের সে কি আনন্দ! সকলের উপর কি একটা অনির্দেশ্য, অব্যক্ত রহস্য মাখানো—কি সে রহস্য জানি না—কিন্তু বেশ জানি সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পরে আর কখনও কোথাও সে রহস্যের ভাব মনে আসে নাই।

যেন এই নিস্তব্ধ, নির্জন রাত্রে দেবতারা নক্ষত্ররাজির মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে কল্পনায় দূরে ভবিষ্যতে নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব নব সৌন্দর্যের জন্ম, নানা নব প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত। শুধু যে আত্মা নিরলস অবকাশ যাপন করে জ্ঞানের আকুল পিপাসায়, যার প্রাণ বিশ্বের বিরাটত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের সম্বন্ধে সচেতন আনন্দে উল্লসিত—জন্মজন্মান্তরের পথ বাহিয়া দূরে যাত্রার আশায় যার ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বর্তমানের দুঃখ, শোক বিন্দুবৎ মিলাইয়া গিয়াছে—সে-ই তাঁদের সে রহস্যরূপ দেখিতে পায়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ...

এভারেস্ট শিখরে উঠিয়া যাহারা তুষারপ্রবাহে ও ঝঞ্ঝায় প্রাণ দিয়াছিল, তাহারা বিশ্ব-দেবতার এই বিরাট রূপকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে...কিংবা কলম্বাস্ যখন আজোরেস্ দ্বীপের উপকূলে দিনের পর দিন সমুদ্রবাহিত কাষ্ঠখণ্ডে মহাসমুদ্রপারের অজানা মহাদেশের বার্তা জানিতে চাহিয়াছিলেন—তখন বিশ্বের এই লীলাশক্তি তাঁর কাছে ধরা দিয়াছিল—ঘরে বসিয়া তামাক টানিয়া প্রতিবেশীর কন্যার বিবাহ ও ধোপা নাপিত বন্ধ করিয়া যাহারা আসিতেছে—তাহাদের কর্ম নয় ইহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা।

২

মিছি নদীর উত্তর পাড়ে জঙ্গলের ও পাহাড়ের মধ্যে সার্ভে হইতেছিল। এখানে আজ আট-দশ দিন তাঁবু ফেলিয়া আছি। এখনও দশ-বারো দিন হয়ত থাকিতে হইবে।

স্থানটা আমাদের মহাল হইতে অনেক দূরে, রাজা দোবরু পান্নার রাজত্বের কাছা-কাছি। রাজত্ব বলিলাম বটে, কিন্তু রাজা দোবরু তো রাজ্যহীন রাজা—তাহার আবাসস্থলের খানিকটা নিকটে পর্যন্ত বলা যায়।

বড় চমৎকার জায়গা। একটা উপত্যকা, মুখের দিকটা বিস্তৃত, পিছনের দিক সংকীর্ণ—পূর্বে পশ্চিমে পাহাড়শ্রেণী—মধ্যে এই অশ্বক্ষুরাকৃতি উপত্যকা—বন্ধুর ও জঙ্গলাকীর্ণ, ছোট বড় পাথর ছড়ানো সর্বত্র, কাঁটা-বাঁশের বন, আরও নানা গাছপালার জঙ্গল। অনেক-গুলি পাহাড়ী ঝরনা উত্তর দিক হইতে নামিয়া উপত্যকার মুক্ত প্রান্ত দিয়া বাহিরের দিকে চলিয়াছে। এই সব ঝরনার দু-ধারে বন বড় বেশী ঘন এবং এত দিনের বসবাসের অভিজ্ঞতা হইতে জানি এই সব জায়গাতেই বাঘের ভয়। হরিণ আছে, বন্য মোরগ ডাকিতে শুনিয়াছি দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে। ফেউয়ের ডাক শুনিয়াছি বটে, তবে বাঘ দেখি নাই বা আওয়াজও পাই নাই।

পূর্বদিকের পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড গুহা। গুহার মুখে প্রাচীন ঝাঁপালো বটগাছ—দিনরাত শন্‌শন্ করে। দুপুর রোদে নীল আকাশের তলায় এই জনহীন বন্য উপত্যকা ও গুহা বহু প্রাচীন যুগের ছবি মনে আনে, যে-যুগে আদিম জাতির রাজাদের হয়ত রাজপ্রাসাদ ছিল এই গুহাটা, যেমন রাজা দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের আবাস-গুহা। গুহার দেওয়ালে একস্থানে কতকগুলো কি খোদাই করা ছিল, সম্ভবত

কোনো ছবি—এখন বড়ই অস্পষ্ট, ভালো বোঝা যায় না। কত বন্য আদিম নরনারীর হাস্য-কলধ্বনি, কত সুখদুঃখ—বর্বর সমাজের অত্যাচারের কত নয়নজলের অলিখিত ইতিহাস এই গুহার মাটিতে, বাতাসে, পাষাণপ্রাচীরের মধ্যে লেখা আছে—ভাবিতে বেশ লাগে।

গুহামুখ হইতে রশি-দুই দূরে ঝরনার ধারে বনের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় একটি গোঁড়-পরিবার বাস করে। দুখানা খুপরি, একখানা ছোট, একখানা একটু বড়, বনের ডালপালার বেড়া, পাতার ছাউনি। শিলাখন্ড কুড়াইয়া তাহা দিয়া উনুন তৈয়ারী করিয়াছে আবরণহীন ফাঁকা জায়গায় খুপরির সামনে। বড় একটা বুনো বাদামগাছের ছায়ায় এদের কুটীর। বাদামের পাকা পাতা ঝরিয়া পড়িয়া উঠান প্রায় ছাইয়া রাখিয়াছে।

গোঁড়-পরিবারের দুটি মেয়ে আছে, তাদের একটির ষোল-সতের বছর বয়স, অন্যটির বছর চোদ্দ। রং কালো কুচকুচে বটে, কিন্তু মুখশ্রীতে বেশ একটা সরল সৌন্দর্য মাখানো—নিটোল স্বাস্থ্য। মেয়ে দুটি রোজ সকালে দেখি দু-তিনটি মহিষ লইয়া পাহাড়ে চরাইতে যায়—আবার সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া আসে। আমি তাঁবুতে ফিরিয়া যখন চা খাই, তখন দেখি মেয়ে দুটি আমার তাঁবুর সামনে দিয়া মহিষ লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে।

একদিন বড় মেয়েটি রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া তার ছোট বোনকে আমার তাঁবুতে পাঠাইয়া দিল। সে আসিয়া বলিল—বাবুজী, সেলাম। বিড়ি আছে? দিদি চাইছে।

—তোমরা বিড়ি খাও?

—আমি খাই নে, দিদি খায়। দাও না বাবুজী, একটা আছে?

—আমার কাছে বিড়ি নেই। চুরুট আছে—কিন্তু সে তোমাদের দেব না। বড় কড়া, খেতে পারবে না।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

আমি একটু পরে ওদের বাড়ী গেলাম। আমাকে দেখিয়া গৃহকর্তা খুব বিস্মিত হইল—খাতির করিয়া বসাইল। মেয়ে দুটি শালপাতায় 'ঘাটো' অর্থাৎ মকাই-সিদ্ধ ঢালিয়া নুন দিয়া খাইতে বসিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে নিরুপকরণ মকাইসিদ্ধ। তাদের মা কি একটা জ্বাল দিতেছে উনুনে। দুটি ছোট ছোট বালক-বালিকা খেলা করিতেছে।

গৃহকর্তার বয়স পঞ্চাশের উপর। সুস্থ, সবল চেহারা। আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—তাদের বাড়ী সিউনি জেলাতে। এখানে এই পাহাড়ে মহিষ চরাইবার ঘাস ও পানীয় জল প্রচুর আছে বলিয়া আজ বছর-খানেক হইতে এখানে আছে। তা ছাড়া এখানকার জঙ্গলের কাঁটা-বাঁশে ধামা চুপড়ি ও মাথায় দিবার টোকা তৈরি করিবার খুব সুবিধা। শিবরাত্রির সময় অখিলকুচার মেলায় বিক্রি করিয়া দু'পয়সা হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে কতদিন থাকবে?

—যতদিন মন যায়, বাবুজী। তবে এ-জায়গাটা বড় ভাল লেগেছে, নইলে এক বছর আমরা কোথাও বড় একটানা থাকি না। এখানে একটা বড় সুবিধা আছে, পাহাড়ের ওপর জঙ্গলে এত আতা ফলে—দু-ঝুড়ি ক'রে গাছ-পাকা আতা আশ্বিন মাসে আমার মেয়েরা মহিষ চরাতে গিয়ে পেড়ে আনতো—শুধ আতা খেয়ে আমরা মাস-দুই কাটিয়েছি। আতার লোভেই এখানে থাকা। জিজ্ঞেস করুন না ওদের!

বড় মেয়েটি খাইতে খাইতে উজ্জ্বল মুখে বলিল—উঃ, একটা জায়গা আছে, ওই পূর্বদিকের পাহাড়ের কোণের দিকে, কত যে বুনো আতা গাছ, ফল পেকে ফেটে কত মাটিতে পড়ে থাকে, কেউ খায় না। আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি তুলে আনতাম।

এমন সময়ে কে একজন ঘন-বনের দিক হইতে আসিয়া খুপরির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—সীতারাম, সীতারাম, জয় সীতারাম—একটু আগুন দিতে পার?

গৃহকর্তা বলিল—আসুন বাবাজী, বসুন।

দেখিলাম জটাজুটধারী একজন বৃদ্ধ সাধু। সাধু ইতিমধ্যে আমায় দেখিতে পাইয়া একটু বিস্ময়ের ও বোধ হয় কথঞ্চিৎ ভয়ের সঙ্গেও, একটু সঙ্কুচিত হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল।

আমি বলিলাম—প্রণাম, সাধু বাবাজী—

সাধু আশীর্বাদ করিল বটে, কিন্তু তখনও যেন তাহার ভয় যায় নাই।

তাহাকে সাহস দিবার জন্য বলিলাম—কোথায় থাকা হয় বাবাজীর?

আমার কথার উত্তর দিল গৃহস্বামী। বলিল—বড্ড গজার জঙ্গলের মধ্যে উনি থাকেন, ওই দুই পাহাড় যেখানে মিশেছে, ওই কোণে। অনেক দিন আছেন এখানে।

বৃদ্ধ সাধু ইতিমধ্যে বসিয়া পড়িয়াছে। আমি সাধুর দিকে চাহিয়া বলিলাম—কতদিন এখানে আছেন?

এবার সাধুর ভয় ভাঙিয়াছে, বলিল—আজ পনেরো-ষোল বছর, বাবুসাহেব।

—একা থাকা হয় তো? বাঘ আছে শুনেছি এখানে, ভয় করে না?

—আর কে থাকবে বাবুসাহেব? পরমাত্মার নাম নিই—ভয়ডর করলে চলবে কেন? আমার বয়স কত বল তো বাবুসাহেব?

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—সত্তর হবে।

সাধু হাসিয়া বলিল—না বাবুসাহেব, নব্বুইয়ের ওপরে হয়েছে। গয়ার কাছে এক জঙ্গলে ছিলাম দশ বছর। তার পর ইজারাদার জঙ্গলের গাছ কাটতে লাগল, ক্রমে সেখানে লোকের বাস হয়ে পড়ল। সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। লোকালয়ে থাকতে পারি নে।

—সাধু বাবাজী, এখানে একটা গুহা আছে, তুমি সেখানে থাক না কেন?

—একটা কেন বাবুসাহেব, কত গুহা আছে এ-পাহাড়ে। আমি ওদিকে যেখানে থাকি সেটাও ঠিক গুহা না হ'লেও গুহার মত বটে। মানে তার মাথায় ছাদ ও দু-দিকে দেয়াল আছে—সামনেটা কেবল খোলা।

—কি খাও? ভিক্ষা কর?

—কোথাও বেরুই নে বাবুসাহেব। পরমাত্মা আহার জুটিয়ে দেন। বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ খাই, বনে এক রকম কন্দ হয় তা ভারি মিষ্টি, লাল আলুর মত খেতে, তা খাই। পাকা আমলকী ও আতা এ-জঙ্গলে খুব পাওয়া যায়। আমলকী খুব খাই, রোজ আমলকী খেলে মানুষ হঠাৎ বুড়ো হয় না, যৌবন ধরে রাখা যায় বহু দিন। গাঁয়ের লোকে মাঝে মাঝে দর্শন করতে এসে দুধ, ছাতু, ভুরা দিয়ে যায়। চলে যাচ্ছে এই সবে এক রকম ক'রে।

—বাঘ-ভালুকের সামনে পড়েছ কখনও?

—কখনও না। তবে ভয়ানক এক জাতের অজগর সাপ দেখেছি এই জঙ্গলে—এক জায়গায় অসাড় হয়ে পড়েছিল—তালগাছের মত মোটা, মিশ্ কালো, সবুজ আর ঘাওা আঁজি কাটা গায়ে। চোখ আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে। এখনও সেটা এই জঙ্গলেই আছে। তখন সেটা জলের ধারে পড়ে ছিল বোধ হয় হরিণ ধরবার লোভে। এখন কোনও গুহাগহ্বরে লুকিয়ে আছে। আচ্ছা যাই বাবুসাহেব, রাত হয়ে গেল।

সাধু আগুন লইয়া চলিয়া গেল। শুনিলাম মাঝে মাঝে সাধুটি এদের এখানে আগুন

লইতে আসিয়া কিছুক্ষণ গল্প করিয়া যায়।

অন্ধকার পূর্বেই হইয়াছিল, এখন একটু মেটে মেটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। উপত্যকার বনানী অদ্ভুত নীরবতায় ভরিয়া গিয়াছে। কেবল পার্শ্বস্থ পাহাড়ী ঝরনার কুলু কুলু স্রোতের ধ্বনি ও ক্বচিৎ দু-একটা বন্য মোরগের ডাক ছাড়া কোনো শব্দ কানে আসে না।

তাঁবুতে ফিরিলাম। পথে বড় একটা শিমুলগাছে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকী জ্বলিতেছে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্রাকারে, উপর হইতে নীচু দিকে, নীচু হইতে উপরের দিকে—নানারূপ জ্যামিতির ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া আলো-আঁধারের পটভূমিতে।

৩

এখানেই একদিন আসিল কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ। লম্বা, রোগা চেহারা, কালো সার্জের কোট গায়ে, আধময়লা ধুতি পরনে, মাথার চুল রুক্ষ ও এলোমেলো, বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে।

ভাবিলাম চাকুরির উমেদার। বলিলাম—কি চাই?

সে বলিল—বাবুজীর (হুজুর বলিয়া সম্বোধন করিল না) দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছি। আমার নাম বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ। বাড়ী বিহার শরীফ, পাটনা জিলা। এখানে চকমকিটোলায় থাকি, তিন মাইল দূর এখান থেকে।

—ও, তা এখানে কি জন্যে?

—বাবুজী যদি দয়া ক'রে অনুমতি করেন, তবে বলি। আপনার সময় নষ্ট করছি নে?

তখন আমি ভাবিতেছি লোকটা চাকুরির জন্যই আসিয়াছে। কিন্তু 'হুজুর' না বলাতে সে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। বলিলাম—বসুন, অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছেন এই গরমে।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম—লোকটির হিন্দী খুব মার্জিত। সেরকম হিন্দীতে আমি কথা বলিতে পারি না। সিপাহী পিয়াদা ও গ্রাম্য প্রজা লইয়া আমার কারবার, আমার হিন্দী তাহাদের মুখে শেখা দেহাতী বুলির সহিত বাংলা ইডিয়ম মিশ্রিত একটা জগাখিচুড়ী ব্যাপার। এ-ধরনের ভদ্র ও পরিমার্জিত, ভব্য হিন্দী কখনও শুনি নাই, তা বলিব কিরূপে? সুতরাং একটু সাবধানের সহিত বলিলাম—কি আপনার আসার উদ্দেশ্য বলুন!

সে বলিল—আমি আপনাকে কয়েকটি কবিতা শুনাতে এসেছি।

দস্তুরমত বিস্মিত হইলাম। এই জঙ্গলে আমাকে কবিতা শোনাইতে আসিবার এমন কি গরজ পড়িয়াছে লোকটির, হইলই বা কবি?

বলিলাম—আপনি একজন কবি? খুব খুশী হলাম। আপনার কবিতা খুব আনন্দের সঙ্গে শুনব। কিন্তু আপনি কি ক'রে আমার সন্ধান পেলেন?

—এই মাইল-তিন দূরে আমার বাড়ী। পাহাড়ের ঠিক ওপারেই। আমাদের গ্রামে সবাই বলছিল কলকাতা থেকে এক বাংগালি বাবু এসেছেন। আপনাদের কাছে বিদ্যার বড় আদর, কারণ আপনারা নিজে বিদ্বান্। কবি বলেছেন—

বিদ্বৎসু সৎকবিবাচা লভতে প্রকাশং
ছাত্রেষু কুট্মলসমং তৃণবজ্জড়েষু।

বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ আমায় কবিতা শোনাইল। কোনো একটা রেল-লাইনের টিকিট

চেকার, বুকিং ক্লার্ক, স্টেশন-মাস্টার, গার্ড প্রভৃতির নামের সঙ্গে জড়াইয়া এক সুদীর্ঘ কবিতা। কবিতা খুব উ'চুদরের বলিয়া মনে হইল না। তবে আমি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের প্রতি অবিচার করিতে চাই না। তাহার ভাষা আমি ভাল বুঝি নাই—সত্য কথা বলিতে গেলে, বিশেষ কিছুই বুঝি নাই। তবুও মাঝে মাঝে উৎসাহ ও সমর্থন-সূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া গেলাম।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ কবিতাপাঠ থামায় না, উঠিবার নাম করা তো দূরের কথা।

ঘণ্টা দুই পরে সে একটু চুপ করিয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল—কি রকম লাগলো বাবুজীর?

বলিলাম—চমৎকার। এমন কবিতা খুব কমই শুনেছি। আপনি কোনো পত্রিকায় আপনার কবিতা পাঠান না কেন?

বেঙ্কটেশ্বর দুঃখের সহিত বলিল—বাবুজী, এদেশে আমাকে সবাই পাগল বলে। কবিতা বুঝবার মানুষ এ-সব জায়গায় কি আছে ভেবেছেন? আপনাকে শুনিয়ে আমার আজ তৃপ্তি হ'ল। সমঝদারকে এ-সব শোনাতে হয়। তাই আপনার কথা শুনেই আমি ভেবেছিলাম একদিন সময়মত এসে আপনাকে ধরতে হবে।

সেদিন সে বিদায় লইল কিন্তু পরদিন বৈকালে আসিয়া আমায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল তাহাদের গ্রামে তাহাদের বাড়ীতে আমায় একবার যাইতে। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহার সহিত পায়ে হাঁটিয়া চক্‌মকিটোলা রওনা হইলাম।

বেলা পড়িয়াছে। সম্মুখে গম-যবের ক্ষেত্রে বহুদূর জুড়িয়া উত্তর দিকের পাহাড়ের ছায়া পড়িয়াছে। কেমন একটা শান্তি চারিধারে, সিল্লী পাখীর ঝাঁক কাঁটা-বাঁশ ঝাড়ের উপর উড়িয়া আসিয়া বসিতেছে. গ্রাম্য বালকবালিকারা এক জায়গায় ঝরনার জলে ছোট ছোট কি মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

গ্রামের মধ্যে ঠাসাঠাসি বসতি। চালে চালে বাড়ী, অনেক বাড়ীতেই উঠান বলিয়া জিনিস নাই। মাঝারিগোছের একখানা খোলা-ছাওয়া বাড়ীতে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ আমায় লইয়া গিয়া তুলিল। রাস্তার ধারেই তার বাড়ীর বাইরের ঘর, সেখানে একখানা কাঠের চৌকিতে বসিলাম। একটু পরে কবিগৃহিণীকেও দেখিলাম—তিনি স্বহস্তে দইবড়া ও মকাইভাজা আমার জন্য লইয়া যে চৌকিতে বসিয়াছিলাম তাহারই একপ্রান্তে স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু কথা কহিলেন না, যদিও তিনি অবগুণ্ঠনবতীও ছিলেন না। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হইবে, রং তত ফর্সা না হইলেও মন্দ নয়, মুখশ্রী বেশ শান্ত, সুন্দরী বলা না গেলেও কবিপত্নী কুরূপা নহেন। ধরনধারণের মধ্যে একটি সরল, অনায়াসশিষ্টতা ও শ্রী।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম—কবিগৃহিণীর স্বাস্থ্য। কি জানি কেন এদেশে যেখানে গিয়াছি, মেয়েদের স্বাস্থ্য সর্বত্র বাংলা দেশের মেয়েদের চেয়ে বহুগুণে ভাল বলিয়া মনে হইয়াছে। মোটা নয়, অথচ বেশ লম্বা, নিটোল, আঁটসাঁট গড়নের মেয়ে এদেশে যত বেশি, বাংলা দেশে তত দেখি নাই। কবিগৃহিণীও ওই ধরনের মেয়েটি।

একটু পরে তিনি এক বাটি মহিষের দুধের দই খাটিয়ার একপাশে রাখিয়া সরিয়া দরজার কবাটের আড়ালে দাঁড়াইলেন। শিকল নাড়ার শব্দ শুনিয়া বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ উঠিয়া স্ত্রীর নিকটে গেল এবং তখনই হাসিমুখে আসিয়া বলিল—আমার স্ত্রী বলছে

আপনি আমাদের বন্ধু হয়েছেন, বন্ধুকে একটু ঠাণ্ডা করতে হয় কিনা তাই দইয়ের সংগে বেশী ক'রে পিপুল শুট ও লংকায় গুঁড়ো মেশানো রয়েছে।

আমি হাসিয়া বলিলাম—তা যদি হয় তবে আমার একা কেন, সকলের চোখ দিয়ে যাতে জল বের হয় তার জন্যে আমি প্রস্তাব করছি এই দই আমরা তিনজনেই খাব। আসুন—। কবিপত্নী দরজার আড়াল হইতে হাসিলেন। আমি ছাড়িবার পাত্র নই, দই তাঁহাকেও খাওয়াইয়া ছাড়িলাম।

একটু পরে কবিপত্নী বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং একটা থালা হাতে আবার আসিয়া খাটিয়ার প্রান্তে থালাটি রাখিলেন, এবার আমার সামনেই চাপা, কৌতুকমিশ্রিত সুরে আমাকে শুনাইয়া বলিলেন—বাবুজীকে বল এইবার ঘরের তৈরী প্যাঁড়া খেয়ে গালের জ্বলুনি থামান।

কি সুন্দর মিষ্টি মেয়েলি ঠেঁট হিন্দী বুলি!

বড় ভাল লাগে এ-অঞ্চলের মেয়েদের মুখে এই হিন্দীর টানটি। নিজে ভাল হিন্দী বলিতে পারি না বলিয়া আমার কথ্য হিন্দীর প্রতি বেজায় আকর্ষণ। বইয়ের হিন্দী নয় —এই সব পল্লীপ্রান্তে, পাহাড়তলীতে, বনদেশের মধ্যে বিস্তীর্ণ শ্যামল যব গম ক্ষেতের পাশে, চলনশীল চামড়ার রহট্ যেখানে মহিষের দ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া ক্ষেতে ক্ষেতে জল সেচন করিতেছে, অস্তসূর্যের ছায়াভরা অপরাহ্নে দূরের নীলাভ শৈলশ্রেণীর দিকে উড়ন্ত বালিহাঁস বা সিল্লী বা বকের দল যেখানে একটা দূরবিসর্পী ভূপৃষ্ঠের আভাস বহন করিয়া আনে—সেখানকার সে হঠাৎ-শেষ-হইয়া-যাওয়া, কেমন যেন আধ-আধ, ভাঙা-ভাঙা ক্রিয়াপদযুক্ত এক ধরনের ভাষা, যাহা বিশেষ করিয়া মেয়েদের মুখে সাধারণত শোনা যায়—তাহার প্রতি আমার টান খুব বেশী।

হঠাৎ আমি কবিকে বলিলাম—দয়া ক'রে দু-একটা কবিতা পড়ুন না আপনার?

বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল দেখাইল। একটি গ্রাম্য প্রেম-কাহিনী লইয়া কবিতা লিখিয়াছে, সেটি পড়িয়া শুনাইল। ছোট্ট একটি খালের এ-পারের মাঠে এক তরুণ যুবক বসিয়া ভুট্টার ক্ষেত পাহারা দিত, খালের ওপারের ঘাটে একটি মেয়ে আসিত নিত্য কলসী-কাঁখে জল ভরিতে। ছেলেটি ভাবিত মেয়েটি বড় সুন্দর। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া শিস দিয়া গান করিত, ছাগল গরু তাড়াইত, মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিত। কত সময়ে দুজনের চোখাচোখি হইয়া গিয়াছে। অমনি লজ্জায় লাল হইয়া কিশোরী চোখ নামাইয়া লইত। ছেলেটি রোজ ভাবিত, কাল সে মেয়েটিকে ডাকিয়া কথা কহিবে। বাড়ী ফিরিয়া সে মেয়েটির কথা ভাবিত। কত কাল কাটিয়া গেল, কত 'কাল' আসিল, কত চলিয়া গেল—মনের কথা আর বলা হইল না। তার পর একদিন মেয়েটি আসিল না, পরদিনও আসিল না; দিন, সপ্তাহ, মাস কাটিয়া গেল, কোথায় সে প্রতি-দিনের সুপরিচিতা কিশোরী? ছেলেটি হতাশ হইয়া রোজ রোজ ফিরিয়া আসে মাঠ হইতে—ভীরু-প্রেমিক সাহস করিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না। ..ক্রমে ছেলেটিকে দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চাকুরি লইতে হইল। বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলেটি সেই নদীর ঘাটের রূপসী বালিকাকে আজও ভুলিতে পারে নাই।

দূরের নীল শৈলমালা ও দিগন্তবিস্তারী শস্যক্ষেত্রের দিকে চোখ রাখিয়া প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় এই কবিতাটি শুনিতে শুনিতে কতবার মনে হইল, এ কি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদেরই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা? কবি-প্রিয়ার নাম রুক্মা, কারণ ঐ নামে কবি একটি কবিতা

দেখিয়াছে, পূর্বে আমাকে তাহা শুনাইয়াছিল। ভাবিলাম এমন গুণবতী, সুরূপা রুক্‌মাকে পাইয়াও কি কবির বাল্যের সে দুঃখ আজও দূর হয় নাই?

আমাকে তাঁবুতে পৌঁছিয়া দিবার সময়ে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ একটি বড় বটগাছ দেখাইয়া বলিল—ঐ যে গাছ দেখছেন বাবুজী, ওর তলায় সেবার সভা হয়েছিল, অনেক কবি মিলে কবিতা পড়েছিল। এদেশে বলে মুসায়েরা। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। আমার কবিতা শুনে পাটনার ঈশ্বরীপ্রসাদ দুবে—চেনেন ঈশ্বরীপ্রসাদকে? ভারী এলেমদার লোক, 'দূত' পত্রিকার সম্পাদক—নিজেও একজন ভাল কবি—আমায় খুব খাতির করে-ছিলেন।

কথা শুনিয়া মনে হইল বেঙ্কটেশ্বর জীবনে এই একবারই সভাসমিতিতে দাঁড়াইয়া নিজের কবিতা আবৃত্তি করিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল এবং সেদিনটি তাহার জীবনে একটা খুব বড় ও স্মরণীয় দিন গিয়াছে। এত বড় সম্মান আর কখনও সে পায় নাই।

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### ১

প্রায় তিন মাস পরে নিজের মহালে ফিরিব। সার্ভের কাজ এতদিনে শেষ হইল।

এগারো ক্রোশ রাস্তা। এই পথেই সেবার সেই পৌষসংক্রান্তির মেলায় আসিয়াছিলাম—সেই শাল-পলাশের বন, শিলাখণ্ড-ছড়ানো মুক্ত প্রান্তর, উঁচু-নীচু শৈলমালা। ঘণ্টা-দুই চলিয়া আসিবার পরে দূরে দিগ্বলয়ের কোলে একটি ধূসর রেখা দেখা গেল—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট।

এই পরিচিত দিক্‌জ্ঞাপক দৃশ্যটি আজ তিন মাস দেখি নাই। এতদিন এখানে আসিয়া আমাদের লবটুলিয়া ও নাঢ়া-বইহারের উপর এমন একটা টান জন্মিয়া গিয়াছে যেন ইহাদের ছাড়িয়া বেশী দিন কোথাও থাকিলে কষ্ট হয়, মনে হয় দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আছি। আজ তিন মাস পরে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা দেখিয়া প্রবাসীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আনন্দ অনুভব করিলাম, যদিচ এখনও লবটুলিয়ার সীমানা এখান হইতে সাত-আট মাইল দূরে হইবে।

ছোট একটা পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় অনেকখানি জুড়িয়া জঙ্গল কাটিয়া কুসুম-ফুলের আবাদ করিয়াছিল—এখন পাকিবার সময়, কাটুনি জনেরা ক্ষেতে কাজ করিতেছে।

আমি ক্ষেতের পাশের রাস্তা দিয়া যাইতেছি, হঠাৎ ক্ষেতের দিক হইতে কে আমায় ডাকিল—বাবুজী, ও বাবুজী—বাবুজী—

চাহিয়া দেখি, আর বছরের সেই মঞ্চী। বিস্মিত হইলাম, আনন্দিতও হইলাম। ঘোড়া থামাইতেই মঞ্চী হাসিমুখে কাস্তে-হাতে ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়ার পাশে দাঁড়াইল। বলিল—আমি দূর থেকেই ঘোড়া দেখে মালুম করেছি। কোথায় গিয়েছিলেন বাবুজী?

মঞ্চী ঠিক তেমনই আছে দেখিতে—বরং আরও একটু স্বাস্থ্যবতী হইয়াছে। কুসুম-ফুলের পাপড়ির গুঁড়া লাগিয়া তাহার হাতখানা ও পরনের শাড়ীর সামনের দিকটা রাঙা।

বলিলাম—বহরাবুরু পাহাড়ের নীচে কাজ পড়েছিল, সেখানে তিন মাস ছিলাম।

সেখান থেকে ফিরছি। তোমরা এখানে কি করছ?

—কুসুম-ফুল কাটছি, বাবুজী। বেলা হয়ে গিয়েছে, এবেলা নামুন এখানে। ঐ তো কাছেই খুপরি।

আমার কোনো আপত্তি টিঁকিল না। মঞ্চী কাজ ফেলিয়া আমাকে তাহাদের খুপরিতে লইয়া চলিল। মঞ্চীর স্বামী নক্‌ছেদী ভকৎ আমার আসার সংবাদ শুনিয়া ক্ষেত হইতে আসিল।

নক্‌ছেদী ভকতের প্রথম পক্ষের স্ত্রী খুপরির মধ্যে রান্নার কাজ করিতেছিল, সেও আমাকে দেখিয়া খুশি হইল।

তবে মঞ্চী সকল কাজে অগ্রণী। সে আমার জন্য গমের খড় পাতিয়া পুরু করিয়া বসিবার আসন করিল। একটি ছোট বাটিতে মহুয়ার তৈল আনিয়া আমাকে স্নান করিয়া আসিতে বলিল।

বলিল—চলুন আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—ঐ টোলার দক্ষিণে একটা ছোট্ট কুণ্ডী আছে। বেশ জল।

বলিলাম—সে জলে আমি নাইব না মঞ্চী। টোলাসুদ্ধ লোক সেই জলে কাপড় কাচে, মুখ ধোয়, স্নান করে, বাসনও মাজে। সে জল বড় খারাপ হবে। তোমরা কি এখানে সেই জলই খাচ্ছ। তা হলে আমি উঠি। ও জল আমি খাব না।

মঞ্চী ভাবনায় পড়িয়া গেল। বোঝা গেল ইহারাও সেই জল ছাড়া অন্য জল পাইবে কোথায় যে খাইবে না! না খাইয়া উপায় কি?

মঞ্চীর বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আমার কষ্ট হইল। এই দূষিত জল ইহারা মনের আনন্দে পান করিয়া আসিতেছে, কখনও ভাবে নাই এ-জলে আবার কি থাকিতে পারে, আজ আমি যদি জলের অজুহাতে ইহাদের আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া চলিয়া যাই, সরলপ্রাণ মেয়েটি মনে বড় আঘাত পাইবে।

মঞ্চীকে বলিলাম—বেশ, ঐ জল খুব ক'রে ফুটিয়ে নাও—তবে খাব। স্নান করা থাক্ গে।

মঞ্চী বলিল—কেন বাবুজী, আমি আপনাকে এক টিন জল ফুটিয়ে দিচ্ছি, তাতেই আপনি স্নান করুন। এখনও তেমন বেলা হয় নি। আমি জল নিয়ে আসছি, বসুন।

মঞ্চী জল আনিয়া রান্নার যোগাড় করিয়া দিল। বলিল—আমার হাতে তো খাবেন না বাবুজী, আপনি নিজেই রাঁধুন তবে!

—কেন খাব না, তুমি যা পার তাই রাঁধ।

—তা হবে না বাবুজী, আপনিই রাঁধুন। একদিনের জন্যে আপনার জাত কেন মারব? আমার পাপ হবে।

—কিছু হবে না। আমি তোমাকে বলছি, এতে কোনো দোষ হবে না।

অগত্যা মঞ্চী রাঁধিতে বসিল। রাঁধিবার আয়োজন বিশেষ কিছু নয়—খানকতক মোটা মোটা হাতে-গড়া রুটি ও বুনো ধুঁধুলের তরকারি। নক্‌ছেদী কোথা হইতে এক ভাঁড় মহিষের দুধ যোগাড় করিয়া আনিল।

রাঁধিতে বসিয়া মঞ্চী এতদিন কোথায় কোথায় ঘুরিয়াছে, সে গল্প করিতে লাগিল। পাহাড়ের অঞ্চলে কলাই কাটিতে গিয়া একটা রামছাগলের বাচ্চা পুষিয়াছিল, সেটা কি করিয়া হারাইয়া গেল সে-গল্পও আমাকে ঠায় বসিয়া শুনিতে হইল।

আমায় বলিল—বাবুজী, কাঁকোয়াড়া-রাজের জমিদারীতে যে গরম জলের কুণ্ড আছে, জানেন? আপনি তো কাছাকাছি গিয়েছিলেন, সেখানে যান নি?

আমি বলিলাম, কুণ্ডের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু সেখানে যাওয়া আমার ঘটে নাই।

মঞ্চী বলিল—জানেন বাবুজী, আমি সেখানে নাইতে গিয়ে মার খেয়েছিলাম। আমাকে নাইতে দেয় নি।

মঞ্চীর স্বামী বলিল—হ্যাঁ, সে এক কাণ্ড বাবুজী। ভারী বদমাইস সেখানকার পাণ্ডার দল।

বলিলাম—ব্যাপারখানা কি?

মঞ্চী স্বামীকে বলিল—তুমি বল না বাবুজীকে। বাবুজী কলকাতায় থাকেন, উনি লিখে দেবেন। তখন বদমাইস গুণ্ডারা মজা টের পাবে।

নক্‌ছেদী বলিল—বাবুজী, ওর মধ্যে সুরয-কুণ্ড খুব ভাল জায়গা। যাত্রীরা সেখানে স্নান করে। আমরা আমলাতলীর পাহাড়ের নীচে কলাই কাটছিলাম, পূর্ণিমার যোগ পড়লো কিনা? মঞ্চী নাইতে গেল ক্ষেতের কাজ বন্ধ রেখে। আমার সেদিন জ্বর, আমি নাইবো না। বড়বৌ তুলসীও গেল না, ওর তত ধর্মের বাতিক নেই। মঞ্চী সুরয-কুণ্ডে নামতে যাচ্ছে, পাণ্ডারা বলেছে—এই ওখানে কেন নামছিস? ও বলেছে—জলে নাইবো। তারা বলেছে—তুই কি জাত? ও বলেছে—গাঙ্গোতা। তখন তারা বলেছে—গাঙ্গোতীনকে আমরা নাইতে দিই নে কুণ্ডের জলে, চলে যা। ও তো জানেন তেজী মেয়ে। ও বলেছে—এ তো পাহাড়ী ঝরনা, যে-সে নাইতে পারে। ঐ তো কত লোক নাইছে। ওরা কি সকলে ব্রাহ্মণ আর ছত্রী? বলে যেমন নামতে গিয়েছে, দুজন ছুটে এসে ওকে টেনে হিঁচড়ে মারতে মারতে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে। ও কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল।

—তার পর কি হ'ল?

—কি হবে বাবুজী? আমরা গরীব গাঙ্গোতা কাটুনি মজুর। আমাদের ফরিয়াদ কে শুনবে। আমি বলি, কাঁদিস্ নে, তোকে আমি মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে নাইয়ে আনবো।

মঞ্চী বলিল—বাবুজী, আপনি একটু লিখে দেবেন তো কথাটা! আপনাদের বাঙালী বাবুদের কলমের খুব জোর। পাজীগুলো জব্দ হয়ে যাবে।

উৎসাহের সহিত বলিলাম—নিশ্চয়ই লিখবো।

তাহার পর মঞ্চী পরম যত্নে আমায় খাওয়াইল। বড় ভাল লাগিল তাহার আগ্রহ ও সেবাযত্ন।

বিদায় লইবার সময় তাহাকে বার-বার বলিলাম—সামনের বৈশাখ মাসে যব গম কাটুনির সময় তারা যেন নিশ্চয়ই আমাদের লবটুলিয়া-বইহারে যায়।

মঞ্চী বলিল—ঠিক যাব বাবুজী। সে কি আপনাকে বলতে হবে!

মঞ্চীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় মনে হইল, আনন্দ, স্বাস্থ্য ও সারল্যের প্রতিমূর্তি যেন সে। এই বনভূমির সে যেন বনলক্ষ্মী, পরিপূর্ণ-যৌবনা, প্রাণময়ী, তেজস্বিনী অথচ মুগ্ধা, অনভিজ্ঞা, বালিকাস্বভাবা।

বাঙালীর কলমের উপর অসীম নির্ভরশীলা এই বন্য মেয়েটির নিকট সেদিন যে অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ তাহা পালন করিলাম—জানি না ইহাতে এতকাল পরে তাহার কি উপকার হইবে! এতদিন সে কোথায়, কি ভাবে আছে, বাঁচিয়া আছে কি না, তাহাই বা কে জানে?

শ্রাবণ মাস। নবীন মেঘে ঢল নামিয়াছে অনেক দিন, নাঢ়া ও লবটুলিয়া-বইহারে কিংবা গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটতলায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাও, শুধুই দেখ সবুজের সমুদ্রের মত নবীন কচি কাশবন।

একদিন রাজা দোবরু পান্নার চিঠি পাইয়া শ্রাবণ-পূর্ণিমায় তাঁর ওখানে ঝুলনোৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলাম। রাজু ও মটুকনাথ ছাড়িল না, আমার সঙ্গে তাহারাও চলিল। হাঁটিয়া যাইবে বলিয়া উহারা রওনা হইল আমার আগেই।

বেলা দেড়টার সময় ডোঙায় মিছি নদী পার হইলাম। দলের সকলের পার হইতে আড়াইটা বাজিয়া গেল। দলটিকে পিছনে ফেলিয়া তখন ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

ঘন মেঘ করিয়া আসিল পশ্চিমে। তার পরেই নামিল ঝম্ ঝম্ বর্ষা।

কি অপূর্ব বর্ষার দৃশ্য দেখিলাম সেই অরণ্য-প্রান্তরে! মেঘে মেঘে দিগন্তের শৈলমালা নীল, ধম্‌কানো কালো বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে আকাশ ছাইয়া আছে, ক্বচিৎ পথের পাশের শাল কি কেঁদ শাখায় ময়ূর পেখম মেলিয়া নৃত্যপরায়ণ, পাহাড়ী ঝরনার জলে গ্রাম্য বালক-বালিকা মহা উৎসাহে শাল-কাঠির ও বন্য বাঁশের ঘুনি পাতিয়া কুচো মাছ ধরিতেছে, ধূসর শিলাখণ্ড ভিজিয়া কালো দেখাইতেছে, তাহার উপর বসিয়া মহিষের রাখাল কাঁচা শালপাতার লম্বা বিড়ি টানিতেছে। শান্তস্তব্ধ দেশ—অরণ্যের পর অরণ্য, প্রান্তরের পর প্রান্তর, শুধুই ঝরনা, পাহাড়ী গ্রাম, মরুম-ছড়ানো রাঙা মাটির জমি, ক্বচিৎ কোথাও পুষ্পিত কদম্ব বা পিয়াল বৃক্ষ।

সন্ধ্যার পূর্বে আমি রাজা দোবরু পান্নার রাজধানীতে পৌঁছিয়া গেলাম।

সেবারকার সেই খড়ের ঘরখানা অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য চমৎকার করিয়া লেপিয়া পুঁছিয়া রাখা হইয়াছে। দেওয়ালে গিরিমাটির রং, পদ্ম গাছ ও ময়ূর আঁকা, শাল কাঠের খুঁটির গায়ে লতা ও ফুল জড়ানো। আমার বিছানা এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই, আমি ঘোড়ায় আগেই পৌঁছিয়াছিলাম—কিন্তু তাহাতে কোনো অসুবিধা হইল না। ঘরে নূতন মাদুর পাতাই ছিল, গোটা দুই ফর্সা তাকিয়াও দিয়া গেল।

একটু পরে ভানুমতী একখানা বড় পিতলের সরাতে ফলমূল-কাটা ও একবাটি জ্বাল-দেওয়া দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিল, তাহার পিছু পিছু আসিল একখানা কাঁচা শাল-পাতায় গোটা পান, গোটা সুপারি ও অন্যান্য পানের মশলা সাজাইয়া লইয়া আর একটি তাহার বয়সী মেয়ে।

ভানুমতীর পরনে একখানা জাম-রঙের খাটো শাড়ী হাঁটুর উপর উঠিয়াছে, গলায় সবুজ ও লাল হিংলাজের মালা, খোঁপায় জলজ স্পাইডার লিলি গোঁজা। আরও স্বাস্থ্য-বতী ও লাবণ্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে ভানুমতী—নিটোল দেহে যৌবনের উচ্ছলিত লাবণ্যের বান ডাকিয়াছে, চোখের ভাবে কিন্তু যে সরলা বালিকা দেখিয়াছিলাম, সেই সরলা বালিকাই আছে।

বলিলাম—কি ভানুমতী, ভাল আছ?

ভানুমতী নমস্কার করিতে জানে না—আমার কথার উত্তরে সরল হাসি হাসিয়া বলিল—আপনি, বাবুজী?

—আমি ভাল আছি।

—কিছু খান। সারাদিন ঘোড়ায় এসে খিদে পেয়েছে খুব।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আমার সামনে মাটির মেঝেতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল ও পিতলের থালাখানা হইতে দুখানা পেঁপের টুকরা আমার হাতে তুলিয়া দিল।

আমার ভাল লাগিল—ইহার নিঃসঙ্কোচ বন্ধুত্ব। বাংলা দেশের মানুষের কাছে ইহা কি অদ্ভুত ধরনের, অপ্রত্যাশিত ধরনের নূতন, সুন্দর, মধুর। কোনো বাঙালী কুমারী অনাত্মীয়া ষোড়শী এমন ব্যবহার করিত? মেয়েদের সম্পর্কে আমাদের মন কোথায় যেন গুটাইয়া পাকাইয়া জড়সড় হইয়া আছে সর্বদা। তাহাদের সম্বন্ধে না পারি প্রাণ খুলিয়া ভাবিতে, না পারি তাহাদের সঙ্গে মন খুলিয়া মিশিতে।

আরও দেখিয়াছি, এ-দেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দুরচ্ছন্দা—ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সঙ্কোচহীন, সরল, বাধাহীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মত স্বাভাবিক। এমনি পাইয়াছি মঞ্চীর কাছে ও বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের স্ত্রীর কাছে। অরণ্য ও পাহাড় এদের মনকে মুক্তি দিয়াছে, দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে—এদের ভালবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত, দৃঢ়, উদার। মন বড় বলিয়া এদের ভালবাসাও বড়।

কিন্তু ভানুমতীর কাছে বসিয়া হাতে তুলিয়া দিয়া খাওয়ানোর তুলনা হয় না। জীবনে সেদিন সর্বপ্রথম আমি অনুভব করিলাম নারীর নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের মাধুর্য। সে যখন স্নেহ করে, তখন সে কি স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দেয় পৃথিবীতে!

ভানুমতীর মধ্যে যে আদিম নারী আছে, সভ্য সমাজে সে-নারীর আত্মা সংস্কারের ও বন্ধনের চাপে মূর্ছিত।

সে-বার যে-রকম ব্যবহার পাইয়াছিলাম, এবারকার ব্যবহার তার চেয়েও আপন, ভানুমতী বুঝিতে পারিয়াছে এ বাঙালী বাবু তাদের পরিবারের বন্ধু, তাদেরই শুভাকাঙ্ক্ষী আপনার লোকদের মধ্যে গণ্য—সুতরাং যে ব্যবহার তাহার নিকট পাইলাম তাহা নিজের স্নেহময়ী ভগ্নীর মতই।

অনেককাল হইয়া গিয়াছে—কিন্তু ভানুমতীর এই সুন্দর প্রীতি ও বন্ধুত্বের কথা আমার স্মৃতিপটে তেমনি সমুজ্জ্বল—বন্য অসভ্যতার এই দানের নিকট সভ্য সমাজের বহু সম্পদ্ আমার মনে নিষ্প্রভ হইয়া আছে।

রাজা দোবরু উৎসবের অন্য আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, এইবার আসিয়া আমার ঘরে বসিলেন।

আমি বলিলাম—ঝুলন কি আপনাদের এখানে বরাবর হয়?

রাজা দোবরু বলিলেন—আমাদের বংশে বহুদিনের উৎসব এইটি। এ সময়ে অনেক দূর থেকে আত্মীয়স্বজন আসে ঝুলনে নাচতে। আড়াই মণ চাল রান্না হবে কাল।

মটুকনাথ আসিয়াছে পণ্ডিত-বিদায়ের লোভে—ভাবিয়াছিল কত বড় রাজবাড়ী, কি কাণ্ডই আসিয়া দেখিবে! তাহার মুখের ভাবে মনে হইল সে বেশ একটু নিরাশ হইয়াছে। এ রাজবাড়ী অপেক্ষা টোলগৃহ যে অনেক ভাল।

রাজু তো মনের কথা চাপিতে না পারিয়া স্পষ্টই বলিল—রাজা কোথায় হুজুর, এ তো এক সাঁওতাল-সর্দার! আমার যে ক'টা মহিষ আছে, রাজার শুনলাম তাও নেই,

হুজুর!

সে ইহারই মধ্যে রাজার পার্থিব সম্পদের বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছে—গরু, মহিষ এদেশে সম্পদের বড় মাপকাঠি। যার যত মহিষ, সে তত বড়লোক।

গভীর রাত্রে চতুর্দশীর জ্যোৎস্না বনের বড় বড় গাছপালার আড়ালে উঠিয়া যখন সেই বন্য গ্রামের গৃহস্থবাড়ীর প্রাঙ্গণে আলো-আঁধারের জাল বুনিয়াছে, তখন শুনিলাম রাজবাড়ীতে বহু নারীকণ্ঠের সম্মিলিত এক অদ্ভুত ধরনের গান। কাল ঝুলন-পূর্ণিমা, রাজবাড়ীতে নবাগত কুটুম্বিনী ও রাজকন্যার সহচরীগণ কল্যকার নাচগানের মহলা দিতেছে। সারারাত ধরিয়া তাহাদের গান ও মাদল বাজনা থামিল না।

শুনিতে শুনিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, ঘুমের মধ্যেও ওদের সেই গান কতবার যেন শুনিতে পাইতেছিলাম।

৩

কিন্তু পরদিন ঝুলনোৎসব দেখিয়া মটুকনাথ, রাজু, এমন কি মুনেশ্বর সিং পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি ভানুমতীর বয়সী কুমারী মেয়েই অন্ততঃ ত্রিশজন চারিপাশের বহু টোলা ও পাহাড়ী বস্তি হইতে উৎসব উপলক্ষে আসিয়া জুটিয়াছে। একটি ভাল প্রথা দেখিলাম, এত নাচগানের মধ্যে ইহাদের কেহই মহুয়ার মদ খায় নাই। রাজা দোবরুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি হাসিয়া গর্বের সুরে বলিলেন—আমাদের বংশে মেয়েদের মধ্যে ও নিয়ম নেই। তা ছাড়া আমি হুকুম না দিলে, কারো সাধ্যি নেই আমার ছেলেমেয়ের সামনে মদ খায়।

মটুকনাথ দুপুরবেলা আমায় চুপি চুপি বলিল—রাজা দেখছি আমার চেয়ে গরীব। রাঁধবার জন্যে দিয়েছে মোটা রাঙা চাল, আর পাকা চালকুমড়ো, আর বুনো ধুঁধুল। এতগুলো লোকের জন্যে কি রাঁধি বলুন তো?

সারা সকাল ভানুমতীর দেখা পাই নাই—খাইতে বসিয়াছি, সে এক বাটি দুধ আনিয়া আমার সামনে বসিল।

বলিলাম—তোমাদের গান কাল রাত্রে বেশ লেগেছিল।

ভানুমতী হাসিমুখে বলিল—আমাদের গান বুঝতে পারেন?

বলিলাম—কেন পারব না? এতদিন তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমাদের গান বুঝব না কেন?

—আজ ও-বেলা আপনি ঝুলন দেখতে যাবেন তো?

—সেজন্যেই তো এসেছি। কতদূর যেতে হবে?

ভানুমতী ধনুঝরি পাহাড়শ্রেণীর দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—আপনি তো গিয়েছেন ও পাহাড়ে। আমাদের সেই মন্দির দেখেন নি?

এই সময় ভানুমতীর বয়সী একদল কিশোরী মেয়ে আমার খাবারঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বাঙালী বাবুর ভোজন পরম কৌতূহলের সহিত দেখিতে এবং পরস্পরে কি বলাবলি করিতে লাগিল।

ভানুমতী বলিল—যা সব এখান থেকে, এখানে কি?

একটি মেয়ের সাহস অন্য মেয়েদের চেয়ে বেশী, সে একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল,—বাবুজীকে ঝুলনের দিন নুন করমচা খেতে দিস্ নি তো?

তাহার এ কথায় পিছনের সব মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া এ উহার গায়ে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ভানুমতীকে বলিলাম—ওরা হাসছে কেন?

ভানুমতী সলজ্জ মুখে বলিল—ওদের জিজ্ঞেস করুন। আমি কি জানি!

ইতিমধ্যে একটি মেয়ে বড় একটা পাকা কামরাঙা লঙ্কা আনিয়া আমার পাতে দিয়া হাসিয়া বলিল—খান বাবুজী একটু লঙ্কার আচার। ভানুমতী শুধু আপনাকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, তা তো হবে না! আমরা একটু ঝাল খাওয়াই।

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। এতগুলি তরুণীর মুখের সরল হাসিতে দিনমানেই যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্বে একদল তরুণ-তরুণী পাহাড়ের দিকে রওনা হইল—তাহাদের পিছু পিছু আমরাও গেলাম—সে এক প্রকান্ড শোভাযাত্রা। পূর্বদিকে নওয়াদা-লছমীপুরার সীমানায় ধন্‌ঝরি পাহাড়, যে পাহাড়ের নীচে মিছি নদী উত্তরবাহিনী হইয়াছে, সে পাহাড়ের বনশীর্ষে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে, একদিকে নীচু উপত্যকা, বনে বনে সবুজ, অন্য-দিকে ধন্‌ঝরি শৈলমালা। মাইল-খানেক হাঁটিয়া আমরা পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। কিছুদূর উঠিতে একটা সমতল স্থান পাহাড়ের মাথায়। জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা প্রাচীন পিয়াল গাছ—গাছের গুঁড়ি ফুল ও লতায় জড়ানো। রাজা দোবরু বলিলেন—এই গাছ অনেক কালের পুরোনো—আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি এই গাছের তলায় ঝুলনের সময় মেয়েরা নাচে।

আমরা একপাশে তালপাতার চেটাই পাতিয়া বসিলাম, আর সেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-প্লাবিত বনান্তস্থলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোরী তরুণী গাছটিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল—পাশে পাশে মাদল বাজাইয়া একদল যুবক তাহাদের সংগে সংগে ঘুরিতেছে। ভানুমতীকে দেখিলাম এই দলের পুরোভাগে। মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গহনা।

কত রাত পর্যন্ত সমান ভাবে নাচ ও গান চলিল—মাঝে মাঝে দলটি একটু বিশ্রাম করিয়া লয়, আবার আরম্ভ করে—মাদলের বোল, জ্যোৎস্না, বর্ষাস্নিগ্ধ বনভূমি, সুঠাম শ্যামা নৃত্যপরায়ণা তরুণীর দল—সব মিলিয়া কোনো বড় শিল্পীর অঙ্কিত একখানি ছবির মত তা সুশ্রী—একটি মধুর সঙ্গীতের মত তার আকুল আবেদন। মনে পড়ে দূর ইতিহাসের সোলাঙ্কি-রাজকন্যা ও তার সহচরীগণের এমনি ঝুলন নাচ ও গানের কথা, মনে পড়ে রাখাল বালক বাপ্পাদিত্যকে খেলার ছলে মাল্যদানের কথা।

আজু কি আনন্দ, আজু কি আনন্দ
ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ্

তার চেয়েও বহু দূরের অতীতে, প্রাচীন যুগের প্রস্তর-যুগের ভারতের রহস্যাচ্ছন্ন ইতিহাসের সকল ঘটনা যেন আমার সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখিলাম—আদিম ভারতের সে সংস্কৃতি যেন মূর্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে সরলা পর্বতবালা ভানুমতী ও তাহার সখীগণের নৃত্যে—হাজার হাজার বৎসর পূর্বের এমনি কত বন, কত শৈলমালা, এমনি-তর কত জ্যোৎস্নারাত্রি, ভানুমতীর মত কত বালিকার নৃত্যচঞ্চল চরণের ছন্দে আকুল

হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মুখের সেসব হাসি আজও মরে নাই—এই সব গুপ্ত অরণ্য ও শৈলমালার আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তারা তাদের বর্তমান বংশধরগণের রক্তে আজও আনন্দ ও উৎসাহের বাণী পাঠাইয়া দিতেছে।

গভীর রাত্রি। চাঁদ ঢলিয়া পড়িয়াছে পশ্চিম দিকের দূর বনের পিছনে। আমরা সবাই পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম। সুখের বিষয় আজ আকাশে মেঘ নাই, কিন্তু আর্দ্র বাতাস শেষরাত্রে অত্যন্ত শীতল হইয়া উঠিয়াছে। অত রাত্রেও আমি খাইতে বসিলে ভানুমতী দুধ ও পেঁড়া আনিল।

আমি বলিলাম—বড় চমৎকার নাচ দেখলাম তোমাদের।

সে সলজ্জ হাসিমুখে বলিল—আপনার কি আর ভাল লাগবে বাবুজী—আপনাদের কল্‌কাতায় ওসব কি কেউ দ্যাখে?

পরদিন ভানুমতী ও তাহার প্রপিতামহ রাজা দোবরু আমায় কিছুতেই আসিতে দিবে না। অথচ আমার কাজ ফেলিয়া থাকিলে চলে না, বাধ্য হইয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় ভানুমতী বলিল—বাবুজী, কলকাতা থেকে আমার জন্যে একখানা আয়না এনে দেবেন? আমার আয়না একখানা ছিল, অনেকদিন হল ভেঙে গিয়েছে।

ষোল বছর বয়সের সুশ্রী নবযৌবনা কিশোরীর আয়নার অভাব! তবে আয়নার সৃষ্টি হইয়াছে কাদের জন্যে? এক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ণিয়া হইতে একখানা ভাল আয়না আনাইয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

### ১

কয়েক মাস পরে। ফাল্গুন মাসের প্রথম। লবটুলিয়া হইতে কাছারি ফিরিতেছি জঙ্গলের মধ্যে কুণ্ডীর ধারে বাংলা কথাবার্তায় ও হাসির শব্দে ঘোড়া থামাইলাম। যত কাছে যাই, ততই আশ্চর্য হই। মেয়েদের গলাও শোনা যাইতেছে—ব্যাপার কি? জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ঢুকাইয়া কুণ্ডীর ধারে লইয়া গিয়া দেখি, বনঝাউয়ের ঝোপের ধারে শতরঞ্জি পাতিয়া আট-দশটি বাঙালী ভদ্রলোক বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে, পাঁচ-ছয়টি মেয়ে কাছেই রান্না করিতেছে, ছ-সাতটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কোথা হইতে এতগুলি মেয়ে-পুরুষ এই ঘোর জঙ্গলে ছেলেপুলে লইয়া পিকনিক করিতে আসিল বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় সকলেরই চোখ আমার দিকে পড়িল—একজন বাংলায় বলিল—এ ছাতুটা আবার কোথা থেকে এসে জুটল এ জঙ্গলে? আম্‌ব্রেলু?

আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া তাদের কাছে যাইতে যাইতে বলিলাম—আপনারা বাঙালী দেখচি—এখানে কোথা থেকে এলেন?

তারা খুব আশ্চর্য হইল, অপ্রতিভও হইল। বলিল—ও, মশায় বাঙালী? হেঁ-হেঁ, কিছু মনে করবেন না, আমরা ভেবেছি—হেঁ-হেঁ—

বলিলাম—না না, মনে করবার আছে কি? তা আপনারা কোথা থেকে আসছেন, বিশেষ মেয়েদের নিয়ে—

আলাপ জমিয়া গেল। এই দলের মধ্যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি একজন রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, রায় বাহাদুর। বাকী সকলে তাঁর ছেলে, ভাইপো, ভাইঝি, মেয়ে, নাতনী, জামাই, জামাইয়ের বন্ধু ইত্যাদি। রায় বাহাদুর কলিকাতায় থাকিতে একখানি বই পড়িয়া জানিতে পারেন, পূর্ণিয়া জেলায় খুব শিকার মেলে, তাই শিকার করিবাব কোনো সুবিধা হয় কিনা দেখিবার জন্য পূর্ণিয়ায় তাঁর ভাই মুন্সেফ, সেখানেই আসিয়াছিলেন। আজ সকালে সেখান হইতে ট্রেনে চাপিয়া বেলা দশটার সময় কাটারিয়া পৌঁছেন। সেখান হইতে নৌকা করিয়া কুশী নদী বাহিয়া এখানে পিক্‌নিক্‌ করিতে আসিয়াছেন—কারণ সকলের মুখেই নাকি শুনিয়াছেন লবটুলিয়া, বোমাইবুরু ও ফুলকিয়া বইহারের জঙ্গল না দেখিয়া গেলে জঙ্গল দেখাই হইল না। পিক্‌নিক্‌ সারিয়াই চার মাইল হাঁটিয়া মোহনপুরা জঙ্গলের নীচে কুশী নদীতে গিয়া নৌকা ধরিবেন—ধরিয়া আজ রাত্রেই কাটারিয়া ফিরিয়া যাইবেন।

আমি সত্যই অবাক হইয়া গেলাম। সম্বলের মধ্যে দেখিলাম ইহাদের সঙ্গে আছে একটা দো-নলা শট্‌-গান্‌—ইহাই ভরসা করিয়া এ ভীষণ জঙ্গলে ইহারা ছেলেমেয়ে লইয়া পিক্‌নিক্‌ করিতে আসিয়াছে। অবশ্য সাহস আছে অস্বীকার করিব না, কিন্তু অভিজ্ঞ রায় বাহাদুরের আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মোহনপুরা জঙ্গলের নিকট দিয়া এদেশের জংলী লোকেই সন্ধ্যার পূর্বে যাইতে সাহস করে না বন্য মহিষের ভয়ে। বাঘ বার হওয়াও আশ্চর্য নয়। বুনো শুয়োর আর সাপের তো কথাই নাই। ছেলেমেয়ে লইয়া পিক্‌নিক্‌ করিতে আসিবার জায়গা নয় এটা।

রায় বাহাদুর আমাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। বসিতে হইবে, চা খাইতে হইবে। আমি এ জঙ্গলে কি করি, কি বৃত্তান্ত। আমি কি কাঠের ব্যবসা করি? নিজের ইতিহাস বলিবার পরে তাঁহাদিগকে সবসুদ্ধ কাছারিতে রাত্রিযাপন করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাঁহারা রাজী হইলেন না। রাত্রি দশটার ট্রেনে কাটারিয়াতে উঠিয়া পূর্ণিয়া আজই রাত বারোটায় পৌঁছিতে হইবে। না ফিরিলে বাড়ীতে সকলে ভাবিবে, কাজেই থাকিতে অপারগ ইত্যাদি।

জঙ্গলের মধ্যে ইহারা এত দূর কেন পিক্‌নিক্‌ করিতে আসিয়াছে তাহা বুঝিলাম না। লবটুলিয়া বইহারের উন্মুক্ত প্রান্তর বনানী ও দূরের পাহাড়রাজির শোভা, সূর্যাস্তের রং, পাখীর ডাক, দশ হাত দূরে বনের মধ্যে ঝোপের মাথায় মাথায় এই বসন্তকালে কত চমৎকার ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে—এসবের দিকে ইহাদের নজর নাই দেখিলাম। ইহারা কেবল চীৎকার করিতেছে, গান গাহিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে, খাওয়ার তরিবৎ কিসে হয় সে-ব্যবস্থা করিতেছে। মেয়েদের মধ্যে দুটি কলিকাতায় কলেজে পড়ে, বাকী দু-তিনটি স্কুলে পড়ে। ছেলেগুলির মধ্যে একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বাকীগুলি বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতির এই অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যময় রাজ্যে দৈবাৎ যদি আসিয়াই পড়িয়াছে, দেখিবার চোখ নাই আদৌ। প্রকৃতপক্ষে ইহারা আসিয়াছিল শিকার করিতে—খরগোস, পাখী, হরিণ—পথের ধারে যেন ইহাদের বন্দুকের গুলি খাইবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

যে মেয়েগুলি আসিয়াছে, এমন কল্পনার-লেশ-পরিশূন্য মেয়ে যদি কখনও দেখিয়াছি। তাহারা ছুটাছুটি করিতেছে, বনের ধার হইতে রান্নার জন্য কাঠ কুড়াইয়া আনিতেছে, মুখে বকুনির বিরাম নাই—কিন্তু একবার কেহ চারিধারে চাহিয়া দেখিল না যে কোথায়

বসিয়া তাহারা খিচুড়ি রাঁধিতেছে, কোন্ নিবিড় সৌন্দর্যভরা বনানীপ্রান্তে।

একটি মেয়ে বলিল—'টিন-কাটার্' ঠুকবার বড্ড সুবিধে এখানে, না? কত পাথরের নুড়ি!

আর একটি মেয়ে বলিল—উঃ, কি জায়গা! ভাল চাল কোথাও পাবার জো নেই—কাল সারা টাউন খুঁজে বেড়িয়েছি—কি বিশ্রী মোটা চাল—তোমরা আবার বলছিলে পোলাও হবে!

ইহারা কি জানে, যেখানে বসিয়া তারা রান্না করিতেছে, তার দশ-বিশ হাতের মধ্যে রাত্রের জ্যোৎস্নায় পরীরা খেলা করিয়া বেড়ায়?

ইহারা সিনেমার গল্প শুরু করিয়াছে। পূর্ণিমায় কালও রাত্রে তাহারা সিনেমা দেখিয়াছে, তা নাকি যৎপরোনাস্তি বাজে। এই সব গল্প। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সিনেমার সঙ্গে তাহার তুলনা করিতেছে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, কথা মিথ্যা নয়। বৈকাল পাঁচটার সময় ইহারা চলিয়া গেল।

যাইবার সময় কতকগুলি খালি জমাট দুধের ও জ্যামের টিন ফেলিয়া রাখিয়া গেল। লবটুলিয়া জঙ্গলের গাছপালার তলায় সেগুলি আমার কাছে কি খাপছাড়াই দেখাইতেছিল!

## ২

বসন্তের শেষ হইতেই এবার লবটুলিয়া বইহারের গম পাকিয়া উঠিল। আমাদের মহালে রাই-সরিষার চাষ ছিল গত বৎসর খুব বেশী। এবার অনেক জমিতে গমের আবাদ, সুতরাং এ বছর এখানে কাটুনি মেলার সময় পড়িল বৈশাখের প্রথমেই।

কাটুনি মজুরদের মাথায় যেন টনক আছে, তাহাদের দল এবার শীতের শেষে আসে নাই, এ সময় দলে দলে আসিয়া জঙ্গলের ধারে, মাঠের মধ্যে সর্বত্র খুপরি বাঁধিয়া বাস করিতে শুরু করিয়াছে। দুই-তিন হাজার বিঘা জমির ফসল কাটা হইবে, সুতরাং মজুরও আসিয়াছে প্রায় তিন-চার হাজারের কম নয়। আরও শুনিলাম আসিতেছে।

আমি সকাল হইলেই ঘোড়ায় বাহির হই, সন্ধ্যায় ঘোড়ার পিঠ হইতে নামি। কত নূতন ধরনের লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে. ইহাদের মধ্যে কত বদমাইশ. গুণ্ডা. চোর, রোগগ্রস্ত—সকলের উপব নজর না রাখিলে এসব পুলিসবিহীন স্থানে একটা দুর্ঘটনা যখন-তখন ঘটিতে পারে।

দু-একটি ঘটনা বলি।

একদিন দেখি এক জায়গায় দুটি বালক ও একটি বালিকা রাস্তার ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে।

ঘোড়া হইতে নামিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে তোমাদের?

উত্তরে যাহা বলিল উহার মর্ম এইরূপঃ উহাদের বাড়ী আমাদের মহালে নয়, নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালার গ্রামে। উহারা সহোদর ভাই-বোন, এখানে কাটুনি মেলা দেখিতে আসিয়াছিল। আজই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং কোথায় নাকি লাঠি ও দড়ির ফাঁসের জুয়াখেলা হইতেছিল, বড় ছেলেটি সেখানে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করে। একটা লাঠির যে-দিকটা মাটিতে ঠেকিয়া আছে সেই প্রান্তটা দড়ি দিয়া জড়াইয়া দিতে হয়,

যদি দড়ি খুলিতে খুলিতে লাঠির আগায় ফাঁস জড়াইয়া যায়, তবে খেলাওয়ালা খেলুড়েকে এক পয়সায় চার পয়সা হিসাবে দেয়।

বড় ভাইয়ের কাছে ছিল দশ আনা পয়সা, সে একবারও লাঠিতে ফাঁস বাধাতেই পারে নাই, সব পয়সা হারিয়া ছোট ভাইয়ের আট আনা ও পরিশেষে ছোট বোনের চার আনা পয়সা পর্যন্ত লইয়া বাজি ধরিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছে। এখন উহাদের খাইবার পয়সা নাই, কিছু কেনা বা দেখাশোনা তো দূরের কথা।

আমি তাহাদের কাঁদিতে বারণ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া জুয়াখেলার অকুস্থানের দিকে চলিলাম। প্রথমে তাহারা জায়গাই স্থির করিতে পারে না, পরে একটা হরীতকী গাছ দেখাইয়া বলিল—এরই তলায় খেলা হচ্ছিল। জনপ্রাণী নাই সেখানে। কাছারির রূপসিং জমাদারের ভাই সঙ্গে ছিল, সে বলিল—জুয়াচোরেরা কি এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকে হুজুর? লম্বা দিয়েছে কোন্ দিকে।

বিকালের দিকে জুয়াড়ী ধরা পড়িল। সে মাইল তিন দূরে একটি বস্তিতে জুয়া খেলিতেছিল, আমার সিপাহীরা দেখিতে পাইয়া তাহাকে আমার নিকট হাজির করিল। ছেলেমেয়েগুলি দেখিয়াই চিনিল।

লোকটা প্রথমে পয়সা ফেরত দিতে চায় না। বলে, সে তো জোর করিয়া কাড়িয়া লয় নাই, উহারা স্বেচ্ছায় খেলিয়া পয়সা হারিয়াছে, ইহাতে তাহার দোষ কি? অবশেষে তাহাকে ছেলেমেয়েদের সব পয়সা তো ফেরত দিতেই হইল—আমি তাহাকে পুলিসে দিবার আদেশ দিলাম।

সে হাতে পায়ে ধরিতে লাগিল। বলিলাম—তোমার বাড়ী কোথায়?

—বালিয়া জেলা, বাবুজী।

—এ রকম করে লোককে ঠকাও কেন? কত পয়সা ঠকিয়েছ লোকজনের?

—গরীব লোক, হুজুর। আমায় ছেড়ে দিন এবার। তিন দিনে মোটে দু-টাকা তিন আনা রোজগার—

—তিন দিনে খুব বেশী রোজগার হয়েছে মজুরদের তুলনায়।

—হুজুর, সারা বছরে এ-রকম রোজগার ক'বার হয়? বছরে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা আয়।

লোকটাকে সেদিন ছাড়িয়া দিয়াছিলাম—কিন্তু আমার মহাল ছাড়িয়া সেদিনই চলিয়া যাইবার কড়ারে। আর তাকে কোনদিন কেউ আমাদের মহালের সীমানার মধ্যে দেখেও নাই।

এবার মঞ্চীকে কাটুনী মজুরদের মধ্যে না দেখিয়া উদ্বেগ ও বিস্ময় দুই-ই অনুভব করিলাম। সে বার বার বলিয়াছিল গম কাটিবার সময়ে নিশ্চয়ই আমাদের মহালে আসিবে। ফসল কাটার মেলা আসিল, চলিয়াও গেল—কেন যে সে আসিল না, কিছুই বুঝিলাম না।

অন্যান্য মজুরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনো সন্ধান মিলিল না। মনে ভাবিলাম, এত বিস্তীর্ণ ফসলের মহাল কাছাকাছির মধ্যে আর কোথাও নাই, এক কুশী-নদীর দক্ষিণে ইসমাইলপুরের দিয়ারা মহাল ছাড়া। কিন্তু সেখানে কেন সে যাইবে, অত দূরে, যখন মজুরি উভয় স্থানেই একই।

অবশেষে ফসলের মেলার শেষদিকে জনৈক গাঙ্গোতা মজুরের মুখে মঞ্চীর সংবাদ পাওয়া গেল। সে মঞ্চীকে ও তাহার স্বামী নক্‌ছেদী ভকৎকে চেনে। একসঙ্গে বহু জায়গায় কাজ করিয়াছে নাকি। তাহারই মুখে শুনিলাম গত ফাল্গুন মাসে সে উহাদের আকবরপুর গবর্ণমেন্ট খাসমহালে ফসল কাটিতে দেখিয়াছে। তাহার পর তাহারা যে

কোথায় গেল, সে জানে না।

ফসলের মেলা শেষ হইয়া গেল জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি, এমন সময় একদিন সদর কাছারির প্রাঙ্গণে নক্‌ছেদী ভকৎকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। নক্‌ছেদী আমার পা জড়াইয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আরও বিস্মিত হইয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম—কি ব্যাপার? তোমরা এবার ফসলের সময় আস নি কেন? মঞ্চী ভাল আছে তো? কোথায় সে?

উত্তরে নক্‌ছেদী যাহা বলিল তাহার মোট মর্ম এই, মঞ্চী কোথায় তাহা সে জানে না। খাসমহালে কাজ করিবার সময়েই মঞ্চী তাহাদের ফেলিয়া কোথায় পালাইয়া গিয়াছে। অনেক খোঁজ করিয়াও তাহার পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম বৃদ্ধ নক্‌ছেদী ভকতের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নাই, যা কিছু ভাবনা সবই সেই বন্য মেয়েটির জন্য। কোথায় সে গেল, কে তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গেল, কি অবস্থায় কোথায় বা সে আছে। সস্তা বিলাস-দ্রব্যের প্রতি তাহার যে রকম আসক্তি লক্ষ্য করিয়াছি, সে-সবের লোভ দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়াও কষ্টকর নয়। তাহাই ঘটিয়াছে নিশ্চয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তার ছেলে কোথায়?

—সে নেই। সে বসন্ত হয়ে মারা গিয়েছে মাঘ মাসে।

অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম শুনিয়া। বেচারী পুত্রশোকেই উদাসী হইয়া যেদিকে দু-চোখ যায়, চলিয়া গিয়াছে নিশ্চয়ই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—তুলসী কোথায়?

—সে এখানেই এসেছে। আমার সঙ্গেই আছে। আমায় কিছু জমি দিন হুজুর। নইলে আমরা বুড়োবুড়ী, ফসল কেটে আর চলে না। মঞ্চী ছিল, তার জোরে আমরা বেড়াতাম। সে আমার হাত-পা ভেঙে দিয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যার সময় নক্‌ছেদীর খুপরিতে গিয়া দেখিলাম তুলসী তাহার ছেলেমেয়ে লইয়া চীনার দানা ছাড়াইতেছে। আমায় দেখিয়া তুলসী কাঁদিয়া উঠিল। দেখিলাম মঞ্চী চলিয়া যাওয়াতে সেও যথেষ্ট দুঃখিত। বলিল—হুজুর, সব ঐ বুড়োর দোষ। গোরমিণ্টের লোক মাঠে সব টিকে দিতে এল, বুড়ো তাকে চার আনা পয়সা ঘুষ দিয়ে তাড়ালে। কাউকে টিকে নিতে দিলে না। বললে, টিকে নিলে বসন্ত হবে। হুজুর, তিন দিন গেল না, মঞ্চীর ছেলেটার বসন্ত হ'ল, মারাও গেল। তার শোকে সে পাগলের মত হয়ে গেল—খায় না, দায় না, শুধু কাঁদে।

—তার পর?

—তার পর হুজুর, খাসমহাল থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিলে। বললে—বসন্তে তোমাদের লোক মারা গিয়েছে, এখানে থাকতে দেবো না। এক ছোকরা রাজপুত মঞ্চীর দিকে নজর দিত। যেদিন আমরা খাসমহাল থেকে চলে এলাম, সেই রাত্রেই মঞ্চী নিরুদ্দেশ হ'ল। আমি সেদিন সকালে ঐ ছোকরাকে খুপরির কাছে ঘুরতে দেখেছি। ঠিক তার কাজ, হুজুর। ইদানীং মঞ্চী বড় কলকাতা দেখব, কলকাতা দেখব করত। তখনই জানি একটা কিছু ঘটবে।

আমারও মনে পড়িল মঞ্চী আর-বছর কলিকাতা দেখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিল বটে। আশ্চর্য নয়, ধূর্ত রাজপুত যুবক সরলা বন্য মেয়েটিকে কলিকাতা দেখাইবার

লোভ দেখাইয়া ভুলাইয়া লইয়া যাইবে।

আমি জানি এ অবস্থায় এদেশের মেয়েদের শেষ পরিণতি হয় আসামের চা-বাগানে কুলীগিরিতে। মঞ্চীর অদৃষ্টে কি শেষকালে নির্বান্ধব আসামের পার্বত্য অঞ্চলে দাসত্ব ও নির্বাসন লেখা আছে?

বৃদ্ধ নক্‌ছেদীর উপর খুব রাগ হইল। এই লোকটা যত নষ্টের মূল। বৃদ্ধ বয়সে মঞ্চীকে বিবাহ করিতে গিয়াছিল কেন? দ্বিতীয়, গভর্ণমেণ্টের টিকাদারকে ঘুষ দিয়া বিদায় করিয়াছিল কেন? যদি উহাকে জমি দিই, সে ওর জন্য নয়, উহার প্রৌঢ়া স্ত্রী তুলসী ও ছেলেমেয়েগুলির মুখের দিকে চাহিয়াই দিব।

দিলামও তাই। নাঢ়া-বইহারে শীঘ্র প্রজা বসাইতে হইবে, সদর আপিসের হুকুম আসিয়াছে, প্রথম প্রজা বসাইলাম নক্‌ছেদীকে।

নাঢ়া-বইহারে ঘোর জঙ্গল। মাত্র দু-চার ঘর প্রজা সামান্য সামান্য জঙ্গল কাটিয়া খুপরি বাঁধিতে শুরু করিয়াছে। নক্‌ছেদী প্রথমে জঙ্গল দেখিয়া পিছাইয়া গিয়াছিল, বলিল—হুজুর, দিনমানেই বাঘে খেয়ে ফেলে দেবে ওখানে—কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি।

তাহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিলাম, তার পছন্দ না হয়, সে অন্যত্র চেষ্টা দেখুক।

নিরুপায় হইয়া নক্‌ছেদী নাঢ়া-বইহারের জঙ্গলেই জমি লইল।

## ৩

সে এখানে আসা পর্যন্ত আমি কখনও তাহার খুপরিতে যাই নাই। তবে সেদিন সন্ধ্যার সময় নাঢ়া-বইহারের জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিতে দেখি ঘন জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা—নিকটে কাশের দুটি ছোট খুপরি। একটার ভিতর হইতে আলো বাহির হইতেছে।

সেইটাই যে নক্‌ছেদীর তা আমি জানিতাম না, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি খুপরির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিলাম সে তুলসী।

—তোমরা এখানে জমি নিয়েছ? নক্‌ছেদী কোথায়?

তুলসী আমায় দেখিয়া থতমত খাইয়া গিয়াছে। ব্যস্তসমস্ত হইয়া সে গমের ভূষি-ভরা একটা চটের গদি পাতিয়া দিয়া বলিল—নামুন বাবুজী—বসুন একটু। ও গিয়েছে লবটুলিয়া, তেল নুন কিনে আনতে দোকানে। বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে।

—তুমি একা এই ঘন-বনের মধ্যে আছ?

—ও-সব সয়ে গিয়েছে, বাবুজী। ভয়ডর করলে কি আমাদের গরীবদের চলে? একা তো থাকতে হ'ত না—কিন্তু অদৃষ্ট যে খারাপ। মঞ্চী যত দিন ছিল, জলেজঙ্গলে কোথাও ভয় ছিল না। কি সাহস, কি তেজ ছিল তার, বাবুজী!

তুলসী তাহার তরুণী সপত্নীকে ভালবাসিত। তুলসী ইহাও জানে এই বাঙালী বাবু মঞ্চীর কথা শুনিতে পাইলে খুশি হইবে।

তুলসীর মেয়ে সুরতিয়া বলিল—বাবুজী, একটা নীলগাইয়ের বাচ্চা ধরে রেখেছি, দেখবেন? সেদিন আমাদের খুপরির পেছনের জঙ্গলে এসে বিকেলবেলা খস্‌খস্‌ করছিল—আমি আর ছনিয়া গিয়ে ধরে ফেলেছি। বড় ভাল বাচ্চা।

বলিলাম—কি খায় রে?

সুরতিয়া বলিল—শুধু চীনার দানার ভূষি আর গাছের কচি পাতা। আমি কচি

কেঁদ পাতা তুলে এনে দিই।

তুলসী বলিল—দেখা না বাবুজীকে—

সুরতিয়া ক্ষিপ্রপদে হরিণীর মত ছুটিয়া খুপরির পিছনদিকে অদৃশ্য হইল। একটু পরে তাহার বালিকা-কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল—আরে নীলগাইয়া তো ভাগলুয়া হৈ রে ছনিয়া—উধার—ইধার—জল্‌দি পাক্‌ড়া—

দুই বোনে হুটোপুটি করিয়া নীলগাইয়ের বাচ্চা পাক্‌ড়াও করিয়া ফেলিল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাসিমুখে আমার সামনে আনিয়া হাজির করিল।

অন্ধকারে আমার দেখিবার সুবিধার জন্য তুলসী একখানা জ্বলন্ত কাঠ উঁচু করিয়া ধরিল। সুরতিয়া বলিল—কেমন, ভাল না বাবুজী? একে খাবার জন্যে কাল রাত্রে ভালুক এসেছিল। ওই মহুয়া গাছে কাল ভালুক উঠেছিল মহুয়া ফুল খেতে—তখন অনেক রাত—বাপ মা ঘুমোয়, আমি সব টের পাই—তারপর গাছ থেকে নেমে আমাদের খুপরির পেছনে এসে দাঁড়াল। আমি একা বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে শুই রাতে—ভালুকের পায়ের শব্দ পেয়ে ওর মুখ হাত দিয়ে জোর করে চেপে আরও জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলুম—

—ভয় করল না তোর, সুরতিয়া?

—ইস্‌! ভয় বই কি! ভয় আমি করি নে। কাঠ কুড়ুতে গিয়ে জঙ্গলে কত ভালুক-ঝোড় দেখি—তাতেও ভয় করি নে। ভয় করলে চলে বাবুজী?

সুরতিয়া বিজ্ঞের মত মুখখানা করিল।

বড় বড় কলের চিমনির মত লম্বা, কালো কেঁদ গাছের গুঁড়ি ঠেলিয়া আকাশে উঠিয়াছে খুপরির চারিধারে, যেন কালিফোর্ণিয়া রেডউড গাছের জঙ্গল। বাদুড় ও নিশাচর কাঁক পাখীর ডানা-ঝটাপটি ডালে ডালে, ঝোপে ঝোপে অন্ধকারে জোনাকির ঝাঁক জ্বলিতেছে, খুপরির পিছনের বনেই শিয়াল ডাকিতেছে—এই কয়টি ছোট ছেলে-মেয়ে লইয়া উহাদের মা যে কেমন করিয়া এই নির্জন বনে-প্রান্তরে থাকে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। হে বিজ্ঞ, রহস্যময় অরণ্য, আশ্রিতজনের প্রতি তোমার সত্যই বড় কৃপা।

কথায় কথায় বলিলাম—মঞ্চী নিজের জিনিস সব নিয়ে গিয়েছে?

সুরতিয়া বলিল—ছোটমা কোনো জিনিস নিয়ে যায় নি। ওর যে বাক্সটা সেবার দেখেছিলেন—ফেলেই রেখে গিয়েছে। দেখবেন? আনছি।

বাক্সটা আনিয়া সে আমার সামনে খুলিল। চিরুনি, ছোট আয়না, পুঁতির মালা, একখানা সবুজ-রঙের খেলো রুমাল—ঠিক যেন ছোট খুকির পুতুল-খেলার বাক্স! সেই হিংলাজের মালাছড়াটা কিন্তু নাই, সেবার লবটুলিয়া খামারের মেলায় সেই যেটা কিনিয়াছিল।

কোথায় চলিয়া গেল নিজের ঘর-সংসার ছাড়িয়া কে বলিবে? ইহারা তো জমি লইয়া এতদিন পরে গৃহস্থালি পাতাইয়া বসবাস শুরু করিয়াছে, ইহাদের দলের মধ্যে সে-ই কেবল যে ভবঘুরে সেই ভবঘুরেই রহিয়া গেল!

ঘোড়ায় উঠিবার সময় সুরতিয়া বলিল—আর এক দিন আসবেন বাবুজী—আমরা পাখী ধরি ফাঁদ পেতে। নূতন ফাঁদ বুনেছি। একটা ডাহুক আর একটা গুড়গুড়ি পাখী পুষেছি। এরা ডাকলে বনের পাখী এসে ফাঁদে পড়ে—আজ আর বেলা নেই—নইলে ধরে দেখাতাম—

নাঢ়া-বইহারের বন-প্রান্তরের পথে এত রাত্রে আসিতে ভয়-ভয় করে। বাঁয়ে ছোট একটি পাহাড়ী ঝরনার জলস্রোত কুলকুল করিয়া বহিতেছে, কোথায় কি বনের ফুল ফুটিয়াছে, গন্ধে ভরা অন্ধকার এক-এক জায়গায় এত নিবিড় যে ঘোড়ার ঘাড়ের লোম দেখা যায় না, আবার কোথাও নক্ষত্রালোকে পাতলা!

নাঢ়া-বইহার নানাপ্রকার বৃক্ষলতা, বন্যজন্তু ও পাখীদের আশ্রয়স্থান—প্রকৃতি ইহার বনভূমি ও প্রান্তরকে অজস্র সম্পদে সাজাইয়াছে, সরস্বতী কুন্ডী এই নাঢ়া-বইহারেরই উত্তর সীমানায়। প্রাচীন জরিপের থাক-নক্সায় দেখা যায় সেখানে কুশীনদীর প্রাচীন খাত ছিল—এখন মজিয়া মাত্র ঐ জলটুকু অবশিষ্ট আছে—অন্য দিকে সেই প্রাচীন খাতই ঘন অরণ্যে পরিণত—

পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্—

কি অবর্ণনীয় শোভা দেখিলাম এই বনভূমির সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে! কিন্তু মন খারাপ হইয়া গেল যখন বেশ বুঝিলাম নাঢ়া-বইহারের এ বন আর বেশী দিন নয়। এত ভালবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল। দু-বৎসরের মধ্যেই সমগ্র মহালটি প্রজাবিলি হইয়া কুশ্রী টোলা ও নোংরা বস্তিতে ছাইয়া ফেলিল বলিয়া। প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল এই নাঢ়া-বইহার, ইহার অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য ও দূরবিসর্পী প্রান্তর লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অথচ কি পাওয়া যাইবে তাহার বদলে?

কতকগুলি খোলার চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই জনারের ক্ষেত, শনের গাদা, দড়ির চারপাই, হনুমানজীর ধ্বজা, ফণিমনসার গাছ, যথেষ্ট দোক্তা, যথেষ্ট খৈনী, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক।

হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।

আর একদিন গেলাম সুরতিয়াদের পাখী-ধরা দেখিতে।

সুরতিয়া ও ছনিয়া দুটি খাঁচা লইয়া আমার সঙ্গে নাঢ়া-বইহারের জঙ্গলের বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের দিকে চলিল।

বৈকাল বেলা, নাঢ়া-বইহারের মাঠে সুদীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া সূর্য পাহাড়ের আড়ালে নামিয়া পড়িয়াছে।

একটা শিমুলচারার তলায় ঘাসের উপর খাঁচা দুটি নামাইল। একটিতে একটি বড় ডাহুক, অন্যটিতে গুড়গুড়ি। এ দুটি শিক্ষিত পাখী, বন্য পাখীকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ডাহুকটি অমনি ডাকিতে আরম্ভ করিল।

গুড়গুড়িটা প্রথমতঃ ডাকে নাই।

সুরতিয়া শিস্ দিয়া তুড়ি দিয়া বলিল—বোলো রে বহিনিয়া—তোহর কির—

গুড়গুড়ি অমনি ডাকিয়া উঠিল—গুড়-ড়-ড়-ড়—

নিস্তব্ধ অপরাহ্নে বিস্তীর্ণ মাঠের নির্জনতার মধ্যে সে অদ্ভুত সুর শুধুই মনে আনিয়া দেয় এমনি দিগন্তবিস্তীর্ণতার ছবি, এমনি মুক্ত দিক্‌চক্রবালের স্বপ্ন, ছায়াহীন জ্যোৎস্নালোক। নিকটেই ঘাসের মধ্যে যেখানে রাশি রাশি হলুদ রঙের দুধলি ফুল ফুটিয়াছে, তারই উপর ছনিয়া ফাঁদ পাতিল—যেন পাখীর খাঁচার বেড়ার মত, বাঁশের তৈরী। সেই বেড়া ক'খানা দিয়া গুড়গুড়ি পাখীর খাঁচাটা ঢাকিয়া রাখিয়া দিল।

সুরতিয়া বলিল—চলুন বাবুজী, লুকিয়ে বসি গে ঝোপের আড়ালে। মানুষ দেখলে চিড়িয়া ভাগবে।—সবাই মিলিয়া আমরা শাল-চারার আড়ালে কতক্ষণ ঘাপটি মারিয়া বসিয়া রহিলাম।

ডাহুকটি মাঝে মাঝে থামিতেছে—গুড়গুড়ির কিন্তু রবের বিরাম নাই—একটানা ডাকিয়াই চলিয়াছে—গুড়ূ-ড়ূ-ড়ূ-ড়ূ—

সে কি মধুর অপার্থিব রব! বলিলাম—সুরতিয়া, তোদের গুড়গুড়িটা বিক্রী করবি? কত দাম?

সুরতিয়া বলিল—চুপ চুপ বাবুজী, কথা বলবেন না—ঐ শুনুন, বুনো পাখী আসছে—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পরে অন্য একটি সুর মাঠের উত্তর দিকে বনপ্রান্তর হইতে ভাসিয়া আসিল—গুড়ূ-ড়ূ-ড়ূ-ড়ূ।

আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। বনের পাখী খাঁচার পাখীর সুরে সাড়া দিয়াছে!

ক্রমে সে-সুর খাঁচার নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইটি পাখীর রব পাশাপাশি শোনা যাইতেছিল, ক্রমে দুইটি সুর যেন মিশিয়া এক হইয়া গেল—হঠাৎ আবার একটা সুর—একটা পাখীই ডাকিতেছে—খাঁচার পাখীটা।

ছনিয়া ও সুরতিয়া ছুটিয়া গেল, ফাঁদে পাখী পড়িয়াছে। আমিও ছুটিয়া গেলাম।

ফাঁদে পা বাধাইয়া পাখীটা ঝট্‌পট্‌ করিতেছে। ফাঁদে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাক বন্ধ হইয়া গিয়াছে—কি আশ্চর্য কাণ্ড! চোখকে যেন বিশ্বাস করা শক্ত।

সুরতিয়া পাখীটা হাতে তুলিয়া দেখাইল—দেখুন বাবুজী, কেমন ফাঁদে পা আটকেছে। দেখলেন?

সুরতিয়াকে বলিলাম—পাখী তোরা কি করিস?

সে বলিল—বাবা তিরাশি-রতনগঞ্জের হাটে বিক্রী করে আসে। এক একটা গুড়গুড়ি দু'পয়সা—একটা ডাহুক সাত পয়সা।

বলিলাম—আমাকে বিক্রী কর, দাম দেব।

সুরতিয়া গুড়গুড়িটা আমায় এমনিই দিয়া দিল—কিছুতেই তাহাকে পয়সা লওয়াইতে পারিলাম না।

৪

আশ্বিন মাস। এই সময় একদিন সকালে পত্র পাইলাম রাজা দোবরু পান্না মারা গিয়াছেন, এবং রাজপরিবার খুব বিপন্ন—আমি সময় পাইলে যেন যাই। পত্র দিয়াছে জগরু পান্না, ভানুমতীর দাদা।

তখনি রওনা হইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে চকমকিটোলা পৌঁছিয়া গেলাম। রাজার বড় ছেলে ও নাতি আমাকে আগাইয়া লইয়া গেল। শুনিলাম, রাজা দোবরু গরু চরাইতে চরাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া হাঁটুতে আঘাতপ্রাপ্ত হন, শেষ পর্যন্ত হাঁটুর সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যুর কারণ ঘটে।

রাজার মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া মাত্র মহাজন আসিয়া গরু-মহিষ বাঁধিয়া রাখিয়াছে।

টাকা না পাইলে সে গরু-মহিষ ছাড়িবে না। এদিকে বিপদের উপর বিপদ, নূতন রাজার অভিষেক-উৎসব আগামী কল্য সম্পন্ন হইবে। তাহাতেও কিছু খরচ আছে। কিন্তু সে-টাকা কোথায়? তা ছাড়া গরু-মহিষ মহাজনে যদি লইয়া যায়, তবে রাজপরিবারের অবস্থা খুবই হীন হইয়া পড়িবে—ঐ দুধের ঘি বিক্রয় করিয়া রাজার সংসারের অর্ধেক খরচ চলিত—এখন তাহাদের না খাইয়া মরিতে হইবে।

শুনিয়া আমি মহাজনকে ডাকাইলাম। তার নাম বীরবল সিং। আমার কোনো কথাই সে দেখিলাম শুনিতে প্রস্তুত নয়। টাকা না পাইলে কিছুতেই সে গরু-মহিষ ছাড়িবে না। লোকটা ভাল নয় দেখিলাম।

ভানুমতী আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে তাহার জ্যাঠামশায় অর্থাৎ প্রপিতামহকে বড়ই ভালবাসিত—জ্যাঠামশায় থাকিতে তাহারা যেন পাহাড়ের আড়ালে ছিল, যেমনি তিনি চোখ বুজিয়াছেন, আর অমনি এই সব গোলমাল। এই সব কথা বলিতে বলিতে ভানুমতীর চোখের জল কিছুতেই থামে না। বলিল—চলুন বাবুজী, আমার সঙ্গে—জ্যাঠামশায়ের গোর আপনাকে দেখিয়ে আনি পাহাড়ের উপর থেকে। আমার কিছু ভাল লাগছে না বাবুজী, কেবল ইচ্ছে হচ্ছে ওঁর কবরের কাছে বসে থাকি।

বলিলাম—দাঁড়াও, মহাজনের একটা কি ব্যবস্থা করা যায় দেখি। তারপর যাব—কিন্তু মহাজনের কোনো ব্যবস্থা করা আপাততঃ সম্ভব হইল না। দুর্দান্ত রাজপুত মহাজন কারও অনুরোধ উপরোধ শুনিবার পাত্র নয়। তবে সামান্য একটু খাতির করিয়া আপাততঃ গরু-মহিষগুলি এখানেই বাঁধিয়া রাখিতে সম্মত হইল মাত্র, তবে দুধ এক ফোঁটাও লইতে দিবে না। মাস দুই পরে এ দেনা শোধার উপায় হইয়াছিল—সেকথা এখন নয়।

ভানুমতী দেখি একা ওদের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া। বলিল—বিকেল হয়ে গিয়েছে, এর পর যাওয়া যাবে না, চলুন কবর দেখতে।

ভানুমতী একা যে আমার সঙ্গে পাহাড়ে চলিল ইহাতে বুঝিলাম সরলা পর্বতবালা এখন আমাকে তাহার পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরমাত্মীয় মনে করে। এই পাহাড়ী বালিকার সরল ব্যবহার ও বন্ধুত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

বৈকালের ছায়া নামিয়াছে সেই বড় উপত্যকাটায়।

ভানুমতী বড় তড়বড় করিয়া চলে, ত্রস্তা হরিণীর মত। বলিলাম—শোন ভানুমতী, একটু আস্তে চল, এখানে শিউলিফুলের গাছ কোথায় আছে?

ভানুমতীদের দেশে শিউলিফুলের নাম সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিকমত তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। পাহাড়ের উপরে উঠিতে উঠিতে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল। নীল ধনুঝরি শৈলমালা ভানুমতীদের দেশকে, রাজ্যহীন রাজা দোবরু পান্নার রাজ্যকে মেখলা-কারে ঘেরিয়া আছে, বহুদূর হইতে হু হু খোলা হাওয়া বহিয়া আসিতেছে।

ভানুমতী চলিতে চলিতে থামিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—বাবুজী, উঠতে কষ্ট হচ্ছে?

—কিছু না। একটু আস্তে চল কেবল—কষ্ট কি?

আর খানিকটা চলিয়া সে বলিল—জ্যাঠামশায় চলে গেল, সংসারে আমার আর কেউ রইল না, বাবুজী—

ভানুমতী ছেলেমানুষের মত কাঁদ-কাঁদ হইয়া কথাটা বলিল।

উহার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। বৃদ্ধ প্রপিতামহই না হয় মারা গিয়াছে, মাও নাই, নতুবা উহার বাবা, ভাই, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা সবাই বাঁচিয়া, চারিদিকে জাজ্বল্যমান সংসার। হাজার হোক ভানুমতী স্ত্রীলোক এবং বালিকা, পুরুষের একটু সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার ও মেয়েলী আদরকাড়ানোর প্রবৃত্তি তার পক্ষে স্বাভাবিক।

ভানুমতী বলিল—আপনি মাঝে মাঝে আসবেন বাবুজী, আমাদের দেখাশুনো করবেন—ভুলে যাবেন না বলুন—

নারী সব জায়গায় সব অবস্থাতেই সমান। বন্য বালিকা ভানুমতীও সেই একই ধাতুতে গড়া।

বলিলাম—কেন ভুলে যাব? মাঝে মাঝে আসব নিশ্চয়ই—

ভানুমতী কেমন একরকম অভিমানের সুরে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—হাঁ, বাংলা দেশে গেলে, কলকাতা শহরে গেলে আপনার আবার মনে থাকবে এ পাহাড় জংলী দেশের কথা —একটু থামিয়া বলিল—আমাদের কথা—আমার কথা—

স্নেহের সুরে বলিলাম—কেন, মনে ছিল না ভানুমতী? আয়নাখানা পাও নি? মনে ছিল কি ছিল না ভাব—

ভানুমতী উজ্জ্বল মুখে বলিল—উঃ বাবুজী, বড় চমৎকার আয়না—সত্যি, সে-কথা আপনাকে জানাতে ভুলেই গিয়েছি।

সমাধি-স্থানের সেই বটগাছের তলায় যখন গিয়া দাঁড়াইলাম, তখন বেলা নাই বলিলেও হয়, দূর পাহাড়শ্রেণীর আড়ালে সূর্য লাল হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছে, কখন ক্ষীণাঙ্গ চাঁদ উঠিয়া বটতলায় অপরাহ্নের এই ঘন ছায়া ও সম্মুখবর্তী প্রদোষের গভীর অন্ধকার দূর করিবে, স্থানটি যেন তাহারই স্তব্ধ প্রতীক্ষায় নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

ভানুমতীকে কিছু বনের ফুল কুড়াইয়া আনিতে বলিলাম, উহার ঠাকুরদাদার কবরের পাথরে ছড়াইবার জন্য। সমাধির উপর ফুল-ছড়ানো-প্রথা এদের দেশে জানা নাই. আমার উৎসাহে সে নিকটের একটা বুনো শিউলি গাছের তলা হইতে কিছু ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহার পর ভানুমতী ও আমি দুজনেই ফুল ছড়াইয়া দিলাম রাজা দোবরু পান্নার সমাধির উপরে।

ঠিক সেই সময় ডানা ঝট্‌পট্‌ করিয়া একদল সিল্লি ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল বটগাছটার মগডাল হইতে—যেন ভানুমতী ও রাজা দোবরুর সমস্ত অবহেলিত অত্যাচারিত, প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ আমার কাজে তৃপ্তিলাভ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—সাধু! সাধু! কারণ আর্য-জাতির বংশধরের এই বোধ হয় প্রথম সম্মান অনার্য রাজ-সমাধির উদ্দেশে।

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

### ১

ধাওতাল সাহু মহাজনের কাছে আমাকে একবার হাত পাতিতে হইল। আদায় সেবার হইল কম, অথচ দশ হাজার টাকা রেভিনিউ দাখিল করিতেই হইবে। তহশীলদার বনোয়ারীলাল পরামর্শ দিল, বাকী টাকাটা ধাওতাল সাহুর কাছে কর্জ করুন। আপনাকে

সে নিশ্চয়ই দিতে আপত্তি করিবে না। ধাওতাল সাহু আমার মহালের প্রজা নয়, সে থাকে গভর্ণমেণ্টের খাসমহালে। আমাদের সঙ্গে তার কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা নাই, এ অবস্থায় সে যে এক কথায় আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে হাজার-তিনেক টাকা ধার দিবে, এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

কিন্তু গরজ বড় বালাই। একদিন বনোয়ারীলালকে সঙ্গে লইয়া গোপনে গেলাম ধাওতাল সাহুর বাড়ী, কারণ কাছারির অপর কাহাকেও জানিতে দিতে চাহি না যে, টাকা কর্জ্জ করিয়া দিতে হইতেছে।

ধাওতাল সাহুর বাড়ী পওসদিয়ার একটা ঘিঞ্জি টোলার মধ্যে। বড় একখানা খোলার চালার সামনে খানকতক দড়ির চারপাই পাতা। ধাওতাল সাহু উঠানের এক পাশের তামাকের ক্ষেত নিড়ানি দিয়া পরিষ্কার করিতেছিল—আমাদের দেখিয়া শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিল, কোথায় বসাইবে, কি করিবে ভাবিয়া পায় না, খানিকক্ষণের জন্যে যেন দিশাহারা হইয়া গেল।

—এ কি! হুজুর এসেচেন গরীবের বাড়ী, আসুন, আসুন। বসুন হুজুর। আসুন তহশীলদার সাহেব।

ধাওতাল সাহুর বাড়ীতে চাকরবাকর দেখিলাম না। তাহার একজন হৃষ্টপুষ্ট নাতি, নাম রামলখিয়া, সে-ই আমাদের জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বাড়ীঘর আসবাবপত্র দেখিয়া কে বলিবে ইহা লক্ষপতি মহাজনের বাড়ী।

রামলখিয়া আমার ঘোড়ার পিঠ হইতে জিন খুরপাচ খুলিয়া ঘোড়াকে ছায়ায় বাঁধিল। আমাদের জন্য পা ধুইবার জল আনিল। ধাওতাল সাহু নিজেই একখানা তালের পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সাহুজীর এক নাতনী তামাক সাজিতে ছুটিল। উহাদেব যত্নে বড়ই বিব্রত হইয়া উঠিলাম। বলিলাম—ব্যস্ত হবার দরকার নেই সাহুজী, তামাক আনতে হবে না, আমার কাছে চুরুট আছে।

যত আদর-আপ্যায়নই করুক, আসল ব্যাপার সম্বন্ধে কথা পাড়িতে একটু সমীহ হইতেছিল, কি করিয়া কথাটা পাড়ি?

ধাওতাল সাহু বলিল—ম্যানেজার সাহেব কি এদিকে পাখী মারতে এসেছিলেন?

—না, তোমার কাছেই এসেছিলাম সাহুজী।

—আমার কাছে হুজুর? কি দরকার বলুন তো?

—আমাদের কাছারির সদর খাজনার টাকা কম পড়ে গিয়েছে, সাড়ে তিন হাজার টাকার বড় দরকার, তোমার কাছে সেজন্যেই এসেছিলাম।

মরীয়া হইয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিলাম, বলিতেই যখন হইবে।

ধাওতাল সাহু কিছুমাত্র না ভাবিয়া বলিল—তার জন্যে আর ভাবনা কি হুজুর? সে হয়ে যাবে এখন, তবে তার জন্যে কষ্ট করে আপনার আসবার দরকার কি ছিল? একখানা চিরকুট লিখে তহশীলদার সাহেবের হাতে পাঠিয়ে দিলেই আপনার হুকুম তামিল হ'ত।

মনে ভাবিলাম এখন আসল কথাটা বলিতে হইবে। টাকা আমি ব্যক্তিগত ভাবে লইব, কারণ জমিদারের নামে টাকা কর্জ্জ করিবার আমমোক্তারনামা আমার নাই। একথা শুনিলেও ধাওতাল কি আমায় টাকা দিবে? বিদেশী লোক আমি। আমার কি সম্পত্তি আছে এখানে যে এতগুলি টাকা বিনা বন্ধকে আমায় দিবে? কথাটা একটু সমীহের উপরই বলিলাম।

—সাহ্‌জী, লেখাপড়াটা কিন্তু আমার নামেই করতে হবে। জমিদারের নামে হবে না।

ধাওতাল সাহ্‌ আশ্চর্য হইবার সুরে বলিল—লেখাপড়া কিসের? আপনি আমার 'ড়ী ব'য়ে এসেছেন সামান্য টাকার অভাব পড়েছে, তাই নিতে। এ তো আসবার গরই ছিল না, হুকুম ক'রে পাঠালেই টাকা দিতাম। তার পর যখন এসেছেনই—খন লেখাপড়া কিসের? আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যান, যখন কাছারিতে আদায় হবে, আমায় পাঠিয়ে দিলেই হবে।

বলিলাম—আমি হ্যান্ডনোট দিচ্ছি, টিকিট সঙ্গে ক'রে এনেছি। কিংবা তোমার পাকা খাতা বার কর, সই করে দিয়ে যাই।

ধাওতাল সাহ্‌ হাত জোড় করিয়া বলিল—মাপ করুন হুজুর। ও কথাই তুলবেন না। মনে বড় কষ্ট পাব। কোনো লেখাপড়ার দরকার নেই, টাকা আপনি নিয়ে যান।

আমার পীড়াপীড়িতে ধাওতাল কর্ণপাতও করিল না। ভিতর হইতে আমায় নোটের তাড়া গুনিয়া আনিয়া দিয়া বলিল—হুজুর, একটা কিন্তু অনুরোধ আছে।

—কি?

—এ-বেলা যাওয়া হবে না। সিধা বা'র করে দিই, রান্নাখাওয়া ক'রে তবে যেতে পাবেন।

পুনরায় আপত্তি করিলাম, তাহাও টিঁকিল না। তহশীলদারকে বলিলাম—বনোয়ারী-লাল, রাঁধতে পারবে তো? আমার দ্বারা সুবিধে হবে না।

বনোয়ারী বলিল—তা চলবে না, হুজুর, আপনাকে রাঁধতে হবে। আমার রান্না খেলে এ পাড়াগাঁয়ে আপনার দুর্নাম হবে। আমি দেখিয়ে দেব এখন।

বিরাট এক সিধা বাহির করিয়া দিল ধাওতাল সাহুর নাতি। রন্ধনের সময় নাতি-ঠাকুরদা মিলিয়া নানা রকম উপদেশ-পরামর্শ দিতে লাগিল রন্ধন সম্বন্ধে।

ঠাকুরদাদার অনুপস্থিতিতে নাতি বলিল—বাবুজী, ঐ দেখছেন আমার ঠাকুরদাদা, ওঁর জন্যে সব যাবে। এত লোককে টাকা ধার দিয়েছেন বিনা সুদে, বিনা বন্ধকে, বিনা তমসুকে—এখন আর টাকা আদায় হতে চায় না। সকলকে বিশ্বাস করেন, অথচ লোকে কত ফাঁকিই দিয়েছে। লোকের বাড়ী ব'য়ে টাকা ধার দিয়ে আসেন।

গ্রামের আর একজন লোক বসিয়াছিল, সে বলিল—বিপদে আপদে সাহুজীর কাছে হাত পাতলে ফিরে যেতে কখনো কাউকে দেখি নি বাবুজী। সেকেলে ধরনের লোক, এতবড় মহাজন, কখনো আদালতে মোকদ্দমা করেন নি। আদালতে যেতে ভয় পান। বেজায় ভীতু আর ভালমানুষ।

সেদিন যে-টাকা ধাওতাল সাহুর নিকট হইতে আনিয়াছিলাম, তাহা শোধ দিতে প্রায় ছ'মাস দেরি হইয়া গেল—এই ছ'মাসের মধ্যে ধাওতাল সাহ্‌ আমাদের ইসমাইলপুর মহালের ত্রিসীমানা দিয়া হাঁটে নাই, পাছে আমি মনে করি যে সে টাকার তাগাদা করিতে আসিয়াছে। ভদ্রলোক আর কাহাকে বলে!

## ২

প্রায় বছর-খানেক রাখালবাবুদের বাড়ী যাওয়া হয় নাই, ফসলের মেলার পরে একদিন সেখানে গেলাম। রাখালবাবুর স্ত্রী আমায় দেখিয়া খুব খুশি হইলেন। বলিলেন—আপনি আর আসেন না কেন দাদা, কোনো খোঁজখবর নেন না—এই নির্বান্ধব জায়গায়

বাঙালীর মুখ দেখা যে কি—আর আমাদের এই অবস্থায়—

বলিয়া দিদি নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। বাড়ীঘরের অবস্থা আগের মতই হীন, তবে এবার ততটা যেন বিশৃঙ্খল নয়। রাখালবাবুর বড় ছেলেটি বাড়ীতেই টিনের মিস্ত্রীর কাজ করে—সামান্যই উপার্জন—তবু যা হয় সংসার একরকম চলিতেছে।

রাখালবাবুর স্ত্রীকে বলিলাম—ছোট ছেলেটিকে অন্তত ওর মামার কাছে কাশীতে রেখে একটু লেখাপড়া শেখান।

তিনি বলিলেন—আপন মামা কোথায় দাদা? দু-তিনখানা চিঠি লেখা হয়েছিল এত বড় বিপদের খবর দিয়ে—দশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে সেই যে চুপ করল—আর এই দেড় বছর সাড়াশব্দ নেই। তার চেয়ে দাদা, ওরা মকাই কাটবে, জনার কাটবে, মহিষ চরাবে—তবুও তেমন' মামার দোরে যাবে না।

আমি তখনই ঘোড়ায় ফিরিব—দিদি কিছুতেই আসিতে দিলেন না। সে-বেলা থাকিতে হইবে। তিনি কি-একটা খাবার করিয়া আমায় না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না।

অগত্যা অপেক্ষা করিতে হইল। মকাইয়ের ছাতুর সহিত ঘি ও চিনি মিশাইয়া এক রকমের লাড্ডু বাঁধিয়া ও কিছু হালুয়া তৈরী করিয়া দিদি খাইতে দিলেন। দরিদ্র সংসারে যতটা আদর-অভ্যর্থনা করা যাইতে পারে, তাহার ত্রুটি করিলেন না।

বলিলেন—দাদা, ভাদ্র মাসের মকাই রেখেছিলাম আপনার জন্যে তুলে। আপনি ভুট্টা-পোড়া খেতে ভালবাসেন, তাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—মকাই কোথায় পেলেন? কিনেছিলেন?

—না। ক্ষেতে কুড়ুতে যাই, ফসল কেটে নিয়ে গেলে যে-সব ভাঙা, ঝরা ভুট্টা চাষারা ক্ষেতে রেখে যায়—গাঁয়ের মেয়েরাও যায়, আমিও যাই ওদের সঙ্গে—এক ঝুড়ি ক'রে রোজ কুড়োতাম।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—ক্ষেতে কুড়ুতে যেতেন?

—হ্যাঁ রাত্রে যেতাম, কেউ টের পেত না। গাঁয়ের কত মেয়েরা তো যায়। তাদের সঙ্গে এই ভাদ্র মাসে কম্‌সে-কম দশ টুক্‌রি ভুট্টা কুড়িয়ে এনেছিলাম।

মনে বড় দুঃখ হইল। এ কাজ গরীব গাঙ্গোতার মেয়েরা করিয়া থাকে--এদেশের ছত্রি বা রাজপুত মেয়েরা গরীব হইলেও ক্ষেতের ফসল কুড়াইতে যায় না। আর একজন বাঙ্গালীর মেয়েকে এ-কাজ করিতে শুনিলে মনে বড়ই লাগে। এই অশিক্ষিত গাঙ্গোতাদের গ্রামে বাস করিয়া দিদি এ-সব হীনবৃত্তি শিখিয়াছেন—সংসারের দারিদ্র্যও যে তাহার একটা প্রধান কারণ সে-বিষয়ে ভুল নাই। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না, পাছে মনে কষ্ট দেওয়া হয়। এই নিঃস্ব বাঙালী পরিবার বাংলার কোনো শিক্ষা-সংস্কৃতি পাইল না, বছর কয়েক পরে চাষী গাঙ্গোতায় পরিণত হইবে, ভাষায়, চাল-চলনে, হাবভাবে। এখন হইতেই সে-পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

রেলস্টেশন হইতে বহু-দূরে অজ পল্লীগ্রামে আমি আরও দু-একটি এরকম বাঙালী-পরিবার দেখিয়াছি। এই সব পরিবারে মেয়ের বিবাহ দেওয়া যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার! এমনি আর একটি বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবার জানিতাম—দক্ষিণ-বিহারে এক অজ গ্রামে তাঁরা থাকিতেন। অবস্থা নিতান্তই হীন, বাড়ীতে তাঁদের তিনটি মেয়ে ছিল, বড়টির বয়স একুশ-বাইশ বছর, মেজটির কুড়ি, ছোটটিও সতের। ইহাদের বিবাহ হয় নাই, হইবার

কোনো উপায়ও নাই—স্বঘর জোটানো, বাঙালী পাত্রের সন্ধান পাওয়া এ-সব অঞ্চলে অত্যন্তই কঠিন।

বাইশ বছরের বড় মেয়েটি দেখিতেও সুশ্রী—এক বর্ণও বাংলা জানে না—আকৃতি-প্রকৃতিতে খাঁটি দেহাতী বিহারী মেয়ে—মাঠ হইতে মাথায় মোট করিয়া কলাই আনে, গমের ভূষি আনে।

এই মেয়েটির নাম ছিল ধ্রুবা। পুরাদস্তুর বিহারী নাম।

তাহার বাবা প্রথমে এই গ্রামে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করিতে আসিয়া জমিজমা লইয়া চাষবাসের কাজও আরম্ভ করেন। তারপর তিনি মারা যান, বড় ছেলে একেবারে হিন্দুস্থানী—চাষবাস দেখাশুনা করিত, বয়স্থা ভগ্নীদের বিবাহের যোগাড় সে চেষ্টা করিয়াও করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ পণ দিবার ক্ষমতা তাদের আদৌ ছিল না জানি।

ধ্রুবা ছিল একেবারে কপালকুণ্ডলা। আমাকে ভাইয়া অর্থাৎ দাদা বলিয়া ডাকিত। গায়ে অসীম শক্তি, গম পিষিতে, উদুখলে ছাতু কুটিতে, মোট বহিয়া আনিতে, গরু-মহিষ চরাইতে চমৎকার মেয়ে, সংসারের কাজকর্মে ঘুণ। তাহার দাদা এ প্রস্তাবও করিয়াছিলেন যে, এমন যদি কোনো পাত্র পান, তিনটি মেয়েকেই এক পাত্রে সম্প্রদান করিবেন। মেয়ে তিনটিরও নাকি অমত ছিল না।

মেজ মেয়ে জবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—বাংলা দেখতে ইচ্ছে হয়?

জবা বলিয়াছিল—নেই ভেইয়া, উহাকো পানি বড্ড নরম ছে—

শুনিয়াছিলাম বিবাহ করিতে ধ্রুবারও খুব আগ্রহ। সে নিজে নাকি কাহাকে বলিয়াছিল, তাহাকে যে বিবাহ করিবে, তাহার বাড়ীতে গরুর দোহাল বা উদুখলওয়ালী ডাকিতে হইবে না—সে একাই ঘণ্টায় পাঁচ সের গম কুটিয়া ছাতু করিতে পারে।

হায় হতভাগিনী বাঙালী কুমারী! এত বৎসর পরেও সে নিশ্চয় আজও গাঙ্গোতীন সাজিয়া দাদার সংসারে যব কুটিতেছে, কলাইয়ের বোঝা মাথায় করিয়া মাঠ হইতে আনিতেছে, কে আর দরিদ্রা দেহাতী বয়স্কা মেয়েকে বিনাপণে বিবাহ করিয়া পাল্কিতে তুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে, মঙ্গলশঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে!

শান্ত মুক্ত প্রান্তরে যখন সন্ধ্যা নামে, দূরে পাহাড়ের গা বাহিয়া যে সরু পথটি দেখা যায় ঘনবনের মধ্যে চেরা সিঁথির মত, ব্যর্থযৌবনা, দরিদ্রা ধ্রুবা হয়তো আজও এত বছরের পরে সেই পথ দিয়া শুকনো কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া পাহাড় হইতে নামে—এ ছবি কতবার কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তেমনি প্রত্যক্ষ করিয়াছি আমার দিদি, রাখালবাবুর স্ত্রী, হয়তো আজও বৃদ্ধা গাঙ্গোতীনদের মত গভীর রাত্রে চোরের মত লুকাইয়া ক্ষেতে খামারে শুকনো তলায়-ঝরা ভুট্টা ঝুড়ি করিয়া কুড়াইয়া ফেরেন।

৩

ভানুমতীদের ওখান হইতে ফিরিবার পথে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সেবার ঘোর বর্ষা নামিল। দিনরাত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, ঘন কাজল-কালো মেঘপুঞ্জে আকাশ ছাইয়াছে ; নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহারের দিগন্তরেখা বৃষ্টির ধোঁয়ায় ঝাপসা, মহালিখারূপের পাহাড় মিলাইয়া গিয়াছে—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের শীর্ষদেশ কখনও ঈষৎ অস্পষ্ট দেখা যায়, কখনও যায় না। শুনিলাম পূর্বে কুশী ও দক্ষিণে কারো নদীতে বন্যা আসিয়াছে।

মাইলের পর মাইল ব্যাপী কাশ ও ঝাউ বন বর্ষার জলে ভিজিতেছে, আমার আপিস-

ঘরের বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া দেখিতাম, আমার সামনে কাশবনের মধ্যে একটা বনঝাউয়ের ডালে একটা সঙ্গীহারা ঘুঘু বসিয়া অঝোরে ভিজিতেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবেই বসিয়া আছে—মাঝে মাঝে পালক উস্‌কোখুস্‌কো করিয়া ঝুলাইয়া বৃষ্টির জল আটকাইবার চেষ্টা করে, কখনও এমনিই বসিয়া থাকে।

এমন দিনে আপিস-ঘরে বসিয়া দিন কাটানো আমার পক্ষে কিন্তু অসম্ভব হইয়া উঠিত। ঘোড়ায় জিন কষিয়া বর্ষাতি চাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম। সে কি মুক্তি! কি উদ্দাম জীবনানন্দ! আর কি অপরূপ সবুজের সমুদ্র চারিদিকে—বর্ষার জলে নবীন, সতেজ, ঘনসবুজ কাশের বন গজাইয়া উঠিয়াছে—যতদূর দৃষ্টি চলে, এদিকে নাঢ়া বইহারের সীমানা ওদিকে মোহনপুরা অরণ্যের অস্পষ্ট নীল সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত থৈ থৈ করিতেছে এই সবুজের সমুদ্র—বর্ষাসজল হাওয়ায় মেঘকজ্জল আকাশের নীচে এই দীর্ঘ মরকতশ্যাম তৃণভূমির মাথায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে—আমি যেন একা এ অকূল-সমুদ্রের নাবিক—কোন্ রহস্যময় স্বপ্ন-বন্দরের উদ্দেশে পাড়ি দিয়াছি।

এই বিস্তৃত মেঘছায়াশ্যামল মুক্ত তৃণভূমির মধ্যে ঘোড়া ছুটাইয়া মাইলের পর মাইল যাইতাম—কখনও সরস্বতী কুণ্ডীর বনের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিয়াছি—প্রকৃতির এই অপূর্ব নিভৃত সৌন্দর্যভূমি যুগলপ্রসাদের স্বহস্তে রোপিত নানাজাতীয় বন্য ফুলে ও লতায় সজ্জিত হইয়া আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সরস্বতী হ্রদ ও তাহার তীরবর্তী বনানীর মত সৌন্দর্যভূমি খুব বেশী নাই—এ নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। হ্রদের ধারে রেড ক্যাম্পিয়নের মেলা বসিয়াছে এই বর্ষাকালে—হ্রদের জলের ধারের নিকট। জলজ ওয়াটারক্রোফ্‌টের বড় বড় নীলাভ সাদা ফুলে ভরিয়া আছে। যুগলপ্রসাদ সেদিনও কি একটা বন্যলতা আনিয়া লাগাইয়া গিয়াছে জানি। সে আজমাবাদ কাছারিতে মুহুরীর কাজ করে বটে, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া থাকে সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্তী লতাবিতানে ও বনপুষ্পের কুঞ্জে।

সরস্বতী কুণ্ডীর বন হইতে বাহির হইতাম—আবার মুক্ত প্রান্তর, আবার দীর্ঘ তৃণভূমি—বনের মাথায় ঘন নীল বর্ষার মেঘ আসিয়া জমিতেছে, সমগ্র জলভার নামাইয়া রিক্ত হইবার পূর্বেই আবার উড়িয়া আসিতেছে নবমেঘপুঞ্জ—একদিকের আকাশে এক অদ্ভুত ধরনের নীল রং ফুটিয়াছে—তাহার মধ্যে একখণ্ড লঘুমেঘ অস্তদিগন্তের রঙে রঞ্জিত হইয়া বহির্বিশ্বের দিগন্তে কোন্ অজানা পর্বতশিখরের মত দেখা যাইতেছে।

সন্ধ্যার বিলম্ব নাই। দিগন্তহারা ফুলকিয়া বইহারের মধ্যে শিয়াল ডাকিয়া উঠিত—একে মেঘের অন্ধকার, তার উপর সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেছে—ঘোড়ার মুখ কাছারির দিকে ফিরাইতাম।

কতবার এই ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ-থমকানো সন্ধ্যায় এই মুক্ত প্রান্তরে সীমাহীনতার মধ্যে কোন্ দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি—এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, সেই দরিদ্র গোঁড়-পরিবার, আকাশ, ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত—তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নবনীলনীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষা-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনানন্দ তাঁরই বাণী, অন্তরের অন্তরে যে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে। সে দেবতাকে ভয় করিবার কিছুই নাই—এই সুবিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ

বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন, অনন্ত তাঁর প্রেম ও আশীর্বাদ। যে যত হীন, যে যত ছোট, সেই বিরাট দেবতার অদৃশ্য প্রসাদ ও অনুকম্পা তার উপর তত বেশী।

আমার মনে যে দেবতার স্বপ্ন জাগিত, তিনি যে শুধু প্রবীণ বিচারক, ন্যায় ও দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত ব্যাপার তাহা নয়—নাঢ়া বইহারের কি আজমাবাদের মুক্ত প্রান্তরে কত গোধূলিবেলায় রক্তমেঘস্তূপের, কত দিগন্তহারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জনের প্রীতির জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টি করেন।

## ৪

এমনি এক বর্ষামুখর শ্রাবণ-দিনে ধাতুরিয়া ইসমাইলপুর কাছারিতে আসিয়া হাজির।

অনেক দিন পরে উহাকে দেখিয়া খুশি হইলাম।

—কি ব্যাপার, ধাতুরিয়া? ভালো আছিস তো?

যে ছোট পুঁটুলির মধ্যে তাহার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি বাঁধা, সেটা হাত হইতে নামাইয়া আমায় হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—বাবুজী, নাচ দেখাতে এলাম। বড় কষ্টে পড়েছি, আজ এক মাস কেউ নাচ দেখে নি। ভাবলাম, কাছারিতে বাবুজীর কাছে যাই, সেখানে গেলে তাঁরা ঠিক দেখবেন। আরো ভাল ভাল নাচ শিখেছি, বাবুজী।

ধাতুরিয়া যেন আরও বোগা হইয়া গিয়াছে। উহাকে দেখিয়া কষ্ট হইল।

—কিছু খাবি ধাতুরিয়া?

ধাতুরিয়া সলজ্জ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে খাইবে।

আমার ঠাকুরকে ডাকিয়া ধাতুরিয়াকে কিছু খাবার দিতে বলিলাম। তখন ভাত ছিল না, ঠাকুর দুধ ও চিঁড়া আনিয়া দিল। ধাতুরিয়ার খাওয়া দেখিয়া মনে হইল, সে অন্ততঃ দু-দিন কিছু খাইতে পায় নাই।

সন্ধ্যার পূর্বে ধাতুরিয়া নাচ দেখাইল। কাছারির প্রাঙ্গণে সেই বন্য অঞ্চলের অনেক লোক জড় হইয়াছিল ধাতুরিয়ার নাচ দেখিবার জন্য। আগের চেয়েও ধাতুরিয়া নাচে অনেক উন্নতি করিয়াছে। ধাতুরিয়ার মধ্যে যথার্থ শিল্পীর দরদ ও সাধনা আছে। আমি নিজে কিছু দিলাম, কাছারির লোক চাঁদা করিয়া কিছু দিল। ইহাতে তাহার কত দিনই বা চলিবে?

ধাতুরিয়া পরদিন সকালে আমার নিকট বিদায় লইতে আসিল।

—বাবুজী, কবে কলকাতা যাবেন?

—কেন বল তো?

—আমায় কলকাতায় নিয়ে যাবেন বাবুজী? সেই যে আপনাকে বলেছিলাম?

—তুমি এখন কোথায় যাবে ধাতুরিয়া? খেয়ে তবে যেও।

—না বাবুজী, ঝল্লুটোলাতে একজন ভূঁইহার বাভনের বাড়ী, তার মেয়ের বিয়ে হবে, সেখানে হয়তো নাচ দেখতে পারে। সেই চেষ্টাতে যাচ্ছি। এখান থেকে আট ক্রোশ রাস্তা—এখন রওনা হলে বিকেল নাগাদ পৌঁছব।

ধাতুরিয়াকে ছাড়িয়া দিতে মন সরে না। বলিলাম—কাছারিতে যদি কিছু জমি দিই, তবে এখানে থাকতে পারবে? চাষবাস কর, থাক না কেন?

মটুকনাথ পণ্ডিতেরও দেখিলাম খুব ভাল লাগিয়াছে ধাতুরিয়াকে। তাহার ইচ্ছা ধাতুরিয়াকে সে টোলের ছাত্র করিয়া লয়। বলিল—বলুন না ওকে বাবুজী, দু-বছরের মধ্যে মুগ্ধবোধ শেষ করিয়ে দেব। ও থাকুক এখানে।

জমি দেওয়ার কথায় ধাতুরিয়া বলিল—বাবুজী, আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত, আপনার বড় দয়া। কিন্তু চাষ-কাজ কি আমায় দিয়ে হবে? ওদিকে আমার মন নেই যে! নাচ দেখাতে পেলে আমার মনটা ভারি খুশি থাকে। আর কিছু তেমন ভাল লাগে না।

—বেশ, মাঝে মাঝে নাচ দেখাবে, চাষ করলে তো জমির সঙ্গে তোমায় কেউ শেকল দিয়ে বেঁধে রাখবে না?

ধাতুরিয়া খুব খুশি হইল। বলিল—আপনি যা বলবেন আমি তা শুনব। আপনাকে বড় ভাল লাগে, বাবুজী। আমি ঝল্লুটোলা থেকে ঘুরে আসি—আপনার এখানেই আসব।

মটুকনাথ পণ্ডিত বলিল—আর সেই সময় তোমাকে টোলেও ঢুকিয়ে নেব। তুমি না হয় রাত্রে এসে প'ড়ো আমার কাছে। মূর্খ থাকা কিছু নয়, কিছু ব্যাকরণ, কিছু কাব্য লবজ রাখা দরকার।

ধাতুরিয়া তাহার পর বসিয়া বসিয়া নৃত্যশিল্পের বিষয়ে নানা কথা কি সব বলিল, আমি তত বুঝিলাম না। পূর্ণিয়ার হো-হো নাচের ভঙ্গীর সঙ্গে ধরমপুর অঞ্চলের ঐ শ্রেণীর নাচের কি তফাৎ—সে নিজে নূতন কি একটা হাতের মুদ্রা প্রবর্তন করিয়াছে—এই সব ধরনের কথা।

—বাবুজী, আপনি বালিয়া জেলায় ছট্ পরবের সময় মেয়েদের নাচ দেখেছেন? ওর সঙ্গে ছক্করবাজি নাচের বেশ মিল থাকে একটা জায়গায়। আপনাদের দেশে নাচ কেমন হয়?

আমি তাহাকে গত বৎসর ফসলের মেলায় দৃষ্ট 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচের কথা বলিলাম। ধাতুরিয়া হাসিয়া বলিল—ও কিছু না বাবুজী, ও মুঙ্গেরের গেঁয়ো নাচ। গাঙ্গোতাদের খুশি করবার নাচ। ওর মধ্যে খাঁটি জিনিস কিছু নেই। ও তো সোজা।

বলিলাম—তুমি জানো? নেচে দেখাও তো?

ধাতুরিয়া দেখিলাম নিজের শাস্ত্রে বেশ অভিজ্ঞ। 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ সত্যই সে চমৎকার নাচিল—সেই খুৎ-খুৎ করিয়া ছেলেমানুষের মত কান্না, সেই চোরা ননী বিতরণ করিবার ভঙ্গী—সেই সব। তাহাকে আরও মানাইল এই জন্য যে, সে সত্যই বালক।

ধাতুরিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল—এত মেহেরবানিই যখন করলেন বাবুজী, একবার কলকাতায় কেন নিয়ে চলুন না? ওখানে নাচের আদর আছে।

এই ধাতুরিয়ার সহিত আমার শেষ দেখা।

মাস-দুই পরে শোনা গেল, বি এন ডব্লিউ রেললাইনের কাটারিয়া স্টেশনের অদূরে লাইনের উপর একটি বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়—নাটুয়া বালক ধাতুরিয়ার মৃতদেহ বলিয়া সকলে চিনিয়াছে। ইহা আত্মহত্যা কি দুর্ঘটনা তাহা বলিতে পারিব না। আত্মহত্যা হইলে, কি দুঃখেই বা সে আত্মহত্যা করিল?

সেই বন্য অঞ্চলে দু-বছর কাটাইবার সময় যতগুলি নরনারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম—তার মধ্যে ধাতুরিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাহার মধ্যে যে একটি নির্লোভ,

সদাচঞ্চল, সদানন্দ, অবৈষয়িক, খাঁটি শিল্পীমনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, শুধু সে বন্য দেশ কেন, সভ্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যেও তা সুলভ নয়।

৫

আরও তিন বৎসর কাটিয়া গেল।

নাঢ়া বইহার ও লবটুলিয়ার সমুদয় জঙ্গল-মহাল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর কোথাও পূর্বের মত বন নাই। প্রকৃতি কত বৎসর ধরিয়া নির্জনে নিভৃতে যে কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, কত কেঁয়োঝাঁকার নিভৃত লতা-বিতান, কত স্বপ্নভূমি—জন-মজুরেরা নির্মম হাতে সব কাটিয়া উড়াইয়া দিল, যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল পঞ্চাশ বৎসরে, তাহা গেল এক দিনে। এখন কোথাও আর সে রহস্যময় দূরবিসর্পী প্রান্তর নাই, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে যেখানে মায়াপরীরা নামিত, মহিষের দেবতা দয়ালু টাঁড়বারো হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া বন্য মহিষদলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিত।

নাঢ়া বইহারের নাম ঘুচিয়া গিয়াছে, লবটুলিয়া এখন একটি বস্তি মাত্র। যে দিকে চোখ যায়, শুধু চালে চালে লাগানো অপকৃষ্ট খোলার ঘর। কোথাও বা কাশের ঘর। ঘন ঘিঞ্জি বসতি—টোলায় টোলায় ভাগ করা—ফাঁকা জায়গায় শুধুই ফসলের ক্ষেত। এতটুকু ক্ষেতের চারিদিকে ফনিমনসার বেড়া। ধরণীর মুক্তরূপ ইহারা কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আছে কেবল একটি স্থান, সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্তী বনভূমি।

চাকুরির খাতিরে মনিবের স্বার্থরক্ষার জন্য সব জমিতেই প্রজাবিলি করিয়াছি বটে, কিন্তু যুগলপ্রসাদের হাতে সাজানো সরস্বতী-তীরের অপূর্ব বনকুঞ্জ কিছুতেই প্রাণ ধরিয়া বন্দোবস্ত করিতে পারি নাই। কতবার দলে দলে প্রজারা আসিয়াছে সরস্বতী কুণ্ডীর পাড়ের জমি লইতে—বর্ধিত হারে সেলামী ও খাজনা দিতেও চাহিয়াছে, কারণ একে ঐ জমি খুব উর্বরা, তাহার উপর নিকটে জল থাকায় মকাই প্রভৃতি ফসল ভাল জন্মাইবে ; কিন্তু আমি রাজী হই নাই।

তবে কতদিন আর রাখিতে পারিব ? সদর আপিস হইতে মাঝে মাঝে চিঠি আসিতেছে, সরস্বতী কুণ্ডীর জমি আমি কেন বিলি করিতে বিলম্ব করিতেছি। নানা ওজর-আপত্তি তুলিয়া এখনও পর্যন্ত রাখিয়াছি বটে, কিন্তু বেশী দিন পারিব না। মানুষের লোভ বড় বেশী, দুটি ভুট্টার ছড়া আর চীনাঘাসের এক কাঠা দানার জন্য প্রকৃতির অমন স্বপ্নকুঞ্জ ধ্বংস করিতে তাহাদের কিছুমাত্র বাধিবে না, জানি। বিশেষ করিয়া এখানকার মানুষে গাছপালার সৌন্দর্য বোঝে না, রম্য ভূমিশ্রীর মহিমা দেখিবার চোখ নাই, তাহারা জানে পশুর মত পেটে খাইয়া জীবনযাপন করিতে। অন্য দেশ হইলে আইন করিয়া এমন সব স্থান সৌন্দর্যপিপাসু প্রকৃতি-রসিক নরনারীর জন্য সুরক্ষিত করিয়া রাখিত, যেমন আছে কালিফোর্নিয়ায় যোসেমাই ন্যাশনাল পার্ক, দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক, বেলজিয়ান কঙ্গোতে আছে পার্ক ন্যাশনাল আলবার্ট। আমার জমিদাররা ও ল্যান্ড-স্কেপ বুঝিবে না, বুঝিবে সেলামীর টাকা, খাজনার টাকা, আদায় ইরশাল, হস্তবুদ।

এই জন্মান্ধ মানুষের দেশে একজন যুগলপ্রসাদ কি করিয়া জন্মিয়াছিল জানি না —শুধু তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আজও সরস্বতী হ্রদের তীরবর্তী বনানী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি।

কিন্তু কতদিন রাখিতে পারিব?

যাক্, আমারও কাজ শেষ হইয়া আসিল বলিয়া।

প্রায় তিন বছর বাংলা দেশে যাই নাই—মাঝে মাঝে বাংলা দেশের জন্য মন বড় উতলা হয়। সারা বাংলা দেশ যেন আমার গৃহ—তরুণী কল্যাণী বধূ যেখানে আপন হাতে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেখায়; এখানকার এমন লক্ষ্মীছাড়া উদাস ধূ ধূ প্রান্তর ও ঘন বনানী নয়—যেখানে নারীর হাতের স্পর্শ নাই।

কি হইতে যেন মনে অকারণ আনন্দের বান ডাকিল, তাহা জানি না। জ্যোৎস্না রাত্রি—তখনই ঘোড়ায় জিন কষিয়া সরস্বতী কুন্ডীর দিকে রওনা হইলাম, কারণ তখন নাঢ়া ও লবটুলিয়া বইহারের বনরাজি শেষ হইয়া আসিয়াছে—যাহা কিছু অরণ্য-শোভা ও নির্জনতা আছে তখনও সরস্বতীর তীরেই। আমি মনে মনে বেশ বুঝিলাম, এ আনন্দকে উপভোগ করিবার একমাত্র পটভূমি হইতেছে সরস্বতী হ্রদের তীরবর্তী বনানী।

ঐ সরস্বতীর জল জ্যোৎস্নালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে—চিক্ চিক্ করিতেছে কি শুধু? ঢেউয়ে ঢেউয়ে জ্যোৎস্না ভাঙিয়া পড়িতেছে। নির্জন, স্তব্ধ বনানী হ্রদের জলের তিন দিক বেষ্টন করিয়া, বন্য লাল হাঁসের কাকলী, বন্য শেফালীপুষ্পের সৌরভ, কারণ যদিও জ্যৈষ্ঠ মাস, শেফালী ফুল এখানে বারো মাস ফোটে।

কতক্ষণ হ্রদের তীরে এদিকে ওদিকে ইচ্ছামত ঘোড়া চালাইয়া বেড়াইলাম। হ্রদের জলে পদ্ম ফুটিয়াছে, তীরের দিকে ওয়াটারক্রোফ্‌ট ও যুগলপ্রসাদের আনীত স্পাইডার লিলির ঝাড় বাঁধিয়াছে। দেশে চলিয়াছি কতকাল পরে, এ নির্জন অরণ্যবাস হইতে মুক্তি পাইব, সেখানে বাঙালী মেয়ের হাতে রান্না খাদ্য খাইয়া বাঁচিব, কলিকাতায় এক-আধ দিন থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখিব, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কতকাল পরে আবার দেখা হইবে।

এইবার ধীরে ধীরে সে অননুভূত আনন্দের বন্যা আমার মনের কূল ভাসাইয়া দোলা দিতে লাগিল। যোগাযোগ হইয়াছিল বোধ হয় অদ্ভুত—এতদিন পরে দেশে প্রত্যাবর্তন, সরস্বতী হ্রদের জ্যোৎস্নালোকিত বারিরাশি ও বনফুলের শোভা, বন্য শেফালীর জ্যোৎস্না-মাখানো সুবাস, শান্ত স্তব্ধতা—ভাল ঘোড়ার চমৎকার কোণাকুনি ক্যান্টার চাল, হু হু হাওয়া—সব মিলিয়া স্বপ্ন! স্বপ্ন! আনন্দের ঘন নেশা! আমি যেন যৌবনোন্মত্ত তরুণ দেবতা, বাধাবন্ধনহীন, মুক্ত গতিতে সময়ের সীমা পার হইয়া চলিয়াছি—এই চলাই যেন আমার অদৃষ্টের জয়লিপি, আমার সৌভাগ্য, আমার প্রতি কোন্ সুপ্রসন্ন দেবতার পরম আশীর্বাদ!

হয়তো আর ফিরিব না—দেশে ফিরিয়া মরিয়াও তো যাইতে পারি। বিদায়—সরস্বতী কুন্ডী, বিদায়—তীরতরু-সারি, বিদায়—জ্যোৎস্নালোকিত মুক্ত বনানী। কলিকাতার কোলাহলমুখর রাজপথে দাঁড়াইয়া তোমার কথা মনে পড়িবে, বিস্মৃত জীবনদিনের বীণার অনতিস্পষ্ট ঝঙ্কারের মত—মনে পড়িবে যুগলপ্রসাদের আনা গাছগুলির কথা, জলের ধারে স্পাইডার লিলি ও পদ্মের বন, তোমার বনের নিবিড় ডালপালার মধ্যে স্তব্ধ মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক, অস্ত-মেঘের ছায়ায় রাঙা ময়নাকাঁটার গুঁড়ি ও ডাল, তোমার নীল জলের উপরকার নীল আকাশে উড়ন্ত সিল্লি ও লাল হাঁসের সারি—জলের ধারের নরম কাদার উপরে হরিণ-শিশুর পদচিহ্ন...নির্জনতা, সুগভীর নির্জনতা।...বিদায়, সরস্বতী কুন্ডী।

ফিরিবার পথে দেখি সরস্বতী হ্রদের বন হইতে বাহির হইয়া মাইলখানেক দূরে

একটা জায়গায় বন কাটিয়া একখানা ঘর বসাইয়া মানুষ বাস করিতেছে—এই জায়গাটার নাম হইয়াছে নয়া লবটুলিয়া—যেমন নিউ সাউথ ওয়েল্স্ বা নিউ ইয়র্ক। নূতন গৃহস্থ পরিবার আসিয়া বনের ডালপালা কাটিয়া (নিকটে বড় বন নাই, সুতরাং সরস্বতীর তীরবর্তী বন হইতেই আমদানী নিশ্চয়ই) ঘাসের ছাওয়া তিন-চারখানা নীচু নীচু খুপরি বাঁধিয়াছে। তারই নীচে এখনও পর্যন্ত ভিজা দাওয়ার উপর একটা নারিকেল কিংবা কড়ুয়া তেলের গলা-ভাঙা বোতল, একটি উলঙ্গ হামাগুড়িরত কৃষ্ণকায় শিশু, কয়েকটি সিহোড়া গাছের সরু ডালে বোনা ঝুড়ি, একটি মোটা রূপার অনন্ত পরা যক্ষের মত কালো আঁটসাঁট গড়নের বউ, খানকয়েক পিতলের লোটা ও থালা ও কয়েকখানা দা, খোন্তা, কোদাল। ইহাই লইয়া ইহারা প্রায় সবাই সংসার করে। শুধু লবটুলিয়া কেন, ইসমাইলপুর ও নাঢ়া বইহারের সর্বত্রই এইরূপ। কোথা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে তাই ভাবি ; ভদ্রাসন নাই, পৈতৃক ভিটা নাই, গ্রামের মায়া নাই, প্রতিবেশীর স্নেহমমতা নাই —আজ ইসমাইলপুরের বনে, কাল মুঙ্গেরের দিয়ারা চরে, পরশু জয়ন্তী পাহাড়ের নীচে তরাই ভূমিতে—সর্বত্রই ইহাদের গতি, সর্বত্রই ইহাদের ঘর।

পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ পাইয়া দেখি রাজু পাঁড়ে এই ধরনের একটি গৃহস্থবাড়ীতে বসিয়া ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেছে। উহাকে দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিলাম। আমায় সবাই মিলিয়া খাতির করিয়া বসাইল। রাজুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে এখানে কবিরাজি করিতে আসিয়াছিল। ভিজিট পাইয়াছে চারি কাঠা যব এবং নগদ আট পয়সা। ইহাতেই সে মহা খুশি হইয়া ইহাদের সহিত আসর জমাইয়া দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছে।

আমায় বলিল—বসুন, একটা কথার মীমাংসা করে দিন তো বাবুজী! আচ্ছা, পৃথিবীর কি শেষ আছে? আমি তো এদের বলছি বাবু, যেমন আকাশের শেষ নেই, পৃথিবীরও তেমনি শেষ নেই। কেমন, তাই না বাবুজী?

বেড়াইতে আসিয়া এমন গুরুতর জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা ভাবি নাই।

রাজু পাঁড়ের দার্শনিক মন সর্বদাই জটিল তত্ত্ব লইয়া কারবার করে জানি এবং ইহাও জানি যে ইহাদের সমাধানে সে সর্বদাই মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়া আসিতেছে, যেমন রামধনু উইয়ের ঢিবি হইতে জন্মায়, নক্ষত্রদল যমের চর, মানুষ কি পরিমাণে বাড়িতেছে —তাহাই সরেজমিনে তদারক করিবার জন্য যম কর্তৃক উহারা প্রেরিত হয়—ইত্যাদি।

পৃথিবীতত্ত্ব যতটা আমার জানা আছে বুঝাইয়া বলিতে রাজু বলিল—কেন সূর্য পূর্বদিকে ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়, আচ্ছা কোন্ সাগর থেকে সূর্য উঠছে আর কোন্ সাগরে নামছে এর কেউ নিরাকরণ করতে পেরেছে? রাজু সংস্কৃত পড়িয়াছে, 'নিরাকরণ' কথাটা ব্যবহার করাতে গাঙ্গোতা গৃহস্থ ও তাহার পরিবারবর্গ সপ্রশংস ও বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে রাজুর দিকে চাহিয়া রহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিল ইংরেজীনবিশ বংগালী বাবুকে কবিরাজ মশায় একেবারে কি অথৈ জলে টানিয়া লইয়া ফেলিয়াছে! বংগালী বাবু এবার হাবুডুবু খাইয়া মরিল দেখিতেছি।

বলিলাম—রাজু, তোমার চোখের ভুল, সূর্য কোথাও যায় না, এক জায়গায় স্থির আছে।

রাজু আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। গাঙ্গোতার দল হা-হা করিয়া

তাচ্ছিল্যের সুরে হাসিয়া উঠিল। হায় গ্যালিলিও! এই নাস্তিক বিচারমূঢ় পৃথিবীতেই তুমি কারারুদ্ধ হইয়াছিলে!

বিস্ময়ের প্রথম রেশ কাটিয়া গেলে রাজু আমায় বলিল—সুরেষনারায়ণ পূর্বে উদয়-পাহাড়ে ওঠেন না বা পশ্চিম-সমুদ্রে অস্ত যান না?

বলিলাম—না।

—এ-কথা ইংরিজি বইতে লিখেছে?

—হাঁ।

জ্ঞান মানুষকে সত্যই সাহসী করে; যে শান্ত, নিরীহ রাজু পাঁড়ের মুখে কখনও উঁচু সুরে কথা শুনি নাই—সে সতেজে, সদর্পে বলিল—ঝুট্ বাত বাবুজী। উদয়-পাহাড়ের যে গুহা থেকে সুরেষনারায়ণ রোজ ওঠেন সে গুহা একবার মুঙ্গেরের এক সাধু দেখে এসেছিলেন। অনেক দূর হেঁটে যেতে হয়, পূর্বদিকের একেবারে সীমানায় সে পাহাড়, গুহার মুখে মস্ত পাথরের দরজা, ওঁর অশ্রের রথ থাকে সেই গুহার মধ্যে। যে-সে কি দেখতে পায় হুজুর? বড় বড় সাধু মহান্ত দেখেন। ঐ সাধু অশ্রের রথের একটা কুচি এনেছিলেন—এই এত বড় চক্‌চকে অভ্র—আমার গুরুভাই কামতাপ্রসাদ স্বচক্ষে দেখেছেন।

কথা শেষ করিয়া রাজু সগর্বে একবার সমবেত গাঙ্গোতাদের মুখের দিকে চক্ষু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চাহিল।

উদয়-পর্বতের গুহা হইতে সূর্যের উত্থানের এত বড় অকাট্য ও চাক্ষুষ প্রমাণ উত্থাপিত করার পরে আমি সেদিন একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেলাম।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

### ১

যুগলপ্রসাদকে একদিন বলিলাম—চল, নতুন গাছপালার সন্ধান ক'রে আসি মহালিখা-রূপের পাহাড়ে।

যুগলপ্রসাদ সোৎসাহে বলিল—এক রকম লতানে গাছ আছে ওই পাহাড়ের জঙ্গলে —আর কোথাও নেই। চীহড় ফল বলে এদেশে। চলুন খুঁজে দেখি।

নাঢ়া-বইহারের নূতন বস্তিগুলির মধ্য দিয়া পথ। এরই মধ্যে এক এক পাড়ার সর্দারের নাম অনুসারে টোলার নামকরণ হইয়াছে—ঝল্লুটোলা, রূপদাসটোলা, বেগমটোলা ইত্যাদি। উদুখলে ধুপধাপ যব কোটা হইতেছে, খোলাছাওয়া মাটির ঘর হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উপরে উঠিতেছে—উলঙ্গ কৃষ্ণকায় শিশুর দল পথের ধারে ধুলাবালি ছড়াইয়া খেলা করিতেছে।

নাঢ়া বইহারের উত্তর সীমানা এখনও ঘন বনভূমি। তবে লবটুলিয়া বইহারে আর এতটুকু বনজঙ্গল বা গাছপালা নাই—নাঢ়া বইহারের শোভাময়ী বনভূমির বারো আনা গিয়াছে, কেবল উত্তর সীমানায় হাজার দুই বিঘা জমি এখনও প্রজাবিলি হয় নাই। দেখিলাম যুগলপ্রসাদ ইহাতে বড় দুঃখিত।

বলিল—গাঙ্গোতার দল ব'সে সব নষ্ট করলে, হুজুর। ওদের ঘরবাড়ী নেই, হাঘরের

দল। আজ এখানে, কাল সেখানে। এমন বন নষ্ট করলে!

বলিলাম—ওদের দোষ নেই যুগলপ্রসাদ। জমিদারে জমি ফেলে রাখবে কেন, তারাও তো গভর্ণমেণ্টের রেভিনিউ দিচ্ছে, চিরকাল ঘর থেকে রেভিনিউ গুনবে? জমিদার ওদের এনেছে, ওদের কি দোষ?

—সরস্বতী কুণ্ডী দেবেন না হুজুর। বড় কষ্টে ওখানে গাছপালা সংগ্রহ করে এনে বসিয়েছি—

—আমার ইচ্ছেয় তো হবে না, যুগল। এতদিন বজায় রেখেছি এই যথেষ্ট, আর কত দিন রাখা যাবে বল। ওদিকে জমি ভাল দেখে প্রজারা সব ঝুঁকছে।

সঙ্গে আমাদের দু-তিনজন সিপাহী ছিল। তারা আমাদের কথাবার্তার গতি বুঝিতে না পারিয়া আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিল—কিছু ভাববেন না হুজুর, সামনে চৈতী ফসলের পরে সরস্বতী কুণ্ডীর জমি এক টুকরো পড়ে থাকবে না।

মহালিখারুপের পাহাড় প্রায় নয় মাইল দূরে। আমার আপিসঘরের জানালা হইতে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যাইত। পাহাড়ের তলায় পৌঁছিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল।

কি সুন্দর রৌদ্র আর কি অদ্ভুত নীল আকাশ সেদিন। এমন নীল কখনও যেন আকাশে দেখি নাই—কেন যে এক-এক দিন আকাশ এমন গাঢ় নীল হয়, রৌদ্রের কি অপূর্ব রং, নীল আকাশ যেন মদের নেশার মত মনকে আচ্ছন্ন করে। কাঁচ পত্রপল্লবের গায়ে রৌদ্র পড়িয়া স্বচ্ছ দেখায়—আর নাঢ়া বইহারের ও লবটুলিয়ার যত বন্য পক্ষীর ঝাঁক বাসা ভাঙিয়া যাওয়াতে কতক সরস্বতী সরোবরের বনে, কতক এখানে ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টে আশ্রয় লইয়াছে—তাহাদের কি অবিশ্রান্ত কূজন!

ঘন বন। এমন ঘন নির্জন আরণ্যভূমিতে মনে একটি অপূর্ব শান্তি ও মুক্ত অবাধ স্বাধীনতার ভাব আনে—কত গাছ, কত ডালপালা, কত বনফুল, কত বড় বড় পাথর ছড়ানো—যেখানে সেখানে বসিয়া থাক, শুইয়া পড়, অলস জীবনমুহূর্ত প্রস্ফুটিত পিয়াল বৃক্ষের নিবিড় ছায়ায় বসিয়া কাটাইয়া দাও—বিশাল নির্জন আরণ্যভূমি তোমার শ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে জুড়াইয়া দিবে।

আমরা পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছি—বড় বড় গাছ মাথার উপরে সূর্যের আলোক আটকাইয়াছে—ছোট বড় ঝরনা কল্ কল্ শব্দে বনের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিতেছে—হরীতকী গাছ, কেলিকদম্ব গাছের সেগুন পাতার মত বড় বড় পাতায় বাতাস বাধিয়া শন্ শন্ শব্দ হইতেছে। বনমধ্যে ময়ূরের ডাক শোনা গেল।

আমি বলিলাম—যুগলপ্রসাদ, চীহড় ফলের গাছ কোথায়, খোঁজ।

চীহড় ফলের গাছ পাওয়া গেল আরও অনেক উপরে উঠিয়া। স্থলপদ্মের পাতার মত পাতা, খুব মোটা কাষ্ঠময় লতা, আঁকিয়া বাঁকিয়া অন্য গাছকে আশ্রয় করিয়া উঠিয়াছে। ফলগুলি শিমজাতীয়, তবে শিমের দুখানি খোলা কটকী চটিজুতার মত বড়, অমনই কঠিন ও চওড়া—ভিতরে গোল বীচি। আমরা শুকনো লতাপাতা জ্বালাইয়া বীচি পুড়াইয়া খাইয়াছি—ঠিক যেন গোল আলুর মত আস্বাদ।

অনেক দূর উঠিয়াছি। ওই দূরে মোহনপুরা ফরেস্ট—দক্ষিণে ওই আমাদের মহাল, ওই সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্তী জঙ্গল অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ওই নাঢ়া বইহারের অবশিষ্ট সিকিভাগ বন—ওই দূরে কুশী নদী মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের পূর্ব সীমানা ঘেঁষিয়া প্রবাহিত—নিম্নের সমতলভূমির দৃশ্য যেন ছবির মত!

—ময়ূর! ময়ূর—হুজুর, ঐ দেখুন, ময়ূর!—

প্রকাণ্ড একটা ময়ূর মাথার উপরেই এক গাছের ডালে বসিয়া। একজন সিপাহী বন্দুক লইয়া আসিয়াছিল, সে গুলি করিতে গেল, আমি বারণ করিলাম।

যুগলপ্রসাদ বলিল—বাবুজী, একটা গুহা আছে পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গলে কোথায়—তার গায়ে সব ছবি আঁকা আছে—কতকালের কেউ জানে না, সেটাই খুঁজছি।

হয়তো বা প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের হাতে আঁকা বা খোদাই ছবি গুহার কঠিন পাথরের গায়ে! পৃথিবীর ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বৎসরের যবনিকা এক মুহূর্তে অপসারিত হইয়া সময়ের উজানে কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিবে আমাদের!

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাঙ্কিত ছবি দেখিবার প্রবল আগ্রহে জঙ্গল ঠেলিয়া গুহা খুঁজিয়া বেড়াইলাম—গুহাও মিলিল, কিন্তু যে অন্ধকার তাহার ভিতরে, ঢুকিবার সাহস হইল না। ঢুকিলেই বা অন্ধকারের মধ্যে কি দেখিব! অন্য একদিন তোড়জোড় করিয়া আসিতে হইবে—আজ থাক্। অন্ধকারে কি শেষে ভীষণ বিষধর চন্দ্রবোড়া কিংবা শঙ্খচূড় সাপের হাতে প্রাণ দিব? এ সব স্থানে তাহাদের অভাব নাই।

যুগলপ্রসাদকে বলিলাম—এ জঙ্গলে কিছু গাছপালা লাগাও নূতন ধরনের। পাহাড়ের বন কেউ কখনো কাটবে না। লবটুলিয়া তো গেল—সরস্বতী কুণ্ডীর ভরসাও ছাড়—

যুগলপ্রসাদ বলিল—ঠিক বলেছেন হুজুর। কথাটা মনে লেগেছে। কিন্তু আপনি তো আসছেন না, আমাকে একাই করতে হবে।

—আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। তুমি লাগাও।

মহালিখারূপের পাহাড় একটা পাহাড় নয়, একটা নাতিদীর্ঘ, অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী, কোথাও দেড় হাজার ফুটের বেশী উঁচু নয়—হিমালয়েরই পাদশৈলের নিম্নতর শাখা, যদিও তরাই প্রদেশের জঙ্গল ও আসল হিমালয় এখান হইতে এক-শ হইতে দেড়-শ মাইল দূরে। মহালিখারূপের পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নের সমতলভূমির দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় প্রাচীন যুগের মহাসমুদ্র একসময়ে এই বালুকাময় উচ্চ তটভূমির গায়ে আছড়াইয়া পড়িত, গুহাবাসী মানব তখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিদ্রিত এবং মহালিখারূপের পাহাড় তখন সেই সুপ্রাচীন মহাসাগরের বালুকাময় বেলাভূমি।

যুগলপ্রসাদ অন্তত আট-দশ রকমের নূতন গাছ-লতা দেখাইল—সমতলভূমির বনে এগুলি নাই—পাহাড়ের উপরকার বনের প্রকৃতি অন্য ধরনের—গাছপালাও অনেক অন্য রকম।

বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। কি রকমের বনফুলের গন্ধ খুব পাওয়া যাইতেছিল—বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গন্ধটা যেন নিবিড়তর হইয়া উঠিল। গাছের ডালে ঘুঘু, পাহাড়ী বনটিয়া, হরটিট প্রভৃতি কত কি পক্ষীর কূজন!

বাঘের ভয় বলিয়া সঙ্গীরা পাহাড় হইতে নামিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল, নতুবা এই আসন্ন সন্ধ্যায় নিবিড় ছায়ায় নির্জন শৈলসানুর বনভূমিতে যে শোভা ফুটিয়াছে, তাহা ফেলিয়া আসিতে ইচ্ছা করে না।

মুনেশ্বর সিং বলিল—হুজুর, মোহনপুরা জঙ্গলের চেয়েও এখানে বাঘের ভয় বেশী। বিকেলের পর এখানে যারা কাঠকুটো কাটতে আসে সব নেমে যায়। আর দল না বেঁধে একা কেউ এ পাহাড়ে আসেও না। বাঘ আছে, শঙ্খচূড় সাপ আছে—দেখছেন না, কি গজাড় জঙ্গল সারা পাহাড়ে!

অগত্যা আমরা নামিতে লাগিলাম। পাহাড়ের জঙ্গলে কেলিকদম্ব গাছের বড় পাতার আড়ালে শুক্র ও বৃহস্পতি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

## ২

একদিন দেখি এমনি একটি নূতন গৃহস্থের বাড়ীর দাওয়ায় বসিয়া গনোরী তেওয়ারী স্কুলমাস্টার শালপাতার ওপর ছাতুর তাল মাখিয়া খাইতেছে।

—হুজুর যে! ভাল আছেন?

—বেশ আছি। তুমি কবে এলে? কোথায় ছিলে? এরা তোমার কেউ হয় নাকি?

—কেউ নয়। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, বেলা হয়ে গিয়েছে, ব্রাহ্মণ, এদের এখানে অতিথি হ'লাম। তাই দুটো খাচ্ছি। চেনাশুনো ছিল না, তবে আজ হ'ল।

গৃহকর্তা আগাইয়া আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল—আসুন হুজুর, বসুন উঠে।

—না, বসব না। বেশ আছি। কতদিন জমি নিয়েছ?

—আজ দু-মাস হুজুর। এখনও জমি চষতে পারি নি।

গনোরী তেওয়ারীকে একটি ছোট মেয়ে আসিয়া কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা দিয়া গেল। সে খাইতেছে কলাইয়ের ছাতু, নুন ও লঙ্কা। ছাতুর সে বিরাট তাল শীর্ণ গনোরী তেওয়ারীর পেটে কোথায় ধরিবে বোঝা কঠিন। গনোরী খাঁটি ভবঘুরে। যেখানে খাইতে বসিয়াছে, সেই দাওয়ার এক পাশে একটি ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, একটি গেলাপ অর্থাৎ পাতলা বালাপোশ-জাতীয় লেপ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম উহা গনোরীর—এবং উহাই উহার সমগ্র জাগতিক সম্পত্তি। গনোরীকে বলিলাম—ব্যস্ত আছি, তুমি কাছারিতে এসো ওবেলা।

বিকালে গনোরী কাছারিতে আসিল।

বলিলাম—কোথায় ছিলে গনোরী?

—বাবুজী, মুঙ্গের জেলায় পাড়াগাঁ অঞ্চলে। বহুৎ পাড়াগাঁয়ে ঘুরেছি।

—কি ক'রে বেড়াতে?

—পাঠশালা করতাম। ছেলে পড়াতাম।

—কোনো পাঠশালা টিঁক্‌ল না?

—দু-তিন মাসের বেশী নয় হুজুর। ছেলেরা মাইনে দেয় না।

—বিয়ে-থাওয়া করেছ? বয়স কত হ'ল?

—নিজেরই পেট চলে না হুজুর, বিয়ে ক'রে করব কি? বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হয়েছে।

গনোরীর মত এত দরিদ্র লোক এ অঞ্চলেও বেশী দেখা যায় না। মনে পড়িল, গনোরী একবার বিনা-নিমন্ত্রণে ভাত খাইতে আমার কাছারিতে আসিয়াছিল, প্রথম যেবার এখানে আসি। বর্তমানে বোধ হয় কতকাল সে ভাত খাইতে পায় নাই। গাঙ্গোতা-বাড়ীতে অতিথি হইয়া কলাইয়ের ছাতু খাইয়া দিন কাটাইতেছে।

বলিলাম—গনোরী, আজ রাত্রে আমার এখানে খাবে। কণ্টু মিশির রাঁধে, তার হাতে তোমার তো খেতে আপত্তি নেই?

গনোরী বেজায় খুশি হইল। একগাল হাসিয়া বলিল—কেন্টু আমাদেরই ব্রাহ্মণ, ওর হাতে আগেও তো খেয়েছি—আপত্তি কি?

তার পর বলিল—হুজুর, বিয়ের কথা যখন তুললেন তখন বলি। আর বছর শ্রাবণ মাসে একটা গাঁয়ে পাঠশালা খুললাম। গাঁয়ে এক ঘর আমাদেরই ব্রাহ্মণ ছিল। তার বাড়ীতে থাকি। ওর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা সব ঠিকঠাক, এমন কি আমি মুঙ্গের থেকে ভাল মেরজাই একটা কিনে আনলাম—তার পর পাড়ার লোক ভাঙচি দিলে—বললে—ও গরীব স্কুল-মাস্টার, চাল নেই, চুলো নেই, ওকে মেয়ে দিও না। তাই সে বিয়ে ভেঙে গেল। আমি সে গাঁ ছেড়ে চলেও গেলাম।

—মেয়েটিকে দেখেছিলে? দেখতে ভাল?

—দেখি নি? চমৎকার মেয়ে, হুজুর। তা আমাকে কেন দেবে? সত্যিই তো, আমার কি আছে বলুন না?

দেখিলাম গনোরী বেশ দুঃখিত হইয়াছে বিবাহ ফাঁসিয়া যাওয়াতে, মেয়েটিকে মনে ধরিয়াছিল।

তারপর অনেকক্ষণ বসিয়া সে গল্প করিল। তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল, জীবন তাহাকে কোনো জিনিস দেয় নাই—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়াছে, দুটি পেটের ভাতের জন্য। তাও জোটাইতে পারে নাই। গাঙ্গোতাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়াই অর্ধেক জীবন কাটাইয়া দিল।

বলিল—অনেকদিন পরে তাই লবটুলিয়াতে এলাম। এখানে অনেক নতুন বস্তি হয়েছে শুনেছিলাম। সে জঙ্গল-মহাল আর নেই। এখানে যদি একটা পাঠশালা খুলি—তাই এলাম। চলবে না, কি বলেন হুজুর?

তখনই মনে মনে ভাবিলাম, এখানে একটা পাঠশালা করিয়া দিয়া গনোরীকে রাখিয়া দিব। এতগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমার মহালে নব আগন্তুক, তাহাদের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করা আমারই কর্তব্য। দেখি কি করা যায়।

## ৩

অপূর্ব জ্যোৎস্না-রাত। যুগলপ্রসাদ ও রাজু পাঁড়ে গল্প করিতে আসিল। কাছারি হইতে কিছু দূরে একটি ছোট বস্তি বসিয়াছে। সেখানকার একটি লোকও আসিল। আজ চার দিন মাত্র তাহারা ছাপরা জেলা হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছে।

লোকটি তাহার জীবনের ইতিহাস বলিতেছিল। স্ত্রী-পুত্র লইয়া কত জায়গায় ঘুরিয়াছে, কত চরে জঙ্গলে বন কাটিয়া কতবার ঘরদোর বাঁধিয়াছে। কোথাও তিন বছর, কোথাও পাঁচ বছর, এক জায়গায় কুশী নদীর ধারে ছিল দশ বছর। কোথাও উন্নতি করিতে পারে নাই। এইবার লবটুলিয়া বইবারে আসিয়াছে উন্নতি করিতে।

এইসব যাযাবর গৃহস্থজীবন বড় বিচিত্র। কথা বলিয়া দেখিয়াছি ইহাদের সঙ্গে, সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত, ব্রাত্য ইহাদের জীবন—সমাজ নাই, সংসার নাই, ভিটার মায়া নাই, নীল আকাশের নীচে সংসার রচনা করিয়া, বনে, শৈলশ্রেণীর মধ্যস্থ উপত্যকায়, বড় নদীর নির্জন চরে ইহাদের বাস। আজ এখানে, কাল সেখানে।

ইহাদের প্রেম-বিরহ, জীবন-মৃত্যু সবই আমার কাছে নূতন ও অদ্ভুত। কিন্তু

সকলের চেয়ে অদ্ভুত লাগিল বর্তমানে এই লোকটির উন্নতির আশা।

এই লবটুলিয়ার জঙ্গলে সামান্য পাঁচ বিঘা কি দশ বিঘা জমিতে গম চাষ করিয়া সে কিরূপ উন্নতির আশা করে বুঝিয়া উঠা কঠিন।

লোকটির বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে। নাম বলভদ্র সেঙ্গাই, জাতে চাষা কলোয়ার অর্থাৎ কলু। এই বয়সে সে এখনও আশা রাখে জীবনে উন্নতি করিবার।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বলভদ্র, এর আগে কোথায় ছিলে?

—হুজুর, মুঙ্গের জেলায় এক দিয়ারার চরে। দু-বছর সেখানে ছিলাম—তারপরে অজন্মা হয়ে মকাই ফসল নষ্ট হয়ে গেল। সে-জায়গায় উন্নতি হবার আশা নেই দেখলাম। হুজুর, সংসারে সবাই উন্নতি করবার জন্যে চেষ্টা পায়। এইবার দেখি হুজুরের আশ্রয়ে—

রাজু পাঁড়ে বলিল—আমার ছ'টা মহিষ ছিল যখন প্রথম এখানে আসি—এখন হয়েছে দশটা। লবটুলিয়া উন্নতির জায়গা—

বলভদ্র বলিল—মহিষ আমায় একজোড়া কিনে দিও পাঁড়েজী। এবার ফসল হোক, সেই টাকা দিয়ে মহিষ কিনতেই হবে—ও ভিন্ন উন্নতি হয় না।

গনোরী ইহাদের কথা শুনিতেছিল। সেও বলিল—ঠিক কথা। আমারও ইচ্ছে আছে মহিষ দু-একটা কিনব। একটু কোথাও বসতে পারলেই—

মহালিখারূপের পাহাড়ের গাছপালা এবং তাহারও পিছনে ধন্‌ঝরি শৈলমালা অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে জ্যোৎস্নার আলোয়, একটু একটু শীত বলিয়া ছোট একটি অগ্নিকুণ্ড করা হইয়াছে আমাদের সামনে—এক দিকে রাজু পাঁড়ে ও যুগলপ্রসাদ, অন্য দিকে বলভদ্র ও তিন-চারটি নবাগত প্রজা।

আমার কাছে কি অদ্ভুত ঠেকিতেছিল ইহাদের বৈষয়িক উন্নতির কথা। উন্নতি সম্বন্ধে ইহাদের ধারণা অভাবনীয় ধরনের উচ্চ নয়—ছ'টি মহিষের স্থানে দশটা মহিষ না-হয় বারোটা মহিষ—এই সুদূর দুর্গম অরণ্য ও শৈলমালা বেষ্টিত বন্য দেশেও মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কেমন, জানিবার সুযোগ পাইয়া আজকার জ্যোৎস্না-রাতটাই আমার নিকট অপূর্ব রহস্যময় মনে হইল। শুধু জ্যোৎস্না-রাত কেন, মহালিখারূপের ঐ পাহাড়, দূরে ওই ধন্‌ঝরি শৈলমালা, ঐ পাহাড়ের উপরকার ঘন বনশ্রেণী।

কেবল যুগলপ্রসাদ এ-সব বৈষয়িক কথাবার্তায় থাকে না। ও আর এক ধরনের ব্রাত্য মন লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে—জমি-জমা, গরু-মহিষের আলোচনা করিতে ভালও বাসে না, তাহাতে যোগও দেয় না।

সে বলিল—সরস্বতী কুণ্ডীর পূব পাড়ের জঙ্গলে যতগুলো হংসলতা লাগিয়েছিলাম, সবগুলো কেমন ঝাঁপালো হয়ে উঠেছে দেখেছেন বাবুজী? এবার জলের ধারে স্পাইডার-লিলির বাহারও খুব। চলুন, যাবেন জ্যোৎস্নারাতে বেড়াতে?

দুঃখ হয়, যুগলপ্রসাদের এত সাধের সরস্বতী কুণ্ডীর বনভূমি—কত দিন বা রাখিতে পারিব? কোথায় দূর হইয়া যাইবে হংসলতা আর বন্য শেফালি-বন! তাহার স্থানে দেখা দিবে শীর্ষ-ওঠা মকাই ও জনারের ক্ষেত এবং সারি সারি খোলা-ছাওয়া ঘর, চালে চালে ঠেকানো, সামনে চারপাই পাতা।...কাদা-হাবড় আঙিনায় গরু-মহিষ নাদায় জাব খাইতেছে।

এই সময় মটুকনাথ পণ্ডিত আসিল। আজকাল মটুকনাথের টোলে প্রায় পনেরটি ছাত্র কলাপ ও মুগ্ধবোধ পড়ে। তাহার অবস্থা আজকাল ফিরিয়া গিয়াছে। গত ফসলের সময়

যজমানদের ঘর হইতে এত গম ও মকাই পাইয়াছে যে, টোলের উঠানে তাহাকে একটা ছোট গোলা বাঁধিতে হইয়াছে।

অধ্যবসায়ী লোকের উন্নতি যে হইতেই হইবে—মটুকনাথ পণ্ডিত তাহার অকাট্য প্রমাণ।

উন্নতি!—আবার সেই উন্নতির কথা আসিয়া পড়িল।

কিন্তু উন্নতির কথা না আসিয়া উপায় নাই। চোখের ওপর দেখিতে পাইতেছি মটুকনাথ উন্নতি করিয়াছে বলিয়াই তাহার আজকাল খুব খাতির-সম্মান—আমার কাছারির যে-সব সিপাহী ও আমলা মটুকনাথকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিত—গোলা বাঁধার পর হইতে আমি লক্ষ্য করিতেছি তাহারা মটুকনাথকে সম্মান ও খাতির করিয়া চলে। সঙ্গে সঙ্গে টোলের ছাত্রসংখ্যাও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ যুগলপ্রসাদ বা গনোরী তেওয়ারীকে কেউ পোঁছেও না। রাজু পাঁড়েও নবাগত প্রজাদের মধ্যে খুব খাতির জমাইয়া ফেলিয়াছে—জড়িবুটির পুটুলি হাতে তাহাকে প্রায়ই দেখা যায় গৃহস্থবাড়ীর ছেলেমেয়েদের নাড়ী টিপিয়া বেড়াইতেছে। তবে রাজু পাঁড়ে পয়সা তেমন বোঝে না, খাতির পাইয়া ও গল্প করিয়াই সন্তুষ্ট।

৪

মাস তিন-চারের মধ্যে মহালিখারূপের পাহাড়ের কোল হইতে লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারের উত্তর সীমানা পর্যন্ত প্রজা বসিয়া গেল। পূর্বে জমি বিলি হইয়া চাষ আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু লোকের বাস এত হয় নাই—এ বছর দলে দলে লোক আসিয়া রাতারাতি গ্রাম বসাইয়া ফেলিতে লাগিল।

কত ধরনের পরিবার। শীর্ণ টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বিছানাপত্র, বাসন, পিতলের ঘয়লা, কাঠের বোঝা, গৃহদেবতা, তোলা উনুন চাপাইয়া একটি পরিবারকে আসিতে দেখা গেল। মহিষের পিঠে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, হাঁড়ি-কুড়ি, ভাঙা লণ্ঠন, এমন কি চারপাই পর্যন্ত চাপাইয়া আর এক পরিবার আসিল। কোনো কোনো পরিবারে স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া জিনিসপত্র ও শিশুদের বাঁকের দু-দিকে চাপাইয়া বাঁক কাঁধে বহুদূর হইতে হাঁটিযা আসিতেছে।

ইহাদের মধ্যে সদাচারী, গর্বিত মৈথিল ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া গাঙ্গোতা ও দোসাদ পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরের লোকই আছে। যুগলপ্রসাদ মুহুরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এরা কি এতদিন গৃহহীন অবস্থায় ছিল? এত লোক আসছে কোথা থেকে?

যুগলপ্রসাদের মন ভাল নয়। বলিল—এদেশের লোকই এই রকম। শুনেছে এখানে জমি সস্তায় বিলি হচ্ছে—তাই দলে দলে আসছে। সুবিধে বোঝে থাকবে, নয়তো আবার ডেরা উঠিয়ে অন্য জায়গায় ভাগবে।

—পিতৃপিতামহের ভিটের কোনো মায়া নেই এদের কাছে?

—কিছু না বাবুজী। এদের উপজীবিকাই হচ্ছে নূতন-ওঠা চর বা জঙ্গলমহাল বন্দোবস্ত নিয়ে চাষবাস করা। বাস করাটা আনুষঙ্গিক। যতদিন ফসল ভাল হবে, খাজনা কম থাকবে, ততদিন থাকবে।

—তার পর?

—তার পর খোঁজ নেবে অন্য কোথায় নূতন চর বা জঙ্গল বিলি হচ্ছে, সেখানে চলে যাবে। এদের ব্যবসাই এই।

৫

সেদিন গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের নীচে জমি মাপিয়া দিতে গিয়াছি, আস্‌রফি টিণ্ডেল জমি মাপিতেছিল, আমি ঘোড়ার উপর বসিয়া দেখিতেছিলাম, এমন সময় কুন্তাকে টোলার পথ ধরিয়া যাইতে দেখিলাম।

কুন্তাকে অনেক দিন দেখি নাই। আস্‌রফিকে বলিলাম—কুন্তা আজকাল কোথায় থাকে, ওকে দেখিনে তো?

আস্‌রফি বলিল—ওর কথা শোনেন নি বাবুজী? ও মধ্যে এখানে ছিল না অনেক দিন—

—কি রকম?

—রাসবিহারী সিং ওকে নিয়ে যায় তার বাড়ী। বলে, তুমি আমাদের জাতভাইয়ের স্ত্রী—আমার এখানে এসে থাক—

—বেশ।

—সেখানে কিছুদিন থাকবার পরে—ওর চেহারা দেখেছেন তো বাবুজী, এত দুঃখে-কষ্টে এখনও—তার পর রাসবিহারী সিং কি-সব কথা ওকে বলে—এমন কি ওর ওপর অত্যাচারও করতে যায়—তাই আজ মাসখানেক হ'ল সেখান থেকে পালিয়ে এসে আছে। শুনি রাসবিহারী ছোরা নিয়ে ভয় দেখায়। ও বলেছিল,—মের ফেল বাবুজী, জান্ দেগা—ধরম দেগা নেহিন্।

—কোথায় থাকে?

—ঝল্লুটোলায় এক গাঙ্গোতার বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের গোয়ালঘরের পাশে একখানা ছোট্ট চালা আছে সেখানেই থাকে।

—চলে কি করে? ওর তো দু-তিনটে ছেলেমেয়ে?

—ভিক্ষে করে—ক্ষেতের ফসল কুড়োয়। কলাই গম কাটে। বড় ভাল মেয়ে বাবু কুন্তা। বাইজীর মেয়ে ছিল বটে, কিন্তু ভাল ঘরের মেয়ের মত মন-মেজাজ—কোন অসৎ কাজ ওকে দিয়ে হবে না।

জরীপ শেষ হইল। বালিয়া জেলার একটি প্রজা এই জমি বন্দোবস্ত লইয়াছে—কাল হইতে এখানে সে বাড়ী বাঁধিবে। গ্র্যাণ্ট সাহেবের বটগাছের মহিমাও ধ্বংস হইল।

মহালিখারূপের পাহাড়ে উপরকার বড় বড় গাছপালার মাথায় রোদ রাঙা হইয়া আসিল। সিল্লীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর দিকে উড়িয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার আর দেরি নাই।

একটা কথা ভাবিলাম।

এতটুকু জমি কোথাও থাকিবে না এই বিশাল লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারে, যেমন দেখিতেছি। দলে দলে অপরিচিত লোক আসিয়া জমি লইয়া ফেলিল—কিন্তু এই আরণ্য-ভূমিতে যাহারা চিরকাল মানুষ, অথচ যাহারা নিঃস্ব, হতভাগ্য—জমি বন্দোবস্ত লইবার পয়সা নাই বলিয়াই কি তাহারা বঞ্চিত থাকিবে? যাহাদের ভালবাসি, তাহাদের অন্তত

এতটুকু উপকার করিবই।

আস্‌রফিকে বলিলাম—আস্‌রফি, কুন্তাকে কাল সকালে কাছারিতে হাজির করতে পারবে? ওকে একটু দরকার আছে।

—হাঁ হুজুর, যখন বলবেন।

পরদিন সকালে কুন্তাকে আস্‌রফি আমার আপিস-ঘরের সামনে বেলা ন'টার সময় লইয়া আসিল।

বলিলাম—কুন্তা, কেমন আছ?

কুন্তা আমায় দুই হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—জী হুজুর, ভাল আছি।

—তোমার ছেলেমেয়েরা?

—ভাল আছে হুজুরের দোয়ায়।

—বড় ছেলেটি কত বড় হল?

—এই আট বছরে পড়েছে, হুজুর।

—মহিষ চরাতে পারে না?

—অতটুকু ছেলেকে কে মহিষ চরাতে দেবে, হুজুর?

কুন্তা সত্যই এখনও দেখিতে বেশ, ওর মুখে অসহায় জীবনের দুঃখকষ্ট যেমন ছাপ মারিয়া দিয়াছে—সাহস ও পবিত্রতাও তেমনি তাদের দুর্লভ জয়চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে।

এই সেই কাশীর বাঈজীর মেয়ে, প্রেমবিহ্বলা কুন্তা।...প্রেমের উজ্জ্বল বর্তিকা এই দুঃখিনী রমণীর হাতে এখনও সগৌরবে জ্বলিতেছে, তাই ওর এত দুঃখ, দৈন্য, এত হেনস্থা, অপমান। প্রেমের মান রাখিয়াছে কুন্তা।

বলিলাম—কুন্তা, জমি নেবে?

কুন্তা কথাটি ঠিক শুনিয়াছে কিনা যেন বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত মুখে বলিল —জমি, হুজুর?

—হাঁ, জমি। নূতন-বিলি জমি।

কুন্তা একটুখানি কি ভাবিল। পরে বলিল—আগে তো আমাদেরই কত জোতজমা ছিল। প্রথম প্রথম এসে দেখেছি। তার পর সব গেল একে একে। এখন আর কি দিয়ে জমি নেব, হুজুর?

—কেন, সেলামীর টাকা দিতে পারবে না?

—কোথা থেকে দেব? রাত্তির ক'রে ক্ষেত থেকে ফসল কুড়োই, পাছে দিনমানে কেউ অপমান করে। আধ টুক্‌রি এক টুক্‌রি কলাই পাই—তাই গুঁড়ো ক'রে ছাতু ক'রে বাচ্ছাদের খাওয়াই। নিজে খেতে সব দিন কুলোয় না—

কুন্তা কথা বন্ধ করিয়া চোখ নীচু করিল। দুই চোখ বাহিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

আস্‌রফি সরিয়া গেল। ছোকরার হৃদয় কোমল, এখনও পরের দুঃখ ভাল রকম সহ্য করিতে পারে না।

আমি বলিলাম—কুন্তা, আচ্ছা ধর যদি সেলামী না লাগে?

কুন্তা চোখ তুলিয়া জলভরা বিস্মিত চোখে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আস্‌রফি তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কুন্তার সামনে হাত নাড়িয়া বলিল—হুজুর

তোমায় এমনি জমি দেবেন, এমনি জমি দেবেন—বুঝলে না দাইজী ?

আস্‌রফিকে বলিলাম—ওকে জমি দিলে ও চাষ করবে কি ক'রে আস্‌রফি ?

আস্‌রফি বলিল—সে বেশী কঠিন কথা নয় হুজুর। ওকে দু-একখানা লাঙল দয়া ক'রে সবাই ভিক্ষে দেবে। এত ঘর গাঙ্গোতা প্রজা, একখানা লাঙল ঘরপিছু দিলেই ওর জমি চাষ হয়ে যাবে। আমি সে-ভার নেব, হুজুর।

—আচ্ছা, কত বিঘে হ'লে ওর হয়, আস্‌রফি ?

—দিচ্ছেন যখন মেহেরবানি ক'রে হুজুর, দশ বিঘে দিন।

কুন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুন্তা, কেমন, দশ বিঘে জমি যদি তোমায় বিনা সেলামীতে দেওয়া যায়—তুমি ঠিকমত চাষ ক'রে ফসল তুলে কাছারির খাজনা শোধ করতে পারবে তো ? অবিশ্যি প্রথম দু-বছর তোমার খাজনা মাপ। তৃতীয় বছর থেকে খাজনা দিতে হবে।

কুন্তা যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাহাকে লইয়া ঠাট্টা করিতেছি, না সত্য কথা বলিতেছি—ইহাই যেন সে এখনও সমঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

কতকটা দিশাহারা ভাবে বলিল—জমি ! দশ বিঘে জমি !

আস্‌রফি আমার হইয়া বলিল—হাঁ, হুজুর তোমায় দিচ্ছেন ! খাজনা এখন দু-বছর মাপ। তীস্‌রা সাল থেকে খাজনা দিও। কেমন, রাজী ?

কুন্তা লজ্জাজড়িত মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—জী হুজুর মেহেরবান। পরে হঠাৎ বিহ্বলার মত কাঁদিয়া ফেলিল।

আমার ইঙ্গিতে আস্‌রফি তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

## সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

### ১

সন্ধ্যার পরে লবটুলিয়ার নূতন বস্তিগুলি দেখিতে বেশ লাগে। কুয়াশা হইয়াছে বলিয়া জ্যোৎস্না একটু অস্পষ্ট, বিস্তীর্ণ প্রান্তরব্যাপী কৃষিক্ষেত্র, দূরে দূরে দু-পাঁচটা আলো জ্বলিতেছে বিভিন্ন বস্তিতে। কত লোক, কত পরিবার অন্নের সংস্থান করিতে আসিয়াছে আমাদের মহালে—বন কাটিয়া গ্রাম বসাইয়াছে, চাষ আরম্ভ করিয়াছে। আমি সব বস্তির নামও জানি না, সকলকে চিনিও না। কুয়াশাবৃত জ্যোৎস্নালোকে এখানে ওখানে দূরে নিকটে ছড়ানো বস্তিগুলি কেমন রহস্যময় দেখাইতেছে। যে-সব লোক এই সব বস্তিতে বাস করে, তাহাদের জীবনও আমার কাছে এই কুয়াশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রির মত রহস্যাবৃত। ইহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি—জীবন সম্বন্ধে ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী, ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী আমার বড় অদ্ভুত লাগে।

প্রথম ধরা যাক্ ইহাদের খাদ্যের কথা। আমাদের মহালের জমিতে বছরে তিনটি খাদ্যশস্য জন্মায়—ভাদ্র মাসে মকাই, পৌষ মাসে কলাই এবং বৈশাখ মাসে গম। মকাই খুব বেশী হয় না, কারণ ইহার উপযুক্ত জমি বেশী নাই। কলাই ও গম যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, কলাই বেশী, গম তাহার অর্ধেক। সুতরাং লোকের প্রধান খাদ্য কলাইয়ের ছাতু।

ধান একেবারেই হয় না—ধানের উপযুক্ত নাবাল-জমি নাই। এ অঞ্চলের কোথাও—

এমন কি ক্ড়ারী জমিতে কিংবা গবর্ণমেণ্ট খাসমহালেও ধান হয় না। ভাত জিনিসটা সুতরাং এখানকার লোকে কালেভদ্রে খাইতে পায়—ভাত খাওয়াটা শখের বা বিলাসিতার ব্যাপার বলিয়া গণ্য। দু-চারজন খাদ্যবিলাসী লোক গম বা কলাই বিক্রয় করিয়া ধান কিনিয়া আনে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়।

তারপর ধরা যাক্ ইহাদের বাসগৃহের কথা। এই যে আমাদের মহালের দশ হাজার বিঘা জমিতে অগণ্য গ্রাম বসিয়াছে—সব গৃহস্থের বাড়ীই জঙ্গলের কাশ ছাওয়া, কাশ-ডাঁটার বেড়া, কেহ কেহ তাহার উপর মাটি লেপিয়াছে, কেহ কেহ তাহা করে নাই। এদেশে বাঁশগাছ আদৌ নাই, সুতরাং বনের গাছের, বিশেষ করিয়া কেঁদ ও পিয়াল ডালের বাতা, খুঁটি ও আড়া দিয়াছে ঘরে।

ধর্মের কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই। ইহারা যদিও হিন্দু, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে ইহারা হনুমানজীকে কি করিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে জানি না—প্রত্যেক বস্তীতে একটা উঁচু হনুমানজীর ধ্বজা থাকিবেই—এই ধ্বজার রীতিমত পূজা হয়, ধ্বজার গায়ে সিঁদুর লেপা হয়। রাম-সীতার কথা কচিৎ শোনা যায়, তাঁহাদের সেবকের গৌরব তাঁহাদের দেবত্বকে একটু বেশী আড়ালে ফেলিয়াছে। বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজার প্রচার তত নাই—আদৌ আছে কিনা সন্দেহ, অন্ততঃ আমাদের মহালে তো আমি দেখি নাই।

ভুলিয়া গিয়াছি, একজন শিবভক্ত দেখিয়াছি বটে। তার নাম দ্রোণ মাহাতো, জাতিতে গাঙ্গোতা। কাছারিতে কোথা হইতে কে একটা শিলাখণ্ড আনিয়া আজ নাকি দশ-বারো বছর কাছারির হনুমানজীর ধ্বজার নীচে রাখিয়া দিয়াছে—সিপাহীরা মাঝে মাঝে পাথর-খানাতে সিঁদুর মাখায়, এক ঘটি জলও কেউ কেউ দেয়। কিন্তু পাথরখানা বেশীর ভাগ অনাদৃত অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে।

কাছারির কিছুদূরে একটা নূতন বস্তি আজ মাস-দুই গড়িয়া উঠিয়াছে—দ্রোণ মাহাতো সেখানে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। দ্রোণের বয়স সত্তরের বেশী ছাড়া কম নয়—প্রাচীন লোক বলিয়াই তাহার নাম দ্রোণ, আধুনিক কালের ছেলে-ছোকরা হইলে নাকি নাম হইত ডোমন, লোধাই, মহারাজ ইত্যাদি। এসব বাবুগিরি নাম সেকালে বাপ-মায়ে রাখিতে লজ্জাবোধ করিত।

যাহা হউক, বৃদ্ধ দ্রোণ একবার কাছারি আসিয়া হনুমান-ধ্বজার নীচে পাথরখানা লক্ষ্য করিল। তারপর হইতে বৃদ্ধ কল্‌বলিয়া নদীতে প্রাতঃস্নান করিয়া এক ঘটি জল প্রত্যহ আনিয়া নিয়মিতভাবে পাথরের উপরে ঢালিত ও সাতবার পরম ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তবে বাড়ী ফিরিত।

দ্রোণকে বলিয়াছিলাম—কল্‌বলিয়া তো এক ক্রোশ দূর, রোজ যাও সেখানে, তার চেয়ে ছোট কুণ্ডীর জল আনলেই পার—

দ্রোণ বলিল—মহাদেওজী স্রোতের জলে তুষ্ট থাকেন, বাবুজী। আমার জন্ম সার্থক যে ওঁকে রোজ জল দিয়ে স্নান করাতে পাই।

ভক্তও ভগবানকে গড়ে। দ্রোণ মাহাতোর শিবপূজার কাহিনী লোকমুখে বিভিন্ন বস্তিতে ছড়াইয়া পড়িতেই মাঝে মাঝে দেখি দু-পাঁচজন শিবের পূজারী নর-নারী যাতায়াত শুরু করিল। এ অঞ্চলে এক ধরনের সুগন্ধ ঘাস জঙ্গলে উৎপন্ন হয়, ঘাসের পাতা বা ডাঁটা হাতে লইয়া আঘ্রাণ লইলে চমৎকার সুবাস পাওয়া যায়। ঘাস যত শুকায়,

গন্ধ তত তীব্র হয়। কে একজন সেই ঘাস আনিয়া শিবঠাকুরের চারিধারে রোপণ করিল। একদিন মটুকনাথ পণ্ডিত আসিয়া বলিল—বাবুজী, একজন গাঙ্গোতা কাছারির শিবের মাথায় জল ঢালে, এটা কি ভাল হচ্ছে?

বলিলাম—পণ্ডিতজী, সেই গাঙ্গোতাই ওই ঠাকুরটিকে লোক-সমাজে প্রচার করেছে যতদূর দেখতে পাচ্ছি। কই তুমিও তো ছিলে, এক ঘটি জল তো কোনদিন দিতে দেখি নি তোমায়।

রাগের মাথায় খেই হারাইয়া মটুকনাথ বলিয়া বসিল—ও শিবই নয় বাবুজী। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা না করলে পুজো পাওয়ার যোগ্য হয় না। ও তো একখানা পাথরের নুড়ি।

—তবে আর বলছ কেন? পাথরের নুড়িতে জল দিলে তোমার আপত্তি কি?

সেই হইতে দ্রোণ মাহাতো কাছারির শিবলিঙ্গের চার্টার্ড পূজারী হইয়া গেল।

কার্তিক মাসে ছট্-পরব এদেশের বড় উৎসব। বিভিন্ন টোলা হইতে মেয়েরা হলুদ-ছোপানো শাড়ী পরিয়া দলে দলে গান করিতে করিতে কল্‌বলিয়া নদীতে ছট্ ভাসাইতে চলিয়াছে। সারাদিন উৎসবের ধুম। সন্ধ্যায় বস্তিগুলির কাছ দিয়া যাইতে যাইতে ছট্-পরবের পিঠে ভাজার ভরপুর গন্ধ পাওয়া যায়। কত রাত পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের হাসি-কলরব, মেয়েদের গান—যেখানে নীল গাইয়ের জেরা গভীর রাত্রে দৌড়িয়া যাইত, হায়েনার হাসি ও বাঘের কাশি (অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন, বাঘে অবিকল মানুষের গলায় কাশির মত এক প্রকার শব্দ করে) শোনা যাইত—সেখানে আজ কলহাস্যমুখরিত, গীতিরবপূর্ণ উৎসব-দীপ্ত এক বিস্তীর্ণ জনপদ।

ছট্-পরবের সন্ধ্যায় ঝল্লুটোলায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। শুধু এই এক টোলায় নয়—পনেরোটি বিভিন্ন টোলা হইতে ছট্-পরবের নিমন্ত্রণ পাইয়াছে কাছারি-সুদ্ধ সকল আমলা!

ঝল্লুটোলার মোড়ল ঝল্লু মাহাতোর বাড়ী গেলাম প্রথমে।

ঝল্লু মাহাতোর বাড়ীর এক পাশে দেখি এখনও জঙ্গল কিছু কিছু আছে। ঝল্লু উঠানে এক ছেঁড়া সামিয়ানা টাঙাইয়াছে—তাহারই তলায় আমাদের আদর করিয়া বসাইল। টোলার সকল লোক ফর্সা ধুতি ও মেরজাই পরিয়া সেখানে ঘাসে-বোনা একজাতীয় মাদুরের আসনে বসিয়া আছে। বলিলাম—খাইবার অনুরোধ রাখিতে পারিব না, কারণ অনেক স্থানে যাইতে হইবে।

ঝল্লু বলিল—একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে। মেয়েরা নইলে বড় ক্ষুণ্ণ হবে, আপনি পায়ের ধুলো দেবেন বলে ওরা বড় উৎসাহ ক'রে পিঠে তৈরি করেছে।

উপায় নাই। গোষ্ঠবাবু মহুরী, আমি ও রাজু পাঁড়ে বসিয়া গেলাম। শালপাতায় কয়েকখানি আটা ও গুড়ের পিঠে আসিল—এক-একখানি পিঠে এক ইঞ্চি পুরু ইটের মত শক্ত, ছুঁড়িয়া মারিলে মানুষ মরিয়া না গেলেও দস্তুরমত জখম হয়। অথচ প্রত্যেক-খানা পিঠে ছাঁচে ফেলা চন্দ্রপুলির মত বেশ লতাপাতা কাটা। ছাঁচে ফেলিবার পরে তবে ঘিয়ে ভাজা হইয়াছে।

অত যত্নে মেয়েদের হাতে তৈরি পিষ্টকের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না। আধখানা অতিকষ্টে খাইয়াছিলাম। না মিষ্টি, না কোনো স্বাদ। বুঝিলাম গাঙ্গোতা মেয়েরা খাবার-দাবার তৈরি করিতে জানে না। রাজু পাঁড়ে কিন্তু চার-পাঁচখানা সেই বড় বড় পিঠে দেখিতে দেখিতে খাইয়া ফেলিল এবং আমাদের সামনে চক্ষুলজ্জাবশতই বোধ হয় আর

চাহিতে পারিল না।

ঝল্লুটোলা হইতে গেলাম লোধাইটোলা। তারপর পর্বতটোলা, ভীমদাসটোলা, আস্‌রাফিটোলা, লছমনিয়াটোলা। প্রত্যেক টোলায় নাচগান, হাসি-বাজনার ধুম। আজ সারারাত ইহারা ঘুমাইবে না। এ-বাড়ী ও-বাড়ী খাওয়া-দাওয়া করিয়া নাচ-গান করিয়াই কাটাইয়া দিবে।

একটি ব্যাপার দেখিয়া আনন্দ হইল, মেয়েরা সব টোলাতেই যত্ন করিয়া নাকি খাবার তৈরি করিয়াছে আমাদের জন্য। ম্যানেজারবাবু নিমন্ত্রণে আসিবেন শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের ও যত্নের সহিত নিজেদের চরম রন্ধন-কৌশল প্রদর্শন করিয়া পিষ্টক গড়িয়াছে। মেয়েদের সহৃদয়তার জন্য মনে মনে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইলেও তাহাদের রন্ধন-বিদ্যার প্রশংসা করিয়া উঠিতে পারিলাম না, ইহা আমার পক্ষে খুবই দুঃখের বিষয়। ঝল্লুটোলার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর পিষ্টকের সহিতও স্থানে স্থানে পরিচয় ঘটিল।

সব জায়গায়ই দেখি রঙীন শাড়ী-পরা মেয়েরা কৌতূহলপূর্ণ চোখে আড়াল হইতে ভোজনরত বাংগালী বাবুদের দিকে চাহিয়া আছে। রাজু পাঁড়ে কাহাকেও মনে কষ্ট দিল না—পিষ্টক ভক্ষণের সীমা অতিক্রম করিয়া রাজু পাঁড়ে ক্রমশ অসীমের দিকে চলিতে লাগিল দেখিয়া আমি গণনার হাল ছাড়িয়া দিলাম—সুতরাং সে কয়খানা পিষ্টক খাইয়াছিল বলিতে পারিব না।

শুধু রাজু কেন—নিমন্ত্রিত গাঙ্গোতাদের মধ্যে সেই ইটের মত কঠিন পিষ্টক এক-একজন এক কুড়ি দেড় কুড়ি করিয়া খাইল—চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত যে সেই জিনিস মানুষে অত খাইতে পারে।

নাঢ়া বইহারে ছনিয়া ও সুরতিয়াদের ওখানেও গেলাম।

সুরতিয়া আমায় দেখিয়া ছুটিয়া আসিল।

—বাবুজী, এত রাত ক'রে ফেললেন? আমি আর মা দুজনে ব'সে আপনার জন্যে আলাদা ক'রে পিঠে গড়েছি—আমরা হাঁ ক'রে বসে আছি আর ভাবছি এত দেরি হচ্ছে কেন—আসুন, বসুন।

নক্‌ছেদী সকলকে খাতির করিয়া বসাইল।

তুলসীকে খুব যত্ন করিয়া খাইবার আসন করিতে দেখিয়া মনে মনে হাসিলাম। ইহাদের এখানে খাইবার অবস্থা কি আর আছে?

সুরতিয়াকে বলিলাম—তোমার মাকে বল পিঠে তুলে নিতে। এত কে খাবে?

সুরতিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ও কি বাবুজী, এই ক'খানা খাবেন না? আমি আর ছনিয়াই তো পনর-ষোলখানা ক'রে খেয়েছি। খান—আপনি খাবেন ব'লে ওর ভেতরে মা কিশমিশ দিয়েছে, দুধ দিয়েছে—ভাল আটা এনেছে বাবা ভীমদাসটোলা থেকে—

খাইব না বলিয়া ভাল করি নাই। সারাবছর এই বালক-বালিকা এ-সব সুখাদ্যের মুখ দেখিতে পায় না। এদের কত কষ্টের, কত আশার জিনিস! ছেলেমানুষকে খুশি করিবার জন্য মরীয়া হইয়া দুইখানা পিষ্টক খাইয়া ফেলিলাম।

সুরতিয়াকে খুশি করিবার জন্য বলিলাম—চমৎকার পিঠে। কিন্তু সব জায়গায় কিছু কিছু খেয়েছি ব'লে খেতে পারলুম না সুরতিয়া। আর একদিন এসে হবে এখন।

রাজু পাঁড়ের হাতে একটা ছোটখাটো বোঁচকা। সে প্রত্যেকের বাড়ী হইতে ছাঁদা

বাঁধিয়াছে, এক-একখানি পিষ্টকের ওজন বিবেচনা করিলে রাজুর বোঁচকার ওজন দশ-বারো সেরের কম তো কোনমতেই হইবে না।

রাজু খুব খুশি। বলিল—এ পিঠে হঠাৎ নষ্ট হয় না হুজুর, দু-তিন দিন আর আমায় রাঁধতে হবে না। পিঠে খেয়েই চলবে।

কাছারিতে পরদিন সকালে কুন্তা একখানি পিতলের থালা লইয়া আসিয়া আমার সামনে সসঙ্কোচে স্থাপন করিল। এক টুকরা ফর্সা নেকড়া দিয়া থালাখানা ঢাকা।

বলিলাম—ওতে কি কুন্তা?

কুন্তা সলজ্জ কণ্ঠে বলিল—ছট্-পরবের পিঠে বাবুজী। কাল রাত্রে দু-বার নিয়ে এসে ফিরে গিয়েছি।

বলিলাম—কাল অনেক রাত্রে ফিরেছি, ছট্-পরবের নেমন্তন্ন রাখতে বেরিয়েছিলাম। আচ্ছা রেখে দাও, খাব এখন।

ঢাকা খুলিয়া দেখি, থালায় কয়েকখানি পিষ্টক, কিছু চিনি, দুটি কলা, একখণ্ড ঝুনা নারিকেল, একটা কমলালেবু।

বলিলাম—বাঃ, বেশ পিঠে দেখছি!

কুন্তা পূর্ববৎ মৃদুস্বরে সসঙ্কোচে বলিল—বাবুজী, সবগুলো মেহেরবানি ক'রে খাবেন। আপনি খাবেন ব'লে আলাদা ক'রে তৈরি করেছি। তবুও আপনাকে গরম খাওয়াতে পারলাম না, বড় দুঃখ রইল।

—কিছু হয় নি তাতে, কুন্তা। আমি সবগুলো খাব। দেখতে বড় চমৎকার দেখাচ্ছে।

কুন্তা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

২

একদিন মুনেশ্বর সিং সিপাহী আসিয়া বলিল—হুজুর, ওই বনের মধ্যে গাছের নীচে একটা লোক ছেঁড়া কাপড় পেতে শুয়ে আছে—লোকজনে তাকে বস্তিতে ঢুকতে দেয় না—ঢিল ছুঁড়ে মারে, আপনি হুকুম করেন তো তাকে নিয়ে আসি।

কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। বৈকাল বেলা, সন্ধ্যার বেশী দেরি নাই, শীত তেমন না হইলেও কার্তিক মাস, রাত্রে যথেষ্ট শিশির পড়ে, শেষরাত্রে বেশ ঠাণ্ডা। এ অবস্থায় একটা লোক বনের মধ্যে গাছের তলায় আশ্রয় লইয়াছে কেন, লোকে তাকে ঢিল ছুঁড়িয়াই বা মারে কেন বুঝিতে পারিলাম না।

গিয়া দেখি গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের ওদিকে (আজ প্রায় ত্রিশ বছর আগে গ্র্যান্ট সাহেব আমীন লবটুলিয়ার বন্য মহাল জরীপ করিতে আসিয়া এই বটতলায় তাঁবু ফেলেন, সেই হইতেই গাছটির এই নাম চলিয়া আসিতেছে) একটা বনঝোপে একটা অর্জুন গাছের তলায় একটা লোক ছেঁড়া ময়লা নেকড়াকানি পাতিয়া শয্যা রচনা করিয়া শুইয়া আছে। ঝোপের অন্ধকারে লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে না পাইয়া বলিলাম—কে ওখানে? বাড়ী কোথায়? বের হয়ে এস—

লোকটি বাহির হইয়া আসিল—অনেকটা হামাগুড়ি দিয়া, অতি ধীরে ধীরে— বয়স পঞ্চাশের উপর, জীর্ণশীর্ণ চেহারা, মলিন ছেঁড়া কাপড় ও মেরজাই গায়ে,—যতক্ষণ সে ঝোপের ভিতর হইতে বাহির হইতেছিল, কি একরকম অদ্ভুত, অসহায় ভাবে শিকারীর

তাড়া-খাওয়া পশুর মত ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ছিল।

ঝোপের অন্ধকার হইতে দিনের আলোয় বাহির হইয়া আসিলে দেখিলাম, তাহার বাম হাতে ও বাম পায়ে ভীষণ ক্ষত। বোধ হয় সেই জন্য সে একবার বসিলে বা শুইলে হঠাৎ আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।

মুনেশ্বর সিং বলিল—হুজুর, ওর ওই ঘায়ের জন্যেই ওকে বস্তিতে ঢুকতে দেয় না—জল পর্যন্ত চাইলে দেয় না। ঢিল মারে, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়—

বোঝা গেল তাই এ লোকটা বনের পশুর মত বনঝোপের মধ্যেই আশ্রয় লইয়াছে এই হেমন্তের শিশিরার্দ্র রাত্রে।

বলিলাম—তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায়?

লোকটা আমায় দেখিয়া ভয়ে কেমন হইয়া গিয়াছে—ওর চোখে রোগকাতর ও ভীত, অসহায় দৃষ্টি। তা ছাড়া আমার পিছনে লাঠি হাতে মুনেশ্বর সিং সিপাহী। বোধ হয় সে ভাবিল, সে যে বনে আশ্রয় লইয়াছে তাহাতেও আমাদের আপত্তি আছে—তাহাকে তাড়াইয়া দিতেই আমি সিপাই সঙ্গে করিয়া সেখানে গিয়াছি।

বলিল—আমার নাম?...নাম হুজুর গিরধারীলাল, বাড়ী তিনটাঙা। পরক্ষণেই কেমন একটা অদ্ভুত সুরে—মিনতি, প্রার্থনা এবং বিকারের রোগীর অসঙ্গত আবদারের সুর এই কয়টি মিলাইয়া এক ধরনের সুরে বলিল—একটু জল খাব—জল—

আমি ততক্ষণে লোকটাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি। সেবার পৌষমাসের মেলায় ইজারাদার ব্রহ্মা মাহাতোর তাঁবুতে সেই যে দেখিয়াছিলাম—সেই গিরধারীলাল। সেই ভীত দৃষ্টি, সেই নম্র মুখের ভাব—

দরিদ্র, নম্র, ভীরু লোকদেরই কি ভগবান জগতে এত বেশী করিয়া কষ্ট দেন! মুনেশ্বর সিংকে বলিলাম—কাছারি যাও—চার-পাঁচজন লোক আর একটা চারপাই নিয়ে এস—

সে চলিয়া গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে গিরধারীলাল? আমি তোমায় চিনি। তুমি আমায় চিনতে পার নি? সেই সে সেবার ব্রহ্মা মাহাতোর তাঁবুতে মেলার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—মনে নেই? কোনো ভয় নেই। কি হয়েছে তোমার?

গিরধারীলাল ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হাত ও পা নাড়িয়া দেখাইয়া বলিল—হুজুর, কেটে গিয়ে ঘা হয়। কিছুতেই সে ঘা সারে না, যে যা বলে তাই করি—ঘা ক্রমেই বাড়ে। ক্রমে সকলে বললে—তোর কুষ্ঠ হয়েছে। সেই জন্য আজ চার-পাঁচ মাস এই রকম কষ্ট পাচ্ছি। বস্তির মধ্যে ঢুকতে দেয় না। ভিক্ষে ক'রে কোনো রকমে চালাই। রাত্রে কোথাও জায়গা দেয় না—তাই বনের মধ্যে ঢুকে শুয়ে থাকব বলে—

—কোথায় যাচ্ছিলে এদিকে? এখানে কি ক'রে এলে?

গিরধারীলাল এরই মধ্যে হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। একটু দম লইয়া বলিল—পূর্ণিয়ার হাসপাতালে যাচ্ছিলাম হুজুর—নইলে ঘা তো সারে না।

আশ্চর্য না হইয়া পারিলাম না। মানুষের কি আগ্রহ বাঁচিবার! গিরধারীলাল যেখানে থাকে, পূর্ণিয়া সেখান হইতে চল্লিশ মাইলের কম নয়—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মত শ্বাপদসঙ্কুল আরণ্যভূমি সামনে—ক্ষতে অবশ হাত-পা লইয়া সে চলিয়াছে এই দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলের পথ ভাঙিয়া পূর্ণিয়ার হাসপাতালে!

চারপাই আসিল। সিপাহীদের বাসার কাছে একটা খালি ঘরে উহাকে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিলাম। সিপাহীরাও কুষ্ঠ বলিয়া একটু আপত্তি তুলিয়াছিল, পরে বুঝাইয়া দিতে তাহারা বুঝিল।

গিরধারীলাল খুব ক্ষুধার্ত বলিয়া মনে হইল। অনেকদিন সে যেন পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। কিছু গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে সে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল।

সন্ধ্যার দিকে তাহার ঘরে গিয়া দেখি সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

পরদিন স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসক রাজু পাঁড়েকে ডাকাইলাম। রাজু গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীর নাড়ী দেখিল, ঘা দেখিল। রাজুকে বলিলাম—দেখ, তোমার দ্বারা হবে, না পূর্ণিয়ায় পাঠিয়ে দেব?

রাজু আহত অভিমানের সুরে বলিল—আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে হুজুর অনেক দিন এই কাজ করছি। পনের দিনের মধ্যে ঘা ভাল হয়ে যাবে।

গিরধারীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেই ভাল করিতাম, পরে বুঝিলাম। ঘায়ের জন্য নহে, রাজু পাঁড়ের জড়ি-বুটির গুণে পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই ঘায়ের চেহারা বদলাইয়া গেল—কিন্তু মুশকিল বাধিল তাহার সেবা-শুশ্রূষা লইয়া। তাহাকে কেহ ছুঁইতে চায় না, ঘায়ে ঔষধ লাগাইয়া দিতে চায় না, তাহার খাওয়া জলের ঘটিটা পর্যন্ত মাজিতে আপত্তি করে।

তাহার উপর বেচারীর হইল জ্বর। খুব বেশী জ্বর।

নিরুপায় হইয়া কুন্তাকে ডাকাইলাম। তাহাকে বলিলাম—তুমি বস্তি থেকে একজন গাঙ্গোতার মেয়ে ডেকে দাও, পয়সা দেব—ওকে দেখাশুনো করতে হবে।

কুন্তা কিছুমাত্র না ভাবিয়া তখনই বলিল—আমি করব বাবুজী। পয়সা দিতে হবে না।

কুন্তা রাজপুতের স্ত্রী, সে গাঙ্গোতা রোগীর সেবা করিবে কি করিয়া? ভাবিলাম আমার কথা সে বুঝিতে পারে নাই।

বলিলাম—ওর এ'টো বাসন মাজতে হবে, ওকে খাওয়াতে হবে—ও তো উঠতে পারে না। সে-সব তোমায় দিয়ে কি ক'রে হবে?

কুন্তা বলিল—আপনি হুকুম করলেই আমি সব করব। আমি রাজপুত কোথায় বাবুজী! আমার জাতভাই কেউ এতদিন আমায় কি দেখেছে? আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। আমার আবার জাত কি?

রাজু পাঁড়ের জড়ি-বুটির গুণে ও কুন্তার সেবাশুশ্রূষায় মাসখানেকের মধ্যে গিরধারীলাল চাঙ্গা হইয়া উঠিল। কুন্তা এজন্য দিতে গেলেও কিছু লইল না। গিরধারীলালকে সে ইতিমধ্যে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিলাম। বলিল—আহা, বাবা বড় দুঃখী, বাবার সেবা ক'রে আবার পয়সা নেব? ধরমরাজ মাথার উপর নেই?

জীবনে যে কয়টি সৎ কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটি প্রধান সৎ কাজ নিরীহ ও নিঃস্ব গিরধারীলালকে বিনা সেলামীতে কিছু জমি দিয়া লবটুলিয়াতে বাস করানো।

তাহার খুপরিতে একদিন গিয়াছিলাম।

নিজের বিঘা পাঁচেক জমি সে নিজের হাতেই পরিষ্কার করিয়া গম বুনিয়াছে। খুপরির চারিপাশে কতগুলি গোঁড়ালেবুর চারা পুঁতিয়াছে।

—এত গোঁড়ালেবুর গাছ কি হবে গিরধারীলাল?

—হুজুর, ওগুলো সরবতী লেবু। আমি বড় খেতে ভালবাসি। চিনি-মিছরি জোটে না আমাদের, ভুরা গুড়ের সরবৎ ক'রে ওই লেবুর রস দিয়ে খেতে ভারি তার!

দেখিলাম আশার আনন্দে গিরধারীলালের নিরীহ চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

—ভাল কলমের লেবু। এক-একটা হবে এক পোয়া। অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছে, যদি কখনো জমি-জায়গা করতে পারি, তবে ভাল সরবতী লেবুর গাছ লাগাব। পরের দোরে লেবু চাইতে গিয়ে কতবার অপমান হয়েছি হুজুর। সে দুঃখ আর রাখব না।

## অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

### ১

এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে। একবার ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। ধন্‌ঝরি শৈলমালা একটি সুন্দর স্বপ্নের মত আমার মন অধিকার করিয়া আছে...তাহার বনানী...তাহার জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি...

সঙ্গে লইলাম যুগলপ্রসাদকে।

তহশীলদার সজ্জন সিং-এর ঘোড়াটাতে যুগলপ্রসাদ চড়িয়াছিল—আমাদের মহালের সীমানা পার হইতে না-হইতেই বলিল—হুজুর, এ ঘোড়া চলবে না, জঙ্গলের পথে রহল চাল ধরলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও পা খোঁড়া হবে। বদলে নিয়ে আসি।

তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম। সজ্জন সিং ভাল সওয়ার, সে কতবার পূর্ণিয়ায় মোকদ্দমা তদারক করিতে গিয়াছে এই ঘোড়ায়। পূর্ণিয়া যাইতে হইলে কেমন পথে যাইতে হয় যুগলপ্রসাদের তাহা অজ্ঞাত নয় নিশ্চয়ই।

শীঘ্রই কারো নদী পার হইলাম।

তারপর অরণ্য, অরণ্য—সুন্দর, অপূর্ব, ঘন নির্জন অরণ্য! পূর্বেই বলিয়াছি এ-জঙ্গলে মাথার উপরে গাছপালার ডালে ডালে জড়াজড়ি নাই—কেঁদ-চারা, শাল-চারা, পলাশ, মহুয়া, কুলের অরণ্য—প্রস্তরাকীর্ণ রাঙা মাটির ডাঙা, উঁচু-নীচু। মাঝে মাঝে মাটির উপর বন্যহস্তীর পদচিহ্ন। মানুষজন নাই।

হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম লবটুলিয়ার নূতন তৈরী ঘিঞ্জি কুশ্রী টোলা ও বস্তি এবং একঘেয়ে ধূসর, চষা জমি দেখিবার পরে। এ-রকম আরণ্যপ্রদেশ এদিকে আর কোথাও নাই।

এই পথের সেই দুটি বন্য গ্রাম—বুরুডি ও কুলপাল বেলা বারোটার মধ্যেই ছাড়াইলাম। তার পরেই ফাঁকা জঙ্গল পিছনে পড়িয়া রহিল—সম্মুখে বড় বড় বনস্পতির ঘন অরণ্য। কার্তিকের শেষ, বাতাস ঠাণ্ডা—গরমের লেশমাত্রও নাই।

দূরে দূরে ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণী বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিল।

সন্ধ্যার পরে কাছারিতে পৌঁছিলাম। যে বিড়িপাতার জঙ্গল আমাদের স্টেট নীলামে ডাকিয়া লইয়াছিল, এ-কাছারি সেই জঙ্গলের ইজারাদারের।

লোকটা মুসলমান, শাহাবাদ জেলায় বাড়ী। নাম আবদুল ওয়াহেদ। খুব খাতির

করিয়া রাখিয়া দিল। বলিল—সন্ধ্যের সময় পৌঁছেছেন, ভাল হয়েছে বাবুজী। জঙ্গলে বড় বাঘের ভয় হয়েছে।

নির্জন রাত্রি।

বড় বড় গাছে শন্ শন্ করিয়া বাতাস বাধিতেছে।

কাছারির বারান্দায় বসিবার ভরসা পাইলাম না কথাটা শুনিয়া।

ঘরের মধ্যে জানালা খুলিয়া বসিয়া গল্প করিতেছি—হঠাৎ কি-একটা জন্তু ডাকিয়া উঠিল বনের মধ্যে। যুগলকে বলিলাম—কি ও?

যুগল বলিল—ও কিছু না, হুড়াল। অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ।

একবার গভীর রাত্রে বনের মধ্যে হায়েনার হাসি শোনা গেল—হঠাৎ শুনিলে বুকের রক্ত জমিয়া যায় ভয়ে, ঠিক যেন কাশরোগীর হাসি. মাঝে মাঝে দম বন্ধ হইয়া যায়, মাঝে মাঝে হাসির উচ্ছ্বাস।

পরদিন ভোরে রওনা হইয়া বেলা ন-টার মধ্যে দোবরু পান্নার রাজধানী চকমকি-টোলায় পৌঁছানো গেগ। ভানুমতী কী খুশি আমার অপ্রত্যাশিত আগমনে! তার মুখে-চোখে খুশি যেন চাপিতে পারিতেছে না, উপচাইয়া পড়িতেছে।

—আপনার কথা কালও ভেবেছি বাবুজী। এতদিন আসেন নি কেন?

ভানুমতীকে একটু লম্বা দেখাইতেছে. একটু রোগাও বটে। তাছাড়া মুখশ্রী আছে ঠিক তেমনি লাবণ্যভরা. সেই নিটোল গড়ন তেমনি আছে।

—নাইবেন তো ঝরনায়? মহুয়া তেল আনব, না কড়ুয়া তেল? এবার বর্ষায় ঝরনায় কি সুন্দর জল হয়েছে দেখবেন চলুন।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি—ভানুমতী ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন. সাধারণ সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে তার সেদিক দিয়া তুলনাই হয় না—তার বেশভূষা ও প্রসাধনের সহজ সৌন্দর্য ও রুচিবোধই তাহাকে অভিজাতবংশের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দেয়।

যে-মাটির ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছি, তাহার উঠানের চারিধারে বড় বড় আসান ও অর্জুন গাছ। এক ঝাঁক সবুজ বনটিয়া সামনের আসান গাছটার ডালে কলরব করিতেছে। হেমন্তের প্রথম, বেলা চড়িলেও বাতাস ঠান্ডা। আমার সামনে আধ মাইলেরও কম দূরে ধনুঝরি পাহাড়শ্রেণী. পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে চেরা সিঁথির মত পথ—একদিকে অনেক দূরে নীল মেঘের মত দৃশ্যমান গয়া জেলার পাহাড়শ্রেণী।

বিড়ির পাতার জঙ্গল ইজারা লইয়া এই শান্ত জনবিরল বন্য প্রদেশের পল্লবপ্রচ্ছায় উপত্যকার কোনো পাহাড়ী ঝরনার তীরে কুটির বাঁধিয়া বাস করিতাম চিরদিন! লবটুলিয়া তো গেল. ভানুমতীর দেশের এ-বন কেহ নষ্ট করিবে না। এ-অঞ্চলে মরুমকাঁকর ও পাইওরাইট্ বেশী মাটিতে. ফসল তেমন হয় না—হইলে এ-বন কোন্ কালে ঘুচিয়া যাইত। তবে যদি তামার খনি বাহির হইয়া পড়ে, সে স্বতন্ত্র কথা।

তামার কারখানার চিমনি. ট্রলি লাইন, সারি সারি কুলি-বস্তি, ময়লা জলের ড্রেন, এঞ্জিন-ঝাড়া কয়লার ছাইয়ের স্তূপ—দোকানঘর. চায়ের দোকান, সস্তা সিনেমায় 'জোয়ানী-হাওয়া' 'শের শমশের' 'প্রণয়ের জের' (ম্যাটিনিতে তিন আনা, পূর্বাহ্নে আসন দখল করুন)—দেশী মদের দোকান. দরজীর দোকান। হোমিও ফার্মেসী (সমাগত দরিদ্র রোগী-দের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়)। আদি ও অকৃত্রিম আদর্শ হিন্দু হোটেল।

কলের বাঁশিতে তিনটার সিটি বাজিল।

ভানুমতী মাথায় করিয়া এঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা বাজারে ফিরি করিতে বাহির হইয়াছে—ক-ই-লা চা-ই-ই—চার পয়সা ঝুড়ি।...

ভানুমতী তেল আনিয়া সামনে দাঁড়াইল। ওদের বাড়ীর সবাই আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতীর ছোট কাকা নবীন যুবক জগরু একটা গাছের ডাল ছুলিতে ছুলিতে আসিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। এই ছেলেটিকে আমি বড় পছন্দ করি। রাজপুতের মত চেহারা ওর, কালোর উপরে কি রূপ! এদের বাড়ীর মধ্যে এই যুবক এবং ভানুমতী, এদের দুজনকে দেখিলেই সত্যই যে ইহারা বন্য জাতির মধ্যে অভিজাতবংশ, তা মনে না হইয়া পারে না।

বলিলাম—কি জগরু, শিকার-টিকার কেমন চলছে?

জগরু হাসিয়া বলিল—আপনাকে আজই খাইয়ে দেব বাবুজী, ভাববেন না। বলুন কি খাবেন, সজারু, না হরিয়াল, না বনমোরগ?

স্নান করিয়া আসিলাম। ভানুমতী নিজের সেই আয়নাখানি (সেবার যেখানা পূর্ণিয়া হইতে আনাইয়া দিয়াছিলাম) আর একখানা কাঠের কাঁকুই চুল আঁচড়াইবার জন্য আনিয়া দিল।

আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছি, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, ভানুমতী প্রস্তাব করিল—বাবুজী চলুন, পাহাড়ে উঠবেন না? আপনি তো ভালবাসেন।

যুগলপ্রসাদ ঘুমাইতেছিল, সে ঘুম ভাঙিয়া উঠিলে আমরা বেড়াইবার জন্য বাহির হইলাম। সঙ্গে রহিল ভানুমতী, ওর খুড়তুতো বোন—জগরু পান্নার মেজ ভাইয়ের মেয়ে, বছর বারো বয়স—আর যুগলপ্রসাদ।

আধ মাইল হাঁটিয়া পাহাড়ের নীচে পৌঁছিলাম।

ধন্‌ঝরির পাদমূলে এই জায়গায় বনের দৃশ্য এত অপূর্ব যে, খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। যেদিকে চোখ ফিরাই সেদিকেই বড় বড় গাছ, লতা, উপল-বিছানো ঝরনার খাদ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট-বড় শিলাস্তূপ। ধন্‌ঝরির দিকে বন ও পাহাড়ের আড়ালে আকাশটা কেমন সরু হইয়া গিয়াছে, সামনে লাল কাঁকুরে মাটির রাস্তা উঁচু হইয়া ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়া পাহাড়ের ও-পারের দিকে উঠিয়াছে, কেমন খট্‌খটে শুক্‌নো ডাঙা মাটি, কোথাও ভিজা নয়, স্যাঁৎসেতে নয়। ঝরনার খাদেও এতটুকু জল নাই।

পাহাড়ের উপরে ঘন বন ঠেলিয়া কিছুদূর উঠিতেই কিসের মধুর সুবাসে মনপ্রাণ মাতিয়া উঠিল, গন্ধটা অত্যন্ত পরিচিত—প্রথমটা ধরিতে পারি নাই, তারপরে চাহিয়া দেখি—ধন্‌ঝরি পাহাড়ে যে এত ছাতিম গাছ তাহা পূর্বে লক্ষ্য করি নাই—এখন প্রথম হেমন্তে ছাতিম গাছে ফুল ধরিয়াছে, তাহারই সুবাস।

সে কি দু-চারটি ছাতিম গাছ! সপ্তপর্ণের বন, সপ্তপর্ণ আর কেলিকদম্ব—কদম্ব-ফুলের গাছ নয়, কেলিকদম্ব ভিন্নজাতীয় বৃক্ষ, সেগুন পাতার মত বড় বড় পাতা, চমৎকার আঁকাবাঁকা ডালপালাওয়ালা বনস্পতিশ্রেণীর বৃক্ষ।

হেমন্তের অপরাহ্নের শীতল বাতাসে পুষ্পিত বন্য সপ্তপর্ণের ঘন বনে দাঁড়াইয়া নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোরী ভানুমতীর দিকে চাহিয়া মনে হইল, মূর্তিমতী বনদেবীর সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি—কৃষ্ণা বনদেবী! রাজকুমারী তো ও বটেই! এই বনাঞ্চল, এই পাহাড়, ওই মিছি নদী, কারো নদীর উপত্যকা, এদিকে ধন্‌ঝরি, ওদিকে নওয়াদার শৈলশ্রেণী—এই সমস্ত স্থান এক সময়ে যে পরাক্রান্ত রাজবংশের অধীনে ছিল, ও সেই

রাজবংশের মেয়ে—আজ ভিন্ন যুগের আবহাওয়ায় ভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে যে রাজবংশ বিপর্যস্ত, দরিদ্র, প্রভাবহীন—তাই আজ ভানুমতীকে দেখিতেছি সাঁওতালী মেয়ের মত। ওকে দেখিলেই অলিখিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই ট্র্যাজিক অধ্যায় আমার চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে।

আজকার এই অপরাহ্ণটি আমার জীবনের আরও বহু সুন্দর অপরাহ্ণের সঙ্গে মিলিয়া মধুময় স্মৃতির সমারোহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—স্বপ্নের মত মধুর, স্বপ্নের মতই অবাস্তব।

ভানুমতী বলিল—চলুন, আরও উঠবেন না?

—কি সুন্দর ফুলের গন্ধ বল তো? একটু বসবে না এখানে? সূর্য অস্ত যাচ্ছে দেখি—

ভানুমতী হাসিমুখে বলিল—আপনার যা মর্জি বাবুজী। বসতে বলেন এখানে বসি। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়ের কবরে ফুল দেবেন না? আপনি সেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি রোজ পাহাড়ে উঠি ফুল দিতে। এখন তো বনে কত ফুল।

দূরে মিছি নদী উত্তরবাহিনী হইয়া পাহাড়ের নীচে দিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে। নওয়াদার দিকে যে অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণী, তারই পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী হাওয়া আরও শীতল হইল। ছাতিম ফুলের সুবাস আরও ঘন হইয়া উঠিল, ছায়া গাঢ় হইয়া নামিল শৈলসানুর বনস্থলীতে, নিম্নের বনাবৃত উপত্যকায়, মিছি নদীর পরপারের গণ্ড-শৈলমালার গাত্রে।

ভানুমতী একগুচ্ছ ছাতিম ফুল পাড়িয়া খোঁপায় গুঁজিল। বলিল—বসব, না উঠবেন বাবুজী?

আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। প্রত্যেকের হাতে এক-একটা ছাতিম ফুলের ডাল। একেবারে পাহাড়ের উপরে উঠিয়া গেলাম। সেই প্রাচীন বটগাছটা ও তার তলায় প্রাচীন রাজ-সমাধি। বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের মত পাথর চারিদিকে ছড়ানো। রাজা দোবরু পান্নার কবরের উপর ভানুমতী ও তাহার বোন নিছনী ফুল ছড়াইল, আমি ও যুগল-প্রসাদ ফুল ছড়াইলাম।

ভানুমতী বালিকা তো বটেই, সরলা বালিকার মতই মহা খুশি। বালিকার মত আব্দারের সুরে বলিল—এখানে একটু দাঁড়াই বাবুজী, কেমন? বেশ লাগছে, না?

আমি ভাবিতেছিলাম—এই শেষ। আর এখানে আসিব না। এ পাহাড়ের উপরকার সমাধিস্থান, এ বনাঞ্চল আর দেখিব না। ধন্‌ঝরির শৈলচূড়ায় পুষ্পিত সপ্তপর্ণের নিকট, ভানুমতীর নিকট, এই আমার চিরবিদায়। ছ-বছরের দীর্ঘ বনবাস সাঙ্গ করিয়া কলিকাতা নগরীতে ফিরিব—কিন্তু যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কেন এত বেশী করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছি!

ভানুমতীকে কথাটা বলিবার ইচ্ছা হইল, ভানুমতী কি বলে আমি আর আসিব না শুনিয়া—জানিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কি হইবে সরলা বনবালাকে বৃথা ভালবাসার, আদরের কথা বলিয়া?

সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নূতন সুবাস পাইলাম। আশেপাশের বনের মধ্যে যথেষ্ট শিউলি গাছ আছে। বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শিউলি ফুলের ঘন সুগন্ধ সান্ধ্য-বাতাসকে সুমিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ছাতিম বন এখানে নাই—সে আরও নীচে

নামিলে তবে। এরই মধ্যে গাছপালার ডালে জোনাকি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাতাস কি সতেজ, মধুর, প্রাণারাম? এ বাতাস সকালে বিকালে উপভোগ করিলে আয়ু না বাড়িয়া পারে? নামিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, কিন্তু বন্য জন্তুর ভয় আছে—তা ছাড়া ভানুমতী সঙ্গে রহিয়াছে। যুগলপ্রসাদ বোধ হয় ভাবিতেছিল, নূতন কোন্ ধরনের গাছ-পালা এ জঙ্গল হইতে লইয়া গিয়া অন্যত্র রোপণ করিতে পারে। দেখিলাম তাহার সমস্ত মনোযোগ নূতন লতাপাতার ফুল, সুদৃশ্য পাতার গাছ প্রভৃতির দিকে নিবদ্ধ—অন্য দিকে তাহার দৃষ্টি নাই। যুগলপ্রসাদ পাগলই বটে, কিন্তু ঐ এক ধরনের পাগল।

নূরজাহান নাকি পারস্য হইতে চেনার গাছ আনিয়া কাশ্মীরে রোপণ করিয়াছিলেন। এখন নূরজাহান নাই, কিন্তু সারা কাশ্মীর সুদৃশ্য চেনার বৃক্ষে ছাইয়া ফেলিয়াছে। যুগলপ্রসাদ মরিয়া যাইবে, কিন্তু সরস্বতী হ্রদের জলে আজ হইতে শতবর্ষ পরেও হেমন্তে ফুটন্ত স্পাইডার-লিলি বাতাসে সুগন্ধ ছড়াইবে, কিংবা কোন-না-কোন বনঝোপে বন্য হংসলতার হংসাকৃতি নীলফুল দুলিবে, যুগলপ্রসাদই যে সেগুলি নাঢ়া বইহারের জঙ্গলে আমদানি করিয়াছিল একদিন—একথা না-ই বা কেহ বলিল!

ভানুমতী বলিল—বাঁয়ে ওই সেই টাঁড়বারোর গাছ—চিনেছেন?

বন্য-মহিষের রক্ষাকর্তা সদয় দেবতা টাঁড়বারোর গাছ অন্ধকারে চিনিতে পারি নাই। আকাশে চাঁদ নাই, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

অনেকটা নামিয়া আসিয়াছি। এবার সেই ছাতিম বন। কি মিষ্ট মনমাতানো গন্ধ!

ভানুমতীকে বলিলাম—এখানে একটু বসি।

পরে সেই বনপথে অন্ধকারের মধ্যে নামিতে নামিতে ভাবিলাম, লবটুলিয়া গিয়াছে, নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহার গিয়াছে—কিন্তু মহালিখারূপের পাহাড় রহিল—ভানুমতীদের ধন্ঝরি পাহাড়ের বনভূমি রহিল। এমন সময় আসিবে হয়তো দেশে, যখন মানুষে অরণ্য দেখিতে পাইবে না—শুধুই চাষের ক্ষেত আর পাটের কল, কাপড়ের কলের চিমনি চোখে পড়িবে, তখন তাহারা আসিবে এই নিভৃত অরণ্যপ্রদেশে, যেমন লোকে তীর্থে আসে। সেই সব অনাগত দিনের মানুষদের জন্য এ বন অক্ষুণ্ণ থাকুক।

২

রাত্রে বসিয়া জগরু পান্না ও তাহার দাদার মুখে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা শুনিলাম। মহাজনের দেনা এখনও শোধ হয় নাই, দুইটি মহিষ ধার করিয়া কিনিতে হইয়াছে, না কিনিলে চলে না, গয়ার এক মাড়োয়ারী মহাজন আগে আসিয়া ঘি কিনিয়া লইয়া যাইত—আজ তিন-চার মাস সে আর আসে না। প্রায় আধ মণ ঘি ঘরে মজুত, খরিদ্দার নাই।

ভানুমতী আসিয়া দাওয়ার একধারে বসিল। যুগলপ্রসাদ অত্যন্ত চা-খোর, সে চা-চিনি সঙ্গে আনিয়াছে আমি জানি। কিন্তু লাজুকতাবশত গরম জলের কথা বলিতে পারিতেছে না, তাহাও জানি। বলিলাম—চায়ের জল একটু গরম করার সুবিধে হবে কি ভানুমতী?

রাজকুমারী ভানুমতী চা কখনও করে নাই। চা খাইবার রেওয়াজই নাই এখানে। তাহাকে জলের পরিমাণ বুঝাইয়া দিতে সে মাটির হাঁড়িতে জল গরম করিয়া আনিল।

তাহার ছোট বোন কয়েকটি পাথরবাটি আনিল। ভানুমতীকে চা খাইবার অনুরোধ করিলাম, সে খাইতে চাহিল না। জগরু পান্না পাথরের ছোট খোরার এক খোরা চা শেষ করিয়া আরও খানিকটা চাহিয়া লইল।

চা খাইয়া আর-সকলে উঠিয়া গেল, ভানুমতী গেল না। আমায় বলিল—ক'দিন এখন আছেন বাবুজী? এবার বড় দেরি ক'রে এসেছেন। কাল তো যেতেই দেব না। চলুন আপনাকে কাল ঝাটি ঝরনা বেড়িয়ে নিয়ে আসি। ঝাটি ঝরনায় আরও ভয়ানক জঙ্গল। ওদিকে বন্ডো বুনো হাতী। অনেক বনময়ূরও আছে দেখতে পাবেন। চমৎকার জায়গা। পৃথিবীর মধ্যে এমন আর নেই।

ভানুমতীর পৃথিবী কতটুকু জানিতে বড় ইচ্ছা হইল। বলিলাম—ভানুমতী, কখনো কোনো শহর দেখেছ?

—না বাবুজী।

—দু-একটা শহরের নাম বল তো?

—গয়া, মুঙ্গের, পাটনা।

—কলকাতার নাম শোন নি?

—হাঁ বাবুজী।

—কোন্ দিকে জান?

—কি জানি বাবুজী!

—আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?

—আমরা গয়া জেলায় বাস করি।

—ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?

ভানুমতী মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে শোনে নাই। কখনও কোথাও যায় নাই চক্‌মকিটোলা ছাড়িয়া। ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে?

একটু পরে বলিল—আমার জ্যাঠামশায় একটা মহিষ এনেছিলেন, সেটা এবেলা তিন সের, ওবেলা তিন সের দুধ দিত। তখন আমাদের এর চেয়ে ভাল অবস্থা ছিল বাবুজী, তখন যদি আপনি আসতেন, আপনাকে রোজ খোয়া খাওয়াতাম। জ্যাঠামশায় নিজের হাতে খোঁয়া তৈরি করতেন। কি মিষ্টি খোয়া! এখন তেমন দুধই হয় না তার খোয়া। তখন আমাদের খাতিরও ছিল খুব।

পরে হাতখানি একবার তুলিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া গর্বের সহিত বলিল—জানেন বাবুজী, এই সমস্ত দেশ আমাদের রাজ্য ছিল। সারা পৃথিবীটা। বনে যে গোঁড় দেখেন, সাঁওতাল দেখেন, ওরা আমাদের জাত নয়। আমরা রাজগোঁড়। আমাদের প্রজা ওরা, আমাদের রাজা ব'লে মানে।

উহার কথায় দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। মহাজনে দেনার দায়ে দুই বেলা যাহাদের মহিষ ধরিয়া লইয়া যায়, সেও রাজবংশের গর্ব করিতে ছাড়ে না।

বলিলাম—আমি জানি ভানুমতী তোমাদের কত বড় বংশ—

ভানুমতী বলিল—তারপর শুনুন বাবুজী, আমাদের সেই মহিষটা বাঘে নিয়ে গেল। জ্যাঠামশায় যে মহিষটা এনেছিলেন।

—কি ক'রে?

—জ্যাঠামশায় ওই পাহাড়ের নীচে চরাতে নিয়ে গিয়ে একটা গাছতলায় বসেছিলেন,

সেখানে বাঘে ধরল।

বলিলাম—তুমি বাঘ দেখেছ কখনও?

ভানুমতী কালো জোড়া-ভুরু দুটি আশ্চর্য হইবার ভঙ্গিতে উপরের দিকে তুলিয়া বলিল—বাঘ দেখিনি বাবুজী! শীতকালে আসবেন চকমকিটোলায়—বাড়ীর উঠোন থেকে গরু-বাছুর ধরে নিয়ে যায় বাঘে—

বলিয়াই সে ডাকিল—নিছনি, নিছনি—শোন্—

ছোট বোন আসিলে বলিল—নিছনি, বাবুজীকে শুনিয়ে দে তো আর বছর শীতকালে বাঘ রোজ রাতে আমাদের উঠোনে এসে কি ক'রে বেড়াত। জগরু একদিন ফাঁদ পেতেছিল। ধরা পড়ল না।

পরে হঠাৎ বলিল—ভাল কথা, বাবুজী, একখানা চিঠি পড়ে দেবেন? কোথা থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, কে পড়বে, এমনি তোলা রয়েছে। যা নিছনি, চিঠিখানা নিয়ে আয়, আর জগরু-কাকাকেও ডেকে নিয়ে আয়—

নিছনি চিঠি পাইল না। তখন ভানুমতী নিজে গিয়া অনেক খুঁজিয়া সেখানা বাহির করিয়া আমার হাতে আনিয়া দিল।

বলিলাম—কবে এসেছে এখানা?

ভানুমতী বলিল—মাস ছ-সাত হবে বাবুজী—তুলে রেখে দিইছি, আপনি এলে পড়াবো। আমরা তো কেউ পড়তে পারিনে। ও নিছনি, জগরু-কাকাকে ডেকে নিয়ে আয়। চিঠি পড়া হবে—সবাইকে ডাক দে।

ছ-সাত মাস পূর্বের পুরনো অপঠিত পত্রখানা আমি যুগলপ্রসাদের উনুনের আলোয় পড়িতে বসিলাম—আমার চারিধারে বাড়ীসুদ্ধ লোক ঘিরিয়া বসিল চিঠি শুনিবার জন্য। চিঠিখানা কায়েথী-হিন্দীতে লেখা—রাজা দোবরু পান্নার নামে চিঠি। পাটনার জনৈক মহাজন রাজা দোবরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছে, এখানে বিড়িপাতার জঙ্গল আছে কিনা—থাকিলে কি দরে ইজারা বিলি হয়।

এ পত্রের সঙ্গে ইহাদের কোনো সম্পর্ক নাই—ইহাদের অধীনে কোনো বিড়িপাতার জঙ্গল নাই। রাজা দোবরু নামে রাজা ছিলেন, চকমকিটোলার নিজ বসতবাটির বাহিরে তাঁর যে কোথাও এক ছটাক জমিও নাই একথা পাটনার উক্ত পত্রলেখক মহাজন জানিলে ডাকমাশুল খরচ করিয়া বৃথা পত্র দিত না নিশ্চয়ই।

একটু দূরে দাওয়ার ও-পাশে যুগলপ্রসাদ রান্না করিতেছে। তাহার কাঠের উনুনের আলোয় দাওয়ার খানিকটা আলো হইয়াছে। এদিকে দাওয়ার অর্ধেকটায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, যদিও কৃষ্ণপক্ষের আজ মোটে তৃতীয়া—ধন্‌ঝরি পাহাড়ের আড়াল কাটাইয়া এই কিছুক্ষণ মাত্র চাঁদ ফাঁকা আকাশের দৃশ্যমান হইয়াছে। সামনে কিছুদূরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়শ্রেণী—চকমকিটোলার বস্তির ছেলেপুলেদের কথা ও কলরব শোনা যাইতেছে।...কি সুন্দর ও অপূর্ব মনে হইতেছিল এই বন্য গ্রামে যাপিত এই রাত্রিটি! ভানুমতীর তুচ্ছ ও সাধারণ গল্পও কি আনন্দই দিতেছিল! সেদিন বলভদ্রের মুখে শোনা সেই উন্নতি করিবার কথা মনে পড়িল।

মানুষে কি চায়—উন্নতি না আনন্দ? উন্নতি করিয়া কি হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে? আমি এমন কত লোকের কথা জানি, যাহারা জীবনে উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দকে হারাইয়াছে। অতিরিক্ত ভোগে মনোবৃত্তির ধার ক্ষইয়া ক্ষইয়া ভোঁতা—

এখন আর কিছুতেই তেমন আনন্দ পায় না, জীবন তাহাদের নিকট একঘেয়ে, একরঙা, অর্থহীন। মন শান-বাঁধানো—রস ঢুকিতে পায় না।

এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। এই মাটির ঘরের জ্যোৎস্না-ওঠা দাওয়ায় সরলা বন্যবালা রাঁধিতে রাঁধিতে এমনি করিয়া ছেলেমানুষী গল্প করিত—আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম। আর শুনিতাম বেশী রাত্রে ওই বনে হুড়ালের ডাক, বন্য হস্তীর বৃংহতি, হায়েনার হাসি। ভানুমতী কালো বটে, কিন্তু এমন নিটোল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে বাংলা দেশে পাওয়া যায় না। আর ওর ওই সতেজ সরল মন! দয়া আছে, মায়া আছে, স্নেহ আছে—তার কত প্রমাণ পাইয়াছি।...ভাবিতেও বেশ লাগে। কি সুন্দর স্বপ্ন! কি হইবে উন্নতি করিয়া? বলভদ্র সেঙ্গাৎ গিয়া উন্নতি করুক। রাসবিহারী সিং উন্নতি করুক।

যুগলপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, রান্না হইয়াছে, চৌকা লাগাইবে কিনা। ভানুমতীদের বাড়ীতে আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হয় না। এদেশে আনাজ মেলে না, তবুও কোথা হইতে জগরু বেগুন ও আলু আনিয়াছে। মাষকলাইয়ের ডাল, পাখীর মাংস, বাড়ীতে তৈরি অতি উৎকৃষ্ট টাটকা ভয়সা ঘি, দুধ। যুগলপ্রসাদের হাতের রান্নাও চমৎকার।

ভানুমতী, জগরু, জগরুর দাদা, নিছনি—সবাই আজ আমাদের এখানে খাইবে—আমি খাইতে বলিয়াছি। কারণ এমন রান্না উহারা কখনও খাইতে পায় না। বলিলাম—একটু দূরে উহারাও একসঙ্গে সবাই বসুক। যুগলপ্রসাদের দেওয়ারও সুবিধা হইবে। একত্র খাওয়া যাক।

ওরা রাজী হইল না। আমাদের আগে না খাওয়া হইলে উহারা খাইবে না।

পরদিন আসিবার সময় ভানুমতী এক কাণ্ড করিল।

হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিল—আজ যেতে দেব না বাবুজী—

আমি অবাক হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কষ্ট হইল।

উহার অনুরোধে সকালে রওনা হইতে পারিলাম না—দুপুরের আহারাদির পরে বিদায় লইলাম।

... ... ...

আবার দুধারে ছায়ানিবিড় বনপথ। পথের ধারে কোথাও রাজকুমারী ভানুমতী যেন দাঁড়াইয়া আছে—বালিকা নয়, যুবতী ভানুমতী—তাহাকে আমি কখনও দেখি নাই। তার সাগ্রহ দৃষ্টি, তার প্রণয়ীর আগমন-পথের দিকে নিবদ্ধ—হয়তো সে পাহাড়ের ওপারের বনে শিকারে গিয়াছে, আসিবার দেরি নাই। তরুণীকে মনে মনে আশীর্বাদ করিলাম। ধন্‌ঝরি পাহাড়ের জোনাকি-জ্বলা নিস্তব্ধ প্রাচীন ছাতিম ফুলের বন ও অপূর্ব দুরছন্দা সন্ধ্যার আড়ালে বনবালার গোপন অভিসার সার্থক হউক।

মহালে ফিরিয়া সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া লবটুলিয়া ত্যাগ করিলাম।

আসিবার সময় রাজু পাঁড়ে, গনোরী, যুগলপ্রসাদ, আস্‌রফি টিণ্ডেল প্রভৃতি পাল্কির চারিধারে ঘিরিয়া পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে লবটুলিয়ার সীমানার নূতন বস্তি মহারাজটোলা পর্যন্ত আসিল। মটুকনাথ সংস্কৃতে স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া আমায় আশীর্বাদ করিল। রাজু বলিল—হুজুর, আপনি চলে গেলে লবটুলিয়া উদাস হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, এদেশে 'উদাস' শব্দের ব্যবহার এবং উহার অর্থের ব্যাপকতা অত্যন্ত

বেশী। মকাই-ভাজা খাইতে খারাপ লাগিলে বলে, 'ভাজা উদাস লাগছে।' আমার সম্পর্কে কি অর্থে উহা ব্যবহৃত হইল ঠিক বলিতে পারিব না।

আমার বিদায় লইয়া আসিবার সময় একটি মেয়ে কাঁদিয়াছিল। আজ সকাল হইতে আসিয়া সে কাছারির উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল—আমার পাল্কি যখন তোলা হইল, তখন চাহিয়া দেখি সে হাপুস-নয়নে কাঁদিতেছে। মেয়েটি কুন্তা।

নিরাশ্রয় কুন্তাকে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছি, আমার ম্যানেজারী জীবনের ইহা একটি সৎকাজ। পারিলাম না কিছু করিতে সেই বন্য বালিকা মঞ্চীর। অভাগিনীকে কে কোথায় যে ভুলাইয়া লইয়া গেল! আজ সে যদি থাকিত তাহার নিজের নামে জমি দিতাম বিনা সেলামীতে।

নাঢ়া বইহারের সীমানায় নক্‌ছেদীর ঘর দেখিয়াই আরও ওর কথা মনে পড়িল। সুরতিয়া ঘরের বাহিরে কি করিতেছিল, আমার পাল্কি দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—বাবুজী, বাবুজী, একটু রাখুন—

পরে সে ছুটিয়া আসিয়া পাল্কির কাছে দাঁড়াইল। ছনিয়াও আসিল পিছু পিছু।

—বাবুজী, কোথায় যাচ্ছেন?

—ভাগলপুরে। তোর বাবা কোথায়?

—ঝল্লুটোলায় গমের বীজ আনতে গিয়েছে। কবে আসবেন?

—আর আসব না।

—ইস্! মিথ্যে কথা!...

নাঢ়া বইহারের সীমানা পার হইয়া পাল্কি হইতে মুখ বাড়াইয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম।

বহু বস্তি, চালে চালে বসত, লোকজনের কথাবার্তা, বালক-বালিকার কলহাস্য, চীৎকার, গরু-মহিষ, ফসলের গোলা। ঘন বন কাটিয়া আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসাইয়াছি ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে। সবাই কাল তাহাই বলিতেছিল—বাবুজী, আপনার কাজ দেখে আমরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছি, নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হয়েছে!

কথাটা আমিও ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হইয়াছে!

দিগন্তলীন মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানীর উদ্দেশে দূর হইতে নমস্কার করিলাম।

হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়!...

## ৩

বহু কাল কাটিয়া গিয়াছে তারপর—পনেরো-ষোল বছর।

বাদাম গাছের তলায় বসিয়া এই সব ভাবিতেছিলাম।

বেলা একেবারে পড়িয়া আসিয়াছে।

বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার আরণ্য-প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট

হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের সে অপূর্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মত আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কেমন আছে কুন্তা, কত বড় হইয়া উঠিয়াছে সুরতিয়া, মটুকনাথের টোল আজও আছে কিনা, ভানুমতী তাহাদের সেই শৈলবেষ্টিত আরণ্যভূমিতে কি করিতেছে, রাখালবাবুর স্ত্রী, ধ্রুবা, গিরধারীলাল, কে জানে এতকাল পরে কে কেমন অবস্থায় আছে!...

আর মনে হয় মাঝে মাঝে মঞ্চীর কথা। অনুতপ্তা মঞ্চী কি আবার স্বামীর কাছে ফিরিয়াছে, না আসামের চা-বাগানে চায়ের পাতা তুলিতেছে আজও!

কতকাল তাহাদের আর খবর রাখি না।



—শেষ—

# অনুবর্তন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের
করকমলে

ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটের আর পিটার লেনের মোড়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল-বাড়িটা বেশ সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। বেলা দশটা। ছাত্রের দল ইতিমধ্যে আসিতে শুরু করিয়াছে, বড়লোকের ছেলেরা মোটরে, মধ্যবিত্ত ও গরিব গৃহস্থের বাড়ির ছেলেরা পদব্রজে। স্কুলের পুরানো চাকর মথুরাপ্রসাদ ছেঁড়া ও মলিন খাকির চাপকান পরিয়া তৈরী, চাপকানের হাতের কাছটাতে রাঙা সুতায় একটা ফুটবলের শিল্ডের মত নকশার মধ্যে ইংরেজী 'এম' ও 'আই' অক্ষর দুইটি জড়াপটি খাইয়া শোভা পাইতেছে; কারণ, স্কুলের নাম মডার্ন ইন্‌স্টিটিউশন, যদিও হেডমাস্টার ক্লার্কওয়েল সাহেবের ব্যক্তিগত চিঠির উপরে ছাপানো আছে "ক্লার্কওয়েল'স মডার্ন ইন্‌স্টিটিউশন", আসলে সেটা ভুল; কারণ স্কুলটি সাহেবের নিজের নয়, অনেক দিনের পুরানো স্কুল, কমিটীর হাতে আছে, ক্লার্কওয়েল সাহেব আজ পনেরো বছর এখানকার বেতনভোগী হেডমাস্টার মাত্র।

এই স্কুল-বাড়ির দোতলায় পিছন দিকের তিনটি ঘর হেডমাস্টারের থাকিবার জন্য নির্দিষ্ট আছে—ঘরের সামনেই ক্লাসরুম, কাজেই পর্দা ফেলা। ক্লার্কওয়েলের বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি, মাথার চুল সাদা, মোটাসোটা, সর্বদা ফিটফাট হইয়া থাকেন, টাইটা এদিক ওদিক নড়িবার জো নাই, শার্টের সামনেটা নিখুঁত ইস্ত্রি করা, চকচকে কলার, ভাল কাটছাঁটের কোট, পেন্টালুনের পা দুটিতে চমৎকার ভাঁজ, যাহাকে বলে 'নাইফ্-এজ্-ক্রিজ্' —ছুরির ফলার মত সরু খাঁজ। সাহেব অবিবাহিত, কেউ কেউ বলে সাহেবের স্ত্রী আছে, কিন্তু সে সাহেবের কাছে থাকে না। তবে এখানে মিস্ সিবসন্ নামে একজন তরুণী ফিরিঙ্গী মেম সাহেবের সঙ্গেই থাকে, কেউ বলে সাহেবের শালী, কেউ বলে কী রকম বোন, কেউ বলে আর কিছু—মিস্ সিবসন্‌ও স্কুলের টীচার, নীচের ক্লাসে ইংরেজী পড়ায় ও উচ্চারণ শেখায়।

মিস্ সিবসনের নামে এ স্কুলে নীচের ক্লাসের দিকে ছোট ছোট ছেলের বেশ ভিড়। আশপাশের অবস্থাপন্ন গৃহস্থেরা মেমসাহেবের কাছে পড়িতে পাইবে ও নিখুঁত ইংরেজী উচ্চারণ শিখিতে পাইবে, এই লোভে ছেলেদের এই স্কুলে ভর্তি করে। বেলা দশটা বাজিতে না বাজিতে ছোট ছোট ছেলেরা স্কুলের সামনের কম্পাউণ্ডে ছুটাছুটি করিতেছে, মার্বেল খেলিতেছে, মারামারি করিতেছে, হৈ-চৈ, চীৎকার লাফালাফি দাপাদাপি জুড়িয়া দিয়াছে।

হঠাৎ দোতলার জানালাপথে ক্লার্কওয়েল সাহেবের মুখখানা বাহির হইল ও বিষম বাজখাঁই চিৎকার শোনা গেলঃ ও, ইউ মথুরা, স্টপ দি নয়েজ্—বাবালোগকো চুপ করনে বোলো—

মুহূর্তে সব চুপ।

ছেলেরা মুখ উঁচু করিয়া হেডমাস্টারকে দেখিয়া লইল, এবং এ ওর মুখের দিকে চাহিয়া যে যাহার মার্বেল পকেটের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল ও উদ্যত ঘুষি নামাইল।

—মথুরা—এই মথুরা—

পুনরায় হেডমাস্টারের গম্ভীর আওয়াজ।

নীচের ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে বসিয়া চাপকান-পরিহিত বৃদ্ধ মথুরা তামাক খাইতেছিল, সে তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া বাহির হইয়া আসিয়া উপরের দিকে চাহিল।

—পহেলা ঘণ্টি মারো, সওয়া দশ হো গিয়া—

দিক্‌বিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া দীর্ঘসময়ব্যাপী স্কুল বসিবার প্রথম ঘণ্টা বাজিয়া চলিল—থামিতে আর চায় না। অনেক ছোট ছোট ছেলের মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—এই এখন যে স্কুল বসিবার ঘণ্টা পড়িতেছে, কলির সবে শুরু। এযাত্রা কি আর ছুটির ঘণ্টা বাজিবার সম্ভাবনা আছে? মোটে সওয়া দশ, আর কোথায় সেই সাড়ে তিন! সাড়ে তিনটাতে নীচের ছোট ছেলেদের ক্লাসের ছুটি।

ক্লার্কওয়েল তাড়াতাড়ি টেবিলে বসিয়া এক প্লেট সরু চালের ভাত, দুইটি কাঁচা টোমাটো, একটা বড় কাঁচকলা-সিদ্ধ, কিছু কাঁচা লেটুস্ শাক ও কপির পাতা কুঁচানো,

এক ফালি নারিকেল ও দুইখানা মুগীর ঠ্যাং-সিদ্ধ খাওয়া শেষ করিয়া হাঁকিলেন, কেবলরাম!

বাবুর্চী কেবলরাম হিন্দু। সাহেবের কাছে অনেক দিন আছে, সেও কায়দাদুরস্ত-ভাবে সাদা উর্দি পরিয়া, মাথায় সাদা পাগড়ি বাঁধিয়া তৈরী—সাহেবের বাবুর্চীগিরি করে এবং স্কুলের সময়ে রেজিস্ট্রি-খাতাপত্র এ-ক্লাস হইতে ও-ক্লাসে বহিয়া লইয়া যায়, জল তোলে, ছেলেদের জল দেয়—এজন্য স্কুল হইতেই সে বেতন পাইয়া থাকে, সাহেবের খানা পাকাইবার জন্য সে কেবল সাহেবের কাছে খোরাকি পায় মাত্র।

কেবলরাম শশব্যস্ত হইয়া বলিল, হুজুর!

—মেমসাহেব কাঁহা?

—এখনও আসতেছেন না কেন, অনেকক্ষণ তো গেছেন। আলেন বলে হুজুর, ধর্মতলায় ওষুধ আনতি গেছেন।

কেবলরামের বাড়ি যশোর ও খুলনার সীমানায়!

—মেমসাহেবকো খানা টেবিলমে রাখ দো। আউর তুমি চলা যাও ইউনিভার্সিটি, পিওন-বুক্‌কা অন্দর দো লেফাফা হ্যায়—

—হুজুর, ইউনিভার্সিটি এখনো খোলে নি, এগারো বাজলি তবে বাবুরা আসবেন, মেমসাহেবের খানা দিয়ে তবে গেলি চলবে না হুজুর?

—বহুৎ আচ্ছা, চা দো।

সকালে ভাত খাওয়ার পর চা-পান ক্লার্কওয়েলের বহুদিনের অভ্যাস।

এই সময় উঁচু গোড়ালির জুতো খট খট করিতে করিতে মিস্ সিবসন্ ঘরে ঢুকিল। কৃশাঙ্গী, লম্বা, মুখে পুরু করিয়া পাউডার, ঠোঁটে লিপস্টিক ঘষা, হাতে হ্যান্ডব্যাগ ঝোলানো। বয়স কম হইলেও গালে ইতিমধ্যেই মেছেতা পড়িতেছে। মুখ ফিরাইয়া চোখ ঘুরাইয়া বলিল, ডিয়ারি, ইউ হ্যাভ্ ফিনিশ্‌ড্ অলরেডি?

—ইয়েস্, ডু ইউ গবল্ আপ কুইক্‌লি, ফার্স্ট বেল্ ইজ গন্, ইউ আর রাদার লেট্ ফর্ মীল।

সরু গলায় গানের সুরে কথা বলিয়া মেমসাহেব পাশের ঘরে ঢুকিল।

ক্লার্কওয়েল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, স্কুলের পোশাক পরিয়াই তিনি খানার টেবিলে বসিয়া-ছিলেন, বাহিরে চাহিয়া পর্দার ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, ক্লাসরুমে ছেলে আসিয়াছে কি না! ঢং ঢং করিয়া স্কুল বসিবার ঘণ্টা পড়িল। ক্লার্কওয়েল শশব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহির হইয়া নীচের গাড়িবারান্দায় স্কুলের ছেলেদের সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে নামিয়া গেলেন।

ক্লার্কওয়েল দোর্দণ্ডপ্রতাপ জাঁহাবাজ হেডমাস্টার। ছাত্র ও মাস্টারেরা সমানভাবে ভয়ে কাঁপে তাঁর দাপটে—পুরো অটোক্র্যাট, কথা বলিলে তার নড়চড় হইবার জো নাই, হুকুমের বিরুদ্ধে কমিটীতে আপীল নাই—কমিটীর মেম্বাররা সবাই বাঙালী, সাহেবকে খাতির করিয়া চলা তাঁহাদের বহুদিনের অভ্যাস, স্কুলের মাস্টারদের ডিক্রি ডিস্‌মিসের একমাত্র মালিক তিনিই।

সুতরাং আশ্চর্য না যে, তাঁহার সিঁড়ি দিয়া দুপ্ দুপ্ করিয়া নামিবার সময় দুই-একজন মাস্টার, যাঁহারা হেডমাস্টারের অলক্ষ্যে তাড়াতাড়ি হাজিরা-বই সই করিতে দোতলায় আপিস-ঘরে যাইতেছিলেন, তাঁহারা একটু সংকুচিত সুরে 'গুড্ মর্নিং স্যার্' বলিয়া এক পাশে রেলিং ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া হেডমাস্টারকে নামিবার পথ বাধামুক্ত করিয়া দিলেন—যদিও তাহা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক; কারণ, চওড়া সিঁড়ি উভয় পক্ষের নামিবার ও উঠিবার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত। ইহা বিনয়ের একপ্রকার রূপ, প্রয়োজনের কার্য নহে।

ক্লাস বসিয়া গেল। ক্লার্কওয়েল হাজিরা-বই খুলিয়া দেখিয়া হাঁকিলেন, মিঃ আলম!

সফরুদ্দিন আলম এম-এ, স্কুলের য়্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার। বয়স ত্রিশের মধ্যে, আইন পাস করিয়া আজ বছর চার-পাঁচ মাস্টারি করিতেছে, ধূর্ত চোখ, চটপটে ধরনের চালচলন—লোক ভাল নয়। হেডমাস্টারের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ, মাস্টারেরা ভয় করিয়া চলে,

ভালবাসে না।

আলম বলিল, ইয়েস্ স্যার্।

—আজ প্রেয়ারের সময় শ্রীশবাবু আর যদুবাবু অনুপস্থিত। ওদের ডাকাও।

—স্যার্, যদুবাবু আর শ্রীশবাবুকে বলে বলে পারলাম না, রোজ লেট্ স্যার্, আপনি একটু বলে দিন ওদের।

লাগাইতে-ভাঙাইতে আলমের জুড়ি নাই বলিয়া মাস্টারের দল তাহাকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলে।

আলম মাস্টারদের ঘরে গিয়া সুমিষ্ট স্বরে বলিল, যদুবাবু, শ্রীশবাবু, হেডমাস্টার আপনাদের স্মরণ করেছেন। শরৎবাবু কোথায়?

যদুবাবু বয়সে প্রবীণ, চালচলন ক্ষিপ্রতাবর্জ্জিত, রোগা, মাথার চুল কাঁচা-পাকায় মিশানো। তিনি ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া বলিলেন, কেন আমায় অসময়ে স্মরণ—

—আপনি প্রেয়ারের সময় কোথায় ছিলেন?

—আসতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। কেন?

—হেডমাস্টার নোট করেচেন—

যদুবাবু উষ্মাসহকারে বলিলেন, ওঃ, তবেই আমার সব হল! নোট করেচেন তো ভারিই করেচেন! গেরস্থ মানুষ, ঘড়ির কাঁটা ধরে আসা সব সময় চলে না।

মিঃ আলম চুপ করিয়া রহিল।

টিফিনের পর যদুবাবুর পুনরায় ডাক পড়িল আপিসে। ক্লার্কওয়েল বলিলেন, ওয়েল, যদুবাবু, আমার স্কুলে শুনলাম আপনার অসুবিধে হচ্ছে?

যদুবাবু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, কেন স্যার্?

বুঝিলেন, আলমের কাছে ওবেলা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সাহেবের কানে উঠিয়াছে।

—আপনার রোজ লেট হচ্ছে স্কুলে, অথচ ঘরের কাজ ঠিকমত করতে পারছেন না শুনলাম।

—ঘরের কাজ? না স্যার্, ঘরের কাজ ঠিক—তার জন্যে কি—

ক্লার্কওয়েল সাহেব বলিলেন, বসুন ওখানে। এখন কোন ক্লাস আছে?

—আজ্ঞে, থার্ড ক্লাসে হিস্ট্রির ঘণ্টা।

—আচ্ছা, যাবেন এখন। আপনি আজ প্রেয়ারের সময় ছিলেন না, রোজই থাকেন না।

—আমি কেন স্যার্, শ্রীশ থাকে না, হীরেনবাবু থাকে না, ক্ষেত্রবাবু থাকে না।

—আমি জানি কে কে থাকে না। আপনার বলার আবশ্যক নেই। আপনি ছিলেন না কেন? লেট করেন কেন রোজ?

—খেতে একটু দেরি হয়ে যায় স্যার্।

—বেশ, মাই গেট্ ইজ্ ওপ্ন্। আপনার অসুবিধে হলে আপনি চলে যেতে পারেন।

যদুবাবু নিরুত্তর রহিলেন। সাহেবের আড়ালে যাহাই বলুন, সামনাসামনি কিছু বলিবার সাহস তাঁহার নাই। অন্তত এতদিন কেহ দেখে নাই।

—আচ্ছা, যান ক্লাসে। কাল থেকে আমার আপিসে এসে সই করবেন আগে।

যদুবাবু পরের ক্লাসের ঘণ্টা পড়িলে আপিসে আসিয়াই ক্ষেত্রবাবুকে সামনে দেখিতে পাইলেন। তখনও অন্য কোন শিক্ষক আপিস-ঘরে আসেন নাই।

ক্ষেত্রবাবু সুর নীচু করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তলব হয়েছিল কেন?

যদুবাবু বলিলেন, ওঃ, অত আস্তে কথা কিসের? বলব সোজা কথা, তার আবার অত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়—

হঠাৎ যদুবাবুকে বাক্‌শক্তি রহিত হইতে দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু সবিস্ময়ে পিছন ফিরিয়া চাহিতেই একেবারে য়্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার মিঃ আলমের সহিত চোখাচোখি হইয়া গেল।

আলম বলিল, ক্ষেত্রবাবু, ফোর্থ ক্লাসে একজামিনের পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—যদুবাবু?

—কাল দেব।

—কেন, আজই দিন না।

—কাল দিলে ক্ষতি কিছু নেই।

অল্পক্ষণ পরে হেডমাস্টারের আপিসে যদুবাবুর আবার ডাক পড়িল।

হেডমাস্টার বলিলেন, যদুবাবু, আপনি ফোর্থ ক্লাসে কি পড়ান?

—হিস্ট্রি স্যার্।

—ওদের উইকাল পরীক্ষা হবে এই শনিবার, পড়া দেখিয়ে দিয়েছেন?

—না স্যার, কাল দেব।

—ওরা কদিন সময় পাবে তৈরী হতে, তা ভেবে দেখলেন না! ছেলেদের কাজ যদি না হয়, তেমন মাস্টার এ স্কুলে রাখাও যা, না রাখাও তাই। মাই ডোর ইজ্ ওপ্ন্— আপনার না পোষায়, আপনি চলে গেলে কেউ বাধা দেবে না।

যদুবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন তিনি এখনই ক্লাসে গিয়া পড়া বলিয়া দিতেছেন।

—তাই যান। পড়া দিয়ে এসে আমাকে রিপোর্ট করবেন।

—যে আজ্ঞে স্যার্।

আপিসে আসিয়া যদুবাবু লম্ফঝম্ফ আরম্ভ করিলেন। অন্য কেহ সেখানে ছিল না, শুধু হেডপণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু।

—ওই আলম, ওটা একেবারে অন্ত্যজ—লাগিয়েছে গিয়ে অমনি হেডমাস্টারের কাছে। কথা পড়তে না পড়তে লাগাবে—এমন করলে তো এ স্কুলে থাকা চলে না দেখছি! বললাম যে ফোর্থ ক্লাসের একজামিনের পড়া দিচ্ছি দেখিয়ে—তা না, অমনি লাগানো হয়েছে। এ রকম করলে কি মানুষ টেঁকে মশাই?

বলা বাহুল্য, যদুবাবু জানিতেন, য়্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার এ ঘণ্টায় নীচের হলে য়্যাডিশনাল হিস্ট্রির ক্লাস লইতেছেন।

ক্ষেত্রবাবু নীরব সহানুভূতি জানাইয়া চুপ করিয়া থাকাই নিরাপদ মনে করিলেন। তিনি ছাপোষা মানুষ, আজ সতেরো বছর ত্রিশ টাকা বেতনে এই স্কুলে চাকরি করিতেছেন। বেলেঘাটা অঞ্চলে একটিমাত্র ঘর ভাড়া লইয়া আছেন সকালে ও সন্ধ্যায় সামান্য একটু হোমিওপ্যাথি করিয়া আর কিছু উপার্জন করেন। চাকুরিটুকু গেলে এ বাজারে পথে বসিতে হইবে।

হেডপণ্ডিত মশায় বৃদ্ধ লোক, তিনি ক্লার্কওয়েল সাহেবের পূর্ব হইতে এ স্কুলে আছেন—তিনি আর নারাণবাবু। অনেক মাস্টার আসিল, চলিয়া গেল, তিনি ঠিক আছেন। মেজাজ দেখাইতে গেলে চাকরি করা চলে না। তবে তিনি ইহাও জানেন, লম্ফঝম্ফ করা যদুবাবুর স্বভাব, শেষ পর্যন্ত কোন দিক হইতেই কিছু দাঁড়াইবে না।

এই সময় নারাণবাবু ঘরে ঢুকিলেন। তিনিও বৃদ্ধ, এই স্কুলেরই একটি ঘরে থাকেন—নিজে রান্না করিয়া খান। আজ পয়ঁত্রিশ বছর এ স্কুলে আছেন এবং এইভাবেই আছেন। বৃদ্ধের নিকট কেহ কখনও তাঁহার কোন আত্মীয়-স্বজনকে আসিতে দেখে নাই। রোগা, বেঁটে-চেহারার মানুষটি, পাকশিটে গড়ন, গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবি ততোধিক ময়লা ধুতি, পায়ে চটি জুতো।

নারাণবাবু পকেট হইতে একটি টিনের কৌটা বাহির করিয়া একটি বিড়ি ধরাইলেন।

ক্ষেত্রবাবু হাত বাড়াইয়া বলিলেন, দিন একটা, কাঠিটা ফেলবেন না।

নারাণবাবু বলিলেন, কী হয়েছে, আজ যদুবাবুকে হেডমাস্টার ডাকিয়েচে কেন?

যদুবাবু চড়াগলায় মেজাজ দেখানোর সুরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, সেই কথাই তো বলচি। শুধু শুধু অন্ত্যজটা আমায় ডেকে নিয়ে গিয়ে—

নারাণবাবু বলিলেন, আস্তে, আস্তে—

যদুবাবু গলা আরও এক পর্দা চড়াইয়া বলিলেন, কেন, কিসের ভয়? যদু মুখুজ্জে ওসব গ্রাহ্যি করে না। অনেক আলম দেখে এসেছি, থার্ড ক্লাস এম-এ— তার আবার প্রতাপটা কিসের হ্যা? কেবল লাগানো-ভাঙানো সব সময়! অত লাগা'নার ধার ধারে কে? উনি ভাবেন, সবাই ওঁকে ভয় করে চলবে। যে চলে সে চলুক, যদু মুখুজ্জে সে

রকম বংশের—

বাহিরে বুট জুতার শব্দ শোনা গেল—মিঃ আলমের পায়ে বুট আছে সবাই জানে—যদুবাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিয়া উঠিলেন, যাই, খড়িটা দিন নারাণবাবু দয়া করে, ক্লাস আছে।

নারাণবাবু বলিলেন, চল, আমিও যাই। ওরে কেবলরাম, ইণ্ডিয়ার বড় ম্যাপখানা দে তো—

কিন্তু দেখা গেল, যে ঘরে ঢুকিল সে মিঃ আলম নয়, বইয়ের দোকানের একজন ক্যানভাসার—এক হাতে ব্যাগ ঝোলানো, অন্য হাতে কিছু নতুন স্কুল-পাঠ্য বই। ক্যানভাসারের সুপরিচিত মূর্তি। ক্যানভাসারের প্রশ্নের উত্তরে তাহাকে হেডমাস্টারের আপিস দেখাইয়া দিয়া যদুবাবু পুনরায় শুরু করিলেন, হ্যাঁ, আমি যা বলব এক কথা। কাউকে ভয় করে না এই যদু মুখুজ্জে। বলি বাবা, এ স্কুল গড়ে তুলেছে কে? ওই নারাণ বাঁড়ুজ্জে আর হেডপণ্ডিত। সাহেব এল তো কাল, উড়ে এসে জুড়ে বসেচে—আর ওই অন্ত্যজ—

মিঃ আলমের প্রবেশটা একটু অপ্রত্যাশিত ধরনে ঘটিল।

যদুবাবু হঠাৎ ঢোক গিলিয়া চুপ করিয়া গেলেন।

মিঃ আলমের ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র ও সংযত। মুখের উপর কেহ গালাগালি দিলেও মিঃ আলমের কথাবার্তা বা ব্যবহারে কখনও রাগ প্রকাশ পায় না। আলম বলিল, ক্ষেত্রবাবুর একটা দরখাস্ত দেখলাম হেডমাস্টারের টেবিলে, কাল আসবেন না। কী কাজ?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আজ্ঞে, কাল আমার ভাগ্নীর বিয়ে—

—তা একদিন কেন, দুদিন ছুটি নিন না। আমি সাহেবকে বলে দেব এখন।

ক্ষেত্রবাবু বিনয়ে গলিয়া গিয়া বলিলেন, যে আজ্ঞে। তাই দেবেন বলে। আমার সুবিধে হয় তা হলে—থ্যাংক্স্।

—নো মেন্শন্—

ছুটির ঘণ্টা এইবার পড়িবে। শেষের ঘণ্টাটা কি কাটিতে চায়? ক্ষেত্রবাবু ও যদুবাবু তিনবার ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন। চারিটা বাজিতে পনেরো মিনিট, আট মিনিট—এখনও চার মিনিট।

স্কুল-ঘরের নীচের তলায় একটা অন্ধকূপ ঘরে থার্ড পণ্ডিত জগদীশ ভট্চাজ জ্যোতির্বিনোদ মশায় আছেন। বাড়ি পূর্ববঙ্গে, দশ বৎসর এই স্কুলে আছেন, কুড়ি টাকায় ঢুকিয়াছিলেন, এখনও তাই—গত দশ বৎসরে এক পয়সাও মাহিনা বাড়ে নাই—অবশ্য অনেক মাস্টারেরই বাড়ে নাই—হেডমাস্টার ও য়্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার ছাড়া হেডমাস্টারের মাহিনা গত চারি বৎসরের মধ্যে দুই শত টাকা হইতে দুই শত পঁচাত্তর এবং মিঃ আলমের মাহিনা ষাট হইতে পঁচাশি হইয়াছে।

ভুলিয়া যাইতেছিলাম, মিস্ সিবসনের মাহিনা গত দুই বৎসরে এক শত হইতে দেড় শত দাঁড়াইয়াছে।

উপরের তিন জনের মাহিনা বছর বছর বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ নীচের দিকের শিক্ষকগণের বেতনের অংক গত দশ পনেরো বিশ বৎসরেও দারুব্রহ্মবৎ অনড় ও অচল আছে কেন—এ প্রশ্ন উত্থাপন করিবার সাহস পর্যন্ত কোন হতভাগ্য শিক্ষকের নাই। সে কথা থাক্।

জগদীশ জ্যোতির্বিনোদ সিক্স্থ্ ক্লাসে বাংলা পড়াইতেছিলেন। তিনি শেষ ঘণ্টার দীর্ঘতায় অতিষ্ঠ হইয়া একটি ছেলেকে ঘড়ি দেখিতে পাঠাইলেন। আপিসঘরে ঘড়ি, সিঁড়ির মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড় বাড়াইয়া চালাক ছেলেরা ঘড়ি দেখিয়া ফিরিয়া আসে, যাহাতে হেডমাস্টারের চোখে না পড়িতে হয়। কিন্তু ভাঙা পা খানায় পড়ে। জগদীশ জ্যোতির্বিনোদের প্রেরিত হতভাগ্য ছাত্রটি একেবারে হেডমাস্টারের সামনে পড়িয়া গেল—ঘড়ি দেখিতে চেষ্টা করিবার অবস্থায়।

ক্লার্কওয়েল ভীমগর্জনে হাঁকিলেন, হোয়াট ইউ আর ট্রাইং টু লুক য়্যাট? ইউ কাম্ আপ।

ছোট ছেলে, কাঁপিতে কাঁপিতে আপিস-ঘরে ঢুকিল। সেখানে মিঃ আলম বসিয়া ছিল। আলম জিজ্ঞাসা করিল, কী করছিলে নন্দ?

—ঘড়ি দেখছিলাম স্যার্।

—কেন? ক্লাসে কেউ নেই?

—আজ্ঞে, থার্ড পণ্ডিতমশাই আছেন। তিনি ঘড়ি দেখতে পাঠিয়ে দিলেন। আলম ও হেডমাস্টার পরস্পরের দিকে চাহিলেন।

—আচ্ছা, যাও তুমি।

মিঃ আলম বলিলেন, চলবে না স্যার্। কতকগুলো টীচার আছে, একেবারে অকর্মণ্য, শুধু ঘড়ি দেখতে পাঠাবে ছেলেদের। কাজে মন নেই। এই থার্ড পণ্ডিত একজন, যদুবাবু, হীরেনবাবু, শরৎবাবু, আর ওই হেডপণ্ডিত—

একটা নোটিস লিখে দিন মিঃ আলম, স্কুল-ছুটির পরে মাস্টারেরা সব আমার সঙ্গে দেখা না করে না যায়। ঘণ্টা দিতে বারণ করে দিন, নোটিস ঘুরে আসুক।

মিঃ আলম হাঁকিল, কেবলরাম, ঘণ্টা দিয়ো না।

একে ঘণ্টা কাটে না, তাহার উপর ক্লাসে ক্লাসে হেডমাস্টারের নোটিস গেল—ছুটির পর কোন মাস্টার চলিয়া যাইতে পারিবেন না, হেডমাস্টার তাঁহাদের স্মরণ করিয়াছেন।

হেডমাস্টারের আপিস-ঘর একে একে যদুবাবু, শরৎবাবু, নারাণবাবু প্রভৃতি আসিয়া জুটিলেন। জ্যোতির্বিনোদ মশায় সকলের শেষে কম্পিত দুরু-দুরু বক্ষে প্রবেশ করিলেন; কারণ, তিনি সেই ছেলেটির মুখে শুনিয়াছেন সব কথা। তাঁহার জন্যই যে এই বিচার-সভার আয়োজন, তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি নাই।

হেডমাস্টার বলিলেন, ইজ্ এভ্রিবডি হিয়ার?

মিঃ আলম উত্তর দিলেন, ক্ষেত্রবাবু আর হেডপণ্ডিতকে দেখিচ নে।

নারাণবাবু বলিলেন, ক্লাসে রয়েছেন, আসছেন।

কথা শেষ হইতেই তাঁহারাও ঢুকিলেন।

—এই যে আসুন, আপনাদের জন্যে সাহেব অপেক্ষা করছেন।

ক্লার্কওয়েল শিক্ষকদের সভায় অতি তুচ্ছ কথা বলিবার সময়ও জজ সাহেবের মত গাম্ভীর্য ও আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বাজেট সভায় বাজেট পেশ করিবার সময় অর্থসচিব যত না বাগ্মিতা দেখান তদপেক্ষা বাগ্মিতা দেখাইয়া থাকেন। তিনি বর্তমানে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া টাই ধরিয়া কখনও দক্ষিণে কখনও বামে হেলিয়া গম্ভীর সুরে আরম্ভ করিলেন, টীচার্স, আজ আপনাদের ডেকেচি কেন এখনি বুঝবেন। আমরা এখানে কতকগুলি তরুণ আত্মার উন্নতির জন্যে দায়ী (বড় বড় কথা বলিতে ক্লার্কওয়েল সাহেব খুব ভালবাসেন), আমরা শুধু মাইনে নিয়ে ছেলেদের ইংরেজী শেখাতে আসি নি, আমরা এসেছি দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল বালকদের সত্যিকার মানুষ করে তুলতে। আমরা তাদের সময়নিষ্ঠা শেখাব, কর্তব্যনিষ্ঠা শেখাব—তবে তারা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে দেশের বড় বড় কার্যভার হাতে নিয়ে নিজেদের জীবন সার্থক করে তুলতে পারবে, সেই সঙ্গে দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হবে।

দুই-একজন শিক্ষক বলিলেন, ঠিক কথা, ঠিক কথা।

—এখন দেখুন, যদি আমরাই তাদের সময়নিষ্ঠা ও কর্তব্যানুরাগ না শিখিয়ে ফাঁকি দিতে শেখাই, যদি আমরা নিজেরা নিজেদের কর্তব্য কাজে অবহেলা করি, তবে সে যে কত বড় অপরাধ, তা ধারণা করবার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অনেকের নেই দেখা যাচ্ছে। শিক্ষকতা শুধু পেটের ভাতের জন্যে চাকরি করা নয়, শিক্ষকতা একটা গুরুতর দায়িত্ব—এই জ্ঞান যাদের না থাকে, তারা শিক্ষক এই মহৎ নামের উপযুক্ত নয়।

দুই-চারজন শিক্ষক মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিলেন।

—আমি জানি, এখানে এমন শিক্ষক আছেন, যাঁদের মন নেই তাঁদের কাজে। তাঁদের প্রতি আমার বলবার একটিমাত্র কথা আছে। মাই গেট ইজ ওপ্ন্—তাঁরা দিব্যি তার মধ্যে দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে চলে যেতে পারেন, কেউ তাঁদের বাধা দেবে না।

হেডমাস্টার কটমট করিয়া যদুবাবু, থার্ড পণ্ডিত ও হেডপণ্ডিতের দিকে চাহিলেন।

—আজকের ঘটনাই বলি। আপনাদের মধ্যে কোন একজন শিক্ষক আজ আপিসে ঘড়ি দেখতে পাঠিয়েছিলেন একটি ছেলেকে। তিনি যে কতবড় গুরুতর অন্যায় করেছেন, তা তিনি বুঝতে পারছেন না। এতে প্রমাণ হল যে, কর্তব্য কাজে তাঁর মন নেই, কখন ঘণ্টা শেষ হবে সে জন্য তাঁর মন উসখুস করছে—তাঁর দ্বারা সুচারুরূপে শিক্ষকের কর্তব্য কখনই সম্পন্ন হতে পারে না। সুকুমারমতি বালকদের সামনে তিনি কী আদর্শ দাঁড় করাবেন? কাজে ফাঁকি দেবার আদর্শ, কর্তব্যে অবহেলার আদর্শ—কী বলেন আপনারা?

সকলেই মাথা এক পাশে হেলাইয়া বলিলেন, ঠিক কথা।

—এখন আমি আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। সে শিক্ষকের প্রতি আর ভাল ব্যবহার করা চলে কি? তাঁর দ্বারা এ স্কুলের কাজ চলে কি? বলুন আপনারা? আমি মিঃ আলমকে এই প্রশ্ন করচি। মিঃ আলম একজন কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষক বলে আমি জানি। আর একজন ভাল শিক্ষক আছেন—নারাণবাবু তাঁর প্রতিও আমি এই প্রশ্ন করচি।

ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু ও থার্ড পণ্ডিত তিন জনেরই মুখ শুকাইল। তিন জনেই ঘড়ি দেখিতে পাঠাইয়াছিলেন, তিন জনের প্রত্যেকেই ভাবিলেন তাঁহার উদ্দেশেই হেডমাস্টারের এই বক্তৃতা।

নারাণবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, একটা কথা আছে আমার স্যার্।

—কী বলুন?

—এবার তাঁকে ক্ষমা করুন, তিনি যেই হোন, আমার নাম জানবার দরকার নেই, এবার তাঁকে ক্ষমা করুন। ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিন স্যার্।

হেডমাস্টারের কণ্ঠস্বর ফাঁসির হুকুম দিবার প্রাক্কালে দায়রা-জজের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল।

—না নারাণবাবু, তা হয় না। আমি নিজের কর্তব্য কর্মে অবহেলা করতে পারব না—আমি এই ইন্স্টিটিউশনের হেডমাস্টার, আমার ডিউটি একটা আছে তো? আমি চোখ বুজে থাকতে পারি নে। আমার কর্তব্য এখানে সুস্পষ্ট, হয়তো তা কঠোর, কিন্তু তা করতে হবে আমায়। আমি সেই টীচারকে সাস্‌পেণ্ড করলাম।

হঠাৎ যদুবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, স্যার্, আমি ঘড়ি দেখতে কোনদিন পাঠাই নি—আজ পাঠিয়েছিলাম, তার একটা কারণ ছিল স্যার্, আমার স্ত্রী অসুস্থ, ডাক্তার আসবে চারটের পরেই—তাই—এবারটা আমায়—

তিনি এতক্ষণ বসিয়া বসিয়া এই কৈফিয়তটি তৈরী করিতেছিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, তাঁহারই উদ্দেশে হেডমাস্টার এতক্ষণ ধরিয়া বাক্যবাণ বর্ষণ করিলেন। বলা বাহুল্য, কৈফিয়তটির মধ্যে সত্যের বালাই ছিল না।

হেডমাস্টারের চোখ কৌতুকে নাচিয়া উঠিল। তাহার একটা কারণ, যদুবাবু কোন-দিনই বাগ্মী নহেন, বর্তমানে ভয় পাইয়া যে কথাবুলি বলিলেন, সেগুলির ইংরেজী বারো আনা ভুল। অথচ যদুবাবু ব্যাকরণ পড়ান ক্লাসে—ইংরেজীর কী কী ভুল হইল, তিনি নিজেও তাহা বলিবার পরক্ষণেই বুঝিয়া লজ্জিত হইয়াছেন, কিন্তু বলিবার সময় কেমন হইয়া যায় সাহেবের সামনে!

হেডমাস্টার বলিলেন, আপনি প্রায়ই ও-রকম করে থাকেন কি না সে সব এখানে বিচার্য বিষয় নয়। আপনার কর্তব্য-কর্মে অবহেলা একবারও আমি ক্ষমা করিতে পারি নে।

নারাণবাবু উঠিয়া বলিলেন, এবার আমাদের অনুরোধটা রাখুন স্যার্।

—আচ্ছা, আমি একজনের সম্বন্ধে সে অনুরোধ মানলাম। কারণ, তাঁর বাড়িতে গুরুতর পারিবারিক কারণ আছে তিনি বলচেন। একজন শিক্ষক মিথ্যে কথা বলচেন, এ রকম ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। কিন্তু আমি থার্ড পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করি, তাঁর কী কারণ ছিল ঘন ঘন ঘড়ি দেখবার? তিনি স্কুলেই থাকেন। তাঁর কোন তাড়াতাড়ি দেখি না। তাঁকে ক্ষমা করতে পারি না. তাঁকে আমি সাস্‌পেণ্ড করলাম।

থার্ড পণ্ডিত এবার দাঁড়াইয়া কাঁদো-কাঁদো সুরে বাংলায় বলিলেন, (তিনি ইংরেজী জানেন না), সাহেব, এবার আমায় ক্ষমা করুন, আমি এমন আর কখনও করব না।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, খুব বাঁচিয়া গিয়াছি এ যাত্রা! আমিও যে ঘড়ি দেখিতে পাঠাই,

সেটা কেহ জানে না।

হেডমাস্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, আমার হুকুম নড়ে না। ছেলেদের প্রতি কর্তব্য-পালন আগে করতে হবে, তার পর ব্যক্তিগত দয়া-দাক্ষিণ্য। সামনের বুধবারে স্কুল কমিটীর মীটিং আছে, সেখানে আমি আপনার কথা ওঠাব। কমিটীর অনুমতি নিয়ে আপনার শাস্তির ব্যবস্থা হবে। আপনি কাল থেকে আর ক্লাসে যাবেন না। কত দিন আপনাকে সাস্‌পেন্ড করা হবে, সেটা কমিটী ঠিক করবেন।

সভা ভঙ্গ হইল। হেডমাস্টার গট গট করিয়া আপিস ছাড়িয়া নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। মাস্টারেরাও একে একে সরিয়া পড়িলেন—তাঁহারা যদি কিছু বলেন, ফুটপাথে গিয়া বলিবেন।

সন্ধ্যার সময় ক্লার্কওয়েল সাহেব মোটরে খয়রাগড়ের রাজকুমারকে পড়াইতে চলিয়া গেলেন ল্যান্সডাউন রোডে। মোটা টাকার টুইশানি, তাহারাই মোটর পাঠাইয়া লইয়া যায়। সাহেব বাহির হইয়া যাইবার পরে মিস্ সিবসন্ ঘরে বসিয়া সেলাই করিতেছে, এমন সময় দরজার বাহিরে খুস-খুস শব্দ শুনিয়া বলিল, হু? কোন্ হ্যায়?

বিনম্র সংকোচে পর্দা সরাইয়া থার্ড পণ্ডিত একটুখানি মুখ বাহির করিয়া উঁকি মারিয়া বলিলেন, আমি মেমসাহেব।

—ও, পাণ্ডিট্! কাম্ ইন্। হোয়াট্'স হোয়াট্?

থার্ড পণ্ডিত হাত জোড় করিয়া কাঁদো-কাঁদো সুরে বলিলেন, সাহেব আমাকে সাস্‌পেন্ড করে'চন।

—বেগ ইওর পার্ডন্?

থার্ড পণ্ডিত 'সাস্‌পেন্ড' কথাটার উপর জোর দিয়া কথা বলিয়া নিজের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন—মি, হাম—

মিস্ সিবসন্ আস্‌লী বিলাতী, নানা দুর্ভাগ্যের মধ্যে পড়িয়া ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে চাকরি লইতে বাধ্য হইয়াছে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, ব্যাপারটা বুঝিয়া হাসিয়া বলিল, ওয়েল—

—ইউ মাদার—আই সন্—সাহেবকে বলুন মা—

—ইয়েস্, আই প্রমিস্ টু—

—হ্যাঁ, মা, বুড়ো হয়েছি—ওল্ড ম্যান (থার্ড পণ্ডিত নিজের মাথার সাদা চুলে হাত দিয়া দেখাইলেন) না খেয়ে মরে যাব—(মুখের কাছে হাত লইয়া গিয়া খাওয়ার অভিনয় করিয়া হাত নাড়িয়া না-খাওয়ার অভিনয় করিলেন) ইট্ নট—

মেমসাহেব হাসিয়া বলিলেন, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড পাণ্ডিট্।

—নমস্কার মাদার।

থার্ড পণ্ডিত চলিয়া আসিলেন।

যদুবাবু ছুটি হইলে মলঙ্গা লেনের ছোট বাসাটায় ফিরিয়া গেলেন। দশ টাকা মাসিক ভাড়ায় একখানি মাত্র ঘর দোতলায়—এক বাড়িতে আরও তিনটি পরিবারের সঙ্গে বাস। যদুবাবুর স্ত্রী দুইখানি রুটি ও একটু পেঁপের তরকারি আনিয়া সামনে ধরিলেন। যদুবাবু গোগ্রাসে সেগুলি গিলিয়া বলিলেন, আর একটু জল—

যদুবাবু নিঃসন্তান। ত্রিশ টাকা মাহিনায় ও দুই-একটি টুইশানির আয়ে স্বামী-স্ত্রীর কায়ক্লেশে চলিয়া যায়।

জলপান করিয়া যদুবাবু একটু সুস্থ হইয়া তামাক ধরাইলেন।

যদুবাবুর স্ত্রীর একসময়ে রূপসী বলিয়া খ্যাতি ছিল, এখন নানা দুঃখকষ্টে সে রূপের কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নাই আর, প্রায় সকল বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের মতই স্বামীর উপর তাহার টানটা বেশী। স্বামীর কাছে বসিয়া বলিল, তোমার বড় শালীর বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে, ছেলের অন্নপ্রাশন, যাবে নাকি?

এ যে একটু বক্রোক্তি, যদুবাবু সেটা বুঝিলেন। এটি যদুবাবুর স্ত্রীর বৈমাত্রেয় দিদি,

সকলে বলে এই মেয়েটির রূপ দেখিয়া যদুবাবু নাকি একদিন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘটে নাই। যদুবাবুর স্ত্রী খোঁচা দিতে ছাড়ে না এখনও।

—তুমি যাও। এখন মুর্শিদাবাদ যাই সে সময় কই? ওরা নিতে আসবে?

—তা জানি নে। তারা এখন বড়লোক, যদিই ধরো গরিব কুটুম্বর অত তোয়াজ না করে! চিঠি একখানা দিয়েছে, এই যথেষ্ট।

—তা হলে যাওয়া হবে না। ভাড়ার টাকা, তারপর ধর নকুতো কিছু একটা দিতে হবে—সে হয় না।

—আমার কাছে কিছু আছে—তবে তুমি যদি না যাও, আমি যাব না!

—আমি ছুটি পাব না। আলম ব্যাটা বড্ড লাগাচ্ছে আমার নামে সাহেবের কাছে। আজ তো এক কাণ্ডতে বেধে গিয়েছিলাম আর কি, অতি কষ্টে সামলেছি। আমার হয় না। তুমি বরং যাও।

এমন সময় বাহির হইতে নারাণবাবুর গলা শোনা গেল—ও যদু, আছ নাকি?

—আসুন, আসুন, নারাণদা—

নারাণবাবু ঘরে ঢুকিয়া যদুবাবুর স্ত্রীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, বউঠাকরুন, একটু চা খাওয়াতে পার?

যদুবাবুর স্ত্রী ঘোমটার ফাঁকে যদুবাবুর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন—অর্থাৎ চা নাই, চিনি নাই, দুধ নাই। অর্থাৎ যদুবাবু বাড়িতে চা খান না।

যদুবাবু বলিলেন, বসুন নারাণদা, আমি একটু আসচি।

নারাণবাবু হাসিয়া বলিলেন, আসতে হবে না ভায়া, আমি সব এনেছি পকেটে, এই যে—আমি খাই কিনা, সব আমার মজুত আছে। তোমার এখানে আসব বলে পকেটে করে নিয়েই এলাম। এই নাও বউঠাকরুন।

—তারপর, দেখলেন তো কাণ্ডখানা?

—ও তো দেখেই আসছি। নতুন আর কী বল?

—আমায় কী রকম অপমানটা—

—আরে, তুমি যে ভায়া, গায়ে পেতে নিলে, ওটা আসলে থার্ড পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে বলছিল সাহেব।

—না না, আপনি জানেন না, আমাকেও বলছিল ওই সঙ্গে।

—কিছু না, তোমার হয়েচে—ঠাকুরঘরে কে? না, আমি তো কলা খাই নি। তুমি কেন বলতে গেলে ও-কথা?

—যাক, তা নিয়ে তর্ক করে কোন লাভ নেই। ও যেতে দিন।

চা-পান শেষ করিয়া দুইজনে উঠিলেন। টুইশানির সময় সমাগত।

যদুবাবু শাঁখারিটোলায় এক বাড়িতে টুইশানিতে গেলেন। নীচের তলায় অন্ধকার ঘর, তিনটি ছেলে একসঙ্গে পড়ে। ভীষণ গরম ঘরের মধ্যে, কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ আসে পাশের সিউয়ার্ড ডিচ হইতে! দুইটি ঘণ্টা তাহাদের পড়া বলিয়া ক্লাসের টাস্ক লিখাইয়া দিতে রাত আটটা বাজিল। আর একটা টুইশানি নিকটেই, যদু শ্রীমানীর লেনে। সেখানে একটি ছেলে—ম্যাট্রিক ক্লাসে পড়ে, বেশ একটু নির্বোধ অথচ পড়াশুনায় মন খুব। এমন ধরনের ছেলেরাই প্রাইভেট টিউটরকে ভোগায় বেশী। এ ছেলেরা এই অঙ্ক কষাইয়া লয় ওটার ভাবাংশ লিখাইয়া লয়—খাটাইয়া ফরমাশ দিয়া যদুবাবুকে রীতিমত বিরক্ত করিয়া তোলে প্রতি দিন। ক্লার্কওয়েল সাহেবকে ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু প্রাইভেট টুইশানির ছাত্র বা ছাত্রের অভিভাবকদের ফাঁকি দেওয়া বড়ই কঠিন।

রাত পৌনে দশটার সময় যদুবাবু উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন! এমন সময় ছেলেটি বলিল, একটু বাকি আছে স্যার্। কাল ইংরেজী থেকে বাংলা রিট্রানস্লেশন (বারো আনা শিক্ষক ও ছাত্র এই ভুল কথাটি ব্যবহার করে) রয়েচে, বলে দিয়ে যান।

যদ্‌বাব্‌র মাথা তখন ঘ্‌রিতেছে। তিনি বলিলেন, আজ না হয় থাক।

—না স্যার্‌। বক্‌নি খেতে হবে, বলে দিয়ে যান।

—কই, দেখি। এতটা? এ যে ঝাড়া আধ ঘণ্টা লাগবে! আচ্ছা, এস তাড়াতাড়ি। আমি বলে যাই, তুমি লিখে নাও।

নির্বোধ ছাত্রকে লিখাইয়া দিতেও প্রায় আধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। রাত সাড়ে দশটার সময় ক্লান্ত বিরক্ত যদ্‌বাব্‌ আসিয়া বাড়ি পেণছিলেন ও যা-হয় দ্‌টি ম্‌খে দিয়াই শয্যা আশ্রয় করিলেন।

পরদিন স্কুলে ক্লার্কওয়েল সাহেব জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন, পণ্ডিত, তুমি মেমসাহেবের কাছে কেন গিয়েছিলে? চাকরি তোমার বন্ধ আছে আমার হ্‌কুমে, তা রদ হবে না।

জ্যোতির্বিনোদ ইংরেজী বোঝেন না, কিন্তু আন্দাজ করিয়া লইলেন, সাহেবকে মেমসাহেব কোন কথা বলিয়া থাকিবে, তাহার ফলেই এই ডাক। তিনি হাত জোড় করিয়া বলিলেন, সাহেব মা-বাপ, আপনি না রাখলে কে রাখবে? আমি এমন কাজ আর কখনও করব না।

হেডমাস্টারের ম্‌খে ঈষৎ হাসির আভাস দেখিয়া জ্যোতির্বিনোদের মনে আশ্বাস জাগিল।

সাহস পাইয়া তিনি হেডমাস্টারের টেবিলের সামনে আগাইয়া গিয়া বলিলেন, এবার আমায় মাপ কর্‌ন,—ব্রাহ্মণ—আমার অন্ন—

হেডমাস্টার টেবিলের উপর কিল মারিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ আমি মানি না। আমার কাছে হিন্দ্‌-ম্‌সলমান সমান।

জ্যোতির্বিনোদ চ্‌প করিয়া রহিলেন—ইংরেজী ব্‌ঝিয়াছিলেন বলিয়া নয়, টেবিলে কিল মারার দর্‌ন ভাবিলেন, সাহেব যে কারণেই হোক চটিয়াছেন।

হেডমাস্টার ভ্র্‌ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ওয়েল?

জ্যোতির্বিনোদ প্‌নরায় হাত জোড় করিয়া বলিলেন, আমায় মাপ কর্‌ন এবার।

—আচ্ছা, যাও এবার, ও-রকম আর না হয়, তা হলে মাপ হবে না।

জ্যোতির্বিনোদ সাহেবকে নমস্কার করিয়া আপিস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজে মিটিল না। স্কুল বসিবার পর মিঃ আলম শ্‌নিয়া হেডমাস্টারকে ব্‌ঝাইলেন, এ রকম করিলে এ স্কুলে ডিসিপ্লিন রাখা যাইবে না—মাস্টাররা স্বভাবতই ফাঁকিবাজ, আরও ফাঁকি দিবে। অতএব সারকুলার বাহির করিয়া থার্ড পণ্ডিতকে মাপ করা হোক। কী জন্য সাস্‌পেণ্ড করা হইয়াছিল, তাহার কারণ এবং ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করিবার উপদেশ লিপিবন্ধ করা থাক্‌ সারকুলার-বহিতে। ইহাতে পণ্ডিত জব্দ হইয়া যাইবে।

হেডমাস্টারের কর্ণদ্বয় মিঃ আলমের জিম্মায় থাকিত, স্‌তরাং সেই মর্মেই সারকুলার বাহির হইয়া গেল। অন্যান্য শিক্ষকেরা জ্যোতির্বিনোদকে ভয় দেখাইল, চাকুরি এবার থাকিল বটে, তবে বেশী দিনের জন্য নয়, এই সারকুলার স্কুলের সেক্রেটারি বা কমিটীর কোন মেম্বারের চোখে পড়িলেই চাকুরি যাইবে।

ক্ষেত্রবাব্‌ পড়াইতেছেন, হেডমাস্টার সেখানে গিয়া পিছনের বেঞ্চির একটা ছেলেকে হঠাৎ ডাক দিয়া বলিলেন, তুমি কী ব্‌ঝেছ বল?

সে কিছ্‌ই শোনে নাই, পাশের ছেলের সঙ্গে গল্পে মত্ত ছিল, তীক্ষ্ণদৃষ্টি ক্লার্ক-ওয়েলের নজর এড়ানো সহজ কথা নয়।

হেডমাস্টার ক্ষেত্রবাব্‌র দিকে চাহিয়া বলিলেন, ডোণ্ট্‌ সিট্‌ অন ইওর চেয়ার লাইক এ বাহাদ্‌র—ছেলেরা কিছ্‌ শ্‌নছে না। উঠে উঠে দেখ্‌ন, কে কী করচে না-করচে!

ক্ষেত্রবাব্‌ ছেলেদের সামনে তিরস্কৃত হওয়ায় নিজেকে অপমানিত বিবেচনা করিলেন বটে; কিন্তু সাহেবের কাছে বিনীতকণ্ঠে অঙ্গীকার করিতে হইল যে, তিনি ভবিষ্যতে

দাঁড়াইয়া ও ক্লাসে পায়চারি করিতে করিতে পড়াইবেন।

সাহেবের জের এখানেই মিটিবার কথা নয়। সে দিন স্কুলের ছুটির পর টিচারদের মীটিং আহূত হইল। সাহেবের উপদেশবাণী বর্ষিত হইল। ছেলেদের স্বার্থ বজায় রাখিয়া যিনি টিকিতে পারিবেন, এ স্কুলে তাঁহারই শিক্ষকতা করা চলিবে; যাঁহার না পোষাইবে, তিনি চলিয়া যাইতে পারেন—স্কুলের গেট খোলা আছে।

বেলা সাড়ে পাঁচটায় হেডমাস্টারের সভা ভাঙিল। মাস্টারেরা বাহিরে আসিয়া নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। যদুবাবু লম্ফঝম্ফ শুরু করিলেন।

—রোজ রোজ এই বাজে হাঙ্গামা আর সহ্য হয় না—সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল—টিউশানিতে যাবার আগে আর বাসায় যাওয়া হবে না দেখছি, কবে যে আপদ কাটবে, নারায়ণের কাছে তুলসী দিই। আপনারা সব চুপ করে থাকেন, বলেনও না তো কোনও কথা! সবাই মিলে বললে কি সাহেবের বাবার সাধ্যি হয় এমন করবার?

অন্য দুই-একজন বলিলেন, তা আপনিও তো কিছু বললেন না যদুদা!

—আমি বলব কি এমনি বলব? আমি যে দিন বলব, সে দিন সাহেবকে ঠ্যালা বুঝিয়ে দেব, আর ঠ্যালা বুঝিয়ে দেব ওই অন্ত্যজটাকে—ও-ই কুপরামর্শ দেয়। আর সাহেবের মত আইডিয়াল টীচার আর হবে না! মারো ঝ্যাংরা!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, সে তো বোঝাই যাচ্ছে, কিন্তু ওকে নড়ানো সোজা কথা নয়। সাহেব ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, আর সবাই খারাপ, কেবল আলম ভাল—

হেডপণ্ডিত বৃদ্ধ লোক, স্মৃতিভ্রংশ ঘটায় অনেক সময় অনেকের নাম মনে করিতে পারেন না, আর ভাল ওই মেমসাহেব—কী ওর যেন নামটা?

—মিস সিবসন্।

—হ্যাঁ, ও খুব ভাল—

মাস্টাররা বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িলেন। ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু, নারাণবাবু ও ফণীবাবু প্রতিদিন ছুটির পরে নিকটবর্তী ছোট চায়ের দোকানে চা খাইতেন। বহুদিনের যাতায়াতের ফলে পিটার লেনের মোড়ের এই চায়ের দোকানটির সঙ্গে তাঁহাদের অনেকের স্মৃতি জড়াইয়া গিয়াছে। নিকট দিয়া যাইবার সময় কেমন যেন মায়া হয়।

ক্ষেত্রবাবুর মনে পড়ে তাঁহার চার বছরের ছেলেটির কথা। সেবার একুশ দিন ভুগিয়া টাইফয়েড রোগে মারা গেল। কত কষ্টভোগ, কত চোখের জল ফেলা, কত বিনিদ্র রজনী যাপন। এই চায়ের দোকানে বসিয়া সহকর্মীদের সঙ্গে কত পরামর্শ করিয়াছেন, আজ পেট ফাঁপিল কী করিতে হইবে: আজ কথা আড়ষ্ট হইয়া আসিতেছে, কী করিলে ভাল হয়! এই চায়ের দোকানের সামনে আসিলেই খোকার শেষের দিনগুলি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে।

নারাণবাবুর স্মৃতি স্কুলের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। আগের হেডমাস্টার ছিলেন অনুকূলবাবু। তিনি ছিলেন ঋষিকল্প পুরুষ। দুজনে মিলিয়া এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন—খুব বন্ধুত্ব ছিল দুজনের মধ্যে। অনুকূলবাবুর অনুরোধে নারাণ চাটুজ্জে রেলের চাকরি ছাড়িয়া আসিয়া এই স্কুলে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। এই স্কুলকে কলিকাতার মধ্যে একটি নামজাদা স্কুল করিয়া তুলিতে হইবে, এই ছিল সংকল্প। একদিন-দুইদিন নয়, দীর্ঘ পনেরো ষোলো বৎসর ধরিয়া সে কত পরামর্শ, কত আশা-নিরাশার দোলা, কত অর্থনাশের উদ্বেগ! একবার এমন সুদিনের উদয় হইল যে, নারাণবাবুদের স্কুল কলিকাতার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর স্কুল হইয়া গেল বুঝি। হেয়ার-হিন্দুকে ডিঙাইয়া সেবার এই স্কুলের এক ছাত্র ইউনিভার্সিটিতে প্রথম স্থান অধিকার করিল। নারাণবাবু দেড় শত টাকা বেতনে সুপারিন্টেন্ডেন্ট নিযুক্ত হইবেন, সব ঠিকঠাব—এমন সময় অনুকূলবাবু মারা গেলেন সব আশা-ভরসা ফুরাইল। একরাশ দেনা ছিল স্কুলের, পাওনাদারেরা নালিশ করিল গবর্নমেণ্ট-নিযুক্ত অডিটার আসিয়া রিপোর্ট করিল, স্কুলের রিজার্ভ ফণ্ডের টাকা ভূতপূর্ব হেডমাস্টার তছরূপ করিয়াছেন। বাড়িওয়ালা ভাড়ার দায়ে আসবাবপত্র বেচিয়া লইল নূতন ছাত্র ভর্তি হইবার আশা থাকিলে হয়তো এতটা ঘটিত না; কিন্তু ছাত্র আসিত অনুকূলবাবুর নামে, তিনিই চলিয়া গেলেন, স্কুলে আর রহিল কে? জানুয়ারি মাসে

আশানুরূপ ছাত্রের আমদানি হইল না, কাজেই পাওনাদারদের উপায়ান্তর ছিল না।

হেডপণ্ডিত চা খান না, তবুও মাস্টারদের সঙ্গে দোকানে বসিয়া গল্পগুজব করিয়া চা-পানের তৃপ্তি উপভোগ করেন আজ বহু বৎসর হইতে। বলিলেন, চলুন নারাণবাবু, চা খাবেন না? আসুন যদুবাবু, ক্ষেত্রবাবু—

মাস্টার মহাশয়দের এ দোকানে যথেষ্ট খাতির। নিকটবর্তী স্কুলের মাস্টার বলিয়াও বটে, অনেক দিনের খরিদ্দার বলিয়াও বটে। দোকানী বেঞ্চ হইতে অন্য খরিদ্দারদের সরাইয়া দেয়, মাস্টার মহাশয়দের চায়ের প্রকৃতি কিরূপ হইবে, সে সম্বন্ধে খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে, দুই-একটি ব্যক্তিগত প্রশ্নও করে আত্মীয়তা করিবার জন্য। অনেক সময় কাছে পয়সা না থাকিলে ধারও দেয়।

যদুবাবু বলিলেন, আমাকে একটু কড়া করে চা দিয়ো আদা দিয়ে।

নারাণবাবু বলিলেন, আমার চায়েও একটু আদা দিয়ো তো।

সকলের সামনে চা আসিল। সঙ্গে সঙ্গে পাশে একখানি করিয়া টোস্ট দিয়া গেল চায়ের পিরিচে প্রত্যেককে। দোকানীকে বলিতে হয় না, সে জানে, ইঁহারা কী খাইবেন, আজিকার খরিদ্দার তো নন।

স্কুলের হাড়ভাঙা খাটুনির পরে এবং যে যাহার টুইশানিতে যাইবার পূর্বে এখানটিতে বসিয়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া চা খাওয়া ও গল্পগুজব প্রত্যেকের পক্ষে বড় আরামদায়ক হয়। বস্তুত মনে হয় যে, সারাদিনের মধ্যে এই সময়টুকু অত্যন্ত আনন্দের। যাঁহারা চারিটা বাজিবার পূর্বে ঘড়ি দেখিতে পাঠান, তাঁহারা নিজেদের অজ্ঞাতসারে এই সময়টুকুরই প্রতীক্ষা করেন। তবে স্কুলমাস্টার হিসাবে ইঁহাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ, জীবনের পরিধি সুপ্রশস্ত নয়, সুতরাং কথাবার্তা প্রতিদিন একই খাত বাহিয়া চলে। সাহেব আজ অমুক ঘণ্টায় অমুকের ক্লাসে গিয়া কী মন্তব্য করিল, অমুক ছেলেটা দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে, অমুক অঙ্কটা এভাবে না করিয়া অন্য ভাবে কী করিয়া ব্ল্যাকবোর্ডে করা গেল, ইত্যাদি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, মাসটাতে ছুটিছাটা একেবারেই নেই, না নারাণবাবু?

—কই আর! সেই ছাব্বিশে কী একটা মুসলমানদের পর্ব আছে, তাও যে ছুটি দেবে কি না—

—ঠিক দেবে। মিঃ আলম আদায় করে নেবে।

—নাঃ, এক-আধ দিন ছুটি না হলে আর চলে না।

যদুবাবু বলিলেন, ওহে, হাফ কাপ একটা দাও তো। আজ চা-টা বেশ লাগছে—

চার পয়সার বেশী খরচ করিবার সামর্থ্য কোন মাস্টারেরই নাই চায়ের দোকানে। যদুবাবুর এই কথায় দুই-একজন বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। নারাণবাবু বলিলেন, কী হে যদু, দমকা খরচ করে ফেললে যে!

—খাই একটু নারাণদা। আর কদিনই বা!

যদুবাবু একটু পেটুক ধরনের আছেন, এ কথা স্কুলে সবাই জানে। বাজার-হাট ভাল করিয়া করিতে পারেন না পয়সার অভাবে, সামান্য বেতনে বাড়িভাড়া দিয়া থাকিতে হয়—কোথা হইতে ভাল বাজার করিবেন! তবে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ পাইলে সেখানে দুই-জনের খাদ্য একা উদরস্থ করেন, স্কুলে ইহা লইয়া নিজেদের মধ্যে বেশ হাসিঠাট্টা চলে।

নারাণবাবু বয়সে সর্বাপেক্ষা প্রবীণ, প্রবীণত্বের দরুন অপেক্ষাকৃত বয়ঃকনিষ্ঠদের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ জন্মিয়াছে তাঁহার মনে। তিনি ভাবিলেন, আহা, খাক খেতে পায় না, এই তো স্কুলে সামান্য মাইনের চাকরি; ভালবাসে খেতে, অথচ কী ছাই বা খায়! মুখে বলিলেন, খাও আর একখানা টোস্ট। আমি দাম দেব। ওহে, বাবুকে একখানা টোস্ট দাও—এখানে।

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন নারাণদা আমাদের শিবতুল্য লোক। তা দাও আর একখানা, খেয়ে নিই।

খাওয়া শেষ করিয়া সকলে বিড়ি বাহির করিলেন। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন দেশলাই পয়সায় দুইটা; তৎসত্ত্বেও কেহ দেশলাই রাখেন না পকেটে, দোকানীর নিকট

হইতে চাহিয়া কাজ সারিলেন।

নারাণবাবু বলিলেন, চল যাই, ছটা বাজে।

যদুবাবু বলিলেন, বাসায় আর যাওয়া হল না, এখন যাই গিয়ে শাঁকারিটোলা, চুনি ছাত্রের বাড়ি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমি যাব সেই ক্যানাল রোড, ইটালি—আমার ছাত্রেরা আবার সেখানে উঠে গিয়েছে।

নারাণবাবুও ছেলে পড়ান, তবে বেশী দূরে নয়, নিকটেই প্রমথ সরকারের লেনে, সরকারদের বাড়িতেই। বাহিরের ঘরে বুড়া যোগীন সরকার বসিয়া আছেন, নারাণবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, আসুন, মাস্টার মশায় আসুন। তামাক খান। বসুন।

—চুনি পান্না খেলে বাড়ি ফিরেচে?

—চুনি ফিরেচে, পান্নার দেখা নেই এখনও। হতচ্ছাড়া ছেলে মাঠে একবার গেলে তো কান্ডজ্ঞান থাকে না—বলই পিটছে, বলই পিটছে! দুটো নাতিই সমান। বসুন, তামাক খান, আসচে।

কিন্তু ছাত্রেরা না-আসিলে চলে না। নারাণবাবুকে দুইটা টুইশানি সারিয়া আবার স্কুলে ফিরিতে হইবে, নিজের হাতে রান্নাবান্না করিতে হইবে, কিছুক্ষণ সাহেবের সঙ্গে বসিয়া মেমসাহেবী গল্পও করিতে হইবে।

এমন সময়ে চুনি আসিয়া ডাকিল, মাস্টার মশায়, আসুন।

চুনি তেরো বছরের বালক, সিক্সথ ক্লাসে পড়ে। নারাণবাবু নিঃসন্তান, বিপত্নীক্—ছেলেটিকে বড় স্নেহ করেন। চুনি দেখিতেও খুব সুন্দর ছেলে, টক্‌টকে ফরসা রঙ, লাবণ্য-মাখা মুখখানি, তবে স্বভাব বিশেষ মধুর নয়। কথায় কথায় রাগ, স্নেহ-ভালবাসার ধার ধারে না—কেহ স্নেহ করিলে বোঝেও না, সুতরাং প্রতিদানেরও ক্ষমতা নাই। বড়-লোকের ছেলে, একটু গর্বিতও বটে।

চুনি নিজের পড়ার ঘরে আসিয়া বলিল, আজ একগাদা অংক দিয়েছেন ক্ষেত্রবাবু, আমায় সব বলে দিতে হবে।

—হবে, বার কর্ খাতা বই।

—আপনি কখন চলে যাবেন?

—কেন রে?

—আজ আধ ঘণ্টা বেশী থাকতে হবে স্যার্।

—থাকব, থাকব। তোর যদি দরকার হয়, থাকব না কেন? তোর কথা ঠেলতে পারি না—

—মাস্টার বাড়িতে রাখা ওই জন্যেই তো। এতগুলো করে টাকা মাইনে দিতে হয় আমাদের ফি মাসে শুধু প্রাইভেট মাস্টারদের—কাকা বলছিলেন আজ সকালে।

কথাটা নারাণবাবুর লাগিল। তিনি আত্মীয়তা করিতে গেলে কী হইবে? চুনি সে সব বোঝে না, উড়াইয়া দেয়—পয়সা দেখায়।

ধমক দিয়া বলিলেন, তোর সে কথায় থাকার দরকার কী চুনি? অমন কথা বলতে নেই টীচারকে। ছিঃ!

চুনি অপ্রতিভ মুখে নিচু হইয়া খাতার পাতা উল্টাইতে লাগিল। সুন্দর মুখে বিজলির আলো পড়িয়া উহাকে দেববালকের মত লাবণ্য-ভরা অথচ মহিমময় দেখাইতেছে। ইহারা আসে কোথা হইতে, কোন্ স্বর্গ হইতে? কে ইহাদের মুখ গড়ায় চাঁদের সব সুষমা ছানিয়া ছাঁকিয়া নিঙড়াইয়া?

নারাণবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। কোথায় যেন পড়িয়াছিলেন, কোন্ কবির লেখা একটি ছত্র—'যৌবনে দাও রাজটিকা'—

সত্য কথা। যৌবন পার হইয়া গিয়াছে বহুদিন, আজ আটান্ন বছর বয়স—ষাটের দুই কম। ডাক তো আসিয়াছে, গেলেই হয়। কী করিলেন সারা জীবন স্কুল-স্কুল করিয়া সব গেল। নিজের বলিতে কিছু নাই। আজ যদি চুনির মত একটা ছেলে—

'যৌবনে দাও রাজটিকা'—সারা দুনিয়ার সমস্ত আশা-ভরসা আমোদ-আহ্লাদ আজ

অপেক্ষমাণ বশ্যতার সঙ্গে এই বালকের সম্মুখে বিনম্রভাবে দাঁড়াইয়া, কত কর্মভার-বিপুলে দিবসের সঙ্গীত বাজিবে উহার জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কত অজানা অনুভূতির বিকাশ ও কর্ম-প্রেরণা! চুনির সঙ্গে জীবন বিনিময় করা যায় না—এই তেরো বছরের বালকের সঙ্গে?

—স্যার, ছুটির ইংরিজী কী হবে? আজ আমাদের ছুটি—এর কী ট্রানস্লেশন করব স্যার্?

—আজ আমাদের ছুটি, আজ আমাদের ছুটি—কিসের মধ্যে আছে দেখি? বেশ। কর। আজ—টু-ডে, আমাদের—আওয়ার, ছুটি—হলি-ডে—

—টু-ডে আওয়ার হলি-ডে?—

—দূর, ক্রিয়া কই! ইংরিজীতে ভার্ব না দিলে সেণ্টেন্স হয় কখনও? কতবার বলে দিয়েচি না?

এমন সময় ঘরে ঢুকিল পান্না—চুনির ছোট ভাই। তাহার বয়স এগারো, কিন্তু চুনির চেয়েও সে দুষ্ট ও অবাধ্য, বাড়ির কাহারও কথা শোনে না, কেবল নারাণবাবুকে একটু ভয় করিয়া চলে? কারণ স্কুলে নারাণবাবুর হাতে বড় মার খায়। ইহাকে তিনি তত ভালবাসেন না।

পান্না ঘরে ঢুকিয়া অপরাধীর দৃষ্টিতে মাস্টারের দিকে চাহিল, তারপর শেল্ফের কাছে গেল বই বাহির করিতে।

নারাণবাবু কড়া সুরে বলিলেন, কোথায় ছিলে?

—খেলছিলাম স্যার্।

—কটা বেজেছে হুঁশ আছে?

পড়ার ঘরেই ঘড়ি আছে দেওয়ালে। পান্না সে দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে ছয়টা বাজিয়াছে। সুতরাং সে বলিল, সাড়ে ছটা স্যার্।

—হুঁ, গাধা কোথাকার! সাড়ে ছটা, না, সাড়ে সাতটা? বল্ কটা বেজেছে? ভাল করে দেখে বল্।

—সাড়ে সাতটা।

—ঠিক হয়েচে। এই বল খেলে এলে! কাল পড়া না হলে তোমার কী করি দেখো।

চুনি বলিল, স্যার্, আজ দুপুরে বেরিয়ে গিয়েচে, এই এল।

পান্না দাদার দিকে চাহিয়া বলিল, লাগানো হচ্ছে স্যারের কাছে? তোর ওস্তাদি আমি বার করে দেব বলচি।

—দে না দেখি? তোর বড় সাহস!

—এই মারলাম। কী করবি তুই?

নারাণবাবু বৃদ্ধ, দুই বলিষ্ঠ বালকের মধ্যে পড়িয়া যুদ্ধ তো থামাইতে পারিলেনই না, অধিকন্তু চশমাটি চূর্ণবিচূর্ণ হইবার সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে পান্না ড্রয়ারের ভিতর হইতে টর্চলাইট বাহির করিয়া চুনির মাথায় এক ঘা বসাইয়া দিল। ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিল।

চুনি হাউমাউ করিয়া কাঁদিবার ছেলে নয়, সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; নারাণবাবু হাঁ-হাঁ করিয়া আসিয়া পড়িতে না পড়িতে এই কাণ্ডটি ঘটিয়া গেল।

গোলমাল শুনিয়া চুনি-পান্নার মা, বিধবা পিসী ও দুই ভাই-বউ অন্তঃপুরের দিকের ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। চুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা কোন উত্তর না পাইয়া মাস্টারের উদ্দেশে নানাপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল—ও মা, মাস্টার তো বসে আছে, তার চোখের সামনে ছেলেটাকে একেবারে খুন করে ফেললে গা!

অন্য একটি বধূ মন্তব্য করিল, মাস্টারকে মানে না দিদি, ছেলেগুলো ভারি দুষ্টু।

চুনির মা বলিলেন, মাস্টার বসে বসে আফিম খেয়ে ঝিমোয়, তা ওকে মানবে কী করে?

নারাণবাবু মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেও মুখে বাড়ির স্ত্রীলোকদের উদ্দেশে কী বলিবেন? কে তাঁহাকে আফিম খাওয়াইয়াছে শুনিবার তাঁহার বড় কৌতূহল হইল।

চুনিকে লইয়া তাহার মা ও পিসীমা চলিয়া গেলে নারাণবাবু রাগের মাথায় পান্নাকে গোটা দুই চড় কষাইলেন, সে চুপ করিয়া রহিল। বাড়ির মধ্যে খুব একটা গোলমাল হইল কিছুক্ষণ ধরিয়া, তাহার পর ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মাথায় চুনি এক পেয়ালা চা-হাতে বাহিরের ঘরে আসিয়া হাজির হইল। সব মিটিয়া গেল, দুই ভাইয়ের সম্মিলিত উচ্চ কণ্ঠস্বরে নৈশ-গগন বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

চুনির মুখের দিকে চাহিয়া নারাণবাবুর বড় মায়া হইল। অবোধ বালক! কেন মারামারি করে তাও জানে না, নিজের ভালমন্দ নিজেরা বোঝে না। মিছামিছি সন্ধ্যার সময় মার খাইয়া মরিল!

স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, লেগেছে চুনি খুব?

চুনি বলিল, আধ ইঞ্চি ডিপ্ হয়ে কেটে গিয়েচে।

—ব্যাণ্ডেজ বাঁধলে কে?

—পিসীমা।

—উনি জানেন?

—চমৎকার জানেন। কেন, ভাল হয় নি?

নারাণবাবুর ইচ্ছা হইল, চুনিকে কোলে টানিয়া লইয়া আদর করেন, তাহাকে সান্ত্বনা দেন। কিন্তু লজ্জায় পারিলেন না। চুনি ঘ্যান্‌ঘেনে ধরনের ছেলে নয়; মার খাইয়া নালিশ করিতে জানে না। এই রকম 'স্টোইক' ধরনের ছেলে নারাণবাবু তাঁর দীর্ঘ শিক্ষক-জীবনে যতগুলি দেখিয়াছেন, এক অঙ্গুলির পর্বগুলির মধ্যেই তাহাদের গণনার পরিসমাপ্তি ঘটে। চুনি সেই অতি অল্পসংখ্যক ছেলেদের একজন। চুনিকে এই জন্যই এত ভাল লাগে তাঁর।

এই সময় চুনির বাবা বাহির হইতে আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, মাস্টার যে! ও কী, ওর মাথায় কী?

নারাণবাবু সব কথা বলিলেন।

চুনির বাবার হৃদ্যতা কর্পূরের মত উবিয়া গেল। তিনি বিরক্তির সুরে বলিলেন, আপনি বসে থাকেন, আর প্রায়ই আপনার চোখের সামনে এ রকম কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ঘটে, আপনি দেখেন না?

—আজ্ঞে, দেখব না কেন? সামান্য কথাবার্তা থেকে মারামারি। আমি এসে পড়ে ছাড়িয়ে দিই, তবে—

—আপনি একটু ভাল করে দেখাশুনো করবেন বলেই তো রাখা। নইলে গ্রাজুয়েট মাস্টার দশ টাকাতেও পাওয়া যায়। দু বেলা পড়াবে।

—আজ্ঞে, আমি দেখি। দেখি না, তা ভাববেন না।

—আমি সব সময় দেখতে পারি নে, নানা কাজে ঘুরি। কিন্তু আপনার দ্বারা দেখচি —আপনার বয়স হয়েছে।

এই সময় চুনি যদি তাহার বাবাকে বলিত—বাবা, স্যারের কোন দোষ নেই, আমারই সব দোষ, তাহা হইলে নারাণবাবুর মনের মত কাজ হইত; নারাণবাবু এই ভাবিয়া সপ্তস্বর্গ প্রাপ্ত হইতেন যে, চুনি তাঁহার অগাধ স্নেহের প্রতিদান দিল।

কিন্তু যাহা আশা করা যায়, তাহা হয় না।

চুনি চুপ করিয়া রহিল। বাবাকে তাহারা দুই ভাই যমের মত ভয় করে।

চুনির বাবা বলিলেন, মাস্টার, বোস। আমি আসচি, চা খেয়েচ?

এইবার চুনি মুখ তুলিয়া বলিল, হ্যাঁ বাবা, আমি এনে দিয়েছি।

চুনির এ কথাটা নারাণবাবুর ভাল লাগিল না। চুনি এ কথা কেন বলিতেছে, নারাণবাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন। পাছে তাহার বাবা গিয়া আর এক কাপ চা মাস্টারের জন্য পাঠাইয়া দেন, সে জন্য। কেন এক পেয়ালা চা বেশী দেওয়া হইবে মাস্টারকে!

নারাণবাবু বাসায় ফিরিলেন, তখন রাত নয়টা। নিজের ছোট ঘরটার চাবি খুলিয়া রান্না চাপাইয়া দিলেন, তারপর যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণখানা লইয়া পড়িতে বসিলেন। এই

সময়টাই বেশ লাগে সারাদিন খাটুনির পরে। আজ স্কুলের এই ঘরে নারাণবাবু আছেন উনিশ বছর। বহুকাল হইল তাঁহার পত্নী স্বর্গগমন করিয়াছেন, নারাণবাবু আর বিবাহ করেন নাই—পত্নীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যত না হোক, গরিব-স্কুল-মাস্টার-জীবনে খরচ চালাইতে পারিবেন না বলিয়াই বেশী।

উনিশ বৎসরের কত স্মৃতি এই ঘরের সঙ্গে জড়ানো।

যখন প্রথম এই স্কুলে অনুকূলবাবু তাঁহাকে লইয়া আসেন, তখন এই ঘরে আর একজন বৃদ্ধ মাস্টার ভুবনবাবু থাকিতেন। ভুবনবাবুর বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদ—ভদ্রলোক বিবাহ করেন নাই, সংসারে এক বিধবা ভগ্নী ছাড়া তাঁহার আর কেহ ছিল না। একদিন বিছানায় লোকটি মরিয়া পড়িয়া ছিল এই ঘরেই। স্কুলের খরচে ভুবনবাবুর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

নারাণবাবু ভাবেন, তাঁহার অদৃষ্টেও তাহাই নাচিতেছে। তাঁহারও কেহ নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ভাই নাই, ভগ্নী নাই—এই ঘরটি আশ্রয় করিয়া আজ বহুদিন কাটাইয়া দিলেন। এখন এমন হইয়া গিয়াছে, এই ঘর ও এই স্কুলের বাহিরে তাঁহার যেন আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। জীবনের একমাত্র কর্মক্ষেত্র এই স্কুল। স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে রুটিন অনুযায়ী কোন্ দিন কী পড়াইবেন, নারাণবাবু সকালে বসিয়া ঠিক করেন।

কাল থার্ড ক্লাসে ললিত ছেলেটা ইংরেজী গ্রামারের 'দি'র ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, নারাণবাবুর প্রাণে তাহাতে এমন একটা ধাক্কা লাগিয়াছে, সে বেদনা নিতান্ত বাস্তব। নারাণবাবু জানেন যে 'দি' ব্যবহার করিতে না পারিলে থার্ড ক্লাসের ছেলে হইয়া সে ইংরেজী ব্যাকরণ শিখিল কী? কাল নারাণবাবু তখনই নোট-বইতে লিখিয়া লইয়াছেন, "থার্ড ক্লাস ললিতমোহন কর, ডেফিনিট্ আর্টিকেল 'দি'।—এইটুকু মাত্র দেখিলেই তাঁহার মনে পড়িবে।

তাহার পর আজ সেই ললিতকে ঝাড়া আধ ঘণ্টা ধরিয়া জিনিসটা শিখাইয়া দিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হইল না। ললিত কর যে আঁধারে সে আঁধারেই রহিয়াছে। কী করা যায়? তাঁহার শিখাইবার প্রণালীর কোন দোষ ঘটিতেছে নিশ্চয়। কী করিলে ললিত ছোঁড়াটা 'দি'র ব্যবহার শিখিতে পারে?

নারাণবাবু হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িল, সেভেন্‌থ ক্লাসের পূর্ণ চক্রবর্তী, মাত্র নয় বছরের ছেলে, এত মিথ্যা কথাও বলে! কত দিন মারিয়াছেন, নিষেধ করিয়াছেন, হেড মাস্টারের আপিসে লইয়া যাইবার ভয় দেখাইয়াছেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও ফল হয় নাই। ছেলেটার সম্বন্ধে কি অভিভাবকের নিকট একখানা চিঠি দিবেন? তাহাতেই বা কী সুফল ফলিবে? না হয় চিঠি পাইয়া ছেলের বাপ ছেলেকে ধরিয়া ঠ্যাঙাইলেন, তাহাতেই ছেলে ভাল হইয়া যাইবে বলিয়া তো মনে হয় না। কী করা যায়?

নারাণবাবুর সম্মুখে এইসব সমস্যা প্রতিদিন দুই-একটা থাকেই। মাঝে মাঝে এগুলি লইয়া তিনি ক্লার্কওয়েল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিতে যান।

সাহেব সন্ধ্যার সময় মোটরে ছেলে পড়াইতে বাহির হন, ফিরিবার অল্পক্ষণ পরেই রাত নয়টা কি সাড়ে নয়টার সময়ে নারাণবাবু সাহেবের দরজায় গিয়া কড়া নাড়িলেন।

—কে? কী, নারাণবাবু? ভেতরে এস।

—স্যার, আপনার খাওয়া হয়েছে?

—এই এখুনি খেতে বসব। এক পেয়ালা কফি খাবে?

—তা—তা—

—বাবুকে এক পেয়ালা কফি দাও। বোস। কী খবর?

—স্যার, আপনার কাছে এসেছিলাম একটা খুব জরুরী দরকার নিয়ে। একবার আপনার সঙ্গে পরামর্শ করব। ওই থার্ড ক্লাসের ললিত কর বলে ছেলেটা—'দি'র ব্যবহার কিছুই জানে না, এত দিন পরে আবিষ্কার করলাম। কাল কত চেষ্টাই করেছি, কিন্তু শেখানো গেল না। কী করা যায় বলুন তো?

ক্লার্কওয়েল সাহেব অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ হেডমাস্টার। এসব বিষয়ে নারাণবাবু

তাঁহার শিষ্য হইবার উপযুক্ত। ক্লার্কওয়েল খাওয়া-দাওয়া ভুলিয়া গেলেন। নিজের টেবিলে গিয়া ড্রয়ার টানিয়া একখানা খাতা বাহির করিয়া নারাণবাবুকে দেখাইয়া বলিলেন, আমারও একটা লিস্ট আছে এই দেখ, ফার্স্ট ক্লাসের কত ছেলে ও-জিনিসটার ব্যবহার ঠিকমত জানে না আজও। আরও কত নোট করেছি দেখ। তবে একটা প্রণালীতে আমি বড় উপকার পেয়েছি, তোমাকে সেটা—এই পড়।—বলিয়া ক্লার্কওয়েল নিজের নোট-বইখানা নারাণবাবুর হাতে দিলেন।

মিস্ সিবসন্ ওদিকের দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া নারাণবাবুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ও নারাণবাবু! আমাদের সংগে ডিনার খাবে? হাউ সুইট্ অফ্ ইউ!

নারাণবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন, তিনি ডিনার খাইতে আসেন নাই। ক্লার্কওয়েল মেমসাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই স্কুলে দুজন টীচার আছে, যারা টীচার নামের উপযুক্ত—নারাণবাবু আর মিঃ আলম। ইনি এসেছেন ললিতকে কী করে 'দি'র ব্যবহার শেখানো যায়, তাই নিয়ে। আর কজন আছেন আমাদের স্কুলের মধ্যে, যাঁরা এসব নিয়ে মাথা ঘামান?

মেমসাহেব হাসিয়া বলিল, ইউ ডিজার্ভ এ স্লাইস্ অফ্ মাই হোম-মেড কেক্ নারাণবাবু; ইউ ডু। একটা কেকের খানিকটা কাটিয়া প্লেটে নারাণবাবুর সামনে রাখিয়া মেমসাহেব বলিল, ইট ইট য়্যান্ড প্রেজ ইট্।

নারাণবাবু বিনয়ে বাঁকিয়া দুমড়াইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, ধন্যবাদ ম্যাডাম, ধন্যবাদ! চমৎকার কেক্! বাঃ, বেশ—

ক্লার্কওয়েল বলিলেন, আর কে কী রকম কাজ করে নারাণবাবু? টীচারদের মধ্যে—

নারাণবাবুর একটা গুণ, কাহারও নামে লাগানো-ভাঙানো অভ্যাস নাই তাঁহার। মিঃ আলম যে স্থলে অন্তত তিন জন টীচারকে ফাঁকিবাজ বলিয়া দেখাইত, সেখানে নারাণবাবু বলিলেন, কাজ সবাই করে প্রাণপণে, আর সবাই বেশ খাটে।

হেডমাস্টার হাসিয়া বলিলেন, ইউ আর য়্যান ওল্ড ম্যান নারাণবাবু। তুমি কারও দোষ দেখ না—ওই তোমার মস্ত দোষ। আমি জানি, কে কে আমার স্কুলে ফাঁকি দেয়। আমি জানি না ভাব? নাম আমি করছি নে—নাম করা অনাবশ্যক—কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাদের নাম তোমার কাছেও অজ্ঞাত নয়। আচ্ছা, যাও—

মেমসাহেব বলিল, ভাল কেক্?

নারাণবাবু বলিলেন, চমৎকার কেক্ ম্যাডাম, অদ্ভুত কেক্।

মেমসাহেব বলিল, আমার বাপের বাড়ি শ্রপশায়ারে, শুধু সেইখানে এই কেক্ তৈরি হয় তোমায় বলছি। তাও দুখানা গাঁয়ে—নরউড্ আর বার্কলে-সেন্ট্-জন্—পাশাপাশি গাঁ। কলকাতার দোকানে যে কেক্ বিক্রি হয় ও আমি খাই নে!

নারাণবাবু আর এক প্রস্থ বিনীত হাস্য বিস্তার করিয়া বিদায় লইলেন।...আজ অনুকূলবাবু নাই, কিন্তু সাহেব ও মেম আসাতে নারাণবাবু খুশীই আছেন। স্কুলের কী করিয়া উন্নতি করা যায় সে দিকে সাহেবের সর্বদা চেষ্টা, তবে দোষও আছে। টাকাকড়ি সম্বন্ধে সাহেব তেমন সুবিধার লোক নয়। মাস্টারদের মাহিনা দিতে বড় দেরি করে, নানা রকমে কষ্ট দেয়—তার একটা কারণ, স্কুলের ক্যাশ সাহেবের কাছে থাকে, সাহেবের বেজায় খরচের হাত—খরচ করিয়া ফেলে, অবশ্য স্কুলের বাবদই খরচ করে, শেষে মাস্টারদের মাহিনা দিতে পারে না সময়মত।

মোটের উপর কিন্তু সাহেব স্কুলের পক্ষে ভালই। বড় কড়াপ্রকৃতির বটে, শিক্ষকদের বিষয়ে অনেক সময় অন্যায় অবিচার যথেষ্ট করিয়া থাকে, যমের মত ভয় করে সব মাস্টার; কিন্তু স্কুলের স্বার্থ ও ছেলেদের স্বার্থের দিকে নজর রাখিয়াই সে-সব করে সাহেব। নারাণবাবু তাই চান, স্কুলের উন্নতি লইয়াই কথা।

যদুবাবুর আজ মোটে বিশ্রামের অবকাশ নাই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া খাটুনি চলিতেছে, দুজন শিক্ষক আসেন নাই, তাঁহাদের ঘণ্টাতেও খাটিতে হইতেছে। একটা

ঘণ্টার শেষে মিনিট পনেরো সময় চুরি করিয়া যদুবাবু তেতলায় শিক্ষকদের বিশ্রাম-কক্ষে ঢুকিলেন, উদ্দেশ্য ধূমপান করা।

গিয়া দেখিলেন, হেডপণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু বসিয়া আছেন। তেতলার এই ঘরটি বেশ ভাল, বড় বড় জানালা চারিদিকে, চওড়া ছাদ, ছাদে দাঁড়াইলে সেণ্ট পলের চূড়া, জেনারেল পোস্ট আপিসের গম্বুজ, হাইকোর্টের চূড়া, ভিক্টোরিয়া হাউস প্রভৃতি তো দেখা যায়ই, বিশাল মহাসমুদ্রের মত কলিকাতা নগরী অসংখ্য ঘরবাড়ির ঢেউ তুলিয়া এই ক্ষুদ্র স্কুল-বাড়িকে যেন চারিধার হইতে ঘিরিয়াছে মনে হয়; নীচে ওয়েলেসলি স্ট্রীট দিয়া অগণিত জনস্রোত ও গাড়ি-ঘোড়ার ভিড়, ট্রামের ঘণ্টাধ্বনি, ফিরিওয়ালার হাঁক, বিচিত্র ও বৃহৎ জীবনযাত্রার রহস্যে সমগ্র শহর আপনাতে আপনি-হারা—থমথমে দুপুরে যদুবাবু মাঝে মাঝে বিড়ি খাইতে খাইতে শিক্ষকদের ঘরের জানালা দিয়া চাহিয়া দেখেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী যদুদা, বিশ্রাম নাকি?

—না ভাই, পরিশ্রম। একটা বিড়ি খেয়ে যাই।

—আমাকেও একটা দেবেন।

হেডপণ্ডিতের দিকে চাহিয়া যদুবাবু বলিলেন, কাল একটা ছুটি করিয়ে নাও না দাদা, সাহেবের কাছ থেকে। কাল ঘণ্টাকর্ণপুজো—

হেডপণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঃ, ঘণ্টাকর্ণপুজোর আবার ছুটি—তাই কখনও দেয়!

—কেন দেবে না? তুমি বুঝিয়ে বোল, তুমিই তো ছুটির মালিক।

—না না, সে দেবে না।

—বলেই দেখ না দাদা। বল গিয়ে, হিন্দুর এটা মস্ত বড় পরব।

—ভাল, তোমাদের কথায় অনেক কিছুই বললুম। তোমরা শিখিয়ে দিলে যে, রামনবমী আর পুজো প্রায় সমান দরের পরব। রাস, দোল ষষ্ঠীপুজো, মাকালপুজো—তোমরা কিছুই বাদ দিলে না। আবার ঘণ্টাকর্ণপুজোর জন্যে ছুটি চাই,—কী বলে—

—যাও যাও, বলে এস, তুমি বললেই হয়।

ক্ষেত্রবাবু ছাদের এক ধারে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওহে, খুকীর বর কাল এসে গেচে।

যদুবাবু ও হেডপণ্ডিত একসঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, সত্যি? এসে গেচে?

—ওই দেখুন না, বসে আছে।

—যাক, বাঁচা গেল। আহা, মেয়েটা বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল!

এই উঁচু তেতলার ছাদের ঘরে বসিয়া চারিপাশের অনেক বাড়ির জীবনযাত্রার সঙ্গে ইঁহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়। বাড়ির মালিকের নাম-ধাম পর্যন্ত জানা নাই—অথচ ক্ষেত্রবাবু জানেন, ওই হলদে রঙের তেতলা বাড়িটার বড় ছেলে গত কার্তিক মাসে মারা গেল, বেশ কোট-প্যাণ্ট পরিয়া কোথায় যেন চাকুরি করিত, বাড়ির গিন্নীর আছাড়িবিছাড়ি মর্মভেদী কান্না। টিফিনের অবকাশে এখানে বসিয়া দেখিয়া ক্ষেত্রবাবুর ও জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ের চোখে জল আসিয়াছিল।

এই যে খুকীর বর আসিল, ইঁহারা জানেন। ষোল-সতেরো বছরের সুন্দরী কিশোরী, বাড়ির ওই জানালাটিতে আনমনে বসিয়া পথের দিকে চাহিয়া থাকিত, আপন মনে চোখের জল ফেলিত। জ্যোতির্বিনোদ মহাশয় এই ঘরেই থাকেন। তিনি বলেন, রাত্রে ছাদে মেয়েটি পায়চারি করিয়া বেড়াইত, এক-একবার কেহ কোন দিকে নাই দেখিয়া ছাদে উপুড় হইয়া প্রণাম করিয়া কী যেন মনে মনে মানত করিত। মেয়েটি যে অসুখী, সকলেই বুঝিতেন। মেয়েটি বিবাহিতা, অথচ আজ এক বৎসরের মধ্যে তাহার স্বামীকে দেখা যায় নাই—কাজেই আন্দাজ করিয়াছিলেন, স্বামীর অদর্শনই মেয়েটির মনোদুঃখের কারণ। কী জাত, কী নাম, তাহা কেহই জানেন না; অথচ এই অনাত্মীয়া, অজ্ঞাতকুলশীলা কিশোরীর দুঃখে প্রৌঢ় শিক্ষকদের মন মহানুভূতিতে ভরিয়া ছিল, যদিও অল্পবয়স্ক দুই-একজন শিক্ষক ইঁহাদের অসাক্ষাতে কিশোরীকে লক্ষ্য করিয়া এমন সব কথা বলিত, যাহা শোভনতার সীমা অতিক্রম করে।

মাঝে মাঝে জ্যোতির্বিনোদ মহাশয় বলিতেন, আহা, কাল রাত্রে খুকী বড্ড কেঁদেছে একা একা ছাদে। হেডপণ্ডিত বলিতেন, ভাই, বড় তো মুশকিল দেখছি! কী হয়েছে ওর

বরের? কোথায় গেল?

কেহই কিছু জানেন না, অথচ মেয়েটির সুখদুঃখ তাঁহারা নিজের করিয়া লইয়াছেন। আজ ইঁহারা সত্যই খুশী—খুকীর বর আসিয়াছে। বিশেষ করিয়া হেডপণ্ডিত ও ক্ষেত্রবাবু।

হেডপণ্ডিতের মেয়ে রাধারাণী, প্রায় এই কিশোরীর সমবয়সী, আজ এক বৎসর হইল মারা গিয়াছে টাইফয়েড রোগে। মেয়েটির দিকে চাহিলেই নিজের মেয়ের কথা মনে পড়ে। বাপের অমন সেবা রাধারাণীর মত কেহ করিতে পারিত না। স্কুলের খাটুনির পরে বৈকালে বাড়ি ফিরিলে দেখিতেন, রাধা তাঁহার জন্য হাত-পা ধোয়ার জল ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, হাত-পা ধোয়া হইলেই একটু জলখাবার আনিয়া দিবে, পাখা লইয়া বাতাস করিবে, কাছে বসিয়া কত গল্প করিবে—ঠিক যেন পাকা গিন্নী। তাহার একমাত্র দোষ ছিল, বায়োস্কোপ দেখিবার অত্যধিক নেশা। প্রায়ই বলিত, বাবা, আজ কিন্তু—

—না মা, এই সেদিন দেখলি, আজ আবার কী!

—তুমি বাবা জান না। কী সুন্দর ছবি হচ্ছে আমাদের এই চিত্রবাণীতে, সবাই দেখে এসে ভাল বলেছে বাবা।

—রোজ রোজ ছবি দেখতে গেলে চলে মা? ক টাকা মাইনে পাই?

—তা হোক বাবা, মোটে তো ন আনা পয়সা!

—ন আনা ন আনা—দেড় টাকা। তোর গর্ভধারিণী যাবে না?

—মা কোথাও যেতে চায় না। তুমি আর আমি—

হেডপণ্ডিত ভাবিতেন, মেয়েটি তাঁহাকে ফতুর করিবে, বায়োস্কোপের খরচ কত যোগাইবেন তিনি এই সামান্য ত্রিশ টাকা বেতনের মাস্টারি করিয়া? উঃ, কী ভালই বাসিত সে ছবি দেখিতে! ছবি দেখিলে পাগল হইয়া যাইত, বাড়ি ফিরিয়া তিন দিন ধরিয়া তাহার মুখে অন্য কথা থাকিত না, ছবির কথা ছাড়া।

কোথায় আজ চলিয়া গেল! আজকাল দুই-একখানা ভাল বাংলা ছবি হইতেছে, ছবিতে কথাও কহিতেছে—এসব দেখিতে পাইল না মেয়ে। বায়োস্কোপের খরচ হইতে তাঁহাকে একেবারে মুক্তি দিয়া গিয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন, তা যাও এ বেলা দাদা,—ছুটিটার জন্যে। তুমি গিয়ে বললেই হয়ে যাবে।

ইহাদের অনুরোধে হেডপণ্ডিত ভয়ে ভয়ে গিয়া হেডমাস্টারের আপিসে ঢুকিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইলেন।

ক্লার্কওয়েল সাহেব কী লিখিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া বলিলেন, হোয়াট? পাণ্ডিট্! সিওরলি ইট ইজ নট এ হলিডে ইউ হ্যাভ্ কাম টু আস্ক ফর?

হেডপণ্ডিত বলিলেন, কাল ঘণ্টাকর্ণপুজো স্যার্।

সাহেব বলিলেন, হোয়াট ইজ দ্যাট? ঘণ্টা—

—ঘণ্টাকর্ণ। হিন্দুর এত বড় পর্ব আর নেই।

—ও ইউ নটি ফেলো, তুমি প্রত্যেক বারই বল এক কথা।

—না স্যার্, পাঁজিতে লেখে—

—ওয়েল, আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড ইট্—হবে না, কী পুজো বললে? ওতে ছুটি হবে না।

হেডপণ্ডিত বুঝিলেন তাঁহার কাজ হইয়া গিয়াছে। সাহেব প্রত্যেক বারই ও-রকম বলেন, শেষ ঘণ্টায় দেখা যাইবে, স্কুলের চাকর সারকুলার-বই লইয়া ক্লাসে ক্লাসে ঘুরিতেছে।

হেডপণ্ডিত ফিরিয়া আসিলে মাস্টারেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হল দাদা?

যদুবাবু বলিলেন, কার্যসিদ্ধি?

—দাঁড়াও দাঁড়াও, হাঁপ জিরিয়ে নিই। সাহেব বললে, হবে না।

—হবে না বলেছে তো? তা হলে ও হয়ে গিয়েচে। বাঁচা গেল দাদা, মলমাস যাচ্ছিল,

তবুও ঘণ্টাকর্ণের দোহাই দিয়ে—

—এখনও অত হাসিখুশির কারণ নেই। যদি পাশের স্কুলে জিজ্ঞেস করতে পাঠায়, তবেই সব ফাঁক। আমি বলেছি, হিন্দুর অত বড় পর্ব আর নেই। এখন যদি অন্য স্কুলে জানতে পাঠায়?

ছোকরা উমাপদবাবু বলিলেন, যদি তারাও ঘণ্টাকর্ণপুজোর ছুটি দেয়?

হেডপণ্ডিত হাসিয়া বলিলেন, ঘণ্টাকর্ণপুজো ছুটি কে দেবে, রামোঃ!

কিন্তু সাহেবের ধাত সবাই জানে। শেষ ঘণ্টা পর্যন্ত মাস্টারের দল দুরু দুরু বক্ষে অপেক্ষা করিবার পরে সকলেই দেখিল, স্কুলের চাকর ছুটির সারকুলার লইয়া ক্লাসে ক্লাসে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে।

যদুবাবুর ক্লাস সিঁড়ির পাশেই। তিনি বলিলেন, কী রে, কী ওখানে?

চাকর একগাল হাসিয়া বলিল, কাল ছুটি আছে, সারকুলার বেরিয়েছে।

—সত্যি নাকি? দেখি, নিয়ে আয় এদিকে।

চোখকে বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু সত্যই বাহির হইয়াছেঃ

"The School will remain closed to-morrow the 9th inst. for the great Hindu festival, Ghanta Karna Puja."

কিছুক্ষণ পরে ছুটির ঘণ্টা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের দল মহাকলরব করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যদুবাবুকে ডাকিয়া হেডমাস্টার বলিলেন, আপনি আর ক্ষেত্রবাবু ফোর্থ ক্লাসের ছেলেদের মিউজিয়ম আর জুতে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবেন?

—খুব স্যার্।

—দেখবেন, যেন ট্রাম থেকে পড়ে না যায়—একটু সাবধানে নিয়ে যাবেন। আর এই নিন টাকা, আনুষঙ্গিক খরচ আর ছেলেদের টিফিন। ছেলেদের বেশ করে বুঝিয়ে দেবেন। সব দেখাবেন।

যদুবাবু স্কুলের সামনের বারান্দাতে গিয়া দাঁড়াইলেন। ছেলেরা দুই সারিতে দাঁড়াইল হেডমাস্টারের বেতের ভয়ে। ড্রিল-মাস্টারের আদেশ অনুযায়ী তাহারা মার্চ করিয়া চলিল। কিন্তু খুব বেশীক্ষণের জন্য নয়, রাস্তার মোড়ে আসিয়া তাহারা আবার দাঁড়াইয়া গেল।

যদুবাবু অনেক পিছনে ছিলেন, ছেলেদের সঙ্গে সমান তালে আসিবার বয়স তাঁহার নাই। ক্ষেত্রবাবু আর একটু আগাইয়া ছিলেন, তিনি দৌড়িয়া গিয়া বলিলেন, দাঁড়ালি কেন রে?

—আমরা ট্রামে যাব স্যার্।

—ট্রামের পয়সা কাছে আছে সব?

দুই-একজন বড় ছেলে সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল, স্কুল থেকে পয়সা দেয় নি স্যার্;

—কই, না। আমার কাছে তো দেয় নি। যদুবাবুর কাছে আছে কি না জানি না, দাঁড়াও, দেখি।

ইতিমধ্যে যদুবাবু আসিয়া ইহাদের কাছে পৌঁছিলেন ঃ কী ব্যাপার? দাঁড়িয়েচ কেন?

—আপনার কাছে ট্রামের ভাড়া দিয়েছেন হেডমাস্টার?

—হ্যাঁ। কিন্তু সে চৌরঙ্গীর মোড় থেকে—এখানে চড়লে পয়সায় কুলুবে না। আপনি ওদের নিয়ে যান, আমি আর হাঁটতে পারছি নে। ট্রামে যাই।

—তবে আমিও ট্রামে যাই। ওরা হেঁটে যাক।

সেই ব্যবস্থাই হইল। যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবু ট্রামে চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত আসিয়া ছেলেদের জন্য অপেক্ষা করিলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমি কিন্তু কালীঘাট যাচ্ছি আমার বন্ধুর বাড়ি, আমি জুতে যাব না।

ক্ষেত্রবাবু কালীঘাটের ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। যদুবাবু দলবল সমেত এদিকের গাড়িতে উঠিলেন। খিদিরপুরের ট্রাম হইতে নামিয়া ছেলেরা হৈ-হৈ করিয়া জুর দিকে

ছুটিল। যদুবাবু জু অনেকবার দেখিয়াছেন, তিনি কি ছেলেদের দলে মিশিয়া হৈ-হৈ করিবেন এখন? একটা গাছের তলায় বসিলেন, পড়িয়া দেখিলেন গাছের নাম 'পুত্রন্‌জীব বক্সবাজি'—জীবপুত্রিকা বৃক্ষ। এই বৃক্ষের ফলের বীজ মৃতবৎসা নারীর গলায় পরাইয়া দিলে ছেলে হইয়া মরে না। তাঁহার স্ত্রীও মৃতবৎসা। এখন ফল লইয়া গেলে কেমন হয়? বয়স অনেক হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় সুবিধা হইবে না।...কী চমৎকার ওই ছেলেটা! প্রজ্ঞাব্রত, যেমন নাম, তেমনই দেখিতে। ছেলে যদি হইতে হয়, প্রজ্ঞাব্রতের মত।

একটি ছেলের দল সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, স্যার্, আমাদের একটু দেখাবেন?

—কী দেখাব?

—স্যার্, অনেক পাখি-জানোয়ারের নাম লেখা আছে, বুঝতে পারছি নে। একটু আসুন না স্যার্।

—হ্যাঁ, আমার এখন ওঠবার শক্তি নেই। তোরা নিজেরা গিয়ে দেখ্‌গে যা। প্রজ্ঞাব্রত কোথায় রে?

—অন্য দিকে গিয়েছে স্যার্, দেখছি নে। যাই তবে স্যার্।

যদুবাবু আপন মনে বসিয়া বসিয়া হিসাব করিলেন। সাহেব ছেলেদের টিফিনের জন্য পাঁচ টাকা দিয়াছে—ছেলে মোট ত্রিশ জন, ছেলে-পিছু দুই টুকরো রুটি আর একটু মাখন দিলে টাকা দেড়-দুই খরচ। বাকী টাকা পকেটস্থ করা যাইবে। নগদ আড়াই টাকা লাভ।

ফিরিবার পথে ছেলের দল অনেকে সরিয়া পড়িল এদিক ওদিক। কেহ গেল ময়দানে হকিখেলা দেখিতে, কেহ কাছাকাছি অঞ্চলে কোনও মাসী-পিসীর বাড়ি গিয়া উঠিল। যদুবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিলেন, দেড় টাকার মধ্যে বাকী ছেলেদের রুটি মাখন ভাল করিয়াই চলিবে। নিউ মার্কেট হইতে নিজেই তিনখানা বড় রুটি ও কিছু মাখন কিনিলেন, মিউজিয়ম হইতে বাহির হইয়া মাঠে বসাইয়া ছেলেদের খাওয়াইয়া দিলেন।

ছেলেরা পাছে আবার ট্রামের পয়সা চাহিয়া বসে, এই ছিল যদুবাবুর ভয়। কিন্তু ছেলেরা বৈকালবেলা মুক্তিব আনন্দে কে কোথায় চলিয়া গেল। ছেলেরা এত হিসাব বোঝে না. হেডমাস্টার ট্রামের পয়সা দিয়াছিলেন কি না সে কৈফিয়ত কেহ লইল না। যদুবাবু একা বাসার দিকে চলিতে চলিতে সতৃষ্ণ নয়নে ধর্মতলার মোড়ে গ্লোব রেস্টুরেণ্টের দিকে চাহিলেন। চপ-কাটলেট ভাজার সুরুচি-ঘ্রাণ ফুটপাথের দক্ষিণ হাওয়াকে মাতাইয়াছে। পকেটে নগদ আড়াই টাকা উপরি-পাওনা—বাড়ির একঘেয়ে সেই ডাঁটাচচ্চড়ি আর কুমড়ো-ভাজা খাইতে খাইতে যৌবন চলিয়া গেল। যদি পেটে ভাল করিয়া না খাইলাম তবে চাকুরি করা কী জন্য? চক্ষু বুজিলে সব অন্ধকার। ছেলে নাই, পিলে নাই, কাহার জন্য খাটিয়া মরা!

রেস্টুরেণ্টে ঢুকিয়া দুইখানা ফাউল কাটলেট, দুইখানা চপ, এক প্লেট কোর্মা, দুই-খানা ঢাকাই পরোটা অর্ডার দিয়া যদুবাবু মহাখুশির সহিত আপন মনে উদরসাৎ করিতেছেন, এমন সময় ফুটপাথ দিয়া প্রজ্ঞাব্রতকে যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন, ও প্রজ্ঞা, ওরে শোন্ শোন্—

প্রজ্ঞাব্রত হকিখেলা দেখিয়া বাড়ি যাইতেছিল, উঁকি মারিয়া বলিল, স্যার্, আপনি এখানে?

—শোন্ শোন্, বোস্। খাবি?

—না স্যার্, আপনি খান।

—কেন, বোস্ না। আয়। এই বয়, দুখানা চপ আর দুখানা কাটলেট দাও তো।

প্রজ্ঞাব্রত দুই-একবার মৃদু প্রতিবাদ করিয়া খাইতে বসিল। যদুবাবু তাহাকে জোর করিয়া এটা-ওটা আরও খাওয়াইলেন। যাইবার সময়ে তাহাকে বলিলেন. একটা সিগারেট কিনে আন্ তো, এই নে পয়সা।

সিগারেট ধরানো হইলে দুইজনে কিছুক্ষণ ধর্মতলা ধরিয়া চলিলেন।

একটা গ্যাস-পোস্টের নীচে আসিয়া যদুবাবু বলিলেন. হ্যাঁ রে, তুই চাঁদা দিয়েছিলি?

—কিসের স্যার?
—এই আজ জু'তে আসবার জন্যে।
—হ্যাঁ স্যার্, চার আনা।
যদুবাবু একটা সিকি বাহির করিয়া প্রজ্ঞাব্রতের হাতে দিয়া বলিলেন, এই নে, নিয়ে যা—কাউকে বলিস নে—
প্রজ্ঞাব্রত বিস্মিত হইয়া বলিল, ও কী স্যার্? জু দেখলাম, ট্রামে গেলাম, রুটি মাখন খাওয়ালেন তখন—
—তুই নিয়ে যা না। তোর অত কথার দরকার কী? কাউকে বলবি নে।
—না স্যার্, আমি নেব না—
—নে বলচি, ফাজলামো করিস নে,—নিয়ে নে—
প্রজ্ঞাব্রত আর্ দ্বিরুক্তি না করিয়া হাত পাতিয়া সিকিটি লইল।
—আমার এই গলি স্যার্, যাই আমি।
—চল্ না, আমায় একটু এগিয়ে দিবি। বেশ লাগে তোর সঙ্গে যেতে।
প্রজ্ঞাব্রত অনিচ্ছার সহিত আরও কিছু দূরে গিয়া ওয়েলিংটন স্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া বলিল, যান স্যার্, আমি আর যাব না—
পরদিন যদুবাবু হেডমাস্টারের কাছে আট টাকা দশ আনার এক বিল দাখিল করিয়া বিনীতভাবে জানাইলেন, দশ আনা বেশী খরচ হইয়া গিয়াছে—ট্রামভাড়া, ছেলেদের খাওয়ানো, আনুষঙ্গিক খরচ।
হেডমাস্টার বলিলেন, ওয়েল, এই নাও দশ আনা।
ছেলেরা কিন্তু ক্লাসে বলাবলি করিতে লাগিল, যদুবাবু তাহাদের কিছুই খাওয়ান নাই। হেডমাস্টার কত টাকা যদুবাবুর হাতে দিয়াছেন, কেহ কেহ তাহাও অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিতে ছাড়িল না।
প্রজ্ঞাব্রত সকলকে বলিল, যদুবাবু গ্লোব রেস্টুরেন্টে বসিয়া মনের সাধে চপ-কাটলেট খাইতেছিলেন, সে পথ দিয়া যাইবার সময় দেখিয়াছে। তাহাকে যে খাওয়াইয়াছেন, সে কথা প্রকাশ করিল না।
যদুবাবু ফোর্থ ক্লাসে তৃতীয় ঘণ্টায় পড়াইতে গিয়া দেখিলেন, ব্ল্যাকবোর্ডে লেখা আছে—গ্লোব রেস্টুরেন্ট, চপ এক আনা, মুর্গির কাটলেট দশ পয়সা! জু হইতে ফিরিবার পথে সকলে খাইয়া যান!
যদুবাবু দেখিয়াও দেখিলেন না। টিফিনের ঘণ্টায় প্রজ্ঞাব্রতকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, ওসব কে লিখেছে বোর্ডে? তুই কিছু বলেছিস?
সে বলিল, না স্যার্, আমি কাউকে বলি নি।
—আর কেউ দেখেছিল আমাকে, বললে কেউ?
—তাও স্যার্ আমি জানি না—
মিঃ আলমের চোখে লেখাটি পড়িল টিফিনের পরের ঘণ্টায়। মিঃ আলম কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন লোক, জিজ্ঞাসা করিল, এসব কী?
ছেলেরা পরস্পর গা-টেপাটেপি করিল। দুই-একজন বইয়ের আড়ালে মুখ লুকাইয়া হাসিল।
—কী বল না। মনিটার!
একজন লম্বা ছেলে উঠিয়া বলিল, কী স্যার্?
—এ কে লিখেচে?
—দেখি নি স্যার্।
—হুঁ। কাল তোরা জু'তে গিয়েছিলি কার সঙ্গে?
—যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে গিয়েছিলাম। তবে ক্ষেত্রবাবু কালীঘাট চলে গেলেন, যদুবাবু ছিলেন।
মিঃ আলম জেরা করিয়া সংগ্রহ করিলেন, তাহারা কী খাইয়াছিল, কত দূর ট্রামে গিয়াছিল ইত্যাদি। হেডমাস্টারকে আসিয়া বলিলেন, কাল ক টাকা দিয়েছিলেন স্যার্

যদুবাবুকে? ছেলেরা তো দু টুকরো রুটি আর মাখন খেয়েচে, যাবার সময় একবারই ট্রামে গিয়েছিল, আর এসেছিল মিউজিয়াম পর্যন্ত। আর কোনও খরচ হয় নি।

—তিন টাকা ট্রামভাড়া আর পাঁচ টাকা টিফিন—যদুবাবু আট টাকা দশ আনার বিল দিয়েচে।

—স্যার্, আপনি অনুসন্ধানের ভার যদি আমার ওপর দেন, আমি প্রমাণ করব—যদুবাবু স্কুলের টাকা চুরি করেছেন। উনি নিজে ফেরবার পথে চপ-কাটলেট খেয়েচেন দোকানে বসে, ফোর্থ ক্লাসের প্রজ্ঞাব্রত দেখেচে। সে আপনার কাছে সব বলতে রাজী হয়েচে। ডেকে নিয়ে আসি তাকে যদি বলেন। যদুবাবু শিক্ষকের উপযুক্ত কাজ করেন নি, ছেলেদের খাওয়ান নি, অথচ স্কুলে বাড়তি বিল দিয়েচেন—এ একটা গুরুতর অপরাধ। আমার ধারণা, উনি এ রকম আরও কয়েক বার করেছেন—জুতে ছেলেদের নিয়ে যাবার সময় তাই উনি সকলের আগে পা বাড়ান। ব্ল্যাকবোর্ডে ছেলেরা যা-তা লিখেচে ওঁর নামে।

হেডমাস্টার হাসিয়া বলিলেন, লেট্ গো মিঃ আলম। এ বিষয়ে আর কিছু উত্থাপন করবেন না। হাজার হলেও আমাদেরই একজন টীচার, সহকর্মী—ছেড়ে দিন ও-কথা। আই ডোণ্ট গ্রাজ দি পুওর ফেলো এ কাটলেট অর্ টু—

গ্রীষ্মের ছুটির আর দেরি নাই। অন্য সব স্কুলে মর্নিং-স্কুল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ স্কুলে হেডমাস্টারের কাছে বহু দরবার করা সত্ত্বেও আজও মর্নিং-স্কুল হয় নাই। হেডমাস্টারের ধারণা, মর্নিং-স্কুল হইলে লেখাপড়া ভাল হয় না ছেলেদের। ক্লাসে ক্লাসে পাখা আছে, মর্নিং-স্কুলের কী দরকার?

ডেপুটেশনের পর ডেপুটেশন হেডমাস্টারের আপিসে গিয়া ব্যর্থকাম হইয়া ফিরিল। অবশেষে সকলে মিঃ আলমকে গিয়া ধরিল। হেডপণ্ডিত বলিলেন, যান মিঃ আলম, বুঝিয়ে বলুন একবারটি।

আলমের দ্বারা স্কুলের ক্ষতিজনক কোনও কার্য হওয়া সম্ভব নয়, তিনি জানাইলেন।

অবশেষে অন্য সব মাস্টার জোট পাকাইয়া হেডমাস্টারের আপিসে গেলেন। ক্লার্কওয়েল একগুঁয়ে প্রকৃতির মানুষ, যাহা ধরিয়াছেন তাহা নড়চড় হইবার জো নাই। কাহারও কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। বরং ফল হইল, যে সব মাস্টার দরবার করিতে গিয়াছিলেন তাঁহাদের উপর নানারকম বেশী খাটুনির চাপ পড়িল।

ছুটির পর প্রায়ই স্কুল হইতে মাস্টারদের চলিয়া যাইবার উপায় ছিল না। প্রশ্নপত্র লিথো করিতে হইবে, ক্লাসের ট্রানস্লেশন দেখিয়া ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করিয়া তাহা হেডমাস্টারের টেবিলে পেশ করিতে হইবে। হেডমাস্টার দেখিবেন, ঠিকমত খাতা দেখা হইয়াছে কি না!

আজ হুকুম হইল, প্রত্যেক শিক্ষক প্রতিদিন প্রত্যেক ক্লাসে কী পড়াইবেন তাহা নোট করিবেন, সে নোট আবার সাহেবের কাছে দাখিল করিতে হইবে।

হেডমাস্টার বলিলেন, স্কুলে পাখা আছে, মর্নিং-স্কুল কী জন্যে? যে সব মাস্টারের না পোষাবে, তিনি চলে যেতে পারেন। মাই গেট ইজ ওপ্ন্—

গলদঘর্ম হইয়া মাস্টারেরা আর দিন-চারেক স্কুল করিলেন। তারপর একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবে হঠাৎ সারকুলার বাহির হইল, কাল হইতেই মর্নিং-স্কুল। ক্লার্কওয়েলের সব কাজই ওই রকম—পরের কথায় বা বুদ্ধিতে তিনি কিছুই কাজ করিবেন না, নিজের খেয়ালমত চলিবেন।

মর্নিং-স্কুল বসিবে ছটায়। দূরে যে সব মাস্টার থাকেন, তাঁহারা শেষরাত্রে উঠিয়া রওনা না হইলে আর ছয়টায় আসিয়া হাজিরা দিতে পারেন না। তাহার উপর সাড়ে দশটায় ছুটির পর রোজ বেলা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত শিক্ষকদের লইয়া পরামর্শ-সভা বসিবে।

সভার কার্য-প্রণালী নিম্নোক্ত রূপ :—

১। সেভেন্থ্ ক্লাসে কী করিয়া হাতের লেখার উন্নতি করা যায়?

২। থার্ড ক্লাসের ছেলেরা শ্রুতিলিখনে কাঁচা—কী ভাবে তাহারা শ্রুতিলিখনে উন্নতি করিতে পারে?

৩। একজন টীচার কাল ক্লাসে বাজে গল্প করিয়াছিলেন—তাঁহার সম্বন্ধে কী ব্যবস্থা করা যায়?

হেডমাস্টার প্রথমে বলিলেন, আচ্ছা, সেভেন্‌থ্‌ ক্লাসের হাতের লেখা সম্বন্ধে কার কী মত?

ক্ষুৎ-পিপাসায় পীড়িত টীচারের দল মনের বিরক্তি চাপিয়া চাকুরির খাতিরে মুখে কৃত্রিম উৎসাহ ও গভীর চিন্তার ভাব আনিয়া একে একে আলোচনায় যোগ দিলেন।

কাহারও ফাঁকি দিবার উপায় নাই, কেহ চুপ করিয়া উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকিবেন, তাহার জো কী? হেডমাস্টার অমনি বলিবেন, যদুবাবু, হোয়াই ইউ আর সাইলেণ্ট্‌?

সর্বশেষে মিঃ আলমের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে সাহেব বলিলেন, নাউ অ্যাট্‌ লাস্ট লেট আস্‌ হিয়ার মিঃ আলম।

মিঃ আলম গম্ভীর মুখে উঠিলেন। যেন 'প্রাইম মিনিস্টার' কোনো গুরুতর বিল আলোচনা করিবার জন্য ট্রেজারি বেঞ্চ হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মিঃ আলমের হাতে তিন পাতা লেখা কাগজ, সেভেন্‌থ্‌ ক্লাসের হাতের লেখা ভাল করা সম্বন্ধে এক গুরুগম্ভীর নিবন্ধ। তাহার মধ্যে কত উদাহরণ, কত প্রস্তাব, কত মহাজন-বাণী উদ্ধৃত।

মিঃ আলম মাথা দুলাইয়া সতেজ উচ্চারণের সহিত গোটা নিবন্ধটা পড়িয়া গেলেন, "অন্‌ দি বেটারমেণ্ট্‌ অফ্‌ হ্যান্ডরাইটিং অফ্‌ সেভেন্‌থ্‌ ক্লাস বয়েজ"—ঝাড়া দশ মিনিট লাগিল।

টীচারদের সভা চুপ। হেডমাস্টার বলিলেন, মিঃ আলম একজন আদর্শ শিক্ষক। এ কথা আমি কতদিন বলেছি। মানুষের মত মানুষ একজন। কারও কিছু বলবার আছে মিঃ আলমের প্রবন্ধ সম্বন্ধে? নারাণবাবু?

বৃদ্ধ নারাণবাবু একটা কী সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

—ওয়েল, যদুবাবু?

যদুবাবু বিনীতভাবে জানাইলেন, তাঁহার কিছু বলিবার নাই। মিঃ আলমের প্রবন্ধের পর আর বলিবার কী থাকিতে পারে?

—ওয়েল, ক্ষেত্রবাবু?

—না স্যার, আমার কিছু বলবার নেই।

এক পর্ব শেষ হইল। বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে, জ্যৈষ্ঠের রৌদ্রে রাস্তার পিচ গলিয়া গিয়াছে। অনেকে চিন্তা করিতেছেন, বাড়ি ফিরিয়া আর স্নানের জল পাওয়া যাইবে না। চৌবাচ্চায় দুই ইঞ্চি জলও থাকে না এত বেলায়। অথচ কিছু বলিবার জো নাই, সাহেব বলিবেন, মাই গেট ইজ ওপ্‌ন্‌—

ঠিক বারোটার সময় 'টীচার্স মীটিং' সাঙ্গ হইল।

বাহিরে পা দিয়াই যদুবাবু বলিলেন, ব্যাটা কী খোশামুদে! দেখলে তো একবার! আবার এক প্রবন্ধ লিখে এনেচে! কাজের আঁট কত!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, একেবারে লর্ড বেকন্‌—"অন দি বেটারমেণ্ট অফ্‌ হ্যান্ডরাইটিং অফ্‌ সেভেন্‌থ্‌ ক্লাস বয়েজ"। হামবাগ্‌ কোথাকার!

যদুবাবু বলিলেন, আর এক খোশামুদে ওই নারাণবাবু। তোর কোনো কুলে কেউ নেই, সন্নিসি হয়ে যা। দরকার কী তোর খোশামুদির?

নীচের ক্লাসের একজন টীচার মেসে থাকিতেন। তিনি সামান্য মাহিনা পান, মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস পান না। তিনি কতকটা আপন মনেই বলিলেন, কোনদিন নাইতে পারি নে—আজ মর্নিং-স্কুল হয়ে পাঁচ দিন নাই নি।

যদুবাবু বলিলেন, এই বলে কে! কই, তুমি তো মুখ ফুটে কথাটা বলতে পারলে না ভায়া সাহেবকে!

—আপনারা সিনিয়র টীচার রয়েছেন, কিছু বলতে পারেন না। আমি চুনোপুঁটি—আমার সাহস কী?

—ওই তো দোষ ভায়া। ওতেই তো পেয়ে বসে। প্রোটেস্ট করতে হয়—মেনে নিলেই বিপদ।

—আপনারা প্রোটেস্ট করুন গিয়ে দাদা, আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

গ্রীষ্মের ছুটি পর্যন্ত প্রায় এই রকম চলিল। গ্রীষ্মের ছুটি আসিয়া পড়িবার দেরি নাই। ছেলেরা সেদিন গান গাহিবে, আবৃত্তি করিবে। দুই-একজন শিক্ষক তাহাদের তালিম দিবার ভার লইয়া স্কুলের কাজ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন।

হঠাৎ শোনা গেল, গ্রীষ্মের বন্ধের পূর্বে মাস্টারদের মাহিনা দেওয়া হইবে না।

দুই মাসের বেতন এই সময়ে একসঙ্গে পাওয়ার কথা। মোটেই পয়সা দেওয়া হইবে না শুনিয়া মাস্টারদের মুখ শুকাইয়া গেল। হেডমাস্টারের কাছে দরবার শুরু হইল। হেডমাস্টার বলিলেন, আমি বা মিস্ সিবসন্ এক পয়সা নেব না—কেউ কিছু নিচ্ছি না। মাইনে আদায় যা হয়েছিল, কর্পোরেশনের ট্যাক্স আর বাড়ি-ভাড়াতে গেল।

দুই-একজন শিক্ষক একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, আমরা তবে খাব কী?

—আমি জানি না। আপনাদের না পোষায়, মাই গেট ইজ ওপন্—

গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রত্যেক মাস্টারের উপর দুই-তিনটি প্রবন্ধ লিখিয়া আনিবার ভার পড়িল—ছাত্রদের প্রতি কর্তব্য, বিভিন্ন বিষয় পড়াইবার প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে। মাস্টারদের দল মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না। মনে মনে কেহ চটিলেন, কেহ ক্ষুব্ধ হইলেন।

যদুবাবু বলিলেন, ওঃ, ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোঁসাই! মাইনের সঙ্গে খোঁজ নেই, প্রবন্ধ লিখে নিয়ে এস—দায় পড়েচে—

ক্ষেত্রবাবু অনেক দিন পরে গ্রামের বাড়িতে আসিলেন, সঙ্গে স্ত্রী নিভাননী ও দুই তিনটি ছেলেমেয়ে।

আজ প্রায় ছয় বছর পৈতৃক ভিটাতে আসেন নাই। চারি ধারে জঙ্গল, বাড়ি-ঘরে গাছ গজাইয়াছে' জমিজমা, আম-কাঁঠালের বাগান যাহা আছে, বারোভূতে লুটিয়া খাইতেছে। গ্রামের নাম আস্‌সিংড়ি—কয়েক ঘর গোয়ালার ব্রাহ্মণ এ গ্রামে বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহস্থ। ধান পুকুর জমিজমা যথেষ্ট তাহাদের। অন্য কোন ভাল ব্রাহ্মণ গ্রামে নাই, কায়স্থ আছে কিছু. গোয়ালা জেলে ছুতার কর্মকার এবং ষাট-সত্তর ঘর মুসলমান—এই লইয়া গ্রাম।

গ্রামে জঙ্গল খুব. বড় বড় আম-কাঁঠালের বাগান। ক্ষেত্রবাবুর পৈতৃক বাড়ি কোঠা, বড় বড় চার-পাঁচখানা ঘর; কিন্তু মেরামত অভাবে ছাদ দিয়া জল পড়ে। বাড়ির উঠানে বড় বড় কাঁঠালগাছে অনেক কাঁঠাল ফলিয়াছে, নারিকেলগাছে ডাবের কাঁদি ঝুলিতেছে। বাড়ির সামনে পুকুর. সেখানে কর্তাদের আমলে বড় বড় মাছ জাল দিয়া ধরা হইত, আজ কিছু নাই। শরিক এক জ্যাঠতুতো ভাই এতদিন সব খাইতেছিল, আজ বছর দুই হইল সে উঠিয়া গিয়া শ্বশুরবাড়ি বাস করিতেছে।

সকালে উঠিয়া ক্ষেত্রবাবু গ্রামের প্রজাদের ডাকাইলেন। সকলে আসিয়া প্রণাম করিল এবং এতদিন পরে তিনি গ্রামে আসিয়াছেন ইহাতে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিল।—বাপ পিতামহের ভিটা ছাড়িয়া বাহিরে না গেলে কি অন্ন হয় না? বাবু এখানে থাকুন, তাহারা ধানের জমি করিয়া দিবে, চলিবার সব ব্যবস্থা করিয়া দিবে। ক্ষেত্রবাবুও ভাবিলেন সাহেবের তাঁবে থাকিয়া দিনরাত্রি দাসত্ব করার চেয়ে এ কত ভাল! 'টীচার্স মীটিং' নাই, দুই ঘণ্টা করিয়া প্রতি দিন খাতা কারেক্ট করিবার হাঙ্গামা নাই. মিঃ আলমের ধূর্ত চক্ষুর চাহনিতে আর ভয় খাইতে হইবে না—এই তো কত চমৎকার! নাকে মুখে গুঁজিয়া স্কুলে দৌড়িবার তাড়া থাকিবে না।

নিভাননী হাসিয়া বলিল, দুধ এখানকার কী চমৎকার গো! ইটালিতে এমন দুধ কিন্তু দেয় না গোয়ালা।

ক্ষেত্রবাবু বলেন, কোত্থেকে সেখানকার গোয়ালারা ভাল দুধ দেবে? তা দিতে পারে কখনও?

দিনকতক ভাল দুধের পায়েস পিঠে খাওয়া হইল। বাড়িতে সত্যনারায়ণের সিন্নি দেওয়া হইল একদিন। ইতিমধ্যে আম-কাঁঠাল পাকিয়া উঠিল, ছেলেমেয়েরা প্রাণ পুরিয়া আম খাইল।

গ্রামের দক্ষিণে জোলের মাঠ, অনেক খেজুর পাকিয়াছে গাছে গাছে, ক্ষেত্রবাবু ছেলে-মেয়েদের হাত ধরিয়া মাঠে গিয়া খেজুর কুড়াইয়া বাল্যের আনন্দ আবার উপভোগ করেন যখন এ গ্রাম ছাড়া আর কোথাও বৃহত্তর দুনিয়ায় স্থান ছিল না, এই গ্রামের আম আমড়া ন বেল খাইয়া একদিন মানুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, যখন এ গ্রামের মাটি ছিল পৃথিবীর ীবনের একমাত্র নোঙর, ক্ষুদ্রের মধ্যেও সে পরিধি ছিল অসীম—সে সব দিনের কথা ন হয়।

তারপর তিনি বি-এ পাস করিলেন, এখানে আর থাকা চলিল না, বিদেশে চাকুরি ইতে হইল। কর্তারাও সব পরলোকে চলিয়া গেলেন—গ্রামের সঙ্গে সংযোগ-সূত্র ছিন্ন ইল। সন্ধ্যায় শিয়ালের ডাকে পিতৃপুরুষের ভিটা মুখরিত হইতে লাগিল। মধ্যে বার-ই এখানে আসিয়াছেন—সেও বছর পাঁচ-ছয় আগেকার কথা, আর আসা ঘটে নাই। নেরো টাকা ভাড়ায় কলিকাতার গলিতে একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকা, বারান্দায় াট্ট এতটুকু রান্নাঘর, ধোঁয়া দিলে বাড়িতে টেকা দায়। এমন দুধ টাটকা তরকারি চোখে খা যায় না। ক্ষেত্রবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন, কী হইলে আবার আসিয়া গ্রামে াস করিতে পারেন। পুরানো দিনের সুখ আবার ফিরিয়া আসে যদি, ক্ষেত্রবাবু তাঁহার ীবনের অনেকখানিই যে-কোন দেবতাকে দানপত্র করিয়া দিতে রাজী আছেন। ক্ষেত্রবাবু ামের প্রজাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। গ্রামে থাকিলে তাঁহার সংসার চলিবার ন্দোবস্ত হয় কি না! সকলেই উৎসাহ দিল, ধানের জমি যাহা আছে তাহাতে বছরের াতের টানাটানি হইবে না—ক্ষেত্রবাবু গ্রামেই থাকুন।

একদিন নিভাননী বলিল, আর কদিন আছে তোমার গো?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কেন?

—না, তাই বলছি।

দিন উনিশ কাটিয়াছে সবে, এখনও প্রায় এক মাস। সত্য কথা যদি স্বীকার করিতে য়, ছুটিটা একটু বেশীই হইয়া গিয়াছে। এতদিন ছুটি না দিলেও চলিত।

নিভাননীর দিন আর কাটে না। এখানে সে কথা বলিবার মানুষ খুঁজিয়া পায় না, ুরিয়া-ফিরিয়া সেই ভড়-গিন্নী আর তাহার মেয়ে সরলা। আর আছে কয়েকটি গোয়ালার ময়ে। কোন আমোদ নাই, আহ্লাদ নাই—বন-জঙ্গলের মধ্যে আর দিন কাটিতে চায় না। াহার উপর উনি নাকি এখানে থাকিবার ব্যবস্থা করিতেছেন, এখানে মানুষ বারো মাস াকিলে পাগল, নয় তো ভূত হইয়া যায়। বাড়ির পিছনে বাঁশবনের নীচেই মিনিট য়েকের পথ দূরে শীর্ণকায় চূর্ণি নদী, টলটলে কাচের মত জল—রোজ এই বাগানের ভতর দিয়া স্নানে যাইবার সময় নিভাননীর ভয় হয়। উঁচু উঁচু আমগাছে পরগাছা ুলিতেছে, কালপ্যাঁচার গম্ভীর স্বরে দিনে-দুপুরেও বুকের মধ্যে কেমন করে। স্নান ঘাঁটিতে নামিয়া কিন্তু মনে বেশ আনন্দ হয়, এত জল এবং এমন কাকের চোখের মত জল লিকাতায় কল্পনাও করা যায় না।

বাঁশের চালা পুড়াইয়া উনানে রান্না—কয়লা নাই, বাড়িতে জল নাই, নিভাননীর সব অভ্যাস নাই। কলিকাতায় রান্নাঘরের মধ্যেই কলের জলের পাইপ। এখানে মানুষ াকে না। সময় যেখানে কাটিতে চাহে না, সে জায়গা আর যাহাই হউক, ভদ্রলোকের াসের উপযুক্ত নয়।

ছেলেমেয়েদেরও এ জায়গা ভাল লাগে না। বড় ছেলে পাঁচু কেবল বলে, মা, কল-াতায় কবে যাওয়া হবে?

তাহাদের বাড়ির সামনে ছোট্ট পার্কটাতে প্রতি বৈকালে টুনু, হাবু, রণজিৎ, হীরু, ঙ্গল সিং বলিয়া একটা শিখের ছেলে, সুরেশ ভানু কত ছেলে আসিয়া জোটে! পাঁচুর ঙ্গে উহাদের সকলের খুব ভাব। পার্কে দোলনা টাঙানো আছে। গড়াইয়া পড়িবার াহার ডোঙা খাটানো আছে, রোজ রোজ সেখানে কত কী খেলা, কত আমোদ-আহ্লাদ!

রণজিতের বাড়ি কাছেই—প্রসাদ বড়াল লেনে। পাঁচুর সঙ্গে রণজিতের খুব বন্ধুত্ব—ায়ই তাহার বন্ধুর বাড়ি পাঁচু যাইত, রণজিতের মা খাইতে দিতেন, তারপরে রণজিতের ান সুসি আর হিমির সঙ্গে তাহারা দুইজনে বসিয়া ক্যারম খেলিত। সুসির অদ্ভুত

টিপ, সরু সরু ফরসা আঙুল দিয়া স্ট্রাইকার ছটকাইয়া সামনের কাঠে রিবাউন্ড করাইয়া কেমন অদ্ভুত কৌশলে সে গুটি ফেলিত। পাঁচু সুসির গুণে মুগ্ধ। অমন অদ্ভুত মেয়ে সে যদি আর কোথাও দেখিয়া থাকে!

হারিয়া গেলে সুসি হাসিয়া বলে, পারলে না পাঁচু, এইবার লালখানা ফেলে হেরে গেলে!

লাল ফেলিলে কী হইবে, পয়েন্ট হইল কই? বোর্ডে যখন সাতখানা গুটি মজুত তখন ওদিকে সুসির হাতের গুণে স্ট্রাইকার অসম্ভব সম্ভব করিয়া তুলিতেছে পাঁচুর বিস্মিত ও মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে। দেখিতে দেখিতে বোর্ড ফাঁকা, প্রতিপক্ষ সব গুটি পকেটে ফেলিয়াছে।

কী মজার খেলা! কী মজার দিন!

এখানে ভাল লাগে না। কী আছে এখানে? কুমোরপাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া গেঁয়ো খেলা যত সব! কথা সব বাঙালে ধরনের, এখানে আর কিছুদিন থাকিলে পাঁচু বাঙাল হইয়া উঠিবে।

নিভাননী বলে, আজ পঁচিশ দিন হল, না?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলেন, দিন গুনছ নাকি?

—ভাল লাগছে না আর, সত্যি।

—তা বটে। আমারও তেমন ভাল লাগছে না—বসে বসে আর দিনে ঘুমিয়ে শরীর নষ্ট হল। একটা কথা বলবার লোক নেই, আছে ওই নন্দী মশায় আর জগহরি ঘোষ—ওরা ধান-চালের দর নিয়ে কথাবার্তা বলে কেবল। কাঁহাতক ওদের সঙ্গে বসে গল্প করি।

—আর কদিন আছে তোমার?

—তা এখনও আঠারো-উনিশ দিন—কি তারও বেশী।

নিভাননী বলিল, ছেলেমেয়েদেরও আর ভাল লাগচে না। কানু আমায় বলচে, মা আমরা কলকাতা যাব কবে?

ক্ষেত্রবাবুও নিজের মনের ভাব দেখিয়া নিজেই অবাক হইলেন। যে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের নাম শুনিলে গায়ের মধ্যে জ্বালা ধরে, চাকুরির সময় যাহাকে কারাগার বলিয়া বোধ হইত, সেই স্কুলের কথা এখন যখন মনে হয় তখন যেন সে প্রশান্ত মহাসাগরের নারিকেল-দ্বীপপুঞ্জ-ঘেরা পাগো-পাগো দ্বীপ, চিরবসন্ত যেখানে বিরাজমান, পক্ষি-কাকলীতে যাহার শ্যাম তীরভূমি মুখর—ইংরেজী টকি-ছবিতে যাহা দেখিয়াছেন কতবার। সেই সিঁড়ির ঘর, তেতলার ছাদে মাস্টারদের সেই বিশ্রামকক্ষ, হেডমাস্টারের সেই বিশ্রামকক্ষ, হেডমাস্টারের আপিসের ঘণ্টাধ্বনি, মথুরা চাকরের সারকুলার-বই লইয়া ছুটাছুটি করিবার সেই সুপরিচিত দৃশ্য—এসব কল্পনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না আর ভাল লাগে না, স্কুল খুলিলেই বাঁচা যায়।

নারাণবাবুর অবস্থা ইহা অপেক্ষাও খারাপ।

নারাণবাবু স্কুলের ঘরটিতে বারো মাস আছেন, কোথাও যাইবার স্থান নাই। সেই ঘর আশ্রয় করিয়া বহুদিন থাকিবার ফলে যখন টুইশানি সারিয়া নিজের ঘরটিতে ফেরেন তখন সমস্ত মন প্রাণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠে, বাড়ি এসে বাঁচা গেল। কত কালের পিতৃ-পিতামহের বাসভূমি যেন সাহেবের বাথরুমের পূর্বদিকের সেই এক জানালা এক-দরজাওয়ালা কুঠুরিটা।

এ ছুটিতে নারাণবাবু গিয়াছিলেন তাঁহার এক দূর-সম্পর্কের ভগ্নীর বাড়ি বরিশালে। চিরকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছেন, বরিশালের পল্লীগ্রামে কিছুদিন থাকিয়াই তিনি হাঁপাইয়া উঠিলেন। গরিব স্কুল-মাস্টার হইলেও নাগরিক মনোবৃত্তি তাঁহার মজ্জাগত—সত্যিকার শহুরে মানুষ। এখানে সকালে উঠিয়া কেহ চা খায় না, লেখাপড়া-জানা মানুষ নাই। এক বাঙাল মোক্তার আছে, পঞ্চানন লাহিড়ী—বয়সে নারাণবাবুর সমান, গ্রামে সে-ই একমাত্র লেখাপড়া জানা লোক। হইলে হইবে কী, লোকটার কথাবার্তায় বরিশালের

নে তিনি ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন—কিন্তু সে গোঁড়া বৈষ্ণব, ধর্মবাতিকগ্রস্ত বৈষ্ণব।

তাহার কাছে গিয়া বসিতে হয়, উপায় নাই। সন্ধ্যাবেলাটা কোথায় কাটানো যায় আর!

অমনি সে আরম্ভ করিবে—গোপিনীদের ভাব সম্বন্ধে উদ্ধব দাস কী বলিতেছেন—এটা বলিয়া লই—

নারাণবাবুকে বাধ্য হইয়া শুনিতে বসিতে হয়। তিনি ধার্মিক লোক নন, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের দার্শনিক অংশ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না তাঁর। লেস্‌লি স্টিফেন এবং মিলের ছাত্র তিনি। পঞ্চানন মোক্তার কথা বলিতে বলিতে যখন দুই হাত তুলিয়া 'আহা আহা' বলে তখন নারাণবাবু ভাবেন, এই একটা নিতান্ত অজ-মুর্খের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা গেল দেখছি!

মনে হয় শরৎ সান্যালের কথা। শরৎ সান্যাল অবসরপ্রাপ্ত এঞ্জিনীয়ার, নারাণবাবুর বহুদিনের বন্ধু—পাশের গলিতে এক সময় বড় বাড়ি ছিল, ছেলেরা রেস খেলিয়া বাড়ি উড়াইয়া দিয়াছে, এখন দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডে ছোট ভাড়াটে বাড়িতে বাস করেন, ছুটি-ছাটার দিনে সন্ধ্যার দিকে ধোপ-দোরস্ত পাঞ্জাবি গায়ে, ছড়ি হাতে প্রায়ই নারাণবাবুর ঘরে আসিয়া বসেন ও নানাবিধ উঁচু ধরনের কথাবার্তা বলেন।

উঁচু ধরনের কথা নারাণবাবু পছন্দ করেন, গোপীভাবের কথা নয়।

কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা, ওয়াশিংটন-চুক্তির ভিতরের রহস্য, আলিগড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলরের বক্তৃতা, শিক্ষাসমস্যা সংক্রান্ত কথা প্রভৃতি আলোচনাকেই নারাণবাবু উচ্চ বিষয় বলিয়া থাকেন। বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত লোকে রাসলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা লইয়া মাথা ঘামায় না।

পঞ্চাননবাবু নিজে ইংরেজী-শিক্ষিত নহেন, সেকালের ছাত্রবৃত্তি-পাস মোক্তার, সুতরাং ইংরেজী শিক্ষার উপর হাড়ে চটা। পশ্চিম হইতে যাহা কিছু আসিয়াছে সব খারাপ, এ দেশে যাহা ছিল সব ভাল। কৃষ্ণদাস কবিরাজের (পঞ্চানন মোক্তার বলেন, কবিরাজ গোস্বামী) চৈতন্যচরিতামৃত তাঁহার মতে বাংলা সাহিত্যের শেষ ভাল গ্রন্থ।

পঞ্চানন মোক্তার গদ্‌গদ কণ্ঠে বলেন, কী সব ইংরিজী বলেন আপনারা বুঝি না। কিন্তু কবিরাজ গোস্বামীর পর আর বই হয় না। বাংলায় আর বই নাই, লেখা হয় নাই তার পর—

এ রকম লোকের সঙ্গে লেস্‌লি স্টিফেন ও মিলের ছাত্র নারাণবাবু কী তর্ক করিবেন!

জীবনে তিনি একজন খাঁটি দার্শনিক দেখিয়াছিলেন—অনুকূলবাবু। নিজের জন্য কখনও কিছু করেন নাই, স্কুল গড়িয়া তুলিবেন মনের মত করিয়া, ভাল শিক্ষা দিবেন তাঁহার স্কুলে, কলিকাতার মধ্যে একটি আদর্শ বিদ্যালয়ে পরিণত করিবেন স্কুলকে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার যত কল্পনা, যত আলোচনা—কত বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন স্কুলের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া! অমন সাধুপুরুষ জন্মায় না।

এই সব তিলক-কণ্ঠিধারী গোপীভাবে বিভোর লোকের মেরুদণ্ডহীন ব্যক্তিত্বের তুলনায় অনুকূলবাবু একটা পুরা মানুষ। আর এই সাহেবটাও মন্দ নয়, অনুকূলবাবুর মত এও স্কুল বলিতে পাগল। স্কুলের স্বার্থ, ছাত্রদের স্বার্থ সবচেয়ে বড় ওঁর কাছে। তবে অনুকূলবাবু ছিলেন খাঁটি স্টোইক্ আর সাহেব এপিকিউরিয়ান্—এই যা তফাত।

যা হোক, নারাণবাবুর ভাল লাগে না—পঞ্চানন মোক্তারকে না, বরিশালের এ পাড়াগাঁ না। পঞ্চানন ছাড়া গ্রামে আরও অনেক মানুষ আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে নারাণ-বাবুর খাপ খায় না। নারাণবাবু ভাবেন, তাহারা ছেলেছোকরা, তাহাদের সঙ্গে কী মিশিবেন! তা ছাড়া যাচিয়া তিনি কাহারও সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন না। কলিকাতার লোক, একটু লাজুক ধরনেরও আছেন।

একদিন গ্রামের বাঁশবনে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে খুব বর্ষা নামিয়া বাঁশঝাড়ের রঙ কালো দেখাইতেছে। চারিদিক মেঘে ঘিরিয়াছে গ্রামখানিকে, টারাসাঁদর ঘন জঙ্গলে বৃষ্টির ধারার শব্দ। গ্রামে এক জায়গায় গান-বাজনার মজলিস হইবে, খুব আগ্রহ লইয়া নারাণ-বাবু সেখানে গিয়া দেখিলেন—পঞ্চানন মোক্তার, দীনবন্ধু স্যাকরা গলায় ত্রিকণ্ঠি তুলসীর মালা ঝুলাইয়া মজলিস জুড়িয়া বসিয়া। আরও অনেক উহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য বসিয়া

আছে। কিছুক্ষণ পরে কীর্তন শুরু হইল, নারাণবাবু চলিয়া আসিলেন—তাঁহার ভাল লাগে না।

কীর্তন কেন তাঁহার ভাল লাগে না, ইহা লইয়া পঞ্চানন মোক্তারের সঙ্গে তর্ক করিয়া একদিন তিনি হার মানিয়াছেন। পঞ্চানন মোক্তার বলে, কীর্তন বাংলার নিজস্ব জিনিস, সঙ্গীতে বাংলার প্রধান দান—এমন মধুর রসের জিনিস যে উপভোগ করিতে না শিখিল, তার শ্রবণেন্দ্রিয়ই মিথ্যা।

নারাণবাবু বলেন, তিনি বোঝেন না, তাঁহার ভাল লাগে না—মিটিয়া গেল। যে ভাল অত তর্ক করিয়া বুঝাইতে হয়, তাহার মধ্যে তিনি নাই। 'বাংলাদেশের দান, বাংলাদেশের দান' বলিয়া চেঁচাইলে কী হইবে! বাংলাদেশ, বাংলাদেশ—তিনি নিজে নিজে। ইহার চেয়ে কথা আছে? মিটিয়া গেল।

সেদিন সেখান হইতে বাহির হইয়া পল্লীগ্রামের উপর বিতৃষ্ণা ধরিয়া গেল নারাণবাবুর। কি বিশ্রী জায়গা এ সব, বৃষ্টির পরে বাঁশবনের চেহারা দেখিলে মনে হয়, কোথায় যেন পড়িয়া আছেন। এমন জায়গায় কি মানুষ থাকে! কলিকাতার ফুটপাথে কোথাও এতটুকু ধুলোকাদা নাই—কী বিশাল জনস্রোত ছুটিয়াছে নিজের নিজের কাজে, সুইচ টিপিলেই আলো, কল টিপিলেই জল। সন্ধ্যার সময় যখন চারিদিকে বাড়িতে আলো জ্বলিয়া ওঠে, 'বঙ্গবাণী' প্রেসে ফ্ল্যাট মেশিনের শব্দ হয়, ওয়েলেসলি স্ট্রীট দিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া ট্রাম চলে, তখন এক অদ্ভুত রহস্যের ভাবে মন পূর্ণ হইয়া যায়; মনে হয়, চিরজীবন এ কর্মব্যস্ত জনস্রোতের মধ্যে কাটাইলেও ক্লান্তি আসে না, প্রাণ নবীন হয়, এতটুকু সময়ের জন্য অবসাদ আসে না মনে।

এখান হইতে চলিয়া যাইতেন, কিন্তু ভাগ্নী যাইতে দেয় না, জোর করিয়াও যাইতে মন সরে না।

জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ও বাড়ি গিয়া খুব শান্তিতে নাই। তাঁহার বাড়ি নোয়াখালি জেলায়। তিন বৎসরে এই একবার বাড়ি আসেন, বাড়িতে স্ত্রীপুত্র সবাই আছে। দুই-তিন ভাই, খুব বড় পরিবার—এমন কিছু বেশী মাহিনা পান না, যাহাতে স্ত্রীপুত্র লইয়া কলিকাতায় থাকিতে পারেন। বাড়িতে আসিয়াই জ্যোতির্বিনোদ এবার এক মোকদ্দমায় পড়িয়া গেলেন, জমিজমা সংক্রান্ত শরিকী মোকদ্দমা। তাহার পর হইল বড় ছেলেটির টাইফয়েড, সে সতেরো দিন ভুগিয়া এবং পয়সা খরচ করাইয়া ঠেলিয়া উঠিল তো স্ত্রী পা পিছলাইয়া হাঁটু ভাঙিয়া শয্যাগত হইয়া পড়িল।

এই রকম নানা মুশকিলে জ্যোতির্বিনোদ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। এদিকে কলিকাতায় থাকিলে লোকের হাত দেখিয়া, ঠিকুজি কুষ্ঠি তৈরী করিয়া কিছু কিছু উপার্জনও হয়। এখানে সে উপার্জন নাই, শুধু খরচ আর খরচ।

কলিকাতায় একরকম থাকেন ভাল, একা ঘরে একা থাকেন, কোন গোলমাল নাই। সাহেবের দাপট সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলে আর কোন হাঙ্গামা নাই। নিজে যা-খুশি দুইটি রান্না করিলেন, অভাব অভিযোগ হইলে নারাণবাবুর কাছে টাকাটা সিকিটা ধার করিয়া দিন চলিয়া যায়। বাড়ির এত ঝঞ্জাট পোহাইতে হয় না। যে চিরকাল একা কাটাইয়া আসিয়াছে, তাহার পক্ষে এসব বড় বোঝা বলিয়া মনে হয়।

ছুটি ফুরাইলে যেন বাঁচা যায়।

যদুবাবু ছিলেন কলিকাতায়, একটা মাত্র টুইশানি সন্ধ্যার সময়—অন্য অন্য টুইশানির ছাত্র কলিকাতার বাহিরে গিয়াছে। দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বেলা পাঁচটার সময় চা খাইয়া তিনি টুইশানিতে যান। সময় কাটাইবার ওই একমাত্র উপায়। পথে এক কবিরাজ-বন্ধুর ওখানে বসিয়া কিছুক্ষণ গল্প-গুজব করেন। স্কুল মাস্টারদের জগৎ সংকীর্ণ, বৃহত্তর কলিকাতা শহরে চেনেন কেবল টুইশানির ছাত্র ও তাহাদের অভিভাবকদের, কিংবা

স্কুল-কমিটীর দু-একজন উকিল কিংবা ডাক্তারকে। তাঁহাদের বাড়িতেও মাঝে মাঝে যদুবাবু গিয়া থাকেন, কমিটীর মেম্বারদের তোয়াজ করা ভাল—কী জানি, কখন কী ঘটে!

একঘেয়ে ভাবে সময় আর কাটিতে চায় না, দিবানিদ্রার অভ্যাস ক্রমশ পাকা হইয়া আসিতেছে। স্কুল-বাড়ির সামনে দিয়া আসিবার সময় চাহিয়া দেখেন সাহেবের ঘরে আলো জ্বলিতেছে কি না! সাহেব দার্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছে মেম সিবসন্‌কে লইয়া—ছুটি ফুরাইবার আগের দিন বোধ হয় ফিরিবে।

অবশেষে দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশ ফুরাইল। সব মাস্টার একত্র হইলেন।

যদুবাবু বলিলেন, এই যে জ্যোতির্বিনোদ মশায়, নমস্কার! বেশ ভাল ছিলেন? কবে এলেন?

হেডপণ্ডিত যদুবাবুর সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া বলিলেন, ভাল যদু? এখানেই ছিলে?

সকলে মিলিয়া বৃদ্ধ নারায়ণবাবুর পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিলেন। নারাণবাবুর স্বাস্থ্য ভাল হইয়া গিয়াছে। যেখানে গিয়াছিলেন, সেখানে দুধ ঘি মাছ মাংস সস্তা, খাওয়া-দাওয়া এখানকার চেয়ে ভাল অনেক, এখানে হাত পুড়াইয়া ভাতে-ভাত রাঁধিয়া খাইয়া থাকিতে হয়। এ বয়সে সেবাযত্ন পাওয়া আবশ্যক—সকলে এসব কথা বলিয়া নারাণবাবুকে আপ্যায়িত করিল।

মাস্টারদের মধ্যে পরস্পর প্রীতি ও আত্মীয়তার বন্ধন স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে দীর্ঘদিন পরস্পর অদর্শনের পর—হিংসা বা মনোমালিন্যের চিহ্নও নাই। এমন কি মিঃ আলমকে দেখিয়াও যেন সকলে খুশী হইল।

হেডমাস্টার বলিলেন, ওয়েল-কাম জেন্টলমেন। আশা করি, আপনারা সব ভাল ছিলেন। এবার হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষা সামনে, সকলে তৈরী হোন, প্রশ্নপত্র তৈরি করুন। আজই সারকুলার বার হবে।

আলম নিজের দেশ হইতে হেডমাস্টারের জন্য প্রায় দুই ডজন মুর্গির ডিম একটা টিনের কৌটা ভরিয়া আনিয়াছে। সিবসন্ ডিম পাইয়া খুব খুশী।

—ও, মিঃ আলম, ইট ইজ সো গুড অফ ইউ! সাচ নাইস্ এগস্ অ্যান্ড সো ফ্রেশ!

কিন্তু পরক্ষণেই সাহেব ও মেম দুইজনকেই আশ্চর্য করিয়া মিঃ আলম কাগজ-জড়ানো কী একটা বাহির করিয়া টেবিলের উপর রাখিল।

মেম বলিল, কী ওটা?

সাহেব বলিয়া উঠিলেন, গুড হেভেনস্! সিওরলি দ্যাট ইজ নট এ শোলডার অফ মাটন?

মিঃ আলম মৃদু হাসিয়া বলিল, ইয়েস স্যার, ইট ইজ স্যার। এ লিটল্ শোলডার অফ মাটন—ফ্রম মাই হোম স্যার।

বিস্মিত ও আনন্দিত মিস্ সিবসন্ বলিল থ্যাংকস্ অ-ফুলি মিঃ আলম!

যদুবাবু টীচারদের ঘরে আড়ালে বলিলেন, ঢের ঢের খোশামুদে দেখেচি বাবা, কিন্তু এ দেখছি সকলের উপর টেক্কা দিলে—আবার বাড়ি থেকে বয়ে ভেড়ার দাপনা এনেচে!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, বাড়ি থেকে না, ছাই! আপনিও যেমন! ওর বাড়িতে একেবারে দলে দলে ভেড়া চরচে! ক্ষেপেছেন আপনি! ওসব চাল দেখানো আমরা বুঝিনে? মিউনিসিপ্যাল মার্কেট থেকে কিনে এনেছে মশাই।

ছেলেরা ক্লাসে ক্লাসে প্রণাম করিল মাস্টারদের। আজ বেশী পড়াশুনা নাই, সকাল সকাল ছুটি হইয়া গেলে সকলে মিলিয়া পুরানো চায়ের দোকানে চা পান করিতে গেলেন। দোকানী তাঁহাদের দেখিয়া লাফাইয়া উঠিলঃ আসুন বাবুরা, আসুন—ভাল ছিলেন সব? আজ স্কুল খুলল বুঝি? ওরে, বাবুদের চা দে। আবার সেই পুরানো ঘরে বসিয়া বহুদিন পরে পুরানো সঙ্গীদের সঙ্গে চা পান। সকলেরই খুব ভাল লাগে।

যদুবাবু বলেন, নারাণদা, গল্প করুন সে দেশের!

—আরে রামো, সে আবার দেশ! মোটে মন টেঁকে না। দুধ ঘি খেতে পেলেই কি হল! মানুষের মন নিয়ে হল ব্যাপার—মন যেখানে টেঁকে না, সে দেশ আবার দেশ!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, যা বলেচেন দাদা। গেলাম পৈতৃক বাড়িতে। ভাবলাম, অনেক

দিন পরে এলাম, বেশ থাকব। কিন্তু মশাই, দু দিন যেতে না যেতে দেখি আর সেখানে মন টিকচে না।

—কলকাতার মতন জায়গা আর কোথাও নেই রে ভাই।

—খুব সত্যি কথা।

—মানুষের মুখ যেখানে দেখা যায়, দুটো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করে সুখ যেখানে, খাই না-খাই সেখানে পড়ে থাকি।

নারাণবাবু অনেকদিন পরে চুনিদের বাড়ি পড়াইতে গেলেন।

চুনিরা দেওঘর না কোথায় গিয়াছিল, বেশ মোটাসোটা হইয়া ফিরিয়াছে। অনেকদিন পরে চুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে নারাণবাবু বড় আনন্দ পাইলেন।

চুনি আসিয়া প্রণাম করিল। নারাণবাবু প্রথম দিনটা তাহাকে পড়াইলেন না, বরিশালে যে গ্রামে গিয়েছিলেন, সে গ্রামের গল্প করিলেন, পঞ্চানন মোক্তারের কথা বলিলেন। চুনি তাঁহার কাছে দেওঘরের গল্প করিল।

নারাণবাবু বলিলেন, পান্না কোথায় রে?

—সে স্যার্, মাসীমার বাড়ি গিয়েছে কালীঘাটে, কাল আসবে। মাসীমার বড় ছেলের পৈতে কিনা।

—তুই যাস নি যে?

—স্যার, আজ প্রথম দিনটা—আপনি আসবেন। রাত্রে যাব!

উত্তর শুনিয়া নারাণবাবু আহ্লাদে আটখানা হইয়া গেলেন। নিজের ছেলেপিলে নাই, পরের ছেলেকে মানুষ করা, তাহাদের নিজের সন্তানের মত দেখিয়া অপত্যস্নেহের ক্ষুধা নিবারণ করা যাহাদের অদৃষ্টলিপি—তাহাদের এরকম উত্তরে খুশী হইবার কথা। চুনি বলিল, চা খাবেন স্যার? আনি—

নারাণবাবু ভাবেন—নিজের নাই, তাতে কী! আমার ছেলেমেয়ে এই ওয়েলেসলি অঞ্চলে সর্বত্র ছড়ানো—আমার ভাবনা কী? একটা করে টাকা যদি দেয় প্রত্যেকে, বুড়ো বয়সে আমার ভাবনা কী?

—স্যার, আজ পড়ব না।

—বেশ, গল্প শোন্—এই বরিশালের গাঁয়ে—

—না স্যার, একটা ভূতের গল্প করুন।

—ভূত-টুত সব মিথ্যে। ও-সব নিয়ে মাথা ঘামাস নে ছেলেবেলা থেকে।

—কিন্তু স্যার কুণ্ডাতে একটা বাড়ি আছে—

—কোথায়?

—কুণ্ডা—দেওঘরের কাছে স্যার। সেখানে একটা বাড়িতে ভূতের উপদ্রব ব'লে কেউ ভাড়া নেয় না। সত্যি, আমরা জানি স্যার।

নারাণবাবু আর এক সমস্যায় পড়িলেন। মিথ্যা ভয় এক বালকের মন হইতে কী করিয়া তাড়ানো যায়? নানা কুসংস্কার বালকদের মনে শিকড় গাড়িবার সুযোগ পায় শুধু অভিভাবকদের দোষে। তিনি শিক্ষক, তাঁহার কর্তব্য, বালকদের মন হইতে সে সমস্ত কুসংস্কার উচ্ছেদ করা।

নারাণবাবু নিজের নোট-বইয়ে লিখিয়া লইলেন। সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করা আবশ্যক, এ বিষয়ে কী করা যায়!

চুনির মা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন, বলি ও দিদি, মাস্টারকে বল না—ছেলে যে মোটে বই হাত করতে চায় না।

(দেওঘরে গিয়ে বেড়িয়ে আর খেলে বেড়াবে—তব কী করবেন উনি?)

নারাণবাবু বলিলেন, বউমা, চুনি ছেলেমানুষ, একদিনে দুদিনে ও স্বভাব ওর যাবে না। আমি ওকে বিশেষ স্নেহ করি, সেদিকে আমার যথেষ্ট নজর আছে, আপনি ভাববেন না।

চুনির মা বলিলেন, ও দিদি, বল যে, পরীক্ষা সামনে আসছে, চুনিকে দু বেলা পড়াতে হবে। এক মাস দেড় মাস তো বসিয়ে মাইনে দিয়েছি। এখন মাস্টার যেন দু বেলা আসে।

নারাণবাবু মেয়েমানুষের কাছে কী প্রতিবাদ করিবেন? ন্যায্য পড়াইয়া এখানে মাহিনা আদায় করিতে গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, ছুটির মাসে বসাইয়া কে তাঁহাকে মাহিনা দিল? ছুটির আগের মাসের মাহিনা এখনও বাকী।

মুখে বলিলেন, বউমা, সকালে আজকাল সময় বেশী পাওয়া যায় না। আমারও নিজের একটু কাজ আছে। আচ্ছা, তা বরং দেখব—

—দেখাদেখি চলবে না বলে দাও দিদি। আসতেই হবে—না পারেন, আমরা অন্য মাস্টার রাখব। ওই তো সে দিন পাশের মেসের ছেলে—তিনটে পাসের পড়া পড়ছে—বলছিল, আমায় দশ টাকা দেবেন, দু বেলা পড়াব।

এই সময় চুনি মাকে ধমক দিয়া বলিল, যাও না এখান থেকে, তোমায় আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিকনেস কাটতে হবে না।

নারাণবাবু বলিলেন, ছিঃ, মাকে অমন কথা বলতে আছে?

মনে মনে কিন্তু খুশী হইলেন।

চুনি বলিল, স্যার্, আপনি মার কথা শুনবেন না। দু'বেলা আপনি পড়ালেও আমি পড়ব না। আমার দু বেলা পড়তে ইচ্ছে করে না।

নারাণবাবুর আনন্দ অনেকখানি উবিয়া গেল। তাঁহার অসুবিধা দেখিয়া তাহা হইলে চুনি কথা বলে নাই, সে দেখিয়াছে নিজের সুবিধা! পাছে নারাণবাবু স্বীকার করিলে দুই বেলা পড়িতে হয়, তাই মাকে ধমক দিয়াছে হয়তো।

বাড়িতে ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার এঞ্জিনীয়ার-বন্ধুটি তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

—কী নারাণবাবু, কবে ফিরলেন?

—আজ দিন তিনেক। ভাল সব? বসুন, বসুন, শরৎবাবু।

মনের মতন সঙ্গী পাইয়াছেন তিনি। উঃ, কোথায় বরিশালের অজ-পাড়াগাঁয়ের পঞ্চানন মোক্তার, আর কোথায় তাঁহার এই বন্ধু শরৎ সান্যাল!

দুইজনে যেমন একত্র হইয়াছেন, অমনি উঁচু বিষয়ের আলোচনা শুরু। এই জন্যই কলিকাতা এত ভাল লাগে। এসব লইয়া কথা বলিবার লোক কি বাংলাদেশের অজ-পাড়াগাঁয়ে মিলিবে।

নারাণবাবুর বন্ধু বলিলেন, ভাল কথা দাদা, আপনাকে দেখাব বলে রেখে দিয়েছি।

—কী?

—'রিডার্স ডাইজেস্ট'-এ একটা আর্টিক্‌ল্ বেরিয়েছে বর্তমান চায়নার ব্যাপার নিয়ে। কাল এনে দেখাব।

—আচ্ছা, কাল আনবেন। কিন্তু আমার ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ আছে তো ওয়াশিংটন-চুক্তি সম্বন্ধে?

—আপনার ও-কথা টেঁকে না। রামানন্দবাবুর মন্তব্য পড়ে দেখবেন এ মাসের 'মডার্ন-রিভিউ'-এ।

—আলবত টেঁকে। আমি কারও কথা মানি নে।

এ কথা নারাণবাবু বলিলেন একটা খাঁটি ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আলোচনা জমাইয়া তুলিবার জন্য। তর্ক না হইলে আলোচনা জমে না।

কলিকাতা না হইলে এমন মনের খোরাক কোথায় জোটে?

দুই বন্ধুতে মিলিয়া মনের খেদ মিটাইয়া রাত এগারোটা পর্যন্ত ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল আলোচনা চলিল। দুই জনেই সমান তার্কিক। কোন কথারই মীমাংসা হইল না। তা না হউক। মীমাংসার জন্য কেহ তর্ক করে না। তর্কের খাতিরেই তর্ক করিতে হয়। আফিমের নেশার মত তর্কের নেশাও একবার পাইয়া বসিলে আর ছাড়িতে চায় না।

নারাণবাবু বলিলেন, আজ একটু যোগবাশিষ্ঠ পড়া হল না!

—তা বেশ তো, পড়ুন না। আরও রাত হোক।

অনেক রাত্রে নারাণবাবুর বন্ধু রায় বাহাদুর শরৎ সান্যাল বিদায় গ্রহণ করিলে নারাণবাবু রান্না চড়াইলেন। মনে এত আনন্দ, ও-বেলার বাসি পুঁটিমাছ-ভাজা ছিল, তাই

দিয়া ঝোল চড়াইলেন আর ভাত—আর কিছু না। মনের আনন্দই মানুষকে তাজা রাখে, খাইয়া মানুষ বাঁচে না শুধু।

খাওয়া শেষ হইলে সাহেবের ঘরের দিকে উঁকি মারিয়া দেখিলেন, সাহেবের টেবিলে আলো জ্বলিতেছে, অত রাত্রে সাহেব লেখাপড়া করিতেছেন নাকি? নারাণবাবুর ইচ্ছা হইল, ঘরে ঢুকিয়া দেখেন সাহেব কী পড়িতেছেন!

সাহেব বলিলেন, কাম ইন্।

নারাণবাবু বিনীত হাস্যের সহিত ঘরে ঢুকিলেন।

—ইয়েস?

—না, এমনি দেখতে এলাম, আপনি কী পড়ছেন!

—আমি আপিসের কাজ করছিলাম। বোস।

—স্যার্, কলকাতার মত জায়গা নেই।

—আমাদের মত লোক অন্য জায়গায় গিয়ে থাকতে পারে না। আমার এক ভাই চায়নাতে আছে—মিশনারি। ক্যান্টন থেকে নদীপথে যেতে হয়—অনেক দূর। আগে সে ব্রিটিশ গানবোটে মেডিক্যাল অফিসার ছিল, এখন মিশনারি হয়েছে। সে কিন্তু চীনদেশের একটা অজ-পাড়াগাঁয়ে মিশনে থাকে। আমি একবার গিয়েছিলাম সেখানে, গিয়ে আমার মন হাঁপিয়ে উঠল।

—আমিও স্যার্ বরিশালে গিয়েছিলাম ছুটিতে, আমারও মন টেঁকে নি।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, স্কুলটাকে আরও ভাল করতে হবে স্যার।

—আমিও তাই ভাবছি। একটা বিজ্ঞাপন দেব কাগজে, আরও ছেলে হোক!

দুজনে বসিয়া স্কুলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল।

নারাণবাবু বিদায় লইয়া শয়নের জন্য গেলেন।

শ্রাবণ মাসের দিকে স্কুলের কাজ ভয়ানক বাড়িল।

এই সময় একজন নতুন মাস্টার স্কুলে নেওয়া হইল—বেশী বয়স নয়, ত্রিশের মধ্যে। লোকটি কবিতা লেখে, বড় বড় কথা বলে, অবস্থাও বোধ হয় ভাল। কারণ, সাধারণ স্কুল-মাস্টারদের অপেক্ষা ভাল সাজগোজ করিয়া স্কুলে-আসে, বেশীর ভাগ আপন মনে বসিয়া থাকে, কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। ফট ফট করিয়া ইংরেজী বলে যখন-তখন। নাম—রামেন্দুভূষণ দত্তগুপ্ত, বাড়ি—নৈহাটীর কাছে কী একটা জায়গায়।

যদুবাবু চায়ের দোকানে বলিলেন, ওহে, এ নবাবটি কে এল হে? নরলোকের সঙ্গে বাক্যালাপ করে না যে!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, করার উপযুক্ত মনে করলেই করবে।

নারাণবাবু চুপ করিয়া ছিলেন। যদুবাবু বলিলেন, কী দাদা! চুপ করে আছেন যে?

—কী বলি বল? কী রকম লোক, কিছু জানি নে তো।

—কী রকম বলে মনে হয়? বেজায় গুমুরে?

—তা হতে পারে। তবে ছেলেমানুষ, শাইও হতে পারে।

—শাই, না, ছাই। কারও সঙ্গে কথা বলে না, টীচারস-রুমে একলাটি বসে কী যেন ভাবে!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, লোকটা কবি, তাই বোধ হয় আপন মনে ভাবে—

যদুবাবু কাহারও প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না, তিনি বলিলেন, হ্যাঃ, কবি—একেবারে রবি ঠাকুর। ডেঁপো কোথাকার!

সে দিন টিফিনের পর কিছুক্ষণ ক্লাসে নূতন শিক্ষক নাই। দশ মিনিট কাটিয়া গেল, তখনও তাঁহার দেখা নাই।

হেডমাস্টার কটমট দৃষ্টিতে ক্লাসের শূন্য চেয়ারের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কার ক্লাস?

মনিটার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, নিউ টীচার স্যার্।

হেডমাস্টার চলিয়া গেলেন।

অনেকক্ষণ পরে নতুন মাস্টার আসিয়া বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মধুরা চাকর আসিয়া একটা স্লিপ দিল তাঁহার হাতে, হেডমাস্টার আপিসে ডাকিয়াছেন।

নতুন মাস্টার উঠিয়া আপিসে গেলেন।

—আমাকে ডেকেছেন স্যার্?

—হ্যাঁ। আপনি ক্লাসে ছিলেন না?

—আমি ক্লাস থেকেই আসছি।

—দশ মিনিট পর্যন্ত আপনি ক্লাসে ছিলেন না।

—আমি দুঃখিত। চা খেতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেল।

—কোথায় চা খেতে গিয়েছিলেন? আমায় না বলে বাইরে যাবেন না।

—কেন স্যার্?

হেডমাস্টার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া নতুন মাস্টারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমার স্কুলের নিয়ম।

নতুন মাস্টার কিছু না বলিয়া ক্লাসে গিয়া পড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আবার হেডমাস্টারের আপিসে আসিয়া বলিলেন, স্যার্, একটা কথা—

—কী?

—আমি স্কুলের একজন টীচার, ছাত্র নই—হেডমাস্টারের কাছে অনুমতি নিয়ে স্কুলের ফটকের বাইরে যেতে হয় ছাত্রদের, টীচারদের নয়। আমার দেরি হয়েছিল ফিরতে, সে জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আপনাকে না বলে যাওয়ার জন্যে আপনি অনুযোগ করলেন, এটা ঠিক করেছেন বলে মনে করি না।

হেডমাস্টারের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে নতুন টীচার গটগট করিয়া ক্লাসে চলিয়া গেলেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ক্লার্কওয়েল তো অবাক, তাঁহার অধীনস্থ কোন মাস্টার যে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এ কথা বলিতে পারে, তাহা তাঁহার কল্পনার অতীত। তিনি তখনই মিঃ আলমকে ডাকিলেন।

—ইয়েস স্যার্।

—নতুন টীচার বেশ ভাল পড়ায়?

—জানি না স্যার্। বলেন তো দৃষ্টি রাখি।

—রাখো।

—কী রকম একটু অসামাজিক ধরনের—

—শুনলাম নাকি, কবি। বাংলা কবিতা পড় তোমরা—পড়েছ কী রকম কবিতা লেখে?

মিঃ আলম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হাত কড়িকাঠের দিকে উঠাইয়া থিয়েটারী ভঙ্গি করিলেন। তারপর সুর নীচু করিয়া বলিলেন, কিসের কবি। বাংলাদেশে সবাই কবিতা লেখে আজকাল। কবি!

—তুমি বাংলা কবিতা পড় মিঃ আলম?

—পড়ি বইকি স্যার্।

আলমের এ কথা সত্য নয়, বাংলা সাহিত্যের কোন খবর কোনদিনও তিনি রাখেন না।

মিঃ আলমের সঙ্গে একদিন নতুন মাস্টারের ঠোকাঠুকি বাধিল।

ব্যাপারটা খুব সামান্য বিষয় অবলম্বন করিয়া। ক্লাসে কী একটা পরীক্ষার কাগজে নতুন মাস্টার নম্বর দিয়া ছেলেদের নিকট ফেরত দিয়াছেন। মিঃ আলম সে ক্লাসে পড়াইতে গিয়া সামনেই বেঞ্চির উপর একটি ছেলের পরীক্ষার খাতা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কিসের খাতা রে?

ছেলেটি বলিল, এবারকার উইকলি এক্সারসাইজের খাতা স্যার্, নতুন স্যার্ দেখে ফেরত দিয়েছেন।

—কী সাব্জেক্ট?

—হিস্ট্রি।

—দেখি খাতাখানা।

মিঃ আলম খাতাখানা লইয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বলিলেন, নম্বর দেওয়া সুবিধে হয় নি।

—কেন স্যার্?

—এর নাম কি মার্ক দেওয়া! এ আনাড়ির মার্ক দেওয়া। এই খাতায় তুমি ষাট নম্বর কখনও পাও না—আমার হাতে চল্লিশের বেশী নম্বর উঠত না।

নতুন টীচারের কাছে ছেলেরা অন্য ভাবে ঘুরাইয়া বলিল, স্যার, আপনার হাতে বড় নম্বর ওঠে।

—কেন রে?

—স্যার, ওই সতীশকে ষাট দিয়েচেন, ও চল্লিশের বেশী পায় না।

—কে বলেছে তোকে?

—মিঃ আলম বলে গেলেন স্যার।

—কী বললেন?

—বললেন, এ আনাড়ীর মার্ক দেওয়া হয়েছে।

নতুন টীচার তখনই গিয়া হেডমাস্টারের আপিসে মিঃ আলমকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। হেডমাস্টার নাই, ক্লাসে পড়াইতে গিয়াছেন। বলিলেন, আপনার সঙ্গে একটা কথা—এক মিনিট—

—কী, বলুন?

—আপনি কি ফোর্থ ক্লাসে আমার খাতা দেখা সম্বন্ধে কিছু বলেছিলেন?

—কেন বলুন তো?

—না, তাই বলছি। ছেলেরা বলছিল, আপনি খাতা দেখে বলেছেন যে খাতা ভাল দেখা হয় নি।

—হ্যাঁ—তা—না—সে কথা ঠিক না—তবে হ্যাঁ, একটু বেশী নম্বর বলেই আমার মনে হল কিনা—

—খুব ভাল কথা। আপনি অভিজ্ঞ টীচার, আমার ভুল ধরবার সম্পূর্ণ অধিকারী। আমায় দয়া করে যদি খাতা দেখাটা সম্বন্ধে একটু বলে-টলে দেন—আমার অনেক ভুল সংশোধন হতে পারে। আমরা আনাড়ী কিনা আবার এ বিষয়ে!

আলমের মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিলেন, তা আমার যা মনে হয়েছে, তাই বলেছি। আপনার নম্বর দেওয়াটা একটু বেশী বলেই মনে হয়েছিল।

—আমি মোটেই তার প্রতিবাদ করছি না। আমি কেবল বলতে চাই ক্লাসে ছেলেদের সামনে মন্তব্য না করে আমাকে আড়ালে ডেকে বললেই ভাল হত।

ন্যায্য কথা। এ কথার উপর কোন কথা চলে না। মিঃ আলমের চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে হেডমাস্টারকে একা পাইয়া মিঃ আলম সাতখানা করিয়া তাঁহার কাছে লাগাইলেন, নতুন টীচারকে খাতা দেখতে দেবেন না স্যার্।

—নতুন টীচারকে? কেন মিঃ আলম?

—উনি খাতা মনোযোগ দিয়ে দেখেন না।

—দেখেছিলে নাকি কোন খাতা?

—হ্যাঁ স্যার্। ফোর্থ ক্লাসের সতীশকে উনি ষাট নম্বর দিয়েছেন যে খাতায়, তাতে চল্লিশের বেশী নম্বর ওঠে না। ভুল কাটেনও নি সব জায়গায়।

এই কথাটার মধ্যে মুশকিল আছে। সব ভুল নিখুঁত ভাবে কাটিয়া কোন মাস্টারই খাতা দেখেন না—স্বয়ং মিঃ আলমও না। এখানে মিঃ আলম নতুন টীচারের উপর বেশ এক চাল চালিলেন। হেডমাস্টার খাতা চাহিয়া পাঠাইয়া সত্যই দেখিলেন, প্রত্যেক পাতায় এক-আধটা ভুল রহিয়া গিয়াছে, যাহা কাটা হয় নাই। নতুন মাস্টারের ডাক পড়িল ছুটির পর।

হেডমাস্টার বলিলেন, ফোর্থ ক্লাসের হিস্ট্রির খাতা দেখেছিলেন আপনি?

—হ্যাঁ স্যার্।

—খাতা ভাল করে দেখেন নি তো। সব ভুলে লাল দাগ দেন নি।

—বেশীর ভাগ দিয়েছি স্যার্। দু-একটা ছুটে গিয়েছে হয়তো।

—না, আমার স্কুলে ওভাবে কাজ করলে চলবে না। খাতা সব আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। আবার দেখতে হবে।

—যে আজ্ঞে স্যার্।

পরদিন নতুন মাস্টার সারকুলার-বই দেখিয়া বাহির করিলেন—মিঃ আলম ফার্স্ট ক্লাসের ইংরেজী গ্রামার ও রচনা খাতা দেখিয়াছেন। তিনখানি খাতা চাহিয়া লইয়া দেখিতে দেখিতে বাহির করিলেন, মিঃ আলম গড়ে প্রত্যেক পাতায় অন্তত তিনটি করিয়া ভুলের নীচে লাল দাগ দেন নাই।

নতুন টীচার খাতা কয়খানি হাতে করিয়া হেডমাস্টারের কাছে না গিয়া মিঃ আলমের কাছে গেলেন। খাতা দেখাইয়া বলিলেন, আপনার খাতা দেখা যদি আদর্শ হিসেবে নিতে হয়, তা হলে প্রত্যেক পাতায় আমার তিনটি ভুলে লাল দাগ না দিয়ে রাখা উচিত ছিল। দেখুন খাতা কখানা।

মিঃ আলম উল্টাইয়া খাতাগুলি দেখিল। যুক্তি অকাট্য। গড়ে তিনটি করিয়া ভুলে লাল দাগ দেওয়া হয় নাই—খাঁটি কথা।

মিঃ আলমের মুখ লাল হইয়া উঠিল অপমানে, কিন্তু কোন কথা বলিলেন না।

নতুন টীচার বলিলেন, আপনি বললেন কিনা হেডমাস্টারের কাছে আমার বড্ড ভুল থাকে খাতায়, তাই দেখালুম—ভুল সকলেরই থাকে। ওগুলো ওভারলুক করতে হয়। সব কথায় হেডমাস্টারের কাছে—

মিঃ আলম রাগিয়া বলিলেন, আপনি কী করে জানলেন, আমি হেডমাস্টারের কাছে বলেছি?

—মনের অগোচরে পাপ নেই। আপনি জানেন, আপনি বলেছেন কিনা!—বলিয়াই নতুন টীচার বেশ কায়দার সহিত ঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ ব্যাপার কী করিয়া যেন অন্য টীচারেরা জানিতে পারিলেন, টীচারদের বসিবার ঘরে টিফিনের সময় এ কথা লইয়া বেশ গুলজার হইল। মিঃ আলমের অপমানে সকলেই খুশী।

যদুবাবু বলিলেন, বেশ হয়েছে অন্ত্যজটার। থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিয়েছে নতুন টীচার—কী ওর নাম, রামেন্দুবাবু বুঝি?

নারাণবাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার একটা গুণ, পরের কথায় বড় একটা থাকেন না। বলিলেন, বাদ দাও ভায়া ও-কথা।

যদুবাবু বলিলেন, বাদ দেব কেন? আপনি তো দাদা, দেবতুল্য লোক। তা বলে দুষ্টু লোকও তো আছে পৃথিবীতে। তাদের শাস্তি হওয়াই ভাল।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, জানেন দাদা, একটা কথা বলি। ওই মিঃ আলমটা সবার নামে হেডমাস্টারের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়—এ কথা আপনি অস্বীকার করতে পারেন? অমন হিংসুক লোক আর দুটি দেখি নি, এই আপনাকে বলে দিচ্ছি।

জ্যোতির্বিনোদ নীচু ক্লাসের পণ্ডিত—বড় বড় ক্লাসে যাঁহারা পড়ান, তাঁহাদের সমীহ করিয়া চলেন, তিনি কাহারও বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা হইলে বিশেষ যোগ দেন না। তিনি বলেন, আমি চুনোপুঁটি, আপনারা সকলেই রুই-কাতলা—আমার কোন কথায় থাকা সাজে না। তিনিও আজ বলিলেন, একটা ভাল বলতে হয় রামেন্দুবাবুকে—তিনি ওই খাতা নিয়ে হেডমাস্টারের কাছে না গিয়ে মিঃ আলমের কাছে গিয়েছেন।

যদুবাবু কাহারও ভাল দেখিতে পারেন না। তিনি বলিলেন, আরে, সেটা কিছু নয় হে ভায়া, হেডমাস্টারের কাছে যেতে সাহস কি হয় সবারই?

নারাণবাবু বলিলেন, তা নয়। অতখানি যে করতে পারে, সাহেবের কাছে যাওয়ার সাহস তার খুবই আছে। লোকটি ভদ্রলোক।

যদুবাবু বলিলেন, তবে একটু গুমুরে। যাক, সব গুণ মানুষের থাকে না। এ কাজটা করে যা শিক্ষা দিয়েছে আলমকে, ভারি খুশী হয়েছি—হ্যা-হ্যা, কী বল ক্ষেত্র-ভায়া?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, স্পিরিট আছে ভদ্রলোকের।

—ডেকে নিয়ে এস না। ওই তো ওদিকের ছাদে বসে থাকে একলাটি। টিফিনে টীচারদের ঘরে কোনদিন তো আসে না।

নারাণবাবু বলিলেন, বসে বসে বই পড়ে লাইব্রেরি থেকে নিয়ে। সে দিন বঙ্কিমের বই পড়ছিল। পকেটে একদিন শেলির কবিতা ছিল। তোমরা ওকে গুমুরে ভাব, ও তা নয়। কবি কিনা, একটু আনমনে ভাবতে ভালবাসে।

—যাও না ক্ষেত্র-ভায়া, ডেকে নিয়ে এস না।

—আমি পারব না দাদা। কিছু যদি বলে বসে! তার চেয়ে চলুন, আজ চায়ের দোকানের আড্ডায় নিয়ে যাওয়া যাক ওকে। আলাপ-সালাপ করা যাক।

ছুটির পরে গেটের বাহিরে মাস্টারের দল নতুন মাস্টারের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; কারণ, এ ঘনিষ্ঠতা হেডমাস্টার বা মিঃ আলমের চোখের আড়ালে হওয়াই ভাল। মিঃ আলম বা হেডমাস্টারের নেকনজরে যে ব্যক্তি নাই, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে যাওয়ার বিপদ আছে।

নতুন টীচার চোখে চশমা লাগাইয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে নব্য কবির স্টাইলে আকাশপানে মুখ করিয়া যেই গেটের বাহিরে পা দিয়াছেন, অমনি যদুবাবু এদিক ওদিক চাহিয়া বলিলেন, এই যে শুনছেন, রামেন্দুবাবু—এই যে—

রামেন্দুবাবু হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিয়া পিছনে ফিরিয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলেন, আমাকে বলছেন?

যেন তিনি ইহা প্রত্যাশা করেন নাই, তাঁহাকে কেহ ডাকিবে।

যদুবাবু বলিলেন, আমরাই ডাকছি, আসুন, একটু চা খেয়ে আসি।

—ও! আচ্ছা—তা চলুন।

সকলেই খুব আগ্রহান্বিত। নতুন টীচারের সঙ্গে এত দিন আলাপ ভাল করিয়া হয়ই নাই, অনেকের সঙ্গে একটা কথাও হয় নাই। আজ ভাল করিয়া আলাপ করা যাইবে। লোকটার অদ্যাকার কার্যে তাহার সম্বন্ধে মাস্টারদের কৌতূহলের অন্ত নাই। আলমকে যে অপমান করিয়া ছাড়িয়াছে, সে সকলের বন্ধু।

চায়ের দোকানে গিয়া প্রতিদিনের মত মজলিস জমিল। স্কুল-মাস্টারদের অবশ্য যতটা হওয়া সম্ভব, তাহার বেশী ইঁহাদের ক্ষমতা নাই। নতুন টীচারকে খাতির করিয়া দুইখানা টোস্ট দেওয়া হইল, বাকী সবাই একখানা করিয়া টোস্ট লইলেন। পরস্পর একটা মানসিক বোঝাপড়া হইল যে, নতুন টীচারের খাবারের বিলটা সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া দিবেন।

নারাণবাবু আলাপের ভূমিকাস্বরূপ প্রথমে জিজ্ঞাসা করিলেন, মশায়ের বাড়ি কোথায়?

—আমার বাড়ি ছিল গিয়ে নদে জেলায় সুবর্ণপুর। এখন কলকাতায় আছি অনেক দিন।

—কলকাতায় কোথায় থাকেন?

—মেসে।

—ও!

যদুবাবু একটু ঘনিষ্ঠতা করার জন্য বলিলেন, অনেক দিন কলকাতায় আর কী আছ, ভায়া, তোমার বয়েসটা কী আর এমন? আমাদের চেয়ে কত ছোট—

নতুন টীচার এ ঘনিষ্ঠতায় বিশেষ ধরা দিলেন না। খুব ভদ্রতার সঙ্গে বিনীতভাবে জানাইলেন, তাঁহার বয়স খুব কম নয়, প্রায় চৌত্রিশ পার হইতে চলিল। 'দাদা' কথাটার ব্যবহার একবারও করিলেন না। বেশ একটু ভদ্র ও বিনীত ব্যবধান বজায় রাখিয়া চলিলেন কথাবার্তায় ও চালচলনে।

একথা ওকথার পর যদুবাবু হঠাৎ বলিলেন, আজ আমরা খুব খুশী হয়েছি, বেশ শিক্ষা দিয়েছেন (মাখামাখি করিবার সাহস তাঁহার উবিয়া গিয়াছিল) ওই ব্যাটাকে—

নতুন টীচার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, কার কথা বলছেন?

—আরে, ওই যে ওই আলমটাকে—ও ব্যাটা হেডমাস্টারের কাছে প্রত্যেক বিষয়ে

লাগাবে। আমাদের উস্তন-কুস্তন করে মেরেচে মশাই। উঃ, ও একেবারে অন্ত্যজ—ওর যা অপমান করেচেন আজ! দেখুন তো, আপনার নামে কিনা লাগাতে—

নতুন টীচারের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি বিরস কণ্ঠে বলিলেন, ও আলোচনা নাই বা করলেন এখন। মিঃ আলমের ভুল হতে পারে। ভুল সবারই হয়। আমি তাঁর ভুল পয়েন্ট-আউট করেছি মাত্র। আদারওয়াইজ হি ইজ এ ভেরি গুড টীচার—ভেরি অনেস্ট অ্যান্ড সিন্‌সিয়ার টীচার। যাক্‌ ওসব কথা।

কঠিন ভদ্র সুরের গাম্ভীর্যে চায়ের দোকানের হাল্‌কা আবহাওয়া যেন থমথম করিয়া উঠিল।

যদুবাবু আর মাখামাখি করিবার সাহস পাইলেন না। অন্য কথা উঠিল। নতুন টীচার বিশেষ কোন কথা বলিলেন না। মজলিস জমিল না, যতটা আশা করা গিয়াছিল।

চায়ের মজলিস শেষ হইলে নতুন টীচার বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সকলের পয়সা তিনি নিজেই দিয়া গেলেন।

যদুবাবু বলিলেন, গভীর জলের মাছ, দেখলে তো?

ক্ষেত্রবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হুঁ।

—বেশ চালবাজ।

—তা একটু আছে বইকি।

নারাণবাবু বলিলেন, তোমরা কারুর ভাল দেখ না—ওই তোমাদের দোষ। এ চালবাজ, ও গভীর জলের মাছ—এই সব তোমাদের কথা।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, না না, ভদ্রলোক ভালই! আমি তো দেখচি বেশ উদার লোক।

যদুবাবু বলিলেন, ওট তো ভায়া, ওই জন্যেই তো বলচি গভীর জলের মাছ। আমাদের পয়সাটি পর্যন্ত নিজে দিয়ে গেল, যেন কত ভদ্রতা! অথচ—

নারাণবাবু বলিলেন, অথচ কী! তুমি সব জিনিসের মধ্যে একটা 'অথচ' না বের করে ছাড়বে না ভায়া!

—অথচ মনের কথাটা প্রকাশ করলে না।

—অথচ নয়, অর্থাৎ তোমার মত পেটপাতলা নয়।

—আপনি তো দাদা আমার সবই দোষ দেখেন।

—রাগ কোর না ভায়া। আমি তো ও-ছোকরার কোন দোষই দেখলাম না। বসে বসে মিঃ আলমের নামে কুৎসা গাইলেই কি ভাল লোক হত?

নারাণবাবুকে সকলেই তাঁহার বয়সের জন্য একটু সমীহ করিয়া চলে। যদুবাবু ইহা লইয়া নারাণবাবুর সঙ্গে আর তর্ক করিলেন না।

মোটের উপর সে দিন চায়ের মজলিস হইতে বাহির হইয়া সকলেই অসন্তোষ লইয়া বাড়ি ফিরিলেন।

মাসের শেষে ছেলেদের প্রোগ্রেস-রিপোর্ট ইত্যাদি লেখার ভিড় পড়িয়া গেল। হেড-মাস্টারের কড়া হুকুম আছে, মাসের শেষ দিন কোন টীচার ছুটির পর বাড়ি যাইতে পারিবে না—বসিয়া বসিয়া সব প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লিখিয়া হেডমাস্টারের সই করাইয়া বিভিন্ন ক্লাসের মার্কের খাতায় ছেলেদের মার্ক জমা করিয়া, ক্লাসের হাজিরা-বহিতে ছেলে-দের গর-হাজিরা বাহির করিয়া তবে যাইতে পাইবে।

এই সব কেরানীর কাজ সাঙ্গ করিয়া বাড়ি ফিরিতে রাত সাড়ে সাতটা বাজিয়া যায়।

স্কুলের প্রথানুযায়ী মাস্টারদের এদিন জলখাবার দেওয়া হয় স্কুলের খরচে। যদুবাবু ছুটির পর সাহেবের কাছে জলখাবারের টাকা আনিতে গেলেন—বরাবর তিনিই যান ও কোন দোকান হইতে খাবার কিনিয়া আনেন।

বরাদ্দ আছে সাড়ে পাঁচ টাকা। সাহেব যদুবাবুর হাতে সাতটি টাকা দিয়া বলিলেন, আজ ভাল করে খাও সকলে—লাড্ডু রসগোল্লা বেশী করে নিয়ে এস।

যদুবাবু প্রথমে একটি রেস্টুরেণ্টে গিয়া দুই পেয়ালা চা খাইলেন, তারপর ছয় টাকার খাবার কিনিলেন এক দোকান হইতে। বাকী একটি টাকা তাঁহার উপরি-পাওনা। অন্য অন্য বার আট আনা পয়সা উপরি-পাওনা হয় অর্থাৎ পাঁচ টাকার খাবার কিনিয়া আট

আনা পকেটস্থ করেন।

স্কুলে আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

মাস্টারেরা অধীর আগ্রহে জলখাবারের প্রত্যাশায় বসিয়া আছেন। একজন বলিলেন, এত দেরি কেন যদুবাবু?

—আরে, গরম গরম ভাজিয়ে আনচি। আমার কাছে বাবা ফাঁকি দিতে পারবে না কোন দোকানদার। বসে থেকে তৈরী করিয়ে ষোল আনা দাঁড়ি ধরে ওজন করিয়ে তবে—

অন্যান্য মাস্টারদের অগাধ বিশ্বাস যদুবাবুর উপরে। সকলেই বলেন, যদুবাবুর মত কিনতে-কাটতে কেউ পারে না—পাকা লোক একেবারে যাকে বলে।

টীচারদের ঘরে বেঞ্চির উপর ছোট ছোট পাতা পাতিয়া খাবার পরিবেশন করা হইল। যদুবাবু এখানে খাইবেন না, তিনি বাড়ি লইয়া যাইবেন। জ্যোতির্বিনোদ মশায় ঘিয়ে-ভাজা জিনিস খাইবেন না, তিনি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাঁহার জন্য শুধু সন্দেশ-রসগোল্লা আনা হইয়াছে। নতুন টীচার বেঞ্চির এক পাশে খাইতে বসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বুড় সাধারণত কাহারও মেশামেশি নাই। তিনি নিঃশব্দে ঘাড় গুঁজিয়া খাইতেছিলেন। যদুবাবু সামনে গিয়া বলিলেন, আর দু-একখানা লুচি দেব?

—না না, আর দেবেন না।

—একটা রসগোল্লা?

অন্যান্য টীচার সকলেই বিভিন্ন বেঞ্চি হইতে নতুন টীচারকে খাওয়ার জন্য, দুই একটা অতিরিক্ত মিষ্টি লওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

মিঃ আলম ভোজসভায় প্রতিবার উপস্থিত থাকেন; কিন্তু স্বীয় পদের আভিজাত্য বজায় রাখিবার জন্য সাধারণ মাস্টারদের সঙ্গে খাইতে বসেন না। মাস্টারেরা বরং খোশামোদ করিয়া প্রতিবার ভোজসভাতেই তাঁহাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিত। মিঃ আলম হাসিমুখে প্রত্যাখ্যান করিতেন।

আজ তাঁহার প্রাপ্য সেই আপ্যায়ন নতুন টীচারের উপর গিয়া পড়িতে দেখিয়া মিঃ আলম মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন, বিস্মিত হইলেন, নতুন টীচারের উপর হিংসায় মন পরিপূর্ণ হইল।

নতুন টীচার বলিলেন, মিঃ আলম, আপনি খেলেন না? আসুন।

মিঃ আলম গম্ভীর মুখে উত্তর দিলেন, না, আপনারা খান। আমি এখন খাই নে।

নতুন টীচার আর কোন কথা বলিলেন না।

মাসে এই একদিন করিয়া স্কুলের খরচে খাওয়া—এমন বেশী কিছু খাওয়া নয়, হয়তো খান পাঁচ-ছয় লুচি, দুইটি রসগোল্লা, একটু তরকারি, এক মুঠো বোঁদে। এই খাওয়া-টুকুর জন্য মাস্টারেরা মাসের শেষ দিনটির প্রতীক্ষায় থাকেন, সে দিন সারা দিনটা খাটিবার পর সন্ধ্যায় সকলে বসিয়া একটু খাওয়াদাওয়া—

পরদিন মিঃ আলম হেডমাস্টারকে গিয়া বলিলেন, স্যার, একটা কথা—মাসের শেষে মাস্টারদের পিছনে পাঁচ টাকা ছ টাকা মিথ্যে খরচ, ও বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। ধরুন, কমিটী থেকে আপত্তি তুলতে পারে। মাস্টারদের ডিউটি তারা করবে, তার জন্যে খাওয়ানো কেন স্কুলের খরচে? আমি তো ভাল বুঝছি নে স্যার।

কমিটীর নামে হেডমাস্টার একটু ভয় পাইয়া গেলেন। তবুও বলিলেন, তা খায় খাকগে। খাটতেও হয় তো।

মিঃ আলম জানিত, কমিটীর নামে সাহেব একটু ভয় পায়। সে গিয়া কমিটীর একজন মেম্বারকে কথাটা লাগাইল। কমিটীর মীটিংয়ে অমূল্যবাবু সাহেবকে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, শুনলাম আপনি টীচারদের জলখাবার খেতে দেন মাসের শেষে, সে কার পয়সায়?

—স্কুলের খরচে।

—কেন?

—মাস্টারদের খাটুনি বেশী হয়—প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লেখা, রেজিস্টার ঠিক করা—

—এ তো তাঁদের ডিউটি। এর জন্যে জলখাবার দেওয়া কেন?

ক্লার্কওয়েল তর্ক করিয়া তখনকার মতো নিজের কাজের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে

চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু পরের মাস হইতে মাস্টারদের জলযোগ বন্ধ হইয়া গেল।

ক্ষেত্রবাবু সে দিন স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখিলেন, স্ত্রী বিছানায় শুইয়া আছে, ভয়ানক জ্বর। এঁটো বাসন রান্নাঘরের এক পাশে জড়ো হইয়া আছে—ওবেলাকার এঁটো পরিষ্কার করা হয় নাই, ছেলেমেয়েগুলো ঘরময় দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছে, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। ক্ষেত্রবাবুর মাথা ঘুরিয়া গেল। সারাদিন পরে আসিয়া এ সব কি সহ্য হয়? স্ত্রীর ব্যবস্থামত ঠিকা-ঝিকে আজ মাস-তিনেক হইল ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। স্ত্রীই বলিয়াছিল, কেন মিছিমিছি ঝির পেছনে আড়াই টাকা তিন টাকা খরচ—আজ একটু নুন দাও মা, আজ খিদে পেয়েছে জলখাবার দাও মা, আজ মাখবার একটু তেল দাও মা—এই সব ঝক্কি রোজ লেগেই আছে। দাও ছাড়িয়ে, কাজকর্ম সব করব আমি। হাসিয়া বলিয়াছিল, কিন্তু মাসে মাসে আড়াইটে করে টাকা আমায় দিয়ো গো, ফাঁকি দিয়ো না যেন।

কিন্তু শরীর খারাপ, মন খাটিতে চাহিলে কী হইবে, তিন মাসের মধ্যে এই তিনবার অসুখে পড়িল। ডাক্তার ও ওষুধ খরচে ঠিকা-ঝিয়ের ডবল খরচ হইয়া গেল।

ক্ষেত্রবাবু নিজে বড় মেয়েটির সাহায্যে রান্নাঘর পরিস্কার করিলেন। মেয়েকে বলিলেন, বাসন মাজতে পারবি হাবি?

হাবি মাত্র সাত বছরের মেয়ে। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হুঁ, খু-উ-ব।

—যা দিকি, আমি কলতলায় দিয়ে আসচি।

ঘরের ভিতর হইতে নিভাননী চিঁ-চিঁ করিয়া বলিল, ও পারবে না—একটা ঠিকে-ঝি দেখে নিয়ে এস। ওই সদ্‌গোপবাবুদের পাশের গলিতে মুংলির মা বুড়ী থাকে, খোঁজ করে দেখগে।

ক্ষেত্রবাবু ধমক দিয়া বলিলেন, তুমি চুপ করে শুয়ে থাক। আমি বুঝছি। কেন ও পারবে না? শিখতে হবে না কাজ? কানু কোথায় রে?

হাবি বলিল, না বাবা, আমি পারব। দাদা খেলা করতে গিয়েচে।

—সুজি কোথায় আছে? ঘি?

নিভাননীর ধমক খাইয়া রাগ হইয়াছিল। সে কথা বলিল না।

—আঃ, বলি—সুজিটা কোথায়? সারাদিন খেটে খিদেতে মরছি, যা হয় কিছু খাব তো?

নিভাননী পূর্ববৎ চিঁ-চিঁ করিতে করিতে বলিল, আমার কী দরকার কথায়? যা বোঝ করো তুমি।

হাবি বলিল, আমি জানি বাবা, আমি দিচ্চি।

তখন নিভাননী মেয়েকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, সুজি করিবার দরকার নাই, ও-বেলার রুটি করা আছে শিকেয় হাঁড়িতে। নিয়ে খেতে বল্। চা করে দিতে পারবি?

হাবি 'না' বলিতে জানে না। ঘাড় লম্বা করিয়া বলিল, হুঁ—উ—উ—

সে চায়ের কাপ ইত্যাদি লইয়া রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিল, মা, উনুনে আঁচ দিয়ে দেবে কে?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তোমাকে ওসব করতে হবে না। হয়েছে, থাক্, আর আমার চায়ে দরকার নেই। তারপর চা করতে গিয়ে জামায় আগুন লেগে মরুক—

নিভাননী বলিল, আহা, মুখের কী মিষ্টি বাক্যি!

ক্ষেত্রবাবু এক গ্লাস জল ঢক ঢক করিয়া খাইয়া ফেলিলেন। তারপর হাবির সাহায্যে রুটি বাহির করিয়া গুড় দিয়া এক-আধখানা নিজে খাইলেন, বাকি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়া টুইশানিতে বাহির হইলেন।

হাবি বলিল, বাবা, মা বলছে, রাত্রে কী খাবে? একখানা পাঁউরুটি কিনে এনো—

ক্ষেত্রবাবু কথা কানে তুলিলেন না। ছাত্রের বাড়ি গিয়া মনে পড়িল, স্ত্রীর অসুখের জন্য একবার বেলেঘাটায় রামসদয় ডাক্তারের ওখানে যাইতে হইবে। খানিকটা আলাপ-পরিচয় আছে; স্কুল মাস্টার বলিয়া ভিজিটটা কম লইয়া থাকে তাঁহার কাছে।

ছেলের বাপ আসিয়া কাছে বসিয়া ছেলের পড়ার তদারক করিতে লাগিল। ফলে

ক্ষেত্রবাবু যে একটু সকাল সকাল বিদায় লইবেন, তাহার উপায় রহিল না। অভিভাবকের মনস্তুষ্টির দরুন বরং একটু বেশী সময় বসিয়া থাকিতে হইল। রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় ছাত্রের বাড়ি হইতে পদব্রজে বেলেঘাটা চলিলেন। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া কাজ শেষ করিতে সাড়ে দশটা বাজিয়া গেল, কাজেই আসিবার পথে ছয়টি পয়সা বাসভাড়া দিয়া ফিরিতে হইল।

বাসায় ফিরিয়া দেখেন, ছেলেমেয়েরা অঘোরে ঘুমাইতেছে। স্ত্রীর আবার জ্বর আসিয়াছিল সন্ধ্যার পরেই, সে বিছানায় পড়িয়া এপাশ ওপাশ করিতেছে।

ভীষণ ক্ষুধা পাইয়াছে। কিন্তু এত রাত্রে কী খাইবেন? ভাত চড়াইবার ধৈর্য থাকে না আর এখন।

নিভাননী জ্বরে বেহুঁশ, তবুও সে জিজ্ঞাসা করিল, পাঁউরুটি এনেচ?

ঐ যাঃ, পাঁউরুটি কিনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন, অত কি ছাই মনে থাকে? বলিলেন, না, আনতে মনে নেই।

নিভাননী উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল, তবে কী খাবে এখন? দুটো চিঁড়ে কিনে আন না হয়—

ক্ষেত্রবাবু বিরক্তির সহিত বলিলেন, হ্যাঁঃ, এখন এগারোটা বাজে, আমার জন্যে চিঁড়ের দোকান খুলে রেখেছে তারা!

—দেখই না গো, মোড়ের দোকানটা অনেক রাত পর্যন্ত খোলা থাকে।

ক্ষেত্রবাবু সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া কলসী হইতে এক গ্লাস জল গড়াইয়া ঢকঢক করিয়া খাইয়া আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িলেন, অর্থাৎ সমস্ত অসুবিধা ও অনাহারের দায়িত্বটা রুগ্ন স্ত্রীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন বিনা বাক্যব্যয়ে।

নিভাননী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

পরদিন সকালে ডাক্তার আসিয়া বলিল, রোগ বাঁকা পথ ধরিয়াছে। বাড়িতে ভাল চিকিৎসা হইবে না, হাসপাতালে পাঠাইতে পারিলে ভাল হয়। ক্ষেত্রবাবুর প্রাণ উড়িয়া গেল। হাসপাতালে স্ত্রীকে পাঠাইলে ছেলেমেয়েদের বাড়িতে দেখাশোনা করে কে? হাসপাতালে যাওয়ার ব্যবস্থাই বা তিনি কখন করেন?

ডাক্তারের হাতে-পায়ে ধরিয়া একটা চিঠি লিখাইয়া লইলেন ক্যাম্বেল হাসপাতালের এক ডাক্তারের নামে। যাইতে গেলে ক্যাম্বেল হাসপাতালে গিয়া কাজ মিটাইয়া আবার ঠিক সময়ে স্কুলে যাইতে পারেন না। সুতরাং হাবিকে তাহার ভাইবোনের জন্য রান্না করিতে বলিয়া, না খাইয়াই বাহির হইলেন। ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে পাঁচ মিনিট লেট হইবার জো নাই।

হাসপাতালে গিয়া শুনিলেন, ডাক্তারবাবু দশটার আগে আসেন না। বসিয়া বসিয়া সাড়ে দশটার সময় ডাক্তারের মোটর আসিয়া গেটে ঢুকিল। ক্ষেত্রবাবুর হাত হইতে চিঠি পড়িয়া বলিলেন, আচ্ছা, আপনি ও-বেলা আমার সঙ্গে একবার দেখা করবেন, এই—ছ'টার সময়। এ-বেলা বলতে পারচি নে।

ক্ষেত্রবাবু প্রমাদ গনিলেন। ছয়টা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করিবেন তো বাসায় যাইবেন কখন, ছেলে পড়াইতেই বা যাইবেন কখন?

স্কুলের কাজ শেষ হইয়া আসিয়াছে, বেলা চারিটা বাজে, এমন সময় সাহেবের ঘরে ডাক পড়িল।

ক্ষেত্রবাবু সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইতেই সাহেব বলিলেন, ক্ষেত্রবাবু, দুটো ক্লাসের প্রশ্নপত্র লিথো করতে হবে—আপনি ছুটি হলে কাজটা করে বাড়ি যাবেন।

হেডমাস্টারের কথার উপর কথা চলে না, অগত্যা তাহাই করিতে হইল। ছুটির পর মাস্টারদের মধ্যে দুই-একজন বলিলেন, চলুন ক্ষেত্রবাবু, চা খেয়ে আসি।

—মনে সুখ নেই, চা খাব কী, চলুন—

সেখানে গিয়া মাস্টারদের দল প্রস্তাব করিলেন, স্কুলে একদিন ফিস্ট্ করা হোক। হেডপণ্ডিত চা না খাইলেও এখানে উপস্থিত থাকেন রোজ। তিনি ফর্দ করিলেন, প্রত্যেক মাস্টারকে এক টাকা চাঁদা দিতে হইবে। তাহা হইলে একদিন পোলাও রাঁধিয়া সবাই

আমোদ করিয়া খাওয়া যায়। যদুবাবু বলিলেন, এক টাকা বড় বেশী হইয়া পড়ে—বারো আনার মধ্যে যাহা হয় হউক।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, মনে সুখ নেই দাদা, এখন ওসব থাক্।

যদুবাবু বলিলেন, কেন, কী হয়েছে?

—বাড়িতে বড় অসুখ। হাসপাতালে পাঠাতে হচ্চে কাল।

সকলেই নানারূপ ব্যগ্র প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। দুই-একজন ক্ষেত্রবাবুর বাড়ি পর্যন্ত গিয়া দেখিতে চাহিলেন। ফিস্ট্ খাইবার প্রস্তাব আপাতত মুলতুবি রহিল। সকলেই কম মাহিনায় সংসার চালান, এক পরিবারের মত মনে করেন পরস্পরকে, একজনের দুঃখ সবাই বোঝেন বলিয়াই চায়ের এ মজলিসের বন্ধুদের মধ্যে প্রীতির বন্ধন ঘনিষ্ঠ ও নির্ভেজাল।

ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে নারাণবাবু হাসপাতাল পর্যন্ত গেলেন। ক্ষেত্রবাবু বলিয়াছিলেন, আপনি বুড়োমানুষ, এতটা আর যাবেন না হেঁটে।

—বুড়োমানুষ বলে কি মানুষ নই? ও কী ভায়া, চল, গিয়ে দেখে আসি।

দুজনে গিয়া ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিয়া হাসপাতালের সব ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন এবং পরদিনই নিভাননীকে হাসপাতালে আনা হইল।

নারাণবাবু রোজ বিকালে টুইশানিতে যাইবার আগে দুইটি কমলালেবু, কোনদিন বা এক গুচ্ছ আঙুর লইয়া নিভাননীকে দেখিয়া যান। স্কুলে পরদিন বলেন, ও ক্ষেত্র-ভায়া, বউমা কাল বলছিলেন, তুমি হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাচ্ছ, তোমার কে এক শালী আছেন, তাঁকে এনে দুদিন রাখ না—

—আপনাকে বললে বুঝি?

—হ্যাঁ, কাল উনি বলছিলেন। তোমার কষ্ট হচ্ছে। কবে যে সেরে উঠব, কবে যে বাড়ি যাব—বলছিলেন বউমা।

—ওই রকম বলে। শালীকে আনা কি সহজ দাদা? নিয়ে এস খরচ করে, দিয়ে এস খরচ করে—খাওয়াও লুচি-পরোটা। সে কি আমাদের সাধ্যি?

নারাণবাবুকে নিভাননী 'দাদা' বলিয়া ডাকে। অ‍ড়ালে 'বট্‌ঠাকুর' বলিয়া ডাকে স্বামীর কাছে। নারাণবাবু কত রকম মজার গল্প করেন তাহার কাছে, রোগীর মনে আনন্দ দিতে চান। একদিন নিভাননী বলিল, দাদা, আমি ভাল হলে আপনাকে ছোট বোনের বাড়ি একদিন খেতে হবে।

নারাণবাবু শশব্যস্ত হইয়া বলেন, নিশ্চয় বউমা, নিশ্চয়, এর আর কথা কী?

—আপনি কী খেতে ভালবাসেন দাদা?

—আমি? আমার—বউমা—বুড়ো হয়েছি—যা হয় সব ভাল লাগে। একলা থাকি, রেঁধে খাই—

—কতদিন আছেন একা?

—তা আজ সাতাশ বছর বউমা।

—একা আছেন?

—তা থাকতে হয় বইকি বউমা। নিজেই রাঁধি—এই বয়সে কি রান্না করতে ইচ্ছে করে? বেশী কিছু রাঁধি না, যা হয় একটা তরকারি করি।

—আপনি মাছ খান?

—তা খাই বউমা। ও বোষ্টমদের ঢঙ নেই আমার। পুরুষ মানুষ, মাছ-মাংস কেন খাব না? ও বোষ্টমদের মেয়েলিপনার ঢঙ দেখলে আমি হাড়ে চটি।

—আমি আপনাকে ইলিশমাছের দই-মাছ রেঁধে খাওয়াব। আমি দিদিমার কাছে রাঁধতে শিখেছি, জানেন?

পিতৃসম স্নেহময় বৃদ্ধের সঙ্গে কথা বলিবার সময় নিভাননীর কণ্ঠে আপনিই যেন আবদারের সুর আসিয়া পড়ে। তাহার বালিকা-বয়সে যে বাবা স্বর্গে গিয়াছেন, যাঁহার কথা ভাল মনে পড়ে না—এই প্রাণখোলা সরল বৃদ্ধের মধ্যে নিভাননী তাঁহাকেই যেন আবার দেখিতে পায়, নিজের কণ্ঠে কখন যে কন্যার মত আবদার-অভিমানের সুর আসিয়া

পড়ে সে বুঝিতেও পারে না।

নারাণবাবু বসিয়া সুখ-দুঃখের কথা বলেন। নারীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আজ ত্রিশ বছর আসেন নাই—স্নেহ-ভালবাসার পাট উঠিয়া গিয়াছে জীবনে। এমন দরদী শ্রোতা পাইয়া তাঁহারও মনের উৎস-মুখ খুলিয়া যায়। প্রথম জীবনের চাকুরির কথা বলেন। বহুকাল-পরলোকগতা পত্নীর সম্বন্ধে বলেন, অনুকূলবাবুর কথাও পাড়েন। নিভাননী সহানুভূতি জানায়, একমনে শুনিতে শুনিতে কখন তাহার চোখ ছলছল করিয়া উঠে।

ক্ষেত্রবাবু সারাদিন আসিতে পারেন না। টুইশানি, বাড়িতে ছেলে-মেয়েদের দেখা-শোনা—এসব সারিয়া রোজ হাসপাতালে আসা চলে না। নারাণবাবু আসেন বলিয়া হয়তো তেমন দরকারও হয় না।

সে দিন নারাণবাবু টুইশানি সারিয়া বউবাজারের মোড় হইতে একটা বেদানা ও দুইটি কমলালেবু কিনিলেন। অনেকদিন কিছু হাতে করিয়া যাইতে পারেন নাই, আজ টুইশানির মাহিনা পাইয়াছেন। হাসপাতালের হলে দেখিলেন, হলের কোণে নিভাননীর সে বিছানাটা খালি, লোহার খাটটা হাড়-পাঁজরা বাহির করা পড়িয়া আছে।

নারাণবাবু ভাবিলেন, তাঁহার ভুল হইয়াছে। কোন্ ঘরে আসিতে কোন্ ঘরে আসিয়াছেন, বৃদ্ধবয়সে মনে থাকে না। বাহির হইতে গিয়া বারান্দায় জলের না কিসের ড্রামটি চোখে পড়িল। না, এই ড্রাম রহিয়াছে—এই তো ঘর। আবার তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

পাশের বিছানার এক রোগী বলিল, আপনি কাকে খুঁজছেন বলুন তো? ও, সেই বউটির আপনি কেউ—আহা, আপনি জানেন না! ও তো আজ দুপুরে হয়ে গিয়েছে। বউটির স্বামী এল, আরও কে কে এল—নিয়ে গেল, প্রায় তখন তিনটে। আহা, আমরা সবাই—কথা কইতে কইতে পাশ ফিরল আর অমনি হয়ে গেল। হার্টে কিছু ছিল না। আহা, আপনি কে হতেন ওঁর—ইত্যাদি।

নারাণবাবু কিছু না বলিয়া ফলগুলি হাতে করিয়া বাহিরে আসিলেন।

আজ ক্ষেত্রবাবুকে কি স্কুলে দেখেন নাই? না বোধ হয়। এখন মনে পড়িল, সারাদিন স্কুলে ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নাই বটে। আজ হাসপাতালে আসিবেন বলিয়া টুইশানিতে গিয়াছিলেন ছুটির পরেই, সুতরাং চায়ের দোকানেও যান নাই। নতুবা ক্ষেত্রবাবুর অনুপস্থিতি চোখে পড়িত।

নিজের ছোট ঘরের নিঃসঙ্গ শয্যায় শুইয়া বৃদ্ধ কত রাত পর্যন্ত ঘুমাইতে পারিলেন না।

স্কুলের দুর্দশা উপস্থিত হইল এপ্রিল মাস হইতে। এপ্রিল মাসে মাস্টারদের বেতন ঠিক সময় দেওয়ার উপায় রহিল না; কারণ, এবার জানুয়ারি মাসে আশানুরূপ ছেলে ভর্তি হয় নাই, বরং অনেক ছেলে ট্রান্সফার লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এ স্কুলে ছেলেদের মাহিনা অন্য স্কুল হইতে বেশী, এই সব দুঃসময়ে লোক বেশী মাহিনা দিতে চায় না। পূর্বে ভাবা গিয়াছিল, সাহেব-মেম স্কুলে পড়াইবে বলিয়া পাড়ার বড়লোকেরা ছেলে এখানেই ভর্তি করিবে; কিন্তু গত ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল তেমন ভাল না হওয়ায় এ স্কুলে পড়াইতে অনেকেই দ্বিধা বোধ করিল। ফলে ছেলে অনেক কমিয়া গিয়াছে এবার।

মাস্টাররা সাতাশে এপ্রিল মার্চ মাসের মাহিনার কিছু অংশ মাত্র পাইল। গরমের ছুটির পূর্বে মে মাসে মার্চ মাসের প্রাপ্ত বেতনের বাকী অংশ শোধ করিয়া দেওয়া হইল। দেড় মাস গরমের ছুটি, গরিব শিক্ষকেরা বাড়ি গিয়া খায় কী? হেডমাস্টারের কাছে দরবার করিয়া ফল হইল না। সকলে বলিল, সাহেব মেম ঠিক ওদের পুরো ছুটির মাইনে নিয়ে যাচ্ছে। আমাদেরই বিপদ।

শোনা গেল, সাহেব দিল্লী না কোথায় যেন বেড়াইতে যাইতেছে।

স্কুলের কেরানী হরিচরণ নাগ কিন্তু বলিল, কথা ঠিক নয়—সাহেব এখনও মার্চ মাসের মাহিনা শোধ করিয়া লয় নাই। মেম এপ্রিল মাস পর্যন্ত মাহিনা লইয়াছে বটে।

সাহেবের নিকট যাইয়া মাহিনা পাইবার জন্য বেশী পীড়াপীড়ি করিলে সাহেব বলিলেন, মাই ডোর ইজ ওপ্‌ন্‌—যাঁদের না পোষায় চলে যেতে পারেন। আমার স্কুলে কষ্ট করে যারা থাকতে না পারবে, তাদের দিয়ে এখানে কাজ হবে না। আমাদের অনেক কষ্টের মধ্যে দিয়ে এখনও যেতে হবে—স্বার্থত্যাগ চাই তার জন্যে। সামনের বছর থেকে স্কুল ভাল হয়ে যাবে। এই বছরটা তোমরা আমার সঙ্গে সহযোগিতা করো।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের ব্যক্তিত্ব বলিয়া জিনিস ছিল, অন্তত গরিব টীচারদের কাছে। কারণ, ব্যক্তিত্ব জিনিসটা ভীষণ রিলেটিভ, আমার গুরুদেবের ব্যক্তিত্ব তোমার কাছে হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু আমার কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ ; তোমার জমিদার-মনিবের ব্যক্তিত্ব যতই গুরু হউক, আমার নিকটে তাহা নিতান্তই লঘু। সুতরাং মাস্টারের দল শুধুহাতে গরমের ছুটিতে দেশে চলিয়া গেল।

যদুবাবু পড়িয়া গেলেন মুশকিলে। কলিকাতা ছাড়িয়া কোথাও একটা যাইবার স্থান নাই, অথচ ইচ্ছা করে কোথাও যাইতে। কতদিন কলিকাতার বাহিরে যাওয়া ঘটে নাই, হাতও এদিকে খালি। তাঁহার ছাত্রেরা দেশে যাইতেছে, নবদ্বীপের কাছে পূর্বস্থলি নামে গ্রাম, বেশ নাকি ভাল জায়গা। কিন্তু যদুবাবু তো একা নহেন, স্ত্রীকে বাসায় রাখিয়া যাওয়া সম্ভব নয়।

পৈতৃক গ্রামে যাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু সেখানে ঘরবাড়ি নাই। জমিজমা শরিক কিনিয়া লইয়াছে আজ বহুদিন। তবুও যদুবাবু বলিলেন, বেড়াবাড়ি যাবে?

যদুবাবুর স্ত্রী বিবাহ হইয়া কিছুদিন যশোর জেলার এই ক্ষুদ্র গ্রামে শ্বশুরঘর করিয়াছিল, ম্যালেরিয়া ধরিয়া মাস দুই ভোগে। তাহার পর হইতেই স্বামীর সঙ্গে বর্ধমান ও পরে কলিকাতায়। সে বেড়াবাড়ি যাইবার প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া কহিল, বেড়াবাড়ি! সেখানে কেমন করে যাবে গো? বাড়িঘর কোথায় সেখানে?

—চলো না, অবনীদের বাড়িতে গিয়ে উঠি। সেও তো কলকাতায় এসে আমার বাসাতে থেকে গিয়েছে দু-একবার।

—না বাপু, পরের ঘরকন্নার মধ্যে যাওয়া, সে বড় ঝঞ্ঝাট। হাতে তোমার টাকাই বা কই?

যদুবাবুর মতলব একটু অন্য রকম। হাতে প্রায় কিছুই নাই, স্ত্রীকে পাড়াগাঁয়ে জ্ঞাতিদের বাড়ি গছাইয়া রাখিয়া আসিয়া দিনকতক তিনি একটু হাল্‌কা হইবেন! এগারো টাকা করিয়া বাসাভাড়া আর টানিতে পারেন না। ওই থার্ড মাস্টার শ্রীশ রায় মেসে থাকে, আড়াই টাকা সীট্ রেণ্ট্, খোরাকী খরচ দশ টাকা, সাড়ে বারো টাকার মধ্যে সব শেষ।

যদুবাবু স্ত্রীকে বলিয়া-কহিয়া রাজী করাইলেন। কিন্তু যাইবার দিন বাড়িওয়ালা গোলমাল বাধাইল।

—আজ পাঁচ মাসের বাড়িভাড়া পাওনা মশাই, পাঁচ এগারোং পঞ্চান্ন টাকা—দশ টাকা মাত্র ঠেকিয়েছেন এ মাসে আর মাত্র পাঁচ টাকা ঠেকিয়ে চলে যাচ্ছেন? বাক্স পেঁটরা-বিছানা সবই নিয়ে চললেন, রইল এখানে কী তবে? ওই একটা জারুল কাঠের সিন্দুক আর একখানা ভাঙা তক্তপোশ, আর তো দেখছি কয়লাভাঙা হাতুড়িটা আর মরচে-ধরা গোটা দুই কাচ-ভাঙা হ্যারিকেন। আপনি যদি আর না আসেন মশাই তো এতে আমার চল্লিশ টাকা আদায় হবে কিসে বুঝিয়ে দিয়ে তবে যান। আমি পাড়ার লোক ডাকি, তারা বলুক, আমার যদি অন্যায় হয়ে থাকে মশাই, আমায় দশ ঘা জুতো মারুক। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে, বাড়িতে জায়গা দিয়েছিলাম, ইস্কুলে মাস্টারি করেন, ছেলেদের লেখাপড়া শেখান, তা এই যদি আপনার ধরন হয়—না মশাই, আমি তা পারব না। মাপ করবেন। আপনি যেতে হয়, জিনিসপত্র রেখে যান, নইলে আমার ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে যান।

—কী হয়েছে, কী হয়েছে?—বলিয়া কলিকাতার হুজুগপ্রিয় কৌতূহলী লোক ভিড় পাকাইয়া তুলিল। কেহ হইল বাড়িওয়ালার দিকে, কেহ হইল যদুবাবুর দিকে—উভয় দলে মারামারি হইবার উপক্রম হইল। যদুবাবুর স্ত্রী চট্ করিয়া উপরে গিয়া বাড়িওয়ালার মায়ের কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন—মা, আপনি বলে দিন। টাকা আমরা ফেলে রাখব না—

পালাবও না। স্কুল খুললেই টাকা শোধ দেব।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া বাড়িওয়ালার মা ডাকিল, ও বদে, বলি শোন্, ওপরে আয়।

ব্যাপারটা মিটিল। স্ত্রী ও বাক্স বিছানা সমেত যদুবাবু মুক্তি পাইলেন; কিন্তু আর তিনি কোনদিন এ বাসা তো দূরের কথা, এ পাড়ার ত্রিসীমানাও মাড়ান নাই।

বেড়াবাড়ি বগুলো স্টেশনে নামিয়া সাত ক্রোশ গরুর গাড়িতে যাইতে হয়। দুপুর ঘুরিয়া গেল সেখানে পৌঁছিতে। শরিক অবনী মুখুজ্জে আহারাদি সারিয়া দিবানিদ্রা দিতেছিলেন, বাহিরে শোরগোল শুনিয়া আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি খুব সন্তুষ্ট হইলেন না। মুখে বলিলেন, কে, যদুদা? সংগে কে? বউদি? বেশ, বেশ—তা এত কাল পরে মনে পড়েছে যে? না, ভাল না, বাড়ির সব অসুখ ব্যায়রাম। আপনার বউমা তো কাল জ্বর থেকে উঠেছে—ছেলে দুটোর এমন পাঁচড়া যে, পঙ্গু হয়ে বসে থাকে—ও পুঁটি—ওগো—এই বউদিদি এসেছেন, নামিয়ে নাও—

রাত্রে যদুবাবু দেখিলেন, থাকিবার ভীষণ কষ্ট। ইহাদের দুইটি মাত্র ঘর আর এক ভাঙা পুজার দালান, তার একখানায় কাঠকুঠা রহিয়াছে। একটি ঘরে ভদ্রতা করিয়া আজিকার জন্য থাকিবার জায়গা দিয়াছে বটে, কিন্তু বেশীদিনের জন্য এ ব্যবস্থা সম্ভব নয়, কারণ অবনীর তিনটি বড় মেয়ে, দুইটি ছেলে, স্ত্রী ও এক বিধবা দিদিকে লইয়া পাশের ওই একখানি মাত্র ঘরে কতদিন থাকিতে পারিবে?

দুই দিন গেল, এক সপ্তাহ গেল। গরমে বড় কষ্ট হয়—সেকেলে কোঠার ছোট ছোট জানালা, হাওয়া চলে না।

অবনীদের সংসারে প্রথম দুই দিন এক হাঁড়িতেই খাওয়া চলিয়াছিল, তারপর যদুবাবুর আলাদা রান্না হয়। জিনিসপত্র সস্তা, এক সের করিয়া দুধ যোগান করা হইয়াছে—বেশ খাঁটি দুধ। যদুবাবুর স্ত্রী বলে, এমন দুধ, যাই বল, শহরে বেশী পয়সা দিলেও মিলবে না।

কিন্তু দিন-পনেরো পরে থাকিবার বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। অবনী একদিন ঘুরাইয়া কথাটা বলিয়াই ফেলিল। অর্থাৎ দেশ তো দেখা হইয়াছে, এইবার যাইবার কী ব্যবস্থা? ভাবখানা এই রকম।

রাত্রে যদুবাবু স্ত্রীকে নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, অবনী তো বলছিল, আর কদিন আছেন দাদা? তা কী করি বল তো? এই গরমে কলকাতায়—

স্ত্রী বলিল, চল এখান থেকে বাপু। নানান অসুবিধে। মন টেকে না। বাবাঃ, যে জঙ্গল! ঘরদোরগুলো ভাল না, ছাদ যেমন—একটা বিষ্টি হলেই জল পড়বে। আর ওরাও আর তেমন ভাল ব্যবহার করছে না। আজ ঘাটে বড়দিদি কাকে বলছিল—আমাদের বাড়ি তো আর শরিকের ভাগ নেই, যে যেখানে আছে হুট্ করে এলেই তো হল না! এই রকম কী কথা! আমাদের যাওয়াই ভাল। যে মশা, রাত্তিরে ঘুম হয় না মশার ডাকে।

যদুবাবুর তাহা ইচ্ছা নয়। স্ত্রীকে এবার শরিকের ঘাড়ে কিছুদিন চাপাইয়া যাইবেন, এই মতলব লইয়াই এখানে আসিয়াছেন। তিনি কিছু বলিলেন না।

আর দুই-তিন দিন পরে যদুবাবু ফিরিবেন মনস্থ করিলেন।

অবনীকে বলিলেন, তোমার বউদিদি রইল এ মাসটা, দিদির সংগে শোবে। আমার কলকাতায় না গেলে নয়, আমি পরশু নাগাদ যাই।

গ্রামের কাপালীপাড়া হইতে সিধু কাপালী আসিয়া বলিল, দাদাঠাকুর, এ গাঁয়ে একটা পাঠশালা খুলে বসুন। পঁচিশ-ত্রিশটা ছেলে দেব—চার আনা আট আনা করে রেট। আপনার বাড়ি বসে যা হয়! কলকাতা ছেড়ে দিয়ে এখানেই থেকে যান না কেন?

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, কলকাতার স্কুলে পঁচাত্তর টাকা মাইনে পাই—সত্তর ছিল, ছেড়ে দেব বলে ভয় দেখিয়েছিলাম, অমনি সেক্রেটারি পাঁচ টাকা বাড়িয়ে বললে—যদুবাবু, আপনার মত টীচার আর কোথায় পাব, আপনি থাকুন। প্রাইভেট টুইশানিতে তাও ধরো পাই—পনেরো আর পঁচিশ সকালে—বিকেলে পনেরো আর কুড়ি। এই ছেড়ে আসব পাঠশালা খুলে চার আনা আট আনা নিয়ে ছেলে পড়াতে? তুমি হাসালে সিদ্ধেশ্বর।

অবনী সেখানে উপস্থিত ছিল। যদুদাদা যে স্কুলে এত মাহিনা পান, এই সে প্রথম শুনিল। কিন্তু কই, তেমন তো আসবাব বাসনপত্র কিছুই নাই! বউদিদি মোটে চারখানা শাড়ি আনিয়াছেন। দাদার দুইটি মলিন পিরান, গায়ে ভাল গেঞ্জি একটাও দেখা যায় না। বিছানা তো যা আনিয়াছেন, তাহা দেখিয়া একদিন অবনীর স্ত্রী বলিয়াছিল—বট্ঠাকুরের যা বিছানাপত্র, ওই বিছানায় কী করে ওরা শোয় কলকাতা শহরে, তা ভেবে পাই নে। আমরা যে অজ পাড়াগেঁয়ে—আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ও-বিছানায় শোবে না।

গ্রামের সকলে ধরিয়াছিল, এতকাল পরে দেশে এসেছে, গাঁয়ের ব্রাহ্মণ কটিকে ভাল করে একদিন মা-বাপের তিথিতে খাইয়ে দাও। কিছুই তো করলে না গাঁয়ে—

যদুবাবু তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই।

অথচ তিনি এত রোজগার করেন নিজের মুখেই তো বলিলেন। কী জানি কী ব্যাপার শহরের লোকের! বেশ মোটা পয়সা হাতে নিয়ে এসেছে দাদা, অথচ খরচপত্র বিষয়ে কঞ্জুস—

কথাটা অবনী স্ত্রীকে বলিল।

স্ত্রী বলিল, কী জানি বাপু, দিদির গায়ে তো একরত্তি সোনা নেই—শাঁখা আর কাঁচের চুড়ি এই তো দেখছি, তা কেমন করে বলব বল? হতে পারে।

—তুমি জান না, ওসব কলকাতার লোক, পাড়াগাঁয়ে আসবার সময়ে সব খুলে রেখে এসেছে। চুরি যাবার ভয় বড্ড ওদের।

ভাবিয়া চিন্তিয়া পরদিন অবনী যদুবাবুর কাছে দুপুরের পর কথাটা পাড়িল: দাদা, একটা কথা ছিল—

—কী হে?

—নানা রকমে বড় জড়িয়ে পড়েছি, মেয়েটা বড় হয়ে উঠেছে, বিয়ে না দিলে আর নয়। বড়দা সেই সোনাগুতির মোকদ্দমা করে আড়ালে বিল বিক্রি করে ফেললেন, জানেন তো সব। সেই নিজে মারাও গেলেন, আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে গেলেন। পয়সার অভাবে ছেলেটাকে পড়াতে পারছি না। তা আমি বলচি কী, ছেলেটাকে আপনার বাসায় রেখে যদি দুটো খেতে দেন আর আপনার স্কুলে ফ্রী করে নেন দয়া করে, তবে গরিবের ছেলের লেখাপড়াটা হয়। আপনিও তো ওর জ্যাঠামশায়—

যদুবাবু বুঝিলেন, মাহিনা সম্বন্ধে ও-রকম বলা উচিত হয় নাই তখন। পাড়াগাঁয়ের গতিক ভুলিয়া গিয়াছেন বহুদিন না-আসার দরুন। এসব জায়গার লোকে সর্বদা সুবিধা খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, চাহিতে-চিন্তিতে ইহাদের দ্বিধা নাই, লজ্জা নাই। কী বিপদেই ফেলিল এখন!

মুখে বলিলেন, তা আর বেশী কথা কী! সুঁটা থাকবে, এ ভাল কথাই তো! তবে এখন স্কুলে ভর্তি করার সময় নয়, সামনের জানুয়ারি মাসে নিয়ে যাব ওকে।

অবনী পল্লীগ্রামের লোক, পাইয়া বসিল। বলিল, তা কেন দাদা, ও বউদিদির সঙ্গেই যাক না। বাসায় থাকুক, সকালে বিকেলে আপনার কাছে একটু আধটু পড়লেও ওর যথেষ্ট বিদ্যে হবে পেটে। বংশের মধ্যে আপনি এল-এ পাস করেছেন—আমাদের বংশের চুড়ো আপনি। আমরা সব মুখ্যু। দেখুন, যদি আপনার দয়ায় একটু আধটু ইংরিজী পেটে যায় ওর, পরে করে খেতে পারবে।

যদুবাবু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন,—তা—তা, হবে। বেশ—বেশ।

স্ত্রীকে রাত্রে কথাটা বলিলেন। স্ত্রী বলিল, কে, ওই সুঁটো? ওই দেখতে পিলেরোগা পেটমোটা, ও আধ সের চালের ভাত খায়। সে দিন একটা কাঁটাল একলা খেলে। ওর পেছনে, যা মাইনে পাও, সব যাবে। তা তুমি কিছু বলেচ নাকি?

—বলেচি বলিচি। কী আর করি! তোমাকে নিয়ে যাবার সময় এখন ছিনেজোঁকের মত ধরে না বসে! ওসব লোককে বিশ্বাস নেই রে বাবা।

—কেন, বাহাদুরি করতে গিয়েছিলে যে বড়? এখন সামলাও ঠ্যালা!

যদুবাবুকে আরও বেশী মুশকিলে পড়িতে হইল। যে দিন তিনি যাইবেন, সে দিন অবনী আসিয়া কুড়ি টাকা ধার চাহিয়া বসিল। না দিলে চলিবে না, সামনের মাসে সে

বউদিদির হাতে কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিয়া দিবে। এখন না দিলে জমিদারের নালিশের দায়ে আমন ধানের জমা বিক্রয় হইয়া যাইবে। সে (অবনী) তাঁহাকে বড় দাদার মত দেখে, তিনি না দিলে এ বিপদের সময় সে কোথায় দাঁড়ায়, কাহার কাছে বা হাত পাতে?

অবনী একেবারে যদুবাবুর পা জড়াইয়া ধরিল। দিতেই হইবে, যদুবাবুর বউমা পর্যন্ত নাকি বটঠাকুরের কাছে আসিবার জন্য তৈয়ারী হইয়া আছে টাকার জন্য।

যদুবাবু প্রমাদ গনিলেন। এমন বিপদে পড়িবেন জানিলে তিনি সিধু কাপালীকে কি ও কথা বলেন?

বলিলেন, তা একটা কথা। টাকাকড়ি ভায়া এখানে কিছু রাখি নি তো! সব ব্যাঙ্কে। তোমার বউদিদি বললে, পাড়াগাঁয়ে যাচ্ছ—সোনাদানা টাকাকড়ি সব এখানে রেখে যাও। হাতে কেবল যাবার ভাড়াটা রেখেছি ভায়া।

—আজই যাবেন?

—হ্যাঁ, এখুনি, খাওয়া হলেই বেরুব! আজই দশটার গাড়িতে—

যদুবাবু মনে মনে বলিলেন, যাও বা থাকতাম আজকের এ বেলাটা হয়তো, আর এক দণ্ডও এখানে থাকি! এখন বেরুতে পারলে হয় এখান থেকে!

কিন্তু অবনী মুখুজ্জে অভাবগ্রস্ত পাড়াগাঁয়ের লোক, তাহাকে তিনি চেনেন নাই কিংবা চিনিয়াও ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অবনী বলিল, বেশ দাদা, চলুন আমিও আপনার সঙ্গে কলকাতা যাই তবে। না হয় যাতায়াতে সাত সিকে পয়সা খরচ হয়ে গেল, টাকাটা এনে জমিদারের দায় থেকে তো বেঁচে যাব এখন! সাত সিকে খরচ বলে এখন কী করব, না হয় গুনগার গেল।

যদুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তুমি কেন গাড়ি ভাড়া করে যেতে যাবে? আমি গিয়েই মনিঅর্ডার করে পাঠাব। তা ছাড়া আজ—আজ আমি, কি বলে—একটু হালিশহরে নামব কিনা! আমার বড় শালীর বাড়ি। তারা কি গেলেই আজ ছাড়বে? এক-আধ দিন রাখবেই। তুমি মিছিমিছি পয়সা খরচ করবে, অথচ সেই দেরি হয়েই যাবে।

অবনী বলিল, ভালই তো, চলুন, না হয় বউদিদির বোনের বাড়ি দেখেই আসি। গাঁয়ে থাকি পড়ে, কুটুমবাড়ির ভালটা মন্দটা না হয় খেয়েই আসি দুদিন।

কোথায় যাইবে অবনী তাঁহার সঙ্গে! তিনি এখন শ্রীশের মেসে গিয়া উঠিবেন। যদুবাবু কি যে বলেন, উপস্থিত বুদ্ধিতে আর কুলায় না। আকাশপাতাল ভাবাও যায় না সামনে দাঁড়াইয়া। বলিলেন, বেশ, বেশ, এ তো খুব ভাল কথা, তোমার মত কুটুম্ব যাবে আমার শালীর বাড়ি। তবে একটা কথাও ভাবছি আবার, যদি কলকাতায় গিয়ে আমাদের স্কুলের হেডমাস্টারের দেখা না পাই!

—হেডমাস্টার! কেন দাদা?

যদুবাবু এতক্ষণে ভাবিয়া বলিবার একটা রাস্তা খুঁজিয়া পাইয়াছেন। বলিলেন, হেডমাস্টারের কাছে ব্যাঙ্কের বইখানা রয়েছে কিনা! হেডমাস্টার না থাকলে টাকা তুলব কী করে?

—কারও কাছে চাইলে আপনি দুদিনের জন্যে ধার পেয়ে যাবেন দাদা! আপনার কত বন্ধুবান্ধব সেখানে। এ দায় উদ্ধার করতেই হবে আপনাকে। দিন একটা উপায় করে।

—অবিশ্যি তা পেতাম। কিন্তু আমার যে বন্ধুবান্ধব এখন গরমের সময় কেউ নেই কলকাতায়, দার্জিলিং কি সিমলে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছে গরমের সময়। কলকাতার বড়লোক উকিল ব্যারিস্টার সব—গরমের সময় সব পাহাড়ে চলে যাবে। এ কি তুমি-আমি?

—তাই তো দাদা, তবে আমার কী উপায় হবে?—অবনী মুখুজ্জে প্রায় কাঁদো-কাঁদো হইয়া পড়িল।

যদু বলিলেন, কিছু ভেবো না ভায়া। আমি যাচ্ছি কলকাতায়—গিয়ে একটা যা হয়-হিল্লে লাগিয়ে দেব। কেন তুমি পয়সা খরচ করে অনর্থক যাবে আমার সঙ্গে? আমি চেষ্টা করে দেখে মনিঅর্ডার করে দেব হাতে পেলেই। আচ্ছা, চলি, দুটো খেয়ে নিই—আর দেরি করা চলে না।

যদুবাবু ঝড়ের বেগে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। মনে মনে বলিলেন, উঃ, কী ছিনে-

জোঁক রে বাবা! কিছুতেই বাগ মানে না, এত করে ভেবে ভেবে বলি। ভাগ্যিস মনে এল হেডমাস্টারের কাছে ব্যাঙ্কের খাতার ওই ফন্দিটা!

টিনের সুটকেস হাতে ঝুলাইয়া যদুবাবু তাড়াতাড়ি দুইটি খাইয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। পাছে অবনী তাহার মত বদলাইয়া ফেলে! কী ঝঞ্ঝাট, এখন মেসে বসাইয়া উহাকে ফ্রেন্ডচার্জ দিয়া খাওয়াও, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখাও—কোথায় বা ব্যাঙ্ক, আর কোথায় বা টাকা!

যদুবাবু শ্রীশ রায়ের মেসে আসিয়া উঠিবার পরে অবনী মুখুজ্জের পর পর তিন-চারিখানা তাগাদার চিঠি পাইলেন। তিনি উত্তর লিখিয়া দিলেন, হেডমাস্টার অনুপস্থিত—টাকা ধারের কোন উপায় হইল না, সে জন্য তিনি খুব দুঃখিত। তবুও চেষ্টায় আছেন। যদুবাবুর স্ত্রী বেচারীর খোঁটা খাইতে খাইতে প্রাণ যাইতেছে। সে বেচারী লিখিল, পরের বাড়ি এমন করিয়া ফেলিয়া রাখা কি তাহার উচিত হইতেছে? কবে তিনি আসিয়া লইয়া যাইবেন? আর সে এক দণ্ডও এখানে থাকিতে চায় না।

যদুবাবু স্ত্রীর পত্রের কোন উত্তর দিলেন না।

যদুবাবুরও খুব দোষ দেওয়া যায় না। স্কুল খুলিবার পর প্রত্যেক মাস্টার মাত্র পনেরো টাকা করিয়া পাইলেন ছুটির মাসের দরুন। তাহার মধ্যে মেসখরচ করিয়া আর হাতে কিছু থাকে না। এদিকে পুরাতন বাড়িওয়ালা স্কুলে আসিয়া তাগাদা দিয়া গায়ের ছাল ছিঁড়িয়া খাইবার উপক্রম করিতেছে। হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করিবার ভয় দেখাইয়া গিয়াছে, কেমন ভদ্রলোক সে দেখিয়া লইবে।

চায়ের দোকানের মজলিসে বসিয়া মাস্টারের দল পয়সাকড়ির টানাটানির কথা রোজই আলোচনা করে। কারণ, অবস্থা সকলেরই একরূপ। জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, সামান্য ত্রিশটে টাকা, তাও দু-মাস বাকি। সাহেবের কাছে বলতে গেলাম, সাহেব আজ দু টাকা দিলে মোটে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমাদেরও তো তাই, সংসার অচল।

যদুবাবু বলিলেন, আমার দুর্দশা তো দেখতেই পাচ্ছ। দু বেলা শাসিয়ে যাচ্ছে। ক্ষেত্রভায়া, তোমার ছেলেমেয়ে কোথায় এখন?

—রেখেছিলাম আমার শাশুড়ীর কাছে দু মাস। এখন আবার এনেছি।

নারাণবাবু বলিলেন, আহা, বউমার কথা ভাবলে কী কষ্ট যে পাই মনে! লক্ষ্মী-স্বরূপিণী ছিলেন। আমি যেন তাঁর বাবা, তিনি মেয়ে—এমন ব্যবহার করতেন আমার সঙ্গে।

উপস্থিত সকলেই ক্ষেত্রবাবুর স্ত্রী-বিয়োগের কথা স্মরণ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন।

ক্ষেত্রবাবু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তাহার নিগূঢ় কারণও ছিল। এই গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি বর্ধমানে তাঁহার জাঠতুতো ভাইয়ের কাছে গিয়াছিলেন। জাঠতুতো ভাই বর্ধমানে রেলে কাজ করেন। বউদিদি সেখানে তাঁহার জন্য একটি পাত্রী ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। পাত্রী-পক্ষ এজন্য তাঁহাকে অনুরোধও করিয়া গিয়াছে। তিনি এখনও মত দেন নাই বটে, কিন্তু এ শনিবার হঠাৎ তাঁহার মন বর্ধমানে যাইতে চাহিতেছে কেন!

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া টুইশানিতে যাইবার পূর্বে ক্ষেত্রবাবু ওয়েলেসলি স্কোয়ারে একটু বসিলেন। বেঞ্চিখানাতে আর একজন কে বসিয়া ছিল, তিনি বসিতেই সে উঠিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু একটু অন্যমনস্ক। পুনরায় বিবাহ করিবার অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা নাই। করিবেনও না। তবে আর একটা কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বিশেষ কষ্ট। সেই কোন্ সকালে তিনি স্কুলে চলিয়া আসিয়াছেন। বড় মেয়েটার উপরে সব ভার—তার বয়স এই মাত্র সাড়ে সাত। সে-ই রান্না-বান্না, ছোট ভাই-বোনদের খাওয়ানো-মাখানোর ঝুঁকি ঘাড়ে লইয়া গৃহিণী সাজিয়া বসিয়া আছে। কিন্তু আজ যদি একটা শক্ত অসুখবিসুখ হয় কাহারও—কে দেখাশোনা করিবে তাহাদের? এ সব ভাবিয়া দেখিবার জিনিস।

স্কুলের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইয়া আসিতেছে। গ্রীষ্মের ছুটির পর দুই মাস চলিয়া গিয়াছে, অথচ ছুটির মাহিনা এখনও সম্পূর্ণ শোধ হয় নাই। সাহেবকে বার বার বলিয়াও কোন ফল হয় না। সাহেবের এক কথা, এ বছর কষ্ট সহ্য করিতে হইবেই। যাহার না পোষায়, সে চলিয়া যাইতে পারে।

একদিন সাহেবের সারকুলার-অনুযায়ী ছুটির পর সাহেবের আপিসে শিক্ষকদের হাজির হইতে হইল। সাহেব বলিলেন, আজ একটা বিশেষ জরুরী মীটিং করা দরকার। থার্ড ক্লাসে গণিতের ফল আদৌ ভাল হইতেছে না, এ বিষয়ে শিক্ষকদের লইয়া পরামর্শ করা নিতান্ত আবশ্যক।

মীটিং চলিল। হতভাগ্য টীচারদের দল খালি পেটে শ্রান্ত দেহে পাঁচটা পর্যন্ত নানারূপ কৌশল উদ্ভাবন করিতে ব্যস্ত রহিল—থার্ড ক্লাসে কী করিয়া অ্যালজেব্রা ভালরূপে শিখানো যায়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন বৈদেশিক শক্তি যুদ্ধ ঘোষণা করিলে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী এতদপেক্ষা অধিক আগ্রহ ও উদ্যোগ দেখাইতে পারিতেন না তাঁহার ক্যাবিনেট মীটিংয়ে।

পাঁচটা বাজিয়া গেল। তখনও প্রস্তাবের অন্ত নাই। থার্ড ক্লাসের গণিত-শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত টীচার হতভাগ্য শেখরবাবু ম্লান মুখে বসিয়া শুনিয়া যাইতেছেন, কারণ এ অবস্থার জন্য তিনিই ধর্মত দায়ী। তাঁহার দপ্তরেই এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। উক্ত ক্লাসের গত দুইটি সাপ্তাহিক পরীক্ষায় গণিতের ফল আদৌ আশাপ্রদ হয় নাই।

সাড়ে পাঁচটার সময় হেডমাস্টার উঠিয়া ধীরে ধীরে গণিতশিক্ষার প্রকৃত উপায় সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ পাঠ শুরু করিলেন—খাতার বহর দেখিয়া মনে হইল, সাড়ে ছয়টার কমে সে প্রবন্ধ শেষ হইবে না।

হঠাৎ নতুন টীচার দাঁড়াইয়া বলিলেন, সার্, আমার একটা কথা বলবার আছে।

হেডমাস্টার প্রবন্ধ পাঠ করিতেছিলেন, থামিয়া মুখ তুলিয়া বিস্মিতভাবে নতুন টীচারের দিকে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ইয়েস?

—স্যার্, ছটা বাজে, মাস্টারেরা সকলেই ক্ষুধার্ত। আজ এই পর্যন্ত থাকলে ভাল হয়।

নতুন টীচারের সাহস দেখিয়া সবাই বিস্মিত ও স্তম্ভিত।

হেডমাস্টার বলিলেন, জান মাস্টার, আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে কোন বাধাসৃষ্টি পছন্দ করি না?

—স্যার্, আমায় ক্ষমা করবেন। স্পষ্ট কথা বলবার সময় এসেছে। আপনার এ রকম মীটিং মাস্টারদের পক্ষে বড় কষ্টদায়ক হয়। এতে স্কুলের কাজ হয় না।

—স্কুলের কাজ কি তোমার কাছে আমায় শিখতে হবে?

—আপনিই ভেবে দেখুন, এতে স্কুলের কী ভাল হচ্ছে? ছেলে ছেড়ে গিয়েছে, রিজার্ভ ফণ্ড নেই, মাইনে পাই না আমরা নিয়মমত। অথচ আপনি এই সব শিক্ষককে নিয়ে আলোচনা-সভার প্রহসন করচেন! আপনিই ভেবে দেখুন, এতে কী উপকার হয়? এই সব টীচার মুখ ফুটে বলতে পারেন না; কিন্তু চারটের পর আপনি এঁদের কাছ থেকে ভাল কিছু আশা করতে পারেন কি?

এবার হেডমাস্টারের পালা বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবার। একজন সামান্য বেতনের টীচারের কাছে তিনি এ ধরনের সোজা ও স্পষ্ট কথা প্রত্যাশা করেন নাই। বলিলেন, আমি কতদিন হেডমাস্টারি করছি, তা তোমার জানা আছে?

—তা আমার জানবার দরকার নেই স্যার্। কিন্তু আপনার এই শাসনপ্রণালী যে আদৌ ফলপ্রদ নয়, তা আপনাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়াতে আপনি আমায় শত্রু ভাববেন না। আমি বন্ধুভাবেই এ কথা বলছি। আপনাকে সদুপদেশ দেওয়ার লোক নেই।

মাস্টারেরা সকলে কাঠের মত বসিয়া আছেন। এমন একটা ব্যাপার তাঁহারা কখনও এ স্কুলে ঘটিতে পারে বলিয়া কল্পনাও করেন নাই। দুই-চারিজন সপ্রশংস দৃষ্টিতে নতুন টীচারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নতুন টীচার যে এমন চোস্ত ইংরেজী বলিতে

পারদর্শী—এ তথ্য আজই তাঁহারা অবগত হইলেন।

হেডমাস্টারের মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বলিলেন, তুমি কি বলতে চাও আমি স্কুল চালাতে জানি নে?

নতুন টীচার কী একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে নারাণবাবু নতুন টীচারকে বলিলেন, ভায়া, ছেড়ে দাও। আর তর্ক-বিতর্ক ক'রো না। সাহেব যা বলছেন, ওনার ওপর আর কথা ব'লো না।

আশ্চর্যের বিষয়, সেই সভাতেই সাহেবের সামনে দুই-তিনজন টীচার, তাঁহাদের মধ্যে ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু আছেন—নারাণবাবুর মধ্যস্থতা করিতে যাওয়ায় স্পষ্টতই বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।

পিছন হইতে হেডমৌলবী বলিল, আহা, বলতে দ্যান ওনাকে নারাণবাবু, বাধা দেবেন না।

আলম বেঞ্চির কোণে চুপ করিয়া বসিয়া আছে, মুখে কথাটি নাই।

নতুন টীচার বলিলেন, স্যার্, আপনি ভেটারান্ হেডমাস্টার, স্কুল চালাতে জানেন না, তাই কি বলছি? কিন্তু আপনি স্কুলের বাজেট দেখে ব্যয়সংকোচের ব্যবস্থা করুন, দু মাসের মাইনে পান নি যে সব মাস্টার, তাঁদের নিয়ে ছটা পর্যন্ত মীটিং করা চলে কি স্যার্?

নারাণবাবু বলিলেন, থাম ভায়া, থাম।

দুই-তিনজন টীচার একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, নারাণদা, ওঁকে বলতে দিন।

হেডমাস্টার দেখিলেন, সভার সমবেত মত তাঁহারই বিরুদ্ধে—নতুন টীচারের সপক্ষে। তাঁহার নিজের স্কুলে বসিয়া এই তাঁহার প্রথম পরাজয়।

একটা দুর্বল কথা তিনি হঠাৎ বলিয়া বসিলেন। বলিলেন, কেন, চারটের পর আমি মাস্টারদের জন্যে জলখাবারের ব্যবস্থা তো করে দিই। আজ যদি তোমাদের খিদে পেয়ে থাকে, আমাকে আগে জানালেই আমি ব্যবস্থা করতাম।

সকলেই বুঝিল, হেডমাস্টারের এ উক্তি দুর্বলতাজ্ঞাপক।

নতুন টীচার বলিলেন, সামন্য দু-চারখানা লুচি জলখাবারের কথা ধরি নি স্যার্। সে যাঁরা খেতে চান, তাঁরা খেতে পারেন। আমার বলবার উদ্দেশ্য, মাস্টারদের ওপর নানা দিক থেকে অন্যায় হচ্ছে—আপনি এর প্রতিকার করুন।

হেডমাস্টার যে আদৌ দমেন নাই, ইহা দেখাইবার জন্য মুখখানাতে গর্বসূচক হাসি আনিয়া সকলের দিকে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন, শীগগির তোমরা আমার মতলব জানতে পারবে স্কুলের উন্নতি সম্বন্ধে।—বলিয়াই চশমাটি খুলিয়া ধীরভাবে মুছিয়া ফেলিতে ফেলিতে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, আচ্ছা, এখন আমরা আমাদের প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ করি—কোন্ পর্যন্ত পড়েছিলাম তখন? দেখি—

এমন ভাব দেখাইবার চেষ্টা করিলেন যেন নতুন টীচারের মন্তব্য তিনি গায়েই মাখেন নাই। ও-রকম বহু অর্বাচীনের উক্তি তিনি বহুবার শুনিয়াছেন, কিন্তু ওসব শুনিতে গেলে তাঁহার চলে না।

সাড়ে ছয়টার সময় প্রবন্ধ শেষ হইল। ইতিমধ্যে যদুবাবু কখন খাবারের টাকা লইয়া গিয়াছিলেন, কেহ লক্ষ্য করে নাই—তিন টুকরি লুচি কচুরি আলুর দম কখন আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে।

হেডমাস্টার নিজে দাঁড়াইয়া শিক্ষকদের খাওয়ার তদারক করিলেন।

নতুন টীচারের মর্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়া গেল স্কুলে এই দিনটির পর হইতে। দোর্দণ্ড-প্রতাপ ক্লার্কওয়েল যার সামনে হঠাৎ নরম হইয়া সরু-সুতা কাটিতে লাগিলেন, তাহার ক্ষমতা আছে বইকি।

মিঃ আলম হেডমাস্টারকে বলিলেন, স্যার্, আপনার মুখের ওপর তর্ক করে, আপনি তাই সহ্য করলেন কাল? বলুন, আজই পড়ানোর ভুল ধরে রিপোর্ট করে দিচ্ছি, দিন ওর চাকরি খেয়ে।

—নতুন টীচার অত ভাল ইংরেজী বলে, আমি জানতাম না মিঃ আলম। আমি ওর

ক্লাস-ওয়ার্ক আগেও দেখেচি। তাকে খারাপ বলা যায় না ঠিক।

—স্যার্, আমার কাল রাগ হচ্ছিল ওর বেয়াদবি দেখে। আর দেখলেন, মাস্টারেরা প্রায় অনেকেই ওকে সাপোর্ট করলে?

—সেটা আমিও ভেবেছি। মাস্টারেরা মাইনে ঠিকমত পায় না বলে অসন্তুষ্ট। অসন্তুষ্ট লোক দিয়ে কাজ হয় না। স্কুলের বাজেটটা সামনের বছর থেকে ব্যালান্স্ না করাতে পারলে আর এরা সন্তুষ্ট হচ্ছে না।

—স্যার্, কাল কোন্ কোন্ টীচার ওকে সাপোর্ট করেছিল, তাদের নাম আমি লিখে রেখেচি।

—নামগুলো দিয়ো আমার কাছে।

—বলেন তো ওদের ক্লাস-ওয়ার্ক দেখি আজ থেকে। রিপোর্ট করি।

একদিন মিঃ আলম চুপি চুপি সাহেবের কাছে আসিয়া বলিল, স্যার্, মাস্টারেরা নতুন টীচারকে নিয়ে দল পাকাচ্ছে।

—কে কে?

—স্যার্, ক্ষেত্রবাবু, যদুবাবু, শ্রীশবাবু, জ্যোতির্বিনোদ, দত্ত, বোস—কেবল নারাণবাবু নয়।

—নারাণবাবু ইজ অ্যান ওল্ড্ লয়্যালিস্ট।

—স্যার্, নতুন টীচারকে নিয়ে দল পাকায়—মোড়ের ওই চায়ের দোকানে রোজ ছুটির পর ওদের মীটিং হয়। নতুন টীচার ওদের দলপতি।

—তোমাকে কে বললে?

—ক্লার্ক সুবল দে আমায় সব কথা বলে। ও ওদের দলে যোগ দিয়ে শুনে এসে আমায় বলেছে। আমাদের স্কুলের সম্বন্ধে ইউনিভার্সিটিতে নাকি ওরা জানাবে। নতুন টীচারের কে আত্মীয় আছে ইউনিভার্সিটিতে।

—দেখ মিঃ আলম, যে যা পারে করুক। আর ও-সব স্পাইগিরি আমি পছন্দ করি নে। এটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, এর মধ্যে ওসব দলাদলি, ডার্টি পলিটিক্স্—আই হেট্। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছেলেদের শিক্ষা, স্কুলকে ভাল করব। গড্ ইজ্ অন্ মাই সাইড—

—আমার মনে হয়, ওই নতুন টীচারকে না তাড়ালে স্কুলে দলাদলি আরও বাড়বে। ও-ই ভাঙবে স্কুলটাকে। ও লোক সুবিধের নয়।

কিন্তু এ রিপোর্টে ফল উল্টা হইল। সাহেবের কাছে মাস দুইয়ের মধ্যে নতুন টীচারের প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। মাস্টারেরা সব নতুন টীচারকে লিডার বানাইয়াছে, তাহাদের অভাব-অভিযোগের কথা নতুন টীচারের মুখে ব্যক্ত হয় হেডমাস্টারের কাছে। আজ ইহাকে দুই টাকা আগাম দিতে হইবে, কাল 'টীচার্স এড্ ফন্ড' হইতে উহাকে পাঁচ টাকা ধার দিতে হইবে—নতুন টীচারকে মুখপাত্র করিয়া সবাই পাঠাইয়া দেয়।

সাহেব বলেন, কী, রামেন্দুবাবু?

—স্যার্, আজ যদুবাবুকে কিছু আগাম দিতে হবে।

—কেন? ও-মাসে দেওয়া হয়েছে সাত টাকা।

—ওঁর বড় ঠেকা! দেনা হয়েছে—

—বড় অবিবেচক লোক ওই যদুবাবু। আমি শুনেছি, ও রেস খেলে।

—না স্যার্। রেস খেলার পয়সা কোথায় পাবেন? মেসে থাকেন এখানে—

মিঃ আলমের কানে কথাটা উঠিল। আজকাল নতুন টীচার সাহেবের কাছে মাস্টারদের জন্য সুপারিশ করে এবং তাহাতে ফলও হয়। আলম একদিন সুবল দে কেরানীকে বাহিরে একটা চায়ের দোকানে লইয়া গেলেন। বলিলেন, সুবল, এ সব হচ্ছে কী?

—কী বলুন স্যার্?

—সাহেব নাকি ওই নতুন টীচারের কথা খুব শুনছেন!

—তাই মনে হয় স্যার্। সে দিন জ্যোতির্বিনোদকে দুদিন ছুটি দিলেন ওঁর সুপারিশে।

—কেন, কেন?

—জ্যোতির্বিনোদের ভাগ্নীর বিয়ে।

—জ্যোতির্বিনোদের ক্যাজুয়াল লিভের হিসেবটা চেক করে কাল আমায় জানিও তো! বুঝলে?

—বেশ, স্যার্।

—স্কুলে যা-তা হচ্চে, না?

কেরানী চুপ করিয়া রহিল। কেরানী মানুষ, বড় টীচারের সামনে যা তা বলিয়া কি শেষে বিপদে পড়িবে? মিঃ আলম বলিলেন, তোমার কী মনে হয়?

—স্যার্, আমরা চুনোপুঁটির দল, আমাদের কিছু না বলাই ভাল।

—নতুন টীচার বড় বাড়িয়েচে, না?

—হুঁ। তবে একটা কথা—

—কী?

—স্যার্, নতুন টীচার রামেন্দুবাবু কিন্তু লোকের অসুবিধে বা উপকার এই ধরনের ছাড়া অন্য কথা নিয়ে সাহেবের কাছে যায় না।

—তুমি কী করে জানলে?

—আমি জানি স্যার্। সেই জন্যেই মাস্টারবাবুরা ওঁর খুব বাধ্য হয়ে পড়েছেন।

—থাক। তোমায় আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। তুমি কাল জ্যোতির্বিনোদের ক্যাজুয়াল লিভটা চেক করে আমায় জানাবে, কেমন তো?

—হ্যাঁ স্যার্, তা করে দেব। বলেন তো আজই দিই।

—কালই দেবে।

পরদিন হিসাব করিয়া ধরা পড়িল, জ্যোতির্বিনোদের তিন দিন ছুটি বেশী লওয়া হইয়া গিয়াছে এ বছর। মিঃ আলম সাহেবের কাছে রিপোর্ট করিলেন। জ্যোতির্বিনোদের তিন দিনের বেতন কাটা গেল। মিঃ আলম হাসিয়া নিজের দলের মাস্টারদের বলিলেন, লিডার হলেই হল না। সব দিকে দৃষ্টি রেখে তবে লিডার হতে হয়। স্কুলটাকে এবার উচ্ছন্ন দেবে আর কি! সাহেবেরও আজকাল হয়েচে যেমন!

হেডপণ্ডিত ছুটিপ্রার্থী হইয়া সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়াছেন!

সাহেব মুখ তুলিয়া বলিলেন, হোয়াট পাণ্ডিট্?

—স্যার্, কাল তালনবমী, টীচারেরা ও ছেলেরা ছুটি চাচ্চে।

—টালনব—হোয়াট ইজ্ দ্যাট্ পাণ্ডিট্? নেভার হার্ড দি নেম্।

—স্যার্, মস্ত বড় পরব হিন্দুর। দুর্গাপুজোর নিচেই—মস্ত পরব।

সাহেব চিন্তা করিয়া বলিলেন, না পণ্ডিত, এ বছর এক শো দিন ছাড়িয়েছে। ইন্সপেক্টর-আপিসে গোলমাল করবে। কী তুমি বলছ টাল—কী?

—তালনবমী।

—ফানি নেম। যাই হোক, ওতে ছুটি দেওয়া চলে না।

হেডপণ্ডিত মাস্টারদের শেখানো ইংরেজী আওড়াইয়া বলিলেন, নেক্সট্ টু দুর্গাপুজো সার্—গ্রেট্—গ্রেট্—ইয়ে—

'ফেস্টিভ্যাল' কথাটা ভুলিয়া গিয়াছেন, অত বড় কথা মনে আনিতে পারিলেন না।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, ইয়েস্, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্—ইউ মিন ফেস্টিভ্যাল—আমি বুঝেছি। হবে না। ক্লাসে পড়াওগে যাও।

সকলেই জানিল, ছুটি হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ঠিক শেষ ঘণ্টায় মথুরা চাপরাসীকে সারকুলার-বই লইয়া ক্লাসে ক্লাসে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে দেখা গেল। তালনবমীর ছুটি হইয়া গিয়াছে।

মনে সকলেরই খুব স্ফূর্তি। জ্যোতির্বিনোদের ঘরে ছাদের উপর অনেকে আড্ডা দিতে গেলেন। জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, বাব্বা, কাল সেই পাগল বউটার কী কাণ্ড রাত্রে—

হেডপণ্ডিত বলিলেন, কী হয়েছিল?

আরে, কখনও কাঁদে কখনও হাসে। রাত্রে ছাদে কতক্ষণ বসে রইল। ওর দুই দেওর এসে শেষে ধরে নিয়ে গেল। মারলেও যা।

নারাণবাবু বলিলেন, বড় কষ্ট হয় মেয়েটার জন্যে। ওর অদৃষ্টটাই খারাপ।

যে বাড়ির বধূর কথা হইতেছে, বাড়িটা বেশ বড়লোকের, স্কুলের পশ্চিম দিকে, গত ছয় মাসের মধ্যে বাড়িটাতে অনেকগুলি বিবাহ হইয়াছিল খুব জাঁকজমকের সঙ্গে। সেই হিড়িকে এই মেয়েটিও বধূরূপে ও-বাড়িতে ঢোকে, কারণ তাহার পূর্বে মাস্টারেরা আর কোনদিন উহাকে দেখেন নাই ও-বাড়িতে। কিন্তু বিবাহের মাসখানেক পর হইতেই বধূটি কেন যে পাগল হইয়া গিয়াছে, তাহা ইঁহারা কী করিয়া বা জানিবেন! তবে বধূটি যে আগে ভাল ছিল, এ ব্যাপার ইঁহারা স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, হ্যাঁ হে, সেই পার্শী মেয়েটাকে আর তো দেখা যায় না ও-বাড়িতে!

শ্রীশবাবু বলিলেন, ও-বাড়িতে অন্য ভাড়াটে এসে গিয়েছে। আরা চলে গিয়েছে।

—কী করে জানলে?

—এই দিন-পনরো থেকে দেখছি, ছাদে বাঙালী মেয়ে গিন্নী পুরুষ-মানুষ ঘোরে।

পার্শী মেয়েটিকে ইঁহারা সকলেই প্রায় দুই বছর ধরিয়া দেখিয়া আসিতেছেন। তাহার আগে বছর পাঁচেক ও-বাড়িতে অন্য ভাড়াটে দেখিয়াছিলেন। মেয়েটি ছাদের লোহার চৌবাচ্চার ছায়ায় বসিয়া একমনে পিঠের উপর বেণী ফেলিয়া বসিয়া পড়িত—যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রতিমা। কোন স্কুল বা কলেজের ছাত্রী হইবে। দুপুরে বা বিকালে শতরঞ্চির উপর একরাশ বই ছড়াইয়া পড়িত—কী একাগ্র মনে পড়িত!

তাহাকে লইয়া মাস্টারদের কত জল্পনা-কল্পনা!

—আচ্ছা, ও কি স্কুলের ছাত্রী?

—কিন্তু ওর বয়েস হিসেবে কলেজের বলেই মনে হয়।

—খুব বড়লোক,—না?

এমন আর কী। ফ্ল্যাট নিয়ে তো থাকে। ওদের চাল খুব বেশী—পার্শী জাতটার—

—বিয়ে হয়েছে বলে মনে হয়?

এইরকম কত কথা! সে তরুণী পার্শী ছাত্রীটি বিবাহিতা হইলেই বা কাহার কী, না হইলেই বা তাহাতে মাস্টারদের কী লাভ! তবুও আলোচনা করিয়া সুখ।

অধিকাংশ মাস্টার এ স্কুলে বহুদিন ধরিয়া আছেন—দশ, তেরো, আঠারো, বিশ বছর। এই উঁচু তেতালার ছাদ হইতে চারি পাশের বাড়িগুলিতে কত উত্থান-পতন পরিবর্তন দেখিলেন। অনেকে বাড়ি যাইতে পান না পয়সার অভাবে, যেমন জ্যোতির্বিনোদ, কি নারাণবাবু, কিংবা মেস্ পালিত শ্রীশবাবু—গৃহস্থবাড়ির মা, বোন, মেয়ে, ইহাদের চলচ্চিত্র মাত্র এত উঁচু হইতে দেখিতে পান এবং দেখিয়া কখনও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন নিজেদের নিঃসঙ্গ জীবনের কথা ভাবিয়া, কখনও আনন্দ পান, কখনও পরের দুঃখে দুঃখিত হন, উদ্বিগ্ন হন। এই চলিতেছে বহুদিন ধরিয়া।

এ এক অদ্ভুত জীবনানুভূতি—দূর হইয়াও নিকট, পর হইয়াও আপন, অথচ যে দূর সে দূরই, যে পর সে পরই। অনেক কুশ্রী ঘটনাও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ওই লাল বাড়িটাতে নয় বৎসর আগে একটি মেয়ে একটি ছেলের সঙ্গে পলাইয়া গিয়াছিল, এদিকের ওই বাড়িটাতে প্রৌঢ়া গৃহিণীকে প্রত্যেকদিন—থাক্, সে সব কথায় দরকার নাই।

কত দুঃখের কাহিনীও এই সঙ্গে মনে পড়ে। ওই পূর্বদিকের হলদে দোতলা বাড়িটাতে আজ প্রায় সাত-আট বছর আগে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে আত্মহত্যা করে। এত-দিন পরেও সে কথা টিফিনের ছুটির সময় মাঝে মাঝে উঠে। বেকার স্বামী, পরিবার প্রতিপালন করিতে না পারিয়া স্ত্রীর সঙ্গে মিলিয়া বেকার-জীবনের অবসান করে।

সে সব দিনে ক্লার্কওয়েল সাহেব ছিল না। ছিলেন সুধীর মজুমদার হেডমাস্টার। অনুকূলবাবুর পরের কথা।

হেডপণ্ডিত বলেন, অনেকদিন হয়ে গেল এ স্কুলে যদু ভায়া, কী বল? সেই বউবাজার স্কুল ভেঙে এখানে আসি—মনে পড়ে সে-কথা? হেডমাস্টারের নাম কী ছিল যেন—শশীপদ কী যেন? আমার আজকাল ভুল হয়ে যায়, নাম মনে আনতে পারি নে।

যদুবাবু বলেন, শশীপদ রায় চৌধুরী। বউবাজার থেকে তারপর রানী ভবানীতে গিয়েছিলেন, মনে নেই?

—আমরা তো স্কুল ভেঙে গেলে চলে এলুম। শশীবাবুর আর কোন খোঁজ রাখি নে। এ স্কুলে তখন অনুকূলবাবু হেডমাস্টার। ওঃ, অমন লোক আর হয় না। আমাদের নারাণদাদা সেই আমলের লোক, না দাদা?

নারাণবাবু বলেন, আমি তারও কত আগের। তুমি আর যদু এসেচ এই আঠারো বছর, আমি তারও বারো বছর আগে থেকে এখানে। অনুকূলবাবুতে আমাতে মিলে স্কুল গড়ি।

ক্ষেত্রবাবু বলেন, আপনারা গড়লেন স্কুল, এখন কোথা থেকে মিঃ আলম আর সাহেব এসে নবাবি করচে দেখ।

নারাণবাবু বলেন, আমি কিছু নই, অনুকূলবাবু গড়েন স্কুল। তার মত ক্ষমতা যার-তার থাকে না। অনুকূলবাবুর মত লোক হচ্ছে এই সাহেব। সত্যিকার ডিউটিফুল হেডমাস্টার হিসেবে সাহেব অনুকূলবাবুর জুড়িদার। লেখাপড়া শেখে সবাই, কিন্তু অন্যকে শেখানো সবাই পারে না। যে পারে, তাকে বলে টীচার। তুমি আমি টীচার নই—টীচার ছিলেন অনুকূলবাবু, টীচার হল এই সাহেব।

হেডপণ্ডিত বলেন, না, দাদা, আপনি টীচার নিশ্চয়ই। আমরা না হতে পারি—

নারাণবাবু বলেন, অত সহজে টীচার হয় না। এই শুনবে তবে অনুকূলবাবুর দু-একটা ঘটনা? একবার একটা ছেলে এল, তার বাবা বর্মায় ডাক্তারি করে, দু'-পয়সা পায়। ছেলেটাকে আমাদের স্কুলে দিয়ে গেল বাংলা শিখবে বলে। বর্মী ভাষা জানে, বাংলা ভাল শেখে নি। পয়সাওলা লোকের ছেলে, বদমাইশও খুব। স্কুল পালায়, বাবা মোটা টাকা পাঠায়—সেই টাকায় থিয়েটার দেখে, হোটেলে খায়, পড়াশুনোয় মন দেয় না।

—এখানে থাকে কোথায়?

—থাকে তার এক আত্মীয়-বাড়ি। সেই ছেলের জন্যে অনুকূলবাবুকে রাতের পর রাত বসে ভাবতে দেখেচি। আমায় বললেন—নারাণ, মারধোর বা বকুনিতে ওকে ভাল করা যাবে না। উপায় ভাবচি। তারপর ভেবে করলেন কী, রোজ সেই ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বার হতেন আর মুখে মুখে গল্প করতেন পাপের দুর্দশা, অধঃপতনের ফল—এই সব সম্বন্ধে। গল্প নিজেই বসে বসে বানাতেন রাত্রে। আমায় আবার শোনাতেন পয়েণ্টগুলো। সেই ছেলে ক্রমে শুধরে উঠল, ম্যাট্রিক পাস করে বেরুল। তার বাবা এসে অনুকূলবাবুকে একটা সোনার ঘড়ি দেয় ছেলে পাস করলে। অনুকূলবাবু ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, আমায় এ কেন দিচ্ছেন? আমার একার চেষ্টায় ও পাস করে নি, আমার স্কুলের অন্যান্য মাস্টারের কৃতিত্ব না থাকলে আমি একা কী করতে পারতাম? তা ছাড়া, আমি কর্তব্য পালন করেছি, ভগবানের কাছে আপনার ছেলের জন্যে আমি দায়ী ছিলাম, কারণ আমার স্কুলে তাকে আপনি ভর্তি করেছিলেন। সে দায়িত্ব পালন করেচি, তার জন্যে কোন পুরস্কারের কথা ওঠে না।—আজকাল ক'জন শিক্ষক তাঁদের ছাত্রের সম্বন্ধে একথা ভাবেন বলুন দিকি? আদর্শ শিক্ষক বলতে যা বোঝায়, তা ছিলেন তিনি। আমাদের সাহেবকে দেখি, অনেকটা সেইরকম ভাব আছে ওঁর মধ্যে।

ক্ষেত্রবাবু ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, দাদা এতক্ষণ অনুকূলবাবুর কথা বলছিলেন, বেশ লাগছিল। আবার তাঁর সঙ্গে সাহেবের নাম করতে যান কেন?

নারাণবাবু গম্ভীর মুখে বলিলেন, কেন করি, তোমরা জান না—আই নো এ রিয়্যল টীচার হোয়েন দেয়ার ইজ ওয়ান—আমার কথা শোন ভায়া, সাহেবকে তোমরা অনেকেই চেন নি।

শিক্ষকের দল পরস্পরের কাছে বিদায় গ্রহণ করিলেন; কারণ সকলেরই টুইশানির সময় হইয়াছে।

পুজোর ছুটির মাস খানেক দেরি। স্কুলের অবস্থা খুবই খারাপ। হেডমাস্টার সারকুলার দিলেন যে যে মাস্টারের নিতান্ত দরকার, তাহারা আসিয়া জানাইলে কিছু কিছু টাকা দেওয়া হইবে, বাকী শিক্ষকদের ছুটির পর স্কুল খোলা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে মাহিনা লওয়ার জন্য।

স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে হট্টগোল পড়িয়া গেল।

যদুবাবু বলিলেন, এ সারকুলারের মানে কী হে ক্ষেত্র-ভায়া? আমাদের মধ্যে কে

তা.লবর আছে, যার টাকার দরকার নেই ?

ক্ষেত্রবাবু কিছু জানেন না, তবে তাঁহার নিজের টাকার দরকার এটুকু জানেন।

শ্রীশবাবু বলিলেন, সেক্রেটারির যেমন দরকার, গরিব মাস্টার—পুজোর সময় শুধু হাতে বাড়ি যেতে হবে সারা বছর খেটে—সকলেরই দরকার। রামেন্দুবাবুকে সকলে বলা যাক।

কিন্তু শোনা গেল, টাকা আদৌ নাই। আশামত আদায় হয় নাই। যা আদায় হইয়াছে, বাড়িভাড়া আর কর্পোরেশন ট্যাক্স দিতেই হইবে, যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিবে নিতান্ত অভাবগ্রস্ত শিক্ষকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

সে দিন টীচারদের ঘরে হঠাৎ মিঃ আলমের আগমনে সকলেই বিস্মিত হইল। মাস্টারদের বসিবার ঘরে মিঃ আলম বড় একটা আসেন না।

মিঃ আলমকে দেখিয়া মাস্টারেরা সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। যে বসিয়াছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল, যে শুইয়াছিল সে সোজা হইয়া বসিল।

মিঃ আলম হাসিমুখে চারিদিকে চাহিয়া বলিলেন, বসুন, বসুন।

তারপর ধীরে ধীরে নিজের আগমনের উদ্দেশ্য পাড়িলেন। হেডমাস্টারের এই যে সারকুলার, এ নিতান্ত জুলুমবাজি। কাহার টাকার জন্য কে এখানে খাটিতে আসিয়াছে ?

সকলে এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। মিঃ আলম সাহেবের বিশ্বাসী লেফটেন্যাণ্ট, তাহার মুখে এ কী কথা ? সাহেবের স্পাই হিসাবেও মিঃ আলম প্রসিদ্ধ। কে কী কথা বলিবে তার সামনে ?

মিঃ আলম বলিলেন, না, সাহেবকে দিয়ে এ স্কুলের আর উন্নতি নেই। আমি আপনাদের কো-অপারেশন চাই। আমার সঙ্গে মিলে সবাই সাহেবের বিরুদ্ধে সেক্রেটারির কাছে আর প্রেসিডেণ্টের কাছে চলুন। স্কুলের যা আয়, তাতে মাস্টারদের বেশ চলে যায়। সাহেব আর মেম পুষতে সাড়ে চার শো টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। এ স্কুলের হাতী পোষার ক্ষমতা নেই। আসুন, আমরা ম্যানেজিং কমিটীকে জানাই।

যদুবাবু প্রথমে কথা বলিলেন। তাঁহার ভাব বা আদর্শ বলিয়া জিনিস নাই কোন কালে, সুবিধা ও স্বার্থ লইয়া কারবার। তিনি বলিলেন, ঠিক বলেছেন মিঃ আলম। আমিও তা ভেবেচি।

মিঃ আলম বলিলেন, আর কে কে আমাকে সাহায্য করতে রাজী ?

জ্যোতির্বিনোদের রাগ ছিল হেডমাস্টারের উপর, বলিলেন, আমি করব।

যদুবাবু বলিলেন, আমিও।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমিও।

শ্রীশবাবুও সাহায্য করিতে রাজী।

কেবল নতুন টীচার ও নারাণবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

মিঃ আলম বলিলেন, কী রামেন্দুবাবু, আপনি কী বলেন ?

নতুন টীচার বলিলেন, আমি দু বছর প্রায় হল এ স্কুলে এসেছি, যা বুঝেছি এ স্কুলের উন্নতি নেই। স্কুলের বাজেট যিনি দেখেছেন, তিনিই এ কথা বলবেন। মিঃ আলম যা বলেছেন, তা খুবই ঠিক।

—তা হলে আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

—কী জন্যে সাহায্য চান ?

—টু রিমুভ্ দি প্রেজেণ্ট্ হেডমাস্টার। আশী টাকার হেডমাস্টার রাখলে স্কুল চলে যায়, মেমের কী দরকার ? ওতে ছেলে বাড়চে না যখন, তখন হাতী পোষা কেন ? আমরা অনাহারে আছি, আর সাহেব মেম সাড়ে চার শো টাকা নিয়ে যাচ্ছে !

—ঠিক কথা।

—তবে আপনি কী করবেন ?

—আমি এতে নেই।

—কেন ?

—প্রকাশ্যভাবে প্রতিবাদ করি বলে গোপনে শত্রুতা করতে পারব না, মাপ করবেন মিঃ আলম। তবে আমি নিউট্রাল থাকব, কারও দিকে হব না—এ কথা আপনাকে

দিতে পারি।

—বেশ, তাই থাকুন। নারাণবাবু?

—আমি বুড়ো মানুষ, আমায় নিয়ে কেন টানাটানি করেন মিঃ আলম? আপনি জানেন, আমি নির্বিরোধী লোক। আমায় আর এর মধ্যে জড়াবেন না।

—অন্য সব টীচারের মুখের দিকে চেয়ে রাজী হোন নারাণবাবু। আপনি হেডমাস্টার হোন, খুব খুশী হব সবাই। এ'দের মধ্যে কেউ নেই, যিনি তাতে অমত করবেন। কিংবা রামেন্দুবাবু হেডমাস্টার হোন—কারও আপত্তি হবে না।

সকলে সমস্বরে এ প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

এই দিনটির পরে মিঃ আলমের চক্রান্ত রোজই চলিতে লাগিল। মাস্টারদের মধ্যে স্বার্থান্বেষী, প্রিন্সিপল-বিহীন যাঁহারা (যেমন যদুবাবু), মিঃ আলমের দলে যোগ দিয়াছেন; ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু মনে মনে মিঃ আলমের দলে আছেন, মুখে কিছু বলেন না। কেবল নারাণবাবু ও নতুন টীচার রামেন্দু দত্ত নিরপেক্ষ, কোন দলেই নাই।

ই'হাদের মীটিং প্রতি দিন ছুটির পর তেতলার ঘরে হয়—নতুন টীচার ও নারাণবাবু সেখানে থাকেন না।

এই অবস্থার মধ্যে আসিল পুজোর ছুটির সপ্তাহ। শনিবারে ছুটি হইবে। ছেলেরা ক্লাসে ক্লাসে ছুটির দিন শিক্ষকদের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেছে। শিক্ষকদের মধ্যে কেহ কেহ গোপনে তাহাদের উসকাইয়া না দিতেছেন এমন নয়।

—কী রে, পড়াশুনো কিছুই হয় নি কেন? গ্রামার মুখস্থ ছিল, টাস্ক ছিল, কিছু করিস নি? খাওয়াতে ব্যস্ত আছিস বুঝি? কি ফর্দ করলি এবার?

ফর্দ শুনিয়া যদুবাবু উদাসীন ভাবে বলিলেন, এ আর তেমন কী হল—এবার থার্ড ক্লাসে যা করবে, শুনে এলুম—

ক্লাসের চাঁই বালকেরা সাগ্রহ কলরবে বলিয়া উঠিল, কী স্যার্—কী স্যার্—?

—আইস্ক্রিম, লুচি, আলুর দম, হরি ময়রার কড়াপাকের সন্দেশ—

—স্যার্, আমরাও করব আইস্ক্রিম।

—হরি ময়রার সন্দেশ স্যার্, কোথায় পাওয়া যায়?

—সে আমি তোদের এনে দেব, ভাবনা কী! পয়সা দিস আমার হাতে।

—কালই দেব চাঁদা তুলে।

—স্যার্, আপনার হাতে আমরা দশ টাকা দেব, আপনি যাতে থার্ড ক্লাসের চেয়ে ভাল হয়, তা কিন্তু করবেন।

থার্ড ক্লাসে গিয়া যদুবাবু বলিলেন, ওঃ, ছুটির টাস্কটা সবাই লিখে নে, ভুলে গিয়েচি একেবারে। তোদের এবার কী বন্দোবস্ত হচ্ছে রে? কিন্তু এবার ফোর্থ ক্লাসে যা হচ্ছে, তার কাছে তোরা পারবি নে।

শ্রীশবাবু ও জ্যোতির্বিনোদ অন্য অন্য ক্লাসে উস্কাইলেন। প্রতি বৎসর ক্লাসে ক্লাসে টেক্কা দিবার চেষ্টা করে।

ছুটির পর হেডমাস্টারের ঘরে নতুন টীচার গিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইলেন।

—স্যার্, আপনার সঙ্গে গোপনীয় কথা আছে—কখন আসব?

—ও, মিঃ দত্ত। তুমি সন্ধ্যার পর এসো—আজ আর টুইশানিতে যাব না।

—বেশ।

ছুটির পর প্রায় দেড় ঘণ্টা মাস্টারেরা থাকিয়া ছেলেদের সেকেন্ড টার্মিনাল পরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করিলেন, প্রোগ্রেস-রিপোর্ট লিখিলেন, বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সিজিল-মিজিল করিলেন—বড় একটা ছুটির আগে অনেক কাজ। অথচ সকলেই জানে, ছুটির মাহিনা কেহ পাইবে না। এই শারদীয় পুজোর সময়ে সকলকে শুধুহাতে বাড়ি যাইতে হইবে—উপায় নাই। ইহা যে স্বার্থত্যাগ প্রণোদিত ব্যাপার তাহা নহে, নিরুপায়ে পড়িযা মার খাওয়া মাত্র। এ চাকরি ছাড়িলে কোন্ স্কুলে হঠাৎ চাকরি মিলিতেছে?

সন্ধ্যার পর নতুন টীচার হেডমাস্টারের নিজের বসিবার ঘরের দরজায় কড়া নাড়িলেন।

—হ্যাঁ, এস। কাম্ ইন্—

নতুন টীচার ঢুকিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

—বোস মিঃ দত্ত, বোস। এক পেয়ালা চা?

—না, ধন্যবাদ। এই খেয়ে আসছি। মিস্ সিবসন্ কোথায়?

—উনি আজকাল পড়াতে বেরোন। ভাল টুইশানি পেয়েছেন—পঞ্চকোটের রাজ-কুমারীকে এক ঘণ্টা ইংরিজী পড়াতে—

—ও!

—কী কথা বলবে বলছিলে?

নতুন টীচার পকেট হইতে একটা কাগজ বাহির করিলেন। গলা ঝাড়িয়া বলিলেন, স্যার্, আপনি এবার কি কিছু দেবেন না আমাদের মাইনে?

—তোমায় তো দেখিয়েছি মিঃ দত্ত। স্কুলের আর্থিক অবস্থা তুমি আর মিঃ আলম জান, আর জানে নারাণবাবু। বেশী লোককে বলে কোনও লাভ নেই। স্কুলকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করছি প্রাণপণে। বাড়িওলা নালিশ করবে শাসিয়েছিল—তার পাঁচ শো টাকা দিতে হয়েছে। মিস্ সিবসন্‌কে দেড় শো টাকা দিতে হবে, উনি দার্জিলিং যাচ্ছেন। কিন্তু তার মধ্যে মোটে পঁচাত্তর দিতে পারছি। আমি এক পয়সা নিচ্ছি নে। এ আমাদের স্ট্রাগলের বছর, এ বছর যদি সামলে উঠি—সামনের বছর হয়-তো সুদিন আসবে। সকলকেই স্বার্থত্যাগ করতে হবে, কষ্ট স্বীকার করতে হবে এ বছরটাতে। বুঝলে না?

—হ্যাঁ স্যার্।

—তুমি কিছু চাও? কত দরকার বল?

—না স্যার্। আমি একরকম ম্যানেজ করে নেব। ধন্যবাদ স্যার্। এই ক'জনকে কিছু কিছু দিতেই হবে, যে করে হোক ম্যানেজ করুন।

নতুন টীচার হাতের কাগজ দেখিয়ে বলিতে লাগিলেন, ক্ষেত্রবাবু কুড়ি টাকা, জ্যোতির্বিনোদ পনেরো টাকা, শ্রীশবাবু আঠারো টাকা, হেডপণ্ডিত দশ টাকা, যদুবাবু কুড়ি—

সাহেব কুইনাইন সেবনের পরের অবস্থার মত মুখখানা করিয়া বলিলেন, ও, দীজ আর দি ট্রাবল্-মেকারস্—

—না স্যার্, এদের না হলে চলবে না। এদের অবস্থা সত্যিই খারাপ—প্রত্যেকেরই বিশেষ দরকার আছে। জ্যোতির্বিনোদের বাড়ি পৈতৃক পুজো, তাঁকে বাড়ি যেতে হবে, ভাড়া চাই। ক্ষেত্রবাবুর আবশ্যক আমি ঠিক জানি নে, তবে তাঁরও দরকার জরুরী। হেডপণ্ডিত পুজো করতে যাবেন দক্ষিণে শিষ্যবাড়ি। কাপড়-চোপড় নেই, কিনবেন। যদুবাবু—

—দি ফানি ওল্ড্ ফক্স্—

—যদুবাবুর স্ত্রী আজ তিন-চার মাস পড়ে আছেন জ্ঞাতির বাড়ি, তাঁদের সেখান থেকে না আনলে নয়—তাঁরা চিঠি লিখছেন কড়া কড়া। ট্রেনভাড়া খরচ চাই—

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, তোমার কাছে সবাই বলে, তোমাকে ধরেছে আমাকে বলতে। বুঝলাম।

—হাঁ, স্যার্।

—এ টাকা আমি যে করে হয় ম্যানেজ করব, তুমি যখন বলছ। তুমি নিজের জন্যে কিছু নেবে না?

—না স্যার্। আমার দুটো টুইশানির টাকা পাব—একরকম করে চালিয়ে নেব এখন। এখনও তো কত মাস্টারকে কিছু দেওয়া হচ্ছে না। শুধু এই ক'জনের নিতান্ত জরুরী দরকার, তাই—

—বেশ, কাল ও'দের বলো, টাকা দিয়ে দেব যে করেই হোক।

—আর একটা কথা স্যার্, যদি জানুয়ারি মাসে সুবিধে হয়, জ্যোতির্বিনোদের কিছু মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে। বড় গরিব।

—কেন, ওকে আমরা যা দিই, ওর বিদ্যাবুদ্ধির পক্ষে তা যথেষ্ট নয় কি?

—না স্যার্। ওর প্রতি অবিচার করবেন না। গরিব বড়—

—কিন্তু বড় ফাঁকিবাজ, ক্লাসে কিছু করে না। আরও দু-চার জন আছে ফাঁকিবাজ। তুমি ভাব, আমি তাদের চিনি নে? স্কুলের অবস্থা ভাল না বলে কিছু বলি নে। আচ্ছা, তোমার কথা মনে রইল, জানুয়ারি মাসে বেশী ছেলে ভর্তি হলে থার্ড পণ্ডিতের কেস্ আমি বিবেচনা করব।

নতুন টীচার বিদায় লইলেন।

যদুবাবু সত্যই বিপদে পড়িয়াছেন।

গত গ্রীষ্মের ছুটিতে স্ত্রীকে সেই যে গ্রামে শরিকের বাড়িতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, অর্থাভাবে তাহাকে আনিতে পারেন নাই। অবনী মুখুজ্জেকে টাকা ধার দিবেন বলিয়াছিলেন, সে অদ্য তিন মাস ধরিয়া তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া আসিয়াছে—নানা ছল ছুতা, সত্য মিথ্যা নানারূপ স্তোকবাক্যে তাহাকে কতদিন ঠেকাইয়া রাখিয়াছেন। যদুবাবুর স্ত্রী লিখিল, তুমি অবনী ঠাকুরপোকে টাকা দিবার কথা নাকি বলিয়া গিয়াছিলে, সে একদফা নিজে, একদফা তাহার দিদি ও স্ত্রীর দ্বারা আমার গায়ের ছাল খুলিয়া ফেলিতেছে, তোমার কাছে টাকা ধারের সুপারিশ করিতে। তুমি কোথা হইতে টাকা দিবে জানি না। তবে এমন বলিলেই বা কেন, তাহাও ভাবিয়া পাই না। যদি টাকা দিতে না পার, তবে আমাকে এখান হইতে সত্বর লইয়া যাইবে। ইহাদের খোঁটা ও গঞ্জনা আর আমার সহ্য হয় না।

যদুবাবু স্ত্রীকে স্তোকবাক্য দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, সে আজ দেড় মাসের কথা। তারপর স্ত্রীর যত চিঠি আসিয়াছে, তাহার কোন উত্তর দেন নাই।

দিবেনই বা কী করিয়া, স্কুলে দুই মাস খাটিয়া এক মাসের মাহিনা পাওয়া যায়—মাসের উনত্রিশ তারিখে গত মাসের মাহিনা যদি হইল, তবে মাস্টারেরা ভাগ্য প্রসন্ন বিবেচনা করেন। মেসের দেনা ঠিকমত দেওয়া যায় না—টুইশানি ছিল, তাই চলে। স্ত্রীকে ইহার মধ্যে আনেন কোথায়, বাসা করিবার খরচ জুটাইবেন কোথা হইতে—বলিলেই তো হইল না!

শনিবার পূজার ছুটি হইবে, আজ বৃহস্পতিবার। যদুবাবু টুইশানি করিয়া ফিরিবার পথে ভাবিতেছিলেন, ছুটিতে কি বেড়াবাড়ি যাইবেন? রামেন্দুবাবুকে ধরিয়াছেন, হেডমাস্টারকে বলিয়া-কহিয়া অন্তত কুড়িটা টাকা যাহাতে পাওয়া যায়। রামেন্দুবাবুর কথা আজকাল সাহেব বড় শোনে।

কিন্তু তা যেন হইল। এই সামান্য টাকা হাতে সেখানে গিয়া কী করিবেন? স্ত্রীকে আনিয়া কোথায়ই বা রাখেন? অর্থকষ্টের বাজারে বাসা করিবেনই বা কোন্ সাহসে, হাওয়ায় ভর করিয়া দাঁড়াইয়া এত ঝুঁকি লওয়া চলে না।

আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে যদুবাবু মেসের দরজায় ঢুকিতেই মেসের একটি লোক বলিয়া উঠিল—একটি ভদ্রলোক আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ থেকে। শ্রীশদা এখনও ছেলে পড়িয়ে ফেরেন নি, আপনাদের ঘরে আমি বসিয়ে রেখেছি আপনার সীটে।

যদুবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমার জন্যে? কোথা থেকে—

—তা তো জিগ্যেস করি নি। দেখুন না গিয়ে, আপনার সীটেই বসে আছেন! বললেন—এখানে খাব। আমি আবার ঠাকুরকে বলে দিলাম যদুবাবুর ফ্রেন্ড খাবে। নইলে রান্না-বান্না হয়ে যাবে, আপনি যখন ফিরবেন।

যদুবাবু দুরু দুরু বক্ষে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে ঢুকিতেই সম্মুখের সীট হইতে অবনী মুখুজ্জে দাঁত বাহির করিয়া একগাল হৃদ্যতার হাসি হাসিয়া বলিল, আসুন দাদা— এই যে! প্রণাম। ওঃ, কতক্ষণ থেকে বসে আছি!

যদুবাবুর হৃদস্পন্দন যেন এক সেকেণ্ডের জন্য থামিয়া গেল। চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তখনই কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, আরে অবনী যে! এস এস ভায়া। তারপর

সব ভাল? তোমার বউদিদি ভাল তো?

—হেঁ হেঁ দাদা, সব একরকম আপনার আশীর্বাদে—

—বেশ বেশ।

—তারপর দাদা এলাম, বলি, যাই দাদার কাছে। জঙ্গলে পড়ে থাকি, দুদিন মুখ বদলানো হবে, আর শহরে দেখে-শুনে আসিগে যাই থিয়েটার বায়োস্কোপ। দিন পনেরো কাটিয়ে আসি পুজোর মহড়াটা। ম্যালেরিয়ায় শরীর জরজর, একটু গায়ে লাগুক—দাদা যখন আছেন।

যদুবাবু পুনরায় কাষ্ঠহাসি হাসিলেন, তা বেশ তা বেশ! তবে—

—তারপর, আপনার কাছে বলতে লজ্জা নেই দাদা—ধার করে গাড়ির ভাড়াটি কোন-ক্রমে যোগাড় করে তবে আসা। হাতে কানা-কড়িটি নেই। বাড়িতে আপনার বউমার, ছেলেপুলের পরনে কাপড় নেই কারও—বছরকার দিন, পুজো আসচে। নিজেরও—দাদা, এই দেখুন না, সাত-পুরনো ধুতি, তাই পরে তবে—। বলি, যাই—দাদার কাছে, একটা হিল্লে হয়েই যাবে। আপাতত গোটা কুড়ি টাকা নিয়ে কাপড়গুলো তো কিনে রাখি। এর পর বাজার আক্রা হয়ে যাবে কিনা!

যদুবাবুর কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কী একটা কথা অস্ফুটভাবে উচ্চারিত হইল, ভাল বোঝা গেল না। অবনী তাহাকেই সম্মতিসূচক বাণী ধরিয়া লইয়া বলিল, না, কালই সকালে টাকাটা নিয়ে বাজার করে নিয়ে আসি। আর আপনি না দিলেই বা যাচ্ছি কোথায় বলুন! আপনার ওপর জোর খাটে বলেই তো আসা। না হয় দুটো বকবেন, না হয় মারবেন—কিন্তু ছোট ভাইয়ের আবদার না রেখে তো পারবেন না—হেঁ-হেঁ—

যদুবাবু বেচারী সারাদিন খাটিয়াছেন, সেই কোন্ সকালে দুইটি খাইয়া বাহির হইয়াছিলেন। রাত দশটা, এখন কোথায় খাইয়া ঘুমাইবেন—এ উপসর্গ কোথা হইতে আসিয়া জুটিল বল তো!

পাড়াগাঁয়ের দূরসম্পর্কের জ্ঞাতি, দেখাশুনা ঘটিত কালেভদ্রে, এখন মাখামাখি করিতে গিয়া মুশকিলেই পড়িয়া গেলেন। পাড়াগাঁয়ের লোকের সঙ্গে বেশী মাখামাখি করিতে নাই—ইহারা হাত পাতিয়াই আছে। পাড়াগাঁয়ের লোকের এ স্বভাব তিনি জানিতেন না যে তাহা নয়, কিন্তু বহুদিন কলিকাতায় থাকার দরুন ভুলিয়া গিয়াছিলেন, তাই আজ এ দুর্দশা। বলিলেন, চল, এস খাবে!

যদুবাবুর ঘরে সাতটি সীট—অর্থাৎ মেঝেতে ঢালা বিছানা পাতিয়া পাশাপাশি সাতটি ক্লান্ত প্রাণী শয়ন করে। তাহার মধ্যে অবনীকে গুঁজিয়া কোন রকমে শোওয়া চলিল। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক, সকলের সম্মুখে অভাব অভিযোগের কথা উচ্চৈঃস্বরে ব্যক্ত করিতে লাগিল। আর এত বকিতেও পারে! 'হাঁ হাঁ' দিতে দিতে যদুবাবুর মুখ ব্যথা হইয়া গেল।

সকালে উঠিয়া অবনীর জন্য চা ও খাবার আনাইয়া দিয়া যদুবাবু মেসের বাজার করিতে বাহির হইলেন, কারণ বাজার জিনিসটা তিনি করেন ভালই, এবং ইহা হইতে দুই-চারি আনা লাভও রাখিতে জানেন নিজের জন্য।

স্কুলে বাহির হইতে যাইবেন অবনী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, কখন আসচেন?

—কাল যে সময় এসেছিলাম, রাত হবে।

অবনী সকলের সামনেই বলিয়া বসিল, তা হলে দাদা, কাপড়ের টাকাটা আমায় দিয়ে যান, আজই কাপড়গুলো কিনে রাখি। আর ওবেলা ভাবছি বায়স্কোপ দেখব, তার দরুনও কিছু দিন, আমার ট্যাঁক যাকে বলে গড়ের মাঠ কিনা! হ্যা—হ্যা—

যদুবাবু তিন চার জন মেস্-বন্ধুর সামনে কী বলিবেন! বলিলেন, আমি এসে দেব এখন, এখন তো—। ইহাতে অবনী চেঁচাইয়া আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল, না দাদা, তা হবে না। আপনি দিয়েই যান—

যদুবাবু ফাঁপড়ে পড়িলেন। টাকা দিবেন কোথা হইতে? কুড়ি টাকা স্কুল হইতে লইবার সুপারিশ ধরিয়াছেন—হয়তো শনিবারের আগে সেই একমাত্র সম্বল কুড়িটি টাকাও

হাতে পাওয়া যাইবে না। টুইশানির টাকা হয়তো ও-বেলা মিলিবে। অবশ্য টাকা হাতে আসিলে অবনীকে তিনি দিবেন না নিশ্চয়ই, তাঁহার নিজের খরচ নাই? বলিলেন, এস, বাইরে আমার সঙ্গে।

পথে গিয়া বলিলেন, অমন করে সকলের সামনে বলতে আছে, ছিঃ! টাকা হাতে থাকলে তোমায় দিতাম না?

অবনী অনুযোগের সুরে বলিল, বা রে! আপনাকে তো কাল রাত থেকে বলছি। সত্যি দাদা, হাতে কিছুই নেই, চা-জলখাবারের পয়সাটি পর্যন্ত নেই। শুধু আপনার ভরসায় এখানে আসা—

—এই রাখ দু আনা পয়সা—চা খাবার খেয়ো। আমি স্কুল থেকে ফিরি, তারপর বলব। চললাম, বেলা হয়ে যাচ্ছে—

স্কুলে বসিয়া যদুবাবু আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। যখন আসিয়া পড়িয়াছে অবনী, তখন হঠাৎ এক-আধ দিনে চলিয়া যাইবে না। উহার স্বভাবই ওই, টাকা না লইয়া যাইবে না। দুই বেলা আট আনা ফ্রেন্ড চার্জ দিয়া উহাকে বসাইয়া খাওয়াইতে গেলে যদুবাবু স্কুল হইতে যে কয়টি টাকা পাইবেন, তাহা উহার পিছনেই ব্যয় হইয়া যাইবে। আর কেনই বা উহাকে তিনি এখানে জামাই-আদরে বসাইয়া খাওয়াইতে যাইবেন, কে অবনী? কিসের খাতির তাহার সঙ্গে?

আচ্ছা, যদি মেসে না ফিরিয়া তিনি পলাইয়া দুই দিন অন্যত্র গিয়া থাকেন, তবে কেমন হয়? মেসে শ্রীশকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়া দেন যদি—বিশেষ কাজে তিনি অন্যত্র যাইতেছেন, এখন দিন-বারো মেসে ফিরিবেন না! কেমন হয়! হইবে আর কী, অবনী সেই দশ দিন বসিয়া বসিয়া দিব্য খাইবে এখন তাঁহার খরচে।

সামনের শনিবার ছুটি। একদিন আগে কি ছুটি লইবেন?

সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে টুইশানি-শেষে যদুবাবু মেসে গিয়া দেখিলেন, অবনী নাই। চলিয়া গেল নাকি?

পাশের ঘরের সতীশবাবু বলিলেন, যদুবাবু, আসুন। আপনার ছোট ভাই সিনেমা দেখতে গিয়েছে, এখুনি আসবে। ছ'টার শোতে গিয়েছে।

—সিনেমা? আমার ছোট ভাই?

সতীশবাবু যদুবাবুর কথার সুরে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, যিনি কাল এসেছিলেন। আমায় বললেন, দাদার স্কুল থেকে আসতে দেরি হচ্ছে। বায়োস্কোপ দেখতে যাবার ইচ্ছে ছিল। তা বোধ হয় হল না। আমি বললাম—কেন হল না? উনি বললেন, টাকা নেই সঙ্গে, দাদার কাছে চাবি। মনে করে নিয়ে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমি বললাম—তা আর কী! যদুবাবু ফিরতে রাত হবে দশটা। আপনার কত দরকার, নিয়ে যান; পরস্পর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এসব—মেস-মেটের ভাই, আপনার কাছে নেই বলে কি আর অভাব ঘটবে?

—কত নিয়ে গেল?

—দু টাকা বললেন দরকার। আর দু টাকা নিয়েছেন বুঝি আপনার পিসিমার জন্যে কী ওষুধ কিনতে হবে—দোকান বন্ধ হলে আজ আর পাওয়া যাবে না—কাল সকালেই বুঝি উনি চলে যাবেন। তা থাক, তার জন্যে কী, এখন দেবার তাড়া নেই। মাইনে পেলে শনিবার দেবেন, এখন কাজটা তো হয়ে গেল।

যদুবাবু অতিকষ্টে রাগ সামলাইয়া ঘরে ঢুকিলেন এবং একটু পরেই অবনী সিনেমা হইতে ফিরিয়া ঘরে ঢুকিল। দাঁত বাহির করিয়া বলিল, এই যে দাদা, দেখে এলাম সিনেমা। থাকি গাঁয়ে পড়ে, ওসব দেখা অদৃষ্টে ঘটেই না তো। সতীশবাবুর কাছ থেকে গোটা চারেক টাকা নিয়ে গেলাম। কুড়ি টাকার মধ্যে চার টাকা সতীশবাবুকে, আর ষোলটা দে'বন আমায়।

যদুবাবু দেখিলেন, অবনী ধরিয়াই লইয়াছে—কুড়ি টাকা তাহার হাতের মুঠার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে। কুড়ি টাকা তো দূরের কথা, এই বহুকষ্টার্জিত টাকার মধ্যে চার টাকা এভাবে বাজে ব্যয় হওয়াই কি কম কষ্টকর? এ চার টাকা দিতেই হইবে ভদ্রতার খাতিরে।

যদুবাবুর বহু ভাগ্য যে, সে কুড়ি টাকা ধার করে নাই!

এমন মুশকিলে তিনি জীবনে কখনও পড়েন নাই। কেন মিছামিছি শরিক-জ্ঞাতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে গিয়াছিলেন! এখন তাহার ধাক্কা সামলাইতে প্রাণ যে যায়! যদুবাবুর ইচ্ছা হইল, তিনি হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিয়া হাত-পা ছোঁড়েন, অবনীকে ধরিয়া দুমদাম করিয়া কিল মারেন, কিংবা একদিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া যান। কিন্তু মেসের ভদ্রলোকদের মধ্যে কিছুই করিবার জো নাই। তিনি শান্তমুখে তামাক সাজিতে বসিয়া গেলেন।

অবনী উৎসাহের সঙ্গে সিনেমায় কী দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার গল্প সবিস্তারে আরম্ভ করিল। গল্প তাহার আর শেষ হয় না। যদুবাবু বলিলেন, চল, খেয়ে আসি।

অবনী হাসিয়া বলিল, আজ এখনও হয় নি। আজ যে আপনাদের মেসে ফিস্ট! আমি খোঁজ নিয়ে এলাম রান্নাঘরে, এখনও দেরি আছে।

সর্বনাশ! আট আনা ফ্রেন্ড্চার্জ আজ ফিস্টের দিনে! এ ভূতভোজন করাইয়া লাভ কী তাঁহার রক্ত-জলকরা পয়সায়!

অবনী পরের দিনও নড়িতে চাহিল তো না-ই, টাকার তাগাদা করিয়া যদুবাবুকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিল। রাত দশটায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, অবনী কাহার কাছে খবর পাইয়াছে, আগামী কাল শনিবার স্কুল বন্ধ হইবে, সুতরাং ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল, বলিল, দাদা, কাল মাইনে পাবেন দু মাসের, না? কাল চলুন, আপনার সঙ্গেই স্কুলে যাই —টাকা ষোলটা দিয়ে দিন, তিনটের গাড়িতে বাড়ি যাই। যদুবাবুর ভয়ানক রাগ হইল, কিন্তু এখানে স্পষ্ট কথা বলিতে গেলেই অবনী ঝগড়া বাধাইবে, তাহাও বুঝিলেন। পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত লোক, কাণ্ডজ্ঞানহীন। কেলেঙ্কারী একটা না বাধাইয়া ছাড়িবে না।

পরদিন ক্লাসের ছেলেরা খাওয়াইল। অবনী গিয়া জুটিল যদুবাবুর সঙ্গে।

যদুবাবু কুড়িটি টাকা বেতন পাইলেন—তাও রামেন্দুবাবুর সুপারিশে। ছুটির সারকুলার বাহির হইয়া গেল। সকলে কে কোথায় যাইবেন, পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করিতে লাগিলেন। মাস্টারেরা চায়ের দোকানে গিয়া মজলিস করিবে ঠিক ছিল, কিন্তু সাহেব তাহাদের লইয়া পাঁচটা পর্যন্ত মীটিং করিলেন।

মীটিংয়ের কার্যতালিকা নিম্নলিখিতরূপঃ—

(১) ছুটির পরেই বার্ষিক পরীক্ষা—কী ভাবে পড়াইলে ছেলেরা বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে।

(২) দেখা গিয়াছে, তৃতীয় শ্রেণীর ছেলেরা ইংরেজী ব্যাকরণে বড় কাঁচা। এই সময়ের মধ্যে কী প্রণালীতে শিক্ষা দিলে তাহারা উক্ত বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিতে পারে।

(৩) টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি পড়া ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

(৪) সপ্তম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রুতিলিখন থাকবে কি না! থাকিলে তাহাতে কত নম্বর থাকিতে পারে।

মিঃ আলম ক্ষেত্রবাবুর প্রশ্নপত্রের দুই স্থানে দুইটি ভুল বাহির করিলেন। পাঠ্য-তালিকার বাহিরে সেই দুইটি প্রশ্ন করা হইয়াছে—এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ওই দুইটি বিষয় নাই। সাহেবের আদেশে পাঠ্য-তালিকা দেখা হইল, ভুলই বটে। ক্ষেত্রবাবু অপ্রতিভ হইলেন।

ধরা পড়িল, যদুবাবু ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাসের প্রশ্ন এখনও তৈয়ারি করেন নাই। মিঃ আলম ধরিয়া দিলেন।

সাহেব বলিলেন, কী যদুবাবু?

যদুবাবু মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলেন, অত্যন্ত দুঃখিত স্যার্। এখুনি করে দিচ্ছি—

—মিঃ আলম ধরে না দিলে কী মুশকিলেই পড়তে হত!

—স্যার্, বড় ব্যস্ত ছিলাম। মন ভাল ছিল না।

—সে সব কথা আমি জানি না। কর্তব্য কাজে অবহেলা করে যে তার স্থান নেই আমার স্কুলে। মাই গেট্ ইজ—

—এবার মাপ করুন স্যার, আর কখনও এমন হবে না।

দোতলা হইতে নামিতেই অবনীর সহিত দেখা। সে সিঁড়ির নীচে তাঁহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। দাঁত বাহির করিয়া বলিল, মাইনে পেলেন দাদা?

যদুবাবুর বড় রাগ হইল—একে সাহেবের কাছে অপমান, অপরের সুপারিশে মাত্র কুড়ি টাকা প্রাপ্তি, তার উপর এইসব হাঙ্গামা সহ্য হয়?

যদুবাবু বলিলেন, না।

—মাইনে পান নি? পেয়েছেন দাদা।

—না, পাই নি। কেউই পায় নি।

অবনী একগাল হাসিয়া বলিল, দাদার যেমন কথা! দু মাসের মাইনে একসঙ্গে পেলেন বুঝি?

যদুবাবু বলিলেন, সত্যিই পাই নি। তুমি মাস্টারমশাইদের জিগ্যেস করে দেখ না?

—এক মাসের মাইনে দেবে না পুজোর সময়—তা কি কখনও হয়?

—এ স্কুলে এমনি নিয়ম। সাহেবের স্কুল, পুজোটুজো মানে না।

অবনী কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া রহিল, তারপর বলিল, তবে আমার টাকা দেবেন বললেন যে ও-বেলা?

—কোথা থেকে দেব বল? স্কুলের মাইনে যখন হল না, টাকা পাব কোথায়?

অবনী কথাটা উড়াইয়া দিবার মত তাচ্ছিল্যের সুরে বলিল, আপনার আবার টাকার ভাবনা! না হয় ডাকঘর থেকে তুলে কিছু দিন দাদা, এখনও সময় যায় নি—

যদুবাবু অবনীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরস কণ্ঠে কহিলেন, ডাকঘরে এক পয়সাও নেই আমার। দিতে পারব না।

অবনী আরও কিছুক্ষণ কাকুতি-মিনতি করিল, রাগ করিল, ঝগড়া করিল, যদুবাবুকে কৃপণ বলিল, তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন বাড়িতে জায়গা দিয়া রাখিয়াছে সে খোঁটাও দিতে ছাড়িল না। যদুবাবুর এক কথা—তিনি টাকা দিতে পারিবেন না।

তিনি মাত্র কুড়ি টাকা মাহিনা পাইয়াছেন, তাহা হইতে কিছু দেওয়ার উপায় নাই।

অবনীর হৃদ্যতা আগেই উবিয়া গিয়াছিল, সে বলিল, তা হলে টাকা দেবেন না আপনি?

কথা যেন ছুঁড়িয়া মারিতেছে।

যদুবাবু বলিলেন, না।

—বেশ। কিন্তু আপনাকে চিনে রাখলাম, বিপদে আপদে লাগব না কি আর কখনও? আচ্ছা, চলি।

কিছু দূর গিয়া তখনই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, হ্যাঁ, বউদিদিকে ওখানে রাখার আর সুবিধে হচ্ছে না। কালই গিয়ে তাঁকে নিয়ে আসবেন, বলে দিচ্ছি। এত অসুবিধে করে পরের বউকে জায়গা দেবার ভারি তো লাভ! সব চিনি, এক কড়ার উপকারে কেউ লাগে না। কেবল মুখে লম্বা লম্বা কথা—

অবনী চলিয়া গেল। যদুবাবু স্কুলের বাহিরে আসিলেন ভাবিতে ভাবিতে। ক্ষেত্রবাবু পিছন হইতে আসিয়া বলিলেন, চল হে যদুদা, একটু চা খাই সবাই মিলে।

—আর চা খাব কী, মন বড় খারাপ।

—কী হল? তুমি তবুও কুড়ি টাকা পেলে। আমাদের তো এক পয়সাও না।

—না হে, তোমার বউদিদি রয়েছে বেড়াবাড়ি—সেই পাড়াগাঁ। তাকে এবার না আনলেই নয়। কিন্তু এনে কোথায় বা রাখি?

—এখন না-ই বা আনলে দাদা! নিজের বাড়িতেই তো রয়েছেন। থাকুক না। এখন পুজোর সময়, দেশে পুজো দেখুন না! গাঁয়ে পুজো হয় তো?

যদুবাবু গর্বের সহিত বলিলেন, আমার বাড়িতেই পুজো। শরিকী পুজো। আর, বেড়াবাড়ির জমিদার তো আমরা। মস্ত বাড়ি, আমার অংশেই এখনও (যদুবাবু মনে মনে গণনা করিলেন) পাঁচখানা ঘর, ওপর নীচে। বাড়িতেই পুকুর, বাঁধা ঘাট। আমার স্ত্রী সেখানেই রয়েছে, আসতে চায় না, বলে—বেশ আছি। হয়েছে কী ভায়া, নামে তালপুকুর,

ঘটি ডোবে না। আছে সবই, এখনও দেশে গেলে লোকজন ছুটে দেখা করতে আসে, বলে —বড়বাবু বিদেশে পড়ে থাকেন কেন? দেশে আসুন, আপনার ভাবনা কী? কিন্তু ম্যালেরিয়া বড্ড। তেমন আয়ও নেই পুরনো আমলের মত। নামটাই আছে। নইলে কি আর বত্রিশ টাকা সাত আনায় পড়ে থাকি এই স্কুলে, রামোঃ!

যদুবাবু ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ারের বেঞ্চিতে বসিয়া মনে মনে বহু আলোচনা করিলেন। স্ত্রীকে এখন কলিকাতায় আনা অসম্ভব।

কুড়ি টাকা মাত্র সম্বলে বাসা করিয়া এক মাসও চালাইতে পারিবেন না। বেড়াবাড়ি এখন গেলে অবনী দস্তুরমত অপমান করিবে তাঁহাকে। সুতরাং তিনি কলিকাতায় মেসেই থাকিবেন, স্ত্রী কাঁদাকাটা করিলে কী হইবে?

যদুবাবুর স্ত্রী পূজার মধ্যে স্বামীকে পাঁচ-ছয়খানা লম্বা লম্বা পত্র লিখিল। সে সেখানে টিকিতে পারিতেছে না, অবনীর দিদির ও স্ত্রীর খোঁটা এবং দুর্ব্যবহারে তাহার জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে আর থাকিতে হইলে সে গলায় দড়ি দিবে, ইত্যাদি।

যদুবাবু লিখিলেন, তিনি এখন রামপুরহাটের জমিদারের বাড়িতে টুইশানি পাইয়াছেন, ছুটি লইয়া এখন দেশে যাইবার কোনও উপায় নাই। তাহারা তাঁহাকে বড় ভালবাসে, ছাড়িতে চায় না!

সর্বৈব মিথ্যা।

স্কুলে ঢুকিবার পূর্বে গেটের কাছে একদল ছাত্র ভিড় জমাইয়া তুলিয়াছে। যদু-বাবুকে দেখিয়া ক্লাস নাইনের একটি বড় ছেলে আগাইয়া আসিয়া বলিল, আজ স্কুলে ঢুকবেন না স্যার, আজ আমাদের স্ট্রাইক, কেউ যাবে না স্কুলে।

যদুবাবুর মুখ অপ্রত্যাশিত আনন্দে উজ্জ্বল দেখাইল। এও কি সম্ভব হইবে? আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলেন? স্ট্রাইক হওয়ার অর্থ সারাদিন ছুটি। এখনই বাসায় ফিরিয়া দুপুরে দিব্য নিদ্রা দিবেন, তারপর বিকালের দিকে উঠিয়া তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ি আছে মঙ্গলা লেনে, সেখানে সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত দাবা খেলিবেন। মুক্তি!

এই সময় শ্রীশবাবু ও মিঃ আলম একসঙ্গে গেটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে ছেলেরা তাঁহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আজ রামতারক মিত্র গ্রেপ্তার হওয়ার দরুন—দেশবিখ্যাত নেতা রামতারক মিত্র—কলিকাতার সমগ্র ছাত্রসমাজে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, স্কুল-কলেজের ছাত্রদল মিলিয়া বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিবে ও-বেলা।

মিঃ আলম বলিলেন, আমাদের যেতেই হবে। আর তোমাদেরও বলি, আমি চাই না যে, এ স্কুলের ছাত্রেরা কোন পলিটিক্যাল আন্দোলনে যোগ দেয়। চলুন যদুবাবু, শ্রীশবাবু—

যদুবাবু মনে মনে ভাবিলেন, গিয়ে সইটা করেই ছুটি, কেউ আসছে না স্কুলে।

হেডমাস্টার স্ট্রাইকের কথা জানিতেন না। তিনি সকালে উঠিয়া খয়রাগড়ের রাজ-বাড়িতে টুইশানিতে গিয়াছিলেন, ফিরিয়া সব শুনিলেন। নিজে গেটে দাঁড়াইয়া ছেলে-দের বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন অনেক—তাঁহার কথা কেহ শুনিল না। টীচার্স রুমে বসিয়া বসিয়া মাস্টারেরা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যদুবাবু বলিলেন, হ্যাঁঃ, শুনছে আজ ক্লার্কওয়েল সাহেবের কথা! তুমিও যেমন! কোথায় রামতারক মিত্তির—অত বড় লীডার আর কোথায় ক্লার্কওয়েল—ফোতো স্কুলের ফোতো হেডমাস্টার!

কিন্তু মাস্টারদের আশা পূর্ণ হইল না। একটু পরেই হেডমাস্টারের স্লিপ লইয়া মথুরা চাপরাসী আসিল, নীচু দিকের ক্লাসে ছোট ছোট ছেলেরা অনেক সকালেই আসে—বিশেষত তাহারা দেশনেতা রামতারক মিত্রের বিরাট ব্যক্তিত্বের বিষয়ে কিছুই জানে না; সুতরাং মাস্টার ও অভিভাবকের ভয়ে যথারীতি ক্লাসে আসিয়াছে। তাহাদের লইয়া ক্লাস করিতে হইবে।

উপরের দিকের ক্লাসের মাস্টার যাঁহারা, এ আদেশে তাঁহাদের কোন অসুবিধা হইল না; কেন না, উপরের কোন ক্লাসে একটি ছাত্রও আসে নাই। ধরা পড়িয়া গেলেন শ্রীশবাবু

প্রভৃতি, যাঁহাদের প্রথম ঘণ্টায় নীচের দিকে ক্লাস আছে।

যদুবাবু চতুর্থ শ্রেণীতে ঢুকিয়া দেখিলেন, জন পাঁচ-ছয় ছোট ছেলে বসিয়া আছে। ওপাশে ক্লাস সেভেন্-এ জনপ্রাণীও আসে নাই, সুতরাং প্রথম ঘণ্টার শিক্ষক হেডপণ্ডিত দিব্য উপরের ঘরে বসিয়া আড্ডা দিতেছেন, অথচ তাঁহার—

রাগে দুঃখে যদুবাবু ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া কটমট করিয়া চারিদিকে চাহিলেন। এই হতভাগাগুলোর জন্যই এই শাস্তি—যদি এই বদমাইসগুলো না আসিত, তবে আজ তাঁহার দিবানিদ্রা রোধ করে কে?

কড়া বাজখাঁই সুরে হাঁকিলেন, আজ পুরনো পড়া ধরব—নিয়ে আয় বই—ছাল তুলব আজ পিঠের, যদি পড়া ঠিকমত না পাই—

ছোট ছোট ছেলেরা তাঁহার রাগের কারণ ঠাহর করিতে না পারিয়া গা টেপাটিপি করিতে লাগিল পরস্পর। একটি ছেলে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, আজ তো পুরনো পড়ার কথা ছিল না স্যার!

যদুবাবু দাঁত খিঁচাইয়া বলিলেন, পুরনো পড়া আবার বলা থাকবে কী? ও যে দিন ধরব, সেই দিনই বলতে হবে—দেখাচ্ছি সব মজা, কোন ক্লাসের ছেলে স্কুলে আসে নি, ওঁরা এসেছেন—ওঁদের পড়বার চাড় কত। ছাল তুলছি আজ পড়া না পারলে—

দুই-একটি বুদ্ধিমান ছেলে ততক্ষণে তাঁহার রাগের কারণ খানিকটা বুঝিয়াছে। একজন বলিল, স্যার, না এলে বাড়িতে বকে, বলে—ওপরের ক্লাসের ছেলেরা স্ট্রাইক করেছে তা তোদের কী? সেই আষাঢ় মাসে স্ট্রাইকের সময় এরকম হয়েছিল—

আর একটি অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ছেলে বলিল, স্যার্, বলেন তো পালাই।

যদুবাবু সুর নরম করিয়া বলিলেন, পালাবি কোথা দিয়ে? ইস্কুলের গেটে হেড-মাস্টার তালা দিয়ে রেখেছেন।

ক্লাসসুদ্ধ ছেলে বলিয়া উঠিল প্রায় সমস্বরে, গেটের দরকার কী স্যার্? আপনি বলুন, টিনের বেড়া রয়েছে পেছনে, ওর তলা দিয়ে গলে বেরিয়ে যাব।

—তবে তাই যা। কাউকে বলিস নে। রেজেস্ট্রি হয় নি তো এখনও—পালা। একে একে যা।

নীচের তলায় আশপাশের ক্লাসে ছেলে নাই, কারণ, সেগুলি বড় ছেলেদের ক্লাস। কেবল পূর্বদিকের কোণে হল-ঘরের পাশের ক্লাসে গুটি-কয়েক ছোট ছেলে লইয়া জ্যোতির্বিনোদ বিরক্তমুখে বসিয়া আছে। যদুবাবু বলিলেন, ওহে জ্যোতির্বিনোদ, ওগুলোকে যেতে দাও না।

জ্যোতির্বিনোদ যেন দৈববাণী শুনিল, এব্ম্প্রভাবে লাফাইয়া উঠিয়া আগ্রহের সুরে বলিল, দেব ছেড়ে? সাহেব কিছু বলবে না তো?

যদুবাবু মুখে কোনদিনই খাটো নহেন, ব্যঙ্গের সুরে বলিলেন, ও সব ভাবলে তবে বসে ক্লাস করো সেই বেলা তিনটে পর্যন্ত (ছোট ছেলেদের তিনটের সময় ছুটি হইয়া যায়)। এই তো আমি ছেড়ে দিলাম—

—আপনারা সব বড় বড়, আমরা হলাম চুনোপুঁটি, সব তাতেই দোষ হবে আমাদের।

—কিছু না, ছেড়ে দাও সব। এই, যা সব পালা—টিনের পার্টিশনের তলা দিয়ে পালা। স্ট্রাইকের দিন স্কুল করতে এসেছে! ভারি পড়ার ছাড়!

জ্যোতির্বিনোদও সুরে সুর মিলাইয়া বলিল, দেখুন দিকি কাণ্ড যত—পড়ে তো সব উল্টে যাচ্ছেন একেবারে। যা সব একে একে! রোতো, গোল করবি তো হাড় ভাঙব মেরে, কেউ টের না পায়—

কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাস প্রায় খালি হইয়া গেল।

যদুবাবু উপরে গিয়া বলিলেন, কোথায় ছেলে? দু-একটা এসেছিল, কে কোথা দিয়ে পালিয়ে গেল ধরতেই পারা গেল না—

ক্ষেত্রবাবু ছুটির দিনই রাত্রির ট্রেনে বর্ধমান রওনা হইলেন।

পরদিন সকালের দিকে বর্ধমান স্টেশনে নামিয়া প্ল্যাটফর্মের উত্তর দিকে মালগুদামের ও পার্সেল-আপিসের পিছনে দাদার কোয়ার্টারে গিয়া ডাক দিলেন, ও বউদি!

—এস এস ঠাকুরপো। মনে পড়ল এতদিন পরে? তা ভাল আছ বেশ? আমায় শশীবাবুর বউ রোজই বলেন—হ্যাঁ দিদি, তোমার সে ঠাকুরপো কবে আসবেন? আমি বলি—তা কী করে জানব? কলেজে কাজ করেন, বড় চাকরি, ছুটি না হলে তো আসতে পারেন না। তা ছেলেমেয়েদের কোথায় রেখে এলে?

—ওরা তাদের পিসীমার কাছে রইল কালীঘাটে—মেজদিদির কাছে।

—বেশ, এসেছ, ভালই হয়েছে। এবার একটা যা হয় ঠিক করে ফেল। ওঁদের মেয়ে বড় হয়েছে, তোমার ভরসাতেই আছে। আর তোমাকে সংসার যখন করতেই হবে, তখন আর দেরি করা কেন. আমি বলি। ব'সো হাত-পা ধোও, চা করি।

ক্ষেত্রবাবু এইরূপ একটা অস্পষ্ট আশার গুঞ্জনধ্বনি সারারাত ট্রেনের মধ্যে কানের কাছে শুনিয়াছেন—চলমান বাতাসে সে আভাস আসিয়াছিল। বাসায় পা দিতেই এমন কথা শুনিবেন, তাহা কিন্তু ভাবেন নাই।

ক্ষেত্রবাবু পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার জাঠতুতো দাদা গোবর্ধনবাবু সন্ধ্যার সময় ডিউটি হইতে ফিরিয়া বলিলেন, এই যে, ক্ষেত্র কখন এসে? চা খেয়েছ? স্কুল কবে—কাল বন্ধ হল? বেশ।

গোবর্ধনবাবু পাকা লোক। যে খুড়তুতো ভাই আজ সাত আট বছরের মধ্যে কখনও ঘনিষ্ঠতা করা দূরের কথা বছরে দুইখানি পোস্টকার্ডের পত্র দিয়া খোঁজখবর লইত কি না সন্দেহ, সেই ভাই কাল স্কুল বন্ধ হইতে না হইতে কলিকাতা হইতে বর্ধমানে আসিয়া হাজির, এ নিশ্চয়ই নিছক ভ্রাতৃ-প্রেম নয়। গোবর্ধনবাবু মনে মনে হাসিলেন।

চা-জলখাবার-পর্বান্তে ক্ষেত্রবাবু তাঁহারই সমবয়সী শ্রীগোপাল মজুমদার অ্যাসিস্ট্যান্ট স্টেশনমাস্টারের বাড়ি বেড়াইতে গেলেন। রেলওয়ে সমাজে পরস্পরকে উপাধি দ্বারা সম্বোধন করাই প্রচলিত।

ক্ষেত্রবাবুকে সেখানেও একদফা চা খাবার খাইতে হইল। মজুমদার বলিল, তারপর ক্ষেত্রবাবু, শুনছিলাম একটা কথা—

ক্ষেত্রবাবুর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করিয়া উঠিল। বুঝিয়াও না-বুঝিবার ভান করিয়া বলিলেন, কী কথা?

—আমাদের মুখুজ্জের ভাইঝির সঙ্গে নাকি আপনার—

ক্ষেত্রবাবু সলজ্জ হাসিয়া বলিলেন, না না, কই না—আমার তো—

—না, আমি বলি, দ্বিতীয় সংসার করার ইচ্ছে যদি থাকে, তবে এখানেই করে ফেলুন—মেয়েটি বড় ভাল।

ক্ষেত্রবাবু দুই-একবার বলি-বলি করিয়া অবশেষে বলিলেন, মেয়ে? ও! দেখেচেন নাকি?

—কে, অনিলা? অনিলাকে ফ্রক পরে বেড়াতে দেখেছি। আমাদের বাসায় আমার ভাগ্নী বিমলার সঙ্গে খুব আলাপ।

—ও!

—বেশ মেয়ে। দেখতে তো ভালই, ঘরের কাজকর্ম সব জানে। চলুন না, পায়ে পায়ে মুখুজ্জের বাসায় যাই। আপনি এসেছেন, বোধ হয় জানে না।

ক্ষেত্রবাবু জিভ কাটিয়া বলিলেন, আরে, তা কখনও হয়? না না। আমি যাব কেন?

—আমরা যে ক'জন আছি স্টেশনের কোয়ার্টারে—সব এক ফ্যামিলির মত। এখানে কুটুম্বিতে করি না কেউ কারও সঙ্গে। সে বারে ওই মল্লিকবাবুর মা মারা গেল, আটাত্তর বছর বয়সে। রাত দেড়টা, আমি এইটিন ডাউন সবে পাস্ করে টিকিটের হিসেব চালানে এনট্রি করছি, এমন সময় বাসা থেকে লোক গিয়ে বললে—শীগগির চল, এই রকম ব্যাপার। সেই রাত্তিরে মশাই রেলওয়ে কোয়ার্টারের ক'টি প্রাণী, বলি ব্রাহ্মণ আর কায়েস্থ কী, হিন্দু তো বটে—ঘাড়ে করে নিয়ে গেলুম শ্মশানে। তা এখানে ওসব নেই। চলুন, যাওয়া যাক।

ক্ষেত্রবাবুর যাওয়ার ইচ্ছা যে না হইয়াছিল তাহা নয়, কিন্তু দাদা কী মনে করিবেন, এই ভয়ে মজুমদারের কথায় রাজী হইতে পারিলেন না।

পরদিন বেলা দশটার সময় ক্ষেত্রবাবু বাসায় বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, এমন সময় একটি মেয়ে এক বাটি তেল আনিয়া সামনে রাখিয়া সলজ্জ সুরে বলিল, দিদি বললেন আপনাকে নেয়ে আসতে।

ক্ষেত্রবাবু চাহিয়া দেখিলেন, সতেরো-আঠারো বছরের মেয়েটি। বেশী ফরসাও না, বেশী কালোও না। মুখশ্রী ভাল।

—ও! বউদিদি বললেন?

ক্ষেত্রবাবু যেন একটু থতমত খাইয়া গিয়াছেন, কথার সুরে ধরা পড়িল।

মেয়েটি হাসি চাপিতে চাপিতে বলিল, হ্যাঁ।—এই কথা বলিয়াই সে চলিয়া গেল।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, কে মেয়েটি, কখনও তো দেখেন নাই একে! এ সেই মেয়েটি নয় তো?

স্নান করিয়া খাইতে বসিয়াছেন, সেই মেয়েটিই আসিয়া ভাতের থালা সামনে রাখিল। আবার ফিরিয়া গিয়া ডালের বাটি আনিয়া দিল। খাওয়ার মধ্যে মেয়েটি অনেক বার যাতায়াত করিল। ক্ষেত্রবাবু দুই-একবার মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, মুখখানি ভাল ছাড়া মন্দ বলিয়া মনে হইল না তাঁহার কাছে। ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না, দাদা পাশে বসিয়া খাইতেছেন। আহারাদির পর ক্ষেত্রবাবু বিশ্রাম করিতেছেন, সেই মেয়েটিই আসিয়া পান দিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবুর কৌতূহল হইল জানিবার জন্য মেয়েটি কে, কিন্তু কখনও অপরিচিতা মেয়ের সঙ্গে কথা কওয়ার বা মেলামেশার অভিজ্ঞতা না থাকায় চুপ করিয়া রহিলেন। গরিব স্কুলমাস্টার, তেমন সমাজে কখনও যাতায়াত নাই।

এ দিন এই পর্যন্ত। মেয়েটি আর আসিল না সারাদিনের মধ্যে। কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর মন যেন তাহার জন্য উৎসুক হইয়া রহিল সারাদিন। মুখখানি বেশ। সেই মেয়েটি নাকি? কী জানি! লজ্জায় কথাটা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। পরে আরও দুই দিন গেল, মেয়েটির কোন চিহ্ন নাই কোন দিকে। হঠাৎ তৃতীয় দিয়ে মেয়েটি সকালে চায়ের পেয়ালা রাখিয়া গেল সামনে। ক্ষেত্রবাবুর বুকের মধ্যে কিসের একটা ঢেউ চলকিয়া উঠিল। মেয়েটি দোরের কাছে একটুখানি দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল এবং আর কিছুক্ষণ পরে আবার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কি আর এক পেয়ালা চা দোব?

—চা! তা বেশ।

—আনব?

—হ্যাঁ।

মেয়েটি এবার চলিয়া যাইতেই ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, লজ্জা কিসের—এবার তিনি জিজ্ঞাসা করিবেনই। সেই মেয়েটি নয়, ও অন্য কেউ, পাশের কোন বাসার মেয়ে। কী জাতি, তাহারই বা ঠিক কী! তা হোক, একটু আলাপ করিতে দোষ নাই।

এবার চা আনিতেই ক্ষেত্রবাবু লাজুকতা প্রাণপণে চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি বুঝি পাশের বাসাতেই থাকেন?

মেয়েটি যেন এতদিন ক্ষেত্রবাবুর কথা কহিবার আশায় ছিল, বহুবিলম্বিত ব্যাপারের অপ্রত্যাশিত সংঘটনে প্রথমটা নিজে যেন কিছু থতমত খাইয়া গেল। পরে বেশ সপ্রতিভ-ভাবেই আঙুল তুলিয়া অনির্দেশ্য একটা বাসার দিকে দেখাইয়া বলিল, পাশে না, ও-ই দিকে আমাদের বাসা।

—ও!

ক্ষেত্রবাবু আর কথা খুঁজিয়া পান না। মেয়েটি যেন আশা করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে, তিনি আবার কথা বলিবেন। ক্ষেত্রবাবু পুনরায় মরীয়া হইয়া বলিলেন, আপনার বাবা বুঝি রেলে কাজ করেন?

—পার্সেল-আপিসে কাজ করেন।

—বেশ।

মেয়েটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া ক্ষেত্রবাবু আকাশ-পাতাল ভাবিয়া জিজ্ঞাসা

করিলেন, আপনি পড়েন বুঝি?

—এখন বাড়িতেই পড়ি, গার্লস্ স্কুলে থার্ড ক্লাস পর্যন্ত পড়েছিলাম, এখন বড় হয়েছি তাই আর স্কুলে যাই নে।

মেয়েটি যে কয়টি ইংরেজী কথা বলিল, সবগুলির উচ্চারণ স্পষ্ট ও জড়তাশূন্য, অশিক্ষিত উচ্চারণ নয়। ইংরেজী-জানা মেয়ে ক্ষেত্রবাবু এ পর্যন্ত দেখেন নাই, মেয়েটির প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, এখানে বুঝি গার্লস্ স্কুল আছে?

—বেশ বড় স্কুল তো, আড়াই শো মেয়ে পড়ে।

—হেডমিস্ট্রেস্ কে?

—আমাদের সময়ে ছিলেন মিস্ সুকুমারী দত্ত বি-এ, বি-টি। এখন কে এসেছেন জানি নে।

বা রে, মেয়েটি 'বি-টি'র খবর পর্যন্ত রাখে। স্কুলমাস্টার ক্ষেত্রবাবু প্রশংসায় বিগলিত হইয়া উঠিলেন মনে মনে। যেন কোনও অদৃষ্টপূর্ব কিছু দেখিতেছেন। বেশ মেয়েটি তো!

—আপনাদের স্কুলে পুরুষ মানুষ টীচার নেই বুঝি?

—নীচের দিকে একজন আছেন ভুবনবাবু বলে, বুড়ো মানুষ। আমরা দাদু বলে ডাকতাম।

—পড়ানো বেশ ভাল হত স্কুলে? অংক কষাতেন কে?—ক্ষেত্রবাবু এবার কথা কহিবার বিষয় খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

—নীহার-দি—মিস্ নীহার তালুকদার, ওঁরা ব্রাহ্ম।

বাঃ, মেয়েটি ব্রাহ্মদের খবরও রাখে। এত বাহিরের খবর-জানা মেয়ে সাধারণ গৃহস্থ-ঘরে বড় একটা দেখা যায় না, অন্তত ক্ষেত্রবাবু তো দেখেন নাই। ইচ্ছা হইল, খানিকক্ষণ মেয়েটির সঙ্গে গল্প করেন; কিন্তু সাহসে কুলাইল না। কে কী মনে করিতে পারে!

পরদিন বৈকালে ক্ষেত্রবাবুর বউদিদি বলিলেন, শশীবাবুদের বাসায় তোমার আর ওঁর নেমন্তন্ন।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, শশীবাবু কে? সেই তাঁরা?

বউদিদি হাসিমুখে বলিলেন, হ্যাঁ গো, সেই তারাই তো।

—সেখানে কি যাওয়া উচিত হবে?

—কেন?

—একটা আশা দেওয়া হবে, কিন্তু--

—কিন্তু কী? তুমি বিয়ে করবে কি না, এই তো?

—হ্যাঁ—তা—সেই রকমই ভাবছিলাম—

—কেন, মেয়ে পছন্দ হয় নি?

ক্ষেত্রবাবু আকাশ হইতে পড়িলেন। তিনি তখনই ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া ফেলিলেন। বউদিদির ষড়যন্ত্র। তাহা হইলে শশীবাবুদের বাসার সেই মেয়েটি! হাসিয়া বলিলেন, সব আপনার কারসাজি। তখন তা ভাবি নি যে, ওই মেয়ে! ও!

—মেয়ে খারাপ?

ক্ষেত্রবাবু দেখিলেন, হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত খেলো করিয়া লাভ নাই, ওজনে ভারী থাকা মন্দ নয়। বলিলেন, মেয়ে? হ্যাঁ—না, তা খারাপ নয়। তবে 'আহা মরি'ও কিছু নয়।

—মনের কথা বলছ ঠাকুরপো? সত্যি বল, তোমার পছন্দ হয় নি? অনিলার কিন্তু তোমাকে পছন্দ হয়েছে।

ক্ষেত্রবাবুর সতর্কতার বাঁধ হঠাৎ ভাঙিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি আগ্রহপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কী, কী, কী রকম?

ক্ষেত্রবাবুর বউদিদি খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তবে নাকি ঠাকুরপোর মন নেই? আমাদের কাছে চালাকি? সত্যি তা হলে ভাল লেগেছে? তবে আমিও বলছি শোন, অনিলা তোমাকে দেখতেই এসেছিল আসলে। অবিশ্যি ছুতো করে এসেছিল। আমি যেন কিছু বুঝি নি, এই ভাবে বললাম, কলকাতা থেকে আমাদের একজন আত্মীয়

এসেছে, বাইরে বসে আছে, চা-টা দিয়ে এস—ভাতটা দিয়ে এস। একা পারছি নে। তাই ও গিয়েছিল। বার বার পাঠালে ভাল হয়, এমনি মনে হল। আজকালকার সব বড়সড় মেয়ে। ওদের ধরনই আলাদা। যেয়ো কিন্তু।

রাত্রে সেই মেয়েটিই ক্ষেত্রবাবুদের পরিবেষণ করিল। কিন্তু করিলে কী হইবে, দাদা পাশেই বসিয়া। ক্ষেত্রবাবু লজ্জায় মুখ তুলিয়া চাহিতেও পারিলেন না। খাওয়া-দাওয়া মিটিয়া গেল। ছোট রেলওয়ে-কোয়ার্টারের বাহিরের ঘরে ক্ষুদ্র তক্তাপোশে শতরঞ্চির উপর ক্ষেত্রবাবু আসিয়া বসিলেন। বাড়ির কর্তা হঠাৎ ক্ষেত্রবাবুর দাদাকে কোথায় ডাকিয়া লইয়া গেলেন। অল্প পরেই সেই মেয়েটি একটা চায়ের পিরিচে চারটি পান আনিয়া তক্তাপোশের এক কোণে রাখিল। ক্ষেত্রবাবু একটা বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিলেন, ও, এটা আপনাদের বাসা? আমি প্রথমটা বুঝতে পারি নি—

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু চলিয়া গেল না।

ক্ষেত্রবাবু আর কথা খুঁজিয়া পান না। মেয়েটি যখন সামনেই দাঁড়াইয়া, তখন বেশীক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলে বড় খারাপ দেখায়। চট করিয়া মাথায় কিন্তু আসেও না ছাই। তখন যে কথাটা আজ দুই দিন হইতে মনে হইতেছে প্রায় সব সময়েই, সেটাই বলিলেন, রেলের বাসাগুলো বড় ছোট, না?

—হ্যাঁ।

—এতে আপনাদের অসুবিধে হয় না?

—আমাদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। এই তো রেলে রেলেই বেড়াচ্ছি কতদিন থেকে—ও সরে গিয়েছে! জ্ঞান হয়ে পর্যন্ত এই রকমই দেখছি।

—এর আগে কোথায় ছিলেন আপনারা?

—আসানসোলে। তার আগে পাকুড়। তার আগে ছিলাম সক্রিগলি জংশন। তখন আমার বয়স সাত বছর, কিন্তু সব মনে আছে আমার।—

মেয়েটি বেশ সহজ সুরেই কথা বলিতে লাগিল, যেন ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে তার অনেক দিনের পরিচয়।

—আচ্ছা, আপনাদের দেশ কোথায়?

—হুগলী জেলায় আরামবাগ সাব-ডিভিশনে। কিন্তু সে বাড়িতে আমরা যাই নি কোনদিন। রেলের চাকরিতে ছুটি পান না বাবা। আমার ভাইয়ের পৈতের সময় বাবা বলেছেন যাবেন।

মেয়েটি তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করে না, নিজে হইতেও কোনও কথা বলে না; কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য যেন উন্মুখী হইয়া থাকে। এ এমন এক অবস্থা, ক্ষেত্রবাবুর পক্ষে যাহা সম্পূর্ণ নূতন। নিভাননীর সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল, তখন তাঁহার বয়স উনিশ, নিভাননীর দশ। তখন নারীর মনের আগ্রহ বুঝিবার বয়স হয় নাই তাঁহার। এতকাল পরে—এসব নূতন ব্যাপার জীবনের।

—আচ্ছা, আপনারা অনেক দেশ ঘুরেছেন, পাহাড় দেখেছেন?

—তিনপাহাড়ী বলে একটা স্টেশন আছে লুপ লাইনে। সেখানে বাবা কিছুদিন রিলিভিং-এ ছিলেন, সেখানে পাহাড় দেখেছি।

—আপনি তো দেখেছেন, আমি এখনও দেখি নি।

মেয়েটি বিস্ময়ের সুরে বলিল, আপনি পাহাড় দেখেন নি?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, নাঃ, কোথায় দেখব? বরাবর কলকাতাতেই আছি। স্কুলের ছুটি থাকলেও টুইশানির ছুটি নেই। যাতায়াত বড় একটা হয় না। আপনাদের বড় মজা, পাসে যাতায়াত করতে পারেন।

মেয়েটি বিস্ময়ের সুরে বলিল, ওঃ ওঃ! খু-উ-ব।

—গিয়েছেন কোথাও?

—দুমকায় আমার এক পিসেমশায় চাকরি করেন, দুমকা রাজস্টেটে। সেখানে মার সঙ্গে গিয়ে মাসখানেক ছিলাম একবার। আর একবার পুরী যাওয়ার সব ঠিকঠাক, আমার ছোট ভাইয়ের অসুখ হল বলে বাবা পাস ফেরত দিলেন। সামনের বছর যাবেন বলেছেন।

ও, আপনাকে আর দুটো পান দি—

—না না, আমি বেশী পান খাই নে। বরং খাবার জল এক গ্লাস যদি—

—আনি।—বলিয়াই মেয়েটি বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় (অখণ্ড সুখ জীবনে পাওয়া যায় না), তখনই বাহির হইতে শশীবাবুর সহিত ক্ষেত্রবাবুর দাদা গোবর্ধনবাবু ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, ক্ষেত্র, তা হলে চল যাই।

একটু পরে জলের গ্লাস হাতে মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিঃশব্দে গ্লাসটি তক্তা-পোশের কোণে রাখিয়া কিঞ্চিৎ দ্রুতপদেই চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু ও তাঁহার দাদাও বিদায় লইয়া আসিলেন।

সেই দিনই রাত্রে ক্ষেত্রবাবু বউদিদির কাছে প্রকারান্তরে বিবাহে মত প্রকাশ করিলেন। পরবর্তী তিন-চারি দিনের মধ্যে সব ঠিকঠাক হইয়া গেল, সামনের অগ্রহায়ণ মাসের দোসরা ভাল দিন আছে। বরপণ এক শো এক টাকা নগদ ও দশ ভরি সোনার গহনা। ঠিকুজী কোষ্ঠী মিলিলে কথাবার্তা পাকা হইবে।

ক্ষেত্রবাবু দাদাকে বলিলেন, দাদা, আমি তা হলে কাল যাব।

—এখনই কেন? আর দু-চার দিন থাক না?

—না দাদা, খোকাখুকী রয়েছে পড়ে সেখানে। যাই একবার।

যাইবার পূর্বদিন পুনরায় শশীবাবুর বাড়ি তাঁহার নিমন্ত্রণ হইল। এ দিন কিন্তু ক্ষেত্রবাবুর উৎসুক দৃষ্টি চারি দিক খুঁজিয়াও মেয়েটির টিকি দেখিতে পাইল না।

বার্ষিক পরীক্ষা চলিতেছে। হেডমাস্টারের তাড়নায় মাস্টারেরা অতিষ্ঠ। বড় হলে যদুবাবু ও শরৎবাবু পাহারা দিতেছেন, হঠাৎ মিঃ আলম তদারক করিতে আসিয়া ধরিয়া ফেলিলেন, দুইজন ছাত্র টোকাটুকি করিতেছে।

মিঃ আলম বলিলেন, আপনারা কী দেখছেন যদুবাবু! কত ছেলে টুকছে—

যদুবাবু দেখিতেছিলেন না সত্যই—এ স্কুলে ঊনিশ বৎসর হইয়া গেল তাঁহার। সাহেব আসিবার অনেক আগে হইতে এখানে ঢুকিয়াছেন। নতুন মাস্টার যাহারা, খুব উৎসাহের সঙ্গে এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে, তাঁহার সে বয়স পার হইয়া গিয়াছে। তিনি চেয়ারে বসিয়া ঢুলিতেছিলেন।

সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়াইতে হইল দুইজনকেই। সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দুইজনের দিকে চাহিলেন।

—কী যদুবাবু, আপনার হলে এই দুজন ছাত্র টুকছিল—আপনি দেখেন না, আপনাদের কৈফিয়ত কী?

—দেখছিলাম স্যার্।

—দেখলে এ রকম হল কেন?

—ছেলেরা বড় দুষ্টু স্যার্,—কী ভাবে যে টোকে—

—চেয়ারে বসে পাহারা দেওয়ায় কাজ হয় না। বিশেষ করে যদুবাবু, আপনার আর মনোযোগ নেই স্কুলের কাজে অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করছি। এ স্কুলে আপনার আর পোষাবে না।

যদুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

—আর শরৎবাবু, আপনি নতুন এসেছেন, আজ দু বছর। কিন্তু এখনি এমনি গাফিলতি কাজের, এর পরে কী করবেন? আপনাদের দ্বারা স্কুলের কাজ আর চলবে না। এখন যান আপনারা, ছুটির পরে একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

যদুবাবু রাগ করিয়া হলে ঢুকিয়া প্রত্যেক ছেলের পকেট খানাতল্লাশ করিলেন, ফলে প্রকাশ পাইল—(১) থার্ড ক্লাসের এক ছেলের পকেট হইতে একখানা ইতিহাসের বইয়ের পাতা, (২) ক্লাসের আর একটি ছেলের কোঁচায় লুকানো একখানি আস্ত ইতিহাসের বই, (৩) নারাণবাবুর ছাত্র চুনির খাতার মধ্যে চার-পাঁচখানা কাগজে নানারূপ নোট লেখা, (৪) সেভেন্থ্ ক্লাসের একটি ছেলের ডেস্ক হইতে দুইখানি বই—একখানি ইংরেজী

ইতিহাসের বই, (এবেলা আছে ইতিহাসের পরীক্ষা) আর একখানি হইল ভূগোল, যাহার পরীক্ষা ওবেলা আছে। বোঝা গেল, ইতিহাসের বই হইতে কিছু আগেও সে টুকিতেছিল।

সব কয়জনকে হেডমাস্টারের কাছে হাজির করা হইল। সাহেবের হুকুমে তাহাদের এবেলা পরীক্ষা দেওয়া রহিত হইয়া গেল। বাড়িতে তাহাদের অভিভাবকদের কাছে পত্র গেল। নারাণবাবুর ছাত্র চুনি বাড়ি যাইতেছিল, নারাণবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন।—হ্যাঁ চুনি, তুমি নোট লিখে এনেছিলে?

চুনি চুপ করিয়া রহিল।

—কেন এনেছিলে? কার কাছ থেকে লিখে এনেছিলে? ও লিখে আনা কি তোমার উচিত হয়েছে?

—না স্যার।

—তবে আনলে কেন?

—আর কখনও আনব না।

—তা তো আনবে না বুঝলাম। এদিকে একটা পেপার পরীক্ষা দিতে পারলে না। পাস-নম্বর থাকবে কী করে, তাই ভাবছি।...চুনি, খিদে পেয়েছে? কিছু খাবি? আয় আমার ঘরে।

নিজের ছোট ঘরটাতে লইয়া গিয়া নারাণবাবু পিঠে হাত দিয়া কত ভাল ভাল কথা বুঝাইলেন- মিথ্যা দ্বারা কখনও মহৎ কাজ হয় না ইত্যাদি। গীতার শ্লোক পড়িয়া শোনাইলেন। ছোলা-ভিজা ও চিনি এবং আধখানা পাঁউরুটি খাওয়াইলেন। চুনি যাইবার সময় বলিল, স্যার, একটা কথা বলব? বাড়ি গিয়ে কোন কথা বলবেন না যেন—

—না, আমার যেচে বলবার দরকার কী! কিন্তু হেডমাস্টারের চিঠি যাবে তোমার বাবার নামে।

চুনির মুখ শুকাইল। বলিল, কেন স্যার?

—তাই সাহেবের নিয়ম।

—আপনি হেড স্যারকে বুঝিয়ে বলুন না। আপনি বললেই—

—যা, বাড়ি যা এখন—দেখি আমি।

চুনি চলিয়া গেলে নারাণবাবু ভাবিতে লাগিলেন, চুনির এ অসাধু প্রকৃতিকে কী করিয়া ভিন্ন পথে ঘুরাইবেন। আজ যেভাবে বলিলেন, ও ঠিক পথ নয়। গীতার শ্লোক বলা উচিত হয় নাই—অতটুকু ছেলে গীতার কথা কী বুঝিবে? তাঁহার নোটবুকে টুকিয়া রাখিলেন—চুনি- মিথ্যা ব্যবহার, হাউ টু করেক্ট্ অনুকূলবাবু হইলে কী করিতেন? নারাণবাবু গভীর দুশ্চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

চায়ের দোকানে বসিয়া সে দিন যদুবাবু আস্ফালন করিতেছিলেনঃ এক পয়সার মুরোদ নেই স্কুলের—আবার লম্বা লম্বা কথা! ডিউটি, ট্রুথ! আরে মশাই, পুজোর ছুটির মাইনে দু টাকা এক টাকা করে সে দিন শোধ হল।

গরিব মাস্টারেরা কী খায় বল তো?

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, না পোষায়, চলে যেতে পারেন দাদা। সাহেবের গেট্ ইজ্ ওপেন—

রামেন্দুবাবু আর নতুন টীচার নন—দু-তিন বছর হইয়া গেল এ স্কুলে, তিনি সব দিন এ মজলিসে থাকেন না, আজ ছিলেন। বলিলেন, জানুয়ারি মাস থেকে মাইনে কাটা হবে, জানেন না বোধ হয়?

সকলেই চমকিয়া উঠিলেন। যদুবাবু ও জগদীশ জ্যোতির্বিনোদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, কে বললে? অ্যাঁ, আবার মাইনে কাটা!

—জানুয়ারি মাসে ছাত্র ভর্তি না হলে মাইনে কাটা হবেই।

—এই সামান্য মাইনে, এও কাটা হবে! আপনি একটু বলুন হেডমাস্টারকে—

—বলেছিলাম। কিন্তু বাজেট্ যা, তাতে মাইনে না কাটলে মাস্টারদের মধ্যে দু-এক-জনকে জবাব দিতে হবে কাজ থেকে। তার চেয়ে সকলকে রেখে মাইনে কাটা ভাল।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, সে যাকগে, যা হয় হবে। এখন সাহেবের কাছে একটা

দরখাস্ত দেওয়া যাক আসুন, যাতে মাসের মাইনেটা ঠিক সময় পাই। আড়াই মাস খেটে এক মাসের মাইনে নিয়ে এভাবে তো আর পারা যাচ্ছে না।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, ও করতে যাবেন না। তাতে ফল হবে না। আমি কি ও নিয়ে বলি নি ভাবছেন?

যদুবাবু বলিলেন, না, আপনি যা বলেন, তার ওপর আমাদের কথা কওয়ার দরকার কী! যা ভাল হয় করবেন।

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া কে একজন বলিলেন, আজ যে নারাণদাকে দেখছি নে?

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, যখন আসি, ঘরে উঁকি মেরে দেখি, তিনি লিখছেন বসে বসে একমনে। আমি আর ডাকলাম না।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, ওই একজন বড় খাঁটি সিন্‌সিয়ার লোক, সে কালের গুরুর মত। ও টাইপ আজকাল বড় একটা দেখা যায় না এ ব্যবসাদারির যুগে। আচ্ছা, আমি এখন চলি—বসুন।

বসিবার সময় নাই কাহারও। সকলকেই এখনই টুইশানিতে যাইতে হইবে।

ক্ষেত্রবাবু চায়ের দোকান হইতে পাশেই শ্রীনাথ পালিতের লেনে বাসায় গেলেন। পনেরো টাকা ভাড়ায় দুইখানি ঘর একতলায়, ছোট্ট রান্নাঘর। এক দিকে সিঁড়ির নীচে কয়লা রাখিবার জায়গা। অন্ধকার কলঘরে একজন লোক দিনমানে ঢুকিলেও বাহির হইতে হঠাৎ দেখিবার জো নাই। তারের আলনায় কাপড় শুকাইতেছে। বাড়িওয়ালী শুচিবেয়ে বুড়ী, গামছা পরিয়া ঝাঁটা হাতে উঠানে জল দিয়া ঝাঁট দিতেছে ও ধুইতেছে।

অনিলা বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল, দেরি হল যে?

—কোথায় দেরি? কানু কই?

—সে বলখেলা দেখতে গিয়েচে, ইন্টার-স্কুল ম্যাচ্ আছে কোথায়। চা খাবে?

—না, এই খেয়ে এলাম দোকান থেকে।

অনিলা হাত-পা ধুইবার জল আনিয়া একটা ছোট টুল পাতিয়া দিল, একখানা গামছা টুলের উপর রাখিল। তারপর একটা বাটিতে মুড়ি মাখিয়া এক পাশে একটু গুড় দিয়া স্বামীকে খাইতে দিল। ক্ষেত্রবাবু হাত মুখ ধুইয়া জলযোগ সমাপনান্তে টুইশানিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অনিলা বলিল, একটু জিরোবে না?

—না, দেরি হয়ে যাবে।

—অমনি বাজার থেকে ছোট খুকীর জন্যে একটা বার্লি কিনে এনো, আর জিরে মরিচ।

—আর কী কী নেই দেখ।

—আর সব আছে, আনতে হবে না।

বড় খুকী এই সময়ে বলিল, বাবা, আমার জন্যে একটা পেন্সিল কিনে এনো—আমার পেন্সিল নেই।

অনিলা বলিল, পেন্সিল আমার কাছে আছে দেব এখন! ম'নে করে দিস কাল সকালে।

ক্ষেত্রবাবু মাসখানেক হইল, নতুন বাসায় উঠিয়া আসিয়া নতুন সংসার পাতিয়াছেন। মন্দ লাগিতেছে না। নিভাননীর মৃত্যুর পরে দিনকতক বড় কষ্ট গিয়াছিল, এখন আবার একটু সেবাযত্নের মুখ দেখিতেছেন। চিরকাল স্ত্রী লইয়া সংসার-ধর্ম করায় অভ্যস্ত স্ত্রীবিয়োগের পর সব যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকিত। অসুবিধাও ছিল বিস্তর, আট বছরের খুকীকে গৃহিণী সাজিতে হইয়াছিল, কিন্তু খুকী যতই প্রাণপণে চেষ্টা করুক, অনভিজ্ঞা শিশু মেয়ে কি তাহার মায়ের স্থান পূর্ণ করিতে পারে?

আবার সংসারে আয়না-চিরুনীর দরকার হইতেছে, সিঁদুরের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে স্নো পাউডার কিনিবার প্রয়োজন তো আসিয়া পড়িল। চিরকাল যে গরুর কাঁধে জোয়াল

ছাড়া পাইলে অনভ্যস্ত মুক্তির অভিজ্ঞতা তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তোলে। মনে হয়, সংসার হইল না, কাহার জন্য খাটিয়া মরিব, কে আমার অসুখ হইলে মুখে একটু জল দিবে—ইত্যাদি। যে বলিষ্ঠ ও শক্তিমান মন মুক্তির পরিপূর্ণতাকে ভোগ করিতে পারে, নির্জনতার ও উদাস মনোভাবের মধ্য দিয়া জীবনে নব নব দর্শন ও অনুভূতিরাজির সম্মুখীন হয়—নিরীহ স্কুল-মাস্টার ক্ষেত্রবাবুর মন সে ধরনের নয়। কিন্তু না হইলে কী হয়? যে ভাবে যে জীবনকে ভোগ করিতে পারে, সেই ভাবেই জীবন তাহার নিকট ধরা দেয়—ইহাতেই তাহার সার্থকতা। বাঁধা-ধরা নিয়ম কী-ই বা আছে জীবনকে ভোগ করিবার?

ক্ষেত্রবাবু ছাত্রদের একতলা কুঠুরির অন্ধকূপে গিয়া ভীষণ গরমের মধ্যে পাখার তলায় অবসন্ন দেহ একখানা ইংরেজী ডিক্‌শনারির উপর এলাইয়া দিয়া পড়ানো শুরু করিলেন। আগে বেশ সময় কাটিত এখানে। এখন মনে হয়, অনিলার সঙ্গে গিয়া কতক্ষণে দুইদণ্ড কথা বলিবেন! ছাত্রও ছাড়ে না, এটা বুঝাইয়া দিন, ওটা বুঝাইয়া দিন করিতে করিতে রাত সাড়ে নয়টা বাজাইয়া দিল। তারপর আসিল ছাত্রের কাকা। সে এফ-এ ফেল, কিন্তু তাহার বিশ্বাস ইংরেজীতে তাহার মত পণ্ডিত আর নাই, ভুল ইংরেজীতে সে ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে আলোচনা করিতে লাগিল, কী ভাবে ছেলেদের ইংরেজী শিখাইতে হয়। আজকালকার প্রাইভেট মাস্টারেরা ফাঁকিবাজ, পড়াইতে জানে না, কেবল মাহিনা বাড়াও—এই শব্দ মুখে। তারপর সে আবার দেখিতে চাহিল, আজ ক্ষেত্রবাবু ছেলেদের কী পড়াইয়াছেন, কালকার পড়া বলিয়া দিয়াছেন কি না, টাস্ক দিয়াছেন কি না!

লোকটার হাত এড়াইয়া রাত দশটার সময় ক্ষেত্রবাবু বাসার দিকে আসিতেছেন, এমন সময়ে পথে রাখাল মিত্তিরের সঙ্গে দেখা। ক্ষেত্রবাবু পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিয়াও পারিলেন না, রাখাল মিত্তির ডাকিয়া বলিল, এই যে! ক্ষেত্রবাবু যে! শুনুন, শুনুন—

—রাখালবাবু যে। ভাল আছেন?

—কই আর ভাল, খেতেই পাই নে, তার ভাল! আপনারা তো কিছু করবেন না।—বলিতে বলিতে রাখালবাবু ক্ষেত্রবাবুর দিকের ফুটপাথে আসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আসুন না, কাছেই আমার বাসা। একটু চা খেয়ে যান। সে দিন আপনাদের স্কুলে গিয়েছিলাম আমার বই দুখানা নিয়ে। সাহেব তো কিছু বোঝে না বাংলা বইয়ের, আপনারা একটু না বললে আমার বই ধরানো হবে না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, এত রাত্তিরে আর যাব না রাখালবাবু, এখন চা খায় কেউ? আমি যাই—

—তবে আসুন, এই মোড়েই চায়ের দোকান, খাওয়া যাক একটু।

অগত্যা ক্ষেত্রবাবুকে যাইতে হইল। রাখালবাবু নাছোড়বান্দা লোক, অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় ক্ষেত্রবাবু জানেন, ইহার হাতে পড়িলে নিস্তার নাই। চা খাইতে খাইতে রাখালবাবু বলিলেন, এবার মশাই, ধরিয়ে দিতে হবে আমার বই দুখানা। আপনাদের মিঃ আলম ভারী বদ লোক, আমায় বলে কি না—ও সব চলবে না, আজকাল অনেক ভাল বই বেরিয়েচে। আমি বলি, তোমার বাবা আমার বই পড়ে মানুষ হয়েচে, তুমি আজ এসেচ রাখাল মিত্তিরের বইয়ের খুঁত ধরতে?

রাখাল মিত্তিরকে ক্ষেত্রবাবু বহুদিন জানেন। বয়স পঁয়ষট্টি, জীর্ণ অতি মলিন লংক্লথের পিরান গায়ে, তাতে ঘাড়ের কাছে ছেঁড়া, পায়ে সতেরো-তালি জুতা। রাখালবাবু কলিকাতার স্কুলসমূহে অতি পরিচিত, পনেরো বছর হইল স্কুল-মাস্টারি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য বই স্কুলে স্কুলে শিক্ষকদের ধরিয়া চালাইয়া দেন। তাহাতেই কায়ক্লেশে সংসার চলে।

ক্ষেত্রবাবুর দুঃখ হয় রাখালবাবুকে দেখিয়া। এই বয়সে লোকটা রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, টো-টো করিয়া স্কুলে স্কুলে সিঁড়ি ভাঙিয়া উঠানামা করিয়া বই-চালানোর তদ্বির করিয়া বেড়ায়। কিন্তু বিশেষ কিছু হয় না। লোকটার পরন-পরিচ্ছদেই তাহা প্রকাশ।

বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, না না, আপনার বই খারাপ কে বলে! চমৎকার বই!

রাখাল মিত্তির খুশী হইয়া বলিল, তাই বলুন দিকি! সকলে কি বোঝে? আপনি

একজন সমজদার লোক, আপনি বোঝেন! আরে, এ কালে ব্যাকরণ জানে কে? আমি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে ব্যাকরণে ফার্স্ট হই, আমার মেডেল আছে, দেখাব।

—বলেন কী!

—সত্যি। আপনি আমার বাসায় কবে আসচেন বলুন, দেখাব।

—না, দেখাতে হবে কেন! আপনি কি আর মিথ্যে বলছেন!

—সে দিন অমনি এক স্কুলের হেডমাস্টার বললে—মশাই, আপনার বই পুরনো মেথডে লেখা। ও এখন আর চলে না। এখন কত নতুন অথর বেরিয়েচে, তাদের বইয়ের ছাপা, ছবি কাগজ অনেক ভাল। আপনার বই আজকাল ছেলেরাই পছন্দ করে না। শুনলেন? আরে, রাখাল মিত্তিরের বই পড়ে কত অথর সৃষ্টি হয়েচে। অথর! আমাকে এসেছেন মেথড শেখাতে। পয়সা হাতে পাই তো ভাল ছাপা ছবি আমিও করতে পারি। কিন্তু কী করব, খেতেই পাই নে, চলেই না। বুড়ো বয়সে লোকের দোর দোর ঘুরে বই কখানা ধরাই, তাতেই কোন রকমে—ছেলেটা আজ যদি মরে না যেত, তবে এত ইয়ে হত না। ধরুন, পঁচিশ বছরের জোয়ান ছেলে, আজ বাঁচলে চৌত্রিশ বছর বয়স হত। আমার ভাবনা কী?

—আচ্ছা, আমি দেখব চেষ্টা করে। এখন উঠি রাখালবাবু, রাত অনেক হল।

—এই শুনুন, নব ব্যাকরণ-সুধা প্রথম ভাগ—ফোর্থ ক্লাসের জন্যে। নব ব্যাকরণ-সুধা দ্বিতীয় ভাগ থার্ড ক্লাসের উপযুক্ত, আর এবার নতুন একখানা বাংলা রচনা লিখেছি, রচনাদর্শ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। খুব ভাল বই, পড়ে দেখবেন। সব রকমের রচনা আছে তাতে। কী ভাষা! ব্যাটারা সব বই লিখেছে. রচনা হয় কারও? কোনও ব্যাটা বাংলা সেণ্টেন্স্ শুদ্ধ করে লিখতে জানে? নিয়ে আসুন বই, আমি পাতায় পাতায় ভুল বার করে দেব—একবার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কৃৎ' প্রত্যয়ের—চললেন যে, ও ক্ষেত্রবাবু, আচ্ছা। তা হলে শনিবার বই নিয়ে যাব, শুনুন—মনে থাকবে তো? দেবেন একটু বলে হেড-মাস্টারকে। আর শুনুন, বাংলা রচনাও একখানা নিয়ে যাব—যাতে হয়, একটু দেবেন বলে—নমস্কার—

ক্ষেত্রবাবু শেষের কথাগুলি ভাল শুনিতে পাইলেন না, তখন তিনি একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছেন।

বাসায় অনিলা তাঁহার ভাত ঢাকা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ক্ষেত্রবাবু ভাবেন, ছেলে-মানুষ—এত রাত পর্যন্ত জাগিয়া থাকার অভ্যাস নাই, সারাদিন খাটিয়া বেড়ায়। স্ত্রীকে ডাক দেন, অনিলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসে. স্বামীকে দেখিয়া অপ্রতিভ হয়। বলে, এত রাত আজ?

—ঘুমুচ্ছিলে বুঝি?

অনিলা হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, খোকাখুকীদের খাইয়ে দিলাম, তারপর একখানা বই পড়তে পড়তে কখন ঘুম এসে গিয়েচে—

ক্ষেত্রবাবু আহারাদি করিলেন। অনিলা বলিল. হ্যাঁ গা, রাগ কর নি তো, ঘুমুচ্ছিলাম বলে?

—বাঃ, বেশ! রাগ করব কেন?

—আমার বার্লি আর জিরে-মরিচ এনেচ?

—ওই যাঃ! একদম ভুলে গিয়েচি। ভুলব না? যদি বা ছাত্রের কাকার হাত এড়িয়ে বেরুলাম, তো পড়ে গেলাম রাখাল মিত্তিরের হাতে। সব স্কুলের সব মাস্টার ওকে এড়িয়ে চলে। একবার পাকড়ালে আর নিস্তার নেই।

—সে কে?

—অথর।

—কী কী বই আছে? কই. নাম শুনি নি তো?

—শুনবে কি—বঙ্কিমবাবু, না রবি ঠাকুর, না শরৎ চাটুজ্জে? স্কুলের—স্কুলের বই লেখে, নব কবিতাপাঠ, বাল্যবোধ—এই সব। বড্ড গরিব, হাতেপায়ে ধরে বই চালায়। ছিনে জোঁক।

—একদিন এনো না বাসায়, দেখব। আমি অথর কখনও দেখি নি—একদিন চা খাওয়াব।

—রক্ষে কর। তুমি চেন না রাখাল মিত্তিরকে। বাসায় আনলে আর দেখতে হবে না। সে কথাই তুলো না।

—বড়লোক?

—খেতে পায় না। বই চলে না। সেকেলে ধরনের বই, একালে অচল। ওই যে বললাম, নাছোড়বান্দা হয়ে ধরে-পেড়ে চালায়।

অনিলার লেখাপড়ার উপর খুব অনুরাগ দেখিয়া ক্ষেত্রবাবুর আনন্দ হয়। নিভাননী লেখাপড়া জানিত সামান্যই; অনিলা মন্দ লেখাপড়া জানে না, ইংরেজীও জানে। বই পড়িতে ভালবাসে বলিয়া শাঁখারিটোলার লাইব্রেরি হইতে ক্ষেত্রবাবু গত মাস হইতে বই আনিয়া দেন, দুইখানা বই একদিনেই কাবার। সম্প্রতি স্কুলের লাইব্রেরি হইতে ছোট ছোট ইংরেজী বই আসে—অনিলার সেগুলি পড়িতে একটু সময় লাগে।

অনিলা সব সময় সব কথার মানে বুঝিতে পারে না। বলে, হ্যাঁ গা, হপ মানে কী? বইয়েতে আছে এক জায়গায়—

—লাফিয়ে লাফিয়ে চলা।

—উঁহু, লাফানো নয়, কোন গাছপালা হবে। লাফানো হলে সে জায়গায় মানে হয় না।

—ওহো, ও একরকমের লতা, চাষ হয় ইংলণ্ডে, বিশেষ করে স্কট্ল্যাণ্ডে। মদ চোলাই হয় লতা থেকে, হুইস্কি বিশেষ করে—

ছোট খুকী ঘুমের ঘোরে ভয় পাইয়া কাঁদিয়া উঠিতে অনিলা ছুটিয়া গেল!

বেলা চারিটা বাজে। হেডমাস্টারের সারকুলার বাহির হইল, ছুটির পরে জরুরী মীটিং, কোন মাস্টার যেন চলিয়া না যায়। মাস্টারদের মুখ শুকাইল। দুই দিন আগে সাহেব ক্লাসে ঘুরিয়া পড়ানোর তদারক করিযা গিয়াছেন, আজ সেই সব ব্যাপারের আলোচনা হইবে, কাহার না জানি কী খুঁত বাহির হইয়া পড়িল!

যদুবাবু ফাঁকিবাজ মাস্টার, তাঁহার খুঁত বাহির হইবেই তিনি জানেন। অনেক দিন অনেক তিরস্কার খাইয়াছেন, বড় একটা গ্রাহ্য করেন না।

মীটিংয়ে হেডমাস্টার বলিলেন, সে দিন আপনাদের ক্লাসে পড়ানো দেখে খুব আনন্দিত হওয়ার আশা করেছিলাম; দুঃখের বিষয়, সে আনন্দলাভ ঘটে নি। টীচারদের কর্তব্য সম্বন্ধে আপনাদের অনেকবার বলেছি, কিন্তু তবুও এমন কতকগুলি টীচার আছেন, যাঁদের বার বার সে কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, এটা বড় দুঃখের কথা। রামবাবু?

একটি ছিপছিপে ছোকরা-গোছের মাস্টার দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, স্যার্?

—আপনি ফিফ্থ ক্লাসে জিওগ্রাফি পড়াচ্ছিলেন, কিন্তু ম্যাপ নিয়ে যান নি কেন?

রামবাবু নিরুত্তর।

—কতবার না বলেছি, ম্যাপ না দেখলে জিওগ্রাফি পড়ানো—

এইবার রামবাবু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন স্যার্, দেশের কথা পড়ানো হচ্ছিল না, বাংলা দেশের উৎপন্ন দ্রব্য পড়াচ্ছিলাম, তাই—

—ও! উৎপন্ন দ্রব্য পড়ালে ম্যাপ নিয়ে যেতে হবে না? কেন, বাংলা দেশের ম্যাপ নেই? —আর ক্ষেত্রবাবু?

ক্ষেত্রবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—আপনি রচনা শেখাচ্ছিলেন থার্ড ক্লাসে। কিন্তু শুধু সামনের বেঞ্চিতে যারা বসে আছে, তাদের দিকে চেয়ে কথা বলছিলেন, পেছনের বেঞ্চির ছাত্ররা তখন গল্প করছিল। ক্লাসসুদ্ধ ছেলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পারলে আপনার পড়ানো বৃথা হয়ে গেল, বুঝতে পারলেন না? তা ছাড়া ব্ল্যাকবোর্ড আদৌ ব্যবহার করেন নি সে ঘণ্টায়। পাণ্ডিট?

পণ্ডিত বলিতে কোন্ পণ্ডিত, বুঝিতে না পারিয়া দুই পণ্ডিতই উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব জ্যোতির্বিনোদের দিকে আঙুল দিয়া বলিলেন, আপনি বাংলা পড়াচ্ছিলেন ফোর্থ ক্লাসে! আপনি কি ভাবেন, খুব চেঁচিয়ে পড়ালেই ভাল পড়ানো হয়? আপনি নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিচ্ছিলেন, নামতা পড়ানোর সুরে চিৎকার করে পড়াচ্ছিলেন, ফলে, ইউ ফেল্ড্ টু ক্যারি দি ক্লাস উইথ ইউ।

পরে হেডপণ্ডিতের দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া রহস্যের সুরে বলিলেন, তা বলে ভাববেন না, আপনার পড়ানো নিখুঁত। আপনি এক জায়গায় বসে পড়ান, সামনের বেঞ্চিতে দৃষ্টি রাখেন এবং মাঝে মাঝে অবান্তর গল্প করেন। যদুবাবু?

যদুবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

—আপনার কোন দোষই গেল না। আমার মনে হয়, আপনার কাজে মন নেই। আপনার দোষের লিস্ট এত লম্বা হয়ে পড়ে যে, তা বলা কঠিন। আপনি কোনদিন ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহার করেন না, ক্লাসে ছেলেদের প্রশ্ন করেন না, টাস্ক্ দেন না—সে দিন বায়ুপ্রবাহের গতি বোঝাচ্ছিলেন, গ্লোব নিয়ে যান নি ক্লাসে। গ্লোব না নিয়ে গেলে—

এমন সময় একটি ছাত্রকে মীটিংয়ের ঘরের মধ্যে উঁকি মারিতে দেখিয়া হেডমাস্টার ধমক দিয়া বলিলেন, কী চাই? এখানে কেন?

ছাত্রটি মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, স্যার্, ফোর্থ ক্লাসের ধীরেনের চোখে বল লেগে চোখ বেরিয়ে এসেছে—

সকলেই লাফাইয়া উঠিলেন।

হেডমাস্টার বলিলেন, চোখ বেরিয়ে এসেছে, কোথায় সে?

সকলে নীচের তলায় ছুটিলেন। স্কুলের বারান্দায় একটা তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলেকে শোয়াইয়া আরও অনেক ছেলে ঘিরিয়া মাথায় জল দিতেছে, বাতাস করিতেছে। হেডমাস্টারকে দেখিয়া ভিড় ফাঁকা হইয়া গেল। সত্যই চোখ বাহির হইয়া আধ ইঞ্চি পরিমাণ ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বীভৎস দৃশ্য!

তখনই মেমসাহেব খবর পাইয়া আসিয়া ছেলেটিকে কোলে লইয়া বসিল। সাহেব দারোয়ানকে ছেলের বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। বড়লোকের ছেলে, বাড়িতে মোটর আছে। মোটর আসিতে দেরি দেখিয়া সে স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে বল খেলিতেছিল, তাহার ফলেই এ দুর্ঘটনা।

দেখিতে দেখিতে ছেলের বাড়ির লোক মোটর লইয়া ছুটিয়া আসিল। তাহার পূর্বেই স্কুলের পাশের ডাঃ বসু হেডমাস্টারের আহ্বানে আসিয়া ছেলেটিকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিতেছিলেন। ছেলের বাবা, হেডমাস্টার ও ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ছেলেকে মোটরে মেডিক্যাল কলেজে লইয়া গেল। হেডমাস্টার সঙ্গে দুইজন মাস্টার দিলেন, শরৎবাবু ও গেম-মাস্টার বিনোদবাবুকে যাইতে হইল।

পরের কয়দিন হেডমাস্টার নিজে এবং আরও তিন-চারজন মাস্টার হাসপাতালে গিয়া ছেলেটিকে দেখিতে লাগিলেন। যে চোখে চোট লাগিয়াছিল, সে চোখটা অস্ত্র করিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হইল, তবুও কিছু হইল না। ছেলেটির অবস্থা দিন দিন খারাপের দিকে যায়। মেমসাহেব প্রায়ই গিয়া বসিয়া থাকে, সাহেবও এক-আধ দিন অন্তর যান, নারাণবাবু টুইশানি-ফেরতা প্রায় রোজই যান।

একদিন বিকালে হেডমাস্টারকে দেখিয়া ছেলেটি কাঁদিয়া ফেলিল। তখনও তাহার বাড়ি হইতে লোকজন আসে নাই। সাহেব গিয়া বসিয়া বলিলেন, ডোণ্ট্ ইউ ক্রাই মাই চাইল্ড্—দেয়ার ইজ এ লিট্ল্ ডিয়ার—বি এ হিরো—এ লিট্ল্ হিরো।

মুশকিল এই যে, সাহেব বাংলা বলিতে পারেন না ভাল, ছোট ছেলে তাঁহার ইংরেজী বুঝিতে পারে না। মুখে কথা বলিতে বলিতে হেডমাস্টার বিপন্ন মুখে ছেলেটির মাথায় ও পিঠে সান্ত্বনাসূচকভাবে হাত বুলাইতে লাগিলেন ; কান্না করে না, কান্না লজ্জার কথা আছে—ইট্ ইজ এ শেম্, বয়, টু ক্রাই, বুঝেছ? ভাল বালক আছে, সারিয়া যাইবে। কিচ্ছু হইবে না—

এমন সময় ছেলের মা ও বাড়ির মেয়েদের আসিতে দেখিয়া সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে বলিলেন, টোমার মার সামনে কান্না করে না। দেয়ার ইজ এ গুড বয়—আমার

স্কুলের বালক কাঁদিবে না—আই নো ইউ উইল কিপ আপ দি প্রেস্টিজ অফ ইওর স্কুল—আই ব্লেস ইউ মাই চাইল্ড—

ছেলেটি খানিকটা বুঝিল, খানিকটা বুঝিল না; কিন্তু সে কান্না বন্ধ করিল, আর কখনও কাহারও সামনে কাঁদে নাই। এমন কি, মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে তাহার সংজ্ঞা লোপ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভয় কি দুর্বলতাসূচক একটি কথাও তাহার মুখে কেহ শোনে নাই।

মাস্টারদের বেতন আরও কমিয়া গিয়াছে; কারণ জানুয়ারি মাসে নতুন ছেলে ভর্তি হয় নাই আশানুরূপ। এই মাসের মাহিনা লইতে গিয়া মাস্টারেরা ব্যাপারটা জানিতে পারিলেন।

চায়ের আসরে যদুবাবু বলিলেন, আর তো চলে না হে, একে এই মাইনে ঠিকমত পাওয়া যায় না, তাতে আরও পাঁচ টাকা কমে গেল। কলকাতা শহরে চালাই কী করে?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তবুও তো দাদা, আপনি বউদিদিকে পাড়াগাঁয়ে রেখেছেন আজ দু বছর। আমি আর-বছর বিয়ে করে কী মুশকিলেই পড়ে গিয়েচি, বাসার খরচ কখনও চলত না; যদি টুইশানি না থাকত।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, খোকার অন্নপ্রাশন দেবে কবে ক্ষেত্রবাবু?

—আর অন্নপ্রাশন! খেতে পাই নে তার অন্নপ্রাশন! বাসা-খরচ চলে না, বাসাভাড়া আজ তিন মাস বাকি।

—আমার কথা যদি শোনেন, তবে অবাক হয়ে যাবেন। স্কুলের ঘরে থাকি,—ঘরভাড়া লাগে না, তাই রক্ষে। আজ ছ মাস বাড়িতে পাঁচটা করে টাকা মাসে, তাও পাঠাতে পারি নে। পঁচিশ ছিল, হল বাইশ। এখানেই বা কী খাই, বাড়িতেই বা কী দিই?

যদুবাবু বলিলেন, আমার ভাবনা কিসের শুনবে? বউটাকে এক জ্ঞাতি শরিকের বাড়ি ফেলে রেখেছি দেশে। সেখানে তার কষ্টের সীমা নেই। কতবার লিখেছে, কিন্তু আমি কোথায় বলো? বত্রিশ থেকে আটাশ হল। মেসে খাই, তাই কুলোয় না।

শরৎবাবু বলিলেন, কোথাও চলে যাই ভাই, কিন্তু এ বাজারে যাই-ই বা কোথায়?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আচ্ছা শরৎ, তোমায় একটা কথা বলি। আমাদের নাহয় বয়েস হয়েছে, স্কুল-মাস্টারি ধরেচি অনেক দিন থেকে, কোথায় আর এ বয়েসে যাব! কিন্তু তুমি ইয়ং ম্যান, কেন মরতে এ লাইনে পচে মরবে? স্কুল-মাস্টারি কি কেউ শখ ক'রে করে? সমস্ত জীবনটা মাটি। এখনও সময় থাকতে অন্য পথ দেখে নাও—তুমি কি ওই গেম-টীচার বিনোদবাবু, কেন যে তোমরা এখানে আছ! পিওর লোজিনেস্—

শরৎবাবু বলিলেন, লোজিনেস্ নয় দাদা। এখানে পঁচিশ পেতাম, হল বাইশ। অনেক চেষ্টা করেছি, হেন আপিস নেই যেখানে দরখাস্ত-হাতে যাই নি, হেন লোক নেই যাকে ধরি নি। আমরা গরিব, নিজের লোক না থাকলে হয় না। আমাদের কে ব্যাক্ করচে, বলুন না দাদা?

—কিন্তু তা তো হল, এ স্কুলের অবস্থা দিন দিন হয়ে দাঁড়াল কী?

—কে জানে কেমন? সাহেবের অত কড়াকড়ি, অমন পড়ানোর মেথড্—কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

যদুবাবু বলিলেন, তা নয়, কী হয়েছে জান? পাশের স্কুলগুলো ছেলে ভাঙিয়ে নেয়, ওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলে যোগাড় করে। হেডমাস্টার মাস্টারদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি যায়।

—আমাদেরও যেতে হবে।

—হেডমাস্টার যে রাজী নন। ওতে মাস্টারদের প্রেস্টিজ থাকে না, ওসব ব্যবসাদারি ক'রে স্কুল রাখার চেয়ে না রাখা ভাল—এ সব বিলিতী মত এখানে খাটবে না। আমি জানি, লালবাজারে একটা স্কুল থেকে ছেলে ট্রান্সফার নেবে বলে দরখাস্ত দিলে—হেড-মাস্টার দুজন টীচার নিয়ে তাদের বাড়ি গিয়ে পড়ল, গার্জেনকে বোঝালে—কেন ট্রান্সফার নেবেন, কী অসুবিধে হচ্ছে বলুন—কত খোশামোদ! কিছুতেই ছেলেকে নিতে দিলে না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমাদের স্কুলে যেমন ট্রান্সফারের দরখাস্ত পড়েছে, আর সাহেব তখনই ক্লার্ককে ডেকে বললে—কত বাকি আছে দেখ, দেখে ট্রান্সফার দিয়ে দাও।

—এ রকম করে কি কলকাতার স্কুল চলে? সাহেবকে বোঝালেও বুঝবে না।

—প্রেস্টিজ যাবে! প্রেস্টিজ ধুয়ে জল খাই এখন।

পরদিন স্কুলে মিঃ আলম টীচারদের লইয়া এক গুপ্ত-সভা করিলেন, স্কুলের ছুটির পর তেতলার ঘরে। উদ্দেশ্য, এ হেডমাস্টারকে না তাড়াইলে স্কুলের উন্নতি নাই। একা দুই শত টাকা মাহিনা লইবে, তাহার উপর ছেলে আসে না স্কুলে। মাস্টারদের এই দুর্দশা। হেডমাস্টার ও মেম বিতাড়ন না করিলে স্কুল টিকিবে না।

যদুবাবু বলিলেন, কী উপায়ে সরানো যায় বলুন? হিমালয় পর্বত কে সরায়?

—কমিটীর কাছে দরখাস্ত পেশ করি সবাই মিলে। আমাদের ভিউজ আমরা লিখি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কিছু হবে না মিঃ আলম। কমিটী ওতে কানও দেবে না, উল্টো বিপত্তি হবে।

মিঃ আলম বলিলেন, দেখুন, কী হয়! আমি বলছি, ওতে ফল হতেই হবে।

এ মীটিংয়ে নারাণবাবু ছিলেন না, কিন্তু রামেন্দুবাবু ছিলেন। তিনি বলিলেন, আমি এর অপোজ করছি। হেডমাস্টার বিতাড়ন করে ফল ভাল হবে কে বলেচে? সেটা উচিতও নয়।

মিঃ আলম বলিলেন, তবে কিসে ফল ভাল হবে?

—তা আমি জানি নে, তবে হেডমাস্টার কড়া বটে, কিন্তু এ ভেরি গুড টীচার। অমন লোককে বুড়ো বয়সে তাড়ালে ধর্মে সইবে না, আর তাড়াতে পারবেনও না।

—কেন?

—কমিটীর কাছে হেডমাস্টারের পোজিশন খুব সিকিওর। তারা ওঁকে মেনে চলে, শ্রদ্ধা করে।

—শত্রুও আছে, যেমন ডাক্তার গাঙ্গুলী, সাতকড়ি দত্ত, মিঃ সেন—এঁরা স্বদেশী কিনা, সাহেবকে দেখতে পারেন না। আপনারা বলুন, আমি তদ্বির-তদারক আরম্ভ করি, মেম্বরদের—বিশেষ করে স্বদেশী মেম্বারদের বাড়ি যাই।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, আমি এর মধ্যে নেই। তবে আমি সাহেবকেও কিছু বলব না। আপনাদের এর মধ্যেও থাকব না, আপনারা যা হয় করুন।

মিঃ আলম বলিলেন, একটা কথা আছে এর মধ্যে।

—কী?

—আপনারা সবাই কিন্তু বলুন, এর পরে আমাকে হেডমাস্টার করবেন আপনারা।

মাস্টারেরা দণ্ডমুণ্ডের মালিক নহেন, বেশ ভাল রকমই তাহা জানেন, তবুও ঘাড় নাড়িয়া কেহ সায় দিলেন, কেহ উৎসাহের সহিত বলিলেন, বেশ, বেশ।

অর্থাৎ যে ক্ষমতা তাঁহাদের নাই, অপর একজনের মুখে তাহা তাঁহাদের আছে শুনিয়া মাস্টারের দল খুশী ও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

রামেন্দুবাবুর দলের দুই-একজন মাস্টার নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিলেন, তাঁহারা রামেন্দুবাবুকে হেডমাস্টার করিবেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, মিঃ আলম, তবে আপনাকে মাইনে কম নিতে হবে।

—কত বলুন?

—এক শোর বেশী নয়—

—সে আপনাদের বিবেচনা, যা ভাল হয় করবেন।

যদুবাবু বলিলেন, আচ্ছা, আপনাকে যদি আর পঁচিশ বেশী দেওয়া যায়, তবে আপনি আমাদের মাইনের বিষয়টাও দেখবেন। এই স্কেল করুন না, গ্র্যাজুয়েট পঞ্চাশ টাকা। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট চল্লিশ।

মাহিনার কত স্কেল হইবে, তাহা লইয়া কিছুক্ষণ মাস্টারদের তুমুল তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, যদুবাবুর প্রস্তাব গ্র্যাজুয়েটদের পক্ষে ঠিকই রহিল, তবে আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের ত্রিশের বেশী আপাতত দেওয়া চলিবে না।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, পণ্ডিতদের সম্বন্ধে একটা বিবেচনা করুন।

মিঃ আলম বলিলেন, আপনারা কত হলে খুশী হন?

যদুবাবু বিষম আপত্তি উঠাইলেন। আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট আর পণ্ডিত এক স্কেলে মাহিনা পাইবে, তাহা হয় না। হেডপণ্ডিত পঁয়ত্রিশ, অন্য পণ্ডিত ত্রিশ ও পঁচিশ।

হেডমাস্টার হওয়ার আসন্ন সম্ভাবনায় উৎফুল্ল মিঃ আলম যদুবাবুর প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেলেন। মাস্টারেরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, ব্যবস্থা ভালই হইয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন, আজ দু বছর ধরে আড়াই মাস খেটে এক মাসের টাকা পাচ্ছি—আজ এক টাকা, কাল দু টাকা, এ আর সহ্য হয় না। তার ওপর মাইনে গেল কমে। ইনক্রিমেন্ট তো হলই না আধ পয়সা আজ চোদ্দ বছরের মধ্যে।

হেডপণ্ডিত বলিলেন, আমার উনিশ বছরের মধ্যে—

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, আমার সতেরো বছরের মধ্যে—

বোঝা গেল, সকলেই বর্তমান ব্যবস্থার উপর অসন্তুষ্ট। নতুন কিছু হইলেই খুশী। সকলেরই উন্নতি হইবে, বাজার-খরচ সচ্ছলভাবে করিতে পারিবেন, বাসায় ফিরিয়া পরোটা জলখাবার খাইতে পারিবেন, দুই-একটা জামা বেশী করাইতে পারিবেন, বাড়িতে অনেকেরই বাসনপত্র কম—কিছু থালা বাটি কিনিবেন, কন্যার বিবাহের দেনা কেহ বা কিছু শোধ করিতে পারিবেন।

কাল হইতে স্কুলে ছেলেদের জন্য টিফিনের বন্দোবস্ত হইবে। 'ডি. পি. আই'-এর সারকুলার অনুযায়ী ছেলেদের নিকট হইতে কিছু কিছু খরচা লইয়া স্কুল ছেলেদের টিফিনের সময় জলখাবারের আয়োজন করিবে। সাহেব ঠিক করিয়াছেন—লাল আটার রুটি আর ডাল, ঠাকুর রাখিয়া তৈরি করানো হইবে, প্রত্যেক ছেলেকে দুটি পয়সা দিতে হইবে খাবার বাবদ—দুইখানা রুটি ও ডাল মাথা-পিছু।

মিঃ আলম বলিলেন, শুনুন, মিটিং ভাঙবার আগে আর একটা কথা আছে। কাল থেকে টিফিন দেওয়া হবে ছেলেদের, ওর হিসেবপত্র আর ছেলেদের দেওয়া-থোওয়ার তদারক করতে হবে একজন টীচারকে, আপনাদের মধ্যে কে রাজী আছেন? সাহেব আমাকে লোক ঠিক করতে বলেচেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কে আবার ওই হাঙ্গামা ঘাড়ে নেবে, থাকি টিফিনের সময় একটু শুয়ে—

হেডপণ্ডিত বলিলেন, আমাদের শরৎ-ভায়া বরং করো—ইয়ং ম্যান। তুমি কি বিনোদ—

হিসাবপত্র করিতে হইবে এবং তিনশো ছেলেকে ডাল রুটি দেওয়ার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইবে বলিয়া কেহই রাজী হয় না। মিঃ আলম বলিলেন, তাই তো, একটা যা হয় ঠিক করে ফেলতে হবে।

যদুবাবু চুপ করিয়া ছিলেন। বলিলেন, তা, তবে—যখন কেউ রাজী হয় না, তখন আর কী হবে, আমাকেই করতে হবে। সাহেবের অর্ডার, না মেনে তো উপায় নেই!

—আপনি নেবেন তা হলে?

—তাই ঠিক রইল মিঃ আলম। কী আর করি, একটু কষ্ট হবে বটে কিন্তু চাকরি যখন করচি—

কর্তব্যকার্যে এতখানি অনুরাগ যদুবাবুর বড় একটা দেখা যায় না, সুতরাং অনেকে বিস্মিত হইলেন।

মিঃ আলম বলিলেন, আপনারা নির্ভয়ে নেমে যান। সাহেব টুইশানিতে বার হয়েছে, মেমসাহেবও নেই। কেউ টের পাবে না।

সকলে ভয়ে ভয়ে নীচে নামিয়া গেল।

চায়ের মজলিসে রামেন্দুবাবু বলিলেন, আমাকে আপনারা এর মধ্যে কিন্তু টানবেন না।

সকলে বলিলেন, কেন, কেন, কী বলুন?

—মিঃ আলম হেডমাস্টার হোন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু সাহেবের

বিরুদ্ধে এ ধরনের ষড়যন্ত্র আমি পছন্দ করি নে। এ ঠিক নয়।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তা ছাড়া আপনি কি ভেবেছেন, এ কখনও হবে? এ হল কালনেমির লঙ্কাভাগ।

বাহিরে আসিয়া সকলেরই মন হাওয়া-বার-হওয়া বেলুনের মত চুপসিয়া গিয়াছিল। এতক্ষণ বড় বড় কথা, প্রস্তাব গ্রহণ-প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে থাকিয়া নিজেদের পার্লামেণ্টের মেম্বরের মত পদস্থ বলিয়া মনে হইতেছিল। সাহেব-তাড়ানো, সাহেব-বাঁচানো প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ কর্মে ডিক্রি-ডিসমিসের মালিক বুঝি তাঁহারাই—বর্তমানে ওয়েলেসলি স্ট্রীটের কঠিন পাষাণময় ফুটপাথে পা দিয়াই সে ঘোর তাঁহাদের কাটিতে শুরু করিয়াছে।

যদুবাবু, যিনি অতগুলি প্রস্তাব আনয়নকারী উৎসাহী মেম্বর, তিনিও টানিয়া টানিয়া বলিলেন, হয় বলে তো বিশ্বাস হচ্ছে না, তবে দেখ—সাহেবকে তাড়াবে কে?

শরৎবাবু বলিলেন, আপনি কখন কোন্‌দিকে থাকেন যদুদা, আপনাকে বোঝা ভার। এই মিঃ আলমকে গালাগাল না দিয়ে জল খান না, আবার দিব্যি ওকে হেডমাস্টার করার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন! কেন, আমরা সকলে ঠিক করেছি রামেন্দুবাবুকে ছাড়া আর কাউকে হেডমাস্টার করা হবে না।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, আমিও তাই বলি।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমারও তাই মত।

যদুবাবু রাগিয়া বলিলেন, বেশ তোমরা! আমিও বলি, রামেন্দুবাবুই উপযুক্ত লোক। আমি ওখানে না বলে করি কী? আলম যখন ওরকম করে বললে, না বলি কী করে?

রামেন্দুবাবু বলিলেন, আপনাদের কারও লজ্জা বা কিছুর কারণ নেই। ক্ষেত্রবাবু ঠিক বলেছেন, এ সব কালনেমির লঙ্কাভাগ হচ্ছে। ক্লার্কওয়েল সাহেব যথেষ্ট উপযুক্ত লোক, যদি তিনি চলে যান, তা হলে যে-কেউ হতে পারেন, আমার কোনও লোভ নেই ওতে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তা নিয়ে এখন আর তর্কাতর্কি করে কী হবে? তবে আমার এই মত, সাহেবের জায়গায় যদি কেউ হেডমাস্টার হওয়ার উপযুক্ত থাকেন স্টাফের ভেতর, তবে রামেন্দুবাবু আছেন।

যদুবাবু বলিলেন, আমি কি বলেচি নয়?

—বলছিলেন তো দাদা, আমি সোজা কথা বলব।

—না, এ তোমার অন্যায় ক্ষেত্র ভায়া। তুমি আমার কথা না বুঝে আগেই—রামেন্দু-বাবু হাসিয়া উভয়ের বিবাদ থামাইয়া দিলেন।

সেদিনকার চায়ের মজলিস শেষ হইল।

দিন তিনেক পরে জ্যোতির্বিনোদ ছুটির ঘণ্টা পড়িতেই বাহিরে যাইতেছেন, যদুবাবু ফোর্থ ক্লাস হইতে ডাক দিয়া বলিলেন, কোথায় যাচ্ছ, ও জ্যোতির্বিনোদ ভায়া?

—একটু কাজ আছে। কেন দাদা?

—না তাই বলছি, এখনই ফিরবে?

—ফিরতে দেরি হবে। শ্যামবাজারে যাব একবার।

—ও!

কিন্তু কি কারণে ওয়েলেসলির মোড় পর্যন্ত গিয়া জ্যোতির্বিনোদের শ্যামবাজার যাওয়ার প্রয়োজন হইল না। সুতরাং তিনি ফিরিয়া তেতলায় নিজের ঘরে ঢুকিলেন। টীচার্স-রুমের পাশেই ছোট ঘর, যাইবার সময় দেখিলেন, যদুবাবু টীচার্স-রুমে কী করিতেছেন। কৌতূহলী হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, কী, একা এখানে বসে এখনও দাদা?

যদুবাবু চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি কী যেন একটা ঢাকিতে চেষ্টা করিলেন, এবং পরে কথা বলিবার প্রাণপণ চেষ্টায় চোখ ঠিকরাইয়া অস্পষ্টভাবে গোঙরাইয়া কী যেন বলিতে গেলেন।

জ্যোতির্বিনোদ দেখিলেন, যদুবাবুর সামনে টেবিলের উপর শালপাতায় খান পাঁচ-ছয় লাল আটার রুটি ও কিছু ডাল—যদুবাবুর মুখ রুটি ও ডালে ভর্তি। আশ্চর্য নয় যে,

এ অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া স্পষ্ট কথা উচ্চারিত হইতেছে না। যদুবাবু ভীষণ আয়াসে ডালরুটির দলাকে জব্দ করিয়া কোন রকমে গিলিয়া ফেলিলেন এবং স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া অপ্রতিভ মুখে বলিলেন, এই টিফিনের পরে এক-আধখানা বাড়তি রুটি ছিল, তাই বলি ফেলে দিয়ে কী হবে! ঠাকুরকে বললাম, দাও ঠাকুর—

—বেশ বেশ, খান না।

—তাই ইয়ে—তুমি যদি খাও, কাল থেকে যদি বাড়তি থাকে, তোমার জন্যেও না হয়—

জ্যোতির্বিনোদ কী ভাবিয়া বলিলেন, কেউ আবার লাগাবে মিঃ আলমের কানে!

যদুবাবু ষড়যন্ত্র করিবার সুরে ও ভঙ্গিতে নিচু গলায় চোখ টিপিয়া বলিলেন, কেউ টের পাবে! তুমিও যেমন! যেখানে আধ মণ ময়দা মাখা হয় ডেলি, সেখানে ছখানা কি আটখানা রুটির হিসেব কে রাখচে? আর আমার হাতেই তো হিসেব। তুমি নাও।

জ্যোতির্বিনোদও নির্বোধ নন। তিনি বুঝিলেন, যদুবাবুর এ রুটি খাইতে হইলে ছুটির পরে নির্জন টীচার্স রুম ভিন্ন আর স্থান নাই। সে রুমের পরে জ্যোতির্বিনোদের থাকিবার ক্ষুদ্র কুঠুরি, তাঁহাকে অংশীদার না করিলে যদুবাবু উহা একা একা আত্মসাৎ কি করিয়া করিবেন? সেই জন্যই যদুবাবু অত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, জ্যোতির্বিনোদ কোথায় যাইতেছে অর্থাৎ এখনই ফিরিবে কি না!

ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, তা যদি বাড়তি থাকে, তবে না হয়—

যদুবাবু উৎসাহের সঙ্গে বলিলেন, বাড়তি আছে—বাড়তি আছে—হয়ে যাবে। খান আষ্টেক করে রুটি তোমার জন্যে, তা সে এক রকম হবে এখন। জলখাবারটা বিকেলবেলার, বুঝলে না? পেটে খিদে মুখে লাজ—না ভায়া, ও কোন কথা নয়।

তিন-চার দিন বেশ খাওয়াদাওয়া চলিল দুইজনের।

জ্যোতির্বিনোদ দেখিলেন, যদুবাবু ক্রমশ রুটির সংখ্যা ও ডালের পরিমাণ বাড়াইতেছেন। একদিন শালপাতা খুলিলে দেখা গেল, বাইশখানা রুটি ও প্রায় সের খানেক ডাল তাহার ভিতর।

জ্যোতির্বিনোদ ভয় পাইয়া বলিলেন, এ নিয়ে কথা হবে দাদা। এত কেন?

—আরে, নাও না খেয়ে। রাত্রের খাওয়াটাও এই সঙ্গে না-হয়—সে পয়সাটা তো বেঁচে গেল—এ পেনি সেভ্‌ড্ ইজ্ এ পেনি গট্, অর্থাৎ—

—কিন্তু দাদা, আমার শরীর খারাপ, আমি এত খেতে পারব না যে।

—বেশ, বেশ, যা পার খাও। না-হয় যা থাকবে, আমিই খাব—ফেলা যাচ্ছে না।

এদিকে মিঃ আলমের ষড়যন্ত্র বেশ পাকিয়া উঠিল। মিঃ আলম কয়েকজন মেম্বরের বাড়ি গিয়া তাঁহাদের বুঝাইলেন, সাহেবকে না তাড়াইলে স্কুলের উন্নতি সম্ভব নয়। মীটিংয়ের দিন পর্যন্ত ধার্য হইয়া গেল। স্থির হইল, ডাক্তার গাঙ্গুলী সে দিন সাহেবকে সরাইবার প্রস্তাব কমিটীতে উঠাইবেন; কমিটীর অন্যতম স্বদেশী মেম্বর সাতকড়ি দত্ত, জনৈক লোহাপটির দালাল সে প্রস্তাব সমর্থন করিবে।

রামেন্দুবাবু গোপনে ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন, মিঃ আলম এদিকে বেশ হেসে কথা বলে হেডমাস্টারের সঙ্গে, আর এদিকে এ রকম ষড়যন্ত্র করে—এ অত্যন্ত খারাপ। আমার মনে হয়, হেডমাস্টারকে ওয়ার্নিং দিয়ে দিলে ভাল হয়।

—কে দেবে?

—আমি দিতে পারতাম, কিন্তু আমার উচিত হবে না। আমি মিঃ আলমের মীটিংয়ে প্রথম দিন ছিলাম।

—তাই কী? আর তো ছিলেন না। আপনিই গিয়ে বলুন।

—সেটা ভদ্রলোকের কাজ হয় না। আর কাউকে দিয়ে বলাতে পারেন তো বলান।

—আর কে যাবে? এক আপনি, নয় তো নারাণবাবু।

—বুড়ো মানুষকে আর এর মধ্যে জড়িয়ে লাভ নেই। হি ইজ্ টু গুড্ এ ম্যান ফর অল দীজ—নিরীহ বেচারী ওঁকে আর এ বয়সে কেন এর মধ্যে?

—আমি বলব?
—আপনার উচিত হবে না। দু-মুখো সাপের কাজ হবে।
—তবে লেট্ ফেট্ টেক্ ইট্স্ কোর্স—
—তাই হোক।
কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষেত্রবাবু ও জ্যোতির্বিনোদ রাত দশটার পরে হেডমাস্টারের দোরে ঘা দিলেন।
সাহেব খয়রাগড়ের রাজকুমারকে পড়াইয়া সবে ফিরিয়াছেন। বলিলেন, কে নারাণবাবু?
ক্ষেত্রবাবু কাশিয়া বলিলেন, না স্যার্, আমি ক্ষেত্রবাবু।
—ও! ক্ষেত্রবাবু? এস এস। এত রাত্রে?
ক্ষেত্রবাবু ঘরে ঢুকিয়া সামনের চেয়ারে মেমসাহেবকে দেখিয়া বলিলেন, গুড ইভ্নিং মিস্ সিবসন্।
বুদ্ধিমতী মেমসাহেব প্রীতিসম্ভাষণ-বিনিময়ান্তে অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু সাহেবকে সব খুলিয়া বলিলেন।
সাহেব তাচ্ছিল্যের সুরে বলিলেন, এই! তা আমি রিজাইন দিতে প্রস্তুত আছি, তাতে যদি স্কুল ভাল হয়—হোক।
ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, না স্যার্, তা হলে স্কুল একদিনও টিকবে না।
—না, যদি মেম্বারেরা আমার কাজে সন্তুষ্ট না হন, তবে আমার থাকার দরকার নেই।
—স্যার্, আপনি যদি বলেন, তবে আমরাও অন্য অন্য মেম্বারের বাড়ি গিয়ে উল্টো তম্বির করি, আপনাকে পছন্দ করে এমন মেম্বর সংখ্যায় কম নয় কমিটীতে।
সাহেব নিতান্ত উদাসীন ভাবে বলিলেন, আমি এই স্কুল গড়ে তুলেছি, যখন এ স্কুলের ভার আমি নিই, তখন স্কুলে দেড় শো ছেলে ছিল। আমি হাতে নিয়ে চার শো দাঁড়ায় ছাত্রসংখ্যা। তারপর আবার কমে গেল। নতুন প্রণালীতে স্কুল চালাব ভেবে-ছিলাম, অক্সফোর্ড থেকে শিখে এসেছিলাম, আমার সব নোট্ করা আছে। এক গাদা নোট্—দেখতে চাও দেখাব একদিন। কিন্তু যদি কমিটী আমাকে না চায়, রিজাইন দিয়ে চলে যাব। এই অঞ্চলে সবাই আমার ছাত্র—চোদ্দ বছর ধরে এই স্কুলে কত ছাত্র আমার হাত দিয়ে বেরিয়েছে। বুড়ো বয়সে খেতে না পাই, এর বাড়ি একদিন ব্রেকফাস্ট খেলাম, আর-এক ছাত্রের বাড়ি একদিন ডিনার খাওয়ালে এই রকম করে চলে যাবে। নারাণবাবু কোথায়?
—বোধ হয় এখন টুইশানিতে।
—ওই একজন সাধুপ্রকৃতির মানুষ। এ সব কথা নারাণবাবু জানে?
—আমাদের মনে হয় শোনেন নি। ওঁর কানে এ কথা কেউ ইচ্ছে করেই ওঠায় না।
—দেখে এস তো। যদি এসে থাকে, ডেকে নিয়ে এস—
নারাণবাবু কিছুক্ষণ পরে জ্যোতির্বিনোদের সঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন।
সাহেব বলিলেন, শুনেছেন নারাণবাবু, আমাকে কমিটী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ হচ্ছে।
নারাণবাবু বিস্মিত মুখে অবিশ্বাসের সুরে বলিলেন, কে বললে স্যার্?
—জিজ্ঞেস করুন এঁদের। আমার বিশ্বাস, লেফ্টেনাণ্ট্ মিঃ আলম এই চক্রান্ত করছে। এত্ তু ব্রুতি!
নারাণবাবু হাসিয়া বলিলেন, জগতে ব্রুটাসের সংখ্যা কম নেই স্যার্। কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, এতদিন আমি কিছুই শুনি নি এ কথা!
—কোথা থেকে শুনবেন? আপনি থাকেন আপনার কাজ নিয়ে।
—স্যার্, আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আপনার কিছু হবে না।
—ভয় কিসের? আমি রিজাইন দিতে রাজি আছি এই মুহূর্তে।
—আমার মত শুনুন। কাউণ্টার প্রোপ্যাগাণ্ডা একটা করতে হয়—
ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমি তা বলেছি। আসুন—আপনি, আমি, শরৎবাবু, গেম্-

টীচার সব মেম্বরদের বাড়ি বাড়ি যাই।

—আমার আপত্তি নেই।

হেডমাস্টার বলিলেন, না, নারাণবাবুকে আমি কোথাও নিয়ে যেতে বলি নে। লিভ্ হিম্ এলোন। আমি আপনাদেরও যেতে বলি নে। আমি ও-সব জিনিসকে বড় ঘৃণা করি। এটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, রাজনীতির আসর নয়, এর মধ্যে দলপাকানো, ষড়যন্ত্র—এ-সবের স্থান নেই। না হয় চলেই যাব।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, স্যার্, আমাদের অনুমতি দিন। আমরা দেখি—

নারাণবাবু বৃদ্ধ বটে কিন্তু বেশ তেজী লোক, তাহা বোঝা গেল। তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল বলিলেন, একটা কথা বলে যাচ্ছি স্যার্, আপনাকে কেউ তাড়াতে পারবে না এ স্কুল থেকে। কিন্তু একটা ভবিষ্যদ্বাণী করি, মিঃ আলম এ স্কুলে আর বেশী দিন নয়।

সাহেব বলিলেন, ভাল কথা, রামেন্দুবাবুর কী মত?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তিনি নিরপেক্ষ। তিনি কোন দলেই যেতে রাজী নন।

—হি ইজ্ এ বর্ন্ জেণ্টল্‌ম্যান—দুজন লোক দেখলাম এ স্কুলে, একজন সামনেই বসে, আর একজন রামেন্দুবাবু।

পরে হাসিয়া ক্ষেত্রবাবুদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মাই অ্যাপেলজি টু ইউ, আপনাদের ওপর কোন মন্তব্য করি নি এতদ্দ্বারা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, স্যার্, আমাকে তিনটে টাকা দিন—আমি একবার এই রাত্রেই দু-একজন মেম্বরের বাড়ি যাই—ডাঃ সেনের বাড়ি যাওয়া বিশেষ দরকার। সেক্রেটারি বিপিনবাবু আমাদের দিকে আছেন। মীটিংয়ের দেরি নেই, একটু চট্‌পট্ চেষ্টা করা দরকার।

সাহেব টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

ক্ষেত্রবাবু বাহিরে আসিয়া নারাণবাবুকে ইঙ্গিতে তাঁহার সঙ্গে আসিতে বলিলেন।

হেডমাস্টার তখনই দোরের কাছে দাঁড়াইয়া তিরস্কারের সুরে বলিলেন, ক্ষেত্রবাবু, আশা করি আপনি আমার আদেশ শুনবেন, আমি এখনও এ স্কুলের হেডমাস্টার মনে রাখবেন। নারাণবাবুকে কোথাও নিয়ে যাবেন না, আমার ইচ্ছা নয়, এই সরল-প্রাণ বৃদ্ধকে আপনারা এ-সব কাজে জড়ান। আপনি একা চলে যান—

মীটিংয়ের আগে ক্ষেত্রবাবুর দল মেম্বারদের বাড়ি বাড়ি গেলেন। যেখানেই যান, সেখানেই শোনা যায়, অপর পক্ষ কিছুক্ষণ আগে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে।

স্বদেশীভাবের লোক গাঙ্গুলীর কাছে ক্ষেত্রবাবুর দল অপমানিত হইলেন।

ডাঃ গাঙ্গুলী বলিলেন, মশাই আপনারা কী রকম লোক জিজ্ঞেস করি? পান তো পঁচিশ-ত্রিশ মাইনে। সাহেবের খোসামুদি করতে ইচ্ছে হয় এতে? একেবারে অপদার্থ সব! কী শিক্ষা দেবেন আপনারা ছেলেদের? নিজেদের এতটুকু আত্মসম্মান জ্ঞান নেই? সাহেবের হয়ে তদ্বির করতে এসেচেন, লজ্জা করে না? সাহেবকে এ মীটিংয়ে তাড়াবই—তারপর আপনাদের মত অপদার্থ দু-একজন টীচারকেও সরাতে হবে, তবে যদি এবার স্কুলটা ভাল হয়, ইত্যাদি।

মীটিংয়ের দিন ক্ষেত্রবাবু দল লইয়া আর-একবার দুই-একজন মেম্বরের বাড়ি গেলেন। মেম্বরদের বিশ্বাস নাই, হয়তো ভুলিয়া বসিয়া আছে, ঘন ঘন মনে না করাইয়া দিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সকলেই বলিল, তাহাদের মনে করাইয়া দিতে হইবে না।

ছয়টার সময় মীটিং। বেলা চারটার সময় হইতে উভয় দল আসিয়া স্কুলে বসিয়া রহিল? অথচ কেহ কাহারও প্রতি অসম্মান দেখাইল না। মিঃ আলম হেডমাস্টারের ঘরে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খাতাপত্র কী কী দরকার আছে মীটিংয়ে নিয়ে যাবার জন্য, বলুন।

—বোস মিঃ আলম, চা খাবে এক পেয়ালা?

—থ্যাংক্‌স্, এখন আর থাক্।

মীটিং বসিল। সাহেবের অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। মিঃ আলমের দলের অত তদ্বির অত অনুরোধ, অত ধরাধরি, সব বুঝি ভাসিয়া যায়। সাহেবকে সরাইবার সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব কেহ আনে না—কার্য-তালিকার মধ্যে এ প্রস্তাব নাই; সুতরাং 'বিবিধ' কতক্ষণে

আসে, সেই অপেক্ষায় উভয় দল দুরুদুরু বক্ষে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ডাক্তার গাঙ্গুলী, যিনি অত লম্ফঝম্প করিয়াছিলেন সাহেব তাড়ানোর জন্য, তিনি মীটিংয়ের গতিক বুঝিয়া সরু মিহি সুরে প্রস্তাব আনিলেন যে সাহেবকে অত বেতন দিয়া এই গরিব স্কুলে রাখা পোষাইতেছে না, বিশেষতঃ নতুন ছাত্র যখন আশানুরূপ ভর্তি হইতেছে না। অতএব সাহেবের বেতন কমানো হউক।

সে প্রস্তাব সমর্থন করিলেন অন্যতম স্বদেশী মেম্বর নৃপেন সেন। সভাপতি প্রস্তাব ভোটে ফেলিতে দেখা গেল, ডাঃ গাঙ্গুলী আর নৃপেনবাবু ছাড়া প্রস্তাবের পক্ষে আর কাহারও মত নাই; এমন কি, শিক্ষকদের প্রতিনিধি মিঃ আলম পর্যন্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন।

ডাঃ গাঙ্গুলী মিঃ আলমকে ডাকিয়া আড়ালে বলিলেন, এটা কী রকম হল মশাই? আপনি আমাদের নাচালেন, শেষে কিনা আপনি নিজে—

মিঃ আলম বিনীতভাবে যাহা বলিলেন, তাহা সত্যই অসঙ্গত নয়। তিনি এখনও ক্লার্কওয়েল সাহেবের অধীনে চাকুরি করেন, প্রকাশ্যে তিনি কোনও মতেই তাঁহার বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না; বরং শিক্ষকদের প্রতিনিধি হিসাবে শিক্ষকের স্বার্থ বজায় রাখিয়া তিনি কর্তব্য পালনই করিয়াছেন।

নৃপেন সেন বলিলেন, জানি জানি, আপনাদের এই রকমই মর‍্যাল কারেজ। ঘেন্না হয়, বাঙালী জাতটা এই রকমেই উচ্ছন্নয় গেল। আপনারা কী শেখাবেন ছেলেদের? ছ্যাঃ ছ্যাঃ—

মীটিং-অন্তে যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবুর দলকে সাহেব ডাকাইয়া বলিলেন, কই যত শুনলাম তোমাদের মুখে, তার কিছুই তো নয়?

ক্ষেত্রবাবুও একটু আশ্চর্য হইয়াছেন। বলিলেন, তাই তো! কিছু বুঝতেও পারলাম না স্যার্।

—যত শুনেছিলে তোমরা, আমার মনে হয় অতখানি সত্যি নয়। মিঃ আলম অত খারাপ মানুষ নয়।

—স্যার্, আমাকে মাপ করবেন, আপনি অবিশ্যি মিঃ আলমকে সন্দেহ করেন না, সে খুব ভাল কথা। তবে আমার স্বচক্ষে দেখা এবং স্বকর্ণে শোনা স্যার্।

—যাক, সব ভাল যার শেষ ভাল। নারাণবাবুর কথাই খাটল। বলেছিল, অপর পক্ষের চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

কমিটীর মেম্বরদের মধ্যে অনেকেই এই মীটিংয়ের পরে আলমের উপর চটিয়া গেলেন। ফলে এক মাসের মধ্যে মিঃ আলমের মাহিনা আরও কাটিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল কমিটীতে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার কোন বাধা ছিল না, কিন্তু সাহেব এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আপত্তি করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় মীটিংয়ের পরে ক্ষেত্রবাবু হেডমাস্টারের ঘরে ঢুকিলেন।

সাহেব বলিলেন, বসুন, ক্ষেত্রবাবু। কী খবর?

—আজ স্যার্ আপনি মিঃ আলমের পক্ষে অতটা না দাঁড়ালেও পারতেন।

—কেন বল তো?

—আপনার খুব বন্ধু নয় ও।

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, ও! তা বলে আমি কি তার প্রতিশোধ নেব ওভাবে? ওস কাজ আমাদের দ্বারা হবে না। আমরা শিক্ষক—আমি চাই না ক্ষেত্রবাবু যে, স্কুলের মধে এ ধরনের দলাদলি হয়। আমি চেয়েছিলাম স্কুলটাকে ভাল করতে। অক্সফোর্ড থেকে অনেক কিছু শিখে এসেছিলাম, নতুন প্রণালীতে শিক্ষা দেব ছেলেদের। এখানে এসে স মিথ্যে হতে চলেছে দেখছি। এখানকার হাওয়াতে দলাদলি ভাসে।

এই সব ঘটনার পর কিছুদিন দলাদলি ও ষড়যন্ত্র ক্ষান্ত রহিল। আবার মাস দু পরে মিঃ আলম নতুন ভাবে ষড়যন্ত্র শুরু করিল। এবার মেমসাহেবের বিরুদ্ধে। স্কুলে অত টাকা খরচ করিয়া মেম রাখিবার কোন কারণ নাই। বিশেষত ছেলেদের স্কুলে মেয়ে মানুষ শিক্ষয়িত্রী কেন? এবার মিঃ আলমের ষড়যন্ত্র সফল হইল। স্বদেশী মেম্বরের দ

টেবিল চাপড়াইয়া লম্বা বক্তৃতা করিল। ফলে মিস্ সিবসনের চাকরি গেল। ছেলেরা মিলিয়া চাঁদা তুলিয়া মেমসাহেবের বিদায় অভিনন্দনজ্ঞাপক সভা করিল। মিস্ সিবসন্ ছোট ছোট ছেলেদের সত্যই ভালবাসিত, বিদায়-সভায় বেচারী প্রতিভাষণ দিতে উঠিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

মেমসাহেবের চলিয়া যাওয়াতে সাহেবের কষ্ট হইল খুব বেশী। সকলে বলে, বিলাত হইতে আসিবার সময় সাহেব মিস্ সিবসন্‌কে সঙ্গে করিয়া আনেন, গরিবের ঘরের মেয়ে, ইণ্ডিয়ায় একটা চাকরি জুটিয়া যাইবে—ইহাই ছিল উদ্দেশ্য।

এই স্কুলের ভার সাহেব যতদিন হইতে লইয়াছেন, মেমসাহেবেরও চাকরি এখানে ততদিন।

চায়ের মজলিসে সে দিন মাস্টারের সংখ্যা কিছু বেশী ছিল।

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, আজ আলমের মনস্কামনা পূর্ণ হল।

ক্ষেত্রবাবু যতখানি সাহেবের পক্ষ হইয়া তদ্বির করিয়াছিলেন, মিস্ সিবসনের পক্ষ হইয়া তাহার অর্ধেকও করেন নাই। মেমসাহেব যাওয়াতে তিনি ততটা দুঃখিত হন নাই, ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইবার কথা। তিনি বলিলেন, তা বটে, তবে আমার মত যদি জিগ্যেস কর—এ চালটা ওদের খুব গভীর।

শরৎবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কী রকম?

—এতে সাহেবকেও তাড়ানো হল।

সকলে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন? কেন?

—সাহেব একা এখানে থাকতে পারবে না।

—তা ছাড়া মেম বেচারীই বা যায় কোথায়? ও তো খুব গরিব ছিল শুনেছি।

—শুনচি মেম দার্জিলিং গিয়ে থাকবে।

—খরচ?

—দার্জিলিং ল্যাঙ্গোয়েজ স্কুলে টীচার হবে। মিশনারী সোসাইটিকে সাহেব লিখেছিলেন ওর জন্য, তারা সব ঠিক করে দিয়েছে।

মেমসাহেব যে খুব ভাল টীচার ও ভাল লোক—এ বিষয়ে সকলেই দেখা গেল একমত। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মিস্ সিবসন্‌কে খুব ভালবাসে, তাহারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া নিজেদের ক্লাসের এক গ্রুপ ফোটো মেমসাহেবকে উপহার দিয়াছে।

একজন কে বলিল, ও ভালই হয়েছে, আমাদের মাইনে পঁচিশ-ত্রিশ—আর মেমসাহেবের মাইনে আশী। অথচ তিনি ইন্‌ফ্যাণ্ট ক্লাসে পড়াবেন। কেন, আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেচি! তোমাদের স্লেভ মেণ্টালিটি কতদূর হয়েচে, তা বুঝতে পারছ না। এ কাজটা মিঃ আলম ঠিকই করেচে।

ক্ষেত্রবাবু বোধ হয় এইটুকু অপেক্ষা করিতেছিলেন। বলিলেন, আমারও তাই মত। এবার মিঃ আলমের এতটুকু অন্যায় হয় নি। তাই বুঝে এবার তদ্বিরও করি নি। এটা আলমের ন্যায্য কাজ।

চায়ের দোকান হইতে ক্ষেত্রবাবু বাসায় ফিরিলেন। অনিলা স্বামীকে চা করিয়া দিয়া বলিল, কী খাবার যে দেব? মুড়ি রোজ রোজ খেতে পার কি? ভেবেছিলাম একটু হালুয়া—

—হ্যাঁ, হালুয়া! ঘিটুকু সব খরচ করে না ফেললে তোমার—

—তুমি তো আধ সের করে মাসে দেবে বলেছ, তার মধ্যেই আমি—

—গত মাসের মাইনের মধ্যে দশটি টাকা আজ পাওয়া গেল, এতে তুমি কত ঘি খাবে, আর কী করবে?

অনিলা দুঃখ ও রাগের সুরে বলিল, আমি কি তোমার ঘি খাই! ছেলেমেয়েরা মুড়ি চবুতে পারে না রোজ, তাই কোনদিন ওদের জন্যে একটু হালুয়া, কি দুখানা পরোটা—

ক্ষেত্রবাবু ঝাঁঝের সঙ্গে বলিলেন, না কেন মুড়ি খেতে পারবে না? বিদ্যাসাগর মশায়

যে না খেয়ে পরের বাসায় থেকে লেখাপড়া শিখেছিলেন! তবে ওসব হয়। যখন যেমন অবস্থা, তখন তেমনি থাকবে।

—আধ সের ঘি তুমি বরাদ্দ করেছ কি না মাসে, আমি তাই শুনতে চাই।

—করেছিলাম। এ মাস থেকে হয়তো খরচ কমাতে হবে। পাচ্ছি কোথায়? ঘির আইটেম্‌ই হয়তো তুলে দিতে হবে।

অনিলা সামনে গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, হ্যাঁ গা, সেই সাড়ে নটায় খেয়ে বেরোও আর সাড়ে পাঁচটায় ফেরো। যদি কিছু না হয় ওতে, তবে ও ছাইপাঁশ চাকরি কেন ছেড়ে দাও না।

—ছেড়ে তো দেব, তার পর?

—ছেলে পড়াও যেমন পড়াচ্ছ—তাতে হয় না? আর নয়তো চল বাবার কাছে। ওদিকে অনেক কিছু জুটে যাবে। ডিহিরি-অন্‌-সোনে আমার সেই শৈলেনকাকা থাকেন, দেখেছ তো তাঁকে? এক মাড়োয়ারীর ফার্মে কাজ করেন। ধরে পেড়ে বললে—সেখানে চাকরি হতে পারে। যদি বল তো বাবাকে লিখি।

—তা না হয় হল। কলকাতা ছেড়ে যেতে কোথাও মন সরে না। এতদিন এখানে আছি—তার কি জান, স্কুলের ওপরও বড় মায়া। আমার বলে নয়, সব মাস্টারেরই। সুখে দুঃখে আজ বারো ষোলো বিশ বছর এক জায়গায় আছি। ওই কেমন একটা নেশা—স্কুলবাড়িটা, ছেলেগুলো, ওই চায়ের দোকানের মজলিসটা, হেডমাস্টার—বেশ লাগে। যত কষ্টই পাই তবুও যেতে পারি নে কোথাও যে, তাই এক এক সময় ভাবি—

—ভাবাভাবির কোনও দরকার নেই, চল বেরুই। কলকাতার খরচ বেশী অথচ খাওয়া হচ্ছে কী, একটু দুধ তোমার পেটে পড়ে না, একটু ঘি না। আমাদের গয়ায় এগারো সের করে খাঁটি দুধ—

—বুঝি সবই। কিন্তু কোথাও গিয়ে থাকতে পারি নে যে। তোমাদের গয়া কেন, আমার নিজের পৈতৃক গ্রামে চোদ্দ সের করে দুধ টাকায়। পাঁচ সিকে উৎকৃষ্ট গাওয়া ঘিয়ের সের—কিন্তু সেবার তোমার দিদি থাকতে নিয়ে গেলুম—মন টেকে না মোটে। ছেলেমেয়েদের মন মোটে টেকে না—সব কলকাতায় মানুষ। তোমার দিদি তো ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল দেশে। তা ছাড়া ম্যালেরিয়াও আছে—

এই সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, ক্ষেত্রবাবু আছেন?

—কে ডাকচে দেখ তো জানলা দিয়ে?

অনিলা দেখিয়া আসিয়া বলিল, একটা ছেলে। তোমার স্কুলের ছেলে নাকি, দেখ না?

ক্ষেত্রবাবু বাহিরে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পরে আবার ঢুকিয়া বলিলেন, সেই তোমার অথর গো, সেই যে সেদিন বলেছিলাম—অথর রাখাল মিত্তির! তিনি তাঁর ছেলের হাত দিয়ে চিঠি দিয়েছেন, তাঁর অসুখ, বড় কষ্ট পাচ্ছেন, আমি যেন গিয়ে দেখা করি—

অনিলা ব্যগ্রভাবে বলিল, আহা, তা যাও! কষ্ট পাচ্ছেন, সত্যি তো—অথর একজন—যাও—

ক্ষেত্রবাবু ছেলেটির পিছু পিছু ইটালি সাউথ রোডের মধ্যে এক অন্ধ গলির ভিতরে গিয়া পড়িলেন। ছেলেটি তাঁহাকে একটা দরজার সামনে দাঁড় করাইয়া বলিল, আপনি দাঁড়ান, দরজা খুলে দি।

সে কোন্‌ দিক দিয়া চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, আমি নিজেও ঠিক চৌরঙ্গীতে থাকি নে, কিন্তু এ কী গলি, বাপ্‌!

দরজা খুলিল। দরজার পাশে-ক্ষুদ্র একটা রোয়াকের সামনে অন্ধকার এক ঘরে ছেলেটি তাঁহাকে লইয়া গেল। এত অন্ধকার যে, প্রথমে বোঝা যায় না, ঘরের মধ্যে কিছু আছে কি না! অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা ক্ষীণ স্বর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, কে? ক্ষেত্রবাবু এসেচেন?

ক্ষেত্রবাবু দেখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চোখ ঠিক্‌রাইয়া একটা বিছানা বা কিছুর অস্পষ্ট আভাস ও একটি শায়িত মনুষ্যমূর্তি-গোছ যেন দেখিতে পাইলেন। আর অগ্রসর না হইয়া দাঁড়াইলেন, কিছু বাধিয়া ঠোকর খাইয়া পড়িয়া না যান।

ক্ষীণস্বর চি' চি' করিয়া বলিল, ওই জানলার ওপরটাতে বসুন। ওরে, একটা কিছু পেতে দে না! ও রাধু—

—থাক্‌ থাক্‌, পেতে দিতে হবে না। আপনার কী হয়েছে?

—আর কী হবে! জ্বর আর কাশি আজ পনেরো দিন। পড়ে আছি। উত্থানশক্তি রহিত—

—তাই তো দেখতে পাচ্ছি। বড় কষ্ট পাচ্ছেন তো!

এইবার ক্ষেত্রবাবু ঘরের ভিতরটা বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। ওই যে রাখালবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়া মলিন বিছানায় কাত হইয়া আছেন, পাশে একটা ততোধিক মলিন লেপ, বিছানার এক পাশে দড়ির আলনাতে দু-চারখানা ময়লা ও আধময়লা কাপড় ঝুলিতেছে, বিছানার সামনে একটা তাক, তাকের ওপর অনেক বই কাগজ। একপাশে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন। দেওয়ালে কয়েকখানি সস্তা ধরনের ক্যালেণ্ডার—বিভিন্ন পাঠ্য-পুস্তক বিক্রেতাদের নাম ও বিজ্ঞাপন ছাপানো। ঘরের আসবাবপত্রের বীভৎস দারিদ্র্যে গরিব স্কুলমাস্টার ক্ষেত্রবাবুও যেন শিহরিয়া উঠিলেন।

—কতদিন অসুখ বললেন?

—তা আজ দিন পনেরো।

—কেউ দেখচে?

—না, দেখে নি। পয়সা নেই, সত্যি কথা বলতে কি ক্ষেত্রবাবু, আজ তিন দিন ঘরে এক পয়সাও নেই। ছেলেকে পাঠিয়েছিলাম রাধাকৃষ্ণ কর অ্যান্ড সন্সের দোকানে। আমার সেই—সেই—সেই—(রাখালবাবু একটু হাঁপ জিরাইলেন) রচনার বইখানা দশ কপি পাঠিয়ে দিয়ে একখানা চিঠি লিখে দিলাম, বলি—এখন বইগুলো রেখে দাম দাও, আমি পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট কমিশন দেব, এখন আমার হাত বড্ড টানাটানি যাচ্ছে—তা ব্যাটারা বই ফেরত দিয়েছে। ও বই নাকি কম বিক্রি—ও এখন বিক্রি হবে না। আপনি তো জানেন, চেৎলা স্কুলের হেডমাস্টার—নব ব্যাকরণ-সুধা প্রথম ভাগ—

—আচ্ছা, আপনি একটু বিশ্রাম করুন।

—বিশ্রাম আমি করছি সারাদিনই। কিন্তু আমি বলি, দেখুন ক্ষেত্রবাবু, যারা জিনিস চেনে, তাদের কাছে জিনিসের কদর! চেৎলা স্কুলের হেডমাস্টার নব ব্যাকরণ-সুধা দেখে বললে, মিত্তির মশাই, এমন বই একালে কে লিখছে আপনি ছাড়া? আপনাকে বলেছি বোধ হয় ক্ষেত্রবাবু, ব্যাকরণে ছাত্রবৃত্তিতে ফার্স্ট স্ট্যান্ড করি, মেডেল আছে। দেখতে চান তো দেখাতে পারি।

—না, দেখাতে হবে কেন? আপনি ঠিকই বলছেন। তা চেৎলা স্কুলে বই ধরালে আপনার?

—না। বললে—আগে যদি আসতেন! কাকে বুঝি কথা দিয়ে ফেলেছে। আসছে বারে প্রমিস্‌ করেছে ধরিয়ে দেবে। আর ওই শাঁকারিটোলা হাই স্কুলে রচনাদর্শখানা পাঠাতে বলেছিল—নমুনা। কিন্তু নমুনা পাঠিয়ে হয়রান। বই ধরাবেন না, নমুনা পাঠাও—

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, ওসব আমরাও জানি। বই ধরাবার ইচ্ছে নেই, বই পাঠান—

রাখালবাবু উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া পাশের তাকে হাত বাড়াইতে গেলেন।

—আপনাকে দেখাই, আর একখানা নীচের ক্লাসের ব্যাকরণ লিখচি—আপনাকে দেখাই—খাতাখানাতে লিখছিলাম—

কাশির বেগে রাখালবাবুর খাতা বাহির করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, থাক্‌ থাক্‌, এখন রাখুন।

—বড় কষ্ট পাচ্ছি। কেউ নেই, কাকে বলি! তাই ছেলেটাকে প্রথমে আপনার স্কুলে পাঠাই, সেখানে দরোয়ান আপনার বাসার ঠিকানা বলে দিয়েছে, তাই বাসায় গিয়েছিল। এখন কী করি, একটা পরামর্শ দিন দিকি ক্ষেত্রবাবু!

—তাই তো। খুবই বিপদ। বাসাতে কে কে আছেন?

—আমার স্ত্রী, দুটি ছোট ছোট ছেলে, এক বিধবা ভগ্নী, তাঁর একটি মেয়ে— এই।

রোজ দুটি করে টাকা হলে তবে সংসার বেশ চলে। এক পয়সা আয় নেই, তায় দু টাকা—কী করা যায় বলুন! খেতে পায় নি বাড়িতে আজ দু দিন। আপনার কাছে খুলে বলতে লজ্জা নেই—

ক্ষেত্রবাবুর মনে যথেষ্ট দুঃখ ও সহানুভূতির উদ্রেক হইল। নিজেকে তিনি ওই অবস্থায় ফেলিয়া দেখিলেন কল্পনায়। কিন্তু তিনি কী করিবেন! তাঁহার হাতে বাড়তি পয়সা এমন নাই, যাহা দিয়া তিনি এই দুঃস্থ বৃদ্ধ গ্রন্থকারকে সাহায্য করিতে পারেন। পরামর্শই বা তিনি কী দিবেন? একমাত্র পরামর্শ হইতেছে পয়সাকড়ির পরামর্শ। কিন্তু কে এই বৃদ্ধকে অর্থ-সাহায্য করিবে, সে কথাই বা তিনি কী করিয়া জানিবেন? বাধ্য হইয়া দুঃখের সঙ্গে ক্ষেত্রবাবু সে কথা জানাইলেন। তাঁহার এ ক্ষেত্রে করিবার কিছু নাই। কোন পথই তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিতেছেন না।

মুশকিল হইল যে, এই সময় রাখাল মিত্তিরের ছেলেটি ভাঙা পেয়ালায় চা আনিয়া ক্ষেত্রবাবুর হাতে দিল। রাখালবাবুর স্ত্রী শুনিয়াছেন, তাঁহার স্বামীর একজন বিশিষ্ট প্রতিপত্তিশালী বন্ধু আসিবেন। চিঠি লইয়া ছেলে তাঁহার কাছে গিয়াছে। তিনি আসিলে দুঃখের একটা কিনারা হইবেই। এখন সেই ভদ্রলোকটি আসিয়াছেন শুনিয়া গৃহিণী তাড়াতাড়ি যথাসাধ্য অতিথি-সৎকার করিয়াছেন। গরিবের ঘরে এই ভাঙা পেয়ালায় একটু চায়ের পিছনে যে কত ভরসা নির্ভরতা আবেদন নিহত, ক্ষেত্রবাবু তাহা বুঝিলেন বলিয়াই চায়ের চুমুক যেন গলায় বাধিতেছিল। এখানে না আসিলেই হইত। পকেটে আছে মাত্র আট আনা পয়সা। তাই কি দিয়া যাইবেন! সে-ই বা কেমন দেখাইবে!

রাখালবাবু স্বয়ং এ দ্বিধা ঘুচাইয়া দিলেনঃ তা হলে উঠবেন? আচ্ছা, কিছু কি আপনার পকেটে আছে? যা থাকে। বাড়িতে খাওয়া হয় নি ও-বেলা থেকে—দুটো একটা টাকা—এমন বিপদে পড়ে গিয়েছি—

ক্ষেত্রবাবু ছেলেটির হাতে একটা আট-আনি দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

সমস্ত সন্ধ্যাটা যেন বিস্বাদ হইয়া গেল। সামনেই একটা ছোট পার্ক, ছেলেমেয়েরা দোলনায় দোল খাইতেছে; লাফালাফি করিতেছে, আনন্দকলরবমুখর পার্কের সবুজ ঘাসের উপর দুই-একটি অফিস-প্রত্যাগত কেরানী বসিয়া বিড়ি টানিতেছে, সোঁদালি ফুলের ঝাড় দুলিতেছে রেলিংয়ের ধারের গাছে, আলু-কাবলির চারি পাশে উৎসাহী অল্পবয়স্ক ক্রেতার ভিড় লাগিতেছে। ক্ষেত্রবাবু একখানা বেঞ্চের এক কোণে গিয়া বসিলেন। বেঞ্চির উপর দুইটি লোক বসিয়া ঘরভাড়া আদায় করার অসুবিধা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলিতেছে।

ক্ষেত্রবাবু ভাবিলেন, রাখালবাবুও তাঁহার মত স্কুলমাস্টার ছিলেন একদিন। আজ অক্ষম ও পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাই এই দুর্দশা। বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, টুইশানিও জোটে না আর। স্কুলমাস্টারের এই পরিণাম।

বেশী দূর যাইতে হইবে না, তাঁহাদের স্কুলেই রহিয়াছেন নারাণবাবু—তিন কুলে কেহ নাই, আজীবন পূতচরিত্র, আদর্শ শিক্ষক, কিন্তু স্কুলের চোর-কুঠুরির ঘরে নির্জন আত্মীয়হীন জীবন যাপন করিতেছেন আজ আঠারো বছর কি বাইশ বছর, কে খবর রাখে? আজ যদি চাকুরি যায়, কাল আশ্রয়টুকুও নাই। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক অবস্থায় ক্ষেত্রবাবু টুইশানিতে চলিয়াছেন, কে পিছন হইতে বলিল, স্যার্, ভাল আছেন?

ক্ষেত্রবাবু পিছন ফিরিয়া চাহিলেন, একটি সুবেশ তরুণ যুবক। বেশ দামী সুট পরনে, চোখে কাঁচকড়ার চশমা। মৃদু হাসিয়া বলিল, চিনতে পারছেন না স্যার্?

—না, কই, ঠিক—তুমি আমাদের স্কুলের?

—হ্যাঁ, স্যার্। অনেক দিন আগে, এগারো বছর আগে—পাস করি। আমার নাম সুরেশ।

—সুরেশ বসু?

—না স্যার্, সুরেশ মুখার্জি, সেবার সেই সরস্বতী পুজোর সময়ে আমাদের বারে ভাঁড়ার লুঠ করে ছেলেরা, মনে আছে? হেডমাস্টার ফাইন করেছিলেন সব ছেলেদের। মনে হচ্ছে স্যার্?

—হ্যাঁ, একটু একটু মনে হচ্ছে যেন। তোমাদের ছেলেবেলার কথা হিসেবে এসব যত

মনে থাকে, আমাদের তত মনে রাখবার ব্যাপার নয় বাবা। বুঝতেই পারচ! কী কর এখন?

—আজ্ঞে স্যার্, রাঁচিতে চাকরি করি, এঞ্জিনীয়ার।

—ইঞ্জিনীয়ারিং পাস করেছিলে, বুঝি বাবা?

—আজ্ঞে, শিবপুর থেকে পাস করে বিলেত যাই। আজ তিন বছর বিলেত থেকে ফিরে গভর্মেন্ট সার্ভিস করছি রাঁচিতে—পি. ডবলিউ. ডি.-তে য়্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনীয়ার।

—কী নাম বললে, সুরেশ মুখার্জি? এখন চেনা-চেনা মুখ বলে মনে হচ্ছে। অনেক দিনের কথা—আর কত ছেলে আসে-যায়, কাজেই সব মনে রাখা—

—নিশ্চয় স্যার্, ঠিক কথা। পুরোনো মাস্টারদের মধ্যে কে কে আছেন স্যার্? যদুবাবু আছেন?

—হ্যাঁ, শ্রীশবাবু থার্ড পণ্ডিত আছেন, নারাণবাবু আছেন—

—নারাণবাবু আজও আছেন স্যার্? উঃ, অনেক বয়স হল তাঁর! তিনি কি স্কুলের সেই ঘরেই থাকেন—আচ্ছা, একবার দেখা করে আসব। বড্ড ইচ্ছে হয়। চাকরটা আছে? কেবলরাম?

—হ্যাঁ, আছে বইকি। যেয়ো না একদিন স্কুলে।

যুবকটি পায়ের ধুলো লইয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু সগর্বে একবার চারিদিকে চাহিলেন—লোকে দেখুক, এমন একজন সুট-পরা তরুণ যুবক তাঁহার পায়ের ধুলো লইতেছে। তাহাকে বেশ সুন্দর দেখিতে, সাহেবের মত চেহারা। কবে হয়তো ইহাকে পড়াইয়াছিলেন মনে নাই, তবুও তো তাঁহাদের স্কুলের ছাত্র। আজ দু পয়সা করিয়া খাইতেছে। বিলাত-ফেরত য়্যাসিস্ট্যান্ট এঞ্জিনীয়ার—এরকম হয়তো কত ছাত্র কত দিকে আছে, সকলের সন্ধান তো জানা নাই।

এইটুকু ভাবিয়াই সুখ। এই ছাত্রের দল তাহাদের বাল্যজীবনের শত সুখস্মৃতির আধার, তাহাদের স্কুল ও স্কুলের শিক্ষকদের ভুলে নাই; কেহ আছে বর্মায়, কেহ আছে সিমলায়, কেহ বা কুমায়ুন, শিলং, মসলিপত্তনে। তবুও দেশের আশা-ভরসাস্থল পুত্র-প্রতিম এই সব তরুণ দল একদিন তাঁহাদেরই হাতে চড়টা চাপড়টা খাইয়া ইংরেজী ব্যাকরণের নিয়ম শিখিয়াছে, বীজগণিতের জটিল রহস্য বুঝিয়াছে—ভাবিয়াও আনন্দ হয়।

ক্ষেত্রবাবু পাশের গলিতে ঢুকিয়া টুইশানি-পড়া ছাত্রের বাড়ি কড়া নাড়িলেন।

চৈত্র মাস। ঈস্টারের ছুটি আজই হইয়া গেল। যদুবাবু মেসে ফিরিয়া দেখিলেন, অবনী চিঠি লিখিয়াছে—তিনি যদি এই মাসের মধ্যে বউদিদিকে এখান হইতে লইয়া না যান, তবে সে বউদিদিকে কলিকাতায় আনিয়া যদুবাবুর মেসে রাখিয়া যাইবে।

মাত্র পাঁচটি টাকা হাতে—স্কুলের টাকা এ মাসে সামান্যই পাওয়া গিয়াছিল কোন্ কালে খরচ হইয়া গিয়াছে মেসের দুই মাসের দেনা মিটাইতে। সামান্য কিছু স্ত্রীকে পাঠাইয়াছিলেন। এ পাঁচটা টাকা টুইশানির অগ্রিম আদায়ী আংশিক মাহিনা। স্ত্রীকে রাখিবার কোন অসুবিধা হইত না বেড়াবাড়ি, যদি নিজের বাড়ি ঘর সেখানে থাকিত। কিন্তু পৈতৃক বাড়ি ভূমিসাৎ হওয়ার পরে যদুবাবু সেখানে আর যান নাই, সেই হইতেই পথে পথে, বাসায়। আজ দেড় বৎসরের উপর, স্ত্রীকে বেড়াবাড়ি পরের সংসারে ফেলিয়া রাখিয়াছেন,—ইচ্ছা করিয়া কি? তাহা নয়। নিরুপায় হিসাবে।

এখন স্ত্রীকে গিয়া ওখান হইতে সরাইতেই হইবে।

নতুবা ইতর অবনীটা সত্য সত্যই হয়তো স্ত্রীকে একদিন মেসে আনিয়া হাজির করিবে। লোকটা কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন কিনা।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া যদুবাবু টিকিট কাটিয়া সিরাজগঞ্জ-প্যাসেঞ্জারে রাত্রে রওনা হইলেন এবং শেষ রাত্রে বগুলা নামিয়া, স্টেশনে রাত কাটাইয়া, পরদিন সকালে সাত ক্রোশ হাঁটিয়া বেলা আড়াইটার সময় গলদঘর্ম ও অভুক্ত অবস্থায় বেড়াবাড়ি পৌঁছিলেন।

অবনী বলিল, আসুন দাদা, তা একেবারে ঘেমে—এঃ, ওরে নিতে কাপালীকে ডেকে এনে গাছ থেকে দুটো ডাব পাড়ার ব্যবস্থা কর। হাত পা ধুয়ে নিন—তারপর ভাল সব?

যদুবাবু ঠাণ্ডা হইলেন। স্ত্রীকে দেখিয়া কিন্তু চমকিয়া উঠিলেন। অবনীর বিধবা

দিদি ক্ষান্ত বলিল, বউ প্রায় কেবল জ্বরে ভুগেচে ওদিকে এই মাসখানেক ফাগুনে হাওয়া পড়ে একটু ভাল আছে। তাও দুবার পড়ল। ঘোর মেলেরিয়া এ সব দিকে। দেখ না, ওই অবনীর ছেলেমেয়েগুলো ভুগে ভুগে হাড্ডি-সার। না একটু ওষুধ, না চিকিচ্ছে—কোথায় পাবে? সামান্য আয়, এদিকে সকালে উঠে দু কাঠা চালের খরচ। বোস, একটা ডাব কেটে আনি ভাই—

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল। বেচারীর ভাগ্যে আজ প্রায় এক বছর পরে তাঁহার দর্শনলাভ ঘটিল।

যদুবাবু বলিলেন, কেঁদো না। এঃ, তোমার চেহারা দেখতে বড্ডই—

—হ্যাঁ, বড্ডই! মরে যাচ্ছিলাম কার্তিক মাসে। মরে বেঁচে উঠেচি। আচ্ছা, মানুষ কী করে এমন হতে পারে? এত করে চিঠি দিলাম, একবার চোখের দেখা—

—তুমি তো বললে চোখের দেখা। হাতে পয়সা না থাকলে তো আর—

—হ্যাঁ গো, যদিই মরেই যেতাম, তা হলে একবার তোমার সঙ্গে দেখাটাও যে হত না!

—সে সবই বুঝলাম। আমার অবস্থাটা তোমরা দেখবে না তো? তোমাদের কেবল—

যদুবাবু স্ত্রী ঝাঁজের সহিত বলিল, অমন কথা বলো না। মুখে পোকা পড়বে। আমি যেমন নীরবে সয়ে গেলাম, এমন কেউ সহ্য করবে না, তা বলে দিচ্ছি। রাত্রে জ্বরে পড়েচি, শুধু মন হাঁপিয়েচে—মরে গেলে তোমাকে একটিবার চোখের দেখাটা হল না বুঝি, তাও কাউকে আমি বিরক্ত করি নি। চারিদিক চাহিয়া সুর নিচু করিয়া বলিল, আর এমন চামার! এমন চামার! এক পয়সার সাবু না, এক পয়সার মিছরি না। বরং তুমি যে টাকা পাঠাতে মাসে মাসে, তা থেকে কেবল আজ দাও এক টাকা, কাল দাও আট আনা—ওই অবনী ঠাকুরপো। না দিলেও চক্ষুলজ্জা, ওদের বাড়ি, ওদের ঘরে জায়গা দিয়েচে। জায়গা দিয়েচে কি অমনি! ওই টাকাটা সিকেটা তো আছেই—আর এদিকে বাক্যির জ্বালা কী! এক-একদিন ইচ্ছে হত—এই সত্যি বলচি দুপুরবেলা—ব্রাহ্মণের সামনে মিথ্যে বলি নি—যে, গলায় দাঁড় দিয়ে মরি—

এই সময়ে অবনীর বিধবা দিদি (তিনি যদুবাবুরও বড়) ডাব কাটিয়া আনিয়া বলিলেন, বউ, এক গ্লাস জল নিয়ে এস, আর এই রেকাবিতে দুখানা বাসোতা—কোথায় কী পাব বল ভাই! বাসোতা দুখানা খেয়ে একটু জল—আমি গিয়ে ভাত চড়াই।

যদুবাবুর স্ত্রী জলহাতে আসিয়া বলিল, ঠাকুরঝি লোকটা এই বাড়ির মধ্যে ভাল লোক। নইলে বউ—ও বাবাঃ—খুরে নমস্কার! বলিয়া উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া, জলের গ্লাসটা যদুবাবুর সম্মুখে নামাইয়া রাখিল।

বৈকালের দিকে অবনী বলিল, দাদার কি এখন গুড ফ্রাইডের ছুটি?

—হ্যাঁ।

—কদিন?

—মঙ্গলবার খুলবে। ওই দিনই ওকে নিয়ে যাব ভাবচি।

—তাই নিয়ে যান। এখানে বউদিদির শরীরও টিকচে না, মনও টিকচে না। তাই কখনও টেকে? আপনি রইলের পড়ে কলকাতায়, উনি রইলেন এখানে। ছেলে নেই, পিলে নেই। আপনার বউমার কাছে কেবল কান্নাকাটি করেন, দুঃখু করেন। নিয়ে যান, সেই ভাল। তা ছাড়া আমাদের এখানে অসুবিধে। ঘরদোর নেই—দুখানি মাত্র ঘর। আবার আমার ছোট ভগ্নীপতি শিশির নাকি আসবে শুনছি ছেলেমেয়ে নিয়ে—কতদিন আসে নি। তারা এলেই বা কোথায় থাকে? তাই বলি, দাদাকে চিঠি লিখি, দাদা এসে ওঁকে নিয়েই যান।

—না, তুমি যা করেছ, যথেষ্ট উপকার করেছ। এতদিন কে রাখে! যাই, একটু বেড়িয়ে আসি—

এ বেড়াবাড়ি গ্রামের বাহিরে খুব বড় বড় মাঠ—আধ মাইল, কি তারও কম দূরে চুনী নদী। নদীর ধারে খেজুরগাছ, নিমগাছ ও ভাঁটসেওড়ার বন। এখন নিমফুলের সময়, চৈত্রের তপ্ত বাতাসে নিমফুলের সুবাস-মাখানো ঘেঁটুফুলের দল কিছুদিন আগে ফুটিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে—এখন শুধু রাঙা রাঙা সুঁটির মেলা ভাঁটগাছের মাথায় মাথায়।

উত্তর দিকের মাঠে প্রকাণ্ড একটা কচিপাতা-ভরা বটগাছের শীর্ষদেশ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া। কিছুদিন আগে সামান্য বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, চষা-ক্ষেতের মাঝে মাঝে জল জমিয়া ছিল, এখনও আধশুকনো কাদায় তার চিহ্ন আছে। একটা তুঁতগাছের তলায় অনেক শুকনো তুঁতফল পড়িয়া আছে। যদুবাবু একটা তুঁতফল কুড়াইয়া মুখে দিলেন—মনে পড়িল, বাল্যকালে এই সময় তুঁতফল খাওয়ার সে কত আগ্রহ। কোথায় গেল সে সব সুখের দিন। বাবা গোয়াড়ি কোর্টে কাজ করিতেন, শনিবারে শনিবারে গ্রামের বাড়িতে আসিতেন, হাঁড়ি-ভর্তি খাবার আনিতেন ছেলেমেয়ের জন্য। তাঁহাদের বাড়িতে মোংলা বলিয়া এক গোয়ালা-ছোঁড়া থাকিত। সরভাজা খাইবার লোভে সে ছুটিয়া গিয়া রাস্তায় দাঁড়াইত—কর্তা হাঁড়ি-হাতে আসিতেছেন, না শুধু হাতে আসিতেছেন দেখিবার জন্য।

নদীতে ডিঙি-নৌকায় জেলেরা মাছ ধরিতেছে। যদুবাবু বলিলেন, কী মাছ রে?

—আজ খয়রা আছে কর্তা।

—দিবি চার পয়সার, যাব? অনেক দিন দেশের খয়রা মাছ খাই নি। টাটকা খয়রা মাছটা—

যদুবাবু অবনীর দিদির হাতে মাছ দিয়া বলিলেন, ও দিদি, এই নাও। দেশের খয়রা মাছ কত কাল খাইনি!

রাত্রে পাড়ায় এক জায়গায় সত্যনারায়ণের সিন্নি উপলক্ষ্যে যদুবাবু অবনীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ি গেলেন। বাড়ির কর্তা যদুবাবুকে যথেষ্ট খাতির করিয়া বসাইল, তামাক সাজিয়া আনিল নিজের হাতে। তাহার বড় ছেলের একটা চাকরি হইতে পারে কি না কলিকাতায়? ছেলেটিকে ডাকিয়া আনিয়া পরিচয় করাইয়া দিল। ম্যাট্রিক দুইবার ফেল করিয়া সম্প্রতি আজ বছর খানেক বসিয়া আছে। পূর্বেকার অভিজ্ঞতা হইতে যদুবাবু সাবধান হইয়াছিলেন, আবার কলিকাতার মেসে, কি বাসায় জুটিয়া উৎপাত করিতে শুরু করিলেই চক্ষুস্থির। পাড়াগাঁয়ের লোককে বিশ্বাস নাই। সুতরাং তিনি বলিলেন, তিনি চেষ্টা করিবেন, তবে এখন কিছু বলিতে পারেন না—আজকাল কত বি-এ-এম-এ পাস ফ্যা-ফ্যা করিতেছে, তা ম্যাট্রিক।

রাত্রে স্ত্রীকে বলিলেন, তা হলে আর একটা মাস এখানে—

—না, তা হবে না। আমায় নিয়ে যাও এবার।

—কিন্তু কোথায় নিয়ে যাই বল তো?

—তা তুমি বোঝ।

যদুবাবু মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিলেন, তুমি বোঝ! বুঝি কী, সেটা আমায় দেখিয়ে দাও। কলকাতায় কি বাসা ঠিক করে রেখে এসেছি যে, তোমায় নিয়ে ওঠাব? উঠবে কোথায়? শেয়ালদা ইস্টীশানে বসে থাকবে?

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে লাগিল।

—আঃ, কী মুশকিলেই পড়েছি বিয়ে করে! ঝাড় হাত-পা থাকলে আজ আমার ভাবনা কি? তোমার ভাবনা ভাবতে ভাবতেই প্রাণ গেল।

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আমার ভাবনা কী ভাবতে হচ্ছে তোমায়? ফেলে রেখেছ এখানে আজ দেড় বছর—জ্বরে ভুগে ভুগে আমার শরীরে কিছু নেই, তাও তোমাকে কি কিছু বলেছি? মুখনাড়া আর খোঁটা দুটি বেলা হজম করতে হত যদি আমার মত, তবে বুঝতে। এততেও তোমার কাছে ভাল হলাম না! তার চেয়ে আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরি, তুমি ঝাড়া হাত-পা হও, আপদ চুকে যাক।

—আচ্ছা, থাম থাম, রাত-দুপুরে কান্নাকাটি ভাল লাগে না। ঘুম আসচে। ওরা শুনতে পাবে—এক ঘর এক দোর, দেখি যা হয়—

—তুমি এবার না নিয়ে গেলে অবনী ঠাকুরপো শুনবে নাকি? স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ হয়েছে এবার আমাকে তোমার সঙ্গে ওরা পাঠিয়ে দেবেই। ওদের বাড়িতে জায়গা হচ্ছে না—ওর ভগ্নীপতি নাকি আসবে শুনছি এ মাসের শেষে। সত্যিই তো, ঘরদোর নেই, ওদের অসুবিধে হয় বইকি। এতদিন তো রাখলে।

—হাঁ, রেখেছে তো মাথা কিনেচে কি না! ভারি করেচে! আর আমার মেসে গিয়ে

যে সাত দিন থেকে এল, আজ সিনেমা রে, কাল ইয়ে রে, তখন?

—তুমি বুঝি অবনী-ঠাকুরপোকে টাকা দাও নি সেবার, সে কী খোঁটা, আর তোমার নামে কী সব কথা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে দিনরাত! আমি বলি, আর তো আমার সহ্যি হয় না, এক দিকে চলেই যাই, কি, কী করি! এত কষ্ট গিয়েছে সে সময়।

—আচ্ছা, থাক্ সে-সব কথা এখন। রাত হয়েছে ঘুম আসছে—সারাদিন খাটুনি আর রাত্তির কালে ভ্যাজর-ভ্যাজর ভাল লাগে না।

যদুবাবু বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রী নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। কিছুকাল পরে বলিল, ঘুমুলে নাকি? ওগো!

যদুবাবু বিরক্তির সুরে বলিল, আঃ, কী?

—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় এবার এখানে রেখে যেয়ো না। আমি আর সহ্য করতে পারছি নে—তুমি বোঝ। কখনও তো তোমায় এমন ক'রে বলি নি—কেবল ওই ঠাকুরঝির জন্যে এখানে এতদিন থাকতে পেরেচি। নইলে কোন্ কালে এতদিন—একবার রটিয়ে দিলে, তুমি নাকি বিয়ে করেছ, আমার ছেলেপিলে হল না বলে। বলে, দাদা সেইজন্যেই বউদিদিকে ত্যাগ করে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে গিয়েছে। সে কত কথা! আমি ভেবে কেঁদে মরি। শুধু ঠাকুরঝি আমায় বোঝাত, বউ, তার কি এখন বিয়ের বয়স আছে যে, বিয়ে করবে? তুমি ওসব শুনো না।

—তুমিও কি ভাব নাকি আমার বিয়ের বয়স নেই?

—বয়েস থাকলে কী হবে, একটা বিয়ে করে তাই খেতে দিতে পার না, দুটো বিয়ে করে তোমার উপায় হবে কী? কুঁজোর সাধ হয় চিত হয়ে শুতে—

এই কথায় যদুবাবুর পৌরুষের অভিমান ভীষণভাবে আহত হওয়ায় তিনি আর কোন কথা না বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন এবং বোধ হয় অনেকক্ষণ পরেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

চুনি এবার থার্ড ক্লাসে উঠিল। চেহারা আরও সুন্দর হইয়াছে, ওষ্ঠে গোঁপের ঈষৎ রেখা দেখা দিয়াছে।

নারাণবাবু পড়াইতে গিয়া তাহার সঙ্গে গল্প করেন নানা বিষয়ে—চুনিকে ছাড়িয়া যেন উঠিতে ইচ্ছা হয় না। চুনির মধ্যে একটি সুদুর্লভ রহস্য ও বিস্ময়ের ভাণ্ডার যেন গুপ্ত আছে, নারাণবাবু নানা কথায় ও প্রশ্নে সেই রহস্য-ভাণ্ডারের সন্ধান খুঁজিয়া বেড়ান। চুনি আসিবামাত্র নারাণবাবু কেমন আত্মহারা হইয়া যান—ভাল করিয়া পড়াইতেও যেন পারেন না, কেবল তাহার সহিত গল্প করিতে ইচ্ছা করে। অথচ চুনি তাঁহাকে কী দিতে পারে? তাঁহাকে সে রাজা করিয়া দিবে না, নারাণবাবু তাহা ভালই জানেন; তবুও কেন এমন হয়, কে জানে? মাস্টার পড়াইতে আসিয়া ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকায়, উঠিতে পারিলে বাঁচে; অথচ নারাণবাবুর উঠিতে ইচ্ছা করে না, রাত্রি বেশী হইয়া যায়, চুনি পান্না ঘুমে ঢুলিয়া পড়ে, কলিকাতার কলকোলাহল নীরব হইয়া আসে। নারাণবাবু ধমক দিয়া বলেন, এই চুনি, এই পান্না, ঢুলছিস নাকি? পান্না চমকিয়া উঠিয়া বইয়ের পাতায় মন দিবার চেষ্টা করে, নিচু সলজ্জ সুরে বলে, ঘুম আসছে স্যার্, রাত অনেক হল—

চুনির মায়ের সুর খোলা দ্বারপথে ভাসিয়া আসেঃ আজ তোদের কি হবে না নাকি? সারা রাত বসে ভ্যাজর ভ্যাজর করলেই বুঝি ভাল পড়ানো হয়?

পরে ঈষৎ নেপথ্য হইতে শ্রুত হইল সেই একই কণ্ঠের সুরঃ বুড়ো মাস্টারটা বসে বসে করে কী এত রাত পর্যন্ত? এত করে বলি ওঁকে, বুড়ো মাস্টার বদলে ফেল—বুড়ো দিয়ে কি নেকাপড়া হয়?

চুনি লাফাইয়া উঠিয়া বাড়ির মধ্যে মাকে হয়তো বা মারিতে ছোটে।

নারাণবাবু ধমক দিয়া চিৎকার করিয়া বলেন, এই চুনি কোথায় যাস্? পান্না যা তো তোর দাদাকে ধরে নিয়ে আয়।

কিছুক্ষণ পরে চুনি ছুটোছুটিতে ঘর্মাক্ত রাঙা মুখে আসিয়া বসিয়া হাঁপাইতে থাকে

—কোথায় গিয়েছিলি?

—কোথাও না স্যার্।

—এই সব স্নান হচ্ছে তোমার, না?

—না স্যার্। আপনি তাই সহ্য করেন, আপনার খেয়াল নেই কোনও দিকে। আমাদের বাড়িতে আসেন, তা আমাদের কত ভাগ্যি। রোজ রোজ মা এরকম করবে, আমি—

—ছিঃ, মার সম্বন্ধে কোন কথা বলতে নেই ছেলের। মায়ের বিচার কি ছেলে করবে? আমারই দেরি হয়ে গিয়েছে আজ, উঠি বরং—

—না স্যার্, বসুন না আপনি।

চুনির মার কণ্ঠস্বর পুনরায় দ্বারপথে শ্রুত হইল: খাবি নে পোড়ারমুখো ছেলে? বামনী কি এত রাত পর্যন্ত তোমাদের ভাত নিয়ে বসে থাকবে নাকি?

নারাণবাবু লজ্জিত কৈফিয়তের সুরে অন্তরালবর্তিনীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বউমা, আমি এই যে যাই—যাচ্ছি—একটু দেরি হয়ে গেল আজ—

ঈষৎ নম্রসুরে উদ্দেশে উত্তর আসিল, ভাত নিয়ে থাকতে হয় ঠাকুরঝি, তাই বলি। নইলে মাস্টার পড়াচ্ছে, পড়াক না—আমি কি বারণ করি?

নারাণবাবু গলির ভিতর দিয়া চলিয়া আসিলেন, মনে অভূতপূর্ব আনন্দ। চুনি তাঁহার দিকে হইয়া মাকে মারিতে গিয়াছিল, তাঁহাকে চুনি তবে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, ভক্তি করে! কেন এ আনন্দ রাখিবার জায়গা নাই, বৃদ্ধ নারাণবাবু তা বুঝিতে পারেন। তাঁহার কেহ আপনার জন নাই এ বিশাল দুনিয়ায়; তবু চুনি আছে, বড় হইলে তাঁহাকে দেখিবে।

স্কুল বাড়ির বড় ছাদে রাত্রে আহারাদির পর নারাণবাবু পায়চারি করেন—বহুকালের অভ্যাস। আকাশের নক্ষত্ররাজি এই তেতলার ছাদ হইতে বেশ দেখা যায় বলিয়াই নারাণবাবু এইসময়ে উন্মুক্ত আকাশতলে বেড়াইতে ভালবাসেন। ডাকিলেন, ও জগদীশ ভায়া, খাওয়াদাওয়া হল?

টীচারদের ঘরের পাশে ক্ষুদ্র টিনের একখানি চালায় জ্যোতির্বিনোদ মাছ ভাজিতেছিলেন, উত্তর দিলেন, না দাদা, এই ছেলে পড়িয়ে এসে রান্না চড়িয়েছি। ও দাদা, আজ কী হয়েছিল জানেন?—বলিতে বলিতে জ্যোতির্বিনোদ বাহিরে আসিলেন: আজ ওই লাল বাড়ির সেই যে ছেলেটা ছাদে উঠে ডন্ কষত, সে আজ নতুন বউ নিয়ে বাড়ি এসেছে—পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে বিয়ে হয়েছিল, আজ বউ নিয়ে এল।

নারাণবাবু আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন বউ হল?

—খাসা বউ হয়েছে—ওরই তত ফরসা, দুজনে ছাদে বেড়াচ্ছিল, খুব হাসিখুশি—

—আহা, তা হোক, তা হোক—

—যাই দাদা, মাছ পুড়ে গেল কড়ায়।

কী জানি কেন, নারাণবাবুর হঠাৎ মনে পড়িল একটা ছবি। চুনি বিবাহ করিয়া বউ আনিয়াছে, যেমন চমৎকার রূপবান ছেলে, তেমনি লক্ষ্মী-প্রতিমার মত বধূ। পুত্রবধূর সাধ তাঁহার মিটিয়াছে। চুনি বলিয়াছে, আমার বউ স্যার্, আপনার সেবা করবে না তো কার সেবা করবে? চুনি পুরীতে বউ লইয়া বেড়াইতে গিয়াছে, সঙ্গে তাঁহাকে লইয়া গিয়াছে, কারণ তাঁহার শরীর খারাপ। পুত্রের কর্তব্য করিয়াছে সে।

চুনির বউ বলিতেছে, বাবা, আপনার পায়ে কি এ বেলা তেল মালিশ করতে হবে?

স্বপ্নাচ্ছন্ন অতীত দিবসগুলির কুয়াশা ভেদ করিয়া কত অস্পষ্ট মুখ উঁকি মারে! দুপুরের সময় টিফিনের ছুটিতে কিংবা বেলা পড়িলে কতবার তিনি এই রকম ছাদে বেড়াইতেন, এই ছাদটিতে উঠিলেই সেই পুরানো দিন, তাহাদের সঙ্গে জড়িত কত মুখ মনে পড়ে!

একখানি মুখ মনে পড়ে—সুন্দর মুখখানি, ডাগর চোখে নিষ্পাপ দৃষ্টি, আট-ন বছরের ছেলে, নাম ছিল সুদেব। মুখের মধ্যে লেবেনচুষ পুরিয়া দিত, তখন নারাণবাবুর মাথার চুলে সবে পাক ধরিয়াছে, টিফিনের সময় রোজ পাকা চুল আটগাছি দশগাছি তুলিয়া দিত। বলিত, আপনাকে ছেড়ে কোন স্কুলে যাব না স্যার্।

তারপর আর ভাল বলে মনে হয় না—অগণিত ছাত্র সমুদ্রে দূর হইতে দূরান্তরে

তাহাদের অপর্যপ্রিয়মান মুখ কখন যে হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল, তার হিসাব মনের মধ্যে খুঁজিয়া মেলে না আর। জীবনের পথ বহু পথিকের আসা-যাওয়ার পদচিহ্নে ভরা, কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট।

ঘরে আসিয়া শুইবার ইচ্ছা হইল না, নারাণবাবু আবার ডাকিলেন, ও জগদীশ, কী করলে রান্নাবান্না?

জ্যোতির্বিনোদ অন্নপিণ্ডরুদ্ধ স্বরে বলিলেন, খেতে বসেচি দাদা।

—আচ্ছা, খাও খাও—

এই স্কুলবাড়ির ছোট ঘরটিতে কত কাল বাস! কত সুপরিচিত পরিবেশ, কত সুদূর অতীতের স্মৃতিভরা মাস, বৎসর, যুগ! আশপাশের বাড়ির গৃহস্থ-জীবনের কত সুখ, আনন্দ, সঙ্কট তাঁহার চোখের উপর ঘটিয়া গিয়াছে। মনে মনে তিনি এই অঞ্চলের পাড়া-সুদ্ধ ছেলে মেয়ে, তরুণী কন্যা বধূদের বুড়ো দাদু, যদিও তাহাদের কেহই তাঁহাকে জানে না, চেনে না। আদর্শ শিক্ষক অনুকূলবাবুর স্মৃতিপূত এই বিদ্যালয়গৃহ, এ জায়গা যে কত পবিত্র—কী যে এখানে একদিন হইয়া গিয়াছে, তার খোঁজ রাখেন, শুধু নারাণবাবু।

আজ মনে এত আনন্দ কেন?

কী অপূর্ব আনন্দ, একটা তরুণ মনের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি আজ তিনি আকর্ষণ করিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন। অনুকূলবাবু বলিতেন, দেখ নারাণ, একটা বেলগাছে বছরে কত বেল হয় দেখেচ? একটা বেলের মধ্যে কত বিচি থাকে, প্রত্যেক বিচিটি থেকে এক হাজার মহীরুহ জন্মাতে পারে। কিন্তু তা জন্মায় না। একটা বেলগাছের ষাট-সত্তর বৎসরব্যাপী জীবনে অত বিচি থেকে গাছ জন্মায় না—অন্তত দুটি বেলচারা মানুষ হয়, বড় হয়, আবার বহু বেল ফল দেয়। বহু অপচয়ের হিসেব কষেই এই পৃষ্টির ইঞ্জিনীয়ারিং দাঁড় করিয়ে রেখেছেন ভগবান। তার মধ্যেই অপচয়ের সার্থকতা। স্কুলের সব ছেলে কি মানুষ হয়? একটা স্কুল থেকে ষাট বছরে দুটো-একটা মানুষ বার হলেও স্কুলের অস্তিত্ব সার্থক। এই ভেবেই আনন্দ পাই নারাণ। প্রত্যেক শিক্ষক, যিনি শিক্ষক নামের যোগ্য—এই ভেবেই তাঁর আনন্দ ও উৎসাহ। দেশের সেবায় সব চেয়ে বড় অর্ঘ্য তাঁরা যোগান—মানুষ।

জ্যোতির্বিনোদ নারাণবাবুর সামনে বিড়ি খান না। আড়ালে দাঁড়াইয়া ধূমপান শেষ করিয়া ছাদের এধারে আসিয়া বলিলেন, দাদা, এখনও খান নি? রাত অনেক হয়েছে।

—না, খাব না, শরীরটা আজ তেমন ভাল নেই।

—কী হয়েছে দাদা? দেখি, হাত দেখি? তাই তো, আপনার যে জ্বর হয়েছে। ছাদে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বেড়াবেন না, বেশ গা গরম। চলুন, নীচে দিয়ে আসি।

—বোস বোস। এ একটু-আধটু গা-গরমে কিছু আসবে-যাবে না। আকাশের নক্ষত্র চেন? তুমি তো জ্যোতিষ নিয়ে ব্যবসা কর। অ্যাস্ট্রনমি জান? ওই যে এক-একটা নক্ষত্র দেখছ—এক-একটা সূর্য। আমি যদি বলি, এই পৃথিবীর মত বহু হাজার পৃথিবী ওই সব নক্ষত্রের মধ্যে আছে, তা হলে তুমি কি তার প্রতিবাদ করতে পার?

—আজ্ঞে না দাদা, প্রতিবাদ তো দূরের কথা—আমি কথাটি বলব না, আপনি যত ইচ্ছে বলে যান। যখন ও নিয়ে কখনও মাথা ঘামাই নি—আপনি যেমন জ্যোতিষ আলোচনা করেন নি কখনও—বলেন, ওসব মিথ্যে।

—মিথ্যে বলি নে, আন্‌সায়েন্টিফিক্‌ বলি।

—ওই একই কথা দাদা। দু পয়সা করে খাই, কাজেই বিশ্বাস করি।

নারাণবাবু ঘরে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। রাত্রে ভয়ানক পিপাসা। সমস্ত গায়ে ব্যথা। ঘুমের ঘোরে আর জ্বরের ঘোরে কত কী অস্পষ্ট স্বপ্ন দেখিলেন—চুনির মুখ, তাঁহার ছেলে নাই, কেহ কোথাও নাই। কেন! এত ছাত্র আছে, চুনি আছে, শিয়রে চুনি বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে।

পরদিন নারাণবাবু সকালে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। দুই-চার দিন গেল, তবুও জ্বর কমে না। ক্ষেত্রবাবু ও রামেন্দুবাবু প্রায়ই আসিয়া বসিয়া থাকেন।

হেডমাস্টার প্রথমে নিজের ঔষধের বাক্স হইতে বাইওকেমিক দিলেন, তারপর ডাক্তার ডাকাইলেন। জ্যোতির্বিনোদ কোথা হইতে নিজের দেশের এক কবিরাজ আনিলেন। ছাত্রেরা কেহ কেহ দেখিয়া গেল। পালা করিয়া রাত জাগিতেও লাগিল।

সকালে স্কুলের মাস্টারেরা দেখিতে আসিয়া খবরের কাগজে একটা খুনের সংবাদ শুনাইয়া গিয়াছিল। নারাণবাবু শুইয়া ভাবিতেছিলেন, মানুষে কী করিয়া খুন করে? একবার তিনি এই স্কুলের ঘরেই রাত্রে আলো জ্বালিয়া পড়িতেছিলেন, ডেয়ো-পিঁপড়ের দল আসিয়া জুটিল লণ্ঠনের আশেপাশে—চাপড় মারিয়া গোটা তিনেক ডোয়ো-পিঁপড়ে মারিয়াছিলেন। তারপর সে কী দুঃখ তাঁহার মনে! একটা ডোয়ো-পিঁপড়ে আধ-মরা অবস্থায় ঠ্যাং নাড়িয়া চিত হইয়া ছটফট করিতেছিল, সেটাকে বাঁচাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই সেটাকে বাঁচানো গেল না। নারাণবাবুর মনে হইল, তিনি জীবহত্যা করিয়াছেন—দুঃখ ও অনুতাপে নিজেকে অতি নীচ বলিয়া বিবেচনা হইল। কী জানি, মানুষকে বিচার করার ভার মানুষের উপর নাই। তিনি যে খুনী নহেন, তাহা কে বলিবে?

নারাণবাবু শুইয়া যেন সমস্ত জীবনের একটা ছবি চোখের সামনে খেলিয়া যাইতে দেখিতে পান। তারাজোল গ্রামের উত্তরে প্রকাণ্ড তালদীঘি, তাহার পাড়ে ঘন তালের বন, কোনকালে রাঢ় অঞ্চলের ঠ্যাঙাড়ে ডাকাতেরা সেই দীঘির পাড়ে মানুষ মারিত। কাঁটা-জঙ্গলের ঝোপ, আঁচোড় বাসক ফুলের গাছ নিবিড় হইয়া উঠিয়া মানুষের উগ্র লোলুপতার লজ্জা শ্যামল শান্তি ও বনকুসুমের গন্ধে ঢাকিয়া দিয়াছে। চীনা পর্যটক আই সিং যেমন বলিয়াছেন—মন ও অন্তঃকরণের তৃষ্ণা হইতেই দুঃখ আসে, পুনর্জন্ম আসে। কিন্তু তৃষ্ণা দূর কর, লোভকে ঢাকিয়া মনে শান্তি স্থাপন কর—ভ্রমসমুদ্রে মানবাত্মার পরিভ্রমণ শেষ হইবে! না, কী যেন ভাবিতেছিলেন—তারাজোল গ্রামের তালদীঘির কথা। মনের মধ্যে উলটাপালটা ভাবনা আসিতেছে।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বের সেই হুগলী জেলার অন্তঃপাতী ক্ষুদ্র গ্রামখানি আজ আবার স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, মুখুজ্জেবাড়ির ছেলে ছনু ছিল সঙ্গী, ছনুর সঙ্গে বাঁশতলায় বাঁশের শুকনো খোলা কুড়াইয়া আনিয়া নৌকা করিতেন। একবার তেঁতুল-গাছে উঠিয়া তেঁতুল পাড়িতে গিয়া হাত ভাঙিয়াছিলেন, সাত ক্রোশ হাঁটিয়া দামোদরের বন্যা দেখিতে গিয়া পথে এক গ্রামে কামারবাড়ি রাত্রে তিনি ও তাঁহার দুইজন বালক সঙ্গী চিঁড়া-দুধ খাইয়া তাহাদের দাওয়ায় শুইয়া ছিলেন—যেন কালিকার কথা বলিয়া মনে হইতেছে। কতকাল তারাজোল যাওয়া হয় নাই!

কেহ নাই আপনার লোক সে গ্রামে। বহুদিন আগে পৈতৃক বাড়ি ভাঙিয়া-চুরিয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে তিন দিনের জন্য তারাজোল গিয়া প্রতিবেশীর বাড়ি কাটাইয়া আসিয়াছিলেন, আর যান নাই। তখনই বাল্যদিনের সে বাড়িঘর জঙ্গলাবৃত ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইয়াছে দেখিয়াছিলেন—হাঁ, প্রায় ত্রিশ বৎসর হইবে।

নারাণবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন।

জ্যোতির্বিনোদ ও যদুবাবু একসঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন।

যদুবাবু বলিলেন, কেমন আছেন দাদা? এই দুটো কমলালেবু—ওহে জ্যোতির্বিনোদ, দাও না রস ক'রে।

শ্রীশবাবু উঁকি মারিয়া বলিলেন, কে ঘরে বসে?

যদুবাবু বলিলেন, এই আমরাই আছি। এস শ্রীশ ভায়া।

—দাদা কেমন?

—এই একটু কমলালেবুর রস খাওয়াচ্ছি।

নারাণবাবুর তৃষিত দৃষ্টি দোরের দিকে চাহিয়া থাকে। দুই দিন, তিন দিন, কোন দিনই চুনিকে দেখিতে পান না। চুনি আসে না কেন? বোধ হয় সে শোনে নাই তাঁহার অসুখের কথা।

সকলে চলিয়া যায়। গম্ভীর রাত্রি। টিমটিম করিয়া আলো জ্বলিতেছে।

উত্তর মাঠে গ্রামের বাঁশবনের ও-পারে দুইটি লোক আকন্দগাছের পাকা ও ফাটা ফল সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছে—তুলা বাহির করিয়া খেলা করিবে। তিনি আর ছনু। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বের তারাজোল গ্রাম। ছনু বাঁচিয়া নাই—প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে মারা গিয়াছে।...

—কে?

—আমি কমলেশ স্যার্, আমাদের নাইট-ডিউটি আজ। বিমলও আসছে।

—নারাণবাবু বলিলেন, হ্যাঁ কমলেশ, চুনিকে চিনিস?

—না স্যার্।

—থার্ড ক্লাসে পড়ে—ভাল নামটা কী যেন! দীপ্তি বোধ হয়।

—হ্যাঁ স্যার্।

—কাল একবার বলবি বাবা—

নারাণবাবু হাঁপাইতে লাগিলেন। কথা বলিবার শ্রম সহ্য হয় না।

—বলব স্যার্ আপনি বেশী কথা বলবেন না—গরম জলটা কীর। মালিশটা—

পরদিন সকাল হইতে নারাণবাবু আর মানুষ চিনতে পারেন না।

কমলেশ ও বিমল চুনিকে গিয়া বলিল। চুনি মহাব্যস্ত, আজ তাহাদের পাড়ার ম্যাচ, তাহাকে ব্যাকে খেলিতে হইবে। আচ্ছা, খেলার পর বরং—রাত্রেই সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে।

চুনি আসিয়াছিল, কিন্তু নারাণবাবু আর তাহাকে চিনিতে পারেন নাই। লোকে বলিতেছিল, তাঁহার জ্ঞান নাই। সে কথা আসলে ঠিক নয়। তিনি তখন তারাজোল গ্রামের মাঠে, বনে, দামোদরের বাঁধে বাল্যসঙ্গী ছনু আর গদাই নাপতের সঙ্গে আকন্দ-গাছের ফলের তুলা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলেন, পঞ্চাশ বৎসর আগের দিনগুলির মত। চুনির কণ্ঠস্বরও তাঁহাকে সেখান হইতে ফিরাইতে পারিল না।

কখনও বা অনুকূলবাবু তাঁহাকে বলিতেছিলেন, নারাণ, মানুষ তৈরি করতে হবে। তুমি আর আমি দুজনে যদি লাগি—।...বউবাজারে এই স্কুলের একটা ব্রাঞ্চ খুলব সামনের বছর থেকে। তুমি হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার...সব বেল ফলের বিচি থেকে কি চারা হয়? বহু অপচয়ের অঙ্ক হিসেবে ধরেই ভগবানের এই সৃষ্টি। ভগবানের গৃহস্থালী কৃপণের গৃহস্থালী নয় নারাণ।

স্কুল-মাস্টারের মধ্যে সবাই তাঁহার খাটিয়া বহন করিয়া নিমতলায় লইয়া গেল। হেডমাস্টার নিজের পয়সায় ফুল কিনিয়া দিলেন। অনেক ছাত্রও সঙ্গে গেল। শুধু ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল নয়, আশেপাশে দুই-তিনটি স্কুলও এই আদর্শ শিক্ষাব্রতীর মৃত্যুতে একদিন করিয়া বন্ধ রহিল।

যদুবাবু বাজার করিয়া বাসায় ফিরিলেন। স্কুলের সময় হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীকে বলিলেন, মাছটা ভেজে দাও, নটা বেজে গিয়েছে—আজ একজামিন আরম্ভ হবে কি না! ঠিক টাইমে না গেলে সাহেব বকাবকি করবে।

শীতকালের বেলা। বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হইবে বলিয়া যদুবাবু সকালে উঠিয়া বাসার অতি ক্ষুদ্র দাওয়াটাতে দাড়ি কামাইতে বসিয়াছিলেন। দাড়ি কামানো শেষ করিয়া বাজার গিয়াছিলেন।

দৈর্ঘ্যে সাত ফুট, প্রস্থে সাড়ে তিন ফুট ঘর—দাওয়ার এক পাশে রান্নাঘর। ঘরের জানালা খুলিলে পিছনের বাড়ির ইঁট-বাহির-করা দেওয়াল চোখে পড়ে। ভাগ্যে শীতকাল, তাই রক্ষা—সারা গরমকাল ও বর্ষাকাল ভীষণ গুমটে অধিকাংশ দিন রাত্রে ঘুম হইত না। তাই সাড়ে আট টাকা ভাড়া।

ভাত খাইতে খাইতে যদুবাবু বলিলেন, বাসা বদলাব, এখানে মানুষ থাকে না, তার ওপর অবনীটা এ বাসার ঠিকানা জানে। ও যদি আবার এসে জোটে—

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, তা অবনী ঠাকুরপো তোমার স্কুলে যাবে, স্কুল তো চেনে।

বাসা বদলালে কী হবে! কী বুদ্ধি!

—ওগো, না না। স্কুলে আমাদের যার-তার ঢোকবার জো নেই। দারোয়ানকে বলে রেখে দেব, হাঁকিয়ে দেবে। এ বাড়ির ভাড়াটাও বেশী।

—এর চেয়ে সস্তা আর খুঁজো না। টিকতে পারবে না সে বাসায়। এখানে আমি যে কষ্টে থাকি! তুমি বাইরে কাটিয়ে আস, তুমি কী জানবে?

—কলকাতার বাইরে ডায়মন্ডহারবার লাইনে গড়িয়া কি সোনারপুরে বাসা ভাড়া পাওয়া যায়—সস্তা, কিন্তু ট্রেন ভাড়াতে মেরে দেবে।

স্কুলে যাইতে কিছু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। মিঃ আলম ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, ক্লাসে পেপার দেওয়া হয় নি। এত দেরি করে এলেন প্রথম দিনটাতেই?

একটু পরেই হেডমাস্টারের টেবিলের সামনে গিয়া যদুবাবুকে দাঁড়াইতে হইল। সাহেব বলিলেন, যদুবাবু, বড়ই দুঃখের কথা—কাজে আপনার আর মন নেই দেখা যাচ্ছে।

—না স্যার্, বাড়িতে অসুখ।

—ওসব ওজর এখানে চলবে না—মাই গেট ইজ ওপন্—যদি আপনার না পোষায়—

—স্যার্, এবার আমায় মাপ করুন—আর কখনও এমন হবে না।

ব্যাপার মিটিয়া গেল। যদুবাবু আসিয়া হলে পরীক্ষারত ছেলেদের খবরদারি আরম্ভ করিলেন।

—এই দেবু, পাশের ছেলের খাতার দিকে চেয়ে কী হচ্ছে?

একটি ছেলে উঠিয়া বলিল, তিনের কোশ্চেনটা স্যার্ একটু মানে করে দেবেন?

—কই, দেখি কী কোশ্চেন! এ আর বুঝতে পারলে না? বুড়ো ধাড়ি ছেলে—তবে পড়াশুনোর দরকার কী?

—স্যার, এ ধারে ব্লটিং পেপার পাই নি—একখানা দিয়ে যাবেন—

হেডমাস্টার একবার আসিয়া চারি দিকে ঘুরিয়া দেখিয়া গেলেন। গেম-টীচার পাশের ঘরে চেয়ারে বসিয়া একখানা নভেল পড়িতেছিল, হেডমাস্টারকে হলে ঢুকিতে দেখিয়া বইখানা টেবিলে রক্ষিত ছেলেদের বইয়ের সঙ্গে মিশাইয়া দিল। পিছনের বেঞ্চিতে দুইটি ছেলে পাশাপাশি বসিয়া বই দেখিয়া টুকিতেছিল, হেডমাস্টারকে পাশের হলে ঢুকিতে দেখিয়া বইখানা একজন ছেলে তাহার শার্টের তলায় পেটকোঁচড়ে বেমালুম গুঁজিয়া ফেলিল।

জিনিসটা এবার গেম-মাস্টারের চোখ এড়াইল না, কারণ তাহার দৃষ্টি আর নভেলের পাতায় নিবদ্ধ ছিল না, ধীরে ধীরে কাছে গিয়া ছেলেটির পিঠে হাত দিয়া গেম-টীচার কড়াসুরে হাঁকিল, কী ওখানে? দেখি, বার কর—

ছেলেটির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। সে বলিল, কিছু না স্যার্—

—দেখি কেমন কিছু না—

বলা বাহুল্য, বই নিছক জড়পদার্থ, যেখানে রাখ সেখানেই থাকে, টানিতেই বাহির হইয়া পড়িল, ছেলেটি বিষণ্ণমুখে দাঁড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। তাহার অপকার্যের সাথী পাশের ছেলেটি তখন একমনে খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিতান্ত ভালমানুষের মত লিখিয়া চলিয়াছে।

দণ্ডায়মান ছাত্রটি হঠাৎ তাহার দিকে দেখাইয়া বলিল, স্যার্, ক্ষিতীশও তো এই বই দেখে লিখছিল।

ক্ষিতীশ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আমি! আমি টুকছিলাম?

গেম-টীচার বইখানি ক্ষিতীশকে দেখাইয়া বলিলেন, এই বই দেখে তুমিও টুকছিলে?

ক্ষিতীশ অবাক হইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া বইখানির দিকে চাহিয়া রহিল, যেন জীবনে সে এই প্রথম সে-বইখানা দেখিল।

—আমি স্যার্, টুকব বই দেখে! আমি!

তাহার মুখে ক্ষুব্ধ, অপমানিত ও বিস্মিত ভাব দেখিয়া মনে হয় যেন গেম-মাস্টার তাহাকে চুরি বা ডাকাতি কিংবা ততোধিক কোন নীচ কার্যে অপরাধী স্থির করিয়াছেন।

সুতরাং সে বাঁচিয়া গেল। তাহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নাই—এক আসামী ছাত্রের উক্তি ছাড়া গেম-মাস্টার কিছু দেখেন নাই। আসামী হেডমাস্টারের টেবিলের সম্মুখে নীত হইল, সেখানেও সে তাহার সঙ্গীর নাম করিতে ছাড়িল না।

হেডমাস্টার হাঁকিলেন, বি এ স্পোর্ট, আর ইউ নট্ অ্যাশেম্ড্ অফ নেমিং ওয়ান অফ ইওর ক্লাস-মেট্স্—কাম, হ্যাভ ইট্—

সপাসপ বেতের শব্দে আশেপাশের ঘরের ও হলের ছাত্রেরা ভীত ও চকিত দৃষ্টিতে হেডমাস্টারের আপিস-ঘরের দিকে চাহিল।

ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িল।

পাহারাদার শিক্ষকেরা হাঁকিলেন, ফিফ্‌টিন্ মিনিট্স্ মোর—

একটি ছেলে ও-কোণে দাঁড়াইয়া বলিল, স্যার্, আমাদের ক্লাসে দেরিতে কোশ্চেন্ দেওয়া হয়েচে—

যদুবাবুই এজন্য দায়ী। তিনি হাঁকিয়া বলিলেন, এক মিনিটও সময় বেশী দেওয়া হবে না—

কারণ, তাহা হইলে আরও খানিকক্ষণ তাহাকে সে ক্লাসের ছেলেগুলিকে আগলাইয়া বসিয়া থাকিতে হয়। ছেলেরা কিন্তু অনেকেই আপত্তি জানাইল। মিঃ আলমের কাছে আপীল রুজু হইল অবশেষে। আপিলে ধার্য হইল, সেই ক্লাসের ছেলেরা আরও পনেরো মিনিট বেশী সময় পাইবে। যদুবাবুকে অপ্রসন্নমুখে আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইল।

কেরানী প্রত্যেক টীচারের কাছে স্লিপ পাঠাইয়া দিল,—মাহিনা আজ দেওয়া হইবে, যাইবার সময় যে যার মাহিনা লইয়া যাইবেন।

প্রায় সব টীচারই সারা মাস ধরিয়া কিছু কিছু লইয়া আসিয়াছেন—বিশেষ কিছু পাওনা কাহারও নাই। কাটাকাটি করিয়া কেহ বারো টাকা, কেহ পনেরো টাকা হাতে করিয়া বাড়ি ফিরিলেন। ইহার মধ্যে যদুবাবুর অভাব সর্বাপেক্ষা বেশী, তাঁহার পাওনা দাঁড়াইল পাঁচ টাকা কয়েক আনা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, চা খাবেন নাকি যদুদা? চলুন।

যদুবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আর চা! যা নিয়ে যাচ্ছি এ দিয়ে স্ত্রীর এক জোড়া কাপড় নিয়ে গেলেই ফুরিয়ে গেল।

দুইজনে চায়ের দোকানে গিয়া ঢুকিলেন।

ক্ষেত্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কী খাবেন যদুদা? আর এখন তো স্কুলের মধ্যে আপনিই বয়সে বড়, নারাণবাবু মারা যাওয়ার পরে।

—দেখতে দেখতে প্রায় দু বছর হয়ে গেল। দিন যাচ্চে. না, জল যাচ্চে! মনে হচ্চে সে দিন মারা গেলেন নারাণদা।

—হেডমাস্টারকে বলে নারাণবাবুর একটা ফোটো. কি অয়েলপেণ্টিং—

—পাগল হয়েছ ভায়া, পুওর স্কুল, মাস্টারদের মাইনে তাই আজ পনেরো বছরের মধ্যে বাড়া তো দূরের কথা, ক্রমে কমেই যাচ্চে—তাও দু মাস খেটে এক মাসের মাইনে নিতে হয়। এ স্কুলে আবার অয়েলপেণ্টিং ঝুলনো হবে নারাণবাবুর—পয়সা দিচ্চে কে?

দোকানের চাকর সামনে দুই পেয়ালা চা ও টোস্ট রাখিয়া গেল। যদুবাবু বলিলেন, না না টোস্ট না, শুধু চা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, খান দাদা আমি অর্ডার দিয়েচি, আমি পয়সা দেব ওর।

—তুমি খাওয়াচ্চ? বেশ বেশ, তা হলে একখানা কেক্‌ও অমনি—

দুইজনে চা খাইতে খাইতে গল্প করিতেছেন, এমন সময়ে খবরের কাগজের স্পেশাল লইয়া ফিরিওয়ালাকে ছুটিতে দেখা গেল—কী একটা মুখে চীৎকার করিয়া বলিতে বলিতে ছুটিতেছে। ক্ষেত্রবাবু বলিলেন. কী বলচে দাদা? কী বলচে?

দোকানী ইতিমধ্যে কখন্ বাহিরে গিয়াছিল। সে একখানা কাগজ আনিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, দেখুন না পড়ে বাবু—জাপান, ইংরেজ আর মার্কিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করচে—'

দুইজনেই একসঙ্গে বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া কাগজখানা উঠাইয়া লইলেন। যদুবাবুই চশমাখানা তাড়াতাড়ি বাহির করিয়া পড়িয়া বিস্ময়ের সঙ্গে বলিলেন, অ্যাঁ—এ কী! এই তো লেখা রয়েছে জাপান অ্যাটাক্‌স্‌ পার্ল হারবার—এ কী! গ্রেট্‌ ব্রিটেন আর মার্কিন—

যদুবাবু 'গ্রেট ব্রিটেন' কথাটা বেশ টানটোন দিয়া লম্বা করিয়া গালভরা ভাবে উচ্চারণ করিলেন।

—উঃ! গ্রেট ব্রিটেন আর ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌ অব আমেরিকা!

ক্ষেত্রবাবু 'ইউনাইটেড স্টেট্‌স্‌ অব আমেরিকা' কথাটা উচ্চারণ করিতে ঝাড়া এক মিনিট সময় লইলেন। দুইজনেই বেশ পুলকিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন হঠাৎ। কেন, তাহার কোন কারণ নাই। একঘেয়ে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যেন বেশ একটা নূতনত্ব আসিয়া গেল—নারাণবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে, এবং এতদিন, আজ প্রায় দুই বৎসর, চায়ের আসর নিত্যনূতন যুদ্ধের খবরে মশগুল হইয়া ছিল। কিন্তু আজ এ আবার এক নূতন ব্যাপারের অবতারণা হইল তাহার মধ্যে।

যদুবাবু বলিলেন, আরে, চল চল, স্কুলে ফিরে যাই—এত বড় খবরটা দিয়ে যাই সকলকে—

—তা মন্দ নয়, চলুন যদুদা। ওহে, তোমার কাগজখানা একটু নিয়ে যাচ্চি। দিয়ে যাব এখন ফেরত।

যে স্কুলের বাড়ি ছুটির পরে কারাগারের মত মনে হয়, ইঁহারা মহা উৎসাহে কাগজ-খানা হাতে করিয়া সেই স্কুলে পুনরায় ঢুকিলেন। মিঃ আলম, শ্রীশবাবু, জ্যোতির্বিনোদ, হেডপণ্ডিত, রামেন্দ্রবাবু প্রভৃতির এ বেলা ডিউটি। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই বিভিন্ন ঘরে পাহারাদি দিতেছেন—উৎসাহের আতিশয্যে উভয়ে কাগজখানা লইয়া গিয়া একেবারে হেডমাস্টারের টেবিলে ফেলিয়া দিলেন।

হেডমাস্টার বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, কী?

—দেখুন স্যার, জাপান হাওয়াই দ্বীপ আর পার্ল হারবার হঠাৎ আক্রমণ করেছে—মিটমাটের কথা হচ্ছিল—হঠাৎ—

হেডমাস্টার যেন কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। বলিলেন, কই দেখি?

খবরটা বিদ্যুদ্বেগে স্কুলের সর্বত্র ছড়াইয়া গেল। ছেলেরা অনেকে টীচারদের নানা-রূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল! স্কুলের অটুট শৃঙ্খলা ভঙ্গ হইয়া বিভিন্ন ঘর ছেলেদের উত্তেজিত কণ্ঠের প্রশ্ন ও মধ্যে মধ্যে দুই-একজন শিক্ষকের কড়া সুরে হাঁকডাক শ্রুত হইতে লাগিল—এই! স্টপ্‌ দেয়ার! উইল ইউ? ইউ, রামেন, ডোণ্ট বি টকিং—হু টক্‌স্‌ দেয়ার? ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদুবাবু ও ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে বাহির হইলেন, কিন্তু চায়ের দোকানে কাগজ ফেরত দেওয়া হইল না, কারণ স্কুলের টীচারদের ব্যূহ ভেদ করিয়া কাগজখানা বাহির করিয়া আনা গেল না।

পড়াইতে গিয়া যদুবাবু আজ আর ছেলেকে ক্লাসের পড়া বলিয়া দিতে পারিলেন না। ছেলের বাবা ও কাকাকে জাপানের ও প্রশান্ত মহাসাগরের ম্যাপ দেখাইতে কাটিয়া গেল।

বাসায় ফিরিবার মুখে গলিতে বৃদ্ধ প্রতিবেশী মাখন চক্রবর্তী রোয়াকের উপর অন্যান্য উৎসাহী শ্রোতাদের মধ্যে বসিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির গূহ্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছেন, যদুবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, কে? মাস্টার মশায়? কী ব্যাপার শুনলেন? খিদিরপুরে পাঁচশো জাপানী গুপ্তচর ধরা পড়েচে জানেন তো?

—সে কী! কই, তা তো কিছু শুনি নি। না বোধ হয়—

চক্রবর্তী মশায় বিরক্তির সুরে বলিলেন, না কী ক'রে জানলেন আপনি? সব পিঠমোড় করে বেঁধে চালান দিয়েছে লালবাজারে। যারা দেখে এল, তারা বললে!

—কে দেখে এল?

—এই তো এখানে বসে বলছিল—ওই ওপাড়ার—'ক যেন—কে হে? সুরেশ বললে গেল? শেষ পর্যন্ত শোনা গেল, কথাটা কে বলিয়াছে, তাহার খবর কেহই দিতে পারে না।

যদুবাবু বাসায় আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, শুনেছ, আজ জাপানের সঙ্গে ব্রিটিশ

গভর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বেধেচে?

—সে কোথায় গো?

—বুঝিয়ে বলি তবে শোন—ম্যাপ বোঝ? দাঁড়াও, এ'কে দেখাচ্ছি।

—ওগো, আগে একটা কথা বলি শোন। অবনী ঠাকুরপো এসেচে আজ।

যদুবাবুর উৎসাহ ও উত্তেজনা এক মুহূর্তে নিবিয়া গেল। বলিলেন, অ্যাঁ! অবনী? কোথায় সে?

—আমায় বললে, চা করে দাও বউদি। চা করে দিলাম, তারপর তোমার আসবার দেরি আছে শুনে সন্ধ্যের সময় কোথায় বেরুল।

—তা তো বুঝলাম! শোবে কোথায় ও? বড্ড জ্বালালে দেখচি। এইটুকু তো ঘর—ওই বা থাকে কোথায়, তুমি আমিই বা যাই কোথায়? রাঁধছ কী?

—কী রাঁধব, তুমি আজ বাজার করবে বললে এ বেলা। বাজার তো আনলে না, আমি ভাত নামিয়ে বসে আছি। দুটো আলু ছিল, ভাতে দিয়েছি, আর কিছু নেই।

—নেই তো আমি কী জানি? আমি কি কাউকে আসতে বলেচি এখানে?

—তা বললে কি হয়! আসতে বল নি, তুমিও না, আমিও না—কিন্তু উপায় কী? নিয়ে এস কিছু।

যদুবাবু নিতান্ত অপ্রসন্নমুখে বাজার করিতে চলিলেন। তাঁহার মনে আর বিন্দু-মাত্র উত্তেজনা ছিল না—এ কি দুদৈব! অবনী আবার কোথা হইতে আসিয়া জুটিল?

রাত্রি নয়টার পরে অবনী একগাল হাসিয়া হাজির হইলঃ এই যে দাদা, একটু পায়ের ধুলো—ভাল আছেন বেশ?

—হ্যাঁ, ভাল। তোমরা সব ভাল? বউমা, ছেলেপিলে? নন্তু ভাল? আমি শুনলাম তোমার বউদিদির মুখে যে, তুমি এসেচ। শুনে ভারী খুশী হলাম। বলি—বেশ, বেশ। কতদিন দেখাটা হয়নি—আছ তো দু-একদিন?

—তা দাদা, আমি তো আর পর ভাবি নে। এলাম একটা চাকরি-টাকরি দেখতে। সংসার আর চলে না। বলি—যাই, দাদার বাসা রয়েছে। নিজের বাড়িই। সেখানে থাকি গে, একটা হিল্লে না করে এবার আর হঠাৎ বাড়ি ফিরচি নে। কিছুদিন ধরে কলকাতায় না থাকলে কিছু হয় না।

অবনীর মতলব শুনিয়া যদুবাবুর মুখের ভাব অনেকটা ফাঁসির আসামীর মত দেখাইল! তবুও ভদ্রতাসূচক কী একটা উত্তর দিতে গেলেন, কিন্তু গলা দিয়া ভাল সুর বাহির হইল না।

আহারাদির পর যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, আমি বাড়িওলার পিসীর সঙ্গে গিয়ে না হয় শুই, তুমি আর অবনী ঠাকুরপো—

যদুবাবু চোখ টিপিয়া বলিলেন, তুমি পাথুরে বোকা। কষ্ট করে শুতে হচ্ছে এটা অবনীকে দেখাতে হবে, নইলে ও আদৌ নড়বে না। কিছু না, এই এক ঘরেই সব শুতে হবে।

যদুবাবুর আশা টিকিল না। সেই ভাবে হাত-পা গুটাইয়া ছোট ঘরে শুইয়া অবনী তিন দিন দিব্য কাটাইয়া দিল। যাওয়ার নামগন্ধ করে না।

একদিন বলিল, দাদা, চলুন, আজ বউদিদিকে নিয়ে সব সুদ্ধ টকি দেখে আসি। পয়সা রোজগার করে তো কেবল সঞ্চয় করছেন, কার জন্যে বলতে পারেন? ছেলে নেই, পুলে নেই।

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, তা তোমার বউদিদিকে তুমি নিয়ে গিয়ে দেখাও না কেন?

—হ্যাঁ, আমার পয়সাকড়ি যদি থাকবে—

অবনী একেবারে নাছোড়বান্দা। অতি কষ্টে যদুবাবু আপাতত তাহার হাত এড়াইলেন।

কয়েক দিন কাটিয়া গেল। যুদ্ধের খবর ক্রমশই ঘনীভূত। বৈকালে চায়ের মজলিসে ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, শুনেছেন একটা কথা? রেঙ্গুনে নাকি কাল বোমা পড়েচে!

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, বল কী ক্ষেত্র ভায়া?

—কাগজে এখনও বেরোয় নি, তবে এই রকম গুজব।

শ্রীশবাবু চায়ের পেয়ালা হাতে আড়ষ্ট হইয়া থাকিয়া বলিলেন, আমার ছোট ভগ্নী-পতি যে থাকে সেখানে! তা হলে আজই একটা তার করে—

যদুবাবু ও জ্যোতির্বিনোদ দুইজনেই ব্যস্তভাবে বলিলেন, হ্যাঁ ভায়া, দাও—এখুনি একটা তার করা আবশ্যক।

—দাদা, আমার হাতে একেবারে কিছু নেই—কত লাগে রেঙ্গুনে তার করতে, তাও তো জানি নে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তার জন্যে কী, আমরা সবাই মিলে দিচ্ছি কিছু কিছু। তার তুমি ক'রে দাও ভায়া, দেখি, কার কাছে কী আছে!

যদুবাবু বিপন্নমুখে বলিলেন, আমার কাছে একেবারেই কিন্তু কিছু নেই—

—আচ্ছা, না থাকে না থাক্। আমরা দেখছি—দেখি হে, বিনোদ ভায়া—

সকলের পকেট কুড়াইয়া সাড়ে তিন টাকা হইল। শ্রীশবাবু তাহাই লইয়া ডাকঘরে চলিয়া গেলেন।

যদুবাবু বলিলেন, তাই তো হে, এ হল কী? এমন তো কখনও ভাবিও নি।

ক্ষেত্রবাবু ও জ্যোতির্বিনোদ টুইশানিতে বাহির হইয়া গেলেন। গলির মোড়ে ইংরেজী কাগজের সদ্য-প্রকাশিত সংস্করণ লইয়া ফিরিওয়ালা ছুটিতেছে—ভারি খবর বাবু—ভারি কাণ্ড হয়ে গেল—

ক্ষেত্রবাবু পকেট হাতড়াইলেন, পয়সা আছে দুইটি মাত্র। তাহাই দিয়া কাগজ এক-খানা কিনিয়া দেখিলেন, কাগজে বিশেষ কিছুই খবর নাই। রেঙ্গুনের বোমার তো নাম-গন্ধও নাই তাহাতে, তবে জাপানী সৈন্য ব্রহ্মের দক্ষিণে টেনাসেরিম প্রদেশে অবতরণ করিয়াছে বটে।

মনটা ভাল নয়, পয়সার টানাটানি। পুনরায় চা এক পেয়ালা খাইলে অবসাদগ্রস্ত মন একটু চাঙ্গা হইত। কিন্তু তার উপায় নাই। এমন সময়ে রামেন্দুবাবুর সঙ্গে দেখা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী, আজ যে চায়ের মজলিসে ছিলেন না?

—না, সাহেবের সঙ্গে দরকার ছিল। এই তো স্কুল থেকে বেরুলাম।

—যুদ্ধের খবর দেখেছেন? খুব খারাপ।

—কী রকম?

—শুনলাম নাকি রেঙ্গুনে বোমা পড়েছে।

—তা আশ্চর্য নয়! কিন্তু গুজব রটে নানারকম এ সময়ে—কাগজে কিছু লিখেছে এ বেলা?

যদুবাবুকে কাহার সহিত যাইতে দেখিয়া দুইজনেই ডাকিয়া বলিলেন, ওই যে, ও যদুদা, শুনে যান—

যদুবাবুর সঙ্গে অবনী। বাজার করিয়া অবনীকে দিয়া বাসায় পাঠাইয়া দিবেন বলিয়া যদুবাবু তাহাকে লইয়া বাহির হইয়াছেন।

—এটি কে যদুদা?

—এ—ইয়ে আমার খুড়তুতো—দেশ থেকে এসেছে—

—বেশ, বেশ। কার কাছে পয়সা আছে? রামেন্দুবাবু?

—আছে। কত?

—সবাই চা খাওয়া যাক। হবে?

—খুব হবে। চলুন সব।

যদুবাবু বলিলেন, রামেন্দু ভায়ার কাছে চার আনা পয়সা বেশী হতে পারে? বাজার করতে যাচ্ছি কিনা!

রামেন্দুবাবু সকলকে ভাল করিয়া চা ও টোস্ট খাওয়াইলেন। যদুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দাদা, আর কী খাবেন বলুন? কেক্ একখানা দেবে?

—না, ভায়া, বরং একখানা মাম্‌লেট—

—ওহে, বাবুকে একটা ডবল ডিমের মাম্‌লেট দিয়ে যাও।

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া সকলে যে যাহার টুইশানিতে বাহির হইলেন। যদুবাবু পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ দেখিলেন, প্রজ্ঞাব্রত ওপারের ফুটপাথ দিয়া যাইতেছে। সে এবার ম্যাট্রিক দিয়া স্কুল হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে, কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। কয়েকটি সমবয়সী বন্ধুর সঙ্গে বোধ হয় মাঠের দিকে খেলা দেখিতে যাইতেছে।

যদুবাবু ডাকিলেন, প্রজ্ঞাব্রত, ও প্রজ্ঞাব্রত—

প্রজ্ঞাব্রত এদিকে চাহিয়া দেখিল, এবং কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন মুখে ও অনিচ্ছার সহিত এপারে আসিয়া বলিল, কী স্যার্?

যদুবাবু সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন, ছেলেটির কী সুন্দর উন্নত চেহারা, খেলোয়াড়ের মত সাবলীল দেহভঙ্গী, গায়ে সিল্কের হাফ-শার্ট, কাবুলী ধরনের পায়জামার মত করিয়া কাপড় পরা, পায়ে লাল শুঁড়ওয়ালা চটি। স্কুলের নীচের ক্লাসের সে প্রজ্ঞাব্রত আর নাই।

—ভাল আছ বাবা?

—হ্যাঁ স্যার্।

—যাচ্ছ কোথায়?

প্রজ্ঞাব্রত এমন ভাব দেখাইল যে, যেখানেই যাই না কেন, তোমার সে খোঁজে দরকার কী? মুখে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিল, এই একটু ওদিকে—

—হ্যাঁ বাবা, একটি কথা বলব ভাবছিলাম। তোমাদের বাড়ি একবার যাব আজই ভাবছিলাম—তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে। তোমার ভাই দেবব্রতকে আজকাল পড়াচ্ছে কে?

—শিববাবু বলে এক ভদ্রলোক। আপিসে চাকরি করেন—আমাদের বাড়ির সামনের মেসে থাকেন—

—ক'টাকা দাও?

—দশ টাকা বোধ হয়—কী জানি, ও-সব খবর আমি ঠিক জানি নে।

—আমি বলছিলাম কি, আমায় টুইশানিটা করে দাও না কেন। স্কুলের মাস্টার ভিন্ন ছেলে পড়াতে পারে? আমি তোমাদের স্নেহ করি নিজের ছেলের মত, আমি যেমন পড়াব —এমনটি কারও দ্বারা হবে না, তা বলে দিচ্ছি—

—কিন্তু এখন তো আমরা সব চলে যাচ্ছি কলকাতা থেকে।

যদুবাবু বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, কলকাতা থেকে? কেন?

—শোনেন নি, জাপানীরা কবে এসে বোমা ফেলবে—এর পরে রাস্তাঘাট সব বন্ধ হয়ে যাবে হয়তো। আমরা বুধবারে বাড়িসুদ্ধ সব যাচ্ছি শিউড়ি, আমার দাদামশায়ের ওখানে। আমাদের পাড়ার অনেকে চলে যাচ্ছে।

—তাই নাকি?

প্রজ্ঞাব্রত ধীরভাবে বলিল, কেন, আপনি কাগজ দেখেন না? হাওড়া স্টেশনে গেলেই বুঝবেন, লোক অনেক চলে যাচ্ছে। আচ্ছা, আসি স্যার্—

—আচ্ছা বাবা, বেঁচে থাক বাবা।

প্রজ্ঞাব্রত চলিয়া গিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। দেখ দেখি বিপদ্! যাইতেছি বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াইতে, রাস্তার মাঝখানে ডাকিয়া অনর্থক সময় নষ্ট—কে এখন বুড়োমানুষের সঙ্গে বকিয়া মুখ ব্যথা করে! মানুষের একটা কাণ্ডজ্ঞান তো থাকা দরকার, এই কি ডাকিয়া গল্প করিবার সময় মশায়?

যদুবাবু কিন্তু অন্য রকম ভাবিতেছিলেন। প্রজ্ঞাব্রতের কথায় তিনি একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। কলিকাতা হইতে লোক পলাইতেছে জাপানী বিমানের ভয়ে? তবে কি জাপানী বিমান এত নিকটে আসিয়া পড়িল?

ছোট একটা টুইশানি ছিল। ভাবিতে ভাবিতে যদুবাবু ছাত্রের বাড়ি গিয়া উঠিলেন। দুইটি ছেলে, রিপন স্কুলে পড়ে—ইহাদের জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে যদুবাবু এক সময়ে কলেজে পড়িয়াছিলেন, সেই সুপারিশেই টুইশানি। যদুবাবু গিয়া দেখিলেন, বাহিরের ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। ডাকিলেন, ও হরে, নরে! ঘরে অন্ধকার কেন?

হরেন নামক ছাত্রটি ছুটিয়া দরজার কাছে আসিয়া বলিল, স্যার্?

—অ্যালো জ্বালিস নি যে বড়?

—স্যার্, আজ আর পড়ব না।

—কেন রে?

—আমাদের বাড়ির সবাই কাল সকালের গাড়িতেই দেশে চলে যাচ্ছে—মা জেঠীমা, দুই দিদি—সবাই যাবে। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হচ্ছে, বড় ব্যস্ত সবাই। আজ আর—আপনি চলে যান স্যার্।

অন্যদিন টুইশানির পড়া হইতে রেহাই পাইলে যদুবাবু স্বর্গ হাতে পাইতেন, কিন্তু আজ কথাটা তেমন ভাল লাগিল না। যদুবাবু বলিলেন, তোরাও যাবি নাকি?

—একজামিনের এখনও দুদিন বাকী আছে, একজামিন হয়ে গেলে আমরাও যাব।

—কোথায় যেন তোদের দেশ?

—গড়বেতা, মেদিনীপুর।

—অচ্ছা, চলি তা হলে।

আজ খুব সকাল। সবে সন্ধ্যা হইয়াছে। এ সময় বাড়ি ফেরা অভ্যাস নাই। বিশেষত এখনই সে কোটরে ফিরিতে ইচ্ছাও করে না। তার উপর অবনী রহিয়াছে, জ্বালাইয়া মারিবে।

ক্রীক লেনে এক বন্ধুর বাড়ি ছুটি-ছাটার দিন যদুবাবু সন্ধ্যাবেলা গিয়া চাটা-আসটা খান, গল্প-গুজব করেন। ভাবিতে ভাবিতে সেখানেই গিয়া পেঁৗছিলেন।

বন্ধু বাহিরের ঘরে বসিয়া নিজের ছেলেদের পড়াইতেছেন। যদুবাবুকে দেখিয়া বলিলেন, এস ভায়া। বোস। আজ অসময়ে যে? ছেলে পড়াতে বেরোও নি?

—সেখান থেকেই আসছি।

—একটু চা করতে বলে আয় তো তোর কাকাবাবুর জন্যে। আমার আবার বাড়ির সবাই কাল যাচ্ছে মধুপুর। সব ব্যস্ত রয়েছে। বাঁধা-ছাঁদা—

যদুবাবুর বুকের মধ্যে ছাঁত করিয়া উঠিল। বলিলেন, কেন? কেন?

—সবাই বলছে, জাপানীরা যে-কোন সময়ে নাকি এয়ার রেড্ করতে পারে, তাই মেয়েদের সরিয়ে দিচ্ছি।

যদুবাবুর মনে বড় ভয় হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বললে?

—বললে কেউ না। কিন্তু গতিক সেই রকমই। এর পরে রাস্তাঘাট বন্ধ হয়ে যাবে।

—বলো কী!

—তাই তো সবাই বলচে। কলকাতা থেকে অনেকে যাচ্ছে চলে। হাওড়া স্টেশনে গিয়ে দেখ গে লোকের ভিড়।

যদুবাবু আর সেখানে না দাঁড়াইয়া বাড়ি চলিয়া আসিলেন। বাসার দরজায় দেখিলেন, দুইখানি ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়াইয়া। বাড়িওয়ালার বড় ছেলে ধরাধরি করিয়া বিছানার মোট ও ট্রাঙ্ক গাড়ির মাথায় উঠাইতেছে।

যদুবাবু বলিলেন, এ সব কী হে যতীন, কোথায় যাচ্ছ?

যতীন বাইশ-তেইশ বছরের ছোকরা, কলেজ পড়ে। বলিল, ও, আমরা—দেশ যাচ্চি মাস্টার মশায়। সকলে বলছে, কলকাতাটা এ সময় সেফ্ নয়। তাই মা আর বউদিদিদের—

—তুমি, তোমার বাবা, এরাও নাকি?

—আমি পেঁৗছে দিয়ে আবার আসব। কী জানেন, পুরুষমানুষ আমরা দৌড়েও এক দিকে পালাতে পারব। হাই এক্সপ্লোসিভ্ বোম্ব্ পড়লে এ বাড়িঘর কিছু কি থাকবে ভাবছেন? বোমার ঝাপটা লেগেই মানুষ দম ফেটে মারা যায়। সে সব অবস্থায়—

যদুবাবুর পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বলিলেন, বল কী?

—বলি তো তাই। গবর্মেণ্ট বলছে, একখানা করে পেতলের চাক্তিতে নামধাম লিখে প্রত্যেকে যেন পকেটে করে বেড়ায়। এয়ার রেডের পরে ওইখানা দেখে ডেড্ বডি সনাক্ত করা—

যদুবাবুর তালু শুকাইয়া গিয়াছে। এখনই যেন তাঁহার মাথায় জাপানী বোমা পড়-

পড় হইয়াছে। বলিলেন, আচ্ছা যতীন, তোমরা তো ইয়ং ম্যান, পাঁচ জায়গায় বেড়াও। তোমার কি মনে হয়, বোমা শীগগির পড়তে পারে?

—এনি মোমেণ্ট পড়তে পারে। আজ রাতেই পড়তে পারে। স্ট্রে রেড্ করার কি সময়-অসময় আছে?

—তাই তো!

যদুবাবু নিজের ঘরে ঢুকিতেই তাঁহার স্ত্রী তাড়াতাড়ি আগাইয়া আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, হ্যাঁ গা, হিম হয়ে তো বসে আছ—এদিকে ব্যাপার কী শোন নি? আজ রাত্রে নাকি জাপান বোমা ফেলবে কলকাতায়। বাড়িওলারা সব পালাচ্ছে—পাশের বাড়ির মটরের বউ আর মা চলে গিয়েছে দুপুরের গাড়িতে। আমি কাঠ হয়ে বসে আছি—তুমি কখন ফিরবে! কী হবে, হ্যাঁ গা, সত্যি সত্যি আজ কিছু হবে নাকি?

যদুবাবু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, হ্যাঃ—ভারি—কোথায় কী তার ঠিক নেই। ভাবিলেন, মেয়েদের সামনে সাহস দেখানোই উচিত—নতুবা মেয়েমানুষ হাউমাউ করিয়া উঠিবে।

—হ্যাঁ গা, বাইরে আজ এত অন্ধকার কেন?

—আজ ব্ল্যাক-আউট একটু বেশী। রাস্তার অনেক গ্যাসই নিবিয়ে দিয়েছে।

—তবুও তুমি বলছ—কোনও ভয় নেই?

এমন সময় অবনী আসিয়া ডাকিল, দাদা ফিরেছেন?

—হ্যাঁ, এস।

—আচ্ছা, দাদা, আজ রাস্তা এত অন্ধকার কেন?

—ও, আজ রাত দশটার পরে কম্প্লিট ব্ল্যাক-আউট। মানে, রাস্তার সব আলো নিবুনো থাকবে।

—কেন?

—তুমি কিছু শোন নি যুদ্ধের খবর?

—না, কী?

যদুবাবুর মাথায় একটা বুদ্ধি আসিয়া গেল। বলিলেন, শোন নি তুমি? জাপানীরা যে, যে-কোনো সময়ে এয়ার রেড্—মানে বোমা ফেলতে পারে। সব লোক পালাচ্ছে। আজ বাড়িওলারা চলে গেল। আমার ছাত্রেরা চলে গেল—সব পালাচ্ছে। হয়তো আজ রাত্রেই ফেলতে পারে বোমা—কে জানে? এখন একটা কথা। তুমি তোমার বউদিদিকে কাল নিয়ে যাও দেশে। আমি তো এখানে আর রাখতে সাহস করি নে—

অবনী পাড়াগাঁয়ে ভীতু লোক। তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। দাদার বাসায় স্ফূর্তি করিতে আসিয়া এ কী বিপদে পড়িয়া গেল সে! বলিল, হ্যাঁ দাদা, আজ কাগজে কী দেখলেন? জাপান কি কাছাকাছি এল?

—তা কাছাকাছি বইকি। মোটের ওপর আজ রাতেই বোমা পড়া বিচিত্র নয়, জেনে রাখ।

—তাই তো!

—তুমি তা হলে কাল সকালেই তোমার বউদিদিকে নিয়ে যাও—

—তা—তা দেখি।—অবনী গুম্ খাইয়া গিয়া আপন মনে কী খানিকটা ভাবিল। কিছুক্ষণ পরে বলিল, হ্যাঁ দাদা, সত্যি সত্যি আজ রাতে কিছু হতে পারে?

—কথার কথা বলচি। হতে পারবে না কেন, খুব হতে পারে। বাধা কী?

—তুমি বোস, আমি দু ভাঁড় দই নিয়ে আসি।

যদুবাবুর স্ত্রী কী কাজে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিল, অবনী নিজের ছোট্ট টিনের সুটকেসটি খুলিয়া কাপড়চোপড় বাহিরে নামাইয়া আবার তুলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া বলিল, বউদিদি, আমার গামছাখানা কোথায়?

আহারাদির পরে যদুবাবু অবনীর সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। এখানে তিনি স্ত্রীকে আর রাখিতে চান না। কাল দুপুরে অবনী তাহাকে লইয়া যাক।

অবনী নিমরাজী হইল।

সকালে উঠিয়া ঘরের দোর খুলিয়া দালানে পা দিয়া যদুবাবু দেখিলেন, অবনীর বিছানাটা গুটানো আছে বটে, কিন্তু সে নাই! অবনীকে ডাকিয়া তুলিতে হয়—অত সকালে তো সে ওঠে না! কোথায় গেল?

অবনী আর দেখা দিল না। টিনের সুটকেসটি কখন সে মাথার কাছে রাখিয়াছিল, ভোরে উঠিয়া গিয়াছে কি রাতেই পলাইয়াছে, তাহারই বা ঠিক কী?

পরদিন স্কুলে শিক্ষকদের মধ্যে একটা উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য দেখা গেল। ক্ষেত্রবাবুর বাসার আশেপাশে যাহারা ছিল, সকলেই নাকি কাল বাসা ছাড়িয়া পলাইয়াছে। ক্ষেত্রবাবু স্ত্রীকে লইয়া তেমন বাসায় কী করিয়া থাকেন। যদুবাবুর বিপদ আরও বেশী, তাঁহার যাইবার জায়গা নাই। জ্যোতির্বিনোদের বাড়ি হইতে টেলিগ্রাম আসিয়াছে—কলিকাতায় আর থাকিবার আবশ্যক নাই, এখনই চলিয়া এস, প্রাণ বাঁচিলে অনেক চাকুরি মিলিবে। হেডমাস্টার মীটিং করিলেন—অভিভাবকেরা চিঠি লিখিতেছে, ইস্কুলের প্রমোশন তাড়াতাড়ি দেওয়া হউক, ছেলেরা সব বাহিরে যাইবে—এ অবস্থায় মাস্টারদের কাছে যে সমস্ত পরীক্ষার খাতা আছে, সেগুলি যত শীঘ্র হয় দেখিয়া ফেরত দেওয়া উচিত।

মিঃ আলম বলিলেন, অনেক ছেলে ট্রান্সফার চাইছে, কী করা যায়?

সাহেব বলিলেন, একে স্কুলে ছেলে নেই, এর উপর ট্রান্সফার নিলে স্কুল টিকবে না। তার চেয়েও বিপদ দেখছি, মাইনে তেমন আদায় হচ্ছে না। বড়দিনের ছুটির আগে মাইনে দেওয়া যাবে না।

যদুবাবু উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, দেওয়া যাবে না স্যার্?

—না।

—নভেম্বর মাসের মাইনে হয় নি এখনও! আমরা কী করে চালাব স্যার্, একটু বিবেচনা করুন। দু মাসের মাইনে যদি বাকী থাকে—

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, আমায় বলা নিষ্ফল, আমি ঘর থেকে আপনাদের মাইনে দেব না তো। না পোষায় আপনার, চলে যাওয়াতে আমি বাধা দেব না—মাই গেট ইজ অল্‌ওয়েজ ওপ্‌ন্—

রামেন্দুবাবুকে সব মাস্টার মিলিয়া ধরিল। অন্তত নভেম্বর মাসের দরুন কিছু না দিলে চলে কিসে? যদুবাবু কাতরস্বরে জানাইলেন, তিনি সম্পূর্ণ নিরুপায়, এ বিপদকালে কোথায় গিয়া উঠিবেন ঠিক নাই, হাতে পয়সা নাই, টুইশানির মাহিনা আদায় হয় কি না-হয়, টুইশানি থাকিবে কি না তাহারও স্থিরতা নাই—কারণ ছেলেরা অন্যত্র যাইতেছে। কতদিনে তাহারা আসিবে কে জানে? টুইশানি না থাকিলে একেবারেই অচল।

রামেন্দুবাবুকে সাহেব বলিলেন, অবস্থা কী রকম বলে মনে হয়?

—কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না স্যার্।

—এবার জানুয়ারি মাসে নতুন ছাত্র বেশী পরিমাণে ভর্তি না হলে স্কুল চলবে না। তারপর এই গোলমাল—

—ও কিছু না স্যার্, জানুয়ারি মাসে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে। এ একটা হুজুগ, কী বল? ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের রাজ্যে আবার বাইরের শত্রুর ভয়!

—হুজুগ বইকি স্যার্! পিওর হুজুগ। ও কিছু না। একটা কথা—

—কী?

—মাস্টারদের মাইনে কিছু কিছু দিতেই হবে স্যার্।

—কোথা থেকে দেব? মাইনে আদায় নেই। তবে নিতান্ত ধরছে—দাও কিছু কিছু। আর একটা কথা, যে সব ছেলে ট্রান্সফারের দরখাস্ত করেচে, তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অভিভাবকদের অনুরোধ করতে হবে, তাদের যেন ছাড়িয়ে না নিয়ে যায়। ক্লাস এইটের একটা ছেলে—নাম সুধীর দত্ত, তার বাড়ি সন্ধ্যার পর একবার যেয়ো।

সন্ধ্যায় সুধীর দত্তের বাড়ি রামেন্দুবাবু অভিভাবককে ধরিতে যাইয়া বেশ দুই কথা

শুনিলেন। ছেলেটি এবার প্রমোশন পায় নাই। ছেলের অভিভাবক চটিয়া খুন, ছেলে তিনি ও-স্কুলে আর রাখিতে চান না। তিনি স্কুল ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন—অনুরোধ বৃথা।

রামেন্দুবাবু বলিলেন, কেন, কী অসুবিধে হল এ স্কুলে বলুন! আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি. তা দূর করে দেওয়া হবে।

—পড়াশুনো কিছু হয় না মশাই আপনাদের স্কুলে। ওদের ক্লাসে যদুবাবু বলে একজন মাস্টার পড়ান, একেবারে ফাঁকিবাজ। কিছু করান না ক্লাসে।

—আপনি ও-রকম নাম করে বলবেন না। ছেলেদের মুখে শুনে বিচার করা সব সময়ে ঠিক নয়। এবার আমি বলছি, ওর পড়াশুনো আমি নিজে দেখব।

—তা, ওরা তো কাল যাচ্ছে নবদ্বীপে। ওর মাসীর বাড়ি। কবে আসবে ঠিক নেই। হ্যাঁ মাস্টারবাবু, এ হ্যাঙ্গামা কতদিন চলবে বলতে পারেন?

—বেশী দিন চলবে বলে মনে হয় না।

—সুধীরকে জানুয়ারী মাসে ক্লাসে উঠিয়ে দেন যদি, তবে ট্রান্সফার এবার না হয় থাক্।

—তাই হবে। ওকে ক্লাস নাইনে উঠিয়ে দেওয়া যাবে।

রামেন্দুবাবু হৃষ্টমনে ফিরিতেছিলেন; কারণ, কর্তব্য নিখুঁতভাবে সম্পাদন করিবার একটা আনন্দ আছে। পথের ধারে এক স্থানে দেখিলেন অনেকগুলি লোক জটলা করিয়া উঁচু মুখে কী দেখিতেছে। রামেন্দুবাবু গিয়া বলিলেন, কী হয়েছে মশায়?

একজন আকাশের দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল, দেখুন তো স্যার্, ওই একখানা এরোপ্লেন—ওখানা যেন কী রকমের না?

রামেন্দুবাবু কিছু দেখিতে পাইলেন না। বলিলেন, কই মশায়, কিছু তো—

দুই-তিন জন অধীরভাবে বলিল, আঃ, দেখতে পেলেন না? এই ইদিকে সরে আসুন —ওই—ওই—

তবুও রামেন্দুবাবু দেখিতে পাইলেন না, একটা নক্ষত্র তো ওটা!

সবাই বলিয়া উঠিল, ওই মশায়, ওই! নক্ষত্র দেখছেন তো একটা? ওই! ও নক্ষত্র নয় —জাপানী বিমান।

রামেন্দুবাবু সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, কিন্তু নক্ষত্র তো আরও অনেক—

লোকগুলি রামেন্দুবাবুর মূঢ়তা দেখিয়া দস্তুরমত বিরক্ত হইল। একজন বলিল, আচ্ছা. এটা কি নক্ষত্র? নীল মত আলো দেখলেন না? চোখের জোর থাকা চাই। ও হল সেই. বুঝলেন? চুপিচুপি দেখতে এসেছে—

আর একজন চিন্তিত মুখে বলিল, তাই তো, এ যে ভয়ানক কান্ড হল দেখছি!

পূর্বের লোকটি বলিল. কলকাতায় থাকা আর সেফ্ নয় জানবেন আদৌ।

সবাই তাহাতে সায় দিয়া বলিল. সে তো আমরা জানি। যে-কোন সময়—এনি মোমেণ্ট বোমা পড়তে পারে।

রামেন্দুবাবু সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

পরদিন স্কুলে মাস্টারদের মধ্যে যথেষ্ট ভয় ও চাঞ্চল্য দেখা গেল। যে যে পাড়ায় থাকেন. সেই সেই পাড়া প্রায় খালি হইতে চলিয়াছে. মাস্টারদের মধ্যে অনেকের যাইবার স্থান নাই।

যদুবাবু চায়ের মজলিসে বলিতেছিলেন. সবাই তো যাচ্ছে, আমি যে কোথায় যাই!

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমারও তাই দাদা। আমার গ্রামে বাড়িঘর সারানো নেই—কতকাল যাই নি। সেখানে গিয়ে ওঠা যাবে না।

—তবুও তোমার তো আস্তানা আছে ভায়া, আমার যে তাও নেই। চিরকাল বাসায় বাসায় থেকে বাড়িঘর সব গিয়েছে। এখন যাই কোথায়?

জ্যোতির্বিনোদ বলিল. আমার বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এসেছে. চিঠির পর চিঠি আসছে —বাড়ি যাবার জন্যে। বাড়ি থেকে লিখছে, চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এস।

হেডপণ্ডিত বলিলেন, কাল শেয়ালদা ইস্টিশানে কী ভিড় গিয়েছে হে! গাড়িতে

উঠতে পারি নে—বুড়ো মানুষ, কত কষ্টে যে ঠেলে-ঠুলে উঠলাম!

—স্কুল বন্ধ হলে যে বাঁচি। সাহেবকে সবাই মিলে বলা যাক, স্কুল বন্ধ করবার জন্যে।

সারারাত্রি ধরিয়া গাড়িঘোড়ার শব্দ শুনিয়া যদুবাবু বিশেষ নার্ভাস' হইয়া উঠিয়াছিলেন। পাড়াসুদ্ধ লোক বিছানা বোঁচকা বাঁধিয়া হয় হাওড়া নয় শেয়ালদহ স্টেশনে ছুটিতেছে। কে বলিতেছিল, ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া অসম্ভব ধরনে বৃদ্ধি পাইতেছে।

জ্যোতির্বিনোদ বলিল, কোন ভয় নেই দাদা। বোঁচকা মাথায় নিয়ে ঠেলে উঠব ইস্টিশানে—আমরা বাঙাল মানুষ, কিছু মানি নে।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আস্‌সিংড়ি চলে যাই ভাবছি, ভাঙা ঘরে গিয়ে আপাতত উঠি। এখানে থাকলে এর পরে আর বেরুতে পারব না।

যদুবাবু সভয়ে বলিলেন, তাই তো, কী যে করি উপায়!

—কালই সাহেবকে গিয়ে আগে ধরা যাক, স্কুল বন্ধ ক'রে দেওয়া হোক।

ক্ষেত্রবাবু চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া ধর্মতলার মোড়ে আসিলেন। দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দুই-তিনখানি ঘোড়ার গাড়ি ছাদের উপর বিছানার মোট চাপাইয়া শেয়ালদহ স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল। ক্ষেত্রবাবু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—আস্‌সিংড়ি গ্রামে যাইবেন বটে, কিন্তু সেখানে বাড়িঘরের অবস্থা কী রকম আছে, তাহার ঠিক নাই। আজ পাঁচ-ছয় বছর পূর্বে নিভাননী বাঁচিয়া থাকিতে সেই একবার গিয়াছিলেন, তাহার পর আর যাওয়া ঘটে নাই। কোন খবরও লওয়া হয় নাই, কারণ এতদিন প্রয়োজন ছিল না।

একটিমাত্র টুইশানি অবশিষ্ট ছিল, সেখানে গিয়া দেখা গেল, আজ বৈকালে তাহারাও দেশে চলিয়া গিয়াছে। বাড়ির কর্তা আপিসে চাকরি করেন। বলিলেন, মাস্টার মশায়, আপনার এ মাসের মাইনেটা আর এখন দিতে পারছি নে—খরচপত্র অনেক হয়ে গেল কিনা! জানুয়ারি মাসে শোধ করব।

—আমায় না দি'লে হবে না বোস মশায়, ফ্যামিলি আমাকে দেশে নিয়ে যেতে হবে—

—তা তো বুঝতে পারছি। কিন্তু এখন কিছু হবে না।

ক্ষেত্রবাবুর রাগ হইল। এখানে দুই মাসের কমে এক মাসের মাহিনা কোন দিনই দেয় না—তাও আজ পাঁচ টাকা, কাল দুই টাকা। নিতান্ত নিরুপায় বলিয়াই লাগিয়া থাকা। কিন্তু এই বিপদের সময় এত অবিবেচনার কাজ করিতে দেখিলে মানুষের মনে মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, না বোস মশায়, এ সময় আমায় দিতেই হবে। দু মাস ধরে ছাত্র পড়'লাম, ছেলে ক্লাসে উঠল। এখন বলছেন, আমার মাইনে দেবেন না। তা হয় না—

বসু মহাশয়ও চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, মশাই, এত কাল তো পড়িয়েচেন—মাইনে পান নি কখনও বলতে পারেন কি? যদি এ মাসটাতে ঠিক সময়ে না-ই দিতে পারি—

—ঠিক সময়ে কোনদিনই দেন নি বোস মশায়, ভেবে দেখুন। তাগাদা না করলে কোন মাসেই দেন নি!

—বেশ মশাই, না-দিয়েচি তো না-দিয়েচি। মাইনে পাবেন না এখন। আপনি যা পারেন, করুন গিয়ে।

ক্ষেত্রবাবু ভদ্রস্বভাবের লোক, টুইশানির মাহিনা লইয়া একজন বৃদ্ধ ব্যক্তির সহিত ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হইল না। কিছু না বলিয়া বাড়ির বাহির হইয়া আসিলেন। কলিকাতায় বাড়ি আছে, আপিসে মোটা চাকুরিও করেন শোনা যায়, অথচ এই তো সব বিচার! ছিঃ!

অন্যমনস্কভাবে গলির মোড়ে আসিতেই ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতায় কাহার সঙ্গে ঠোকাঠুকি হইল! ক্ষেত্রবাবু বলিয়া উঠিলেন, মাপ করবেন মশাই, দেখতে পাই নি—দুটো গ্যাসই নিবিয়েচে—

লোকটি বলিল, কে, ক্ষেত্রবাবু নাকি?

—ও! রাখালবাবু?

—আমিই। ভালই হল, দেখা হল এ ভাবে। আপনাদের স্কুলে কাল যাব ভাবছিলাম—

—ভাল আছেন মিত্তির মশায়?

—আমাদের আবার ভাল-মন্দ! বই দিয়ে এসেছি পাঁচ-ছটা স্কুলে—এখন ধরায় যদি, তবে বুঝতে পারি। আপনাদের স্কুলে আমার সেই নব ব্যাকরণবোধখানা ধরানোর কী করলেন? চমৎকার বই! ক্লাস ফাইভ আর ফোরের উপযুক্ত বই। সন্ধি আর সমাস যে ভাবে ওতে দেওয়া—। বইয়ের লিস্ট হয়েচে আপনাদের?

—এখনও হয় নি।

—কেন, প্রমোশন হয় নি? তবে বইয়ের লিস্ট হয় নি কেমন কথা?

—না, প্রমোশন হবে বুধবার। শুক্রবারে ছুটি হবে।

—আমার বইয়ের কী হল?

—হেডমাস্টারের কাছে দেওয়া হয়েছে—কী হয়, বলতে পারি নে!

—আমার যে এদিকে অচল ক্ষেত্রবাবু। এই অবস্থায় প্রায় দেড়শো টাকা ধার করে বই ছাপালাম। প্রেসের দেনা এখনও বাকি। দপ্তরীর দেনা তো আছেই। বাসা ভাড়া তিন মাসের বাকী। বই যদি না চলে, তবে খেতে পাব না ক্ষেত্রবাবু। আপনারাই ভরসা।

—বুঝলম সবই রাখালবাবু, কিন্তু এ তো আর আমার হাতে নয়। আমি যতদূর বলবার বলেচি।

কথার মধ্যে সত্যের কিছু অপলাপ ছিল। ক্ষেত্রবাবু বলেন নাই! রাখাল মিত্তিরের বই আজকাল অচল। তবুও হয়তো চলিত, কিন্তু বড় বড় প্রকাশকের সহিত প্রতি-যোগিতা করিয়া বই চালানো রাখাল মিত্তিরের কর্ম নয়। তাহারা লাইব্রেরির জন্য বিনা-মূল্যে কিছু বই দেয়, প্রাইজের সময় বই কিনিলে মোটা কমিশন দেয়।

রাখাল মিত্তির ক্ষেত্রবাবুর পিছু ছাড়ে না। বলিল, আসুন না আমার ওখানে, একটু চা খাবেন—

শেষ পর্যন্ত যাইতেই হইল—নাছোড়বান্দা রাখাল মিত্তিরের হাতে পড়িলে না গিয়া উপায় নাই। সেই ছোট একতলার কুঠুরী। এই অগ্রহায়ণ মাসেও যেন গরম কাটে না। একখানা নীচু কেওড়া কাঠের তক্তাপোশের উপর মলিন বিছানা। কেরোসিন কাঠের একটা আলমারি-ভর্তি বই। ঘরখানা অগোছালো, অপরিষ্কার, মেঝের উপরে পড়িয়া আছে দুইটা ময়লা ছেঁড়া জামা ছেলেপুলেদের, এক বোতল আঠা, একটা আলকাতরা- মাখানো মালসা।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কী বই রাখালবাবু, আলমারিতে?

—দেখবেন? এই সব বই—এই দেখুন—

রাখালবাবু সগর্বে বই নামাইয়া দেখাইতে লাগিলেন।

—এই দেখুন প্রকৃতিবোধ অভিধান। পুরনো বইয়ের দোকান থেকে তিন টাকায়—আর এই দেখুন মুগ্ধবোধ—মশাই, সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়লে কি ভাষার ওপর দখল দাঁড়ায়? সহ্যের্ঘঃ থেকে আরম্ভ করে সব সূত্র তিনটি বছর ধরে মুখস্থ করে ভাঁতা হয়ে গিয়েচে, তাই আজ দু-এক পয়সা ক'রে খাচ্চি। রাখাল মিত্তিরের ব্যাকরণের ভুল ধরে, এমন লোক তো দেখি নে। গোয়ালটুলি স্কুলের হেডপণ্ডিত সে দিন বললে—মিত্তির মশাই, আপনার ব্যাকরণ পড়লে ছেলেদের সন্ধি আর সমাস গুলে খাওয়া হয়ে গেল। পড়া চাই—পেটে বিদ্যে না থাকলে—

—আপনার বই ধরিয়েচে নাকি?

—না হেডমাস্টার বললে শশিপদ কাব্যতীর্থের ব্যাকরণ আর-বছর থেকে রয়েছে ক্লাসে। এ বছর যুদ্ধের বছরটা, বই বদলালে গার্জেনরা আপত্তি করবে—তাই এ বছর আর হল না। সামনের বছর থেকে নিশ্চয়ই দেবে।

একটি বারো-তেরো বছরের রোগা মেয়ে, একটা থালায় দুটি আংটাভাঙা পেয়ালা বসাইয়া চা আনিল। রাখালবাবু বলিলেন, ও পাঁচী! এটি আমার ভাগ্নী—আমার যে বোন এখানে থাকে, তার মেয়ে—প্রণাম কর মা, উনি ব্রাহ্মণ।

—আহা, থাক্ থাক্। এস মা, হয়েছে—কল্যাণ হোক। বেশ মেয়েটি।

—অসুখে ভুগছে। বর্ধমানে দেশ, কেউ নেই। এবার এক জ্ঞাতি কাকা নিয়ে গিয়েছিল, ম্যালেরিয়ায় ধরেচে। যাও মা, দুটো পান নিয়ে এস তোমার মামীমার কাছ থেকে। চা মিষ্টি হয়েছে? চিনি নেই, আখের গুড় দিয়ে—

—না না, বেশ হয়েছে।

দুধচিনিবিহীন বিস্বাদ চা, তামাক-মাখা গুড়ের গন্ধ, এক চুমুক খাইয়া বাকিটুকু গলাধঃকরণ করিতে ক্ষেত্রবাবুর বিশেষ কসরত করিতে হইল।

রাখালবাবু বলিলেন, তা তো হল, কী হাঙ্গামা বলুন দিকি! পাড়া যে খালি হয়ে গেল অর্ধেক!

—আপনাদের এ পাড়াতেও?

—হ্যাঁ মশাই, আশেপাশে লোক নেই। সব পালাচ্ছে। পাশের বাড়ির ঘোষালেরা আজ সকালে সব পালাল—এখন ওরা বড়লোক, এই দিনকতক আগেও পুতুলের বিয়েতে হাজার টাকা খরচ করেছে। ফুলশয্যের তত্ত্ব করেছিল, দশজন ঝি চাকর মাথায় করে নিয়ে গেল, মায় রুপোর দান-সামগ্রী, খাট বিছানা এস্তোক! ওদের কথা বাদ দিন। এখন আমরা যাব কোথায়?

—সেই ভাবনা তো আমারও, ভাবছি তো। গরিব স্কুল-মাস্টার—

—গরিব তো বটেই, যাবার জায়গাও তো নেই।

—আপনার দেশে বাড়িঘর—

রাখালবাবু হাসিয়া বলিলেন, দেশই নেই, তার বাড়িঘর! দেশ ছিল ন'দে জেলায়, কাঁচড়াপাড়া নেমে যেতে হয়। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম। সে সব কিছু নেই। বড় হয়ে আর যাই নি, এই কলকাতাতেই—

—আমারও তো তাই।

পাঁচী পান আনিয়া রাখিয়া গেল।

—অনেক পয়সা খরচ করে বই ছাপালাম, চার-পাঁচ শো টাকা দেনা এখনও বাজারে। এই হাঙ্গামাতে যদি বই বিক্রি কমে যায়, তবে তো পথে বসতে হবে। আপনাদের ভরসাতেই—

—কিছুই বুঝছি নে, কী যে হবে!

—আমাদের এখানে কিছু হবে না, কী বলেন? যুদ্ধ হচ্ছে ফিলিপাইনে আর হংকংয়ে, তার এখানে কী?

—সিঙ্গাপুর ডিঙিয়ে আসা অত সোজা নয়।

—তবে লোক পালাচ্চে কেন?

—প্যানিক—ভয়—প্যানিক একেই বলে। আচ্ছা উঠি, রাত হল মিত্তিরমশাই।

—আর একটু বসবেন না? আচ্ছা, তা হলে—হ্যাঁ, একটা কথা। আনাআষ্টেক পয়সা হবে।

পকেটে যাহা কিছু খুচরা ছিল, তক্তাপোশের উপর রাখিয়া ক্ষেত্রবাবু বাহিরের মুক্ত বাতাসে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া যেন বাঁচিলেন।

'স্পেশাল টেলিগ্রাফ' কাগজ বাহির হইয়াছে, কাগজওয়ালা ফুটপাথ ধরিয়া ছুটিতেছে। ক্ষেত্রবাবু একজনের হাত হইতে কাগজ লইয়া দেখিলেন—হংকং অবরুদ্ধ।...চীনসমুদ্রে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস!

ক্ষেত্রবাবু কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

পরদিন স্কুলে হেডমাস্টার সব মাস্টারকে আপিসে ডাকিলেন। জরুরী মীটিং।

হেডমাস্টার এ বছরের পরীক্ষার লম্বা রিপোর্ট লিখিয়াছেন, সকলকে পড়িয়া শোনাইলেন। প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট হইতে রিপোর্ট লওয়া হয়, পরীক্ষার কাগজ দেখার পরে। সেই সব রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া হেডমাস্টার নিজে রিপোর্ট লিখিয়া অভিভাবকদের মধ্যে ছাপাইয়া বিলি করেন। তাঁহার ধারণা, ইহাতে স্কুলে ছেলে বাড়িবে।

রিপোর্ট পড়িয়া সকলের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কী রকম হয়েছে?

সকলেই বলিলেন, চমৎকার রিপোর্ট হইয়াছে, এমন ধারা হয় না।

—থার্ড ক্লাসের ইংরিজী নিতেন কে?

যদুবাবু বলিলেন, আমি স্যার্।

—ভীষণ খারাপ ফল এবার আপনার সাবজেক্টে। আপনি লিখিত কৈফিয়ত দেবেন—

—যে আজ্ঞে স্যার্।

—ক্লাস সেভেনের ইতিহাস কে নেয়?

শ্রীশবাবু বলিলেন, আমি স্যার্।

—সকলের চেয়ে ভাল ছেলে মোটে ষাট পেয়েছে।

—স্যার্, প্রশ্ন বড় কঠিন হয়েছিল—সিলেবাস ছাড়া প্রশ্ন হলে কী করে ছেলেরা—

—না। এমন কিছু কঠিন নয়। প্রশ্নপত্র সব আমি আর মিঃ আলম দেখে দিয়েছি। কমিটিতে এ কথা আমায় রিপোর্ট করতে হবে। লিখিত কৈফিয়ত দেবেন। আর এবার বাড়ি বাড়ি গিয়ে একটু ক্যানভাস করা দরকার হবে ছুটির পরে। নইলে ছেলে হবে না!

ক্ষেত্রবাবু উঠিয়া ভয়ে ভয়ে বলিলেন, কিন্তু স্যার্, এদিকে শহর যে খালি হয়ে গেল—

সাহেব তাচ্ছিল্যের সুরে বলিলেন, কে বললে?

যদুবাবু ও শ্রীশবাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন, সেই রকমই দেখা যাচ্ছে স্যার্। ক্ষেত্রবাবু ঠিক বলেছেন।

গেম্-মাস্টার বিনোদবাবু বলিলেন, আমাদের পাড়াতে তো আর লোক নেই।

জগদীশ জ্যোতির্বিনোদ বলিল, আমি এক জায়গায় ছেলে পড়াই, তারা চলে গিয়েছে। তাদের বাড়ি খালি।

সাহেব মিঃ আলমের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কী মিঃ আলম, আপনি কী দেখেছেন? এই রকম হয়েছে নাকি?

—মিঃ আলম উঠিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, না স্যার্। এখানে ওখানে দু-একটা বাড়ি খালি হয়েছে বটে। কিছুই নয়!

ক্ষেত্রবাবু প্রতিবাদের সুরে বলিলেন, কিছু না কী রকম মিঃ আলম? হাওড়া স্টেশনে নাকি বেজায় ভিড় হচ্চে—কুলি আর ঘোড়ার গাড়ির দর বেজায় বেড়েছে—

—ওসব গুজব। কই, আমি তো রোজ বেড়াই, কিছু দেখি নি।

এমন সময় রামেন্দুবাবু বাহির হইতে একখানা খবরের কাগজ লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সাহেবের টেবিলে রাখিয়া বলিলেন, দেখুন স্যার্, হংকং যায় যায়—জাপানীরা সিঙ্গাপুরে দূর-পাল্লার কামানের গোলা ছুঁড়েচে।

হেডমাস্টারের কড়া ডিসিপ্লিনের নিগড় বুঝি ছুটিল! ক্ষেত্রবাবু ও শ্রীশবাবু টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া খবরের কাগজ পড়িতে গেলেন। সমবেত শিক্ষকদের মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি উত্থিত হইল।

—তাই তো!

—তাই তো!

—দেখ না ভায়া কাগজটা।

—সিঙ্গাপুর বিপন্ন!

—ব্যাপার কি?

সাহেব কাগজ হাতে তুলিয়া পড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, বাজে গুজব। সিঙ্গাপুর পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য।

মিঃ আলম বলিলেন, বাজে গুজব—হেঁঃ—

সাহেব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কাগজখানা এক দিকে সরাইয়া বলিলেন, যাক এসব! তা হলে বাড়ি বাড়ি ক্যানভাসিংয়ের জন্যে কে কে রাজী আছেন বলুন? সকলের সাহায্যই আমি চাই। যদুবাবু? ক্ষেত্রবাবু? মিঃ আলম?

ইঁহারা সকলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের ডিসিপ্লিন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল। জাপানী বোমার হুজুগে পড়িয়া সে কঠোর ডিসিপ্লিনের ভিত্তি সামান্য একটু নড়িয়া উঠিয়া-

ছিল মাত্র—তাহাও অতি অল্পক্ষণের জন্য।

হেডপণ্ডিত বলিলেন, স্যার্, ছুটি কদিন হচ্ছে?

সাহেব গম্ভীরস্বরে বলিলেন, পাণ্ডিট, ছুটি বেশী দিন দিতে চাই না। দোসরা জানুয়ারি খুলবে। কিন্তু তার আগে ক্যানভাসিং করবার জন্যে চার পাঁচজন টীচারকে এখানে থাকতে হবে। আমি তাদের নামে সারকুলার করব।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, আমাদের মাইনেটা স্যার্—

—স্কুল খুললে দেওয়া হবে।

যদুবাবু মুখ কাঁচুমাচু করিয়া বলিলেন, কিছু না দিলে স্যার্, আমরা দাঁড়াই কোথায়? হাতে কিছু নেই—

—যার না পোষাবে, তিনি চলে যেতে পারেন—মাই গেট্—

—যদুবাবু শিক্ষক কর্তৃক তিরস্কৃত স্কুলের ছাত্রের মত ঘাড় নীচু করিয়া পুনরায় আসনে বসিয়া পড়িলেন।

হেডমাস্টার বলিলেন, আমি ছুটির কদিন মিঃ আলম, রামেন্দুবাবু আর ক্ষেত্রবাবুকে চাই। তাঁরা রোজ আসবেন অফিসে। নতুন বছরের রুটিনে অনেক অদলবদল করতে হবে। সিলেবাস তৈরী করতে হবে প্রত্যেক ক্লাসের। আপনারা তিন জন আমাকে সাহায্য করবেন। যদুবাবু?

যদুবাবু আবার দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

—আপনিও আসবেন। আপনাকে ক্লাস-টাস্কের একটা চার্ট করতে হবে গ্রীষ্মের ছুটি পর্যন্ত।

যদুবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, আমি স্যার্, আমার শালীর, মানে—বিয়ে—দেশে যেতে হবে সেখানে। আমিই সব দেখাশুনো করব—

হঠাৎ মনে পড়িল পৌষ মাসে বিবাহ হয় না হিন্দুর, এ কথা সাহেব না জানিলেও অন্যান্য মাস্টারেরা সবাই জানে, হয়তো আলমও জানে। আলম সাহেবকে বলিয়া দিতেও পারে। তাই তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, বিয়ে এই সামনের বুধবার, কিন্তু ছুটিতে আমার না গেলে—

—ইয়েস্, ইয়েস্, আই আন্ডারস্ট্যান্ড।

সভা ভঙ্গ হইল। সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া যদুবাবু রামেন্দুবাবুকে পাকড়াও করিলেন।

—ও রামেন্দুবাবু, আমায় গোটা দশেক টাকা দিতে বলুন সাহেবকে। করে দিতেই হবে। না হলে মারা যাব। হাতে কিছু নেই। টুইশানির ছেলে পালিয়েচে। কোথায় পয়সা পাই বলুন তো?

ক্ষেত্রবাবু বাড়ি ফিরিতেই অনিলা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, এসেচ? শোন, সব পালাচ্ছে। পাড়া ফাঁকা হয়ে গেল যে? সোমবার থেকে নাকি হাওড়ার পুল খুলে দেবে, রেলগাড়ি বন্ধ করে দেবে?

—কে বললে?

—কে বললে আবার—সবাই বলচে। তোমার ছুটির কদিন দেরি? এর পর যাওয়া যাবে না কোথাও—ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া নাকি দশ টাকা করে হয়েচে—বোমা নাকি শীগগির পড়বে। সিঙ্গাপুর ব্লকড্ করেচে, দেখেছ তো?

ক্ষেত্রবাবুর ভয় হইয়া গেল। তাই তো, ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া চড়িয়া গেল কী করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিবেন? বলিলেন, কিন্তু কোথায় যাওয়া যায় বল তো? জায়গা তো দেখচি এক আসসিংড়ি। কতকাল সেখানে যাই নি। নিভা বেঁচে থাকতে একবার গরমের ছুটিতে সেখানে গিয়েছিলাম। বাড়িঘর এতদিনে ইটের স্তূপ হয়েছে পড়ে। বেজায় জঙ্গল সে গাঁয়।

—চল, গয়া যাই।

—পয়সা? অত টাকা কোথায়? স্কুলে এক পয়সা দিলে না।

—আমার বাক্সে পাঁচ-ছটা টাকা আছে। আর কিছু ধার কর।

—কে দেবে ধার? সে বাজার নয়।

—কিন্তু যা হয় কর তাড়াতাড়ি। এর পর আর কলকাতা থেকে বেরুনো যাবে না, সবাই বলচে।

—রান্না হয়ে থাকে, দাও। আমি একবার যদুদার বাসা থেকে আসি। দেখে আসি, কী করছে ওরা!

যদুবাবু বাসায় পা দিতেই তাঁহার স্ত্রী বলিল, ওগো, কী হবে গো? সবাই চলে যাচ্ছে. কী করবে কর। কোন্‌দিন ঝুপ করে বোমা পড়বে, তখন—

—দাঁড়াও, একটু স্থির হতে দাও। চা কর, আগে খাই। তারপর সব শুনছি।

চা করিয়া যদুবাবুর গৃহিণী কাঁসার গ্লাসে আঁচল জড়াইয়া লইয়া আসিল।

যদুবাবু বলিলেন, কেন, পেয়ালা?

—সে ও-বেলা ধুতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গুঁড়ো হয়ে গেল।

যদুবাবু রাগিয়া উঠিলেনঃ তা ভাঙবে বইকি, তোমাদের তো ভেবে খেতে হয় না। জিনিসপত্র নষ্ট করলেই হল—লাগে টাকা, দেবে গৌরী সেন। একটা পেয়ালার দাম কত আজকালকার বাজারে, তার খোঁজ রাখ?

এমন সময় বাহিরে ক্ষেত্রবাবুর গলা শোনা গেলঃ ও যদুদা, বাসায় আছেন নাকি?

যদুবাবু তাড়াতাড়ি চা-সুদ্ধ কাঁসার গ্লাসটা স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিলেন, এটা নিয়ে যাও—নিয়ে যাও। দেখে ফেলবে, বলবে কী? গলার সুর বাড়াইয়া বলিলেন, এস ক্ষেত্র ভায়া—এস এস—

—কী হচ্চে?

—এই সবে এলাম ভায়া। সবে মিনিট দশেক। তারপর কী মনে করে? বোস এইটেতে।

—বউদিদি কোথায়? ও বউদিদি, বলি, একটু চা-টা না হয় করেই খাওয়ান—

যদুবাবু হাসিয়া বলিলেন, চা খাবে কি ভাই, পেয়ালা ভেঙে বসে আছে তোমার বউদিদি—কাঁসার গেলাসে চা খাচ্ছিলাম, তা তোমাকে কি আর তাতে—

—খুব দেওয়া যায়। তাতেই দিন না বউদিদি।

—দাও তা হলে, ওগো, ওই চা-ই দিয়ে যাও—ক্ষেত্র ভায়া আমাদের ঘরের লোক।

চা আসিল। চা খাইতে খাইতে ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, তা তো হল। এখন কী উপায় করা যাবে বলুন দিকি? কলকাতার যা অবস্থা! লোক সব পালাচ্চে—

—হেডমাস্টার তা বুঝবেন না। তাঁর মতে কোন বিপদের কারণ নেই। আবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক্যান্‌ভাসিং করতে হবে ছেলের জন্যে! ছেলে কোথায়? কলকাতা শহর তো ফাঁকা হয়ে গেল।

—তা কি আর সাহেবকে বোঝানো যাবে দাদা? কাল থেকে ক্যান্‌ভাসিংয়ে না বেরুলে সাহেব রাগ করবে। আপনারও তো ডিউটি আছে?

—তাই তো, কী করা যায় ভাবচি। মুশকিল আসলে কী হয়েছে জান ভায়া, হাতে নেই পয়সা। রামেন্দু ভায়াকে ধরেছি, সাহেবকে বলে গোটা-দশেক টাকা আমায় না দেওয়ালে চলবে না।

—কোথায় যাবেন ভাবচেন?

—কোথায় যে যাই! হাতে পয়সা নেই, দেশঘর নেই। তোমার তবুও তো দেশে বাড়িঘর আছে, আমার যাবার স্থান নেই। এক আছে জ্ঞাতি-ভাইয়ের বাড়ি, বেড়াবাড়ি বলে গ্রাম, তা সেখানে তারা যে রকম ব্যবহার করেচে—পরের বাড়ি কোন জোর তো সেখানে খাটে না! তুমি কোথায় যাবে ভাবচ?

—আমরাও সেই একই অবস্থা। আস্‌সিংড়িতে—মানে আমাদের দেশে—কতকাল

যাই নি। বাড়িঘর এতদিনে ভূমিসাৎ। নয়তো একগলা জঙ্গল, সাপ-ব্যাঙের আড্ডা হয়ে আছে। মেয়েছেলে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াই কী করে? আমার স্ত্রী বলছিল, গয়াতে—শ্বশুরবাড়ি—

—সেই সবচেয়ে ভাল আমার মতে। তাই কেন যাও না?

—পয়সা? পয়সা কোথায়? স্কুলে খাটব, দু মাস পরে এক মাসের মাইনে নেব—এই তো অবস্থা। জানেন তো সবই।

—আচ্ছা, তোমার কী মনে হয় ভায়া? জাপানীরা কি এতদূর আসবে? সিঙ্গাপুর নিতে পারবে?

—কী করে বলব? তবে আমার এক জানাশোনা গবর্মেন্ট অফিসার বলছিল, সিঙ্গাপুর হঠাৎ নিতে পারবে না। ওখানে যুদ্ধ হবে দারুণ, এবং সে যুদ্ধ কিছুকাল চলবে।

—তবে কলকাতাতে ফেলতে পারে, কী বল?

—ফেলতে পারে। সাহেব যাই বলুক, কলকাতা খুব সেফ্ হবে না।

—স্কুলটাতে দুদিন বেশী ছুটির কথা বলে দেখলে হয় না?

—সাহেবকে তা বলা যাবে না। সাহেব ভিজবে না।

ক্ষেত্রবাবু আর কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া বিদায় লইলেন। ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতা, ঘুটঘুটে অন্ধকার—কাল হইতে আলো আরও কমাইয়া দিয়াছে। মোড়ের কাছে এক জায়গায় ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা। ক্ষেত্রবাবুর কৌতূহল হইল, গাড়ির ভাড়া কেমন হাঁকে একবার দেখিবেন।

রাস্তা পার হইতে ভয় করে। অন্ধকারের মধ্যে দূরে বা নিকটে বহু আলো তাঁহার দিকে আসিতেছে—ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে বোঝা যায় না, কত বেগে সেগুলি এদিকে আসিতেছে। ক্ষেত্রবাবু সন্তর্পণে রাস্তা পার হইয়া গাড়ির আড্ডার কাছে গিয়া বলিলেন, ওরে গাড়োয়ান, ভাড়া যাবি?

একখানা গাড়ির ছাদে একটা লোক শুইয়াছিল। উঠিয়া বলিল, কাঁহা যানে হোগা বাবুজি?

—হাওড়া ইষ্টিশানে।

—আভি জাইয়েগা?

—হ্যাঁ, এখুনি।

—ক আদমী আছে?

—তিন-চার জন আছে—মালপত্তর। কত ভাড়া নিবি?

—এক বাত বোলেগা বাবুজি? চার রুপেয়া।

—কত?

—চার রুপেয়া বাবুজি। কাল ইসসে অউর বাঢ়েগা বাবুজি। কাল পান্-ছ রুপেয়া হোগা। দিন দিন বাঢ়তে যাতা হ্যায়—যাবেন আপনি? সওয়ারী কোথা থেকে যাবে?

ক্ষেত্রবাবু কী একটু অজুহাত দেখাইয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। তাঁহার হাত-পা যেন অবশ হইয়া আসিতেছে—সম্মুখে যেন ঘোর বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, প্রলয় অথবা মৃত্যু, স্ত্রীপুত্র লইয়া এই ব্ল্যাক-আউটের ঘুটঘুটে অন্ধকারচ্ছন্ন কলিকাতা শহরে তিনি বোতলের মধ্যে ছিপি আঁটা অবস্থায় বুঝি মারা পড়িলেন! ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া দিনে দিনে যদি অসম্ভব অঙ্কের দিকে ছোটে, তবে তাঁর মত গরিব স্কুল-মাস্টার তো নিরুপায়।

মোড়ের মাথায় বিষ্ণু ভট্চাজের সঙ্গে অন্ধকারে প্রায় মাথা ঠুকিয়া গেল। পরস্পরকে চিনিয়া পরস্পর ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বিষ্ণু হাওড়ার রেলওয়ে মালগুদামে কাজ করে, বলিল, ওঃ, জানেন ক্ষেত্রদা, কী কান্ড আজ হাওড়া স্টেশনে! প্রত্যেক ট্রেন ছাড়ছে, লোকে লোকারণ্য। লোক গাড়িতে উঠতে পাচ্ছে না—দশ টাকা, পনেরো টাকা করে কুলিরা নিচ্ছে। আবার শুনছি, হাওড়া ব্রিজ দিয়ে গাড়ি-ঘোড়া যাওয়া বন্ধ করে দেবে। এত ভিড় যে, স্ট্র্যান্ড রোড একেবারে জ্যাম্—ই আই আর-এর গাড়িতে ওঠবার উপায় নেই।

—তুমি এখনও আছ যে?

—আমি আর কোথায় যাব? ফ্যামিলি পাঠিয়ে দিয়েছি বীরভূম—মামাশ্বশুরবাড়ি।

ক্ষেত্রবাবু বাসায় ঢুকিলেন। অনিলা বলিল, কী হল গো? যদুবাবু কী বললে?
—বলবে আর কী! সব একই অবস্থা। সেও ভাবছে কোথায় যাবে—জায়গা নেই—
—গয়া যাবে?
—যাব কি, ই আর আর-এর গাড়িতে নাকি যাওয়ার উপায় নেই।
—তবে কী করবে? স্কুল তো এখনও বন্ধ হল না!
—বন্ধ হলে কী হবে? আমার ছুটির মধ্যে ডিউটি পড়েছে—আমার যাবার জো নেই—

অনিলা স্বামীর হাত ধরিয়া মিনতির সুরে বলিল, ওগো, আমার মুখের দিকে চেয়ে তুমি চাকরি ছেড়ে দাও। এই বোমার হিড়িকে তোমাকে এখানে ফেলে রেখে আমার কোথাও গিয়ে শান্তি হবে না। ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে চাইতে হবে লক্ষ্মীটি, শুধু তোমার-আমার কথা ভাবলে হবে না।

ক্ষেত্রবাবুর মনে হইল, তাঁহার মাথার উপরে ভীষণ বিপদ সমাগত। স্ত্রীর গলার সুরে, নিজের মুখের কথায় যেন কোন মহা ট্র্যাজেডির ইঙ্গিত দিতেছে, সে ট্র্যাজেডির বেড়াজাল এড়াইয়া কোথাও পলাইবার পথ নাই।

সারারাত্রি বড় রাস্তা দিয়া ঘড়-ঘড় করিয়া ঘোড়ার গাড়ি আর ঠুনঠুন করিয়া রিকশা ছুটিতেছে—ক্ষেত্রবাবু বিনিদ্র চক্ষে সারারাত্রি ধরিয়া শুনিয়াই চলিলেন। অনিলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, ছেলেমেয়েরা ঘুমাইতেছে, সম্মুখে কী বিপদ, ইহাদের সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই নাই। কী করিয়া উদ্যত জাপানী বোমার হাত হইতে ইহাদের বাঁচাইবেন? বাঁচাইতে পারিবেন কি শেষ পর্যন্ত? হাতে টাকা পয়সা কোথায়?

সারারাত্রি ক্ষেত্রবাবু বিছানায় এপাশ ওপাশ করিলেন।

পরদিন স্কুলের প্রমোশন। সাহেব খুব সকালে উঠিয়া—অভিভাবকদের পড়িয়া শোনাইবার জন্য যে রিপোর্ট লিখিয়াছেন, তাহা আর-একবার পড়িয়া দেখিতে বসিলেন। আজ ছেলেদের প্রমোশনের পর অভিভাবকদের সভায় এই রিপোর্ট পড়া হইবে—প্রতি বৎসর হইয়া থাকে, অভিভাবকদের নিমন্ত্রণ করা হয়, এবারেও হইয়াছে।

"বড়ই আনন্দের কথা, সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজী পরীক্ষার ফল এবার যথেষ্ট আশাপ্রদ; যদিও ক্লাসের সর্বোচ্চ নম্বর শত-করা বাহান্ন, তবুও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রত্যেক উত্তরের খাতা আমাকে যথেষ্ট সন্তোষ দান করিয়াছে। ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে হরিচরণ এবার গ্রামারে বিশেষ উন্নতি করিয়াছে, যদিও ক্রিয়াপদের যথার্থ প্রয়োগ এখনও সে শিক্ষা করে নাই। গ্রামার-শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক এজন্য যত্ন লইতেছেন। শ্রীমান নবীনচন্দ্র গুই ইংরেজী আর্টিকলের ব্যবহারে বালকসুলভ ভ্রম প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তাহার গ্রামারের জ্ঞান উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। নবম শ্রেণীর অঙ্কের ফল এ বৎসর আশাতীত ভাল। শ্রীমান গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নব্বুই নম্বর পাইয়া অঙ্কে ক্লাসের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। আমি এই বালকের গত বৎসরের অঙ্ক পরীক্ষার ফলের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—বিগত বৎসরের ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষায় শ্রীমান গোপাল বীজগণিত ও জ্যামিতিতে যথাক্রমে আটচল্লিশ ও বত্রিশ নম্বর মাত্র পায় —এক বৎসরের মধ্যে সেই বালকের এই উন্নতি শুধু যে কেবল অঙ্কশিক্ষকের কৃতিত্বের পরিচায়ক তাহা নহে, বালকের নিজের অধ্যবসায় ও আগ্রহেরও নিদর্শন বটে। আমি এজন্য তাহাকে একটি স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র দিব স্থির করিলাম। শ্রীমান লালগোপাল ধর ইতিহাসে এ বৎসর..." ইত্যাদি।

অভিভাবকদের কাছে এই ধরনের রিপোর্ট পাঠ কোন স্কুলেই হয় না—কিন্তু সাহেবের বিশ্বাস, ইহাতে অভিভাবকেরা সন্তুষ্ট থাকে, স্কুলের ছাত্রসংখ্যা বাড়ে। এই ধরনের রিপোর্ট পাঠ নাকি ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলের একটি বৈশিষ্ট্য। কৃতী বালকদিগকে

স্বাক্ষরিত প্রশংসাপত্র দান আর একটি বৈশিষ্ট্য; যদিও ছেলেরা আড়ালে বলাবলি করে, রৌপ্যপদক দিতে অর্থব্যয় আছে, প্রশংসাপত্র দিতে খরচ শুধু কাগজের।

মাস্টারেরা বেলা নয়টার মধ্যে আসিয়া গেল। কাল সারকুলার দেওয়া হইয়াছিল—বিভিন্ন মাস্টারের বিভিন্ন কাজ। কেহ প্রমোশন-প্রাপ্ত ছেলেদের নাম, ক্লাস ও সারি তালিকা করিতেছে, কেহ ভাল ছেলেদের পরীক্ষার খাতাগুলি আলাদা করিয়া রাখিতেছে, কেহ নতুন ক্লাসের বইয়ের লিস্টগুলি তৈয়ারি করিতেছে। দুইজনে মিলিয়া একখানা বিজ্ঞাপন লিথো করিতেছে [এই স্কুলে আধুনিকতম শিক্ষা-বিজ্ঞান অনুমোদিত পদ্ধতিতে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয়, হেডমাস্টার মিঃ জি. বি. ক্লার্কওয়েল এম. এ. (লিড্স্) বি. এড. (লণ্ডন) এল. টি. (কর্ক) এস. সি. এম. এস. (অমুক) স্বয়ং নবম ও দশম শ্রেণীতে ইংরাজী পড়ান এবং শিশু-শ্রেণীতে কথ্য ইংরেজী শিক্ষা দেন। আমরা স্পর্ধার সহিত বলিতে পারি— ]।

বিজ্ঞাপন ছাপাইবার পয়সা নাই—তাই লিথো করা। অভিভাবকদের হাতে বিলি করা হইবে। হেডমাস্টারের নানা ফাইফরমাশ খাটিতে খাটিতে মাস্টারেরা হিমসিম খাইয়া গেল!

বেলা দশটা বাজিল। এ কয়দিন ছেলেরা তেমন নাই—কারণ, পরীক্ষার পর একরকম ছুটিই ছিল। আজ প্রমোশনের দিন, অন্য অন্য বছর বেলা সাড়ে নয়টার সময় হইতে ছেলেদের ভিড় হয়—এবার জনপ্রাণীর দেখা নাই! বেলা এগারোটা বাজিল, কেহই নাই। সাড়ে এগারোটার সময় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন মাত্র ছাত্র আসিল—তিন শো সাড়ে তিন শো ছেলের মধ্যে। দুইজন মাত্র অভিভাবক দেখা দিলেন প্রায় বারোটার সময়। আর কেহই আসিল না। হেডমাস্টার রীতিমত নিরাশ হইলেন—কত কষ্ট করিয়া লেখা রিপোর্ট কাহার সামনে পাঠ করিবেন? তবুও তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন, নিজের ঘর হইতে গাউন ঝুলাইয়া ও স্লেটের মত দেখিতে হ্যাট মাথায় দিয়া সাজিয়া-গুজিয়া মাস্টারদের লইয়া ক্লাসে ক্লাসে প্রমোশন দিতে গেলেন।

মিঃ আলম বলিলেন, স্যার্, নীচের তলায় কোন ক্লাসে ছেলে নেই—ছোট ছোট ছেলে-দের ক্লাস একেবারে ফাঁকা! সেখানে কি যেতে হবে?

সাহেব হাইকোর্টের জজের মত গম্ভীর সুরে বলিলেন, নিয়ম যা, তার একটুকু ব্যতিক্রম হবার জো নেই আমার স্কুলে। শূন্য ক্লাসের সামনেই প্রমোশনের লিস্ট পড়া হবে।

সুতরাং উপরের ক্লাসের প্রমোশন লিস্ট পড়া শেষ করিয়া হেডমাস্টার দলবল লইয়া নীচেকার শূন্য ক্লাসগুলিতে অবতীর্ণ হইলেন।

হেডমাস্টার ডাকিলেন, রমেন্দ্র বোস প্রোমোটেড্ টু নেক্সট্ হাইয়ার ক্লাস, অমুকে প্রোমোটেড্ টু নেক্সট্ হাইয়ার ক্লাস, ইত্যাদি।

ফাঁকা হাওয়া এ-জানালায় ও-জানালায় হা-হা করিতেছে। কড়িকাঠে টিকটিকি টিক্টিক্ করিয়া উঠিল। হাসি পাইলেও কোন মাস্টারের হাসিবার জো নাই। শ্রীশবাবু গেম্ মাস্টার বিনোদবাবুর পাঁজরায় আঙুলের গুঁতা মারিল। যদুবাবু ক্ষেত্রবাবুকে চিম্টি কাটিলেন।

উপরে আসিয়া রিপোর্ট পড়িবার সময় দেখা গেল, সেই দুইজন অভিভাবক আপিসে বসিয়া আছে। তাহারা সাহেবের বার্ষিক প্রোগ্রেস রিপোর্ট শুনিতে আসে নাই, আসিয়াছে তাহাদের ছেলেদের ট্রান্সফার সার্টিফিকেট লইতে।

সাহেবের ইঙ্গিতে মিঃ আলম তাহাদের আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা এ স্কুল থেকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন কেন? ওদের এ বছরের ফল বেশ ভালই। হেডমাস্টারের রিপোর্টটা শুনুন না—

একজন বলিল, রিপোর্ট শুনে কি করব মশাই, আমাদের ফ্যামিলি সব এখান থেকে চলে গিয়েছে কাটোয়ায়, আজ আট-দশ দিন হল। সেখানে এখন সবাই থাকবে। এখানে বাড়ি চাবিবন্ধ, ছেলে থাকবে কার কাছে? সেখানেই ভর্তি ক'রে দেব।

অন্য লোকটি বলিল, আমাদের দেশ মশাই বর্ধমানে। আমাদের দোকান ছিল, উঠিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি। দেশের স্কুলে ভর্তি করব। আপনি সাহেবকে বলুন, ট্রান্সফার আজই

দিতে হবে। আমাদের পাড়ায় লোক নেই, থাকব কী ভরসায়?

—রিপোর্টটা শুনুন না?

—না মশাই, মন ভাল না। ওসব শোনবার সময় নেই। আমার ব্যবস্থাটা করে দিন তাড়াতাড়ি।

মিঃ আলম ফিরিয়া আসিলে সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হল?

—স্যার, ওরা শোনে না। ট্রান্সফার না নিয়ে ছাড়বে না মনে হচ্ছে!

—ছেলে এল না কেন আজ?

রামেন্দুবাবু বলিলেন, ছেলে কোথায় যে আসবে স্যার? সব ভেগেছে।

নমো-নমো করিয়া মিটিং শেষ হইল। রিপোর্ট পাঠ হইল স্কুলের মাস্টারদের সামনে। মীটিং অন্তে হেডমাস্টারের নানারকম সারকুলার বাহির হইল—এ মাস্টারকে এ করিতে হইবে, ও মাস্টারকে ও করিতে হইবে। ছুটির সারকুলার বাহির হইল—দোসরা জানুয়ারি স্কুল খুলিবে। হেডমাস্টারের নিকট মাস্টারেরা বিদায় লইলেন। অতি সাধের লিথো-করা বিজ্ঞাপন কাহাদের মধ্যে বিলি করা হইবে? স্কুলের বোর্ডে খানকতক আঠা দিয়া জুড়িয়া দেওয়া হইল।

চায়ের দোকানে যদুবাবু আর শ্রীশবাবু হাসিয়া বাঁচেন না।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, সাহেবের কী কাণ্ড! কোনো ত্রুটি হবার জো নেই।

যদুবাবু বলিলেন, নাঃ, হেসে আর বাঁচি নে—হাসতে হাসতে পেট ফুলে উঠল। হাসতেও পারি নে সাহেবের সামনে—

এই সময় জ্যোতির্বিনোদ একটা পুঁটলি হাতে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আজ শেষ দিনটা, একটু ভাল করে খাওয়া-দাওয়া যাক যদুদা?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, হাতে পোঁটলা কিসের হে?

—আজ বাড়ি যাচ্ছি রাত্রের গাড়িতে।

—এ কদিনের জন্যে?

—না দাদা, বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে। যাই চলে, যা হয় হবে। এখন কলকাতা আসা বোধহয় হবে না।

—সাহেব কি ছুটি দেবে?

—না হয় চাকরি ছেড়ে দেব। দেশে ঘর আছে, ভিক্ষে করে খাব। বামুনের ছেলে, তাতে লজ্জা নেই।

যদুবাবুর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। এই জ্যোতির্বিনোদের মত সামান্য দরের লোকে যদি চাকরি ছাড়িয়া দিবার মত মরীয়া হইয়া উঠিতে পারে, তবে বিপদ কত বেশী!

কে একজন বলিল, ক্ষেত্রদার হোমিওপ্যাথিটা যা হোক চলছিল—

—আর হোমিওপ্যাথি ভায়া! পাড়ায় নেই লোক, ডাক্তারি করতাম একটু-আধটু অবসরমত, তাও গেল—পাড়া খালি।

যদুবাবু হঠাৎ যেন শীতকালেও ঘামিয়া উঠিতে লাগিলেন। শ্রীশবাবু, শরৎবাবু, গেম্ মাস্টার বিনোদবাবু, হেডপণ্ডিত, সবাই আজ উপস্থিত। বড়দিনের ছুটি হইয়া যাইতেছে —তাহার উপর এই গোলমাল। কী হইবে কে জানে? একটু ভাল করিয়া খাওয়া-দাওয়া করিয়া লওয়া যাক। ইঁহাদের ভাল খাওয়ার দৌড়—চার পয়সা হইতে ছয় পয়সা বা আট পয়সা। একখানা টোস্টের জায়গায় দুইখানা টোস্ট। তাহাই সকলে আমোদ করিয়া খাইলেন। ইঁহারা অল্পেই সন্তুষ্ট, অভাবের মধ্যে সারা জীবন এবং যৌবনের প্রথম অংশ অতিবাহিত করিয়া সংযম ও মিতব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

ইঁহাদের মধ্যে জগদীশ জ্যোতির্বিনোদ অমিতব্যয়িতার প্রথম উদাহরণ দেখাইয়া বলিলেন, ওহে দোকানদার, যদুবাবুকে আরও একখানা কেক দাও, শ্রীশবাবুকে একখানা টোস্ট দাও, বিনোদকে—

যদুবাবু একগাল হাসিয়া বলিলেন, আমাদের জ্যোতির্বিনোদের হার্টটা যাই বল বেশ ভাল।

—আর দাদা, হার্ট! এবার কলকাতা থেকে চলে যাচ্ছি। বোধ হয় এই শেষ দেখা—চাকরি আর করব না—

—কেন, কেন?

—বাড়ির সকলে বলেছে, প্রাণ বাঁচলে অনেক চাকরি মিলবে—চলে এস বাড়ি।

যদুবাবু কথাটা এই কিছুক্ষণ আগেই একবার শুনিয়াছেন ইঁহার মুখ হইতে, তবুও আর একবার জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিয়া বিপদের গুরুত্বটা ভাল করিয়া যেন বুঝিতে চাহিলেন।

ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন, তারপর ক্ষেত্র ভায়া, ব্যাপার কী দাঁড়াল বল তো? সত্যি কি কলকাতা ছেড়ে যেতে হবে?

ক্ষেত্রবাবুও ঠিক এই কথাই ভাবিতেছেন। চা খাইতে খাইতে এই মাত্র ভাবিতেছিলেন, আস্‌সিংড়ি যাওয়া ভাল, না, ডিহিরি-অন-সোনে শ্বশুরবাড়িতে? যদুবাবুর কথায় যেন একটু বিস্মিত হইলেন। ভয়ানক বিপদ নিশ্চয় সম্মুখে, নতুবা যদুদার মনেও ঠিক একই সময়ে সেই একই কথা উঠিল কেন? বলিলেন, তা যেতে হবে বইকি। সবাই যখন পালাল—

গেম্‌-মাস্টার বলিলেন, আমার এক বন্ধুর বাড়িতে রেডিও আছে। টোকিও থেকে নাকি বলেছে, সাতাশে তারিখে কলকাতায় নিশ্চয়ই বোমা ফেলবে—

যদুবাবু সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, অ্যাঁ!

ক্ষেত্রবাবুর নিজের স্নায়ুসমূহের উপর কর্তৃত্ব আরও দৃঢ়তর। তিনি বলিলেন, কোন্ সাতাশে? এই সাতাশে?

—এই সামনের সাতাশে দাদা। আজ হল সতরো।

যদুবাবুর সামনে এইবার দোকানী জ্যোতির্বিনোদের অর্ডারী সেই কেক্‌খানা দিয়া গেল। যদুবাবুর তখন আর কেক্ খাইবার রুচি নাই—অন্য সময়ে হইলে পরের দেওয়া চার পয়সা দামের ভাল কেক্‌খানা কী তৃপ্তির সঙ্গেই একটু একটু করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া চায়ের সঙ্গে খাইয়া শেষ করিতে অন্তত দশ-পনেরো মিনিট করিতেন—পাছে তাড়াতাড়ি ফুরাইয়া যায়! আজ কিন্তু যদুবাবুর মনে হইল, তিনি মিউনিসিপ্যালিটির জবাইখানার মধ্যে বসিয়া আছেন, চারি ধারে গরুর বদলে মানুষের কাটা হাত, পা, ঘিলু-বার-হওয়া শূন্যগর্ভ নরমুণ্ড. চাপ চাপ রক্ত, থেঁতলানো ধড়, ছটকিয়া পড়া দন্তপাটি—শবের উপরে শব, রক্তমাখা চুলের বোঝা, উগ্র কর্ডাইটের গন্ধ, মৃত্যু, আর্তনাদ!

যদুবাবু নিজের অজানিতে শিহরিয়া উঠিলেন।

কোথায় যাইবেন তিনি? যাইবার কোন জায়গা নাই। বেড়াবাড়ি গিয়া উঠিবেন অবনীর খোশামোদ করিয়া, হাতে পায়ে ধরিয়া? এ বিপদসঙ্কুল স্থানে মরণের ফাঁদের মধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকার চেয়ে তাও যে ভাল। ভাগ্যে আজ রামেন্দুবাবুকে ধরিয়া-কাঁদিয়া গোটাকতক টাকা সাহেবের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইয়াছেন!

সম্মুখের টেবিলস্থ পাত্রের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, ইতিমধ্যে কখন কেক্‌খানা খাইয়া ফেলিয়াছেন অন্যমনস্ক অবস্থায়। টেবিল হইতে উঠিয়া বলিলেন, তোমরা তা হলে বোস, আমি আসি—

জ্যোতির্বিনোদ বলিলেন, আরে বসুন বসুন যদুবাবু, আর এক পেয়ালা চা দেবে? আর একখানা কেক্?

আরে, না হে না। আমার সময় নেই সত্যি। একটা জরুরী কাজ আছে, আমি চলি—

অপরের চা ও খাবার যদুবাবু বোধহয় জীবনে এই সর্বপ্রথম প্রত্যাখ্যান করিলেন।

বেলা সাড়ে পাঁচটা। শীতের বেলা, সন্ধ্যার বেশী দেরি নাই। ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতায় বেশী ঘোরাঘুরি করা চলিবে না, তবুও যদুবাবু শ্যামবাজারে তাঁহার এক জানা-শোনা লোকের আড়তে গিয়া কিছু টাকা ধারের চেষ্টা একবার দেখিলেন। যদি কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হয়, বেশ কিছু রেস্ত থাকা দরকার হাতে।

টালার পুলের পাশ দিয়া গলিটা নামিয়া গেল। যদুবাবু দুরু দুরু বক্ষে আড়তের নিকটবর্তী হইলেন, কী জানি কী ঘটে! কত টাকা চাহিবেন? দশ, না, ত্রিশ? পাওয়া যাইবে কি ঐ বাজারে? বিশেষত এ স্থলে আলাপ-পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ নয়। লোকটি তাঁহার শালার সহপাঠী, শালার সঙ্গে কয়েকবার ইতিপূর্বে এখানে আসিয়াছেন—এক-সময়ে যাতায়াত ছিল, এখন কমিয়া গিয়াছে।

আড়তের টিনের চালা নজরে পড়িতেই যদুবাবুর বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল, জিভ শুকাইয়া আসিল।

পথের ধারে খালের জলে একটা হাঁড়ি-বোঝাই ভড় হইতে লোকজন হাঁড়ি নামাইতে-ছিল। যদুবাবু লক্ষ্য করিলেন, অনেকগুলি মাটির তোলো-হাঁড়ি ডাঙায় সাজাইয়া এক পাশে রাখিয়া দিয়াছে। এক পাশে স্তূপাকার কলিকা। লুঙ্গি-পরা একজন মাঝি আরও কলিকা নামাইতেছে।

যদুবাবু ভাবিলেন, এ হাঁড়িতে আর কি কেউ ভাত রেঁধে খাবে? কলকাতা শহর তো ফাঁকা—এত কল্কেতেই বা তামাক খাবে কে?

তখন একেবারে আড়তের সামনে তিনি পেঁৗছিয়া গিয়াছেন।

সামনেই একজন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, বছর পঞ্চাশেক বয়স, মাথায় টাক, রঙ খুব গৌরবর্ণ, গায়ে হাত-কাটা বেনিয়ান। লোকটি গুড়গুড়িতে তামাক খাইতেছিলেন।

যদুবাবু পৈঠা দিয়া উঠিতে উঠিতে হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন, এই যে সীতানাথবাবু, ভাল আছেন?

—এই যে যদুবাবু, আসুন—বসুন। তারপর কোথা থেকে? রামনাথ কোথায়?

রামনাথ যদুবাবুর শ্যালক, আজ বছর কয়েক যদুবাবু তাহার কোন খবর জানেন না; সেও ভগ্নীপতির খবরাখবর রাখে না। কিন্তু এ কথা এ স্থলে বলা ঠিক হইবে না। যাহার সুবাদে আড়তের মালিকের সঙ্গে পরিচয়, সে-ই যদি খোঁজখবর না রাখে, তবে ইহার নিকটও যদুবাবুকে কিঞ্চিৎ খেলো হইতে হয় বইকি। সুতরাং তিনি বলিলেন, রামু সেইখানেই আছে। মধ্যে আসবে লিখেছিল, ছুটি পাচ্ছে না—

—সেই জব্বলপুরেই আছে? আছে ভাল?

—হ্যাঁ, তা ভাল আছে।

—আপনাদের স্কুল ছুটি হয়ে যায় নি? আপনি এখনও স্কুলে আছেন তো?

—আছি বইকি। নয়তো কী আর করব বলুন? আপনাদের মতন তো ব্যবসা-বাণিজ্য শিখি নি।

আড়তের মালিক হাসিয়া বলিলেন, আপনাদের তো ভাল, বিছানা বাক্স বাঁধলেন, কলকাতা থেকে পালালেন, আমাদের কী হয় বলুন তো? গুদাম-ভরা মাল নিয়ে এখন যাই কোথায়? বোমা পড়ে, এখানেই যা হয় হোক। বসুন, চা খাবেন? ওরে, দু পেয়ালা চা করতে বল্ ঠাকুরকে।

চা খাইয়া এ-কথা ও-কথার পরে যদুবাবু আসল কথাটি উত্থাপন করিবার পূর্বে যথেষ্ট সাহস করিয়া লইলেন। তাহার পর শুষ্কমুখে বার দুই-তিন ঢোক গিলিয়া বলিলেন, আপনার কাছে এসেছিলাম সীতানাথবাবু, হাতে বিশেষ কিছু নেই, একেবারেই খালি। কলকাতার বাইরে যেতে হলে কিছু হাতে রাখা দরকার। গোটা কুড়ি টাকা যদি আমাকে ধার দেন এসময় তবে বড়ই উপকার করা হয়, আমি অবিশ্যি যত সত্বর হয়, আপনার ধার শোধ করব, জানুয়ারি মাসের মাইনে থেকে—

চাহিবার ভাষা অবশ্য ইহাই। আড়তদার সীতানাথবাবু স্কুল-মাস্টার নহেন, লোক চরাইয়া খান। টাকা ধার লইলে কেহ স্বেচ্ছায় শোধ দিয়া যায় বাড়ি বহিয়া, ইহা বিশ্বাস করেন না। যদুবাবুর সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠতাও তাঁহার নাই, এ অবস্থায় যদুবাবু একে-বারে কুড়ি টাকা ধার চাওয়াতে কিঞ্চিৎ বিস্মিতও হইয়াছিলেন। বেশ অমায়িকভাবে হাসিয়া, কথার সঙ্গে কিছুমাত্র ডালপালা না জুড়িয়া যথেষ্ট ভদ্রতা ও বিনয়ের সহিত বলিলেন, টাকা হবে না। এ সময় নয়—

যদুবাবু আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। সীতানাথবাবুর গলার সুরে হৃদ্যতা

বা আত্মীয়তার লেশমাত্র নাই। চাঁচাছোলা কেতাদুরস্ত ভাবের ভদ্রতার সুর। শুনিলে ভয় হয়, দ্বিতীয় বার আর যাচ্ঞা করা চলে না। তবুও প্রাণের দায় বড় দায়—কাল সকালে তিনি কলিকাতা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবেনই, যে দিকে দুই চোখ যায়, এখানে লজ্জা করিলে চলিবে না। সুতরাং আবার বলিলেন, তা দেখুন সীতানাথবাবু, একটু দেখুন। হয়ে যাবে এখন। আমার বড্ড দরকার। কলকাতা থেকে চলে যাবার উপায় নেই, আমাকে একটু সাহায্য করুন—

—হবে না। পারব না। মাপ করুন—

সীতানাথবাবু হাত জোড় করিলেন এমন ভঙ্গিতে, যেন তিনি বিশেষ কোন অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছেন যদুবাবুর কাছে।

তবুও যদুবাবু আবার বলিলেন, তবে না হয় আমায় পনেরোটা কি দশটা টাকা দিন —যা পারেন—আমি যে বড় টানাটানিতে পড়েছি কিনা—জানুয়ারি মাসের মাইনে পেলেই—

সীতানাথবাবু কী ভাবিয়া বলিলেন, পাঁচটা টাকা নিয়ে যান, এসেছেন যখন। ও গোপাল, ক্যাশ থেকে পাঁচটা টাকা দাও তো!

ওদিকে একজন বৃদ্ধ লোক বসিয়া খাতাপত্র লিখিতেছিল, সে বলিল, খাতায় কী লিখব বাবু?

—আমার নিজ নামে হাওলাত লিখে রাখ। এই নিন—আসুন।

যদুবাবু নমস্কার করিয়া সীতানাথবাবুর আড়ত হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শ্যামবাজারের মোড় পর্যন্ত আর আসিতে পারেন না, রাস্তা পার হইতে পারেন না, ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওখানা কী আসে—রিক্শা, না, মোটর?

আলো চলিয়া আসিতেছে—অন্ধকারের মধ্যে কত জোরে আসিতেছে বোঝা যায় না, ঘাড়ে পড়িবে নাকি?

বাড়ি আসিলেন তখন দশটা-রাত্রি।

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, এলে? আমি ভেবে মরি, এত রাত পর্যন্ত এই অন্ধকারে—

—শোন, বিছানা বাক্স গুছিয়ে নাও—কাল সকালের ট্রেনেই বেরুতে হবে। আর নয় এখানে—

যদুবাবুর স্ত্রী অবাক হইয়া যদুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, সে কী গো! যাবে কোথায় একটা ঠিক কর আগে।

—অত ঠিক করার সময় নেই। চল বেড়াবাড়ি যাই।

যদুবাবুর স্ত্রী শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, ওগো, তুমি মাপ কর। সেখানে আমি যাব না।

যদুবাবু মুখ খিঁচাইয়া বলিলেন, তবে মরগে যাও—যাবে কোথায়? দাঁড়াবার জায়গা আছে কোথায় জিগ্যেস করি? এখানে মর বোমা খেয়ে।

—তা সেও ভাল। অবনী ঠাকুরপোর বউ আর মায়ের খিটিং খিটিং দাঁতের বাদ্যি আমার সহ্য হবে না। তার চেয়ে মরি, বোমা খেয়েই মরি।

—তবে মর, যা হয় কর। আমি কিচ্ছু জানি নে—

—তুমি যাও না নিজে। রেখে যাও আমায় এখানে—

আহারাদি করিয়া যদুবাবু মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বেড়াবাড়ি যদি না যাওয়া যায়, তবে কোথায় গিয়া উঠিবেন এখন? দিদির বাড়ি? হুগলী জেলার যে পল্লীগ্রামে তাঁহার দিদির বাড়ি, ভগ্নীপতির মৃত্যুর পরে বহুদিন কেন, বহুকাল সেখানে যাওয়া হয় নাই। বাড়িঘরের কী আছে না-আছে, তিনি জানেনও না। সেইখানেই অগত্যা যাইতে হয়। মোটর উপর যেখানে হয়, কাল সকালেই পলাইতে হয়। ভাবিবার সময় নাই।

একবার কী একটা শব্দ হইল, যদুবাবু চমকিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এরোপ্লেনের শব্দ, সাইরেন বাজিল নাকি?

পোঁ—ও—ও—ও—

ক্রমশ শব্দটা মাথার উপরে আসিতেছে। যদুবাবুর প্লীহা চমকাইয়া গেল।

জাপানী প্লেন যে নয়, তাহা কে বলিল? যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, এই দেখ, একখানা উড়ো-জাহাজ আলো জ্বালিয়ে মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে।

যদুবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, চুপ, চুপ, হ্যারিকেনটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যাও—ঘরের মধ্যে নিয়ে যাও—বোমা! বোমা! জাপানী বোমা!

আবার সেই রক্তাক্ত জবাইখানার দৃশ্য তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট হইয়া উঠিল—রক্ত, চুল, অস্থি, মাংস। স্ত্রীকে বলিলেন, বেঁধে নাও, বিছানা-টিছানা বেঁধে ফেল—কটা বেজেছে দেখ তো, দেশেই যাব ঠিক করলাম। নিজের দেশে।

আজ রাতটা কি কোন রকমে কাটিবে না?

সকাল হইতে না হইতে যদুবাবু ঘোড়ার গাড়ির আড্ডায় গাড়ি ভাড়া করিতে গেলেন। হাওড়া স্টেশনে যাইতে কেহ হাঁকিল তিন টাকা, কেহ হাঁকিল সাড়ে তিন টাকা। একজন বলিল, হাওড়া পুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে বাবু, কোন গাড়ি যেতে দিচ্ছে না—

যদুবাবু চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, কে বললে?

—হামরা সব জানি বাবু।

দুইখানা রিক্‌শা ঠুন্ ঠুন্ করিয়া যাইতেছিল। তাহাদের থামাইয়া, বারো আনায় রিক্‌শা ঠিক করিয়া তাহাদের বাসার সামনে আনিলেন। তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই। যদি হাওড়ার পুল বন্ধ থাকে, বালি ব্রিজ হইয়া রিক্‌শা ঘুরাইয়া লইবেন—যত টাকা লাগে। কলিকাতা হইতে বাহির হইতেই হইবে। এ মৃত্যুর ফাঁদ হইতে বাহির হইতে পারিবেন না কি কোন রকমে? জাপানী বোমা!!!

জিনিসপত্র রিক্‌শায় বোঝায় দিয়া মলঙ্গা লেন হইতে সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউতে পড়িয়া বউবাজার দিয়া হাওড়ার পুলের দিকে চলিলেন। একটু একটু ফরসা হইয়াছে। পুল নির্বিঘ্নে পার হইয়া গেল, অত ভোরেও দলে দলে ছ্যাকরা গাড়ি, মোটর, রিক্‌শা, ঠ্যালা-গাড়ি, মোট-মাথায় মুটে, পথচারীর দল চলিয়াছে পুল বাহিয়া। যদুবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তবে কি পুল পার হইতে পারিয়াছেন সত্যই? বোধ হয় এ যাত্রা তবে রক্ষা পাইয়া গেলেন।

স্টেশনে লোকে লোকারণ্য অত সকালেও। বউ-ঝি, ছেলে-মেয়ে, লটবহর, মুটে, বিছানা, ধামা, ট্রাম, গুড়ের ভাঁড়, তেলের টিন, ছাতালাঠির বাণ্ডিল, চ্যাঁ-ভ্যাঁ, হৈ-চৈ। টিকিট কাটিতে গিয়া দেখিলেন, টিকিটের জানালা খোলে নাই। অথচ সেখানে সার বাঁধিয়া লোক দাঁড়াইয়া। গেটে ঢুকিবার উপায় নাই, পিষিয়া তালগোল পাকাইয়া কোন রকমে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিলেন। গাড়ির দরজায় চাবি—লোকজন জানালা দিয়া লাফাইয়া ডিঙাইয়া কামরার মধ্যে ঢুকিতেছে। যদুবাবু এক ভদ্রলোককে বলিলেন, মশায় একটু দয়া করে যদি সাহায্য করেন মেয়েদের।

যদুবাবুর স্ত্রী বসিবার জায়গা পাইলেন, কিন্তু তিনি নিজে অতি কষ্টে দাঁড়াইবার স্থানটুকু পাইলেন। এই সময় যদুবাবুর স্ত্রী বলিলেন, ওগো, সেই ছোট বালতিটা? সেটা সেই টিকিট-ঘরের সামনে—সেখানেই পড়ে আছে—

সর্বনাশ! যদুবাবু অমনি ছুটিলেন। আছে, ঠিক আছে। বালতিটা কেহই লয় নাই। ভিড়ের মধ্যে জিনিসপত্র চুরি যায় না। কাছে কাছে সর্বদাই লোক। সকলেই ভাবে, তাহার মধ্যে কাহারও জিনিস।

গেটে পুনরায় ঢুকিবার সময় বেজায় ভিড়। সারি সারি মুটে মোটঘাট মাথায় দাঁড়াইয়া, পিছনে বউ ঝি, ছেলে মেয়ে, পুরুষ। গেট আবার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। একটু পরে কেন যে হঠাৎ গেট খুলিল, তাহা কেহ বলিতে পারে না। নরনারীর দল ধীর মন্থর গতিতে গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটি অল্পবয়সী বধূ দুই হাতে দুইটি ভারি পোঁটলা ঝুলাইয়া ভিড়ে পিষিয়া যাইতেছে। যদুবাবুর মনে সেবা-প্রবৃত্তি জাগিল। আহা, কতটুকু মেয়ে, এই ভিড় সহ্য করা কি ওদের কাজ? যদুবাবু গিয়া বলিলেন, মা আপনার পুঁটুলিটা দিন আমার হাতে—

বউটিকে সামনে দিয়া হাত দিয়া প্রায় বেড়িয়া ভিড়ের সংস্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া তাহাকে গেট্ পার করিয়া দিলেন। বউটির সঙ্গে উনিশ-কুড়ি বছরের ছোকরা, তাহার দুই হাতে দুইটি ভারী ট্রাঙ্ক। সে যদুবাবুকে বলিল, স্যার্, আপনি কোন্ গাড়িতে যাবেন? শেওড়াফুলি? তা হলে এক গাড়িতেই—

যদুবাবু বধূটিকে অনেক কষ্টে স্ত্রীর পাশে একটা জায়গা করিয়া বসাইয়া দিলেন। ট্রেন ছাড়িল।

পুনর্জন্ম।

যদুবাবু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। জাপানী বোমার পাল্লা হুগলী জেলা পর্যন্ত পৌঁছিবে না।

ক্ষেত্রবাবু শেষ পর্যন্ত আস্‌সিংড়ি গ্রামে যাওয়াই স্থির করিলেন। প্রায় আজ দশ বছর পরে যাওয়া। বহু কষ্টে ভিড়, অসুবিধা, অতিরিক্ত খরচ, ধাক্কাধুক্কি সহ্য করিয়া গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন সন্ধ্যার কিছু আগে। গিয়া দেখিলেন, পৈতৃক বাড়ির পশ্চিম দিকের কুঠুরিতে গ্রামের এক গরিব গৃহস্থ আশ্রয় লইয়াছে, তাহারা জাতিতে কৈবর্ত। তাহারা মনের আনন্দে গাছে ডাব ইঁচড় ইত্যাদি পাড়িয়া খাইতেছে, বাঁশঝাড়ের বাঁশ কাটাই-তেছে, উঠানে প্রকাণ্ড তরকারির ক্ষেত করিয়াছে। কোন কালে কেহ আসিয়া এ-সব কাজের কৈফিয়ত চাহিবে, তাহারা কোনদিনও ভাবে নাই। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা বাড়ির মালিকদের আকস্মিক আবির্ভাবে তাহারা সন্ত্রস্ত তটস্থ হইয়া পড়িল।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, কে হে! ও, পাঁচু না? তোমরাই আছ?

পাঁচু হাত কচলাইয়া বলিল, আজ্ঞে, আমরাই। বাড়িঘর সেবার পড়ে গেল ঝড়ে, তা বলি বাবুর বাড়ি পড়ে রয়েছে, তাই আমরা—

—আছ, ভালই। বাপের ভিটেতে সন্ধ্যে পড়ছে। তা ওদিকে অত জঙ্গল করে রেখেছ কেন? নিজেরাই থাক, এটুকু ভাল করে রাখলে পার। ওদিকের ঘরগুলো ভাল আছে?

—না বাবু। ওই একখানা ঘর ভাল ছিল, আমরাই থাকি। ওদিকের ঘরের ছাদ দিয়ে জল পড়ে।

—যাই হোক, এখন রাত্তিরটা থাকার ব্যবস্থা কী করা যায়?

—ওদিকের ঘর দুটো পরিষ্কার করে দিই বাবুকে। এখন আসুন।

সেই ভাঙা ঘরের স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে জিনিসপত্র, স্ত্রীপুত্র লইয়া ক্ষেত্রবাবু সেই সন্ধ্যা হইতে অধিষ্ঠিত হইলেন। অনিলার আদৌ ইচ্ছা ছিল না এখানে আসিবার। শুধু টাকা-পয়সার অভাবে গ্রামে আসিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে!

অনিলা বলে, সাপখোপ কামড়াবে নাকি! মেঝের ওপর শোয়া—তোমার এখানে তক্তাপোশ নেই?

ছিল—সবই। আজ দশ বছর আসি নি, লোকে চুরিই করুক বা উইয়েই খাক—

পাঁচ-ছয় দিন কাটিয়া গেল।

গ্রামে আসিয়া নূতন জীবন শুরু হইয়াছে ক্ষেত্রবাবুর। সকালে উঠিয়া জেলেপাড়া হইতে মাছ সংগ্রহ করিয়া আনেন, বন-বাগান হইতে এঁচড় ডুমুর পাড়িয়া আনেন, কয়লা পাওয়া যায় না—সুতরাং কাঠ কুড়াইয়া আনেন। সকালে সাড়ে নয়টায় খাওয়ার পরিবর্তে বেলা বারোটায় খান।

অনিলা বলে, প্রাণ গেল বাপু, একটু কথা বলি কার সঙ্গে, এমন লোক খুঁজে মেলা দুর্ঘট।

—কেন, কাকাদের বাড়ি যাও, দত্তদের বাড়ি যাও—

—কী যাব? কেউ কথা বলতে পারে না। শুধু গেঁয়ো কথা—কী রাঁধলে ভাই? কতক্ষণ রান্নার কথা বলা যায় বল তো? এর চেয়ে ডিহিরি গেলে খুব ভাল হত। শুনলে না আমার কথা।

শীঘ্রই কিন্তু এ অভাব দূর হইল।

গ্রামের একটা বাড়িতে কলিকাতা হইতে এক ঘর গৃহস্থ আসিল। ক্ষেত্রবাবুর মত তাহারাও এই গ্রামের বাসিন্দা, কলিকাতায় বাড়ি আছে, বড়বাজারে মসলার ব্যবসা করিয়া বেশ সঙ্গতিপন্ন অবস্থা। তাহারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে আরও দুই ঘর বোমা-ভীত পরিবার। শেষোক্ত দলের একটি পরিবারের থাকিবার স্থান নাই, পূর্বোক্ত গৃহস্থের প্রাচীন ঠাকুরদালানে দরমার বেড়া দিয়া আবরু সৃষ্টি করিয়া এক ঘর সেখানে রহিল। অপর পরিবারের জন্য গ্রামে ঘর খুঁজিয়া মিলল না! সকলেই গরিব, কোঠাবাড়ি বেশী নাই—যাহা দুই-একখানা আছে, তাহাতে মালিকদের নিজেদেরই কুলায় না।

ক্ষেত্রবাবুর কাছে লোক আসিয়া বলিল, আপনার একখানা ঘর ভাড়া দেবেন?

ক্ষেত্রবাবু অবাক হইলেন। গ্রামের ভাঙা কুঠুরি কেহ ভাড়া লইবে, একথা কে কবে শুনিয়াছে? ভরসা করিয়া বলিলেন, তা দিতে পারি।

—কী নেবেন?

ক্ষেত্রবাবু ভাবিয়া বলিলেন, তিন টাকা।

লোকটি এই গ্রামেরই লোক। বলিল, তিন টাকা কেন? পনেরো টাকা হাঁকুন না তাই দেবে।

ক্ষেত্রবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, পনেরো টাকা বাড়িভাড়া কে দেবে? এই ভাঙা বাড়ির একখানা ঘরের ভাড়া তিন টাকা, তা-ই বেশী। পাগল!

—আপনি জানেন না। ওরা টাকার আন্ডিল, কারে না পড়লে কি করতে এসেছে এই পাড়াগাঁয়ে? ঠিক দেবে। নইলে বাড়ি পাচ্ছে কোথায়?

ক্ষেত্রবাবু হাজার হোক স্কুল-মাস্টার, অত ব্যবসাবুদ্ধি মাথায় খেলিলে আজ সতেরো-আঠারো বছর ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুলে পঁয়ত্রিশ টাকা বেতনে মাস্টারি করিবেন কেন? তিনি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিতে গেলেন। অনিলা বলিল, সে কী গো, ওই ঘর আবার ভাড়া! ওর আছে কী যে, ভাড়া দেবে? তারা বিপদে পড়ে এসেছে, ওই ভাঙা দুটো ঘরে থাকতে চাইছে, এতেই বোঝ। এমনি থাকতে দাও, কথা বলবার মানুষ পাওয়া যাচ্ছে এক ঘর, এই না কত!

ক্ষেত্রবাবু ক্ষীণ সুরে বলিলেন, তিনটে টাকা দিতে চাচ্ছে—আর বাড়াচ্ছি নে অবিশ্যি। দিক তিনটে টাকা। নিই।

—নাও গে যাও, কিন্তু আর এক পয়সা বেশী বোল না।

পরদিন ক্ষেত্রবাবুর ভাঙা ঘরে ভাড়াটেরা আসিয়া গেল—একটি বধূ, তিন ছেলে মেয়ে, প্রৌঢ়া ননদ। শোনা গেল, বধূটির স্বামী কাজ করে ইছাপুরে বন্দুকের কারখানায়। ছুটি পাইলেই একবার আসিয়া দেখিয়া যাইবে। অনিলা বধূটির সঙ্গে খুব ভাব করিয়া ফেলিল, তার নাম কুসুমকুমারী, বাপের বাড়ি বাগবাজার—বৃন্দাবন মল্লিকের গলি। কলিকাতা ছাড়িয়া বাহিরে আসা এই প্রথম, বিশেষ করিয়া আসসিংড়ির মত অজ পল্লী-গ্রামে। প্রত্যেক কাজেই অসুবিধা, না আছে দেওয়াল টিপিলেই আলো, কল টিপিলেই জল, না আছে ভাল রাস্তাঘাট, না আছে একটা টকি-বায়স্কোপ।

তবুও দিন যায় কায়ক্লেশে। মেয়েছেলে, কেহ নিজের বাপের বাড়ি শ্বশুরবাড়িতে অপর মেয়ের কাছে ছোট হইতে দিতে চায় না। কুসুম বাগবাজারের গল্প করে তো অনিলা ডিহিরি-অন-সোনের গল্পে তাহাকে ছাড়াইয়া যাইতে চায়।

শীত কাটিয়া বসন্ত পড়িল। ক্ষেত্রবাবুর মনে পড়িল, আমের বউলের গন্ধ কতদিন এমন পান নাই, বাঁশবন, মাঠে ঘেঁটফুল ফোটার দৃশ্য কতকাল দেখেন নাই। বহুদিন পূর্বের বিস্মৃত শৈশবকালের স্মৃতি অতীত মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া শৈশবের মাতাপিতার কত হাসি ও কথার টুকরা ভুলিয়া-যাওয়া স্নেহস্বর লইয়া মনের মধ্যে উঁকি মারে।

হাতের পয়সা ফুরাইয়া গেল। অনিলা পিতৃগৃহ হইতে আসিবার সময় লুকাইয়া সামান্য কিছু অর্থ আনিয়াছিল, তাহা দিয়াই এতদিন চলিল, নতুবা ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে

বশেষ কিছু আনেন নাই। ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল আর খোলে নাই, আঠারোই ডিসেম্বরের পরে কলিকাতার কোন স্কুলই খুলে নাই—ক্ষেত্রবাবু স্কুল হইতে পত্র পাইয়া জানিয়াছেন, খবরের কাগজেও দেখিয়াছেন।

স্কুল কি উঠিয়া গেল! হেডমাস্টারের নামে দুই-তিনখানা পত্র দিয়াও উত্তর না পাওয়াতে বৈশাখ মাসের প্রথমে ক্ষেত্রবাবু নিজেই কলিকাতা গেলেন। সে কলিকাতা আর নাই, রাস্তা দিয়া কত কম লোকজন চলিতেছে, তেল বন্ধ হওয়ায় দরুন মোটর গাড়ির সংখ্যা বহু কমিয়া গিয়াছে, রাত আটটার পর ঘুটঘুটে অন্ধকার।

পিটার লেনের মোড়ে ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল-বাড়িটার আর সে শ্রীছাঁদ নাই। গেট ভেতর হইতে ভেজানো ছিল। ঢুকিয়া ক্ষেত্রবাবু ডাকিলেন, ও মথুরা—মথুরা।

নীচের তলার ঘর হইতে কেবলরাম বাহির হইয়া আসিল। ক্ষেত্রবাবুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি দুই হাত জোড় করিয়া মাথা নিচু করিয়া বলিল, কেমন আছেন বাবু?

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, ও কেবলরাম, সাহেব কোথায়?

কেবলরাম হতাশার সুরে দুই হাত তুলিয়া বলিল, তিনি কলকাতায় নেই। নাগপুরে গেছেন। আমার মাইনে চুকিয়ে দিয়ে গেলেন যাবার সময়।

—স্কুল!

—উঠে গিয়েছে বাবু।

—তবে তোকে মাইনে দিচ্ছে কে এখানে?

—হেডমাস্টার বললেন, তুই এখানে থাক্। চিঠিপত্র এলে তাঁর নামে পাঠাতে বলে গিয়েছেন। যদি এর পরে স্কুল চলে—কিন্তু তা চলবে না বাবু, বাড়িওলার পাঁচ মাসের ভাড়া বাকী, শুনছি নাকি নোটিস দিয়েছে।

—ছেলেপিলে কেউ আসে না?

—কে আসবে বাবু, কে আছে কলকাতায়? ওই পাশের গলির কেষ্ট আসে, আর আসে শিবরাম—ওই কুণ্ডু লেনের বাবুদের বাড়ির সেই দুষ্টু ছেলেটা। ওরা এসে খোঁজ নেয়, কবে স্কুল খুলবে। আমি বলি—যাও ছেলেরা, স্কুল যদি খোলে, খবর পাবে।

—মাস্টারেরা?

—কেবল হেডপণ্ডিত এসেছিলেন সাহেবের ঠিকানা নিতে, আর শ্রীশবাবু এসেছিলেন টাকার কী হল জানতে। আর কেউ আসে না! শ্রীশবাবু ঢাকায় চাকরি পেয়েছেন, জ্যোতির্বিনোদ মশাই দেশের স্কুলে চাকরি নিয়েছেন।

—নাগপুরে সাহেব কী করছেন জান? তাঁর ঠিকানা কী?

—তিনি কী করছেন তা জানি নে। ঠিকানা নিয়ে যান, আমার কাছে সে দিনও চিঠি দিয়েছেন।

ক্ষেত্রবাবু ঠিকানা লইয়া বিষণ্ণ মনে স্কুল হইতে বাহির হইলেন। আজ সতেরো বৎসরের কত সুখ-দুঃখের লীলাভূমি, কত ছেলে এই দীর্ঘ সতেরো বছরে আসিয়াছে গিয়াছে, কত অস্পষ্ট কাঁচা উৎসুক মুখ মনে পড়ে এখানকার মাটিতে আসিয়া দাঁড়াইলে। মুখই মনে পড়ে, মুখের অধিকারীর নাম মনে পড়ে না। ক্লার্কওয়েল সাহেব, যদুবাবু, জ্যোতির্বিনোদ, মিঃ আলম—আজ সকলের সঙ্গেই আর একবার দেখা করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু কে কোথায় আজ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে।

পুরানো চায়ের দোকানটিতে ঢুকিয়া ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, ওহে, চা দাও এক পেয়ালা।

দোকানী দেখিয়া ছুটিয়া আসিল: মাস্টারবাবু যে! আসুন, আসুন। ভাল সব?

—ভাল। তোমাদের সব ভাল?

—আর কী করে ভাল হবে বাবু! আপনারা সব চলে গেলেন, তিন-তিনটে স্কুল বন্ধ আছে, সব বন্ধ। বিক্রি-সিক্রি নেই, দোকান চলে কী করে বলুন?

ক্ষেত্রবাবু বসিয়া বসিয়া আপন মনে চা খাইতে লাগিলেন। কোথায় গেল সে পুরানো দিন। ওইখানটাতে বসিত জ্যোতির্বিনোদ, এখানটাতে রামেন্দুবাবু, ক্ষেত্রবাবুর পাশে সব সময়েই বসিত যদুদা, আর ওই হাতলহীন চেয়ারটা ছিল নারাণদার (আহা বেচারী! ভালই হইয়াছে স্বর্গে গিয়াছে, স্কুলের এ দুর্দশায় বেচারীর প্রাণে বড়ই কষ্ট হইত।)

বাঁধা-ধরা আসন। এখানে বসিয়া দুঃখের মধ্যেও কত আনন্দ, কত মজলিস করা গিয়াছে গত দশ বারো চৌদ্দ বছর! আজ কেউ নাই কোন দিকে। সব ছত্রভঙ্গ।

স্কুল আর বসিবে না। কলিকাতার সব স্কুল যদিও দুই-পাঁচ মাস পরে খোলে তাঁহাদের স্কুল আর বসিবে না। বসিতে পারে না—আর্থিক অবস্থা খারাপ। বাড়িওয়ালা আর মাসখানেক দেখিয়া 'টু লেট' ঝুলাইয়া দিবে। মাস্টারেরা পেটের ধান্ধায় যে যেখানে পারিয়াছে, চাকুরিতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, নয়তো তাঁর মত সুদূর পল্লীগ্রামে আত্মগোপন করিয়াছে।

ক্লার্কওয়েল সাহেবের মত একনিষ্ঠ শিক্ষাব্রতীর আজ কী দুরবস্থা, তাহার খবর কে রাখে?

—ক পয়সা?

—মাস্টারবাবু, আপনাদের খেয়েই মানুষ। এতদিন পরে পায়ের ধুলো দিলেন—এক পেয়ালা চা খেয়েছেন, ওর আর কী দাম নেব? মাস্টারবাবু, মাপ করবেন।

—আচ্ছা, আমাদের স্কুলের আর কোন মাস্টার যদি এখানে চা খেতে আসে, তবে আমার কথা বোল তাকে, কেমন তো? মনে থাকবে? আমার নাম ক্ষেত্রবাবু। বোল—আমি তাদের কথা ভুলি নি, কেমন তো?

চায়ের দোকান হইতে বাহির হইয়া দুই-একটি টুইশানির ছাত্রদের বাড়ি গেলেন। বাড়ি তালাবন্ধ। মেয়েছেলে নাই, ভাবে মনে হইল। পুরুষেরা যদি বা থাকে, কর্মস্থল হইতে সকাল সকাল ফিরিবার তাগিদ নাই। ক্ষেত্রবাবু অন্যমনস্ক ভাবে পথ চলিতে লাগিলেন। ধর্মতলার কাছাকাছি আসিলে একটি তরুণ যুবক আসিয়া খপ করিয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া ধুলো লইয়া প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বলিল, স্যার্, ভাল আছেন? চিনতে পারেন?

—হ্যাঁ, রাজেন দেখচি যে! তা আর চিনতে পারব না! তুই কাদের সঙ্গে সঙ্গে যেন পাস করিস্, কোন্ বছর?

—বছর পাঁচ হয়ে গেল স্যার্। মনে রেখেছেন, এই যথেষ্ট। আমি শিবুদের ব্যাচে পাস করি। শিবুকে মনে আছে? শিবনাথ ভট্চাজ্জি—ক্ষীরোদ ডাক্তারের ছেলে।

ক্ষেত্রবাবু ভাল মনে করিতে পারিলেন না; কিন্তু বলিলেন, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কী করচিস?

—এ. আর. পি-তে ঢুকেছি স্যার। বেকার বসেছিলাম, আজ অনেক দিন। এবার—

—বেশ, বেশ। আচ্ছা, চলি।

সন্ধ্যার দেরি নাই। আবার সেই ব্ল্যাক-আউটের কলিকাতা। আর কলিকাতায় থাকিয়া লাভ নাই। রাত সাড়ে আটটায় গাড়ি আছে শিয়ালদহে। ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু সস্তার বিস্কুট ও লেবেঞ্চুস কিনিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই ক্ষেত্রবাবু স্টেশনে আসিয়া জমিলেন।

যদুবাবু আজ মাস দুই শয্যাগত।

হাওড়া জেলার যে পল্লীগ্রামে তিনি গিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন, ভগ্নীপতির ঘরবাড়ির অবস্থা যা, তাহাতে সেখানে মানুষের বাস করা চলে না। তবুও থাকিতে হইল, কী করিবেন—অভাব। কিন্তু মাসখানেক পরে যদুবাবুর ম্যালেরিয়া ধরিল। অর্থের অভাব, তদুপরি থাকিবার কষ্ট—এ গ্রামে আত্মীয়বন্ধু কেহ নাই, হাতেও নাই পয়সা।

গ্রামের নাম কমলাপুর, তারকেশ্বর লাইন হইয়া যাইতে হয়—সেওড়াফুলি হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ দূরে। গ্রামের ভদ্রলোকেরা সকলেই ডেলি-প্যাসেঞ্জার, সকালে কেহ আটটা চল্লিশ, কেহ নয়টা দশের ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় ছোটে, আবার ঝাড়নে বাজারহাট বাঁধিয়া বাড়ি ফেরে। যেটুকু গল্পগুজব করে—হয় আপিস, নয়তো ফুটবল, আজকাল অবশ্য যুদ্ধের গল্প।

পাশেই অবিনাশ বাঁড়ুজ্জের বাড়ি। কলিকাতা হইতে রাত নয়টার সময় প্রৌঢ় ভদ্রলোক

াড়ি ফিরিলে যদুবাবু উদ্বেগের সুরে জিজ্ঞাসা করেন, আজ যুদ্ধের খবর কী অবিনাশবাবু?

অবিনাশবাবু যুদ্ধের আলোচনা করিতে বসেন। তোজো বা ওয়াভেল বা চার্চিল াহা না ভাবিয়াছেন, অবিনাশবাবু তাহা ভাবিয়া বুঝিয়া বিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছেন। সিঙ্গাপুর বা ব্রহ্মদেশ কী করিলে রক্ষা পাইতে পারিত, ব্রিটিশের কী ভুল হইল, কোন্ পথ ধরিয়া কী ভাবে যুদ্ধ করিলে আপার বর্মা এখনও রক্ষা হয়—এসব কথা অবিনাশবাবু খুব ভালই জানেন। কলিকাতায় দিন পনেরোর মধ্যে বোমা পড়িবে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। বোমারু বিমানের আক্রমণের চিত্র তাঁহার মত কেহ আঁকিতে পারে না।

শুনিয়া শুনিয়া যদুবাবুর কী হইয়াছে, আজকাল তিনি যেন সর্বদাই সশঙ্ক।

একদিন রাত্রে আহার-করিতে বসিয়া হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া শুনিলেন, এরোপ্লেনের শব্দের মত একটা শব্দ না?

স্ত্রীকে বলিলেন, দাঁড়াও, ও কিসের শব্দ গো?

—কই?

—ওই যে শোন না—আলো সরাও, আলো ঘরে নিয়ে যাও, ঘরে নিয়ে যাও। জাপানী প্লেন হতে পারে—

—তোমার হল কী? ও তো গুবরে পোকা উড়ছে জানলার বাইরে।

—না না, গুবরে পোকা কে বললে? দেখে এস আগে—দুধ দিতে হবে না, আগে দেখে এস—

যদুবাবুর স্ত্রী ঝাঁটার আগায় পোকাটাকে উঠানে ফেলিয়া দিয়া বলিল, জাপানী এরোপ্লেন ঝাঁট দিয়ে তফাত করে রেখে এলাম গো। এখন নিশ্চিন্দি হয়ে বসে দুধ দিয়ে ভাত দুটি খাও। এক চাক্‌লা আম দিই?

সংসারের বড় কষ্ট, অথচ ভয়ে যদুবাবু কলিকাতায় গিয়া স্কুলে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকার খোঁজখবর করিতে পারেন না। স্কুলে চিঠি লিখিয়াও জবাব পাইলেন না। ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থান, শরীরের মধ্যে অসুখ ঢুকিল—প্রায়ই অসুখে ভোগেন। অথচ ঔষধ নাই পথ্য নাই। থাকিবারও খুব কষ্ট।

যদুবাবু বলেন, এর চেয়ে বেড়াবাড়ি ছিল ভাল।

যদুবাবুর স্ত্রী বলে, সেখানেও যে সুখ, তা নয়; তবে তুমি সঙ্গে থাকলে আমি বনেও থাকতে পারি। সে বার তুমি আমায় ফেলে রেখে এলে একা—কী করে থাকি বল তো?

যদুবাবু বলেন, তুমি অবনীর দিদিকে একখানা চিঠি লেখো। আম-কাঁঠালের সময় আসছে, চল যাই। কতকাল বেড়াবাড়ি বাস করি নি। আসল কথা কী জান, কলকাতা ছাড়া কোন জায়গায় মন টেঁকে না। কথা বলবার মানুষ নেই—আমার যে সব বন্ধু ছিল কলকাতায়, তাদের কেউ পোস্ট-মাস্টার, কেউ মার্চেন্ট অফিসের বড় কেরানী, দু শো টাকার কম মাইনে নয়। স্কুল মাস্টারকে সবাই খাতির করত। শিক্ষিত লোক শিক্ষিত লোকের মর্ম বোঝে।

—কেন, ওই অবিনাশবাবু—উনিও তো ভাল চাকরি করেন।

—ওই অবিনাশটা? আরে রামোঃ, রেল-আপিসে কাজ করে, সেকালের এন্ট্রান্স পাস—ওর দরের লোকের সঙ্গে কি আমাদের বনে? ওই দেখ না কেন, দুটো ছেলে রয়েচে, আমি তার বাড়ির পাশে একজন কলকাতার বড় স্কুলের মাস্টার, পড়া না কেন টুইশানি? দে না দশটা টাকা মাসে? এমন পাবি কোথায় তোদের এই পাড়াগাঁয়ে? পেটে বিদ্যে থাকলে তবে তো! রেল-আপিসের কেরানী আর কত ভাল হবে!

অবনীর দিদিকে চিঠি লেখা হইল, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। ইতি-মধ্যে যদুবাবু একদিন হঠাৎ জ্বর হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। যদুবাবুর স্ত্রী গিয়া অবিনাশবাবুর স্ত্রীর কাছে কাঁদিয়া পড়িলেন। অবিনাশবাবু তখনও আপিস হইতে ফেরেন নাই, তাঁহার চাকর পাঠাইয়া পাশের গ্রামের ভূষণ ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলেন! ভূষণ ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিলেন, মাথায় হঠাৎ রক্ত উঠিয়া এমন হইয়াছে। খুব সাবধানে থাকা দরকার। চিকিৎসাপত্র করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ করিতে যদুবাবুর স্ত্রীকে

শেষ সম্বল হাতের রুলি বিক্রয় করিতে হইল।

এই সময় হঠাৎ একদিন অবনী আসিয়া হাজির। সে একটা পুটুলি হইতে গোটা-কয়েক কমলালেবু ও পোয়াটাক মিছরি যদুবাবুর বিছানার এক পাশে রাখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, নিতে এসেছি দাদা, চলুন। বউদিদি দিদিকে পত্র লিখেছিলেন আপনার অসুখের খবর দিয়ে। দিদি বললেন—যাও, ওদের গিয়ে এখানে নিয়ে এস।

যদুবাবু মিনতির সুরে বলিলেন, তাই নিয়ে চল ভায়া, এখানে আমার মন টেঁকে না।

—বউদিদি কই?

—বোধ হয় ঘাটে গিয়েছে। বোস, আসছে এখুনি।

অবনীকে দেখিয়া যদুবাবু যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। নির্বান্ধব স্থানে তবুও একজন দেশের লোক, জ্ঞাতির সান্নিধ্যলাভ কম কথা নয়।

অবনী ইহাদের সঙ্গে করিয়া বেড়াবাড়ি আনিয়া ফেলিল। যে ঘরে পূর্বে যদুবাবুর স্ত্রীর স্থান হইয়াছিল, সেই ঘরখানাতেই এবারও যদুবাবুরা আসিয়া উঠিলেন। ঘরখানা সেই রকমই আছে, বরং আরও খারাপ, আরও স্যাঁতসেঁতে। দেওয়ালে নোনা লাগার ছোপ আরও পরিস্ফুট হইয়াছে।

গ্রামে ডাক্তার নাই, আশপাশের ষোলখানা গ্রামের মধ্যে কুত্রাপি ডাক্তার নাই, দুই-একজন হাতুড়ে বদ্যি ছাড়া। তাহাদেরই একজন আসিয়া যদুবাবুকে দেখিল। পুরাতন জ্বরে ভাত খাওয়ার পরামর্শ দিল। বলিল, নাতি-খাতি সেরে যাবে অখন, ও গরম হয়েছে, গরমের দরুন অসুখডা সারচে না।

রুলি বিক্রয়ের টাকা ফুরাইয়া আসিতেছে দেখিয়া যদুবাবুর স্ত্রী স্বামীকে বলিল, হ্যাঁ গো, কাল তো ওরা বলছিল—এক মণ চাল কিনতে হবে, অবনীর হাতে এখন টাকা নেই, তা তোমার ইয়েকে একবার বল। আমি তোমাকে আর কী বলব, সব বিদ্যে তো জানি। এক মণ চালের দাম দিতে গেলে তোমার ওষুধপথ্যির পয়সা থাকে না। অথচ ওদের হাঁড়িতে খাওয়াদাওয়া, না দিলেও তো মান থাকে না। কী করি?

যদুবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন, তোমাদের কেবল পয়সা আর পয়সা, একটা লোক শুয়ে বিছানায়—জানি নে ও-সব, যাও এখান থেকে—

যদুবাবুর স্ত্রীর আর কোন গহনাপত্র নাই, স্বামী বিশেষ কিছু দেন নাই, বরং বাপের বাড়ি হইতে আনীত যাহা কিছু ধূলাগুঁড়ো ছিল, তাহাও স্বামী ফুঁকিয়া দিয়াছেন অনেকদিন পূর্বে।

এখন উপায়? ভাবিয়া-চিন্তিয়া বিবাহের সময় শ্বশুরের দেওয়া বেনারসী শাড়িখানা লুকাইয়া গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন রায়বাড়ির গিন্নীর কাছে লইয়া গেল।

রায়-বাড়ির গিন্নী বলিলেন, এস এস ভাই। কবে এলে? শুনলাম নাকি ঠাকুরপোর বড্ড অসুখ?

যদুবাবুর স্ত্রী কাঁদিয়া বলিল, সেই জন্যেই আসা। কলকাতার স্কুল উঠে গিয়েছে, হাতে এক পয়সা নেই, অথচ ওঁর অসুখ। আমার এই ফুলশয্যের বেনারসীখানা বিক্রি করে দিন। নইলে উপায় নেই। এই দেখুন ভাল কাপড়, এখনও নষ্ট হয় নি—এক জায়গায় কেবল একটু পোকায় কেটেচে—

রায়গিন্নীর অবস্থা ভাল! দুই ছেলে চাকুরি করে, জমিজমাও আছে। বাড়ির কর্তা আগে কোর্টের নাজির ছিলেন—সে কালের নাজির, দুই পয়সা উপার্জন করিয়াছিলেন। একটি মেয়ে বিধবা, বাপের বাড়ি থাকে, কিন্তু তাহার শ্বশুরবাড়ির অবস্থা ভালোই—স্ত্রীধন হিসাবে কিছু কোম্পানির কাগজও আছে।

রায়গিন্নী বলিলেন, ফুলশয্যের বেনারসী কেন বিক্রি করবে ভাই? দু-পাঁচ টাকা দরকার থাকে, নিয়ে যাও। আবার যখন তোমার হাতে আসবে, দিয়ে যেয়ো।

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, না, আপনি একেবারে বিক্রি করিয়েই দিন। ধার করলে একদিন শোধ দিতে হবে, তখন কোথায় পাব?

স্ত্রীর মুখে এ কথা শুনিয়া যদুবাবু চটিয়া গেলেন। বলিলেন, ধার দিতে চাচ্ছিল, নিলেই হত। কাপড়খানা থাকত, টাকাও চার-পাঁচটা আসত। কাপড়খানা ঘুচিয়ে দিয়ে

এলে? এমন পাথুরে বোকা নিয়ে কি সংসার করা চলে?

যদুবাবুর স্ত্রী কোনও প্রতিবাদ করিল না। অবুঝ স্বামী, রোগ হইয়া আরও অবুঝ হইয়া গিয়াছে। তাহাকে মিষ্টি কথায় ভুলাইয়া রাখিতে হইবে, ছেলেমানুষকে যেমন লোকে ভোলায়। টাকাকড়ির বিষয়ে মানুষের সঙ্গে সোজাসুজি ব্যবহার ভাল। ফাঁকি দিয়া, ঠকাইয়া কতদিন চলে? স্বামীকে সে কথা বোঝানো শক্ত।

এদিকে অবনীদের ধারনা, যদুবাবু প্রভিডেন্ট ফান্ডের মোটা টাকা আনিয়াছেন সঙ্গে। স্বামী স্ত্রী লইয়া সংসার, এতদিন কলিকাতায় চাকরি করিয়াও দুই-পাঁচ হাজার বা কোন্ ব্যাঙ্কে না জমাইয়া থাকিবেন? বাইরের লোকের সামনে অবনী বলে, দাদার হাতে পয়সা আছে। গভীর জলের মাছ, এ কি আর তুমি আমি?

যদুবাবুকে বলে, দাদা, টাকা ব্যাঙ্কে রাখা ভাল না, যে বাজার!

যদুবাবু বলেন, তা তো বটেই।

—তা আপনি যদি রেখে এসে থাকেন ব্যাঙ্কে, একদিন না হয় আমিই যাই—চেক লিখে দিন, টাকাটা উঠিয়ে আনি।

যদুবাবু ভাঙেন তবু মচকান না। ব্যাঙ্কের ত্রিসীমানা দিয়া যে তিনি কস্মিনকালে হাঁটেন নাই, অবনীকে এই সোজা কথাটা বলিলেই হাঙ্গামা চুকিয়া যায়; কিন্তু তা তিনি বলিলেন না। এমন ভাবের কথা বলিলেন, যাহাতে অবনীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, দাদার অনেক টাকা কলিকাতার ব্যাঙ্কে মজুত!

সেই দিন হইতে উহাদের দিক হইতে নানা ধরনের তাগিদ আসিতে লাগিল। আজ অবনীর মেয়ে উমার কাপড় নাই, কাল কাছারির খাজনা না দিলে মান থাকে না, পরশু অবনীর নিজের জুতা এমন ছিঁড়িয়াছে যে একজোড়া নতুন জুতা ভিন্ন ভদ্রসমাজে সে মুখ দেখাইতে পারিতেছে না। তা ছাড়া, সংসারের বাজার-খরচের প্রায় সমুদায় ভার পড়িল যদুবাবুদের অর্থাৎ যদুবাবুর স্ত্রীর উপর। ফলে বেনারসী শাড়ি বিক্রির পঁচিশ টাকা, দিন-কুড়ির মধ্যেই কয়েক আনা পয়সায় আসিয়া দাঁড়াইল।

যদুবাবুর স্ত্রী জানে, স্বামীর কাছে কিছু চাওয়া ভুল। তোরঙ্গের তলায় একটা সিঁদুরের কৌটার মধ্যে বহুকালের দুল ভাঙা, নথের টুকরা, এক কুঁচি চুড়ির গুঁড়া, দুই-চারটা সিঁদুর-মাখানো লক্ষ্মীর টাকা ইত্যাদি ছিল। সব গৃহিণীই এগুলি লুকাইয়া কুড়াইয়া রাখিয়া দেন, যদুবাবুর স্ত্রীও তাহা করিয়াছিলেন। কত কালের স্মৃতি-জড়ানো এই অতি প্রিয় দ্রব্যগুলির দিকে চাহিয়া তাঁহার চোখে জল আসিল। শেষ সম্বল সোনার কুচি—লোকে কথায় বলে। সত্যিই সেই শেষ সম্বলটুকুও কি হাতছাড়া করিতে হইবে, অবস্থা এত মন্দ হইয়া আসিয়াছে?

অবনী একদিন যদুবাবুর কাছে ভূমিকা ফাঁদিয়া বলিল, দাদা, একটা কথা বলি। এ মাসে আমায় কিছু টাকা দিন। একটা গরু বিক্রি আছে আদাড়ী জেলেনীর, বাইশ টাকা দাম চায়—এবেলা এক সের ওবেলা এক সের দুধ দিচ্ছে। আপনার অসুখের জন্যে দুধের তো দরকার। গরুটা কিনে রাখি, সব হাঙ্গামা মিটে যায়।

যদুবাবু স্বভাবসিদ্ধভাবে উত্তর দিলেন, তা—তা—বেশ। মন্দ কী? হ্যাঁ, সে ভালই।

অবনী উৎসাহ পাইয়া বলিল, কবে দিচ্ছেন টাকাটা? আজ না হয় পাঁচটা টাকা দিন, বায়না করে আসি। হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে—

আসলে সে দিন আড়ংঘাটার বাজারে অবনীর পাঁচ টাকা ধার শোধ দেওয়ার ওয়াদা ছিল, কুন্ডুদের দোকানে অনেক দিনের দেনা, নতুবা তাহারা নালিশ রুজু করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে।

যদুবাবু বলিলেন, তা এখন তো হয় না। তোমার বউদিদির কাছে চাবি। সে ঘাটে গিয়েছে।

যদুবাবুর উপর হইতে চাপ গিয়া পড়িল এবার তাঁহার বেচারী স্ত্রীর উপর। বউদিদি কেন দিবেন না, দাদা যখন বলিয়া দিয়াছেন? আসল কথা, দাদা তো কঞ্জুস্ আছেনই, বউদিদি হাড়-কঞ্জুস্। হাত দিয়া জল গলে না।

করট ও ফিঙে প্রাথ গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিন ধরিয়া বাঁশঝাড়ে ডাকে, প্রস্ফুটিত তুঁত-পুষ্পের ঘন সুবাসে যদুবাবুর জানালার বাহিরের বাতাস ভরপুর, রোগগ্রস্ত যদুবাবু নিজের বিছানায় বালিশ ঠেসান দিয়া বসিয়া বসিয়া শোনেন। সামনের নারিকেল গাছের গায়ে একটা গিরগিটি, যখনই যদুবাবু চাহিয়া দেখেন, সেই গিরগিটি ওই গাছের গায়ে একই জায়গায়। দেখিয়া দেখিয়া রুগ্ন উদ্‌ভ্রান্ত যদুবাবুর মনে হয়, ওই গিরগিটিটা তাঁহার এই বর্তমান শয্যাশায়ী অবস্থার প্রতীক। ওটাও যেমন নারিকেলগাছের গায়ে অচল অনড়, তিনিও তেমনি এই আলো-আনন্দহীন কক্ষে, পুরানো ভাঙা কোঠার কেমন এক-প্রকার নোনাধরা গন্ধের মধ্যে শয্যাগত, উত্থানশক্তিরহিত।

কবে শরীর সারিবে কে জানে? যেদিন ওই গিরগিটিটা ওখান হইতে সরিয়া যাইবে?

অবনীর বড় ছেলে কালীকে ডাকিয়া বলিলেন, এই শোন্, ওই গিরগিটিটাকে ওখান থেকে তাড়াতে পারবি?

বালক অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেন জ্যাঠামশাই?

—দে না, দরকার আছে।

—একটা কঞ্চি নিয়ে আসি জ্যাঠামশায়। খোঁচা দিযে তাড়াই। আপনি উঠবেন না, শুয়ে শুয়ে দেখুন।

তাড়ানো হইল বটে, কিন্তু আবার পরদিন সকালে উঠিয়া যদুবাবু সভয়ে চাহিয়া দেখিলেন, গিরগিটিটা আবার সেই নারিকেলগাছের গায়ে স্বস্থানে জাঁকিয়া বসিয়া আছে। যদুবাবু হতাশ হইয়া বালিশের গায়ে ঠেস দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

অসুখ সারে না। দিন দিন দুর্বল হইয়া আসিতেছে দেহ, পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তারের ওষুধে ফল হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাস গিয়া আষাঢ় মাস পড়িল। বর্ষার জলে সঙ্গে সঙ্গে হু-হু করিয়া মশককুল দেখা দিল, ফুটা ছাদ দিয়া জল পড়িতে লাগিল রোগীর বিছানায়, এক-একদিন রাত্রে বিছানা গুটাইয়া ঘরের কোণে জড়সড় হইয়া স্বামী-স্ত্রীতে রাত কাটাইতে হয়।

যদুবাবুর স্ত্রী বলে, কপালে এতও ছিল!

যদুবাবু চটিয়া বলেন, তুমি ও-রকম নাকে কেঁদো না বলে দিচ্ছি। কথায় বলে পুরুষের দশ দশা। রেখেছিলাম তো কলকাতায় বাসা করে এতাবৎ কাল। জাপানীদের তো আমি ডেকে আনি নি। পড়ে গিয়েছি বিপদে, তা এখন কী করি বল? সুদিন আসে, কলকাতায় গিয়ে উঠব আবার—তা বলে নাকে কেঁদে কী হবে?

যদুবাবুর স্ত্রী বলিল, আমার জন্যে কিছু বলি নি, তোমার জন্যেই বলি। তোমার কি এত কষ্ট করা অভ্যেস আছে কখনও? চিরকাল টুইশানি করে এসেছ, শীতকালে গরম জল করে দিয়েছি হাত-পা ধুতে, তোমার ঠান্ডা সহ্য হয় না কোনো কালে—

—আচ্ছা, থাক্ থাক্, তার জন্যে নাকে কেঁদে কী হবে? আবার হবে সব—কেবল ওই অবনীটার জ্বালায়—

কিন্তু লক্ষণ ক্রমশ খারাপ দেখা দিল। আষাঢ় মাস পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই যদুবাবু যেন আরও দুর্বল হইয়া পড়িলেন। জ্বর রোজ আসে, কোনদিন ছাড়ে, কোন দিন ছাড়ে না।

সে দিন জগন্নাথের স্নানযাত্রা। সকালের দিকে বৃষ্টি হইয়া দুপুরের পর বৃষ্টি-ধৌত সুনীল আকাশে ঝলমলে সোনালী রোদ উঠিল। আতাগাছটাতে, ফুটন্ত ফুলে-ভরা আকন্দগাছটাতে, বাঁশঝাড়ের মাথায় অদ্ভুত রঙের রোদ মাখানো। আতাফুলের কুঁড়ির মৃদু সুবাস শৈশবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অবনীর মেয়ে টুনি বলিতেছে, মা, আমি পঞ্চমীর পালুনী করে পান্তা ভাত খেতে পারব না কিন্তু বলে দিচ্ছি, চিঁড়ে খাব।

যদুবাবুর মনে পড়িল, তাঁহার মা যদুবাবুর বাল্যদিনে মনসার পালুনি করিয়া পাতে যে চিঁড়ার ফলার রাখিয়া উঠিতেন; তাহা খাইবার জন্য তাঁহাদের দুই ভাইবোনে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত। কোথায় সে বাল্যকালের মা, কোথায় বা সেই ছোট বোন মঙ্গলা! চল্লিশ বছরের ঘন কুয়াশায় তাহাদের মুখ মনের দর্পণে আজ অস্পষ্ট।...

তারপর কতকাল গ্রামছাড়া। ১৯০০ সালের পর আর গ্রামে এভাবে বাস করা হয় নাই। সেই সালেই যদুবাবু এন্ট্রান্স পাস করেন বোয়ালমারি হাই স্কুল হইতে। দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ রামকিঙ্কর বসু ছিলেন হেডমাস্টার। যেমন পাণ্ডিত্য, তেমনই বেতের বহর ছিল তাঁহার। রামকিঙ্কর বোসের বেত খাইয়া অনেক ডেপুটি মুন্সেফ পয়দা হইয়া গিয়াছে সেকালে।

যদুবাবুকে বলিয়াছিলেন—যদু, তুমি বড় ফাঁকিবাজ, টেস্ট পরীক্ষায় টুকে পাস করলে, চিরকালই পরের টুকে পাস করলে, জীবনের পরীক্ষায় যেন এ রকম ফাঁকি দিয়ো না, বড্ড ফাঁকে পড়ে যাবে।

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। কী সুন্দর অপরাহ্নের নীল আকাশ! কী সুন্দর সোনার রঙের সূর্যালোক! ছোট গোয়ালে-লতার ঝোপে একজোড়া বনটিয়া আসিয়া বসিল। ছেলেবেলা যদুবাবু পাখি বড় ভালবাসিতেন। পদা বুনো নামে তাঁহাদের এক পৈতৃক প্রজা ছিল, তাহার সঙ্গে মিশিয়া ফাঁদ পাতিয়া জলচর পক্ষী ধরিতেন—সরাল, পানকৌড়ি, বক, শামুকুড়—কত কাল এসব দেখেন নাই! গানের তাল কবে কাটিয়াছিল, স্মরণ নাই। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের অনতিক্রমণীয় ব্যবধান।

যেন তাঁহার নবদৃষ্টি জাগ্রত হইয়াছে এই রোগশয্যায়। টুইশানি ছুটাছুটি নাই, সারাদিন ঠেসান দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকা। কতকাল এত দীর্ঘ অবকাশ ভোগ করেন নাই। ভগবানের কথা কখনও ভাবেন নাই, আজ মনে হইল—তিনি আছেন। না থাকিলে এই সুন্দর রোদ, বনটিয়া, তাঁহার মনের এই অকারণ আনন্দ, শত অভাবের মধ্যেও মায়ের স্নেহময়ী স্মৃতির বাস্তবতা কোথা হইতে আসিল? ভগবান না থাকিলে ওই অনাথা নিঃসম্বল বিধবাকে কে দেখিবে? তাঁহার দিন ফুরাইয়াছে, তিনি জানেন।

জীবন কি ফাঁকি দিয়া কাটাইলেন!

সুদীর্ঘ জীবনের বহু কথা আজ যেন মনে পড়িতেছে, গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের কর্মজীবনের ইতিহাস—না, ফাঁকি কেন দিবেন? ফাঁকি দেন নাই। নারাণদা সাধুপুরুষ ছিলেন—স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন—নারাণদা বলিতেন, জীবনকে সার্থক করিতে হইলে তাহাকে মানুষের কোন না কোন কাজে, সমাজের কোন না কোন উপকারে লাগানো চাই।

তিনিও জীবনকে বৃথা যাইতে দেন নাই। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত ছাত্র লেখাপড়া শিখিয়া তাঁহার হাতে মানুষ হইয়াছে। হয় নাই কি? নিশ্চয়ই হইয়াছে। সেই সব ছেলেই সাক্ষী আজ, পরকালে মৃত্যুপারের দেশের বড় দরবারে তাহারা সাক্ষ্য দিবে একদিন, যদুবাবু আশা করেন।

দুই-একটা অন্যায় কাজ, দুই-একটা—চুরি ঠিক বলা যায় না—চুরি নয়, তবে হাঁ, একটু আধটু খারাপ কাজ যে না করিয়াছেন, এমন নয়। তিনি তাহা স্বীকারই করিতেছেন। ভগবান গরিব মানুষের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

বেলা গেল।...

গিরগিটিটা নারিকেলগাছের গুঁড়িতে ঠায় বসিয়া আছে।...

ভগবান দয়াময়, গরিবের অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

যদুবাবুর স্ত্রী এক বাটি বার্লি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, নেবু দিয়ে বার্লি দেব, না, মিছরি দেব? পরে থামিয়া বলিল, আজ গুণে দেখলাম, এগারোখানা আমসত্ত্ব হয়েছে, বুঝলে? কলকাতার বাসায় নিয়ে যাব হ্যাঙ্গামা মিটে গেলে। তুমি দুধ দিয়ে খেতে ভালবাস বলে আমসত্ত্ব দিলাম মরে-কুটে—সেরে ওঠো তুমি।

স্ত্রীকে হঠাৎ বিস্মিত করিয়া দিয়া তিনি তাহাকে পুরোনো আমলের আদরের সুরে অনেক দিন পরে বলিলেন, বিছানায় এসে কাছে একটুখানি বোস না! এস—

ক্লার্কওয়েল সাহেবের স্কুল দিন পাঁচ-ছয় খুলিয়াছে। দুই-তিন জন ব্যতীত অন্য সব শিক্ষক আসিয়াছেন। আসেন নাই কেবল জ্যোতির্বিনোদ আর শ্রীশবাবু। তাঁহারা দেশের স্কুলে চাকরি পাইয়াছেন। ছেলেরাও বেশী নাই, এ-ক্লাসে পাঁচ জন ও-ক্লাসে দশ জন। অনেকে বলিতেছে—স্কুল টিঁকিবে না।

আর আসেন নাই যদুবাবু। সাহেবের সারকুলার-বই লইয়া কেবলরাম ক্লাসে ক্লাসে ফিরিতেছে--স্কুলের সুযোগ্য প্রবীণ শিক্ষক যদুগোপাল মুখুজ্জের পরলোকগমনে স্কুল দুই দিন বন্ধ রহিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় একাদিক্রমে ঊনিশ বৎসর এই স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া ছাত্র ও শিক্ষক সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে স্কুলের যে অপরিসীম ক্ষতি হইল...ইত্যাদি ইত্যাদি।

# দেবযান

১

সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহন্তে
অস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে

—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ

২

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

—ভগবদ্‌গীতা

৩

But Mind, Life and Matter, the lower trilogy, are also indispensable to all cosmic beings not necessarily in the form or with the action and conditions which we know upon earth or in this material universe, but in some kind of action however luminous, however puissant, however subtle. For Mind is essentially that faculty of super-mind which measures and limits, which fixes a particular centre and views from that the cosmic movement.

SRI AUROBINDO'S

The Life Divine, Vol. I.

৪

Beyond these subtle physical planes of experience and the life-worlds there are also mental planes to which the soul seems to have an internatal access but it is not likely to live consciouslv there if there has not been a sufficient mental or soul development in this life···

৫

We know that he creates images of these superior planes which are often mental translation of certain elements in them and erects his images into a system, a form in actual worlds ; he builds up also desire-worlds of many kinds to which he attaches a strong sense of inner reality. Vol. III. p. 77.

৬

We arrive then necessarily at this conclusion that human birth is a term at which the soul must arrive in a long succession of rebirths and that it has had for its previous and preparatory terms in the succession the lower forms of life upon earth···

৭

"God is Love and object of Love. Divine Love is not a thing of God : it is God Himself. God needs us just as we need God. This universe is the mere Visible tangible aspect of Love and of the need of love." HENRI BERGSON.

কুড়ুলে-বিনোদপুরের বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী রায়সাহেব ভরসারাম কুণ্ডুর একমাত্র কন্যার আজ বিবাহ। বরপক্ষের নিবাস কলকাতা, আজই বেলা তিনটের সময় মোটরে ও রিজার্ভ বাসে কলকাতা থেকে বর ও বরযাত্রীরা এসেচে। অমন ফুল দিয়ে সাজানো মোটর গাড়ী এদেশের লোক কখনো দেখেনি। পুকুরের ধারে নহবৎ-মঞ্চে নহবৎ বসেচে, রং-বেরঙের কাপড় ও শালু দিয়ে হোগলার আসর সাজানো হয়েচে। খুব জাঁকের বিয়ে।

রাত সাড়ে ন'টা। রায়সাহেবের বাড়ীর বড় নাটমন্দিরে বরযাত্রীদের খেতে বসিয়ে দেওয়া হয়েচে। তারা সকলেই কলকাতার বাবু, কুড়ুলে-বিনোদপুরের মত অজ-পাড়াগাঁয়ে যে তাঁদের শুভাগমন ঘটেছে, এতে রায়সাহেব কৃতার্থ হয়ে গিয়েছেন, বার বার বিনীতভাবে বরযাত্রীদের সামনে এই কথাই তিনি জানাচ্ছিলেন। সভামণ্ডপ থেকে নানা-রকম শব্দ উত্থিত হচ্ছিল।

—ও কি পালমশায়, না-না—মাছের মুড়োটা ফেললে চলবে না—

—ওরে এদিকে একবার ভাতের বালতিটা (অর্থাৎ পোলাওএর বালতি—পোলাওকে ভাত বলাই নিয়ম, তাতে সভ্যতা, সুরুচি ও বড়মানুষী চালের বিশিষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়) নিয়ে আয় না—এ'দের পাত যে একেবারেই খালি—সন্দেশ আর দুটো নিতেই হবে —আজ্ঞে না, তা শুনবো না—বাটাছানার না হলেও পাড়াগাঁয়ের জিনিসটা একবার চেখে দেখুন দয়া করে—

ওদিকে যখন সবাই বরযাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত, নাটমন্দিরের সামনে উঠানে একপাশে বিভিন্ন গ্রামের কতকগুলি সাধারণ লোক খেতে বসেচে। তাদের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ, কিন্তু অত্যন্ত দরিদ্র—সে অন্য লোকদের সঙ্গে নিজের পার্থক্য বজায় রেখে একটু কোণ মেরে বসেচে। বসলে কি হবে, এদের দিকে পরিবেশনের মানুষ আদৌ নেই—ফলে এরা হাত তুলে খালি-পাত কোলে বসে আছে।

ব্রাহ্মণযুবকের নাম যতীন। পাশের গ্রামের বেশ সৎ বংশের ছেলে। বয়েস তার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে। লোকটি বড়ই হতভাগ্য। বেশ সুন্দর চেহারা, লেখাপড়া ভালই জানে, এম্-এ পর্য্যন্ত পড়ে গান্ধীজীর নন্-কো-অপারেশনের সময় কলেজ ছেড়ে বাড়ী আছে। বিবাহ করেছিল, কয়েকটি ছেলেমেয়েও আছে, আজ কয়েক বৎসর তার স্ত্রী তার সঙ্গে ঝগড়া করে ছেলেমেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে উঠেচে। এখানে নিজেও আসে না, ছেলেমেয়েদেরও আসতে দেয় না। যতীনের বাপ-মা কেউ জীবিত নন—সুতরাং বড় বাড়ীর মধ্যে ওকে নিতান্তই একা থাকতে হয়, তার ওপর ঘোর দারিদ্র্যের কষ্ট। একজনের খরচ, তাই চলে না।

ভরসারাম কুণ্ডুর ছোটভাই ওদের পাতের সামনে দিয়ে যেতে যেতে ওকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলো—আরে এই যে যতীন, পাচ্চ-টাচ্চ তো সব ? ওরে কে আছিস্ এদিকে পাতে লুচি দিয়ে যা—

যতীনের মনটা খুশি হোল। এতক্ষণ সত্যিই তাদের এখানে দেখবার লোক ছিল না। আয়োজন খুব বড় বটে কিন্তু পরিবেশন করবার ও দেখাশুনো করবার লোকের অভাবে সাধারণ নিমন্ত্রিতদের অদৃষ্টে বিশেষ কিছু জুটচে না।

আহারাদি শেষ হয়ে গেল। এখুনি পুকুরের ধারে বাজি পোড়ানো হবে, কলকাতা থেকে বরপক্ষ ভাল বাজি এনেচে, এসব পাড়াগাঁয়ে অমন কেউ দেখেনি। বাজি দেখবার জন্যে পুকুরের ধারে লোকে লোকারণ্য হয়েচে। যতীনও তাদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো।

হুস্ শব্দে একটা হাউই আকাশে উঠে গিয়ে প্রায় নক্ষত্রের গায়ে ঠেকে ঠেকে তারপর লাল নীল সবুজ ফুল কেটে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামতে লাগলো।

দলের অনেকে চীৎকার করে উঠলো, আগুন লাগবে। আগুন লাগবে।

দু-চারবার এ রকম তারাবাজি উঠলো নামলো, কারো ঘরের চালে আগুন লাগলো না দেখে উদ্বিগ্ন লোকদের মন শান্ত হোল।

তারাবাজি একটার গায়ে একটা হুস্ করে আকাশে উঠছিল, আর যতীন আশ্চর্য হয়ে সে দিকে চেয়ে দেখছিল একদৃষ্টে ঊর্ধ্বমুখে। বহুদিন ধরে সে পাড়াগাঁয়ে নিতান্ত দুরবস্থায় পড়ে আছে, অনেকদিন ভাল কিছু দেখে নি। কলকাতার সে ছাত্রজীবন এখন আর মনে পড়ে না যেন—সে সব যেন গত জন্মের কাহিনী।

সুতোরগাছির মেঘনাথ চক্কত্তি ওকে দেখে বল্লে—এই যে যতীন। আজ রায়সাহেবের বাড়ী খেলে নাকি? তোমার নেমন্তন্ন ছিল? তা তোমাদের বলতে সাহস করে—কই আমাদের বলুক দিকি? ছোট জাত তিলি-তামলি, না হয় দুটো টাকাই হয়েচে, তা বলে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করে খাওয়াবে বাড়ীতে!...তোমরা গিয়ে নিজেদের গিয়ে মান খুইয়েচ তাই তোমাদের বলতে সাহস করে—ছিঃ—

যতীন যখন বাড়ী পৌঁছলো তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর।

বাঁশবনের মধ্যে সুঁড়ি পথ পেরিয়ে ওর পৈতৃক আমলের কোঠা। অনেকগুলো ঘর-দোর, বাইরে চন্ডীমন্ডপ তবে এখন সবই শ্রীহীন। একটা ধানের বড় গোলা ছিল, অর্থ-কষ্টে পড়ে গত মাঘমাসে সে সাড়ে সাত টাকায় গোলাটা বিক্রী করে ফেলেচে। গোলার ইটে-গাঁথুনি-সিঁড়ি ক'খানা মাত্র বর্তমান আছে।

আলো জেলে নিজের বিছানাটা পেতে নিয়েই সে আলোটা নিভিয়ে দিলে—তেলের পয়সা জোটে কোথা থেকে যে আলো জ্বালিয়ে রাখবে? অন্ধকারে শূন্য বাড়ীতে একা বসলেই মনে পড়ে আশালতার কথা।

আশালতা কি করে এত নিষ্ঠুর হতে পারলে? বিয়ের পরে প্রথম পাঁচ বছরের কথা মনে হোলে তার বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে। এই ধরনের কত শ্রাবণ-রাত্রিতে ঐ ছাদে সে কত নিভৃত আনন্দ-মুহূর্তের কাহিনী এই বাড়ীর বাতাসে আজও বাজে, কত মিষ্টি কথা, কত চাপা হাসি, কত সপ্রেম চাহনি।

মনে পড়ে তারা দুজনে একসঙ্গে তারকেশ্বর গিয়েছিল একবার, তখন যতীনের বড় ছেলেটি আট মাসের শিশু। যাবার আগের দিন রাত্রে আশা রাত একটা পর্যন্ত জেগে খাবার তৈরী করলে। বল্লে, তোমায় কোথাও বাজারের খাবার খেতে দেবো না। নানারকম অসুখ করে যা-তা খাবার খেলে। তার চেয়ে তৈরী করে নিলুম, সস্তাও হবে, কেনা খাবারের চেয়ে। ওখানে গিয়ে বাবার প্রসাদ খেলেই চলবে, পথে এই যা করে নিলুম এতেই কুলিয়ে যাবে।

পথে দুষ্টুমি করে যতীন সব খাবার খেয়ে ফেলেছিল নৈহাটি যাবার আগেই, আশাকে ঠকাবার জন্যে। নৈহাটি স্টেশনে খাবার খেতে চাইলে আশা অপ্রতিভ হয়ে পড়লো, খাবার একটুকরোও নেই। যতীন হেসে বল্লে—কেমন, বাজারের খাবার কিনতে হবে না যে বড়! এখন কি হয়?

হয়তো অতি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাই পরের পাঁচ-ছ'মাস তাদের দুজনকে অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা জুগিয়েছিল।—মনে আছে সেই নৈহাটি স্টেশনের কথা? কি হয়েছিল বল তো?

—যাও যাও, পেটুক গণেশ কোথাকার! আমি কি করে জানবো যে-ইত্যাদি

ইত্যাদি…

আহা, প্রথম যৌবনের স্বপ্নে রঙীন্ রাগ-সাগরের লীলাচঞ্চল বীচিমালার সে কত চপল নৃত্য! কোথায় মিলিয়ে গিয়েচে, মিশিয়ে গিয়েচে, অতলতলে তলিয়ে গিয়েচে সে সব দিন। তার ঠিকানা নেই, খোঁজ নেই, খবর নেই।

সেই আশালতা আছে তার বাপের বাড়ীতে। আজ পাঁচ বছরের মধ্যে একখানা চিঠি দেয়নি যে তার স্বামী বেঁচে আছে না মরেচে। সেও শ্বশুরবাড়ী যায় না; একবার বছর-তিনেক আগে গিয়েছিল, নিতান্ত না-থাকতে পেরে। আগে থেকে একখানা চিঠি দিয়েছিল যে সে যাচ্চে।

দুপুরের আগে সে গিয়ে পেঁছুলো। অনেক আগ্রহ করে গিয়েছিল। শাশুড়ী-ঠাক্‌রুণ রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে কুটনো কুট্‌ছিলেন, তাকে দেখে যেন ভূত দেখলেন। যতীন গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিতেই তিনি উদাসীন সুরে বল্লেন—থাক্ থাক্ হয়েচে, তারপর, এখন কি মনে করে এখানে?

—এই সব দেখাশুনো করতে এলাম। ছেলেমেয়ে সব ভাল আছে? কোথায় সব?

—ঐ যে বাইরের দিকে খেলা করচে—ডেকে দিচ্চি।

যতীন স্ত্রীর কথাটা লজ্জায় উল্লেখ করতে পারলে না।

ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা করলে। তাদের মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে যতীনের মনে হোল তারা কি একটা যেন ঢাকচে। ছেলেমেয়েও সব পর হয়ে গিয়েচে, ওর কাছে বড় একটা ঘেঁষতে চায় না আর। ছোট মেয়েটা তো তাকে দেখে নি বল্লেই হয়, আশা যখন চলে এসেছিল তখন খুকীর বয়েস এক বছর মাত্র।

খাওয়া-দাওয়ার সময়েও আশাকে দেখা গেল না। তার ঘরেও নয়। ওর মনে ভয় হোল, আশা বেঁচে আছে তো? লজ্জা ও সঙ্কোচ কাটিয়ে শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করলে —ওদের মা কোথায়? দেখচি নে যে?

শাশুড়ী তাড়াতাড়ি বল্লেন—সে এখানে নেই বাপু। সে আজ দিন-দশেক হোল গিয়েচে, তার দিদির শ্বশুরবাড়ী বারাসতে। তারা অনেকদিন থেকে নিয়ে যাবে নিয়ে যাবে করছিল, তা আমি বলি যাক বাপু দুদিন একটু বেড়িয়ে আসুক। জীবনে তো তার সুখের সীমে নেই!

যতীন ভীষণ নিরাশ হোল। সে যে কত কি মনে ভেবে এসেচে, আশাকে বলবে—চল আশা, যা হবার তা হয়ে গিয়েচে—ঘরের লক্ষ্মী ঘরে চলো। কাকে নিয়ে কাটাই বলো তো তুমি যদি এমন করে থাকবে?

তারপর শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস্ করলে—কবে আসবে?

—আসা-আসির এখন ঠিক নেই। এ মাসে তো নয়ই, পুজোর সময় পর্য্যন্তও থাকতে পারে। এখানে রাঁধবার লোক নেই, বুড়োমানুষ এতগুলো লোকের ভাতজল করচি দুবেলা, প্রাণ বেরিয়ে গেল।

শেষের কথাটি যে তাকে চলে যাবার ইঙ্গিত, যতীনের তা বুঝতে দেরি হোল না। বিকেলের দিকেই সে ভগ্নমনে বাড়ীর দিকে রওনা হোল। পথে তার খুড়তুতো শালী আন্না, দশ বছরের মেয়ে, অশত্থ-তলায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে দেখে কাছে এসে বল্লে—দাদাবাবু, আজই এলেন, আজই চল্লেন যে। রইলেন না?

—না, সব দেখাশুনো করে গেলুম। তা ছাড়া তোর দিদি তো এখানে নেই, অনেক-দিন পরে এলুম, প্রায় বছর দুই পরে, দেখাটা হোল না।

আন্না কেমন এক অদ্ভুত ভাবে ওর দিকে চাইলে—তারপরে এদিক ওদিক চেয়ে সুর নিচু করে বল্লে—একটা কথা বলবো দাদাবাবু, কাউকে বলবেন না আগে বলুন'

যতীন বল্লে—না, বলছি নে। কি কথা রে আন্না?

—দিদি এখানেই আছে, কোথাও যায় নি। আপনার আসবার খবর পেয়ে চৌধুরীদের বাড়ী ওর সই-মার কাছে লুকিয়ে আছে। জ্যাঠাইমা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে আপনার কাছে এসব কথা না বলতে।

যতীন বিস্মিত হয়ে বল্লে—ঠিক বলচিস্ আন্না!

পরেই বালিকার সরল চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলে এ প্রশ্ন নিরর্থক। সে দৃষ্টিতে মিথ্যার ভাঁজ ছিল না।

যতীন চলে আসচে, আন্না বল্লে—আজ থেকে গেলেন না কেন দাদাবাবু?

—না, থাকা হবে না আন্না। বাড়ীতে কাজকর্ম ফেলে এসেচি বুঝলি নে?

আন্না আবার বল্লে—দিদিকে একবার চুপি চুপি বলে আসবো যে আপনি চলে যাচ্ছেন, যদি দেখা করে? যাবো দাদাবাবু?

বালিকার সুরে করুণা ও সহানুভূতি মাখানো। সে ছেলেমানুষ হলেও বুঝেছিল যতীনের প্রতি তার শ্বশুরবাড়ীর আচরণের রূঢ়তা। বিশেষ করে তার নিজের স্ত্রীর।

যতীন অবিশ্যি রইল না, চলেই এল।

চলে এল বটে, কিন্তু যে যতীন গিয়েছিল, সে যতীন আর আসে নি। মনভাঙা দেহটা কোনো রকমে বাড়ীতে টেনে এনেছিল মাত্র।

তারপর দীর্ঘ তিন বছর কেটে গিয়েচে। একথা ঠিক যে, সে রকম বেদনা তার মনে এখন আর নেই, থাকলে সে পাগল হয়ে যেতো। সময় তার ক্ষতে অনেকখানি প্রলেপ বুলিয়ে জ্বালা জুড়িয়ে এনেচে। কিন্তু এমন দিন, এমন রাত্রি আসে যখন স্মৃতির দংশন অসহ্য হয়ে ওঠে।...

তবুও নীরবে সহ্য করতে হয়। তা ছাড়া আর উপায় কিছু তো নেই। এই ক'বছরের মানসিক যন্ত্রণায় ওর শরীর গিয়েচে, মন গিয়েচে, উৎসাহ নেই, আগ্রহ নেই, অর্থ উপার্জ্জনের স্পৃহা নেই, মান-অপমান বোধ নেই।

যে যা বলে বলুক, দিন কোনো রকমে কেটে গেলেই হোল। কিসে কি এসে যায়? তেলি-তামলির বাড়ী নেমন্তন্ন খেলেই বা কি, রবাহূত অনাহূত গেলেই বা কি, লোকে নিন্দে করলেই বা কি, প্রশংসা করলেই বা কি। কিছু ভাল লাগে না—কিছু ভাল লাগে না।

## ২

যতীনের পৈতৃক বাড়ীটা নিতান্ত ছোট নয়। পূর্ব্বপুরুষেরা এক সময়ে মনের আনন্দে ঘরদোর করে গিয়েচেন। এখন এমন দাঁড়িয়েচে যে সেগুলো মেরামত করবার পয়সা জোটে না। পূর্ব্বদিকের আল্‌সেটা কাঁঠালের ডাল পড়ে জখম হয়ে গিয়েচে বছর দুই হোল। মিস্ত্রী লাগানোর খরচ হাতে আসে নি বলে তেমনি অবস্থাতেই পড়ে রয়েচে।

গত ত্রিশ বৎসরের কত পদচিহ্ন এই বাড়ীর উঠানে। বাবা...মা...বউদিদি...মেজ-দিদি...পিসিমা...দুই ছোট ভাই...আশা...খোকা-খুকীরা...

কত ভালবাসতো সবাই...সব স্বপ্ন হয়ে গেল..কেউ নেই আজ..

সে শিক্ষিত বলে আগে গ্রামের লোক তাকে খুব মেনে চলতো। এখন তারা দেখেচে যে শিক্ষিত হয়েও তারা এক পয়সা উপার্জ্জন করবার শক্তি নেই, এতে এখন সবাই তাকে ঘৃণা করে। তার নামে যা-তা বলে।

আশা যখন প্রথম প্রথম বাপের বাড়ী গিয়েছিল, তখন লজ্জা ও অপমান ঢাকবার জন্যে

যতীন গাঁয়ে সকলের কাছে বলে বেড়াতো—শাশুড়ী-ঠাকুরুণের হাতে অনেক টাকা আছে—কোন্ দিন মরে যাবেন, বয়েস তো হয়েচে। এদিকে বড় মেয়ে প্রায়ই মার কাছে থাকে, পাছে টাকার সবটাই বেহাত হয়ে যায় তাই ও বল্লে—দ্যাখো, এই সাম্নটা কিছুদিন মার কাছে গিয়ে থাকি গে। নইলে কিছু পাবো না।

এই কৈফিয়ৎ প্রথম প্রথম খুব কার্য্যকরী হয়েছিল বটে। তারপর বছরের পর বছর কেটে গেল, এখন লোকে নানারকম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। কেউ বলে, অনেকদিন হয়ে গেল, এইবার গিয়ে বৌকে নিয়ে এসো গে যতীন। শাশুড়ীর টাকার মায়া ছেড়ে দাও, বুড়ী সহজে মরবে না।

পিছনে কেউ বলে—এই মোটর গাড়ীর শব্দ ওঠে দ্যাখো না! যতীনের বৌ টাকার পুঁটুলি নিয়ে মোটর থেকে নেমে বলবে—এই নাও পাঁচ হাজার টাকা। তোমার টাকা তুমি রাখো। কি করবে করো—আমি খালাস হই তো আগে! এই ধরো পুঁটুলিটা।

তা ছাড়া আরও কত রকমের কথা বলে—সে সব এখানে ব্যক্ত করবার নয়।

এই সমস্ত ব্যঙ্গ-অপমান যতীনকে বেমালুম হজম করে ফেলতে হয়। সয়ে গিয়েচে, আর লাগে না—মাঝে মাঝে কষ্ট হয় মানুষের নিষ্ঠুরতা বর্ব্বরতা দেখে। একটা সহানুভূতির কথা কেউ বলে না, কেউ এতটুকু দরদ দেখায় না—কি মেয়ে, কি পুরুষ। সংসার যে কি ভয়ানক জায়গা, দুঃখে কষ্টে না পড়লে বোঝা যায় না। দুঃখীকে কেউ দয়া করে না, সবাই ঘৃণা করে।

মানুষ হয়ে মানুষকে এত কষ্ট দিতে পারতো না যদি একটু ভেবে দেখতো। কিন্তু অধিকাংশ মানুষের চিন্তার বালাই নেই তো!

এসব ভেবে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু এসব সে গায়ে মাখে না। গা-সওয়া হয়ে গিয়েচে মানুষের নিষ্ঠুরতা, মানুষের অপমান। এর পরেও সে লোকের বাড়ীতে ভাত চেয়ে খায়। কোনদিন লোকে দেয়, কোনদিন দেয় না—বলে, বাড়ীতে অসুখ, রাঁধবার লোক নেই—বড়ই লজ্জিত হোলাম ভাই...ইত্যাদি।

যতীনের বাড়ীর পেছনে খিড়কির বাইরে ছোট্ট একটু বাগান আছে, তাতে একটা বড় পাতিলেবুর গাছ আছে। যেদিন কোথাও কিছু না মেলে, গাছের লেবু তুলে সে বিনোদপুরের হাটে বিক্রী করতে নিয়ে যায়, আম কাঁঠালের সময় গাছের আম কাঁঠাল মাথায় করে হাটে নিয়ে যায়। এতেও লোকে নিন্দে করে—শিক্ষিত লোক হয়ে ভদ্রসমাজের মুখ হাসাচ্চে। রায়সাহেব ভরসারাম কুণ্ডু কেন তার বাড়ীর কাজকর্মে ব্রাহ্মণদের নেমন্তন্ন করতে সাহস না করবে?

এক সময়ে বড্ড বই পড়তে ভালবাসতো সে। অনেক ভাল ভাল ইংরিজি বই ছিল, সংস্কৃত বই ছিল তার ঘরে—কতক নষ্ট হয়ে গিয়েচে, কতক সে-ই বিক্রী করে ফেলেচে অভাবে পড়ে। এইসব নির্জ্জন রাত্রে বইগুলোর জন্যে সত্যি মনে কষ্ট হয়।

এইরকম নির্জ্জন রাত্রে বহুদিন আগেকার আর একজনের কথা মনে পড়ে। সে স্বপ্ন হয়ে গিয়েচে অনেকদিন। ভুলেও তাকে গিয়েছিল, কিন্তু আশা চলে যাওয়ার পরে তার কথা ধীরে ধীরে জেগে উঠেচে।

গত পাঁচ বছরে যতীন অনেক শিখেচে। মানুষের দুঃখ বুঝতে শিখেচে, নিজের দুঃখে উদাসীন হয়ে থাকতে শিখেচে, জীবনের বহু অনাবশ্যক উপকরণ ও আবর্জ্জনাকে বাদ দিয়ে সহজ অনাড়ম্বর সত্যকে গ্রহণ করতে শিখেচে।

বর্ষার শেষে যতীন পড়ল অসুখে। একা থাকতে হয়, এক ঘটি জল দেবার মানুষ নেই। মাথার কাছে একটা কলসী রেখে দিত—যতক্ষণ শক্তি থাকতো নিজেই জল গড়িয়ে

খেত—যখন না থাকতো শুয়ে চিঁ চিঁ করতো। গাঁয়ের লোক একেবারেই যে দেখেনি তা নয়, কিন্তু সে নিতান্ত দায়সারা গোছের দেখা। তারা দোরের কাছে দাঁড়িয়ে উঁকি মেরে দেখে যেতো—হয়তো ছেলেমেয়ের হাতে দিয়ে ক্বচিৎ এক বাটি সাবুও পাঠিয়ে দিতো—সেও দায়সারা গোছের। সে দেওয়ার মধ্যে স্নেহ-ভালবাসার স্পর্শ থাকতো না।

অনেকে পরামর্শ দিত—ওহে, বৌমাকে এইবার একখানা পত্র দাও। তিনি আসুন—না এলে এই অবস্থায় কে দেখে, কে শোনে, কে একটু জল মুখে দেয়। আমাদের তো সব সময় আসা ঘটে ওঠে না, বুঝতেই তো পারো. নানারকম ধান্ধাতে ঘুরতে হয়। নইলে ইচ্ছে তো করে, তা কি আর করে না?...ইত্যাদি।

এ কথার কোনো উত্তর সে দিত না।

৩

আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি যতীন সেরে উঠলো। যার কেউ নেই, ভগবান তাকে বোধ হয় বেশিদিন যন্ত্রণা ভোগ করান না। হয় সারান, নয় সারাবার ব্যবস্থা করেন। বৈকালের দিকে নদীর ধারের মাঠে সে বেড়াতে গেল। একটা জায়গায় একটা বড় বাবলা কাঠের গুঁড়ি পড়ে। চারিদিক ঘিরে সেখানে বনঝোপ। পড়ন্ত বেলায় পাখীর দল কিচ্ কিচ্ করচে, কেলে-কোঁড়া লতায় শরতের প্রথমে সুস্নিগ্ধ ফুল ফুটেচে, নির্মেঘ আকাশ অদ্ভুত ধরনের নীল।

গাছের গুঁড়িটার ওপর সে দেহ এলিয়ে দিয়ে আধ-শোওয়া অবস্থায় রইল। শরীর দুর্বল, বেশিক্ষণ দাঁড়াতে বা বসতে কষ্ট বোধ হয়।

ওর মনে একটা ভয়ানক কষ্ট...বিশেষ করে এই অসুখটা থেকে ওঠবার পরে। মনটা কেমন দুর্বল হয়ে গিয়েচে রোগে পড়ে থেকে। নইলে যে আশালতা অত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেচে তার সঙ্গে, রোগশয্যায় পড়ে সেই আশালতার কথাই অনবরত মনে পড়বে কেন। শুধু আশালতা...আশালতা...

না, চিঠি সে দেবে না—দেয়ও নি। মরে যাবে তবুও চিঠি দেবে না। মিথ্যে অপমান কুড়িয়ে লাভ কি, আশালতা আসবে না। যদি না আসে, তার বুকে বড় বাজবে, পূর্বের ব্যবহার সে খানিকটা এখন ভুলেচে, স্বেচ্ছায় নতুন দুঃখ বরণ করার নির্ব্বুদ্ধিতা তার না হয়। সে অনেক দুঃখ পেয়েচে, আর নয়।

সব মিথ্যে...সব ভুল...প্রেম, ভালবাসা সব দুদিনের মোহ। মূর্খ মানুষ যখন মজে, হাবুডুবু খায়, তখন শত রঙীন কল্পনা তাতে আরোপ ক'রে প্রেমাস্পদকে ও মনের ভাবকে মহনীয় করে তোলে। মোহ যখন ছুটে যায়, অপসিয়মাণ ভাঁটার জল তাকে শুষ্ক বালুর চড়ায় একা ফেলে রেখে কোন্ দিক দিয়ে অন্তর্হিত হয় তার হিসেব কেউ রাখে না।

এই নিভৃত লতাবিতানে, এই বৈকালের নীল আকাশের তলে বসে সে অনুভব করলে জগতের কত দেশে, কত নগরীতে, কত পল্লীতে কত নরনারী, কত তরুণ, কত নবযৌবনা বালিকা প্রেমের ব্যবসায়ে দেউলে হয়ে আজ এই মুহূর্তে কত যন্ত্রণা সহ্য করচে। নিরুপায় অসহায় নিতান্ত দুঃখী তারা। অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রে তাদের দুঃখ দূর করা যায় না। কেউ তাদের দুঃখ দূর করতে পারে না। এই সব দুঃখীদলের সেও একজন। আজ পৃথিবীর সকল দুঃখীর সঙ্গে সে যেন একটা অদৃশ্য যোগ অনুভব করলে নিজের ব্যথার মধ্যে দিয়ে।

দারিদ্র্যকে সে কষ্ট বলে মনে করে না। কেউ তাকে ভালবাসে না, এই কষ্টই তাকে

যন্ত্রণা দিয়েচে সকলের চেয়ে বেশি। আশা যদি আবার আজ ফিরে আসে—পুরোনো দিনের আশা হয়ে ফিরে আসে—সে নতুন মানুষ হয়ে যায় আজ এই মুহূর্তে। দশটি বছর বয়েস কমে যায় তার।

যাক, আশার কথা আর ভাববে না। দিনরাত ঐ একই চিন্তা অসহ্য হয়ে উঠেচে! সে পাগল হয়ে যাবে নাকি?

হঠাৎ সে দেখলে হাউ হাউ করে কাঁদচে।

একি ব্যাপার! ছিঃ ছিঃ—নাঃ, সে সত্যিই পাগল হবে দেখচি। যতীন কাঠের গুঁড়িটা থেকে তাড়াতাড়ি উঠে ব্যস্তভাবে পায়চারি করতে লাগলো। নিজেকে সে সংযত করে নিয়েচে—আর সে ও কথাই ভাববে না। যে গিয়েচে, ইচ্ছে করে যে চলে গিয়েচে, তাকে মন থেকে কেটে বাদ দিতে হবে—হবেই। কেটে বাদই দেবে সে।

যতীন বাড়ী ফিরে এল। অন্ধকার বাড়ী, অন্ধকার দোর। ভাঙা তক্তাপোশের ওপর তার রাজশয্যা তো পাতাই আছে। সে কেউ ঝাড়েও না, পাতেও না, তোলেও না। অন্ধকারের মধ্যে শয্যায় দেহ প্রসারিত করে শোবার সময় একবার তার মনে হোল—সেই আশা কেমন করে এমন নিষ্ঠুর হতে পারলে!

সেই রাত্রেই যতীনের আবার খুব জ্বর হোল। হয়তো এতখানি পথ যাতায়াত করা, এত ঠান্ডা লাগানো দুর্বল শরীরে তার উচিত হয় নি। পরদিন দুপুর পর্যন্ত সে অঘোর অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল—কেউ খোঁজ খবর নিলে না। দুপুরের পর বোষ্টমদের বৌ ওদের উঠোনে তাদের পোষা ছাগল খুঁজতে এসে অত বেলা পর্যন্ত ঘরের দোর বন্ধ দেখে বাড়ী গিয়ে খবর দিলে। সে সকালের দিকে আরও দুবার এদিকে কি কাজে এসে দোর বন্ধ দেখে গিয়েছিল।

বিকেলের দিকে সন্ধ্যার কিছু আগে তার জ্বর কমলে সে নিজেই দোর খুললে। কিন্তু এক পাও বাইরে আসতে পারলে না। বিছানায় গিয়েই শুয়ে পড়লো। তৃষ্ণায় তার জিব শুকিয়ে গিয়েচে। কাছাকাছি কারো বাড়ী নেই যে, ডাকলে শুনতে পাবে। বেশি চেঁচানোরও শক্তি নেই।

সকালে কেউ দেখতে এল না। এর একটা কারণ ছিল। যতীনের বাড়ী ইদানীং বড় একটা কেউ আসতো না। এক ছিলিম তামাকও যেখানে খেতে না পাওয়া যাবে, পাড়াগাঁয়ে সে-সব জায়গায় লোক বড় যাতায়াত করে না। কাজেই দুদিন কেটে গেল, যতীনের ঘরের দোর বন্ধ রইল, কেন লোকটা দোর খুলচে না, এ দেখবার লোক জুটলো না। পরের দিন অনেক বেলায় বোষ্টম-বৌ আবার ছাগল খুঁজতে এসে অত বেলায় যতীনের দোর বন্ধ দেখে ভাবলে—যতীন ঠাকুর কত বেলা পর্যন্ত ঘুমুচ্চে আজকে!... বেলা দশটা বাজে এখনও সাড়াশব্দ নেই! বেলা বারোটার সময় একবার কি ভেবে আবার এসে দেখলে তখনও দোর বন্ধ। ব্যাপারটা সে বুঝতে পারলে না। পাড়ার মধ্যে খবরটা বল্লে।

পাড়ার দু-চারটা ষণ্ডাগুণ্ডা গোছের যুবক এসে ডাকাডাকি করতে লাগলো।

—ও যতীন দা, এত বেলায় ঘুম কি, দোর খুলুন—ও যতীন-দা—

কেউ সাড়া দিলে না। আরও লোকজন জড় হোল—দোর ভাঙা হোল।

যতীন বিছানায় মরে কাঠ হয়ে আছে। কতক্ষণ মরেচে কে জানে, দুঘণ্টাও হতে পারে, দশঘণ্টাও হতে পারে।

তখন সকলে খুব দুঃখ করতে লাগলো। বাস্তবিকই কারো দোষ ছিল না। যতীন লোকটা আজকাল কেমন হয়ে গিয়েছিল লোকজনের সংগে তেমন করে মিশতো না, কথাবার্তা বলতো না বলে লোকেও এদিকে বড় একটা আসতো না। সুতরাং যতীনের

আবার অসুখ হয়েচে, এ খবরও কেউ রাখে না।

নবীন বাঁড়ুয্যে বল্লেন—আহা, ভবতারণ-দা'র ছেলে! ওর বাবার সংগে একসংগে পাশা খেলেচি আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে বসে। লোকটা বেঘোরে মারা গেল। তাই কি আমি জানি ছাই যে এমনি একটা অসুখ হয়েচে (বাস্তবিকই তিনি জানতেন না), আমার স্ত্রী আর আমি এসে রাত জাগতাম। আর সে বৌটিরই বা কি আক্কেল—ছ'বছরের মধ্যে একবার চোখের দেখা দেখলে না গা—হ্যাঁ?

সকলে একবাক্যে যতীনের বৌ-এর উদ্দেশে বহু গালাগালি করলে।

যতীনের মৃতদেহ যখন শ্মশানে সৎকারের জন্যে নিয়ে যাওয়া হোল, তখন বেলা দুটোর কম নয়।

৪

যতীন হঠাৎ দেখতে পেলে তার খাটের পাশে পুষ্প দাঁড়িয়ে তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসচে।...

পুষ্প! এক সময় পুষ্পের চেয়ে তার জীবনে প্রিয়তর কে ছিল?

দুজনে—
নৈহাটির ঘাটে
বসে পৈঠার পাটে
কত খেলেচি ফুল ভাসায়ে জলে—

সেই পুষ্প।

নৈহাটির ঘাট নয়—সাগঞ্জ-কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট। নৈহাটির আরপারে। সেখানে ছেলেবেলায় তার মাসীমার জীবদ্দশায় সে কতবার গিয়েচে। এক এক সময় ছ'মাস আটমাস মাসীমার কাছেই সে থাকতো। মাসীমার ছেলেপুলে ছিল না, যতীন ছিল তার চক্ষের মণি। তারপর মাসীমা মারা গেলে, মেসোমশায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করলেন, সাগঞ্জ-কেওটাতে মাসীমার বাড়ীর দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে গেল ওর কাছে।

বুড়োশিবতলায় পুরোনো মন্দিরের কাছে ছিল ওর মাসীমার বাড়ী আর রাস্তার ওপাশেই ছিল পুষ্পদের বাড়ী। পুষ্পর বাবা শ্যামলাল মুখুয্যে বাঁশবেড়ের বাবুদের জমিদারিতে কি কাজ করতেন। পুষ্প ছিল ভারি সুন্দরী মেয়ে—তার হাসি—সে হাসি কেবল পুষ্পই হাসতে পারতো। দোষের মধ্যে পুষ্প ছিল অত্যন্ত গর্বিত মেয়ে। তার বিশ্বাস ছিল তার মত সুন্দরী মেয়ে এবং তার বাবার মত সম্ভ্রান্ত লোক গংগার ওপারে কোথাও নেই।

ধীরে ধীরে পুষ্পের সংগে ওর আলাপ হয়, ধীরে ধীরে সে আলাপ জমে। ও তখন তেরো বছরের ছেলে, পুষ্প তেরো বছরের মেয়ে। সমান বয়স হোলে কি হবে, বাচাল ও বুদ্ধিমতী পুষ্পের কাছে যতীন ভেসে যেতো। পুষ্প চোখে-মুখে কথা কইতো, যতীন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার গর্বিত সুন্দর মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইত। মস্ত অশ্বত্থগাছ যে পুরোনো ঘাটটার ওপরে, যেটার নাম সেকালে ছিল বুড়োশিবতলার ঘাট, ওই ঘাটে কতদিন সে ও পুষ্প একা বসে গল্প করেচে, জগদ্ধাত্রী পুজোর ভাসানের দিন পাঁপর-ভাজা কিনে ঘাটের রানার ওপর বসে দুজনে ভাগ করে খেয়েচে। কেমন করে যে সেই রূপ-গর্বিতা বালিকা তার মত সাদাসিধে ধরনের বালককে অত পছন্দ করেছিল, অত দিনরাত মিশতো, নিত্য তাদের বাড়ী না গেলে অনুযোগ করতো—এ সব কথা যতীন জানে না, সে সব বোঝবার বয়েস তখন ওর হয়নি।

দু-দশ দিন নয়, দেড় বছর দুবছর ধরে দুজনে কত খেলা করেচে, কত গল্প করেচে, কত ঝগড়া করেচে, পরস্পরের নামে পরস্পরের গুরুজনের কাছে কত লাগিয়েচে, আবার দুজনে পরস্পরে যেচে সেধে ভাব করেচে—সে কথা লিখতে গেলে একখানা ইতিহাসের বই হয়ে পড়ে।

মাসীমার মৃত্যুর পরে কেওটার পথ বন্ধ হোল। বছরখানেকের মধ্যে পুষ্পও বসন্ত হয়ে মারা গেল। দেশে থাকতে পুষ্পর মৃত্যুসংবাদ মেসোমশায়ের চিঠিতে সে জেনেছিল। তারপর তেরো বছর কেটে যাওয়ার পরে ছাব্বিশ বছর বয়সে যতীন বিবাহ করে। বাল্যের তেরো বছর—বহুদিন। পুষ্প তখন ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েচে। তারপর আশালতার সঙ্গে নবীন অনুরাগের রঙীন দিনগুলিতে পুষ্প একেবারে চাপা পড়ে গেল। কিন্তু চাপা পড়ে যাওয়া আর ভুলে যাওয়া এক জিনিস নয়। মানুষের মনের মন্দিরে অনেক কক্ষ এক এক কক্ষে এক এক প্রিয় অতিথির বাস। সে কক্ষ সেই অতিথির হাসিকান্নার সৌরভে ভরা, আর কেউ সেখানে ঢুকতে পারে না। প্রেমের এ অতিথিশালা বড় অদ্ভুত, অতিথি যখন দূরে থাকে তখনও যে কক্ষ সে একবার অধিকার করেচে সে তারই এবং তারই চিরকাল। আর কেউ সে কক্ষে কোনো দিন কোনো কালে ঢুকতে পারে না। সে যদি আর ফিরেও না আসে কখনো, চিরদিনের জন্যই চলে যায়—এবং জানিয়ে দিয়েও যায় যে সে ইহজীবনের মতই চলে যাচ্ছে—তখন তার সকল স্মৃতির সৌরভ সুদ্ধ সে ঘরের কবাট বন্ধ করে দেওয়া হয়—তারই নাম লেখা থাকে সে দোরের বাইরে। তার নামেই উৎসর্গীকৃত সে ঘর আর-কারো অধিকার থাকে না দখল করবার।

পুষ্পের ঘরের কবাট বন্ধ ছিল—চাবি দেওয়া, বাইরে ছিল পুষ্পের নাম লেখা। হয়তো চাবিতে মরচে পড়েছিল, হয়তো কবাটের গায়ে ধুলো মাকড়সার জাল জমেছিল, হয়তো এ ঘরের সামনে অনেক দিন কেউ আসে নি, কিন্তু সে ঘর দখল করে কার সাধ্য? আশালতা সে ঘরে ঢোকে নি—আশালতার ঘর আলাদা।

সেই পুষ্প।

যতীন অবাক্ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল। প্রথমেই যে কথাটা ওর মনে উঠলো সেটা এই যে, পুষ্পের সঙ্গে শেষবার দেখা হওয়ার পরে যে বহু বছর কেটে গিয়েচে--তেরো বছর পরে সে বিয়ে করে আশাকে, বিয়ে করেচেও আজ দশ বছর--এই দীর্ঘ, দীর্ঘ তেইশ বছর পরে কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাটের সেই রূপসী মেয়ে বালিকা পুষ্প কোথা থেকে এল? যে বয়সে তারা দুজনে—

নৈহাটির ঘাটে
বসে পৈঠার পাটে
খেলা করেছিল ফুল ভাসায়ে জলে--!

বুড়োশিবতলার ঘাটের প্রাচীন সোপানশ্রেণীর ওপরে বাঁকাভাবে অস্তসূর্যের আলো এসে পড়েচে—ঘাটের রানায় শেওলা জমেচে, ঠিক ওপারে হালিসহরে শ্যামাসুন্দরী ঘাটের মন্দিরেও পড়েচে রাঙা আলো, কিন্তু সেটা পড়েচে পশ্চিমদিক থেকে সোজাভাবে গিয়ে, এখনও সেই প্রাচীন পাখীর দল ডাকচে বড় অশ্বত্থগাছটার ডালে ডালে, সাদা পাল তুলে ইলিশ মাছ ধরা পুরোনো জেলেডিঙির সারি চলেছ ত্রিবেণীর দিকে...যতীন বসে পুষ্পের সঙ্গে গত বারোয়ারীতে যাত্রায় দেখা কি একটা পালার গল্প করচে...তেইশ বছর পরেও পুষ্প এখনও সেই রকমটি দেখতে রয়েচে কেমন করে?

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হোল—পুষ্প তো নেই! সে তো বহুকাল মরে গিয়েচে। ব্যাপার কি, সে স্বপ্ন দেখচে না কি? পুষ্প কিন্তু এগিয়ে এসে হাসিমুখে বল্লে—অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখচো কি? চিনতে পেরেচো? বল তো আমি কে?

যতীন তখনও হাঁ করে চেয়েই আছে। বল্লে—খুব চিনেচি। কিন্তু তুই কোথা থেকে এলি পুষ্প? তুই তো কত কাল হোল—

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বল্লে—মরে গিয়েচি, অর্থাৎ তোমার হাড় জুড়িয়েছিল—এই তো? কিন্তু তুমিও যে মরে গিয়েচ যতুদা? নইলে তোমার আমার দেখা হবে কেমন করে? তুমিও পৃথিবীর মায়া কাটিয়েচ অর্থাৎ পটল তুলেচ।

যতীনের হঠাৎ বড় ভয় হোল। এ সব কি ব্যাপার? তার জ্বর হয়েছিল খুব, সে কথা মনে আছে। তারপর মধ্যে কি হয়েছিল তার জানা নেই। বর্তমানে বোধ হয় তার জ্বরের ঘোর খুব বেড়েচে, জ্বরের ঘোরে আবোল-তাবোল স্বপ্ন দেখচে। তবুও সে এতকাল পরে পুষ্পকে দেখতে পেয়ে ভারি খুশি হোল। স্বপ্নই বটে, বড় মধুর স্বপ্ন কিন্তু!

পুষ্প কিন্তু ওকে ভাববার অবকাশ দিলে না। বল্লে—পুরোনো দিনের মত দুষ্টুমি কোরো না যতুদা। এখন তুমি ছেলেমানুষটি নেই। এখানে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসচে, থাকতে পারচি না—এখন এসো আমার সঙ্গে।

সে হঠাৎ পাগল হয়ে গেল নাকি? সে তো কিছুই বুঝতে পারচে না। যাবে কোথায় চলে সে? পুষ্পই বা আসে কোথা থেকে? অথচ সে তো এই তার পুরোনো ঘরেই রয়েচে ঐ তো চূণবালি খসা দেওয়াল, ঐ তো উঠোনের পেঁপে গাছটি, ঐ পৈতৃক আমলের গোলার ভাঙা সিঁড়ি।

পুষ্পকে সে বল্লে—তুই কি করে জানলি আমার অসুখ করেচে? প্রশ্ন করলে বটে, অথচ যতীন সঙ্গে সঙ্গে ভাবলে, আশ্চর্য! কাকে একথা জিজ্ঞেস করচি? পুষ্প, যে তেইশ বছর আগে মারা গিয়েচে, তাকে? অদ্ভুত স্বপ্ন তো! এমনধারা স্বপ্ন তো সত্যিই জীবনে কোনদিন দেখি নি।

পুষ্প বল্লে—কি করে জানলুম? বেশ কথাটি বল্লে তো যতুদা! তোমার এই ঘরে তোমার কাছে আমি বসে নেই পরশু তোমার জ্বর হওয়ার দিন থেকে? দিন রাতে অনবরতই তো তোমার শিয়রে বসে।

—বলিস্ কি পুষ্প! আমার শিয়রে তুই বসে আছিস দুদিন থেকে? পুষ্প, একটা কথা বল্ তো—আমি পাগল হয়ে যাই নি তো জ্বরের ঘোরে?

—সবাই ও-রকম কথা বলে যতুদা। প্রথম প্রথম যারা আসে তাদের বারোআনা ওই কথাই বলে। তারা বুঝতে পারে না তাদের কি হয়েচে। তুমিও জ্বালালে যতুদা।

কথা শেষ করে পুষ্প ওর হাত ধরে খাট থেকে নামিয়ে নিতেই যতীন বেশ সুস্থ ও হালকা মনে করলে নিজেকে। তারপর কি মনে করে খাটের দিকে একবার চাইতেই সে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। খাটের ওপর তার মত একটা দেহ নির্জীব অবস্থায় পড়ে। ঠিক তার মত চোখ মুখ—সবই তার মত।

পুষ্প বল্লে—দাঁড়িও না যতুদা—এসো আমার সঙ্গে। কেমন, এখন বোধ হয় বিশ্বাস হয়েচে? বুঝলে এখন?

পুষ্প তো ঘরের দরজা খুললে না? তবে তারা ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো কি করে! এখনও রাত আছে। অন্ধকার রয়েচে, মাথার ওপরে অগণ্য তারা জ্বল'চ নবীন বাঁড়ুয্যের বাড়ীর দিকে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করচে। অথচ এই ঘন অন্ধকার রাত্রে সে চলেচে কোথায়? কার সঙ্গেই বা চলেচে? এখনও কি সে স্বপ্ন দেখ'চ?

পুষ্প বল্লে—এখন বিশ্বাস হোল যতুদা? দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে বার হয়ে এলাম দেখলে না?

—কি করে এলাম?

—ইটের দেওয়াল এখন তোমার আমার কাছে ধোঁয়ার মত। আমাদের এ শরীরে

পৃথিবীর জড় পদার্থের স্পর্শ লাগবে না। আর একটা মজা তোমায় দেখাবো. পায়ে হেঁটে যেও না, মনে ভাবো যে উড়ে যাচ্চি—

যতীন মনে মনে তাই ভাবলে। অমনি সে দেখলে তার দেহ রবারের বেলুনের মত আকাশ দিয়ে উড়ে চলেচে। দুজনে চললো, পুষ্প আগে, যতীন তার পেছনে। কোথায় যাচ্চে, যতীন কিছুই জানে না।

সে অনেক কথা ভাবছিল যেতে যেতে। এত অদ্ভুত ঘটনা তার জীবনে আর কখনো হয়নি। স্বপ্নে কি এমন সব ব্যাপার ঘটে? স্বপ্ন যদি না হয় তবে কি সে পাগল হয়ে গেল? তাই বা কেমন করে হয়, তবে পুষ্প আসে কোথা থেকে? কিম্বা সবটাই মনের ধাঁধা—hallucination?

না—একেই বলে মৃত্যু?

এরই নাম যদি মৃত্যু হয় তবে লোকে এত ভয় করে কেন? কেউ তো কখনো তাকে বলেনি যে মৃত্যুর পরে মানুষ জীবিত থাকে—বরং তার মনে হচ্চে সে আরও বেশি জীবন্ত হয়েচে—বেঁচেই বরং রোগের যন্ত্রণায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ যতীন দেখলে যে সে এক নতুন দেশে এসেচে—দেশটা পৃথিবীর মতই। তার পায়ের তলায় নদী, গাছপালা, মাঠ, সবই আছে—কিন্তু তাদের সৌন্দর্য্য অনেক বেশি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে, সূর্য্য দেখা যায় না—অথচ অন্ধকারও নেই—ভারি চমৎকার এক ধরনের অপার্থিব মৃদু আলোকে সমগ্র দেশটা উদ্ভাসিত। গাছপালার পাতা ঘন সবুজ, নানাধরনের ফুল, সেগুলো যেন আলো দিয়ে তৈরী।

এক জায়গায় এসে পুষ্প থামলো।

একি! এ তো সেই পুরোনো দিনের কেওটা-সাগঞ্জের বুড়োশিবতলার ঘাট। ঐ গঙ্গা। ঐ সেই প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটা। ঐ তো বুড়োশিবের ভাঙা মন্দিরটা। পৃথিবীতে মাঝে মাঝে গোধূলির সময় মেঘলা আকাশে যেমন একটা অদ্ভুত হলদে আলো হয়, ঠিক তেমনি একটা মৃদু, তাপহীন, চাপা আলো গাছপালায়, গঙ্গার জলে, বুড়োশিবের মন্দিরের চূড়োয়। ওকে ঘাটের সোপানে একা বসিয়ে পুষ্প কোথায় চলে গেল। যতীন চুপ করে বসে অদ্ভুত আলোকে রঙীন গঙ্গাবক্ষের দিকে চেয়ে রইল। বাল্যের শত সুখের, শত আনন্দস্মৃতির রঙ্গস্থল সেই পুরোনো জায়গা—ঐ তো ওপারে শ্যামা-সুন্দরীর ঘাট, শ্যামাসুন্দরীর মন্দির। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কোনো দিকে আর কোনো লোকজন নেই। এতখানি সুবিস্তীর্ণ স্থান একেবারে নির্জন। কেউ কোথাও নেই সে ছাড়া!

এমন সময়ে অশ্বত্থ গাছের তলায় সেই প্রাচীন পথটা দিয়ে পুষ্পকে আসতে দেখা গেল। তার খোঁপায় কি একটা ফুলের মালা জড়ানো।

যতীন বল্লে—এ কোথায় আনলি পুষ্প? বুড়োশিবতলার ঘাট না? এ কি সাগঞ্জ-কেওটা?

পুষ্প যে সত্যিই দেবী, যতীন তার দিকে চেয়ে সেটা এবার ভালভাবেই বুঝতে পারলে। এমন গাঢ়যৌবনা, শান্ত আনন্দময়ী মূর্ত্তি মানবার হয় না—কি রূপই তার ফুটেচে। কি জ্যোতির্ময় মুখশ্রী! যতীন অবাক্ হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল।

পুষ্প বল্লে—না যতুদা—এ স্বর্গ। সকলের স্বর্গ তো এক নয়!...

তারপর মৃদু হেসে সলজ্জ সুরে ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—এ আমাদের স্বর্গ—তোমার আর আমার স্বর্গ।

যতীনকে পুষ্প একটা ছোট-খাটো সুন্দর বাড়ীতে নিয়ে গেল। সে বাড়ী ইট-কাঠের তৈরী নয়, যেন মনে হোল এক ধরনের মার্বেল পাথরে তৈরী, কিন্তু মার্বেল পাথরও নয় সে জিনিস। বাড়ীর চারিধারে ফুলের বাগান, সবুজ ঘাসের মাঠ। দূরে গঙ্গা দেখা যাচ্ছে। পুষ্প বল্লে—এসব আমার তৈরী। জানো আমি এদেশে এসেচি আজ আঠারো বছর, তোমার অপেক্ষায় ঘর সাজিয়ে বসে আছি। পৃথিবীতে কেওটার গঙ্গার ঘাটের চেয়ে প্রিয়তর আমার আর কিছু ছিল না। এখানে এসে কল্পনায় তাই সৃষ্টি করেচি। এখানে যার যা ইচ্ছে কল্পনায় গড়ে নিতে পারে। এই বাড়ীও আমার কল্পনায় তৈরী।

যতীন বল্লে—কেমন করে হয়?

—এদেশের বস্তুর ওপর চিন্তার শক্তি খুব বেশী। পৃথিবীর বস্তুর মত এখানকার বস্তু নয়। আরও অনেক সূক্ষ্ম—অন্য ধরণের, সে পরে নিজেই টের পাবে। চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করতে তোমাকেও শিখতে হবে—সৃষ্টি করতে হোলে পৃথিবীতেও যেমনি চিন্তার দরকার, এখানে তার চেয়েও বেশি দরকার। চিন্তার শক্তিকে যে বাড়াতে পেরেছে, ইচ্ছামত চালাতে পারে, সে এদেশের বড় কারিগর। কিন্তু এও যে বস্তু, সে বিষয়ে ভুল নেই; পৃথিবীর মানুষ যাকে চেনে, সে বস্তু নয়—তা হোলেও বস্তুই।

—আমার বাবা-মা কোথায় পুষ্প?

—এখনই আসবেন। অসুখের সময় তোমার মা আর আমি তোমার শিয়রে বসে থাকতাম। তাঁরা অন্য জায়গায় থাকেন। পৃথিবী থেকে তোমাকে আনতে যাচ্ছিলেন কিন্তু সন্তানের মরণের দৃশ্য তাঁদের দেখতে কষ্ট হবে ভেবে আমিই তাঁদের যেতে বারণ করি। তোমার পৃথিবীর দেহটা বড্ড খারাপ দেখতে হয়ে গিয়েছিল মরণের আগে—মা গো, ভাবলে ভয় করে।

যতীন বল্লে—আর তোমাদের দেখলে আমার ভয় হচ্চে না? তোমরা যে ভূত, সেটা খেয়াল আছে?

পুষ্প বল্লে—সে তো তুমিও।

যতীন বল্লে—এদেশে আর সব লোক গেল কোথায় পুষ্প? এখানে কি তুমি আর আমি দুটি প্রাণী? তোমার বাবা-মা কোথায়?

পুষ্প হেসে বল্লে—এটা তৃতীয় স্তরের ওপরের অঞ্চল। তুমি জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েচ বলে এখানে আসতে পেরেচ—আর এসেচ আমি এখানে তোমায় ডেকেচি, ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা করেচি তোমার দুঃখের দিনের অবসানের জন্যে। সে সব কথা তুমি কি জানো? নইলে সাধারণ লোক মরার পরে এ জায়গায় আসতে পারে না? আমার বাবা এখনও মরেন নি, খুব বুড়ো হয়েচেন, কালনায় আছেন, আমাদের দেশে। মা অনেক বছর স্বর্গে এসেচেন বটে, কিন্তু তিনি অন্য জায়গায় আছেন। এ স্তরের নিয়ম এই যে তুমি যদি ইচ্ছে করো তুমি কাউকে দেখতে পাবে না, কেউ তোমাকে দেখতে পাবে না। তুমি আমি এখন নির্জনে খানিকটা থাকতে চাই—কতকাল তোমায় দেখিনি তোমার সঙ্গে কথা বলিনি—আমি চাইনে যে এখানে এখন কেউ আসে।

কথা শেষ করে পুষ্প একদৃষ্টে গঙ্গার দিকে চেয়ে কি যেন দেখলে। তারপর বল্লে—চলো তোমায় পৃথিবীতে একবার নিয়ে যাই। তোমার মৃতদেহটা শ্মশানে দাহ করচে। তোমার দেখা দরকার।

পুষ্প যতীনের হাত ধরলে, পরক্ষণেই স্বর্গ গেল মিলিয়ে। তাদের গ্রামের শ্মশানে

যতীন দেখলে সে আর পুষ্প দাঁড়িয়ে আছে। চিতার ধূম জিউলি গাছটার মাথা পর্য্যন্ত ঠেলে উঠেচে।

যতীন হেসে বল্লে—দেখচিস্ পুষ্প, পুণ্যাত্মার চিতার ধোঁয়া কতদূর উঠেচে!

পুষ্প বল্লে—আমি না থাকলে পুণ্যাত্মাগিরি বেরিয়ে যেতো।

তাদের পাড়ার ছেলে-ছোক্‌রার দল মৃতদেহ এনেচে। বুড়োদের মধ্যে এসেচেন নবীন বাঁড়ুয্যে। তিনিই মুখাগ্নি করচেন। সকলেই আশালতাকে কি ক'রে খবরটা দেওয়া যায় সেই আলোচনা করচে।

যতীন হঠাৎ বলে উঠলো—পুষ্প, আশালতাকে একবার দেখবো। নিয়ে যাবি? ওর বড্ড সর্বনাশ করে গেলাম, ওর জন্যে ভারি মন কেমন করচে।

পুষ্প বল্লে—ভাবো যে তুমি আশালতাদের বাড়ী গিয়েচ। বেশ মনকে শক্ত করে ভাবো।

আশালতা স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ কিছুই জানে না, সে দুপুরে খাওয়ার পরে আঁচল পেতে ঘুমুচ্ছে। তাকে সে অবস্থায় নিশ্চিন্ত-মনে মাটির ওপর ঘুমুতে দেখে দুঃখে ও সহানুভূতিতে যতীনের মন পূর্ণ হয়ে গেল। আহা, হিন্দুর মেয়ে, স্বামী অভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে কি অসহায় অবস্থাতেই পড়লো! আজ হয়তো বুঝতে পারবে না—কিন্তু একদিন বুঝতেই হবে। মায়ের পাশে ছোট মেয়েটি ঘুমুচ্ছিল, খোকা পাড়ায় কোথায় খেলতে গিয়েচে। এই বয়সে পিতৃহীন হোল—সত্যি, কি দুর্ভাগা ওরা!

পুষ্প ওসব ভাবনা যতীনকে ভাবতে দিলে না। বল্লে—চলো যাই, পৃথিবীতে বেশিক্ষণ থাকা নিয়ম না।

আশালতাকে আঁচল পেতে মাটিতে ঘুমুতে দেখে পর্য্যন্ত যতীন যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। তার আদৌ ইচ্ছা নেই স্বর্গে যেতে। তার মন আর কোথাও যেতে চায় না। পুষ্প বল্লে—যতীনদা, তুমি এত ভালবাসো আশাকে! ওর মত হতভাগিনী মেয়েও দেখিনি, ও তোমাকে বুঝলো না। সত্যি কষ্ট হয় ওর জন্যে, কিন্তু তুমি এখানে থেকে ওর কোনো সাহায্য করতে পারবে না। চলো যাই।

গতির বেগে পৃথিবীটা কোথায় মিলিয়ে গেল। শুধু মেঘ—সাদা মেঘ চারিদিকে। ওদের পায়ের তলায় বহুদূরে কোথায় অভাগিনী আশালতা মেঝেতে আঁচল পেতে নিশ্চিন্তমনে ঘুমুতে লাগলো।

যতীন বাড়ী ফিরে এসে দেখলে একটি মহিলা তার জন্যে অপেক্ষা করচেন। প্রথমে দূর থেকে তার মনে হোল এঁকে কোথায় সে দেখেচে—কিন্তু মহিলাটি যখন ছুটে এসে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, তখন তার চমক ভাঙ্‌লো।

—বাবা মন্টু, বাবা আমার! আমার মানিক!...

—মা, তুমি?

যতীন মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। মায়ের মুখের দিকে চেয়ে সে অবাক্ হয়ে গেল। বাহান্ন বছর বয়সে তার মায়ের মৃত্যু হয়, কিন্তু এখন তাঁর মুখে বার্দ্ধক্যের চিহ্নমাত্র নেই। তাই বোধহয় সে মাকে চিনতে পারেনি প্রথমটা।

—বাবা কোথায় মা?

যতীন কথা শেষ করে ঘরের দোরের দি'ক চাইতেই বাবাকে দেখতে পেলে। পঞ্চাশ বছর বয়সে যতীনের বাবা মারা গিয়েছিলেন—এ চেহারা তত বয়সের নয়। এ দেশে প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ লোক নেই? যতীন বাবাকে প্রণাম করতেই তিনি এগিয়ে এসে আশীর্বাদ করলেন। বল্লেন—তোমার এখনও আসবার বয়েস হয়নি বাবা, আর কিছু

থাকলে বিষয়-সম্পত্তিগুলোর একটা গতি করতে পারতে। মাখন রায়ের জমিটা কত শখ করে খরিদ করেছিলাম কাছারীর নীলেমে, সেটা রাখতে পারলে না বাবা? আর বেছে বেছে ওই শশধর চক্কত্তি ছাড়া আর কি লোক পেলে না?

যতীনের মা বল্লেন—আহা বাছা এল পৃথিবী থেকে এত কষ্ট পেয়ে, তোমার এখন সময় হোল পোড়া বিষয়ের কথা নিয়ে ওকে বকতে? কি হবে বিষয় এখানে? কি কাজে লাগবে মাখন রায়ের জমি এখানে আমায় বুঝিয়ে বলো তো শুনি?

যতীনের বাবা বল্লেন—তুমি মেয়েমানুষ, বিষয়ের কি বোঝ? তুমি সব কথার ওপর কথা বলতে আসো কেন? মাখন রায়ের জমা—

পুষ্প ঘরে ঢুকতে যতীনের বাবা কথা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। যতীনের মা বল্লেন—পুষ্পকে চিনতে পেরেছিলি তো মণ্টু?

যতীন বল্লে—খুব।

—ওর মত তোকে ভালবাসতে আর কাউকে দেখলুম না। এই আঠারো-উনিশ বছর ও এখানে এসেচে, এই বাড়ীঘর সাজিয়ে তৈরী করে তোরই অপেক্ষায় বসে আছে। পুষ্প তোকে এনেচে বলেই তৃতীয় স্তরে আসতে পেরেচিস, নইলে হোত না। আর উনি এখনও দ্বিতীয় স্তরে পড়ে রইলেন। বিষয-সম্পত্তিই ওঁর কাল হয়েচে। এসেচেন আজ ষোল বছর, বিষয়ের কথা ভুলতে পারলেন না, সেই ভাবনা সর্বদা। এত করে বোঝাই, এত ভাল কথা বলি, ওঁর চোখ সেই পৃথিবীর জমিজমার দিকে। কাজেই ওপরে উঠতে পারচেন না কিছুতেই—

যতীনের মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে খানিকটা চুপ করে রইলেন। তারপর স্নেহের দৃষ্টিতে পুষ্পের দিকে চেয়ে বল্লেন, উন্নতি করেচে আমার পুষ্প মা। এ রকম কেউ পারে না। এত অল্প দিনে ও যেখানে আছে এখানে আসা যায় না! ওর পবিত্র একনিষ্ঠ ভালবাসা এখানে এনেছে ওকে। কত উঁচু জাতির লোকের সঙ্গে ওর আলাপ আছে, দেখিস এখন। তাঁরা যখন আসেন, আমি থাকতে পারিনে তাঁদের সামনে।

যতীন বল্লে—মা, তুমি কোন্ স্তরে আছ?

—আমি ওঁর সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরে থাকি। ওঁকে ছেড়ে আসি কেমন করে? ওঁকে এত করে বলি, কানে কথা যায় না। ঐ দেখলে না, এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারলেন না, বিশেষত পুষ্পের সামনে উনি দাঁড়াতে পারেন না, ওর তেজ উনি সহ্য করতে পারেন না।

পুষ্প লজ্জায় রাঙা হয়ে বল্লে—কি যে বল মা!...তারপর সে ঘরের বাইরে চলে গেল। যতীনের মা বল্লেন—না মণ্টু, সত্যি বলচি শোন। তুমি নতুন এসেচ, তোমার পক্ষে এখন বোঝা অসম্ভব যে পুষ্প কত উঁচুদরের আত্মা। ও যে-সব উচ্চস্তরে যায়, সেখানে যাওয়ার কল্পনাও করতে পারে না সাধারণ মানুষ পৃথিবী থেকে এসে। তোমার জন্যে ও এখানে কষ্ট করে থাকে নইলে এর অনেক উঁচুতে ওর জায়গা। আর কী ভালবাসার প্রাণ ওর সেই কবে ছেলেবেলায় সাগঞ্জ-কেওটাতে থাকতে তোকে ভাল লেগেছিল, জীবনে সেই ওর ধ্যান জ্ঞান। তোকে আর ভুলতে পারলে না। তুই বৌমার ব্যাপারে পৃথিবীতে কষ্ট পেতিস, পুষ্পর এখানে কি কান্না! ওর মত আত্মার পৃথিবীতে যেতে কষ্ট হয় কিন্তু তোমার জন্যে সদাসর্বদা ও সেখানে যেতো। ওকে দেখতে পাওয়া পুণ্যের কাজ।

সম্মুখের এই সুন্দর আকাশ ঐ কলস্বনা ভাগীরথী, অদ্ভুত রঙের বনানী, অপরিচিত বন লতার সর্বাঙ্গ ছেয়ে সে সব অপরিচিত বনপুষ্পরাজি এই শান্তি, এই রূপ—এও যেমন স্বপ্ন—পুষ্পের কথা পুষ্পের ভালবাসাও তেমনি স্বপ্ন। তার জীবনে সে শুধ

নিজেকে ভুলিয়ে এসেচে সুখ পেয়েচে বলে, কিন্তু সত্যিই কোনো জিনিস পায়নি কখনো—আজ মৃত্যুপারের দেশে এসে তার সারাজীবনের স্বপ্ন সার্থক হতে চলেচে একথা তার বিশ্বাস হয় না। কোন্‌টা স্বপ্ন, কোন্‌টা বাস্তব, তার কুড়ুলে-বিনোদপুরের বাড়ী, না এই স্বপ্নলোক?...আশালতা, না পুষ্প?...

যতীনের মা বল্লেন—তাঁরা ওকে বড় ভালবাসেন, মাঝে মাঝে অনেক ওপরে নিয়ে যান তাঁদের রাজ্যে? আমি ওর মুখে সে সব গল্প শুনেচি, ইচ্ছে হয় এখুনি যাই, কিন্তু আমাদের অনেক বছর কেটে যাবে সে রাজ্যে পৌঁছুতে, তবুও পৌঁছুতে পারবো না। সাধারণ মানুষ পৃথিবী থেকে যারা আসে তারা এত নিম্নস্তরের জীব যে, এই তুমি যে দেশে আছ, এ-ই তাদের কাছে উচ্চ স্বর্গ। অন্য সব উচ্চস্তরের কথা বাদই দাও।

একটা আশ্চর্য চাপা আলো আকাশের এক কোণ থেকে এসে পড়লো। সমস্ত স্থানটা অল্পক্ষণের জন্যে নীল আলোয় আলো হয়ে উঠলো—আবার তখুনি সেটা মিলিয়ে গেল। একটা ঠাণ্ডা, নীলোজ্জ্বল আলোর সার্চ্চলাইট যেন দু-সেকেণ্ডের জন্যে কে ঘুরিয়ে দিলে।

যতীন বল্লে—ও কিসের আলো মা?

—আমি কিছু বলতে পারবো না বাবা। এ সব দেশের ব্যাপার ভারি অদ্ভুত, চন্দ্র-সূর্য্যির দেশ এ নয়। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, আমি কি করে জানবো কিসে থেকে কি হয়। দেখি চোখে এই পর্যন্ত। কেন ঘটে, কিসের থেকে ঘটে, সে সব যদি জানবো তবে তো জ্ঞানী আত্মা হয়ে যাবো। পুষ্পও জানে না, পুষ্প মেয়েমানুষ, ও ভালবাসায় বড় হয়ে এখানে এসেচে, জ্ঞানে নয়। ও-সব কথার উত্তর সে দিতে পারবে না। আচ্ছা, এখন আসি মণ্টু। নতুন সবে কাল এসেচ, ক্রমে কত কি অদ্ভুত ব্যাপার দেখবে, কত কি নিজেই জানতে পারবে। সময় ফুরিয়ে যাবে না, সময় এখানে অফুরন্ত, অনন্ত।

যতীনের মা চলে গেলেন।

৬

যতীন একদিন পুষ্পকে বল্লে—কত দিন হয়ে গেল এখানে এসেচি বলতে পারিস পুষ্প? এখানে দিনরাত্রির কোনো হিসেব পাইনে।

পুষ্প বল্লে—পৃথিবীর অভ্যেস দূর হতে এখনও তোমার অনেক দিন লাগবে যতুদা। এখানে দিনরাত্রির কোনো দরকার যখন নেই, তখন ঘড়ি দেখা অভ্যেসটা ছেড়ে দাও। সময়, যে অফুরন্ত, অনন্ত, যতদিন সেটা অনুভব না করবে, ততদিন মুক্তি হবে না। মনের দ্বিধা সংকীর্ণ ভাব দূর না হোলে মুক্তি সম্ভব নয়, যতুদা।

—কি ধরনের মুক্তি?

—কি জানি আমি এ সব বড় বড় কথা জানিনে, তোমায় আবার আমি কি বোঝাবো যতুদা, তুমি কি আমার চেয়ে কম বোঝো?

—বাজে কথা বলে আমায় ভোলাতে চাস নে পুষ্প। আমি অনেক কিছু জানতে চাই, আমাকে শেখানোর ব্যবস্থা করে দিবি? কত কি যে জানতে চাই তার ঠিক নেই। কে আমায় বলে দেবে বল্ তো!

—আছে, লোক আছে। তোমায় নিয়ে যাবো একদিন সেখানে। খুব উঁচু এক আত্মা আমায় বড় স্নেহ করেন। আমার স্তরে আসতে তাঁর কষ্ট হয়। তাই আমিই যাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তুমি যাবে একদিন? আমি গুরুদেব বলি তাঁকে। বৈষ্ণব সাধু।

—কিন্তু আমি সে সব উচ্চস্তরে কি করে যাবো পুষ্প? মোটে সেদিন পৃথিবী

থেকে এসেচি—তোমার দয়ায় তাই এত উঁচু স্তরে আছি, এর চেয়েও উঁচুতে কি ভাবে যাবো ?

—যাওয়া ঠিক কঠিন নয়, কিন্তু থাকতে পারবে না বেশিক্ষণ। যাতে যেতে পারো তার ব্যবস্থা আমি করবো।

—আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞেস করি পুষ্প, আমার এখনও একটা সন্দেহ হয়, এ সব স্বপ্ন নয় তো ?

—যাও, পাগলামি কোরো না যতুদা। তোমার একথার উত্তর অন্তত একশো বার না দিয়েচি তুমি আসা পর্যন্ত ? দেখবে আর একটা জিনিস, দেখাবো ? অবিশ্যি তোমায় সেখানে আজ যেতেই হবে।

—কি সেটা ?

—আজ তোমার শ্রাদ্ধের দিন। তোমার ছেলে নিনু কাছা গলায় দিয়ে শ্রাদ্ধ করচে। পিণ্ডদানের সময় তোমায় গিয়ে হাত পেতে পিণ্ড নিতে হবে।

ছেলের কথা শুনে যতীন অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ হয়ে গেল। নিনু, আহা দুধের বালক, তাকে কাছা গলায় দিয়ে শ্রাদ্ধ করতে হচ্চে!...সে সে বড় করুণ দৃশ্য !

যতীন বল্লে—আমি যাবো না সেখানে।

পুষ্প হেসে বল্লে—ঐ যে বলছিলাম, তুমি এ জগতের ব্যাপার কিছুই জানো না। সে ছেলেমানুষ, যখন কচি হাতে ছলছল চোখে তোমার নামে পিণ্ড দেবে, সে এমনি আকর্ষণ তোমাকে টেনে নিয়ে যাবে। তোমার সাধ্য কি তুমি না গিয়ে থাকো ? খুব ভালবেসে যে টানবে, তার টান এ জগতে এড়ানো যায় না। পৃথিবীর স্থূল দেহে স্থূল মন বাস করে—এখানে তা নয়। এখানে মন আপনা-আপনি বুঝতে পারবে কোন্‌টা সত্যিকার ভালবাসা, বুঝে সেখানে যাবে। আচ্ছা তুমি ব'সো, আমি একবার দেখে আসি ওদিকে কি হচ্চে।

পৃথিবীর হিসাবে মিনিট-দুই সময়ও তারপর চলে যায়নি পুষ্প হঠাৎ কোথায় চলে গেল এবং ফিরে এসে বল্লে—ওখানে এখন সকাল সাতটা। শ্রাদ্ধের আয়োজন শুরু হয়েচে। নিনু কিন্তু এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। যতীনের আগ্রহ হোল জিজ্ঞেস করে—আশা কি করচে। সে ভয়ানক ব্যাকুল হয়েচে আশার খবর জানবার জন্যে। কত দিন খবর পায়নি। আশা কেঁদেছিল, চোখের জল ফেলেছিল তার মৃত্যুসংবাদে ?

জানবার জন্যে সে মরে যাচ্চে, কিন্তু লজ্জা করে পুষ্পকে এসব কথা বলতে। যতীন বুড়োশিবতলার ঘাটের রানায় চুপ করে বসে রইল। সামনে কুলু-কুলু-বাহিনী গঙ্গা, নীল আকাশের তলা দিয়ে একদল পাখী উড়ে এপার থেকে ওপারে যাচ্চে। ঘাটের ওপরে বৃদ্ধবটের শাখার নিবিড় আশ্রয়ে একটা অজানা গায়ক-পাখী অতি মধুর স্বরে ডাকচে। যতীনের মন আজ অত্যন্ত বিষণ্ণ। আশা খুব কেঁদেছিল ? আশাকে সে বড় নিঃসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে এসেচে—স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীপুত্রকে সুখে রাখা, তার অভাবে তারা কষ্ট না পায় তার ব্যবস্থা করা। সে অকর্ম্মণ্য স্বামী; নিজের কর্তব্য পালন করার শক্তি তার ছিল না। আশাকে সে সুখী করতে পারেনি একদিনও।

পুষ্প এসে বল্লে—বৌদিদির কথা ভেবে যে সারা হোলে, যতুদা !

তারপর সস্নেহে ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—চল তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাই। বৌদিদির কাছে নিয়ে যেতাম—কিন্তু পৃথিবীর সঙ্গে বেশি যোগাযোগ এখন তোমার পক্ষে ভাল নয়। তা ছাড়া তুমি তার কোনো উপকারও করতে পারবে না এ অবস্থায়।

—কোথায় নিয়ে যাবি পুষ্প ?

—অনেক উঁচু এক স্বর্গে। নতুন এসেচো পৃথিবী থেকে, তোমরা বুঝতে পারবে

না। মনে করলেই সেখানে যাওয়া যায় না। তোমার যাওয়া সম্ভব হবে শুধু আমি নিয়ে যাবো বলে। তুমি কিন্তু পৃথিবী সম্বন্ধে সকল রকম চিন্তা মন থেকে তাড়াও।

—তা আমি পারবো না পুষ্প। তোর বৌদি বড় অভাগিনী, তার কথা ভুলতে পারবো না।

—দয়া বা সহানুভূতি তোমায় নামাবে না, ওপরে ওঠাবে। তাই ভেবো যতুদা, কিন্তু সাবধান, বিষয়-সম্পত্তির কথা যেন ভেবো না—ত্রিশঙ্কুর অবস্থা হবে। এসো আমার সঙ্গে।

দুজনে শূন্যপথে নীলাভ শূন্য-সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে উড়ে চললো। ডাইনে বাঁয়ে অগণিত তারালোকে, মৃদু নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় ভাসানো জীবনপুলক ওদের মুক্ত দেহে এনেচে শিহরণ, প্রাণে মুক্তির আনন্দ—দূর...দূর...বহুদূর তারা চললো কত নতুন অজানা দেবলোক...

ক্রমে আর একটা নতুন লোকের ওরা সমীপবর্ত্তী হতে লাগলো...দূর থেকে তার সৌন্দর্য্যে যতীনের সমস্ত জৈবিক চেতনা অবশ হয়ে এল—বিলুপ্তপ্রায় চেতনার মধ্যে দিয়ে তার মনে হোল বহু কদম্বদ্রুম যেন কোথায় মুকুলিত, লতানিকর বিকশিত, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত গিরিগ্রামে বহু বিহগকণ্ঠের কাকলী, প্রেম...স্নেহ...সুগভীর স্নেহের নিঃস্বার্থ আত্মবলি...আরও কত কি...কত কি সে সবের স্পষ্ট ধারণা ওর নেই... ওর চেতনা রইল না...পুষ্প বিব্রত হয়ে পড়লো—যতীন অতি উচ্চ স্তরে যে সচেতন থাক্‌বে না, পুষ্পের এ ভয় হয়েছিল, তবুও তার আশা ছিল চেষ্টা করলে নিয়ে যাওয়া কি এতই অসম্ভব...একবার সে দেখবে।

না, যতীন সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললে। যতীনের দেহটাকে নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ওর মন থাকবে নিদ্রিত। কিছুই দেখবে না, জানবে না, শুনবে না। নিয়ে গিয়ে লাভ কি?

পুষ্প ডাকতে লাগলো—ও যতুদা...চেয়ে থাকো, কোথায় যাচচ ভেবে দেখো...আমি পুষ্প, ও যতুদা...চোখ চাও...

নিকটেই একটা বেগুনি রঙের শৈলশৃঙ্গ...বন্য লতাপাতার আড়ালে একটা শিলাখণ্ডে যতীনকে সে শোওয়ালে। সংজ্ঞা হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতীনের গতি বন্ধ হয়ে গিয়েচে...নিকটের ঝরণা থেকে জল এনে ওর মুখে দিয়ে পুষ্প আঁচল দিয়ে ওকে বাতাস করতে লাগলো। পরে নিজের দেহের চৌম্বিক শক্তি আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ওর দেহে সঞ্চালিত করতে লাগলো।

এমন সময়ে পুষ্পের দৃষ্টি হঠাৎ আকৃষ্ট হলো ওই উচ্চ শিখরটার প্রান্তদেশে। সেখানে পরম সুন্দর এক তরুণ দেবতা বহুদূরে মহাশূন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে আছেন আনমনে। কোনো দিকে তাঁর খেয়াল নেই, কি যেন ভাবচেন। তাঁর অঙ্গের নীলাভ জ্যোতি দেখে বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলে পুষ্প বুঝলে এ অতি উচ্চ শ্রেণীর আত্মা, দেবতা-গোত্রে চলে গিয়েচেন—মানুষের কোনো পর্যায়ে ইনি এখন আর পড়েন না।

পুষ্প জানতো এ জগতে যে যত পবিত্র, উচ্চ, সে দেখতে তত রূপবান, তত তরুণ। তারুণ্য এখানে নির্ভর করে না জন্মের তারিখের দূরত্ব বা নিকটত্বের ওপরে। এখানে দেহের নবীনতা ও সৌন্দর্য্য একমাত্র নির্ভর করে আধ্যাত্মিক প্রগতির ওপরে। এঁর রূপ ও নবীনতা পৃথিবীর হিসেবে ষোলো-সতর বছরের অতি রূপবান্ কিশোর বালকের মত—অত্যন্ত উচ্চ স্তরের দেবতা ভিন্ন এ রকম হয় না।

দেবতার ধ্যানভঙ্গ করতে পুষ্পের সাহস হোল না। সে এত উঁচু আত্মা কখনও দেখেনি। কি করবে ভাবচে, এমন সময় দেবতার অন্যমনস্ক চক্ষু অল্পক্ষণের জন্যে ওদের দিকে পড়লো। পরক্ষণেই তিনি অতীব জ্যোতিষ্মান দুটি চোখ দিয়ে ভাল করে চেয়ে

দেখলেন। একটু বিস্ময়ের সুরে বল্লেন—কে তোমরা?

পুষ্প প্রণাম করে বল্লে—সবই তো বুঝচেন, দেব।

এইবার যেন দেবতার অন্যমনস্ক একাগ্রতা কিছু ভগ্ন হোল—বর্তমান সম্বন্ধে তিনি সচেতন হয়ে উঠলেন। বল্লেন—কি বলো তো? আমার যোগ নেই এ স্তরের সঙ্গে। বুঝতে পারবো না।

পুষ্প নিজেদের পরিচয় দিয়ে তার গন্তব্যস্থানের কথা ও যতীনের অবস্থা সব বললে।

আত্মা বল্লেন—ওকে যেখানে এনে ফেলেচ, এখানেও তো ওর চৈতন্য হবে না—ওর পক্ষে এও তো অতি উচ্চ স্থান; নিচে নামিয়ে নিয়ে যাও ওকে।

পুষ্প বল্লে—আপনি কে বলুন দেবতা, আমার কত শুভদিন আজ, আপনাকে দেখলাম। এতকাল তো আছি এ জগতে, আপনার মত আত্মা কখনও দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আপনি কে দেব?

আত্মা অতি মধুর প্রসন্ন হাসি হেসে বল্লেন--তুমি অত জানতে চাও কেন? তুমি ভারতবর্ষের কন্যা, ভক্তি তোমার জন্মগত। বিশ্বাস কর, এই মাত্র। তুমিও খুব উচ্চ-স্তরের আত্মা, নইলে আমায় দেখতে পেতে না। তোমার সঙ্গীকে যদি আমি জাগিয়েও দিই, ও আমায় দেখতে পাবে না। যাও ওকে নামিয়ে নিয়ে যাও।

তবু পুষ্প সাহসে নির্ভর করে বল্লে—আপনি কে দেব?...পাহাড়ের চূড়োতে বসে ছিলেন কেন? এ স্তর তো আপনার নয়।

কথাটা শেষ করেই পুষ্প বুঝলে আত্মা তখনই বড় হয়, যখন প্রেমে সে বড় হয়। সামান্য পৃথিবীর মেয়ের এই প্রগল্‌ভ কথায আত্মা চটে তো গেলেনই না, কৌতুক-মিশ্রিত গভীর স্নেহে তাঁর সুশ্রী বিশাল জ্যোতির্ম্ময় চোখ দুটি স্নিগ্ধ হয়ে এল। বল্লেন—দেখবে কি দেখছিলাম? এসো এখানে। তোমায় দেখাবো, তুমি তার উপযুক্ত হয়েচো।

পুষ্প আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে গেল আত্মা শৈলশৃঙ্গের প্রান্তসীমার দিকে দাঁড় করিয়ে হাত দিয়ে ওকে স্পর্শ করে বল্লেন—দেখচ?

পুষ্পের সারাদেহ শিউরে উঠলো। সামনে এ এক অন্য পৃথিবী, বিশাল জলা-ভূমিতে বড় বড় অতিকায জীবজন্তু কর্দ্দমে ওলট-পালট খাচ্ছে—গাছপালার একটিও পরিচিত নয। বাতাসে অস্বাচ্ছন্দ্যকর গরম জলীয় বাষ্প—সূর্যের তেজ অতিশয় প্রখর ...তারপর ছবির পর ছবি...কত দেশ, কত যুদ্ধ, কত সৈন্যদল...কত প্রাচীন দেশের বেশভূষা পরা লোকজন...প্রশস্ত রাজপথ, প্রাচীন দিনের শহর...পচা ডোবা খানা শহরের রাজপথের পাশেই...ঘোর মহামারীতে দলে দলে লোক মরচে, কী বীভৎস দৃশ্য!

আত্মা বল্লেন—বহু দূর অতীতে ফিরে চাইছিলাম। কত কল্প আগেকার আমারই বহু পূর্ব জন্মে। কত লোককে হারিয়েচি, কত মধুর হৃদয়—আর কখনো খুঁজে পাইনি। বিশ্বের দূর প্রান্তের মোহনায় বসে তাদের কথা মনে পড়েছিল। যা দেখলে, সব আমার জীবনের বিভিন্ন অঙ্কের রঙ্গভূমি। লক্ষ্মী মেয়েটি, এখন তোমার সঙ্গী ছেলেটিকে নিয়ে নেমে যাও।

পুষ্প তাঁকে প্রণাম করে বিনীত ভাবে বল্লে—আপনার দেখা আবার কবে পাবো?

—যখন স্মরণ করবে। একমনে স্মরণ করলেই আসবো—কিন্তু যখন তখন আমায় কষ্ট দিও না। আমার নানা কাজ, কোথায় কখন থাকি। কল্প-পর্বতে সঙ্গীত যেদিন বাজবে, চুম্বকের ঢেউ কম থাকবে, সেদিন আমায় ডেকো।

কল্প-পর্বতের সঙ্গীত কি, পুষ্প তা জানতো। চতুর্থ স্তরে একটি সুনির্জন পাহাড়ে বহু শতাব্দী ধরে এক নির্দিষ্ট সময়ে আপনা-আপনি অতি মধুর অপার্থিব সঙ্গীত-ধ্বনি ওঠে। কত কাল পূর্বে জনৈক পবিত্র আত্মা ঐ স্থানটিতে বসে নূতন সুর সৃষ্টি

করতেন—কোনো বড় সুরশিল্পী হবেন। ওপরের স্বর্গে উঠে গিয়েচেন বহুকাল, কেউ তাঁকে এখন আর দেখে না—কিন্তু সেই নির্দিষ্ট সময়ে এখনও তাঁর সৃষ্ট সুরপুঞ্জে স্বর্গমণ্ডলের অজ্ঞাত কোণটি ছেয়ে যায়।

দেবতা বিদায় নিলেন—বহুদূরব্যাপী নভোমণ্ডল জ্যোতির্ময় হয়ে উঠলো তাঁর দেহ-জ্যোতিতে। তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবার পরেও যেন খানিকক্ষণ আকাশটা আলো হয়ে রইল। পুষ্প অবাক্ হয়ে সেদিকে চেয়ে রইল। এত বড় দেবতা এতদিন এখানে থেকেও কখনো সে দেখেনি।

## ৭

যতীনের চেতনা ফিরে এল বাড়ীতে ফিরবার পথেই।

পুষ্পকে বল্লে—এ কোথায় যাচ্চি আমরা, এখনও পৌঁছুইনি?

পুষ্প বল্লে—না, চলো বাড়ী ফিরে যাই। সেখানে এখন তোমার যাওয়া চলবে না। তুমি পথে এমন হয়ে পড়লে! চতুর্থ স্তর পার হতে না হতেই তোমার সংজ্ঞা চলে গেল। পঞ্চম স্তরে নিয়ে যাই কি করে? উঃ, একটা অদ্ভুত জিনিস তুমি দেখলে না।

তারপর পুষ্প সবিস্তারে উন্নত আত্মাটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার বৃত্তান্ত বর্ণনা করলে। বল্লে—আমার বড় ইচ্ছে ছিল তুমি দেখতে পাও, কিন্তু বুঝলুম তিনি এখন তোমায় দেখা দিতে ইচ্ছুক নন। তুমি দেখতে পাবেও না।

যতীনের মনে পড়লো তার মায়ের সঙ্গে যেদিন কথা বলছিল আকাশের দূর প্রান্তে অমনি একটা অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতির্লেখা দেখা গিয়েছিল, পুষ্প যেমন বর্ণনা করলে তেমনি। পুষ্পকে সে কথা বল্লে। পুষ্পকে বল্লে—আমি জানি, ও আলো সব সময়ই উচ্চ আত্মাদের, যাঁদের আমরা দেবতা বলি, তাঁদের গতিবিধির পথে দেখা যায়। উল্কার মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁদের পথ, যখন তাঁরা যান। অত শুদ্ধ আত্মা কিন্তু আমাদের স্তরে কমই আসেন, খুব কমই দেখা যায়।

—দেখ পুষ্প, আমি তোমার এখানে এসে ভাবতুম কত উঁচু স্তরে এসেচি! আজ আমার সে অহঙ্কার ভেঙে গেল। অত সব উঁচু স্তর আছে, তা কি জানতাম!

পুষ্প হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। বল্লে—এ কথা তো কখনো শুনিনি! তুমি ভাবতে আমাদের এই বুঝি বৈকুণ্ঠধাম? তবে তুমি নতুন এসেচ পৃথিবী থেকে, তোমার দোষ কি যারা এখানে অনেকদিন আছে তারাও জানে না। আমি শুনেছিলাম এক শুদ্ধ আত্মার কাছে, যাঁর কাছে তোমায় নিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বলেন সপ্তম স্তর পর্যন্ত আছে, যেখানে পৃথিবীর মানুষ যেতে পারে। তার ওপরেও অসংখ্য স্তর আছে, তবে সে সব অঞ্চলের খবর তিনিও জানেন না। সে সব পৃথিবীর মানুষের জন্য নয়।

—আর আমি চতুর্থ স্তর ছাড়িয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়লাম!

—তা যদি না হোত, আমি বৌদিকে এনে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতাম।

যতীন আগ্রহের সঙ্গে কিন্তু কিছু অবিশ্বাসের সুরে বল্লে, আশাকে? কি করে?

—সে ঘুমিয়ে পড়লে তার সূক্ষ্ম দেহ স্থূল দেহ থেকে বার করে। এ রকম করা যায়, আমি করতেও জানি। কিন্তু বৌদিদির কোন জ্ঞান থাকবে না, যখন তাঁকে এখানে আনা হবে। তোমার মত অচৈতন্য হয়ে যাবে, দ্বিতীয় স্তর পার না হতেই। এই এ জগতের নিয়ম। যে স্তরের যে উপযুক্ত নয়, সে স্তরে পৌঁছুলে তার চেতনা লোপ পায়। কার সঙ্গে কথা কইবে যতুদা?

—কোনো উপায় নেই পুষ্প? আমরা পৃথিবীতে গিয়ে দেখা দিতে পারি নে?

—প্রথমত, তা পারা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। আর যদিও বা পারা যায়, তাতেও কোনো ফল হবে না। বৌদিদি পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়ে, মানুষ মরে কোথায় যায়, তাদের কি অবস্থা হয়, এসব সম্বন্ধে কিছু জানে না। মন কুসংস্কারে পূর্ণ। তোমায় দেখে সে এমনি ভয় পাবে যে তোমার যে জন্যে যাওয়া বা দেখা দেওয়া, তা হবে না।

যতীন কিছুতেই ছাড়ে না। তার সনির্বন্ধ অনুরোধে পুষ্প অবশেষে ওকে আশার কাছে নিয়ে গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে রাজী হলো। যতীন বল্লে, আজই চলো।

পুষ্প ঘাড় নেড়ে বল্লে—এখন শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নারাত্রি পৃথিবীতে। ওর আলোর ঢেউ আমাদের দেহ ধারণ করে দেখা দেওয়ার পক্ষে বড় বাধা। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে অনেক সহজ হবে। ক'টা দিন সবুর করো না!

তারপর একদিন ওরা কৃষ্ণাসপ্তমী তিথিতে দুজনে পৃথিবীতে নেমে গেল। যতীন নতুন পৃথিবী থেকে গিয়েচে, সে স্পষ্টই সব দেখতে লাগলো, কিন্তু পুষ্প অনেক দিন উচ্চস্তরে কাটানোর ফলে ওর সব ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট কুয়াশার মত ঠেকচে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে তার কষ্ট হতে লাগলো।

ওরা বেশি রাত্রে আসে নি, কারণ আশা তখন ঘুমিয়ে পড়বে, ওদের দেখবে কি করে?

পুষ্প বল্লে—খুব ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করো। খুব জোর করে ভাবো যে আমি আশাকে দেখা দেবো, দেবো, দেবো। তুমি বেশিদিন পৃথিবী ছেড়ে যাওনি, তোমার দেহ স্থূল-চোখে দেখা যাবে তা হোলে।

পৃথিবীর হিসেবে দুঘণ্টা প্রাণপণে চেষ্টা করেও যতীন নিজের দেহ কিছুতেই আশার চোখে দৃশ্যমান করতে পারলে না। আশা রান্নাঘরে যাচ্ছে আসচে, ছেলেদের খাইয়ে আঁচিয়ে দিলে, ঘরে গিয়ে বাবার জন্যে পান সাজলে, দোতলার ঘরে একা গিয়ে ছেলে-মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এল। যতীন সব সময় ওর পাশে পাশে সামনে, রোয়াকে, ঘরে, দোতলায় উঠবার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থেকেও কিছুতেই কিছু করতে পারলে না। কতবার ডাকলে—আশা, ও আশা, এই যে আমি, ও আশা—আশা? আমি এসেচি তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

আশা ওকে টেরও পেলে না। এমন কি মনেও কিছু অনুভব করলে না। পুষ্প বল্লে, আচ্ছা, এখন থাক। ওর মন এখন চঞ্চল অবস্থায় রয়েচে। যখন বিছানায় এসে শোবে, প্রথম তন্দ্রা আসবে, তখন মন হবে শান্ত, স্থির, একাগ্র। সেই সময়ে সামনে দাঁড়িও।

যতীন বল্লে—উঁহু, সে হবে না। ওর হ্যারিকেন লণ্ঠন ঘরে সারারাত জ্বালিয়ে ঘুমুনো অভ্যেস। সে আলোতে তো কোনো কাজই হবে না!

—আচ্ছা সে হবে এখন। তুমি সেজন্যে ব্যস্ত হয়ো না। আমি চেষ্টা করবো এখন।

ততক্ষণ যতীন পুষ্পকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর বাইরে গেল। এই তার শ্বশুরবাড়ীর দেশ। প্রথমে সে যখন এখানে আসে তখন ওই মজুমদারের বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে আরও পাড়ার পাঁচজন নতুন জামাইয়ের সঙ্গে পাশা খেলে তাস খেলে কত দুপুর সন্ধ্যা কাটিয়েছে! ওই সেই যদু ভড়ের পুকুর, যেখানে মস্ত বড় রুইমাছ ধরেছিল ছিপে, সেই প্রথম ও সেই শেষ। ওঃ, মাছটা ঘাটের ঐ পৈঠাটার ওপর পড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল জলে, ওরই বড় শালা, আশার ভাই ছেনি জাল দিয়ে মাছটা ধরে ফেলে। সে সব এক দিন গিয়েচে।

হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠলো—ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

ওরা দুজনেই ফিরে চাইলে। যদু ভড়ের ছেলে শ্রীশ ভড় গাড়ু হাতে পুকুরের ঘাটে নামতে গিয়ে হাঁ করে অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে—হাত কুড়ি-পঁচিশ দূরে।

পুষ্প বল্লে—তুমি পৃথিবীর ভাবনা খুব একমনে ভাবছিলে, তোমায় দেখতে পেয়েচে পরক্ষণেই দেখা গেল শ্রীশ গাড়ু ঘাটে রেখে ওর দিকে এগিয়ে আসচে, সে যে পুষ্পকে দেখতে পাচ্চে না—সেটা বেশ বোঝাই গেল। তার বিস্মিত দৃষ্টি শুধু যতীনের দিকে নিবদ্ধ। পরক্ষণেই কিন্তু সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ভয়ে চীৎকার করে উঠলো। যতীন তো অবাক্! ভয়ে চীৎকার করে কেন? সে বাঘ না ভালুক!

শ্রীশ ভড়ের গলার আওয়াজ পেয়ে ততক্ষণ তাদের বাড়ীর মধ্যে থেকে, পাশের নিমাই ভড়ের বাড়ী থেকে, ওর জ্যাঠামশাই নন্দ ভড়ের বাড়ী থেকে অনেক লোক ছেলেবুড়ো বেরিয়ে এল। সকলের সমবেত ভদ্র প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লে—উঃ কি কাণ্ড! এমন তো কখনো দেখিনি।

সবাই বল্লে—কি, কি, কি দেখলি রে?

—ওইখানে দাঁড়িয়ে ছিল সাদামত দিব্যি একজন মানুষ। যেমন ডেকেচি, অমনি মিলিয়ে গেল। বাপ্...না রে বাপ্, সপষ্ট নিজের চোখে দেখলাম, তোমরা বলচো চোখের ভুল! আমি কি গাঁজা খাই যে চোখের ভুল?

সবাই গোলমাল করতে লাগলো, দু-একজন সাহসী লোক এগিয়ে দেখতে এল লেবুগাছের আড়ালে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা, যতীনের আশেপাশে যাতায়াত করচে অথচ সে আর পুষ্প সেইখানেই দাঁড়িয়ে।

যতীন কৌতুকের হাসি হেসে বল্লে—লোকগুলো কানা নাকি? খুঁজচে যাকে, সে তো এখানেই দাঁড়িয়ে।

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে—যাক্, ভালই হয়েচে তোমায় চিনতে পারেনি চিনতে পারলে বলতো, মুখুয্যেদের বাড়ীর জামাই ভূত হয়ে লোকের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বৌদিদি শুনলে কষ্ট পেতো। লোকে বলতো গতি হয়নি। কেমন, শখ মিটলো তো? নিরীহ লোককে আর ভয় দেখিয়ে দরকার কি, চলো পালাই।

৮

বুড়োশিবতলার ঘাটে অশ্বত্থতলায়, যতীন অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছিল।

পুষ্প মাঝে মাঝে কোথায় যায়, আজও বেরিয়েচে। তার নানা কাজ, কোথায় কখন ঘোরে। পুষ্পকে যতীন খানিকটা বোঝে, খানিকটা বোঝে না। পুষ্পের ভালবাসায় সেবা যত্নে তার বহুদিনের বুভুক্ষু প্রাণ তৃপ্ত হয়েচে বটে কিন্তু সঙ্গিনী হিসাবে যতীনের মনে হয় পুষ্প অনেক উঁচু। সে পুষ্পকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে, এমন কি কিছু কিছু ভয়ও করে। তার সঙ্গে কিন্তু মন খুলে কথা বলা যায় না, বলতে চাইলেও মুখে অনেকটা আটকে যায়। এমন সুখ, শান্তি, আনন্দের মধ্যেও যতীন নিজেকে খানিকটা একা মনে না করে পারে না।

আশা, আজ যদি আশা...

এই সব সুন্দর দিনে, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বসে আশার কথাই মনে হয় আরও মনে হয় সে বড় হতভাগিনী, তার এত ভালবাসা আশা বোঝেনি; আশা যদি বুঝতো, তার মূল্য দিত, হতভাগিনী নিজেই কত তৃপ্তি পেতো।

তার ইচ্ছা হয় যখন তখন আশার কাছে যায়। কিন্তু পুষ্প তাকে যেতে দেয় না এর কারণ যতীন জানতো না। আশার জীবনের অনেক ব্যাপার পুষ্প যা জানে যতীন তা জানে না। পাছে সে সব দেখলে যতীনের মানসিক যন্ত্রণা বেড়ে যায়, সেজন্যে পুষ্প প্রাণপণে সে সব জিনিস ওর দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। যার কোনো প্রতিকার

করবার ক্ষমতা নেই, তা ওকে জানতে দিয়ে কোনো লাভ নেই।

যতীন জানতো আশা খেয়ালের বশে অভিমান করে বাপের বাড়ী গিয়ে উঠেছিল এবং অভিমানের দরুনই তার সঙ্গে দেখা করেনি। তার নিষ্ঠুরতা, সেও অভিমানপ্রসূত। আশার চরিত্রের আসল দিক পুষ্প কত কৌশলে ঢেকে রেখেচে যতীনের কাছে তা একমাত্র জানতেন যতীনের মা। পাছে ওর চোখেও সে সব ধরা পড়ে যায়, এই ভয়ে নিজে সঙ্গে না নিয়ে যতীনকে একা আশার কাছে যেতে দিত না। যতীনের একা যাবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও একা পৃথিবীতে যেতে সে তেমন সাহস পায় না—একদিন যাবার চেষ্টা করে খানিকটা গিয়েছিলও, হঠাৎ মধ্যপথে কে যেন ওকে চৌকো কাঠের বাক্সের আকারের ঘর তৈরী করে তার মধ্যে বন্দী করবার চেষ্টা করতে লাগলো। ও এগিয়ে যায়, একটা ঘর ফুঁড়ে বার হয়, আবার সামনে ঐ রকম কিউব দিয়ে সাজানো ঘর আর একটি তৈরী হয়—সেটা অতি কষ্টে পার হয়, তো আর একটা। দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষাকৃত স্থূল অথচ অত্যন্ত নমনীয় বস্তুপুঞ্জের ওপর ওর নিজের চিন্তাশক্তি কার্য ক'রে আপনা-আপনিই এই রকম কিউব-সাজানো দেওয়ালের বেড়াজাল সৃষ্টি হচ্ছিল—চিন্তার সংযম বা পবিত্রতা অভ্যাস না করলে এই সব নিম্নস্তরে যে ও রকম হয় তা যতীনের জানা ছিল না—যতীন যত ভয় পায়, ততই তার মনের বল কমে যায়—ততই সে নিজের সৃষ্টি কিউবরাশির মধ্যে নিজেই বন্দী হয়। জনৈক উচ্চস্তরের পথিক-আত্মা তাকে সে বিপদ থেকে সেদিন উদ্ধার করেন। সেই থেকে একা পৃথিবীতে আসতে ওর ভরসা হয় না।

আজও বসে ভাবতে ভাবতে আশার জন্যে সহানুভূতি ও দুঃখে ওর মন পূর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু কি করবার আছে তার, অশরীরী অবস্থায় আশার কোনো উপায়ই সে করতে পারে না—অন্তত করবার উপায় তার জানা নেই।

হঠাৎ তার প্রবল আগ্রহ হোল আর একবার সে আশার কাছে যাবার চেষ্টা করবে। এলোমেলো চিন্তা মন থেকে সে দূর করবে—ভেবে ভেবে চণ্ডীর একটা শ্লোক তার মনে পড়লো...

যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

এই শ্লোকটা একমনে আবৃত্তি করতে করতে সে ইচ্ছা করলে যে পৃথিবীতে যাবে—আশাদের বাড়ীতে—আশার কাছে। পরক্ষণেই সে অনুভব করলে সে মহাশূন্যে মহাবেগে কোথায় নীত হচ্চে, গতির বেগে তার শরীরে শিহরণ এনে দিলে, মন মাঝে মাঝে অন্যদিকে যায়, আবার ফিরিয়ে এনে জোর করে চণ্ডীর শ্লোকের প্রতি নিবদ্ধ করে।

এই তো তার শ্বশুরবাড়ীর পুকুর। ঐ তো সামনেই বাড়ী। বড় মজার ব্যাপার। এটা এখনও যতীন বুঝতে পারে না, কি করে সে চিন্তা করা-মাত্রেই ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছে গেল। এরোপ্লেন যারা চালায়, তাদের তো দিক্‌ভুল হয়, হত বিপাকে বেঘোরে কষ্ট পায়—কিন্তু কি নিয়ম আছে এ জগতে যে, জনৈক অজ্ঞ আত্মা শুধু মাত্র চিন্তা দ্বারা গন্তব্য স্থানে এসে পৌঁছয়।

রাত্রি...আশা দোতলার ঘরে ঘুমুচ্চে, ও গিয়ে তার শিয়রে বসলো। খানিকটা পরে দেখলে আশার দেহের মধ্যে দিয়ে ঠিক আশার মত আর একটি মূর্তি বার হচ্চে। যতীন শুনেছিল গভীর নিদ্রার সময় মানুষের সূক্ষ্মদেহ তার স্থূলদেহ থেকে সাময়িক ভাবে বার হয়ে ভুবর্লোকে বিচরণ করে। কিন্তু আশার এই সূক্ষ্মদেহ দেখে যতীন বিস্মিত ও ব্যথিত হয়ে গেল। কি জ্যোতি-হীন, শ্রীহীন, অপ্রীতিকর মেটে সিঁদুরের মত লাল রঙের দেহটা! চোখ অর্ধনিমীলিত, ভাবলেশহীন, বুদ্ধিলেশহীন...একটু পরে সে দেহের চক্ষুদুটির দৃষ্টি যতীনের দিকে স্থাপিত হোল—কিন্তু সে দৃষ্টিতে এমন

কোনো লক্ষণ নেই, যাতে যতীন বুঝতে পারে যে আশা ওকে চিনেচে বা ওর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ও সচেতন হয়েচে। যেন মুমূর্ষু লোকের চোখের চাউনি—যা কিছু বোঝে কিছু বোঝে না, চেয়ে থাকে অথচ দেখে না। যতীন ভুবর্লোকের অল্পদিন-সঞ্জাত সামান্য অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলে, আশার সূক্ষ্মদেহ অত্যন্ত অপরিণত এবং আদৌ উচ্চতর স্তরের উপযুক্ত নয়। সে জিজ্ঞেস করলে—আশা, কেমন আছ? আমায় চিনতে পারো?

আশার চোখে-মুখে এতটুকু চৈতন্য জাগলো না, সে যেন ঘুমুচ্চে। যতীন চতুর্থ স্তরে যেমন অবস্থায় পড়েছিল, আশার ভুবর্লোকে অতি নিম্নস্তরেই সেই অবস্থা। এখন ও যদি পৃথিবীর স্থূল দেহটা হারায়, এ লোকে এসে মহাকষ্ট পাবে, কারণ যে দেহটা নিয়ে এ লোকের সঙ্গে কারবার সে দেহটাই ওর তৈরী হয়নি। সদ্যঃপ্রসূত অন্ধ বিড়াল ইঁদুর ধরবে কেমন করে?

অর্থাৎ আশা অতি নিম্নশ্রেণীর আত্মা। যতীন আরও কয়েকবার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আশাকে সচেতন করবার বৃথা চেষ্টা করে ব্যথিত মনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলে।

সেদিনই বুড়োশিবতলার ঘাটে গঙ্গার ধারে এক ব্যাপার ঘটলো।

## ৯

পুষ্প ও যতীন দুজনে নিজেদের বাড়ীর সামনে বাগানে বসে গল্প করচে। যতীন পুষ্পকে পৃথিবীতে যাওয়ার কথা কিছুই বলেনি। তবুও পুষ্প সব ব্যাপার জানে। পাছে মনে কষ্ট পায় এই জন্যে যতীনকে সে বলেনি যে সে জানে। হঠাৎ আকাশের এক কোণে নীল উজ্জ্বল আলো দেখা গেল—গঙ্গার এপার ওপার, ওদের বাড়ী, ঘর, বাগান, বুড়ো-শিবতলার ঘাট, এমন কি ওপারের শ্যামাসুন্দরীর ঘাট পর্যন্ত সে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। পুষ্প শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—দ্যাখো, দ্যাখো, কোনো দেবতা হচ্চেন—চেয়ে দ্যাখো—

পরক্ষণেই যতীনের মনে হোল একটা বিরাট প্রজ্বলন্ত উল্কা তাদের বাড়ীর অদূরে উন্মুক্ত বনজ লিলির ঝোপের ধারে এত প্রখর আলো বিকাশ ক'রে এসে পড়লো যে, দুজনেরই চোখ ধাঁধিয়ে গেল তার তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল তীব্রতায়।

ওরা আশ্চর্য হয়ে ছুটে গিয়ে দেখলে যে এক মহাজ্যোতির্ময়দেহধারী পুরুষ ঝোপের ধারে বসে পড়েচেন। অমন মহিমময় শ্রী যে পৃথিবীর মানুষের হয় না—তা দুবার দেখে বুঝতে হয় না।

দুজনেই বিস্ময়ে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দূরে থেকে চেয়ে দেখচে, এমন সময় দেবতার নিকট থেকে পুষ্পের নিকট পর্যন্ত একটা ম্যাজেণ্টা রঙের আলোয় চওড়া শিখা সাপের মত কুটিল বক্র আকৃতি ধরে একবার খেলে গেল। একটা বড় দশ ব্যাটারির টর্চের আলো কে যেন একবার টিপে তখনি বন্ধ করলে।

পুষ্প বুঝলে এটা কি। অতি উচ্চশ্রেণীর দেবতাদের বিদ্যুতের ভাষা।

পঞ্চম স্তরের সেই আত্মার কাছে পুষ্প একথা শুনেছিল।

তিনি বলেছিলেন, উদ্ধর্তন লোকে—নবম বা দশম স্তরের ওপরেও যে সব উচ্চ স্তর সেখানে দেববিবর্তনের জীবেরা বাস করেন। মানুষের সর্বপ্রকার ধারণার অতীত তাঁদের ক্রিয়াকলাপ—তাঁদের সে বিরাট জীবনের সম্বন্ধে পৃথিবীর লোকই বা কি, সাধারণ প্রেতলোকের আত্মারাই বা কি, কোনো খবর জানে না। মুখের ভাষায় তাঁরা কথা বলেন না—তাঁদের প্রকাশের ভঙ্গি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আগুনের বা বিদ্যুতের ভাষায় চলে তাঁদের কথাবার্তা।

পুষ্প হাতজোড় করে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। পুনরায় মহাব্যস্ত ও ক্ষিপ্র আর একটা তীব্র বিদ্যুৎ-শিখা ওকে এসে স্পর্শ করতেই ওর মনের মধ্যের চিন্তায় এই প্রশ্ন জাগলো—আমি কোথায়... ?

দেবতাকে দেখা যায় না। তাঁর স্থানে শুধু একটা আলোর মণ্ডলী পরিদৃশ্যমান। পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি পৃথিবীর আত্মিক লোকে।

আবার বিদ্যুতেব শিখা। পুষ্পের মনে পুনরায় প্রশ্ন জাগলো—পৃথিবী কি?

পুষ্প বল্লে—পৃথিবী একটা ক্ষুদ্র গ্রহ, সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

পুষ্পের এ কথাগুলো কি ভাবে দেবতা বুঝলেন, পুষ্প জানে না। বোধ হয় এ উত্তরগুলো চিন্তারূপে দেবতার নিজের মনে জাগছিল। পৃথিবীর ভাষায় অনুবাদ করলে দুজনের কথাবার্তা খানিকটা নিম্নোক্তরূপ দাঁড়ায়। পুনরায় প্রশ্ন হোল—

—বিশ্বের কোন্ অংশে ?

পুষ্প বিপদে পড়ে একমনে সেদিনকার সেই দেবতাকে স্মরণ করলে। এ সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া তার সাধ্যের অতীত।

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! সেদিনকার সেই শৈলশিখরারূঢ় দেবতা তখনই তার সম্মুখে তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে আবির্ভূত হোলেন। পুষ্প প্রণাম করে বল্লে—দেব, আমি সামান্যা মানবী। উনি যে প্রশ্ন করছেন, আমি তার কি উত্তর দেবো? আমার বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তারপর সে দ্বিতীয় দেবতাটির পানে কৃতজ্ঞতা ও বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তিনি সেদিন বলেছিলেন বটে 'স্মরণ করলেই আমি আসবো' পুষ্প একথা বিশ্বাস করেনি। সে মহা অপরাধী দেবতার কাছে—ছি ছি, কি অবিশ্বাসী তার আত্মা!

কিন্তু এ চিন্তা চাপা পড়ে গেল আর এক আশ্চর্য ব্যাপারে। দুই দেবতার মধ্যে যেন তীব্র বিদ্যুৎশিখার ক্ষিপ্র আদানপ্রদান চলচে—পৃথিবীর কোনো ঘটনার উপমাদ্বারাই তার স্বরূপ বোঝানো যাবে না। দুখানা বড় যুদ্ধজাহাজ যেন পরস্পর পরস্পরের ওপর তীব্র অক্সি-হাইড্রোজেন আলোর সার্চলাইট্ বিক্ষেপ করচে! দুই বিরাট দেবতার কথাবার্তা চলছিল। পরে এই কথাবার্তা পৃথিবীর ভাষায় অনুবাদ করে পুষ্পের দেবতা-বন্ধু তাকে যা বলেছিলেন, তা এইরূপ—

পুষ্পের দেবতাবন্ধু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেম—আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনি কে দেব?

আগন্তুক দেবতা বল্লেন—আমি কোথায় আগে বলুন।

—পৃথিবীর আত্মিক লোকে।

—পৃথিবী কি ?

—ক্ষুদ্র গ্রহ, সূর্য নামে একটা নক্ষত্রের চারিধারে ঘোরে।

—বিশ্বের কোন্ অংশে ?

—এ প্রশ্নের কি জবাব দেবো? ছায়াপথ দ্বারা সীমাবদ্ধ যে নক্ষত্রজগৎ তারই এক অংশে। আপনি কোন্ অংশের অধিবাসী?

এর উত্তরে আগন্তুক দেবতা বল্লেন—আমার কথা শুনে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না। আমি বহু, বহু দূরের অন্য নক্ষত্রজগতের অধিবাসী। আমি বহু কোটি বৎসর পূর্বে ভ্রমণে এবং নতুন দেশ আবিষ্কারে বেরিয়েছিলাম। আমার চৈতন্য যতদিন হয়েচে আমার মনে এক অদম্য পিপাসা ছিল বিশ্বের প্রত্যন্ততম সীমা আবিষ্কার করবো। কি কি নতুন দেশ এতে আছে দেখবো। এতকাল ধরে বেগমান বিদ্যুতের অপেক্ষাও দ্রুততর গতিতে শুধু শূন্যে বেড়াচ্চি। সম্প্রতি নক্ষত্রের, গ্রহের, নানা জগতের ও বিভিন্ন

লোকের গোলকধাঁধার অরণ্যে দিশাহারা হয়ে এখানে শক্তিহীন, অবসন্ন ও বিমূঢ় অবস্থায় এসে পড়েচি। নক্ষত্র ও বস্তুজগৎ এখানে এত বেশী কেন? এ দুটি প্রাণী কোথাকার লোক?

—এই দুই জীব পৃথিবীর তৃতীয় স্তরের অধিবাসী। পুরুষটি সম্প্রতি বস্তুতর থেকে আত্মিক স্তরে এসেচে। ওরা নিতান্ত নিরীহ, অজ্ঞ। মেয়েটি কিছু উন্নত—তাও জ্ঞানে নয়, প্রেমে।

যতীন এতক্ষণ শ্রদ্ধায় ভয়ে ও গভীর বিস্ময়ে আড়ষ্ট হয়ে পিছন দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। সে এই কথাবার্তার বিন্দুবিসর্গও বুঝছিল না—তার মনে অত উচ্চ দেবাত্মাদের চিন্তা প্রতিফলিত হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। পুষ্প ওর দিকে চেয়ে কথা বলতে সে বুঝলে যে তার সম্বন্ধে কোনো কথা বলা হচ্চে। সে এগিয়ে এসে প্রণাম করে চুপ করে রইল। এত বড় জ্যোতির্ময় আত্মা সে আর কখনো দেখেনি। দেবতা বল্লেন—উঃ কোথায় এসে পড়েচি। বিশ্বের কোন্ অংশে যে আছি তা কিছুই বুঝতে পারচি নে। তুমি কোন্ একটা গ্রহের নাম করলে? যে নক্ষত্রটার চারিধারে ঘোরে সেটা আমি নতুন দেখলাম। নক্ষত্রটা খুব বড় নক্ষত্রের দলে পড়ে না। এবং ওর আলোও পরিবর্তনশীল, আমি বার কয়েক ওর আলো-কে বাড়তে-কমতে দেখেচি। ওর নাম কি বল্লে—সূর্য!

পুষ্প তার নিজের চিন্তার কিছু অংশ এবার যতীনের মনে চালনা করলে। সে বেচারা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝচে না কোন্ ভীষণ মহাপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে পুষ্প পোড়ারমুখী কথা বলচে। জানুক ও বুঝুক কিছু।

পুষ্পের মনের মধ্যে দিয়ে ওদের কথাবার্তা যতীন বুঝতে পারলে এবং বুঝে অবাক হয়ে গেল। পুষ্প ভাবছিল—এ আবার কত উচ্চস্তরের, কি ধরনের লোক রে বাবা, যে সূর্যের নামটাই শোনেনি কখনো, পৃথিবী তো দূরের কথা!

কথাটা মনে হয়ে তার বড় হাসি পেল। ছিঃ—হাসি সামলে নিয়ে সে বল্লে—আপনার কথা শুনতে বড় আগ্রহ হচ্চে। আপনি আমাদের বাড়ীতে বসে একটু বিশ্রাম করুন। আর দয়া করে বলবেন কি, কি দেখলেন এতকাল ধরে?

আগন্তুক ওদের বাড়ীর বাইরে পাথরের বেঞ্চিতে এসে বসলেন।

যতীন সম্ভ্রমে উদ্‌ভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে হঠাৎ বিনীতভাবে বলে বসলো, একটু চা খাবেন কি সার?

পুষ্প মুখে আঁচল চাপা দিয়ে অতিকষ্টে হাসি দমন করে বল্লে—কি যে তুমি করো যতুদা! পৃথিবীর অভ্যেস্ তোমার এখনও গেল না। চা খাবে কে? আর 'সার' বলচো কাকে?

যতীন অপ্রতিভ হয়ে অধিকতর বিনীত ভাব ধারণ করলে।

এই দুই নবদৃষ্ট আত্মার কাণ্ড দেখে আগন্তুক দেবতার মন কৌতুকে ও আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠলো। কোথাকার জীব এরা, অথচ দ্যাখো কি সুন্দর হাসে! মহামহেশ্বরের বিচিত্র সৃষ্টি শুধু বিরাটতার দিক থেকেই নয়, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যেও এর কি রহস্যময় মূর্তি। এরা কেন হাসচে, কি নিয়ে কথা বলচে তা তিনি বুঝতে পারছিলেন না। আর একটা কথাও তিনি বোঝেননি, তাই এখন পুষ্পকে প্রশ্ন করলেন—গ্রহের জড়লোক আর আত্মিক-লোক কি বলচো, বুঝতে পারলাম না তো? কি সেটা?

পুষ্প বল্লে—প্রভু, আমরা যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি, তখন আমাদের দেহ অন্য পদার্থ দিয়ে তৈরী হয়। সে দেহ স্থূল, সেখানকার সব জিনিসই সেই ধরনের স্থূল পদার্থে গড়া। তারপর একটা সময় আসে, যখন সেই স্থূল দেহটা নষ্ট হয়ে যায়—তখন

আমরা এই আত্মিক লোকে আসি। কেন, প্রভু. আপনি কি এ জানেন না?

দেবতা বল্লেন—শনেচি বটে এমন হয় কোনো কোনো গ্রহের জীবের ক্ষেত্রে, আমার অভিজ্ঞতা নেই। আমায় সেখানে একবার নিয়ে যাবে—তোমাদের এই পৃথিবী গ্রহের জড়লোকে?

—কিন্তু সেখানে আপনি যেতে পারবেন দেব অত স্থূল রাজ্যে?

দেবতা হেসে বল্লেন—আমি পথিক। কত বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে দিয়ে চলা অভ্যেস্ করতে হয়েচে আমাকে, তবে বিশ্বভ্রমণ করা সম্ভব হয়েচে। নইলে তোমাদের এই যে যাকে বলচো আত্মিকলোক, এখানেই কি আমি আসতে পারতাম? জড়বস্তুর নিবিড় প্রকাশ আত্মার ক্ষেত্রে আমি দেখেচি অন্য অনেক গ্রহে। চল, যাই।

একটু পরে ওরা তিনজনে পৃথিবীর দিকে চললো। পৃথিবীর নিকটে এসে দেবতা বল্লেন—উঃ, মেঘের মত কি সব বিশ্রী চিন্তার ধোঁয়া চারিদিকে! তোমরা দেখতে পাচ্চ না?

যতীন তো কিছুই দেখতে পায় না—পুষ্প জানে, পৃথিবীর মানুষের পাপের ও দুঃখের নানারকম চিন্তার মেঘ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে জমা হয়ে মাঝে মাঝে পৃথিবীতে যাতায়াতের সময় তাকে কষ্ট দিয়েচে। তবুও সে পৃথিবীরই জীব, তার ততটা কষ্ট হয় না, যতটা ইনি পাবেন।

যেখানে ওরা গিয়ে নামলো সেটা ভারতবর্ষের বিহার অঞ্চলের একটা ছোট গ্রাম। মহিষদল মাঠে চরাচ্চে রাখালরা। তিনজন মেয়েমানুষ একটা ভুট্টাক্ষেতের ধারে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করচে। পৃথিবীতে ভাদ্রমাস। শরতের বেশ পরিষ্কার নীল আকাশ, বন্যাব জল এসে নেমে গিয়েচে, গ্রামের মধ্যে গৃহস্থবাড়ীর উঠানে পচা কাদা। একটা বাড়ীতে মকাই-এর মরাই-এর মধ্যে জল ঢুকে মকাই-এর দানা পচিয়ে ফেলেচে বলে বাড়ীর মেয়েরা মকাইগুলো নামিয়ে ঝাড়চে।

দেবতা বল্লেন—কি আশ্চর্য! এদের গতি এতটুকু জায়গায় সীমাবদ্ধ! এর চেয়ে দ্রুত যেতে পারে না?

কাটিহার থেকে মুঙ্গেরগামী একখানা ট্রেন এসে পড়লো। দেবতা বিস্ময়ের সুরে বল্লেন—ও ব্যাপারটা কি?

—মানুষে ওই গাড়ীটা তৈরী করেচে। ওকে বলে রেলগাড়ী। খুব জোরে মানুষকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যায়, প্রভু।

দেবতা কৌতুকের দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—ওই কি দ্রুত যাওয়ার নমুনা? নমুনা দেখে তো খুব আশা হয় না এদের দ্রুতগামিতার ভবিষ্যৎ ইতিহাস সম্বন্ধে। ওর নাম কি জোরে যাওয়া?

এক জায়গায় দুটি ছোট ছেলেমেয়ে ভুট্টাক্ষেত থেকে ভুট্টা চুরি করে খেতে গিয়ে ক্ষেত্রস্বামীর হাতে পড়ে খুব মার খাচ্চে দেখে দেবতা বল্লেন—আহা, কচি ছেলেমেয়ে দুটিকে অমন করে মারচে কেন? পরে তিনি ক্ষেত্রস্বামীর মনে সদয় চিন্তা বিক্ষেপ করতে চেষ্টা করলেন। স্থূল দেহের স্থূল মনে প্রথমেই কোনো কার্যকরী হোল না—কিন্তু অসাধারণ শক্তিশালী দেবতার মনের জোরে তাকে সৎ চিন্তার প্রেরণা স্পর্শ করলে। সে ছেলেমেয়ে দুটিকে ছেড়ে দিয়ে বল্লে—আচ্ছা, যা, নিয়েচিস্ যা তা এবারকার মত নিয়ে যা—আর কখনো আসিসনে।

দেবতা বল্লেন—আহা, এদের তো বড় কষ্ট! কি অদ্ভুত এই সৃষ্টি! যত দেখচি ততই এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে যাচ্চি। আমার কি ইচ্ছে হচ্চে জানো—এদের মধ্যে মানুষ হয়ে

থাকি। এদের দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করি।

পুষ্প বল্লে—দেব, নিকটের এই পাহাড়ের চূড়াটাতে বসে আপনার ভ্রমণের গল্প একটু করবেন দয়া করে? শুনবার বড় ইচ্ছে হচ্চে।

ভাদ্র মাসের গঙ্গা কূলে কূলে ভরা। বিকেল হয়েচে। পশ্চিম দিগন্তে জামালপুরের পাহাড়ের পিছনে রঙীন্ মেঘস্তূপের আড়ালে সূর্য অস্ত যাচ্চে।

পাহাড়ের মাথায় ছোট ছোট জঙ্গল। একটা ফাঁকা জায়গায় বন্য হরীতকী গাছের তলায় ওরা বসলো। নীচে গঙ্গার ধারে একটা পাট-বোঝাই ভড়ের মাঝিমাল্লারা রান্না-বান্নার উদ্যোগ করছিল। যতীন ভাবছিল—এই তো বৃহত্তর জীবন, মৃত্যুর পরে যা সে লাভ করেচে। কোথায় বাংলাদেশের এক ছোট্ট গ্রামে সে ছিল বন্দী, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেল তার জীবন—পৃথিবীর অতীত কত লোকে কত স্তরে এমনি কত নিস্তব্ধ শরৎ দুপুরে, অপরাহ্ণে, কত বসন্তদিনের আসন্ন বেলায়, কত জ্যোৎস্নারাত্রিতে তার ইচ্ছামত অভিযান ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে জমা রয়েছে! এমন সব সুখের দিনে শুধু মনে হয় সেই হতভাগী—

দেবতা তাঁর ভ্রমণের কাহিনী বলতে লাগলেন।

সে ভারি চমৎকার কথা তাঁর সব কথা পুষ্প বা যতীন বুঝতে পারছিল না। তবুও তারা মুগ্ধ হয়ে গেল তাঁর উৎসাহদীপ্ত মুখের ভঙ্গীতে, কথার সুরে। কত লক্ষ বৎসর পূর্বে তিনি বেরিয়েচেন বিশ্বভ্রমণে। কত গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্রজগৎ, কত ছায়াপথ, নীহারিকাপুঞ্জ মানসগতিতে ভ্রমণ করচেন। আলো বা বিদ্যুতের সেখানে পৌঁছতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগে—সে সব সুন্দর নক্ষত্রমণ্ডলী পার হয়েও লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের অঞ্চলে চলে গিয়েচেন। তখনও দেখেছেন বহু দূরে আর এক অজানা বিশ্বের সীমা মহাশূন্যের প্রান্তে আবছায়া দেখা যায়। আবার সে বিশ্বেও পৌঁছেচেন, আবার অগণিত নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকারাজির মধ্যে দিয়ে দেবতার অমিত গতিতে বহু শত বৎসর ধরে ছুটে গিয়ে যেমন তার সীমা ছাড়িয়েচেন, আবার দূরে দেখতে পেয়েচেন আর এক রহস্যময় অজ্ঞাত বিশ্বের ক্ষীণ সীমান্তবর্তী ক্ষীণালোক তারকামণ্ডলী। কত প্রজ্বলন্ত নক্ষত্র, কত স্বয়ম্প্রভ বাষ্পমন্ডলী লক্ষ লক্ষ যোজন বিস্তৃত হয়ে রয়েচে শূন্যের দিগন্ত থেকে দূর দিগন্তে...অবশেষে এই বর্তমান বিশ্বটায় পৌঁছে গ্রহনক্ষত্রের গোলকধাঁধার মধ্যে কিছু দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন।...

পুষ্প বল্লে—আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন?

দেবতা বল্লেন—তা অসম্ভব। এই গ্রহের বিভিন্ন আত্মিক স্তর ছেড়ে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। এর আকর্ষণে টেনে রাখবে। সে দেহ তোমাদের তৈরী হয়নি। তবে আর কিছুকাল অপেক্ষা কর। কাছাকাছি বহু অদ্ভুত জগৎ আছে, সেখানে তোমাদের নিয়ে যাবো; আমায় স্মরণ ক'রো না—তাতে আমি আসবো না। যখন তোমরা তার উপযুক্ত হয়েচ বুঝবো—আমি নিজেই আসবো। এখন আমি যাই। আর একটা বিষয়ে সাবধান থেকো, তোমরা দেখতে পাচ্চ না, আমি পাচ্চি, তোমাদের এই গ্রহটার চারিদিক ঘিরে একটা বিরাট শক্তিশালী চৌম্বক ঢেউ বইচে, সেটা সব সময় তোমাদের ঐ পৃথিবীর দিকে টানচে! এই ঢেউএ পড়লে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে ঐ পৃথিবীর জড়লোকে তোমাদের ফেলে পুনরায় জড়দেহ ধারণ করাতে বাধ্য করবে। এটাকে পুনর্জন্মের ঢেউ বলা যেতে পারে। খুব সাবধান। বিশ্বের সীমা আবিষ্কার করবার যার আগ্রহ, সে যেন ক্ষুদ্র গ্রহের স্থূলস্তরে আবার স্থূল জড়দেহ ধারণ না করে।

পুষ্প ও যতীন দুজনে প্রণাম করলে। পুষ্প বল্লে—আবার যেন আপনার দেখা পাই, দেব।

পরমুহূর্তে দেবতা অন্তর্হিত হলেন।

পুষ্প বল্লে—দেখলে তো? শুনলে? ওই সেই চুম্বকের ঢেউ। আমাদের এক দেবতা বলেছিলেন অনেক দিন আগে। তোমাকে একবার পঞ্চম স্তরে নিয়ে যেতে যেতে বিপদে পড়েছিলুম, তুমি অজ্ঞান হয়েছিলে—মনে আছে? সেইবার তাঁর সঙ্গে দেখা।

১০

একদিন গঙ্গার ঘাটে বসে থাকার সময় যতীন দেখে অবাক হয়ে গেল যে দিব্যি চমৎকার জ্যোৎস্না উঠলো। একেবারে পৃথিবীর পূর্ণিমার জ্যোৎস্না। তার শুভ্র আলোর ঢেউ পড়লো গঙ্গাবক্ষে, পড়লো গিয়ে ওপারের শ্যামাসুন্দরী মন্দিরের সর্বাঙ্গে, তীরের প্রাচীন বটের মাথায় ডালের ফাঁকে ফাঁকে।

যতীন ভাবলে—এ আবার কি? জ্যোৎস্না তো কখনো এখানে দেখিনি! এখানে রাত্রিই বা কি, দিনই বা কি!

এমন সময়ে পুষ্প হাসতে হাসতে পাশে বসে বল্লে—কেমন জ্যোৎস্না হয়েচে দেখ; মনে পড়ে তুমি আর আমি কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাটে এমনি জ্যোৎস্নারাতে কত বসে ইলিশমাছ ধরা দেখতাম?

—কিন্তু জ্যোৎস্না উঠলো কোথা থেকে? চাঁদ এল কি করে?

—তৈরী করলুম জ্যোৎস্নাটা। ভাবলুম তোমার সঙ্গে একদিন জ্যোৎস্নারাতে ঘাটে বসা যাক। কেমন, বেশ হয়নি?

—আচ্ছা পুষ্প, যে কোনো ঋতু, যে কোনো সময়কে তৈরী করতে পারো? এ তো অদ্ভুত!

—সময় এখানে মনের দ্বারা সৃষ্টি করা যায়, যেমন অন্য সব জিনিস করা যায়। সে তো তুমি চোখের ওপর দুবেলা দেখচো। আচ্ছা যতুদা, সাগঞ্জ-কেওটার কথা মনে পড়ে?

—খুব পড়ে পুষ্প। সেই একবার আমি গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম মনে আছে? তোর কি কান্না! সত্যি আমি এক একবার ভাবি জীবনে কি পুণ্য না জানি করেছিলুম যে তোর মত মেয়ের সঙ্গ পেয়ে ধন্য হয়েছি। আমার এখনও মনে হয় এ সব স্বপ্নই বা।

পুষ্প লজ্জিত সুরে বল্লে আহা!

পুষ্প বুঝতে পারে যে, যতীন আশার কথা ভাবচে, ঘাটে এসে বসেই তার কথা ওর মনে হয়েচে। যত উচ্চ স্তরের আত্মাই হোক, পুষ্প মেয়েমানুষ, তার মনটা হু হু করে ওঠে। যতুদাকে সে আবাল্য ভালবাসে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে কিন্তু যতুদা তার চেয়ে যে আশা-বৌদিকে বেশী ভালবাসে, একথা সে জেনেও মনে স্থান দেয় না বেশীক্ষণ। উপায় কি? এই তার অদৃষ্টলিপি, নইলে সে ছেলেবেলায় পৃথিবী ছেড়ে, যতুদাকে ছেড়ে আসবে কেন? যতীনের গত তেরো বছরের জীবনে পুষ্প ছিল না, ছিল আশা—এ অবস্থায় আশার সঙ্গেই যতীনের মনের যোগ অনেক গাঢ়বদ্ধ। কারো কোনো দোষ নেই।

পুষ্পের মনে দুঃখের ছায়া এসে পড়তেই বাইরের জ্যোৎস্না ক্রমশ ম্লান হয়ে এল। মন প্রফুল্ল না থাকলে মানসিক সৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হবেই।

হঠাৎ পুষ্প যতীনের দিকে চেয়ে বলে—একটা কথা ভুলে গিয়েছিলুম, যতুদা। আজ কল্প-পর্বতের গান বাজবার দিন। চল তোমাকে শুনিয়ে আনি। সে এক অদ্ভুত জিনিস।

ওদের স্বর্গ থেকে বেরিয়ে ওরা শূন্যে বেয়ে চললো। বহুদূরে একটা সবুজ নক্ষত্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে পুষ্প বল্লে—ওইখানে আমাদের যেতে হবে। ওই দিকে একদৃষ্টে

চোখ রেখে ভাবো যে আমরা ওখানে যাবো।

নক্ষত্রটা যেন ক্রমে বড় হচ্চে, যতীনের মনে হোল সে সবেগে ওর দিকে নীত হচ্চে। কি অদ্ভুত এ যাত্রা। যতীন অবাক হয়ে চেয়ে দেখছিল অনেক দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড গ্রহ ডুবে ডুবে ঘুরচে।

পুষ্প বল্লে—এই হচ্চে শুক্রগ্রহ—সন্ধ্যাবেলা সেটাকে পশ্চিম আকাশে দেখা যায়। আকাশের রং এখানে নীল নয়, অনেকটা ধূসরমিশ্রিত বেগুনী। শূন্যপথে অনেক আত্মা তাদের মতই যাওয়া আসা করচে, তবে তাদের মধ্যে কেউই উচ্চশ্রেণীর নয়, ওদের রং দেখে শ্রেণী ঠিক করতে শিখে গিয়েচে যতীন। এ সব আত্মার রং খানিকটা খানিকটা মেটে সিঁদুরের মত লাল। খুব সাধারণ শ্রেণীর আত্মা। তবে নিম্ন শ্রেণীর আত্মা এখানে আসে না। তাদের দ্বিতীয় স্তরের নিম্ন পর্যায় ছাড়িয়ে ওঠবার সাধ্যই নেই।

হঠাৎ যতীন বল্লে—সে পাহাড় তো চতুর্থ স্তরে, সেখানে পৌঁছে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বো না পুষ্প?

পুষ্প হেসে বল্লে—তাহলে তোমায় কি আনতুম যতুদা? সেবার তুমি যেখানে অজ্ঞান হয়েছিল, সেটা চতুর্থ স্তরের ঊর্দ্ধলোক। চতুর্থ স্তরে ঠিকই ছিলে। চতুর্থ স্তরে সেই নীল হ্রদ দেখেছিলে, যেখানে দেব-দেবীরা স্নান করছিলেন।

যতীন বল্লে—কই, কোথায় দেবদেবীরা স্নান করছিলেন আমি তো দেখিনি? তখন থেকেই আমার জ্ঞান চলে যাচ্ছিল তাহলে।

ওদের কথা শেষ হতে না হতেই যতীন দেখলে তারা একটা অত্যন্ত সুন্দর দেশে এসে পৌঁছেচে।

দেশটার চারিদিকেই চক্রবাল রেখার কূলে কূলে নীল পাহাড়। গাছপালা সেখানে আদৌ তৃতীয় স্তরের মত নয়—কোনোটার রং নীল, কোনোটার বেগুনী, কোনোটার সোনালী; ফুলফল যেন রঙীন আলো দিয়ে গড়া। পাহাড়ের মাথায় মাথায় যেন জ্বলন্ত রঙীন্ আলোর মেলা। পুষ্প একটা গাছের ফুল তুলে ওকে দেখালে, তুলবা মাত্র বোঁটায় আর একটা ফুল কোথা থেকে এসে শূন্যস্থান পূর্ণ করলে। আরও একটা আশ্চর্য ব্যাপার, প্রান্তরের ও শৈলসানুর সব ফুল মুহূর্তে মুহূর্তে স্পন্দিত হচ্চে, যেন চারিদিকে রাশি রাশি লক্ষ লক্ষ নানা বিচিত্র বর্ণের জোনাকি নিবচে জ্বলচে। পাখী-গুলো যখন আকাশে উড়চে, তাদের ডানায় যেন সাতরঙা রামধনুর খেলা। এদেশে বাতাসে একটা অদ্ভুত শান্তি ও আনন্দের বার্তা—একটা বিচিত্র জীবন-উল্লাসের ইঙ্গিত।

যতীন একটা জিনিস লক্ষ্য করলে, এখানকার দৃশ্য যে রকম, পৃথিবীতে এ দৃশ্য কল্পনাও করা যায় না। এর কোনো জিনিস পৃথিবীতে নেই।

পুষ্পকে সে কথাটা বল্লে।

—পৃথিবীর সঙ্গে খুবই কম মিল এ দেশের, না, পুষ্প?

পুষ্প বল্লে—যতুদা, এর একটা সহজ কারণ আছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের আত্মারা পৃথিবী থেকে সদ্য এসেচে। পৃথিবীর স্মৃতি তখনও তাদের কাছে ম্লান হয়নি। যখন তারা মানসলোক সৃষ্টি করে, পৃথিবীর সেই স্মৃতি তাদের অনেকখানিই সাহায্য করে। কাজেই তাদের তৈরী স্বর্গ হয় পৃথিবীরই অবিকল নকল। কিন্তু এই সব স্তরের আত্মাদের মনে পৃথিবীর স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে এসেচে—অনেকের নেই বল্লেই হয়। কাজেই তারা যখন গড়ে—নিজেদের কল্পলোক নিজেদের কল্পনা থেকে গড়ে। তাই সব হয় নতুন, সবই হয় আজগুবি। এ সবই যা দেখচো এ স্তরের অধিবাসীদের সৃষ্টি—ওই পাহাড়পর্বত, গাছপালা, ফুল, পাখী, সাধারণ দৃশ্য—সব।

—কিন্তু তোমার মানুষজন কই? একজনেরও তো সাক্ষাৎ নেই।

—তাঁরা ইচ্ছে না করলে এ স্তরের আত্মাকে তুমি সহজে দেখতে পাবে না যতুদা। কম্পপর্বতের কাছে যাকে আমরা চুম্বকশক্তির ঢেউ বলি—তা অত্যন্ত প্রবল। সেখানে গেলে তোমার দেহ শক্তিমান হবে, তখন খুব উচ্চ স্তরের আত্মাকেও অল্পক্ষণের জন্যে—মানে মাত্র যতক্ষণ সেই পর্বতের কাছে থাকবে ততক্ষণের জন্যে—দেখতে পাবে।

অল্প পরেই একটা অনুচ্চ পর্বত সামনে দেখা গেল, তার ওপরটা অনেকখানি সমতল। সেই সমতল জমিটুকুর ওপর যে দৃশ্য চোখে পড়ল যতীনের, তাতে সে বিস্মিত, মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হয়ে গেল।

সেখানে বহু দেবদেবী একত্র হয়েচেন। তাঁদের অঙ্গের জ্যোতি ও রূপে সমস্ত ভূমিশ্রী আলোকিত হয়ে উঠেচে, সমগ্র বায়ুমণ্ডল (যদি এখানে বায়ুমণ্ডল বলে কোনো কিছু থাকে) তাঁদের দেহনিঃসৃত উচ্চ বৈদ্যুতিক শক্তির স্পন্দনে মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের নির্ঝর হয়ে উঠেচে যেন, দেহগন্ধের সুরভিতে বহুদূর পর্যন্ত আমোদিত।

যতীন এ পর্যন্ত এত উচ্চ জীবের একত্র সমাবেশ কখনো দেখেনি। সে চুপি চুপি বল্লে—এ যে ওঁদের দস্তুরমত ভিড় লেগে গিয়েচে দেখ্‌চি, পুষ্প! উঃ—

সবাই যেন কিসের অপেক্ষা করচে। সকলের চোখ বাঁ দিকের একটা খুব উঁচু পাহাড়ের দিকে নিবদ্ধ। যতীন বল্লে—ও পুষ্প, এ যেন ফোর্টের র‍্যামপার্টে দাঁড়িয়ে মোহনবাগানের ম্যাচ দেখতে এসেচে সব—আহা, টিকিট কিনতে পায়নি বেচারীরা!

পুষ্প তিরস্কারের সুরে বল্লে—নাঃ, তুমি জ্বালালে যতুদা—চুপ করে থাকো না কেন ছাই।

যতীন কি বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করে গেল।

বাঁ ধারের সেই পাহাড়ের চূড়া থেকে এক অপূর্ব, মধুর শব্দের ঢেউ উত্থিত হোল। দেবদেবীরা সকলে অবনতমস্তকে শুনতে লাগলেন। কেউ কেউ পাহাড়ের ঢালুর রঙীন স্বয়ম্প্রভ তৃণদলে শুয়ে পড়লেন অলসভাবে। কেউ বসে দুহাতে মুখ ঢাকলেন। বেশীর ভাগই কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন।

সে মধুর শব্দ কণ্ঠসঙ্গীত নয়, যন্ত্রসংগীতের মত শব্দটা। কিন্তু পরিচিত কোন যন্ত্রে বাদিত সংগীত নয়। অত্যন্ত রহস্যময় তার উৎপত্তিস্থল। যেন গঙ্গার ধারা,—কোন্ উচ্চ পর্বতের তুষারপ্রবাহে তার জন্ম, কেউ খবর রাখে না। যতীনের সর্বাঙ্গ বার বার শিউরে উঠতে লাগলো।

শুনতে শুনতে যতীনের মনে হোল সে আর পৃথিবীতে বদ্ধ আত্মা নয়—সে উচ্চ অমৃতের অধিকারী দেবতা হয়ে গিয়েচে, সে মুক্ত, সে বিরাট—তার আত্মা সারা বিশ্বকে ব্যেপে সচেতন হতে চায়, তার বিরাট হৃদয়ে সকল পাপী তাপী, মূর্খ ও নিন্দুকের স্থান আছে, পতিতের উদ্ধার করতে যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্মেচে, তাদের দুঃখে যুগে যুগে করেচে মৃত্যুবরণ। বিশ্বের মহাদেবতার প্রেমিক পার্শ্বচর সে—সে নৃত্যশীল গ্রহ-নক্ষত্রের বিচিত্র নৃত্যচ্ছন্দে লীলাময়, পবিত্র, প্রেমিক, মুক্ত দেবতা। একি আনন্দ! একি শিল্পমাধুর্য! একি অভিনব অননুভূতপূর্ব অমরতা!

কোনো দিকে কেউ আর দাঁড়িয়ে নেই...সবাই বসে পড়েচে...নিস্তব্ধ চারিদিক .. মধুর অশরীরী রহস্যময় মোহিনী সংগীতলহরী কখনও উচ্চে, কখনও মৃদুস্বরে একটানা বয়ে চলেচে...বিরাম নেই...বিরতি নেই পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই তার বর্ণনা নেই...কতক্ষণ সময় কেটে গেল তার লেখাজোখা নেই—অনন্তকাল ধরে অমন সংগীত-প্রবাহিণী গোমুখী-নির্গত ভাগীরথীধারার মত বয়ে চলেচে...চলেচে। যতীনের মনের কোন্ গুপ্ত কক্ষের গভীর অনুভূতির দ্বার খুলে গেল। সে দেখতে পেল তার পৃথিবীতে যাপিত আরও অনেক পূর্ব জীবন...এই অনন্ত জীবনপ্রবাহে সে যুগ-

যুগান্তর ধরে ভাবের ও প্রেমের স্রোতে বয়ে আসচে...আশা কি এক জন্মের আশা, না পুষ্প এক জন্মের পুষ্প? কত যুগ ধরে ওরা যে ওর নিত্যসঙ্গিনী, ওর জীবনে ছন্দে গাঁথা ওদের জীবন—কতবার কত বিরহ-মিলন হাসি-অশ্রুর মধ্যে দিয়ে ওদের সঙ্গে কত-বার দেখাশোনা, কতবার ছাড়াছাড়ি—কত বিস্মৃত মরুদ্বীপে, কত শ্যামল পল্লীর কুঞ্জে কুঞ্জে, কত ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর তীরের কুটীরে, কত পাহাড়ের নীচেকার আদিম কালের গুহায়...কত রাজার রাজপ্রাসাদে...কত দশার্ণ গ্রামে ব্যাধরূপে, কত শারদ্বীপে ক্রৌঞ্চ-মিথুন রূপে, কত কুরুক্ষেত্রে বেদগায়ক ব্রাহ্মণরূপে...

যতীন দেখলে পুষ্প কাঁদচে...ও নীরবে পুষ্পের হাতে হাত দিয়ে তাকে নিজের কাছে সস্নেহে নিয়ে এল...

তারপর কখন সে অপূর্ব সঙ্গীত থেমে গিয়েচে, বিচিত্ররূপী জ্যোতির্ময় জীবেরা মহা-শূন্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েচেন...কখন জ্যোৎস্নার আলোতে সারা দেশ ভরে গিয়েচে যতীনের খেয়াল নেই...জ্যোৎস্না, জ্যোৎস্না... বহু পূর্ণিমার সম্মিলিত জ্যোস্নালোক চারিদিকে...

যতীন বল্লে—পুষ্প, চল ওঠো।

## ১১

ওরা কিছু দূরে মাত্র এসেচে—এক জায়গায় দেখলে মাটির বুকে যেন চাঁদ খসে পড়েচে।

দুজনে কাছে গিয়ে দেখলে, পরমরূপসী এক দেবী ঘাসের ওপর বসে হাপুস নয়নে কাঁদিচেন। ওরা অবাক হয়ে গেল। এত উচ্চস্তরের দেবীর দুঃখ কিসের?

যতীন জিজ্ঞেস্ করলে—মা, আপনার কোনো সাহায্য করতে পারি?

দেবী ওদের দিকে চাইলেন। যতীনের মনে হলো দেবী কি সাধে হয়? এত রূপ এত জ্যোতি এত মহিমা—অথচ কি মমতা, করুণা, দীনতায় ভরা দৃষ্টি!

বল্লেন—পারবে?

দুজনেই বলে উঠলো—হুকুম করুন, আপনার আশীর্বাদে পারবো।

দেবী বল্লেন কল্পপর্বত থেকে ফিরচো? তোমরা কোথায় থাকো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা এর নীচের স্বর্গে থাকি, তৃতীয় স্তরে।

—কি মধুর সঙ্গীত! শুনলে?

যতীন বল্লে—শুনলাম, মা। আমি বেশীদিন পৃথিবী ছেড়ে আসিনি। এই ব্যাপরটা কি আমায় একটু বলবেন দয়া করে?

দেবী বল্লেন—বলবো এর পরে। এখন বলি শোনো। আমি থাকি অন্য নক্ষত্রলোকে। পৃথিবীর এক জায়গায় মানুষের ভয়ানক কষ্ট। আমি সে দেশে জন্মেছিলুম হাজার হাজার বছর আগে। তাদের দুঃখে, আর আজ কল্পপর্বতের সঙ্গীত শুনে, আমার মন বড় ব্যাকুল হয়েচে। চলো যাই পৃথিবীতে, দেখি কি করা যায়—কিন্তু মুশকিল হয়েচে এই যে আমি এতকাল আগে পৃথিবী থেকে চলে এসেচি, জড় জগতের সঙ্গে সম্পর্ক এতকাল হারিয়েচি যে, সরাসরি ভাবে কোনো কাজই সে জগতে করতে পারি নে। মধ্য-বর্তী স্তরের আত্মার সাহায্য ভিন্ন আমি পৃথিবীতে গিয়ে কি করবো? তোমরা যদি যাও—

ওরা বলে উঠলো, নিশ্চয়ই যাবো মা!

দেবী বল্লেন—একটু অপেক্ষা কর। আমার এক সঙ্গী আছেন—তিনি আমার লোকেই থাকেন, উচ্চ স্তরের জীব, পৃথিবীতে গিয়ে শুধু আঁকুপাঁকু করেন, কিছু করতে পারেন না কাজে। পৃথিবীর জড়স্তরে আমরা সংস্পর্শ স্থাপন করতে পারি নে। তিনি প্রাচীন যুগের একজন বড় কবি ছিলেন। তাঁকে নিয়ে যাই চলো। এসো আমার সঙ্গে।

আবার নীল শূন্যে যাত্রা।...বহু দূরে একটা ক্ষীণ নক্ষত্র জ্বলছিল। দেবী সেই নক্ষত্র লক্ষ্য করে চললেন। পরক্ষণেই এক সুন্দর উপবন। এক ক্ষুদ্র নদী বয়ে যাচ্ছে উপবনের মধ্য দিয়ে—লতাপাতা কিন্তু পৃথিবীর মত শ্যামল—পৃথিবীরই যেন এক শান্ত প্রাচীনকালীন তপোবন। মৃগকুল নির্ভয়ে খেলা করে বেড়াচ্চে, লতায় লতায় বিচিত্র বন্য পুষ্প প্রস্ফুটিত। এক সৌম্যমূর্তি জ্যোতির্ময় আত্মা লতাবিতানে বসে কি যেন লিখচেন। দেবী ওদের নিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড় করালেন। মুখ তুলে চাইতেই যতীন ও পুষ্প এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে প্রণাম করলে।

দেবী বল্লেন— কল্পপর্বতের পথে এদের সঙ্গে দেখা। পৃথিবীতে নিয়ে যাবো তাই সঙ্গে করে আনলাম।

যতীন ও পুষ্পের দিকে চেয়ে দেবী বল্লেন—রামায়ণ-রচয়িতা কবি বাল্মীকি তোমাদের সামনে।

ওরা দুজনেই চমকে উঠলো। মহাকবি বাল্মীকি!

দেবতা স্মিতহাস্যে ওদের বসতে বল্লেন। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—এই আমার আশ্রম। ওই পাশেই তমসা নদী। ওই আমার গৃহ। পৃথিবীতে যা আমার প্রিয় ছিল এখানে তাই সৃষ্টি করেচি, ওই আমার স্বর্গ। আর তোমাদের সামনে ইনি আমার মানস-দুহিতা—সীতা, যিনি তোমাদের সঙ্গে করে এনেচেন।

পুষ্প, যতীন বিস্মিত, স্তব্ধ। ভারতবর্ষের ছেলেমেয়ে তারা। সীতার নামে ওদের সর্ব শরীরে বিদ্যুতের ঢেউ বয়ে গেল। কত যুগ ধরে ভারতের আকাশ বাতাস যে পুণ্য নামে মুখরিত, সেখানকার বনের পাখীও যে নামে গান গায়, সেই ভগবতী দেবী জানকী তাদের সম্মুখে! এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম?

বাল্মীকি বল্লেন—তোমরা বিস্মিত হয়েচ। বোধ হয় এ লোকে বেশী দিন আসনি। সীতাকে আমি সৃষ্টি করেচি। যা ছিলেন পৃথিবীতে আমার কল্পনার মধ্যে—এ লোকে তা মূর্তিমতী হয়েচেন।

যতীন বল্লে—বুঝতে পারলাম না, দেব।

—এ লোকে চিন্তার দ্বারা জীবের সৃষ্টি করা যায়। শুধু যে বাড়ীঘর করা যায় তাই নয়, স্থানের ও সময়েরও সৃষ্টি করা যায়।—আমার আশ্রমের সময় কি দেখচো?

—আজ্ঞে, সন্ধ্যা গোধূলি।

—আমার সময় সন্ধ্যা গোধূলি। আমি ভালবাসি গোধূলি। আমার কল্পনা এই সময় জাগ্রত হয়। তাই আমার আশ্রমে সব সময় গোধূলি।

—আচ্ছা দেব, শ্রীরামচন্দ্র তবে কোথায়?

—সীতাকে যত আন্তরিক আগ্রহ নিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম, রামচন্দ্রকে তত সহানুভূতি নিয়ে গড়িনি। তাই আমার স্বর্গে আমার প্রিয়তম সৃষ্টি সীতাই আছেন, রামচন্দ্র নেই। লক্ষ্মণ নেই, ভরত নেই,—কেউ নেই।

—তবে কি, দেব, সীতা বা রামচন্দ্র সত্যি সত্যি কেউ ছিলেন না?

—হয়তো ছিলেন। আমি তাঁদের জানি না। আমার কাব্যের রাম, আমার কাব্যের সীতা—আমারই সৃষ্ট জীব। ও প্রায়ই আমার এখানে আসে। নানা কাজে সারা জগৎ ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু আমায় ভোলে না।

করুণা দেবী বল্লেন—বাবা, ওসব এখন রাখো। পৃথিবীতে যাবে?

বাল্মীকি বল্লেন—তুই তো জানিস, পৃথিবীতে গিয়ে আমি কিছু করতে পারিনে। বহুকাল আগে ভবভূতিকে প্রভাবান্বিত করে একখানা কাব্য লিখিয়েছিলাম—চমৎকার

কাব্য হয়েছিল। আর বাংলাদেশের মধুসূদনকে দিয়ে আর একখানা কাব্য লেখাতে গিয়েছিলুম—কিন্তু বেশী প্রভাবান্বিত করতে পারিনি—গিয়ে দেখি কয়েকটি ভিন্নদেশীয় কবি তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েচেন। তাঁদের প্রভাবই তার ওপর বেশী কাজের হোল। আমি গিয়ে ফিরে এলাম। তুই একাই যা মা—এদের নিয়ে যা—এই ছেলেমেয়ে দুটিকে। এরা নতুন পৃথিবী থেকে এসেচে—এদের দিয়ে কাজ ভাল হবে।

পুষ্প বল্লে—চলুন দয়া করে, যেখানে আমাদের নিয়ে যান যাবো।

ওরা কিছুক্ষণ পরে পৃথিবীতে এসে পৌঁছলো। পৃথিবীতে তখন সকাল দশটা, কিন্তু দেশটা খুব শীতের দেশ। রৌদ্রের মুখ দেখা যায় না। কুয়াশায় চারিদিক ঘেরা। প্রথমে একটা গ্রামে ওরা গিয়ে পৌঁছলো—সেখানে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়েচে। প্রত্যেক বাড়ীতে অনাহার-জীর্ণ বাপ মা ছেলে মেয়ে—পথের ধারে অনাহারে মৃত মানুষের দেহ। পাশাপাশি অধিকাংশ গ্রামেরই সেই অবস্থা। নিকটবর্তী একটা গ্রামে মোটরভ্যান এসেচে মৃতদেহ কুড়িয়ে ফেলবার জন্যে। পুলিশের লোক জেলের কয়েদীদের দিয়ে মৃতদেহ বহন করাচ্চে। তারা রাস্তার ধার থেকে ঘরের মধ্যে থেকে মৃতদেহের ঠ্যাং ধরে হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে মোটরভ্যান বোঝাই করচে! গাড়ীটা ময়লা ফেলা গাড়ীর মত বোঝাই হয়ে গিয়েচে মৃতদেহের স্তূপে। তার মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, যুবা, শিশু সকলের মৃতদেহই আছে। পচা মড়ার গন্ধে চারিদিক নিশ্চয়ই পূর্ণ, কারণ যে সব জেলকয়েদী মুর্দাফরাসের কাজ করচে, তাদের নাকে মুখে কাপড় বাঁধা। বীভৎস দৃশ্য।

রোগজীর্ণ ও অনাহারশীর্ণ লোক দলে দলে শহরের দিকে চলেচে—সকলের ভাগ্যে শহরে পৌঁছনো ঘটবে না, পথেই অর্দ্ধেক লোক মরবে। তারপর আছে পুলিশের মোটরভ্যান ও জেলকয়েদী মুর্দ্দাফরাসের দল। যাহা শহরে পৌঁছুচে, তারা অনেকে সেখানে দুর্বল শরীরে দুরন্ত শীতের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে পেভমেণ্টের ওপর ল্যাম্প-পোস্টের তলায় মরে পড়ে থাকবে। বেচারীরা ল্যাম্প-পোস্টের তলায় আশ্রয় নিচ্চে ওপরের আলোটা থেকে এতটুকু উত্তাপ পাবার মিথ্যা আশায়। তারপর তাদেরও জন্যে রয়েচে পুলিশের মোটরভ্যান ও সেই জেলকয়েদী শ্মশানবন্ধুর দল।

পথের ধারে বসে এক জায়গায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট আট বছর বয়সের বড় ভাই পাঁচ বছর বয়েসের শীর্ণকায় কঙ্কালসার ছোটভাইকে একটা ভাঙা তোবড়ানো, রাস্তার ধারে কুড়োনো টিনের মধ্যে করে মুসুরির ডাল সিদ্ধ মুখে তুলে খাওয়াচ্চে। এই সব অসহায় ছেলে-মেয়ের কষ্ট সকলের চেয়ে বেশী—দেবীর চোখে জল এল এদের কষ্টে। অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের বাপ-মা তাদের শহরে ছেড়ে দিয়ে পুলিশের ভয়ে পালিয়ে গিয়েচে—এই আশায় যে, শহরে থাকলে তবু তাঁদের পাঁচজনে দয়া করবে, একেবারে না খেয়ে মরবে না, কোনো কোনো ছেলেমেয়ের বাপ-মা অনাহারের ও রোগের কষ্টে পথের ধারেই ইহলীলা সংবরণ করে লাসবোঝাই মোটরভ্যানে নিরুদ্দেশযাত্রা করেচে—

আরও কয়েকটি আত্মা এদের মধ্যে কাজ করচে দেখা গেল।

দেবীকে দেখে একটি মেয়ে এগিয়ে এলেন। এঁর দেহ অতি সুন্দর, স্বচ্ছ, সুনীল জ্যোতির্মণ্ডিত—দেখেই বোঝা যায় খুব উচ্চ শ্রেণীর আত্মা।

এঁদের কাজ দেখে মনে হোল দুর্ভিক্ষে মৃত ব্যক্তিদের আত্মা যাতে আত্মিকলোকে এসে দিশাহারা হয়ে কষ্ট না পায়—সেই দেখতেই এঁরা সমবেত হয়েচেন।

দেবী সেই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করলেন। মেয়েটি বল্লে—আমার এই দেশ। বহু দিন আগে ভল্‌গা নদীর ধারে একটি গ্রামে এক কৃষকপরিবারে আমি জন্ম নিয়েছিলাম—জার আইভ্যানের রাজত্বকালে। রাশিয়ার কৃষকেরা চিরদিনই দুঃখী—সোভিয়েট গবর্ণ-

মেণ্টের আমলে এদের ক্ষেত্রের ফসলের ভাগ দিতে হয় কারখানার শ্রমিকদের ও শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত নাগরিক শ্রেণীর জন্যে। এদের জন্যে যা থাকে, তাতে এদের কুলোয় না। তাই এই ঘোর দুর্ভিক্ষ। এদের ছেড়ে আমি যেতে পারিনে—তাই এদের সঙ্গে সঙ্গে থাকি। আর একজন লোকের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই আসুন।

একজন অতি সুন্দর সুশ্রী যুবক কিছু দূরে একদল দুর্ভিক্ষপীড়িত বালক-বালিকার মধ্যে দাঁড়িয়ে কি করছিলেন।

মেয়েটি বল্লেন—ইনি ডাক্তার আমেন্ডো। রাশিয়ার কৃষকদের জন্যে ইনি সারা জীবন খেটেচেন পৃথিবীতে থাকতে। গবর্ণমেণ্টের কুদৃষ্টিতে পড়ে লণ্ডনে পালিয়ে গিয়েছিলেন মহাযুদ্ধের পূর্বে। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের সময়েও ফিরে এসে অনেক দুর্দশা ভোগ করেচেন। স্ট্যালিনের সুনজরে বড় একটা ছিলেন না। এঁর জীবনের একমাত্র কাম্য হচ্চে গরীব ও দুঃখী লোকের দুঃখ দূর করা। সোভিয়েট গবর্ণমেণ্টের অনেক জিনিস ইনি সুদৃষ্টিতে দেখতেন না, তারাও এঁকে সুনজরে দেখতো না। আজ মাত্র পাঁচ বছর হোল আত্মিক লোকে এসেচেন, তাও সেই গরীবদেরই কাজে প্রাণ দিয়ে। আমাশা রোগে আক্রান্ত পল্লীতে ডাক্তারি করতে গিয়ে নিজে সংক্রামক আমাশা রোগেই প্রাণ হারান। এত বড় নিঃস্বার্থ দয়ালু আত্মা এ যুগে খুব কমই জন্মেচে। মরণের পরে এ লোকে এসেও সেই রাশিয়ার গরীব লোকদের নিয়েই থাকেন। যেখানে দুর্ভিক্ষ, যেখানে রোগ-শোক সেখানেই ছুটে আসচেন। চতুর্থ স্তরের আত্মা, কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে যেতে চান না কোথাও।

ডাক্তার আমেন্ডো এদের সামনে এসে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। বল্লেন—আপনারা ভারতবর্ষের লোক ছিলেন না? দেখলেই বোঝা যায়। এরা ভগবানকে দেখিয়ে দিচ্চে দেশ থেকে, যেন ইটপাথরের তৈরী গির্জা ভাঙলেই ভগবানকে তাড়ানো যায়! রাশিয়াতে উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় মুক্তাত্মা যদি দয়া করে আসেন, তবে কিছু কাজ করা যায়।

মেয়েটি বল্লেন—সে দু-একজনের কাজ নয়, ডাক্তার। অনেক আত্মার সমবেত চেষ্টার ফলে যদি চিন্তার চৌম্বিক ঢেউ-এর সৃষ্টি করা যায়—খুব শক্তিশালী ঢেউ, তবে হয়তো কিছু হতে পারে। তোমার আমার দ্বারা তা হবে না।

ডাক্তার আমেন্ডো বল্লেন—আর একটা ব্যাপার। পৃথিবীতে এসে এখন দেখচি আমরা বড় অসহায় হয়ে পড়ি। দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরের আত্মার সাহায্য না নিয়ে কিছু করতে পারিনে। জন কতক দ্বিতীয় স্তরের লোক আমরা যোগাড় করে এনেচি কিন্তু ওরা মন দিয়ে কাজ করছে না।

পুষ্প বল্লে—আমাদেব দুজনকে নিন্ দয়া করে আপনার দলে। আমাদের দিয়ে যা সাহায্য হয় পাবেন। একটা কথা, আমাদের ভারতবর্ষেও দুর্ভিক্ষে আর বন্যায় বড় কষ্ট পায় লোকে। সেখানকার জন্যেও আপনারা সাহায্য করবেন—তারা বড় দুঃখী।

ডাঃ আমেন্ডো বল্লেন—সে আপনি ভাববেন না। যেখানেই লোকে দুঃখ পাচ্চে, সেখানেই আমরা থাকবো। দেশ, জাতি, ধর্মের গণ্ডি নেই আমাদের কাছে। সারা পৃথিবী আমাদের দেশ। তবে কি জানেন, এই রাশিয়া আমাদের জন্মভূমি। এখানকার লোকের দুঃখ আমাদের প্রাণকে বড় স্পর্শ করে। ভারতবর্ষেও যখন যেতে বলবেন, তখনই আমরা যাবো। আমাদের দলে অনেক লোক আছেন—সবাইকে নিয়ে যাবো।

যতীন বল্লে—আরও উচ্চ স্তরের কোনো লোক আসেন না কেন? পঞ্চম বা ষষ্ঠ কি তারও ওপরের স্তরের কাউকে তো দেখতে পাইনে।

ডাঃ আমেন্ডো বল্লেন—তাঁরা কাজ করেন আমাদের মধ্যে দিয়ে। তাঁরা এলেও আপনি তাঁদের চোখে দেখতে পাবেন না। পৃথিবীতে এলে তাঁরা আমাদের চেয়েও

অসহায় হয়ে পড়েন। পৃথিবীর স্থূললোকের স্থূল মনের ওপর তাঁদের প্রভাব আদৌ কার্যকর হয় না। তাঁরা উৎসাহ ও প্রেরণা দেন আমাদের—আমরা কাজ করি।

মেয়েটি বল্লেন—এর মধ্যে আরও কথা আছে। বড় বড় দুর্ভিক্ষ, মড়ক, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি যাতে দেশকে দেশ বা জাতিকে জাতি কষ্ট পায়—এ সবের মূলে অতি উচ্চ দেবতা—যাঁরা গ্রহদের প্ল্যানেটরি স্পিরিট—তাঁদের হাত রয়েচে। তাঁদের উদ্দেশ্য বা কর্মপ্রণালী আমরা বুঝিনে। কিন্তু ঐ সব উচ্চ স্তরের বড় বড় লোকে তা বুঝতে পারেন। এর হয়তো কোথাও বড় একটা উদ্দেশ্য রয়েচে। আমাদের দৃষ্টি তত দূরে পেঁাছোয় না—তাঁরা সেটা দেখতে পান, কাজেই গ্রহদেবদের কাজে হস্তক্ষেপ করতে যান না। আপনি কিছুদিন আমাদের সঙ্গে থাকুন ঘোরাফেরা করুন, অনেক কিছু দেখতে বা জানতে পারবেন। এ লোকের কাণ্ডকারখানা এত বিরাট ও জটিল যে নতুন পৃথিবী থেকে এসে মানুষে হতভম্ব হয়ে পড়ে—কিছুই ধারণা করতে পারে না।

যতীন বল্লে—কিন্তু জানবার আগ্রহ আমার অত্যন্ত বেশী, দেবী। আমি জানতে চাই কি করে এই বিরাট আত্মিকমণ্ডলী কাজকর্ম চালাচ্চেন—এঁরা কি করেন, এঁদেরই বা কে চালাচ্চে, গ্রহদেব যাঁদের বলচেন, তাঁরাই বা কে, কোথায় থাকেন, কত উচ্চ স্তরের আত্মা, তাঁদের দেখতে পাওয়া যায় না কেন,—কোথা থেকে তাঁরা এলেন—এ সব না জানলে আমার মনে শান্তি নেই।

মেয়েটি বল্লেন—জানবার ইচ্ছে থাকলেই ক্রমে ক্রমে সব জানতে পারবেন। এই আগ্রহই আসল। বেশীর ভাগ মানুষ পৃথিবী থেকে এখানে এসে কিছুই জানে না, বোঝে না, বোঝবার চেষ্টাও করে না। জানবেন, জ্ঞান ভিন্ন উন্নতি নেই। এ লোকে আরও শক্ত নিয়ম। সেবা বলুন, ধর্ম বলুন, প্রেম বলুন—ততদিন ঊর্দ্ধলোকে আপনার ঠাঁই হবে না, যতদিন জ্ঞানের আলো আপনার মনের অন্ধতা দূর না করচে।

ডাক্তার আমেন্ডো বল্লেন—পৃথিবীতে কি জানেন, নানা মুনির নানা মতে সেখানে সত্যের সমাধিলাভ ঘটেচে। এখনও পৃথিবীর মন আপনার যায়নি। এ জীবনের বিরাট প্রসারতা এখনও আপনি দেখতে পাননি। আপনি অজর, অমর, আপনার জীবন শাশ্বত অফুরন্ত। আপনার জন্মগত অধিকার এই জীবনের অমৃতপানে। আপনি তৃতীয় স্তরের মানুষ, আপনি কি ছোট? আপনিও মুক্তাত্মা, আপনার সঙ্গে এই মহীয়সী মহিলা তো সাক্ষাৎ দেবী। এই সব পৃথিবীর হতভাগ্যদের ভরসার স্থল আপনারা। এরা যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে সে প্রার্থনা যাঁর কাছে পেঁাছোয়, তিনি আপনাদের মত পবিত্র মুক্তাত্মাদের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এদের সাহায্য করেন। তিনি শক্তি বিকীর্ণ করচেন, আপনারা যন্ত্ররূপে সেই শক্তিকে ধরচেন, ধরে কাজে লাগাচ্চেন। বেতারের ঢেউএর আপনারা রিসিভার। যন্ত্র যত উঁচুদরের, যত নিখুঁৎ—তাঁর বাণীর প্রকাশ সেখানে তত সুস্পষ্ট, সুন্দর।

যতীন অদ্ভুত প্রেরণা পেলে, ডাক্তার আমেণ্ডোর মত এত বড় আত্মার প্রশংসাতে কিছু লজ্জিতও হোল। এতখানি প্রশংসার উপযুক্ত সে নয় তা সে জানে। তবে হবার চেষ্টা আজ থেকে তাকে করতেই হবে।

কিছু পরে পুষ্প ও যতীনের পায়ের তলায় বিশাল ভলগা একটা সরু রৌপ্যসূত্রের মত হয়ে ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়ে গেল। সেদিনের মত ওরা বিদায় নিলে।

পুষ্পদের বুড়োশিবতলার বাড়ীতে আজকাল দেবী প্রায়ই আসেন। এঁকে আমরা করুণাদেবী বলে পরিচয় দেবো। করুণাদেবী অতি উচ্চ স্তরের নীলজ্যোতির্বিশিষ্ট আত্মা কিন্তু পৃথিবীর কাছাকাছি তিনি থাকতে ভালবাসেন, কারণ পৃথিবীর —

জীবকুল ছেড়ে ঊর্ধ্বে স্বর্গে গিয়ে তিনি শান্তি পান না। এঁর চরিত্রের মাধুর্য্যে ও ও সুন্দর ব্যবহারের কথা শুনে পুষ্প ও যতীন এঁর প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল।

যখনই তিনি আসতেন, একরাশ ফুল ও ফল নিয়ে আসতেন ওপরের স্বর্গ থেকে। সে ফুল যেন স্পন্দনশীল আলোর তৈরী—খাওয়া যায়, খুব সুস্বাদু এবং ভারি চমৎকার ভুরভুরে সুগন্ধ তার। সে ফল খেলে মনে শক্তি ও পবিত্রতা আসে, এই তার গুণ। কিন্তু এই নিম্নতর তৃতীয় স্বর্গে সে ফল বেশী সময় থাকতো না—কিছুক্ষণ পরেই ঠিক কর্পূরের দলার মত উবে যেত। দেবী বলতেন, ওপরকার জগতের এই সব ফল পৃথিবীর ন্যায় স্থূল দেহের সৃষ্টির জন্যে জন্মায় না, মনের আধ্যাত্মিক পুষ্টির খোরাক যোগানোই এদের কাজ।

সেদিন তখন ওদের বাড়ীতে সকালবেলা করে রেখেছে পুষ্প। ঠিক যেন পৃথিবীর সকাল, লতাপাতায় শিশির, পাখী ডাকচে ও গঙ্গার ওপারে সূর্য উদয় হচ্চে, পুষ্প সবে গঙ্গাস্নান করে শিবমন্দিরে পুজো করতে যাচ্চে, এমন সময় করুণাদেবী এলেন। পুষ্পকে বল্লেন—বেশ সকালটি করে রেখেচে তো! পুজো সেরে নাও, চল তুমি আর যতীন আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে।

যতীন ঘরের মধ্যে বসে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল।

দেবীকে বসবার আসন দিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল। করুণাদেবী বল্লেন—তুমি পুজো কর না?

—ওতে আমার বিশ্বাস নেই। আমার মনে হয় পৃথিবীতে দেবতা ও ভগবান সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা গড়ে ওঠে, এখানে এসে তার আমূল সংস্কারের প্রয়োজন আছে। সে ভাবের দেবতা কই এখানে? সে ভাবের ভগবানই বা কোথায়? পুষ্প মেয়েমানুষ, ওর মনে ভক্তি ও পূজার্চ্চনার প্রবৃত্তি কোনো প্রশ্ন ওঠায় না। বিনা দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে সে পুজোর ফুল তার মন-গড়া ইষ্টদেবের পায়ে দেয়। আমি তা পারি না। আমার মনে হয়—

করুণাদেবী বল্লেন—তোমার এ কথার মধ্যে ভুল রয়েচে, যতীন। তুমি ভেবো না ভগবান সম্বন্ধে তুমি কোনো ধারণা কখনো করে উঠতে পারবে। তুমি কোথায়, আর সেই বিরাট বস্তু, যাঁকে পৃথিবীতে বলে ভগবান, তিনিই বা কোথায়? অতএব ভক্তি ও অর্চ্চনা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে হোলে তোমার মনের মত ভগবান তোমাকে গড়ে নিতে হবে। তোমার সেই মন-গড়া দেবতার মধ্যে দিয়েই অর্ঘ্য পৌঁছোবে সেই বিশ্বদেবের পায়ে। তুমি তৃতীয়-স্বর্গবাসী জীব, এর বেশী কি করতে পারো?

যতীন ছাড়তো না তর্ক করতো, এমন সময়ে পুজো শেষ করে পুষ্প ফিরে এল। দেবী ওদের দুজনকে নিয়ে পৃথিবীতে এলেন।

যে জায়গাটিতে তাঁরা এলেন, সেখানটা একটা নির্জন স্থান। ছোট একটা নদী, তার ধারে অনেকদূরব্যাপী ঘন জঙ্গল।

যতীন বল্লে—এটা কোন্ দেশ?

দেবী বল্লেন—বাংলাদেশ, চিনতে পারচ না কেন? মধুমতী নদী, এইখানে ছিল বড় গঞ্জ নকীবপুর, রাজা সীতারাম রায়ের আমলে। ধ্বংস হয়ে জঙ্গল হয়ে রয়েচে। বাংলাদেশ ছাড়া তোমাদের আনতাম না—কারণ যে কাজ করতে হবে তাতে বাঙলা ভাষা বলা দরকার হবে। চল দেখাচ্চি।

নদীর ধারে জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় ছোট একখানা খড়ের বাড়ী। কিন্তু বাড়ীখানা দেখেই যতীন অবাক্ হয়ে গেল। ঘরখানা পৃথিবীর বস্তু দিয়ে তৈরী নয় আত্মিকলোকের চিন্তাশক্তিতে সৃষ্ট আত্মিকলোকের সূক্ষ্ম পদার্থে তৈরী ঘর। পৃথিবীতে এমন

ঘর কি করে এল, যতীন জিজ্ঞাসা করতে যাচ্চে—এমন সময় একটি বৃদ্ধ এক বোঝা কঞ্চি বয়ে নিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

যতীন আরও অবাক্ হয়ে গেল।

বৃদ্ধটি পার্থিব স্থূল দেহধারী মানুষ নয়—খুব নিম্নস্তরের আত্মা—পৃথিবীতে যাকে বলে প্রেত! তার হাতের কঞ্চির বোঝাও সত্যিকার কঞ্চির বোঝা নয়, সেটা চিন্তা-শক্তিতে গড়া আত্মিকলোকের বস্তু দিয়ে তৈরী।

বৃদ্ধের ভাব দেখে মনে হোল সে তাদের কাউকে দেখতে পায়নি।

যতীন বিস্মিত ভাবে বল্লে—ব্যাপার কি? এ তো মানুষ নয়। এখানে এ ভাবে কি করচে?

করুণাদেবী বল্লেন—সেই কথা বলবো বলেই তোমাদের আজ এনেচি। বড় করুণ ইতিহাস লোকটির। ওর নাম দানু পাড়ুই। স্ত্রীকে সন্দেহ হয় বলে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়—দেশ থেকে পালিয়ে পুলিশের ভয়ে নাম ভাঁড়িয়ে নকীবপুরের এই জঙ্গলে অনেক দিন ঘর বেঁধে ছিল। আট-দশ বছর পরে ওর নিমোনিয়া হয়, তাতেই মারা পড়ে। মৃত্যুর পরে হয়ে গিয়েচে আজ ত্রিশ বছর। এই ত্রিশ বছরেও ও বুঝতে পারেনি যে ও মরে গিয়েচে। ভাবে, ওর কি অসুখ করেচে, তাই ওকে কেউ দেখতে পায় না। জঙ্গলের মধ্যে খুব কমই লোক আসে, কাজেই জীবন্ত মানুষের সঙ্গে ওর পার্থক্য কি, বুঝবার সুযোগ ঘটেনি। নিজেও পুলিশের ভয়ে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে। অথচ এত স্থূল ধরনের মন, এত নিম্নস্তরের আত্মা যে, আমি কতবার চেষ্টা করেও কিছু করতে পারিনি। আমাকে ও দেখতেও পায় না। ওর নিজের লোক যারা মারা গিয়েচে, কখনো কেউ আসে না। তাই তোমাদের এনেচি আজ।

যতীন বল্লে—আশ্চর্য্য!

দেবী বল্লেন—মরে গিয়ে বুঝতে না পারা আত্মিক লোকের এক রকম রোগ। পুরোনো হয়ে গেলে এ রোগ সারানো বড় কঠিন, কারণ, মৃত্যুর প্রকৃত স্বরূপ কখনো না জানার দরুন এই সব অজ্ঞ নিম্ন আত্মারা বেঁচে থাকার সঙ্গে মৃত্যুর পরের অবস্থার সূক্ষ্ম পার্থক্যটুকু আদৌ বুঝতে পারে না। এমন কি, বুঝিয়ে না দিলে ষাট, সত্তর, একশো, দুশো বছর এ রকম কাটিয়ে দেয়, এমন ব্যাপারও বিচিত্র নয়।

যতীন এমন ব্যাপার কখনো শোনেনি। সঙ্গে সঙ্গে এই হতভাগ্য, বন্ধুহীন, স্বজন-হীন, অসহায় বৃদ্ধের ওপর তার সহানুভূতি হোল। করুণাদেবী সত্যই করুণাময়ী বটে, পৃথিবীর এই সব হতভাগ্যদের খুঁজে খুঁজে বার করে তাদের সাহায্য করা তাঁর কাজ, তিনি যদি দেবী না হবেন, তবে কে হবে?

যতীন বল্লে—আচ্ছা এই খড়ের ঘরটা—

এবার উত্তর দিলে পুষ্প। বল্লে—বুঝলে না? ওর আসল পৃথিবীর ঘরখানা কোন্ কালে পড়ে ভূমিসাৎ হয়ে গিয়েচে। কিন্তু সেই ঘরখানার ছবি ওর মনে তো আছে—ওর চিন্তা সেই ছবির সাহায্যে ঘরটা গড়েচে—যেমন আমার তৈরী গঙ্গা আর কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট। এ লোকে তো ও তৈরী করা কঠিন নয়। অনেক সময় আপনা-আপনি হয়।

দেবী বল্লেন—পুষ্পকে আর আমাকে ও তো দেখতে পাবেই না। যতীন এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াও তো ওর সামনে!

সন্ধ্যা হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে ঘন অন্ধকার ঝোপেঝাড়ে জোনাকি পোকা জ্বলে উঠলো। যতীন গিয়ে বুড়োর সামনে দাঁড়ালো, কিন্তু তার ফল হলো উল্টো। বৃদ্ধ ওকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠলো এবং ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে

লাগলো। দেবী বল্লেন, ও তোমাকে দেখতে পেয়েচে, কিন্তু ভাবচে তুমি ভূত।

পুষ্প ভাবলে, কি মজার কান্ড দ্যাখো! ভূত হয়ে ভূতের ভয় করচে!

দেবী বল্লেন—ওর সঙ্গে কথা বলো—

যতীন বল্লে—ভয় কি বুড়োকর্তা! ভয় পাচ্চ কেন?

বৃদ্ধ ভয়ে কাঁপচে আর রাম রাম বলচে। যতীনের হাসি পেল কিন্তু দেবী সামনে রয়েচেন বলে সে অতি কষ্টে চেপে গেল।

যতীন আবার বল্লে—বুড়োকর্তা, ভয় কিসের, তুমি এখানে একলা আছ কেন?

এবার বোধহয় বৃদ্ধের কিছু সাহস হোল। সে বল্লে—আজ্ঞে কর্তা আপনি কে?

—আমার এখানেই বাড়ী। কাছেই থাকি। তুমি কতদিন এখানে আছ? একলা থাকো কেন? তোমার কেউ নেই?

বৃদ্ধ এইবার একটু ভিজল। বল্লে—বাবু, আপনি পুলিশের লোক নয়? আমায় ধরিয়ে দেবেন না?

যতীন বল্লে—না, কেন ধরিয়ে দেবো? কি করেছ তুমি? তা ছাড়া তোমার যা অবস্থা তাতে পুলিশে তোমাকে এখন আর কিছু করতে পারবে না।

বৃদ্ধ উৎকণ্ঠিত সুরে বল্লে—কি হয়েছে বলুন তো বাবু আমার? আপনি কি ডাক্তার? সত্যি বাবু, আমিও বুঝতে পারিনে যে আমার এ কি হোল। একবার অনেক-কাল আগে আমার শক্ত অসুখ হয়—তারপর অসুখ সেরে গেল, কিন্তু সেই থেকে আমার কি হয়েচে আমার কথা কেউ শুনতে পায় না, লোককে ডেকে দেখেচি আমার ডাক না শুনে তারা চলে যায়। মামুদপুরের হাটে যাই, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না। আমার শরীরে যেন খিদে তেষ্টা চলে গিয়েচে। আগে আগে ভাত খেতাম, এখন খিদে হয় না বলে বহুকাল খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। শরীরটা কেমন হাল্কা মনে হয়, যেন তুলোর মত হাল্কা—মনে হয়, যেন আকাশে উড়ে যাবো। তেষ্টা নেই শরীরে। আর একটা জিনিস বাবু, কোনো কিছুতে হাত দিলে আগের মত আর আঁকড়ে ধরতে পারিনে। হাত গলিয়ে চলে যায়। এ কি রকম রোগ বাবুমশাই? পুলিশের ভয়ে কোথাও যেতে পারি নে, নইলে নলদীর সরকারী ডাক্তারখানায় গিয়ে একবার ডাক্তারবাবুকে দেখানো ভেবেছিলাম।

যতীন বল্লে—বল্ছি সব কথা। কিন্তু পুলিশের ভয় কর কেন? কি করেছিলে?

বৃদ্ধ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বল্লে—কেন বাবু?

—বল না। আমি কাউকে বলবো না। আমার অবস্থা বুঝতে পারচ না? আমিও তোমার দলের একজন। আমিও মানুষজনের সঙ্গে মিশতে পারিনে।

কথাটার মধ্যে দুরকম অর্থ ছিল। বৃদ্ধ সোজাটাই বুঝলে। বুঝে বল্লে—আপনার নামেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে না কি বাবু? কি করেছিলেন আপনি?

—আমি আমার স্ত্রীকে খেতে দিতাম না। বাপের বাড়ী ফেলে রেখেছিলাম। তার সঙ্গে আমার ঝগড়া হোত প্রায়ই। তারপর একদিন—

বৃদ্ধ বল্লে—বাবু মশাই, আপনি পুলিশের লোক। আমি বুঝতে পেরেচি। আপনি সব জানেন দেখচি। তা ধরুন আমায়, আমার যে রোগ হয়েচে, বোধ হয় বেশীদিন বাঁচবো না। এ রকম জ্যান্ত মরা হয়ে থাকার চেয়ে ফাঁসি যাই যাবো। এতদিনে আমার ভুল বুঝতে পেরেচি বাবু মশাই। আমার বৌ-এর কোনো দোষ ছিল না, সতীলক্ষ্মী ছিল সে। আমার মনে মিথ্যে ধুক্‌বুক ছিল কালীগয়লার ছোট ভাইটার সঙ্গে বড় হাসিঠাট্টা করতো। বারণও করে দেলাম অনেকবার, তাও শুনতো না। তাই একদিন রাগের মাথায়—কিন্তু দোহাই দারোগা বাবু, খুন করবো বলে মারিনি। মাঠ থেকে

সবে এসে পা দিইচি বাড়ীতে দেখি কালীগয়লার ভাই ছিচরণ খিড়কী দোর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে; চাষার রাগ—বল্লাম—ও কেন বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছিল? বউ উত্তর দেবার আগেই রাগের মাথায় তার মাথায় এক ঘা—

বৃদ্ধ হঠাৎ কেঁদে ফেললে। বল্লে—তারপর আমি সব বুঝতে পেরেছিলাম দারোগা-বাবু। ছিচরণকে বউ ভাই-এর মত দেখতো। ছিচরণ হাসির গল্প বলতে পারতো, বউ তাই শুনতে ভালবাসতো। বৌ-এর কোন দোষ ছিল না। সেই পাপের ফলে আজ আমার এই ভয়ানক রোগ জন্মেচে শরীরে। আর আমার জীবনে মায়া নেই, সর্বদা বউডার কথা ভাবি আজকাল। অনেকদিন থেকেই ভাবি। একা একা এই জঙ্গলে এই রোগ নিয়ে আর কাটাতে পারিনে, দারোগাবাবু। জেলে গেলে তবুও পাঁচটা মানুষের সঙ্গে কথা বলে বাঁচবো।

দেবী বল্লেন—ওকে জিজ্ঞেস কর, ওকি বৌ-এর সঙ্গে দেখা করতে চায়?

যতীন বৃদ্ধকে কথাটা জিজ্ঞেস্ করতেই সে অবাক্ হয়ে ওর দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে বল্লে—তবে কি বাবু বৌ হাসপাতালে গিয়ে বেঁচে গিয়েছিল?

যতীন বল্লে—তা নয়, তুমিও আর বেঁচে নেই। তুমিও মরে গিয়েচ, তোমার বৌও মরে গিয়েচে। আমিও মরে গিয়েচি। সবাই আমরা পরলোকে আছি এখন। তোমাকে উদ্ধার করতে আরও দু'জন দেবী এখানে এসেচেন, তুমি তাদের দেখতে পাচ্চ না। এখানেই তাঁরা আছেন। তোমার এ অবস্থা দেখে তাঁদের দয়া হয়েছে। এবার তোমার ভাবনা নেই, তোমার স্ত্রীর সঙ্গেও আমরা দেখা করিয়ে দেব।

বৃদ্ধ কিন্তু এসব কথা বিশ্বাস করলে না। সে সন্দিগ্ধ সুরে বল্লে—তবে আমার এই রোগটা হোল কেন? এটা সারবার একটা ব্যবস্থা করে দিন দয়া করে। বৌ-এর সঙ্গে দেখা করে কি হবে বাবু? হাসপাতাল থেকে সে যদি সেরে থাকে, তবে ত ভালই। তার ভাই-এর বাড়ী আছে বুঝি? তা থাক্, দেখা করে আব কি হবে বাবুমশাই, এ রোগ নিয়ে আর কারু সঙ্গে দেখা করতে চাইনে বাবু।

যতীন ওর কাছে পরলোক ও মৃত্যুর প্রকৃতি বর্ণনা করলে খানিকক্ষণ। করুণাদেবী বল্লেন—ও সব বলো না যতীন ওর কাছে। ওতে কোনো উপকার হবে না। ও কি বুঝবে ওসব কথা? দেখচো না কত নিম্ন স্তরের আত্মা? বুদ্ধি বলে জিনিস নেই ওর মধ্যে। ওকে বোঝাতে হোলে অন্যপথে যেতে হবে। ওর স্ত্রীকে আনতে হবে খুঁজে পেতে কোনরকমে, তার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে। কিন্তু ওর তো দেখচি ভালবাসার কোনো বন্ধন নেই স্ত্রীর সঙ্গে। এ অবস্থায় দুজনের যোগ স্থাপন করানোই কঠিন কাজ। এ লোকে যার সঙ্গে যার ভালবাসা বা স্নেহ নেই, তার সঙ্গে তার কোনো যোগই যে সম্ভব নয়।

আরও কয়েকবার যাতায়াত ও অনবরত চেষ্টা করলে ওরা। বৃদ্ধ কিছুই বোঝে না। তাকে তার অবস্থা বোঝানো সাংঘাতিক কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। তাকে কিছুতেই বোঝানো যায় না যে সে মরে গিয়েছে। কারো ওপর তার টান নেই—না স্ত্রী, না ছেলেমেয়ে, না অন্য কারো ওপর।

করুণাদেবী বল্লেন—শুধু বুদ্ধিহীন বলে নয়, এমন একটি অদ্ভুতধরনের হৃদয়হীন প্রেমহীন আত্মা আমি খুব কমই দেখেচি। মনে হয় প্রেম ভালবাসা স্নেহ এসব যদি থাকতো তা হলেও ওর উদ্ধার এত কঠিন হোত না। কি যে করি এখন!

কিন্তু কি অপূর্ব নিঃস্বার্থ দরদ করুণাদেবীর! পতিত হতভাগ্যদের ওপর কি তাঁর মায়ের মত গভীর সহানুভূতি! কত কষ্ট করে তিনি নিম্নস্তরের বহু জায়গা খুঁজে পেতে একদিন এক স্ত্রীলোককে এনে হাজির করলেন ওর সামনে। যতীন আর পুষ্প

সব সময়েই ওঁকে সাহায্য করতো, ওঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতো। কারণ অত নিম্নস্তরে দেবী সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য—পুষ্পও তাই—যতীনের বিনা সাহায্যে কোন কাজই সেখানে হবার উপায় ছিল না। স্ত্রীলোকটিরও তেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই, মনে প্রেম ভালবাসাও তথৈবচ। ধূসরামিশ্রিত লাল রঙের দেহধারী আত্মা। তবে সে সক্রিয় ধরনের বা অনিষ্ট-কারী চরিত্রের মেয়ে নয়—মোটামুটি ভাল-মানুষ এবং ওর স্বামীর মতই প্রেম ভালবাসার ধার ধারে না।

খুব এমন কিছু উঁচুদরের আত্মা না হোলেও বৃদ্ধের অপেক্ষা কিছু উঁচু। কিন্তু হঠাৎ খুন হয়ে মৃত হওয়ার ফলে অনেকদিন পর্য্যন্ত তার এ লোকে ভাল জ্ঞান হয় নি। সম্প্রতি কিছু কিছু বুঝতে আরম্ভ করেচে।

যতীন বৃদ্ধকে বল্লে—চিনতে পারো? এগিয়ে এসে দ্যাখো তো

বৃদ্ধ চমকে উঠলো, বল্লে—বড় বৌ যে!

ওর স্ত্রী হেসে বল্লে—হ্যাঁ, মুগুরের বাড়ি মাথায় দিয়ে ভেবেছিলি হাত থেকে বুঝি এড়ালি! তা আর হোল কৈ?

বৃদ্ধ অবাক হয়ে বল্লে—বড় বৌ, তুই তাহলে বেঁচে আছিস্?

বড় বৌ বল্লে—তুইও যা আমিই তাই। দুজনেই মরে ভূত হয়ে গিয়েচি। আজ এঁরা সব এসেচেন তাই এঁদের দয়ায় উদ্ধার হয়ে গেলি। নে এঁদের গড় কর্ পায়ে।

—পুলিশের দারোগাবাবুকে?

—যমের অরুচি—পুলিশের দারোগা আবার কে এর মধ্যে? মরচেন কেবল পুলিশ পুলিশ করে; অত যদি পুলিশের ভয় তবে রাগের সময় কাণ্ডজ্ঞান ছিল না কেন রে মুখপোড়া? এঁকে প্রণাম কর্, আর দুজন আছেন, তাঁদের দেখবার ভাগ্যি তোর এখনও হয়নি, এই পিটুলি গাছের তলায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম কর্। চল্ আমার সঙ্গে, তোকে সব বুঝিয়ে দিচ্চি—এখন কিছু বুঝবিনে।

বৃদ্ধ যতীনের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করলে। স্ত্রীর কথায় পিটুলি গাছের তলায় মাথা নীচু করে অদৃশ্য পুষ্প ও দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করলে। স্ত্রীলোকটিও সকলকে প্রণাম করলে—তারপর বৃদ্ধকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেল।

ফেরবার পথে করুণাদেবী বল্লেন—যারা কিছুই বোঝে না, তাদের দিয়ে না হয় নিজের উপকার না হয় পরের উপকার। দেখলে তো চোখের সামনে? যারা এই বিরাট বিশ্বরহস্যের কিছুই বোঝে না, তারা নিজেদের মহান্ অদৃষ্টলিপি, আত্মার বিরাট ভবিষ্যৎ কি বুঝবে? এসব লোকের এখনও কতবার পৃথিবীতে জন্মাতে হবে, তবে এরা উচ্চস্তরের উপযুক্ত হবে। এদের নিয়ে ভাবনায় পড়তে হয় এমন!

যতীন মনে মনে ভাবলে—পতিতের ওপর এমন দয়া না থাকলে সাধে কি আর দেবী হওয়া যায়!

পৃথিবী থেকে ফেরবার পথে এক জায়গায় শূন্যপথে ক্ষুদ্র একটি জগৎ মহাশূন্য-সমুদ্রের মধ্যে নির্জন দ্বীপের মত দেখা যাচেচ। তার কিছু ওপর দিয়ে যাবার সময় একটি দৃশ্য দেখে যতীন আর পুষ্প দুজনেই থেমে গেল। এ জগতে এসে পর্যন্ত ওরা অনেক উন্নত স্তরের জ্যোতির্ময়ী মহিমময়ী রূপসী দেবীদের দেখেচে, যেমন একজন করুণাদেবী তাদের সঙ্গেই রয়েচেন। কিন্তু এই নির্জন ক্ষুদ্র জগৎটির এক-স্থানে প্রান্তরের মধ্যে শিলাখণ্ডের ওপর যে নারীকে ওরা বসে থাকতে দেখলে, তাঁর শ্রী ও মহিমার কোনো তুলনা দেওয়া চলে না। কি তেজ, কি দীপ্তি, কি প্রজ্বলন্ত রূপ—অথচ মুখে কেমন একটা দুঃখ ও বিষাদের ছায়া—তাতে মুখশ্রী আরও সুন্দর হয়েছে দেখতে। স্বচ্ছ নীল আভা তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে বার হয়ে শিখাখণ্ডটাকে পর্যন্ত

যেন দামী পান্নায় পরিণত করেচে।

করুণাদেবীও সেদিকে চেয়ে চমকে থেমে গেলেন। বল্লেন—ওঁকে চেন না? বহু সৌভাগ্যে দেখা পেলে। বহু উচ্চস্তরের দেবী, চল, দেখা করিয়ে দিই। তোমাদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলে উনি বিশেষ খুশি হবেন এই জন্যে যে, উনি প্রেমের দেবী। ওঁর কাজ পৃথিবীতে শুধু চলে না, বহু গ্রহে উপগ্রহে. স্থূল ও আত্মিক জগতে, বিশ্বের বহু দূর দূর নক্ষত্রের মধ্যে যেখানেই জীব বাস করে—সেই সব স্থানেই দুটি প্রেমিক আত্মার মিলন সংঘটন করিয়ে বেড়ান। উনি একা নন, ওঁর দলবল খুব বড়। অনেক সঙ্গিনী আছে ওঁর। উনি অসীমশক্তিময়ী দেবী, আলাপ হোলে হঠাৎ কিছু বুঝতে পারবে না। অত বড় প্রাণ, অত উদার প্রেম-ভালবাসা ভরা আত্মা তোমরা কখনো দেখনি। খুব সৌভাগ্য তোমাদের যে চোখে ওঁকে দেখতে পেয়েচ আজ, এর একমাত্র কারণ আজ তোমরা পৃথিবীতে ওই আত্মাটির উদ্ধারের সাহায্য করেচ, সেই পুণ্যে এই মহাদেবীকে চোখে দেখার সৌভাগ্য লাভ করলে! নইলে সাধ্য কি তোমাদের ওঁকে দেখতে পাও? এসো আমার সঙ্গে, আলাপ করিয়ে দিই।

ওরা এসে সেই দেবীর সামনে প্রণাম করে দাঁড়িয়ে রইল।

—আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেচে—করুণাদেবী বল্লেন—এরা পৃথিবীর লোক, মেয়েটি এঁকে ভালবাসতো বড়। বাল্যপ্রেম। মেয়েটি আগে মারা যায়, তারপর এ লোকে সে বহুদিন প্রতীক্ষায় ছিল। সম্প্রতি মিলন হয়েচে।

প্রণয়দেবী স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে হাসিমুখে বল্লেন—আমি জানি, সখী। এর নাম পুষ্প, ওর নাম যতীন। আমি ওদের ওপরে দৃষ্টি রাখিনি ভেবেচ? এই একটি সত্যিকার প্রেমের উদাহরণ। যেখানেই সত্যিকার জিনিস, সেখানেই আমি আছি। চেষ্টা করি তাদের মিলিয়ে দিতে, কিন্তু সব সময় পারিনে। আরও ওপরে রয়েচেন কর্মের দেবতারা—লিপিকদের দল। তাঁদের প্যাঁচ ছাড়ানো কত কঠিন তোমার তো জানতে বাকী নেই! এদের পূর্বজন্মের কর্ম ছিল ভাল, তাও, এই ছেলেটির গোলমাল রয়েছে এখনও, পরে দেখতে পাবে। তা এনে ভালই করেচ। আমার মণ্ডলীতে এরা আসুক, কারণ এরা আমারই দলেব উপযুক্ত লোক।

পুষ্প ও যতীন উল্লসিত হয়ে উঠল।

প্রেমের ব্যাপারে কি সাহায্য তাদের দিয়ে হবে তারা জানে না, কিন্তু একথা তাদের প্রাণের কথা যে তারা নিজেদের জীবন ধন্য মনে করবে যদি পৃথিবীর একটি ব্যর্থ প্রণয়ীর জীবনেও তারা সার্থকতার আলো জ্বালাতে পারে। এই তাদের অন্তরের কথা। যারা যে দলের, এতদিন পরে যতীন ও পুষ্প যেন সগোত্র আত্মার আত্মীয়মণ্ডলীকে আবিষ্কার করলে।

যতীন আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছিল, বিশ্বের কি অদ্ভুত কার্যপ্রণালী! অদৃশ্য জগতের কি বিরাট সংঘরাজি, কি বিরাট কর্মপ্রবাহ। পুষ্প ভাবছিল—কিন্তু করুণাদেবীকে ছেড়ে ওরা কি করে যাবে? তাঁকে যে ওরা বড় ভালবাসে—কিন্তু তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া হবে যে। ...করুণাদেবী যেন ওর মনের কথা বুঝেই বল্লেন—তোমাদের প্রকৃত স্থান এ মণ্ডলীতে। আমার দেখা সর্বদাই পাবে, যখন চাইবে তখনই দেখা দেবো, সেজন্য ভেবো না। তোমরা যাও এঁর সঙ্গে।

প্রণয়দেবী বল্লেন—উনি আর আমি পৃথক্ নই। উনি যেখানে, সেখানে আমি আছি; আমি যেখানে, সেখানে উনিও থাকেন। প্রেম আর করুণা পরস্পর ফুল আর সুতোর মত একসঙ্গে আছে। সুতোকে ফেলে মালা গাঁথা যায় না, ফুলকে বাদ দিয়ে সুতো নিয়ে মালা হয় না।

—কেন, বিনি সুতোয় মালা হয় না সখী?

—বড় সন্তর্পণে গলায় দিতে হয়। বড় ঠুনকো হয়। বড় অল্পে মরে বাঁচে। করুণা প্রেমকে সাহায্য না করলে প্রেম হয় ঠুনকো। এদিকে প্রেম পেছনে না থাকলে করুণা রক্তাল্পতা রোগে মারা পড়ে। ছলনা কেন করচো সখী, তুমি নাকি এ জান না!

আবার নীল শূন্যপথে, আবার বাধাহীন তড়িৎ-অভিযান। যতীন ও পুষ্প বুড়ো-শিবতলার ঘাটে পৌঁছে গেল।

## ১২

যদিও তৃতীয় স্বর্গে দিন নেই রাত নেই, সময় অবিভাজ্য ও মাত্রাস্পর্শহীন তবুও যতীনের সুবিধার জন্যে পুষ্প বুড়োশিবতলার ঘাটে পৃথিবীর মতই দিনরাত্রি সৃষ্টি করতো। ঘুমের আবশ্যক না থাকলেও নিজের সৃষ্ট রাতে ঘুমাতো।

দিন কয়েক পরে।

পুষ্প ঘুম ভেঙ্গে উঠেচে। ওর শয়নকক্ষের বাইরের প্রকাণ্ড মুচকুন্দ চাঁপার গাছটাতে পাখীরা কিচ্ কিচ্ করচে। ও দেখলে জানালা দিয়ে নতুন-ওঠা প্রভাত-সূর্য্যের আলোর রং কেমন অদ্ভুত ধরনের সবুজ ও গোলাপী। আরও বিস্মিত হোল দেখে যে সেই রঙীন আলোর মৃদু জ্যোতিটা বাষ্পাকারে তার খাটটা ঘিরে রয়েচে যেন। যতীন বুঝতে পারতো না ব্যাপারটা। পুষ্প বুঝলে ওপরের স্বর্গ থেকে কোনো উচ্চতর আত্মা তাকে স্মরণ করেচেন।

যতীনকে কথাটা বলতেই সে বল্লে—চল আমিও যাই।

পুষ্প দুঃখিত সুরে বল্লে—পারবে না যতুদা, নইলে তোমায় ফেলে যেতে কি আমার সাধ? আমার মনে হচ্চে ইনি সেদিনকার সেই দেবী, করুণাদেবী যাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তা যদি হয়, সে স্বর্গে যাওয়া তোমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তুমি থাকো আমি যাই, কাজ শেষ হলেই চলে আসবো।

গোলাপী আলোর সরল জ্যোতিরেখা অনুসরণ করে সে মহাশূন্যপথে উঠলো। পুষ্প চতুর্থস্তরের আত্মা, তার শক্তি গতিবেগ যতীনের চেয়ে অনেক বেশী। কিন্তু যতীন সঙ্গে থাকলে পুষ্প নিজেকে সংযত করে চলে ওর সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে। নইলে লক্ষ লক্ষ মাইল চোখের নিমিষে অতিক্রম করবার শক্তি ধরে সে।

পুষ্প যে স্বর্গে পৌঁছুলো, পৃথিবীর ভাষায় তার হয়তো বাইরের রূপের অনেক-খানিই বর্ণনা করা যায়, কেবল করা যায় না তার অন্তঃপ্রবিষ্ট সুগভীর শান্তি ও বহু-গুণে বর্দ্ধিত সুখদুঃখের অনুভূতির স্পন্দনমান তীব্রতার। সে কি ভয়ানক জীবনছন্দ! সেখানকার মাটিতে পা দিলেই মনের সুখ, দুঃখ, শোক, স্নেহ, প্রেম কল্পনা সব শতগুণ বেড়ে যায়। অনুভূতির তীব্রতা যারা সহ্য না করতে পারে, তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে সেই মুহূর্তেই। বলহীন মন স্বর্গলাভ করতে পারে না!

পুষ্প শক্তিময়ী, পুষ্প চতুর্থ স্তরের উচ্চ থাকের আত্মা—তাকেও রীতিমত চেষ্টা করতে হোল প্রাণপণে সংজ্ঞা বজায় রাখবার জন্যে।

চারিপাশের অদৃশ্য ইথারের তরঙ্গ যেন তার দেহের কোন্ অজানা ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করে তাকে সক্রিয় করে তুলেচে। সে অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের কাজ যে-অনুভূতিরাজিকে মনের মুকুরে প্রতিভাত করা—পৃথিবীতে, এমন কি নিম্নতর স্বর্গগুলিতেও, সে সব অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় ঘটে না।

অথচ প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই তারা থাকতে পারে এবং আছেও, কেবল আস্বাদ করবার ইন্দ্রিয় ঘুমিয়ে আছে। উচ্চ জগতের তীব্রতর স্পন্দন-তরঙ্গ তাকে জাগিয়ে তুলতে পারে—কিন্তু যেমন গঙ্গা যখন মর্তে অবতরণ করেন, তখন কেউ তার তাল সামলাতে পারেনি, ঐরাবত পর্য্যন্ত ভেসে গিয়েছিল—উচ্চ স্বর্গের দেবতা মহাদেব নেমে এসে জটাজাল বিস্তার করে না দাঁড়ালে কারো সাধ্য ছিল না সে বেগবতী স্রোতোধারার মুখে দাঁড়ায়—ঐ সব অনুভূতির বেগ তেমনি সহ্য করতে পারে একমাত্র উচ্চস্তরের দেবতারাই। চারিদিকে ফুল ফুটে আছে সে সব ফুলের রঙই বা কত রকম, কিন্তু আলোর মত কি একটা অজানা পদার্থে সে সব গাছ, সে সব ফুল তৈরী—একটা ছিঁড়ে নিলে তার জায়গায় তখনি আর একটা ঐ রকম ফুল গজাবে। বড় বড় জলাশয় আছে, তার নীলাভ নিস্তরঙ্গ বক্ষের উপর দিয়ে লোকেরা হেঁটে যাতায়াত করচে, যেমন মাটির ওপর দিয়ে পৃথিবীর লোক যায়। অথচ সেখানে নৌকাও আছে—যাদের ইচ্ছে, নৌকা করেও বেড়াতে পারে।

এক জায়গার স্ফটিক প্রস্তরের মত স্বচ্ছ কোনো পদার্থে তৈরী একটা বাড়ীর সামনে গিয়ে ঐ রঙীন জ্যোতিরেখা বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গিয়েচে। পুষ্প সেখানে ঢুকে দেখলে প্রণয়দেবী একটা বড় জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখচেন।

পুষ্প ঘরে ঢুকতেই ওর দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমায় ডেকেচি বড় বিপদে পড়ে। আমায় একটু সাহায্য করো।

পুষ্প বল্লে—বলুন কি করতে হবে!

দেবী বল্লেন—বোসো। পৃথিবীতে গিয়ে কাজ করতে পারে, এমন লোকই চাইছিলাম। তুমি ভিন্ন আর কারো কথা মনে উঠলো না। যতীন কোথায়, তাকে আনলে না কেন?

পুষ্প সলজ্জস্বরে বল্লে—যতুদা এখানে আসতে পারবে না। আসতে চেয়েছিল, আমি আনিনি।

দেবী প্রসন্ন সহাস্য মুখে বল্লেন—আচ্ছা, এবার থেকে আমি তাকে নিয়ে আসবো।

—আপনি পারেন.—আমার শক্তি কতটুকু, আমার কাজ নয়। একবার পঞ্চম স্বর্গে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলুম, চতুর্থস্তরেই অজ্ঞান হয়ে পড়লো। আর আমি চেষ্টা করিনি।

পুষ্প একটা জিনিস লক্ষ্য করলে।

প্রথমদিন সে প্রণয়দেবীকে যে মূর্তিতে দেখেছিল এ ঠিক সে মূর্তি নয়। প্রণয়দেবীকে আরও তরুণী দেখাচ্ছে, মুখশ্রী আরও সুন্দর। শরীর স্বচ্ছ, সুন্দর, নীলাভ শুভ্র।

দেবী বল্লেন—কি ভাবচ?

—আপনি জানেন কি ভাবচি।

—আমার চেহারা এখন যে রকম দেখচো, তখন অন্যরকম দেখেছিলে—এই তো?

পুষ্প কথাটা জানতো। সে শুনেছিল বহু উচ্চ স্বর্গে অধিবাসীদের কোন নির্দিষ্ট রূপ নেই। অধিকাংশ সময়েই তাঁরা একটা ডিম্বাকৃতি সোনালী আলোর মত—যখন কারো সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয় না বা মূর্তি গ্রহণ করবার বিশেষ কোনো আবশ্যক থাকে না—তখন তাঁরা শুধু একটা চৈতন্য-বিন্দুতে পর্যবসিত হয়ে এই ডিম্বাকৃতি আলোর মূর্তিতে অবস্থান করেন। কিন্তু প্রয়োজন উপস্থিত হোলে তাঁরা যে কোন মূর্তি ইচ্ছামত ধারণ করতে পারেন—অতি সুন্দর তরুণের রূপ বা মহিমময় গম্ভীর বয়স্ক লোকের রূপ বা পৃথিবী-প্রচলিত নানা শাস্ত্র ও ধর্ম-গ্রন্থাদিতে বর্ণিত দেব, দেবী

দেবদূত প্রভৃতির রূপ—যাতে মানুষেরা স্বজাতীয় ও স্বদেশীয় ট্রাডিশন অনুযায়ী মূর্তিতে তাঁদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারে, প্রাণে বল ও উৎসাহ পেতে পারে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

তবুও ভাল করে দেবীর মুখে শোনবার জন্যে তার কৌতূহল হোল। প্রণয়দেবী বল্লেন—দেখ, পৃথিবীতেও এই একই ব্যাপার হয়। আত্মার অবস্থার সঙ্গে বাইরের আকৃতি বদলায়। সাধুর একরকম চেহারা, নিম্নস্তরের লোকের আর একরকম। কিন্তু পৃথিবীর স্থূল পদার্থের ওপর আত্মার প্রভাব তত কার্য্যকর হয় না। এখানে তা নয়। এমন কি এবেলা ওবেলা রূপের পরিবর্তন হয় এখানে। খুব প্রেম বা সহানুভূতির সময় এখানে মুখশ্রী দেখতে দেখতে অপূর্ব সুন্দর হয়ে ওঠে, ঠিক পৃথিবীর খুব ভাবপ্রবণ, কল্পনাময়ী, অপরূপ রূপসী কিশোরীর মত। আবার অন্য অবস্থায় অন্য রূপ ফুটে ওঠে মুখে। ইচ্ছামত পৃথিবীতে পোশাক বদলায়, এখানে তেমনি মূর্তি বদলানো যায়—

পুষ্প সকৌতুকে ভাবলে—অর্থাৎ কিনা আটপৌরে গেরস্থালী মূর্তি, পোশাকী মূর্তি, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করার মূর্তি, প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের মূর্তি, ভক্তের কাছে পুজো নেওয়ার মূর্তি—এরা আছে বেশ মজায়!

প্রণয়দেবী পৃথিবীর এই প্রগল্‌ভা বালিকার চিন্তা বুঝতে পেরে স্নেহের হাসি হাসলেন। বল্লেন—আমি পৃথিবীতে এখন যেতে পারচি নে। তুমি যাও, যতীনকে সঙ্গে নিয়ে যাও। এখানে সরে এসো, যে ব্যাপারের জন্যে পাঠাচ্চি এখানে এসে দেখ দাঁড়িয়ে।

ওদিকের যে প্রকাণ্ড বড় ফরাসী বে-উইণ্ডোর মত জানালার ধারে তিনি পুষ্প আসবার আগে দাঁড়িয়ে কি দেখছিলেন, পুষ্প গিয়ে সেখানে দাঁড়ালো।

দাঁড়াবামাত্র তার দৃষ্টিশক্তি যেন সহস্রগুণে বেড়ে গেল। লক্ষ কোটি যোজন দূরবর্তী এক অতি ক্ষুদ্র গ্রহ—পৃথিবীর এক ক্ষুদ্র গ্রাম ওর নয়নপথে পতিত হোল। দেখেই বুঝলে, বাঙ্‌লাদেশ। সন্ধ্যা নেমে আসচে।

নারিকেল সুপারি গাছে ঘেরা ছোট্ট একটা একতালা কোঠাবাড়ী। বাড়ীতে বিবাহ হচ্চে। উঠোনে ক্ষুদ্র শামিয়ানা টাঙানো, বাইরের বৈঠকখানায় ফরাস বিছানো, বরযাত্রীরা এখনও আসে নি, কন্যাপক্ষ ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করচে। সকলের একটা ব্যস্ততা ও উৎসাহের ভাব। কিন্তু সরুপাড় ধুতি পরনে একটি সতেরো আঠারো বছরের কিশোরী নিরানন্দ মুখে ঘরের এক কোণে চুপ করে বসে আছে। যেন আজকের উৎসবের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই—মাঝে মাঝে চোখের উদ্‌গত অশ্রু আঁচল দিয়ে মুছে ফেলে ভয়ে ভয়ে চকিতদৃষ্টিতে চারিদিকে চাইচে, কেউ দেখতে না পায়।

দেবী বল্লেন—ওই যে মেয়েটা দেখচো, ওর নাম সুধা, বিয়ে ওর ছোট বোনের। ওই মেয়েটার দুঃখে আমি এত কষ্ট পাচ্চি যে স্বর্গে থাকা আমার দায় হয়ে উঠেচে। ও অত্যন্ত প্রেমিকা মেয়ে—অত অল্প বয়সে অত ভাবপ্রবণ প্রেম-পাগলিনী মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। ও আজ বছর-দুই বিধবা হয়েচে—তের বছরে বিবাহ হয়েছিল। স্বামী বেঁচে ছিল বছর দুই। এই দু-বছরে স্বামীকে ও প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল। রোজ রোজ লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। আজ ওর ছোট বোনের বিয়ে। ওর কেবলই মনে হচ্চে ওর বিয়ের দিনটির কথা। আজ সারাদিন লুকিয়ে কাঁদচে পাছে মা বাবা মনে কষ্ট পায়। আমার আর সহ্য হয় না ওর দুঃখ—কি যে করি। তার চেয়েও করুণ ব্যাপার হচ্চে এই যে, মেয়েটিকে আমি তিনজন্ম ধরে লক্ষ্য করচি, তিন জন্মই ওর এই অবস্থা, বিয়ের অল্পদিন পরেই বিধবা হচ্চে। অথচ কি ভালবাসার পিপাসা ওর! কি প্রেমপ্রবণ হৃদয়! ...আর দেখচো, তো, গরীব ঘরের মেয়ে!

পুষ্পের হৃদয় গলে গেল অভাগী বালিকার জীবনের ইতিহাস শুনে। চোখে জল এল। সে বল্লে—কিন্তু আপনার তো অসীম শক্তি, আপনি তো ইচ্ছে করলেই ওর উপায় হয়।

দেবী বিষণ্ণ মুখে বল্লেন—তা হয় না, পুষ্প। কেন হয় না, চল তোমায় দেখাবো। তুমি আগে যাও--আমি কিছু পরেই যাবো। যতীনকে নিয়ে তুমি চলে যাও।

লক্ষ লক্ষ মাইল চোখের পলকে অতিক্রম করে পুষ্প এল ওদের বুড়োশিবতলার বাড়ীতে। যতীনকে সঙ্গে নিয়ে তারপর সে চলে এল সুধাদের বাড়ী। সুধাদের বাড়ী তখন বর এসেচে। মেয়েরা হুলু দিয়ে শাঁক বাজিয়ে বরকে এগিয়ে নিয়ে এল। সুধার সেখানে যাবার উপায় নেই। বাড়ীর বিধবা মেয়ে, মাঙ্গলিক কোনো অনুষ্ঠানে আজ তার সামনে থাকবার জো নেই। তবুও সে কৌতূহলদৃষ্টিতে ঘরের জানালার গরাদে ধরে উঠোনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে বর দেখচে। কৌতূহল অল্পক্ষণের জন্য তার শোককে জয় করেচে।

পুষ্প এসে সুধার পাশে দাঁড়ালো। সুধা যে আত্মা হিসেবে উচ্চশ্রেণীর তা তখনি বুঝলে পুষ্প, কারণ পুষ্পের প্রভাব সে তখনি নিজের মনের মধ্যে অনুভব করলে—তার ভারী মনটা তখনি হালকা হয়ে গেল। জীবনে সব যেন শেষ হয়ে যায় নি, আরও অনেক কিছু আছে, জীবনের তো সবে শুরু, বহুদূরের পথে কোথায় কোন্ বাঁকে নক্ষত্রের মত সারারাত জেগে আছে বনফুলের দল, চাঁদের আলোয় জ্যোৎস্নাময় হয়ে আছে সে জায়গা—আবার আশা ফুটে ওঠে মনে—অতীত বাসররাত্রির স্মৃতির আনন্দের মত পবিত্র অনুভূতিতে মন ভরে ওঠে।

যতীন দেখলে একটি আত্মা অনেকক্ষণ থেকে বিবাহসভার এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করচে। যতীনকে দেখে সে কাছে এল। বল্লে···আপনি কে? আপনি এখানে কেন?

যতীন বল্লে—আপনি কে?

—আমি এই বিধবা মেয়েটির স্বামী।

—ওকে একটু সান্ত্বনা দিন আজ।

আমি চেষ্টা করচি কিন্তু পারচি নে। আপনাকে দেখে বুঝেচি আপনি উচ্চ স্বর্গের মানুষ, আপনি যা পারবেন, তা আমি পারবো না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম আপনি এখানে কেন।

—এই মেয়েটির দুঃখে একটি দেবীর মন গলে গিয়েছে। তিনি পাঠিয়েচেন এখানে আমাদের।

—কই, আর কেউ তো নেই এখানে? আপনি তো একা—

যতীন পুষ্পের পাশেই ছিল, সুধার স্বামী খুব উঁচুদরের আত্মা নয়, ওরা দেখেই বুঝেছিল, সে দেখতে পেলে না পুষ্পকে।

যতীন বল্লে—কথাটা। সুধার স্বামী বিনীতভাবে তাকে এবং উদ্দেশে পুষ্পকে প্রণাম করলে। বল্লে—আমি বড় কষ্ট পাচ্চি ওর জন্যে। কিন্তু কিছু করবার নেই, ও যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ওকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি—কিন্তু আমার চেয়ে ওর অবস্থা উন্নত, আমার ক্ষমতা নেই কিছু করবার—

যতীন বল্লে--উচ্চস্বর্গের একজন দেবী আপনার স্ত্রীর ওপর কৃপাদৃষ্টি রেখেচেন--তিনি আমাদের এখানে পাঠিয়েচেন। তিনি নিজে এখুনি আসবেন—

পুষ্প বল্লে—তিনি এসেচেন, এই তো এলেন—

সুধার স্বামী পুষ্পের কথা শুনতে পেলে না, যতীন প্রণয়দেবীকে দেখতে পেলে না। কিন্তু প্রণয়দেবীর শান্ত কোমল প্রভাব সে মনের মধ্যে অনুভব করতে পারলে।

প্রণয়দেবী নিজে সব সময় সুধার পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন, বল্লেন—এদের ফেলে আমার কোথাও থেকে সুখ নেই। এবারও এদের ওই রকম ভুগতে হবে, সুধার স্বামী তত উচ্চ অবস্থার নয়—তা ছাড়া কেন এরা এ রকম ভুগচে তা আমি ঠিক জানি না। জগতে এইসব ঘটে যে অদৃশ্য বিরাট শক্তির নির্দেশ অনুসারে, সে শক্তি বড় রহস্যময়। তার কর্মপ্রণালী বা প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই বুঝি না, জানিও না।

পুষ্প বল্লে—তিনিই তো ভগবান?

প্রণয়দেবী চমকে উঠে বল্লেন—ও নাম কানে গেলে মন অন্যরকম হয়ে যায়। যখন তখন ও নাম নিও না। ভগবান যে কি, তা আমরা জানিনি এখনও। যে শক্তির কথা বলচি, হয়তো তাকেই তোমরা ওই নামে ডাকো।

সুধার বোনের বিয়ে হয়ে গেল, বরকনে বাসরঘরে চলে গিয়েচে এই মাত্র। গরীবের ঘরের বিয়ে, তবুও উঠানে ছোট শামিয়ানা টাঙানো হয়েচে প্রতিবেশীর বাড়ী থেকে চেয়ে এনে, আধমণটাক ময়দার লুচি ভাজা হয়েচে বরযাত্রী ও প্রতিবেশীদের খাওয়ানোর জন্যে, তারা খেতেও বসেচে। গ্রামের বৌ-ঝির দল সেজেগুজে বাসরঘরে ঢুকে বরের চারিপাশে ভিড় জমিয়ে তুলেচে। প্রণয়দেবী ঘরে ঢুকে এক কোণে দাঁড়িয়ে প্রসন্নদৃষ্টিতে চারিদিকে চাইলেন, যেন মনে মনে সকলকে আশীর্বাদ করলেন। আজকার দিন এবং সময় তাঁর চরণপাতের শুভ সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়ে গেল।

কিন্তু যতীন বিষণ্ণ মনে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল—আজকার বিবাহ-উৎসবের দৃশ্যে তার মনে হচ্ছিল, আশার সঙ্গে এমন এক উৎসবের মধ্যে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু আজ কোথায় সে আর কোথায় আশা! সুধার মত আজ সে বিধবা, জীবনের সব সাধ আরও আজ ফুরিয়ে গিয়েচে—পরের সংসারে পরের হাততোলা খেয়ে—

পুষ্প ধমক দিয়ে বল্লে—যতীন-দা!

এই সময় প্রণয়দেবী বল্লেন—সুধা রান্নাঘরের কোণে বসে কাঁদচে, একটু ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াও পুষ্প।

পুষ্প এসে দেখলে সুধার স্বামীও সেখানে উপস্থিত। তারও চোখে জল। মরণের যবনিকার আড়ালে প্রেমের এই লীলা পুষ্পকে মুগ্ধ করলে। প্রেম মরণজয়ী, এই সত্যটা এই দৃশ্যে যেন পুষ্পের মনে ভাল করে অাঁকত হয়ে গেল।

একটু পরে প্রণয়দেবী নিজে সেখানে এসে দাঁড়ালেন। সুধার মাথায় তাঁর হাত রেখে বল্লেন—কোনো দুঃখ কোরো না। আমি মিলন করিয়ে দেবো। তোর মত মেয়ে লক্ষ লক্ষ রয়েচে আমার পৃথিবীতে—তাদের ছেড়ে স্বর্গেও যেতে পারি নে।

পুষ্প বল্লে—আপনার মত দেবী ইচ্ছে করলে সুধার কোনো উপকার হয় না?

—আমি সেবা করতে পারি, বিশ্বের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করবার আমি কে? আমার মত হাজার হাজার আছেন দেবদেবী। তা ছাড়া পৃথিবীর মানুষদের নিয়ে আমার কারবার। অগণ্য জীবলোক রয়েচে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে—তাদের জন্যে অন্য সব দেবদেবী আছেন।

—তাঁদের আপনি জানেন?

—জানি তাঁরা আছেন—পরিচয় সকলের সঙ্গে নেই। আমাদের শক্তি মানুষের চেয়ে হয়তো বেশী, তবুও সীমাবদ্ধ। চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই।

সেদিন যতীন বুড়োশিবতলার ঘাটে একা বসে অন্যমনস্কভাবে আশালতার কথা ভাবলে অনেকক্ষণ। পুষ্প ওকে সব কথা বলেচে, প্রণয়দেবীর মুখে যা কিছু শুনেছিল। তিনিই যখন অদৃষ্টকে উল্টে দিতে পারেন না, সে তো অতি তুচ্ছ ওঁর কাছে—কি করতে পারে সে? আশাকে তার নিজের ভাগ্যের পথে চলতে হবে।

পশ্চিমাকাশে অস্তসূর্য্যের রাঙা আভা। গঙ্গার বুকে পাল তুলে ছোট বড় নৌকার দল চলেচে। দু-একটা মাছরাঙা পাখী ছোঁ মেরে মাছ ধরচে ডাঙা থেকে অনতিদূরে। নৈহাটির গঙ্গা, কেওটা-সাগঞ্জের গঙ্গা।

কতক্ষণ সে এ রকম বসে ছিল জানে না, হঠাৎ সে চমকে উঠে দেখলে একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে। যতীন শশব্যস্তে উঠে তাঁকে প্রণাম করলে।

আগন্তুক বল্লেন—বেশ করে রেখেচ হে তুমি! পৃথিবী থেকে অল্পদিন এসেচ?

—আজ্ঞে হাঁ।

—তাই দেখচি। হুগলী জেলায় বাড়ী ছিল? তাই গঙ্গার ধার-টার ঠিক এই রকম করেচ। এ সব মায়া। জগৎ বা বিশ্বটাও তেমনি মায়া—সেই এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ছাড়া সব মায়া। কোন কিছুর মধ্যে বাস্তবতা নেই।

যতীন মনের মধ্যে হাতড়াতে লাগলো। এই ধরনের একটা মতের কথা সে শুনেছিল, একবার একটা বইয়েও পড়েছিল যেন। মনে মনে বল্লে—অদ্বৈতমত বলচেন?

মহাপুরুষ যেন একটু বিস্ময়ের ভাবে বল্লেন—অদ্বৈত বেদান্ত সম্বন্ধে তুমি জানো? তবে বই পড়লে কি হয়? প্রত্যক্ষ অনুভূতি চাই। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি চাই। তুমি মরে এখানে এসেচ, কিন্তু জ্ঞান জন্মায়নি ভেতরে। এখানে হুগলীর জেলার গঙ্গার ঘাট তৈরী করে রেখেচ। এমনি করেচে অনেকেই এখানে। সব মায়া। আবার পৃথিবীতে জন্ম নিতে হবে গিয়ে—অদ্যবাব্দশতান্তেবা—আজই হোক, দুশো বছর কি হাজার বছর পরেই হোক। অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি ভিন্ন মুক্তি নেই।

যতীন ভয়ে ভয়ে বল্লে—আজ্ঞে, মুক্তি মানে কি?

—ভগবানের সঙ্গে একাত্মবোধ। যোগসাধনা ভিন্ন তা সম্ভব নয়। উপনিষদে দুটি পাখীর রূপক বর্ণনা আছে। একটি গাছের দুটি ডালে ওপরে নীচে দুটি পাখী বসে রয়েচে। নীচের পাখীটা মিষ্ট ফল খাচ্চে, কটু ফল খাচ্চে,—ওপরের পাখী নির্বিকার অবস্থায় বসে আছে, সুখ-দুঃখে উদাসীন, নিজ মহিমায় মগ্ন। একটি পরমাত্মা, অপর পাখীটি ইন্দ্রিয়সুখমগ্ন জীবাত্মা। নীচের পাখীটি যখন ওপরে ওঠে ওপরের পাখীটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে—তখনই তার মুক্তি।

তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি—

যতীন এমন কথা কখনো শোনেনি। বিস্ময়মুগ্ধের মত চেয়ে রইল সন্ন্যাসীর দিকে। সে ভেবেছিল মরণের পর যখন বেঁচে আছে, তখন তার আর ভাবনা কি? কিন্তু এখন ওর মনে হোল কোথায় যেন কি গলদ রয়ে গিয়েচে। সে বিনীতভাবে বল্লে—আজ্ঞে তবে আমাদের উপায়? আমাদের কে যোগ-শিক্ষা দেবে, কি হবে—শুনেচি সে বড় খটমট ব্যাপার—ওসব কি আমাদের জন্যে?

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—খুব সোজা নয়, শক্তও নয়। আমিও পৃথিবীতে তোমারই মত মানুষ ছিলাম। যৌবনে স্ত্রী-বিয়োগ হোল, সংসার মিথ্যা মনে হোল। তবুও পাঁচ বছর সংসারেই রয়ে গেলাম। তারপর সন্ন্যাস গ্রহণ করলাম। সদ্‌গুরুর সন্ধান পেলাম। আসামের এক জঙ্গলে পনের বছর যোগ অভ্যাস করবার পর একদিন গুরুর কৃপার নির্বিকল্প সমাধি হোল।

যতীন রুদ্ধনিঃশ্বাসে বল্লে—তারপর।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—তারপর? তারপর আর কিছুই না। মুখে সে অবস্থার কথা বলা যায় কি? সে তুমি কি বুঝবে? এখনও তুমি ছেলেমানুষ মাত্র। বড় উচ্চ অবস্থার কথা সে সব। তুমি আর নির্গুণ ব্রহ্ম এক। মায়া তোমার স্বরূপ আবরণ করে বসেচে। তুমি কেন, পৃথিবীর সব কিছু। ছোট কেউ নও। তোমরা সবাই অজর অমর, শাশ্বত

আত্মা—তুমিও এ জগতের কর্তা, এ জগৎকে সৃষ্টি করেচ—তবে ছোট হয়ে আছ কেন? এই লোকে এসেচ—এও উপাধির লোক। এর আরও ওপরে উচ্চতর লোক আছে—মহা জ্যোতির্ময় লোক, দেবদেবীরা সেখানে বাস করেন। তোমার মত লোক তার ধারণা করতে পারবে না। জগৎকে সৃষ্টি ও লয় করতে তাঁরা সমর্থ। কিন্তু সেও অনিত্য। সেও উপাধি ও স্বগুণস্তরের জগৎ। তারও ওপরে নিরুপাধি নির্গুণ ব্রহ্ম বিরাজ করেন। সেখানে পৌঁছুনো মানুষের আগ্রহ থাকলেই হয়। আসলে তোমার সঙ্গে তার অভিন্নতা কোথায়? এ জগতে দুঃখ নেই, পাপ নেই, শোক নেই, ভয় নেই, মৃত্যু নেই সে তো দেখেই নিলে, ক্ষুদ্রত্ব নেই, এসব কিছু নেই—আছে শুধু আনন্দ, অমরত্ব, বিরাটত্ব। আর তুমিই তার অধিকারী। অতএব ওঠো, জাগো—তৎ ত্বমসি—তুমিই সেই।

সন্ন্যাসীর সর্বদেহ দিয়ে একপ্রকার নীল বিদ্যুতের মত জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্চে তাঁর দিকে চাওয়া যায় না। যতীন তাঁর পদস্পর্শ করবার জন্যে মাথা নীচু করতেই তিনি বল্লেন—উঁহু—ছোট ভেবে আমার পা ছুঁয়ে তোমার কি হবে? ছোট তুমি নও। তুমিই দেব, তুমিই দেবী, তুমিই সগুণ ঈশ্বর—তুমিই জগৎকারণ নিরুপাধি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—একই আছে, আর কিছু নেই জগতে—একম্ এব, অদ্বিতীয়—পৃথিবী বা পরলোক সব দুদিনের খেলা, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু—বার বার আসা-যাওয়া—সব অনিত্য—জেগে ওঠো—ঘুম ভেঙে জেগে ওঠো।

সন্ন্যাসী এত জোরে জোরে কথাগুলো বল্লেন—যতীনের মনে হোল তার সমস্ত শরীরে হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ খেলে গেল—সন্ন্যাসীর দেহ থেকেই যেন সে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ছুটে এল তার দেহে। সে চোখের সামনে কতকগুলো গোল গোল জড়ানো জড়ানো গোলকধাঁধা খেলার মত কি দেখলে—তারপর আর তার জ্ঞান রইল না। যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যে সে যেন কোথায় চলেচে!

নীল আকাশ, সোম-সূর্য্য-তারকাচিহ্নিত—তার আশেপাশে, উর্দ্ধে, নামোতে। বহু দূরে নীল সমুদ্রে ডুবে একটা কুণ্ডলীকৃত নীহারিকা পাক খাচ্চে—লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি নক্ষত্র, সূর্য,—কুয়াসার ঢেউএর মত উল্কাপিণ্ডদল বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্রের বহির্দেশে ভ্রাম্যমান—লক্ষ লক্ষ জীবজগৎ, কোটি কোটি জীবজগৎ, লক্ষ কোটি লক্ষ কোটি আত্মিক লোক—কত লীলা, কত খেলা, কত সুখদুঃখের অনন্ত প্রবাহ—অনন্ত জীবজগৎ......

এ সবও ছাড়িয়ে এক জ্যোতির্ময় রাজ্যের প্রান্তে গিয়ে একটি অপূর্ব শান্তির অনুভূতি সে অনুভব করলে...সুগভীর আনন্দ ও শান্তি, আর যেন মনে কোনো আশা নেই, কোনো তৃষ্ণা নেই, সুখ নেই, দুঃখ নেই, পাপের ভয় নেই, পুণ্যের স্পৃহা নেই, স্বর্গভোগের আকাঙ্ক্ষা নেই, পুষ্পের প্রতি প্রেম নেই, আশালতার প্রতি অনুকম্পা নেই—মনই নেই—যেন শুধু আছে 'আমি আছি' এই অনুভূতি, আর আছে তার সঙ্গে মিশে এক অতি উচ্চস্তরের আনন্দ, শান্তি, মহা উচ্চ জ্ঞান স্বয়ম্ভু স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বের গভীর অনির্বচনীয় আনন্দ।

যতীনের মনে হোল সেই সন্ন্যাসী যেন কোথায় তার আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেচেন...কখনও তাঁর জ্যোতির্ময় দেহ দেখা যায়, কখনও যায় না।

তারপর সেই জ্যোতির্ময় দেশের অপূর্ব শান্তি ও আনন্দময় আবেষ্টনীর মধ্যে সে প্রবেশ করলে...সঙ্গে সঙ্গে সেই সুগভীর পুলকে তার মন আবার ভরে উঠলো—উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দেহধারী দেবদেবীরা সে রাজ্যের মণ্ডলে বিচরণ করচেন, তাঁরা যে আসনপীঠে ঠাকুর সেজে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছেন তা নয়, তাঁরা যেন সে জগতের সাধারণ অধিবাসী, নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত আছেন, তাই কেউ আকাশপথে বায়ুভরে চলেচেন, সমতল ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল পৃথিবীর মানুষের মত নন তাঁরা—উর্দ্ধে, নিম্নে

—সর্বদিকে সমান গতি তাঁদের...দু'একজনকে কাছে থেকে দেখবারও অবসর সে পেলে ...পৃথিবীর মানুষের মত দেহ বটে, কিন্তু যেন বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, দেবীদের মুখের সৌন্দর্য্য অতুলনীয়, তাদের পৃথিবীর বাড়ীতে ছেলেবেলায় একটি প্রাচীন পটুয়ার আঁকা রাজরাজেশ্বরী মূর্তি ছিল দেওয়ালে টাঙানো, তার বৃদ্ধা ঠাকুরমা রোজ স্নান সেরে সেই পটের পুজো করতেন, খানিকক্ষণের জন্যে যেন পটের মুখ হাসতো—এতদিনের মধ্যে জীবনে সে সেই পটে আঁকা রাজরাজেশ্বরীর মুখশ্রীর মত সুন্দর ও কমনীয় মুখশ্রী আর দেখেনি...এখানে সে দু-একটি দেবীর মুখ যা দেখবার সুযোগ পেলে, পটের সে ছবির মুখের চেয়ে অনেক, অনেকগুণে সুশ্রী, আরও মহিমময়ী, বক্র চাহনির মধ্যে ত্রিভুবনী-বিজয়ী শক্তি...অথচ মুখে অনন্ত করুণার বাণীমূর্তি...

কোথায় যেন রাশি রাশি বনপুষ্প ফুটেচে, নির্বাত ব্যোম তাদের সম্মিলিত সুবাসে ভরপুর...

এসবও ছাড়িয়ে চললো সে...মহাবিদ্যুতের মত তার গতি, কোথাও অনন্ত ব্যোমে, মহাশূন্যের সুদূরতম প্রান্তে, অনন্তের জ্যোতি-বাতায়ন সেখানে চারিদিকে উন্মুক্ত... দেবদেবীর বাসস্থান এ সব মহাদেশও যেন আপেক্ষিক চৈতন্যের রাজ্য; বাসনার রাজ্য... এদেরও দূর, বহুদূর পারে, সব আকাশ ও সময়ের পারে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যেখানে এক হয়ে মিলিয়ে গিয়েচে—সোম সূর্য নেই, তারকা নেই, অন্ধকার নেই, আলোও নেই—সেই এক বহুদূর দেশে সে গিয়ে পৌঁছেচে...এদেশ আকারধারী জীব বা দেবদেবীর রাজ্য নয়, সর্ববিধ আকার এখানে জ্যোতিতে লোপ পেয়েচে, অথচ এ জ্যোতিও দৃশ্যমান আলোকের জ্যোতি নয়, আগুন নয়, বিদ্যুৎ নয়—কি তা সে জানে না...তার সর্বদিকে, তাকে চারিধার থেকে ঘিরে এই জ্যোতি...আর কি একটা বিচিত্র, অনির্বচনীয় অনুভূতি...ওর মন লোপ পেয়েচে অনেকক্ষণ, চৈতন্যও যেন লোপ পেতে বসেচে... অথচ যতীনের মনে হোল এই তার আপন স্থান, এতদিনে আপন স্থানে সে ফিরে এসেচে...এই তার বহুপরিচিত স্বদেশ...যুগ-যুগান্ত, কত মহাযুগ ধরে সে এখানে আবার ফেরবার অপেক্ষায় ছিল। মহাব্যোমে আর কেউ নেই, আশালতা না, পুষ্প না, তার যতীনও না, সন্ন্যাসী না, তাদের এ লোকে বাঁধা কত সাধের ঘর বা বুড়োশিবতলার ঘাট না, দেব না, দেবী না, পরলোক না, এমন কি ঈশ্বরও না...

মহাব্যোমের মহাশূন্য অনাদি, অনন্ত স্বয়ম্ভু, স্বপ্রকাশ, নির্বিকার, নির্বিকল্প সে শুধু আছে—পাপহীন, পুণ্যহীন, মঙ্গলহীন, অমঙ্গলহীন, সুখহীন, দুঃখহীন সর্বপ্রকার উপাধিহীন...

সে-ই আছে মাত্র একা।

নিঃসঙ্গ মহাব্যোমে আর কোথাও কিছু নেই, কেউ নেই!

সে-ই সব।

এমন কি, এ মহাব্যোমও তার সৃষ্টি—সৃষ্টি নয়—সে নিজেই

যতীন আর কিছু জানে না।

যখন ওর চৈতন্য হোল তখন সে দেখলে সেই মহাসন্ন্যাসী পাশেই বুড়োশিবতলায় ঘাটের রাণাতে বসে আছেন—সে তাঁর এপাশে বসে। যেন সে ঘুম ভেঙে উঠেচে এইমাত্র।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—কি হোল? দেখলে?

যতীন মূঢ় ও অভিভূতের মত তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—কি দেখলাম বলুন দিকি?

—আমি চললাম। যা দেখলে, দেখলে। মুখে কি বোঝাবো? মন নিম্নস্তরের ইন্দ্রিয় মাত্র, ওর চেয়ে বড় অনুভূতির দরজা যেদিন খুলবে, সেদিন আমায় বোঝাতে হবে না, নিজেই বুঝবে। তোমার সে অবস্থার এখনও বহু বিলম্ব। দু-চার জন্মে হবে না। অনেকবার এখনও পৃথিবীতে যাতায়াত করতে হবে।

তিনি যাবার উদ্যোগ করচেন দেখে যতীন ব্যাকুলভাবে বল্লে—প্রভু, যাবেন না, যাবেন না। পুষ্প বলে একটি মেয়ে আছে, তাকে একবার দেখা দিয়ে যাবেন দয়া করে?

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—সময় হোলে দুজনেই দেখা পাবে আবার। তবে স্ত্রীলোকের পথ ভক্তির, জ্ঞানের নয়। আমি তোমাদের দুজনকেই জানি. গত তিন জন্ম তোমরা আমার দেখা পেয়েচ, তোমাদের ভালবাসি। কিন্তু তাতে কি হবে? সময় হয়নি। চক্রপথে ঘুরতে হবে অনেকদিন। আমি আছি তোমাদের পেছনে। নতুবা আমার দেখা পেতে না।

সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হোলেন।

১৩

একটু পরে পুষ্প এল। বল্লে—কি করছিলে?

যতীন তার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—পুষ্প, তুমি মায়া? মিথ্যে?

—সে কি যতীন-দা? ব্যাপার কি?

—এ সব ভেল্কি? তুমি বুঝিয়েচ পরলোক-টরলোক। আমরা মরে ভূত হয়ে আছি। চক্রপথে এখনো আমাদের অনেক ঘুরতে হবে।

পুষ্প খিল খিল করে হেসে বল্লে—এ তত্ত্ব তুমি জানলে কোথায়? নতুন কথা তোমার মুখে!

—হাসি নয়। আমার মনে শান্তি নেই। এক মহাপুরুষ এসে অদ্ভুত দর্শন করিয়ে গেলেন আমার গা ছুঁয়ে। এখন বুঝেচি সব মিথ্যে।

—কিছুই বোঝোনি। বুঝতে অনেক দেরি! ভগবানের দয়া যেদিন হবে সেদিন বুঝবে। এ আমি অনেকদিন জানি। কিন্তু তাতে কি? এতেই আনন্দ। যুগে যুগে আসবো যাবো, এর শোক-দুঃখেও আনন্দ খুঁজে নেবো। লীলাসঙ্গী হয়ে থাকবো তাঁর। তিনিই খেলা করচেন, খেলুড়ে না পেলে খেলা করবেন কাকে নিয়ে? সবাই ব্রহ্ম হয়ে বসে থাকলে সব শূন্য, নিরাকার। তুমি নেই, আমি নেই, জগৎ নেই—ইহলোক নেই, পরলোক নেই। সত্যি কথা। কিছুই নেই—আবার সবই আছে। খেলা করো না দুদিন, যতদিন তিনি খেলাবেন।

—তারপর?

—তারপর সকলের যা গতি, তোমারও তাই। তাঁতে ভক্তি রাখো, সব হবে। তুমি তো তুমি, আমি তো আমি—লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অতি উচ্চ স্তরের আত্মা, যাঁরা দেব-দেবী হয়ে গেছেন—তাঁরাও তাই।...সব অনিত্য।

—তুমি এসব কি করে জানলে?

—করুণাদেবী সেদিন বলেচেন। ও নিয়ে মন খারাপ কোরো না। ও শেষ অবস্থার কথা। যখন সে অবস্থা আসবে, তখন আর বসে ভাবতে হবে না। তিনিই পথ দেখিয়ে দেবেন। এখন চলো, আশাবৌদির বড় বিপদ, কিছু করতে পারি কিনা দেখা যাক্—

যতীন ব্যস্ত হয়ে বল্লে—কি-কি-কি বিপদ? আশার? কি হয়েছে?

পুষ্প কৌতুকের হাসিতে ভেঙে পড়লো যেন। বল্লে—ঐ! এত বাসনা এত মায়া

যার মধ্যে এখনও, তিনি জগৎকে উড়িয়ে দিয়ে ভগবানে মিশে যেতে চান! সন্ন্যাসি ভেল্কি দেখালে কি হবে, ও অবস্থা তোমার-আমার জন্যে নয়। পৃথিবী ছেড়ে এসে এখনও তার বাঁধন কাটাতে পারেন না, উনি বড় বড় বুলি ঝাড়েন!

—সন্ন্যাসী তাই বলছিলেন, সময় হয়নি।

—সময় শুধু হয়নি যে তা নয়—হোতে ঢের দেরি। ও নিয়ে মাথা ঘামাবে না বলে দিচ্চি। তাঁর লীলাসঙ্গী হয়ে থাকো, মনে মনে সর্বদা তাঁকে ভক্তি করে ডাকো। তিনিই আলো জ্বালবার কর্তা। করুণাদেবী কি কম উঁচু স্তরের জীব? কিন্তু উনি বলেন, আমি মনেপ্রাণে মেয়েমানুষ—সুখদুঃখ স্নেহভালবাসা নিয়ে থাকতে ভালবাসি। তাঁর সঙ্গে মিশে যেতে চাই নে, লীলাসহচরী হয়ে থাকি তাঁর সৃষ্টিতে। তাঁকে ভালবাসি মনেপ্রাণে, তাঁর জীবদের সেবা করি যুগে যুগে। এই আমার তপস্যা। মুক্তি চাইনে।

—সত্যি, এমন না হোলে আর দেবী! দেবী কি—সাক্ষাৎ মা! জগতের করুণাময়ী মা। আমাকে একবার দেখা দিতে বোলো, পায়ের ধুলো নেবো—না ভুল হোলো, ধুলো আর এখানে কোথায়? তা ছাড়া ওঁদের পায়ে কি ধুলো লাগে! এত উচ্চ স্থান তাঁর এ আমি জানতাম না।

—আচ্ছা আর অত বিচার করতে হবে না তোমায়। আমি বলবো তোমায় দেখা দিতে। ওঁরাই তো দেবী। পৃথিবীতে ওঁদেরই তো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে পুজো করা হয়। ও'রাই দুর্গা, ও'রাই কালী, ও'রাই সরস্বতী। নামে কি আসে যায়। অন্য দেশে হয়তো অন্য নামে পুজো করে।

—এখন কিছু কিছু বুঝচি। আগে এ সব কথাই শুনিনি কখনো পুষ্প—সত্যি বলচি।

—সময় না হোলে শুনতেও পায় না কেউ। অবধূত তোমায় কি দেখালেন বলো না।

যতীন বর্ণনা করলে। বর্ণনা করবার সময় তার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সেই অপূর্ব অনুভূতি ও পুলকের স্মৃতি এখনও ওর মনে খুব জাগ্রত—তাই বর্ণনা করতে গিয়ে এখনও তার কিছুটা যেন আবার সজাগ হয়ে উঠলো মনে।

আবার সেই অতীন্দ্রিয় জগৎ, যেখানে সংকল্পও নেই, বিকল্পও নেই, মনের পারের সেই অনির্দেশ্য রাজ্য, ক্ষণকালের জন্যও যার মধ্যে প্রবেশের অধিকার সে পেয়েছিল মহাপুরুষ অবধূতের কৃপায়—সে জগতের বর্ণনা মুখে সে কি দেবে? কথা তার জড়িয়ে যেতে লাগলো, ঘন ঘন রোমাঞ্চ হতে লাগলো সে অবস্থার স্মরণে। পুষ্প সব শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

পরে হাত জোড় করে উদ্দেশে প্রণাম করে বল্লে—তাঁর চরণে প্রণাম করো যতীনদা। বড় ভাগ্যে তাঁর সাক্ষাৎ পেয়েচ। সাক্ষাৎ ঈশ্বরের সমান ওঁরা। কি পুণ্য না জানি ছিল তোমার!

দুজনে পৃথিবীতে নেমে এসেচে।

সন্ধ্যার কিছু পরে। যতীন কবি নয়, কিন্তু, পৃথিবীর এ সন্ধ্যা, কি যে ভাল লাগলো ওর! পৃথিবীতে বৈশাখ মাসের প্রথম, আম্রনিকুঞ্জের নিভৃত অন্তরালে কোকিলের ডাক, সন্ধ্যা হওয়ায় প্রস্ফুটিত বিল্বপুষ্পের ঘন সুবাস, একটি জামগাছে কচি সবুজ থোলো থোলো জাম ধরেচে, রাঘবপুরের হাট সেরে হাটুরে গোরুর গাড়ীর সারি চুয়াডাঙ্গার কাঁচা সড়ক ধরে চলচে আম-কাঁঠাল বাগানের তলায় তলায়, মাঠে মাঠে আউশ ধানের ক্ষেতে সবুজ ধানের জাওলা।

আশাদের পুকুরের ধারের তেঁতুল গাছের তলায় ওরা বসলো। যতীনের মনে হোল, কি সুন্দর পৃথিবীর বসন্ত! সেই বহুপরিচিত প্রিয় পৃথিবী, কত দুঃখ-সুখ, আশা-আনন্দের স্মৃতিতে ভরা। সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়ে ভাল আছে কি মন্দ আছে জানে না, কিন্তু পৃথিবীতে এলেই মন সরে না এখান থেকে যেতে। এই বৈশাখে কাঁচ আমের ঝোল, বেলের পানা, ঐ অদূরবর্তী চূর্ণী নদীতে এই গরমের দিনে অবগাহন স্নান, হাট থেকে পাকা তরমুজ কিনে আনা...নাঃ, পৃথিবীই ভালো। কোথায় এ সব সুখ? মাটির পথে চলার ছোটখাটো কত আনন্দ, কত স্মৃতি...হাসি অশ্রু...

পুষ্প হঠাৎ বল্লে—কি ভাবচো যতীন-দা? ব্রহ্মজ্ঞান পেতে গিয়েছিলে না?

—না পুষ্প, বড় ভাল লাগচে। অনেক দিন পরে এসে—

—পৃথিবীর বাতাসে বাসনা-কামনা ভাসচে, এজন্য বড় বড় আত্মারা পৃথিবীতে আসতে চান না। ছেলেবেলায় যাত্রা হয়েছিল একটা গান শুনেছিলে নৈহাটিতে? 'এ বাঁধন বিধির সৃজন, মানব কি তায় খুলতে পারে'—পৃথিবীতে ফিরে এসে বেশীক্ষণ এই জন্যে থাকতে নেই। ঐ ছোটখাটো সুখদুঃখের সোনার শেকলে বাঁধা পড়তে সাধ যায়। 'পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে'—তুমি তো তুমি!

—যা বলেচ পুষ্প, তুমি দেখছি অনেক কিছু জানো—

—সত্যি যতীন-দা। আমার কি ইচ্ছে হয় না? এখনই হচ্চে। বড় বড় আত্মা পর্যন্ত অনেক সময় পৃথিবীতে কিছুক্ষণের জন্যে ফিরে পুনর্জন্ম গ্রহণের কামনা করেন। নিম্ন-স্তরের দুর্বল আত্মার তো কথাই নেই। খুঁৎ খুঁৎ করে পৃথিবীর কাছাকাছি ঘোরে। নয়তো ফট্ করে আবার জন্ম নিয়ে বসে। তাদের ঘন ঘন পৃথিবীতে আসা বারণ!

যতীন হেসে বল্লে—যেমন আমি—

—তুমি কেন, অনেক মহারথীর এই দশা হয়। কিন্তু তাই যদি হবে, তবে মানুষ এগিয়ে চলবে কবে? ভগবানের তা ইচ্ছে নয়। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—এক জায়গায় বাঁধা পড়ে থাকলে চলবে না। পথ অফুরন্ত, পথের পাশে ফুলের সুগন্ধে গাছতলায় ঘুমিয়ে পড়তে ভাল লাগে বটে কিন্তু তা আমাদের গতি আটকে দেবে। অভীঃ, ভয় নেই—এগিয়ে চলো, অভীঃ—

—ওঃ, তুমি এত কথা জানলে কবে পুষ্প?

—করুণাদেবীর সঙ্গে কি এমনি এমনি বেড়াই! তা ছাড়া আমি তোমার কত আগে এখানে এসেচি জানো তো? দয়া করে ওঁরা আমায় শিখিয়েচেন। ভগবানের মহাশক্তিই এগিয়ে নিয়ে চলেচে সবাইকে—

হঠাৎ পুষ্প পুকুরপাড়ের ওদিকে চেয়ে বল্লে—ঐ দ্যাখো যতীন-দা—

যতীন চেয়ে দেখলে পুকুরপাড়ের আমবাগানের তলায় চুপি চুপি চোরের মত একটি লোক এসে দাঁড়ালো। একটু পরেই ওদের বাড়ীর খিড়কিদোর খুলে আশা বের হয়ে এল এবং গাছতলায় লোকটির সঙ্গে যোগ দিলে। যতীন সর্বশরীরে কেমন একটা জ্বালা অনুভব করলে। সংস্কারের প্রভাব, জ্বালা তো দেহের নয়, আসলে মনের।

সে আপন মনে বলে উঠলো—যদু মুখুয্যের ছেলে নেত্যনারায়ণ—

পুষ্প বল্লে—চেন ওকে?

—কেন চিনবো না? শ্বশুরবাড়ীর এ পাড়াতেই ওদের বাড়ী, ও কলকাতায় কি চাকরি করতো জানি, বি-এ পর্যন্ত পড়েছিল তাও জানি। আশা বলতো প্রায়ই, আমাদের গাঁয়ের নেত্যদা। এবার বি-এ পাশ দেবে। উঃ, আশা যে এতদূর নেমে যাবে—! এখনও আমি দুবছর মরিনি—এর মধ্যেই—পাপীয়সী!

—যাত্রাদলের ভীমের মত কথা শুরু করে দিলে যে যতীন-দা! আশা-বৌদির

বয়সের কথা ভেবো। জড়দেহ থাকলেই তার কামনা বাসনা আছে। বড় বড় হাতী তলিয়ে যাচ্ছে তো মূর্খ আশা-বৌদি!

যতীন বিরক্ত হয়ে বল্লে—লেকচার রাখো। এই দেখাতে নিয়ে এলে' উঃ, ইচ্ছে হচ্চে ছোকরার ঘাড়টা মট্‌কাই—পারি কই? হাত পা যে হাওয়া!

অত অধৈর্য্য হয়ো না। খুন করবার প্রবৃত্তি জাগলো কেন? একটা কিছু করতে হবে। সে কিন্তু ওভাবে নয়। একটা ছোকরাকে মারলে আরও অনেক ছোকরা জুটবে। মন নীচু দিকে নামলে জলের মত গড়িয়েই চলে। আশা-বৌদির অদৃষ্ট ভাল না। এখনও অনেক দুঃখ, অনেক অপমান আছে ওর ভাগ্যে, তুমি আমি কি করবো? কর্ম-ফল ওর। বেচারী! এখন ওরা যা করচে, তাতে বাধা দিতে তুমি আমি কেউ নই! মানুষ স্বাধীন, সে পুতুলখেলার। পুতুল নয়। বাসনানদী পাপের পথেও বয়, পুণ্যের পথেও বয়। চলো, এক কাজ করি।

যতীন কিন্তু এগিয়ে গেল পুকুরের ওপাড়ের দিকে। আশার পরনে সরু কালোপাড় ধুতি, হাতে ক'গাছা সোনার চুড়ি, যতীন চিনতে পারলে তাদের গ্রামের মহেন্দ্র সেকরার দোকান থেকে বিয়ের পরের বছর গড়া। আশা বসে পড়েচে গাছের গুঁড়ির আড়ালে, নেত্যনারাণ কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে।

আশা বলচে—বাড়ী করে দিলে গাঁয়ের লোক যদি কিছু বলে?

নেত্য হাত নেড়ে বল্লে—থোড়াই কেয়ার। এ শর্মা আর কাউকে ভয় করে না। তুমি ঠিক থাকলেই হোল। তুমি বলবে, বাপের বাড়ীর সংসার আর দুদিন পরে ভাই-এদের সংসার হবে। আমার শ্বশুরবাড়ীর টাকায় আমি বাড়ী করচি। মিটে গেল, কার কি বলবার আছে?

—ও জমিটা তা হোলে কিনতে হবে তো?

—সে লেখাপড়া আমি করে দেবো। বেশ হবে, ইটের দেওয়াল আর খড়ের চালা করে দিই। তুমি ওখানে চলে যাও। পাড়ার বাইরে ঘর হবে, একটু বেশী রাত করে চলে যাবো, শেষ রাতে উঠে চলে আসবো। এমন বনে-জঙ্গলে ভয়ে ভয়ে আর দেখা করতে হবে না। সারারাত্রি মজা করো, কি বলো?

—তুমি যা বোঝো। আমার কিন্তু হাতে মাত্র পঞ্চাশটি জমানো টাকা আছে, আর কিছু নেই বলে দিচ্চি—দু-এক কুঁচো গহনা-ভাঙা সোনা হয়তো আছে। বাড়ী করবার খরচ কিন্তু তোমায় দিতে হবে।

নেত্য হাসিমুখে বল্লে—দেখি মুখখানা? ও মুখ দেখে বাড়ী তো বাড়ী, পয়সা থাকলে মটোর গাড়ী কিনে দিতে পারতাম। কিন্তু বলে দিচ্চি, ও শম্ভু চক্কত্তিটার সঙ্গে আর কথা বলতেও পাবে না কোনো দিন।

আশা হেসে বল্লে—আহা! শম্ভুদা'র ওপর তোমার অত হিংসে কেন? আমি কবে কি করচি তার সঙ্গে? সে আসে যায়, পাশের বাড়ীর ছেলে, তাড়িয়ে তো দিতে পারিনে?

—আচ্ছা, ভালো কথা। নিজের বাড়ী হোলে সে তো আর পাশের বাড়ীর ছেলে থাকবে না, তখন নতুন বাড়ীতে না ঢোকে যেন।

আশা একটু ভেবে বল্লে—হ্যাঁগো, এতে গাঁয়ে কোনো কথা উঠবে না তো? আমি মেয়েমানুষ, কি বুঝি বলো। তুমি রাগ কোরো না—আমার ভয় করে।

—কোনো ভয় নেই। নেত্য মুখুয্যে যে কাজে হাত দেবে, তাতে কিছু গোলমাল হবে না। কিছু ভেবো না।

কথা শেষ করে নেত্য আশার পাশে বসে পড়ে তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে—আমায় ভালোবাসো আশা?

আশা এদিক ওদিক চেয়ে মৃদুস্বরে বললে—নিশ্চয়ই।

—সত্যি বলচো?

—কেন, সন্দেহ আছে নাকি?

—তোমাদের যে মতিস্থির নেই কিনা, তাই বলচি। কাল সারাদুপুর শম্ভু চক্কত্তির সঙ্গে গল্প করেচ।

—আহা! মা সেখানে সব সময়ে বসে। শম্ভুদা একটা কবিতার বই পড়ে শোনাচ্ছিল।

—কি কবিতা?

—তা জানি নে। কিন্তু সেজন্যে তুমি ভাবো কেন? আমার একটা উপায় যেখানে হয়, সেখানেই আমি থাকবো। মা বুড়ো হয়েচেন, আমার নিজের হাতে সম্বল নেই। ভাইবৌরা এসে যদি জ্বালা দেয়, দুকথা শোনায়, সে সংসারে থাকা আমার পোষাবে না। যদি অদৃষ্টই মন্দ না হবে, তবে এত শীগ্‌গির কপাল পুড়বে কেন আমার?

আশা মুখ নীচু করে আঁচলে চোখের জল মুছলে। যতীনের মন করুণা ও সহানুভূতিতে ভরে উঠলো ওর ওপরে—তাহলে জীবনের এসব সংকটময় মুহূর্তেও আশা তার কথা মনে করে! এখনও তাকে সে ভোলেনি! পুষ্প ওর পাশে এসে মৃদুস্বরে বল্লে—চলে এসো যতীনদা, এখানে থেকে কিছু করতে পারবে না।

গভীর রাত্রি।

আশা তাদের বাড়ীর ছোট্ট ঘরে ময়লা বালিশ মাথায় দিয়ে মেজেতে মাদুর পেতে শুয়ে আছে। গরমের দরুন শিয়রের জানালাটা খোলা। পুকুরপাড়ের অভিসার থেকে ফিরে সে দুটি মুড়ি খেয়ে শয্যা আশ্রয় করেচে। গরীবের ঘরের বিধবা, রাত্রে লুচি পরোটা জোটে না।

যতীন বল্লে—আহা, কি খেলে দেখলে তো পুষ্প? পেট পুরে খেতেও পায় না।

—তা তো হোল, কিন্তু এখনও ঘুমোয়নি ভালো। গরমে ঘুমুতে পারচে না। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। এখন সামনে যেও না। এই রকম আধ-তন্দ্রা অবস্থায় তোমাকে ও দেখতে পেতে পারে। তোমার দেহও এখনও তেমন সূক্ষ্ম হয়নি। তাতে ফল হবে উল্টো। ও আঁক-পাঁক করে উঠবে ভূত দেখচে বলে, সেবারে সেই জানো তো?

যতীন বাইরের রোয়াকে গিয়ে দাঁড়ালো। যতীনের বৃদ্ধা শাশুড়ী পাশের ঘরে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। যতীনের মনে পড়লো, আশার সঙ্গে প্রথম বিয়ের পরে এই ঘরে তাদের বাসর হয়। তারপরে জামাইষষ্ঠীতে শ্বশুরবাড়ীতে এসে সে এই ঘরে নববিবাহিতা বধূর সঙ্গে রাত্রিযাপন করেচে। কোথায় গেল সে সব দিন! তার ইচ্ছে নেই অন্য কোথাও যাবার। আশা বিপন্না, সে এখানে আশার কাছেই থাকবে। স্বর্গ-টর্গ তার জন্যে নয়। ঐ সেই কুলুঙ্গি, আশার জন্যে এক শিশি গন্ধতেল কিনে এনেছিল একবার, ঐ কুলুঙ্গিটাতে থাকত, দুজনে মাখতো। তার মাথায় জোর করে বেশি তেল ঢেলে দিয়ে আশা নিজের হাতে মাখিয়ে দিত। কাড়াকাড়ি করে মাখতো দুজনে।

সেই আশা কেন এমন হয়ে গেল?

পুষ্প এসে বল্লে—এসো যতীন-দা। আশাবৌদি ঘুমিয়ে পড়েচে।

আশা খানিকক্ষণ আগে ঘুমিয়েচে। ময়লা বালিশটা মাথায় দিয়ে ছেঁড়া মাদুরে শরীর এলিয়ে দিয়েচে। যতীনের মন করুণায় ভরে উঠলো। মেয়েমানুষ অসহায়, ওদের কি দোষ। সংসারে বহুলোক ওৎ পেতে আছে ওদের বিভ্রান্ত করে ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্যে। একটু আশ্রয়ের আশায় ওরা না বুঝে না ভেবে দেখে সে পথে ছোটে। যতীন কাছে গিয়ে ডাকলে—আশা?

পুষ্প বল্লে—দাঁড়াও, শুধু ডাকলে হবে না, লেকচারের কাজ নয়। ওর মনে তোমাদের কোনো একটা সুখের রাত্রির ছবি আঁকো। যেমন ধরো তোমাদের ফুলশয্যার রাত্রি, তোমাদের গাঁয়ের ভিটেতে।

—সে কি করে করব?

—সেদিনের কথা একমনে চিন্তা করো—

একটু পরে আশার সূক্ষ্ম শরীর ওর দেহ থেকে বের হয়ে মূঢ়, অভিভূতের মত চারিদিকে চাইলে। কিন্তু পুষ্প দেখেই বুঝলে সে দেহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল জগতের ঊর্দ্ধের অতি নিম্নস্তরেও নিজের চৈতন্য পূর্ণ প্রকাশ করতে অসমর্থ।

পুষ্প বল্লে—ওকে ছবি দেখাও যতীন-দা—

—ছবি দেখবে কে? ওর তো এ লোকে জ্ঞান নেই দেখচি—

—ছবি দেখাও, তা হোলে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠবে—

—ফুলশয্যার রাত্তিরের!

—যা যে কোনো একটা সুখের দিনের। পারবে তো? আমার দ্বারা তো হবে না। তোমার নিজের ছবি তোমাকে দেখাতে হবে।

যতীন একমনে ভেবে সত্যিই একটা ছবি তৈরি করতে সমর্থ হোল। এ স্তরে চিন্তার শক্তি ক্ষণস্থায়ী আকার নির্মাণ করতে সমর্থ—একটা পুরোনো কোঠার ঘর আশাকে এবং ওদের সকলকেই যেন চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললে। কাঁঠাল-কাঠের পুরোনো তক্তপোশে লেপ তোশক পাতা বিছানা যতীনের পৈতৃক, জানালার বাইরে মনসাতলার আমগাছটা, ঘরে জলচৌকির ওপর ঝক্‌ঝকে পুরোনো পেতল কাঁসা, যতীনের মায়ের হাতে মাজা। যতীনের শোবার সেই ঘরটি এমন বাস্তব হয়ে উঠলো যে আশার ঘরবাড়ী মিলিয়ে গেল। যতীনও যেন অবাক হয়ে গেল তার চিন্তাশক্তির কার্য দেখে। আশা তার শ্বশুরবাড়ীর ঘরটাতে শুয়ে আছে—প্রায় নিখুঁত শ্বশুরবাড়ীর ঘর, দেওয়ালে টাঙানো কাঠের আর্শিটা পর্য্যন্ত। আশার সূক্ষ্ম দেহ তখনও অর্দ্ধ-অচেতন। যতীন স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকলে—আশা, ও আশা—

আশা যেন ঘুম ভেঙে উঠে চারিদিকে চাইলে এবং কি দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। যতীন আবার ডাকলে—আশা, ও আশা—

আশা যতীনের মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে, যেন কিছু বুঝতে পারলে না।

—আশা, ভাল আছ?

পুষ্প বল্লে—অমন ধরনের কথা বোলো না। ছবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে পুরোনো দিনের মত কথা বলো।

যতীন বল্লে—আশা, কাল সকালেই উঠে কাপাসডাঙায় যাবো কাজে। ভোরে একটু চা করে দিতে পারবে?

আশা উত্তর দিলে—খুব ভোরে যাবে? কত ভোরে?

—সাতটার মধ্যে।

আশার চোখের মূঢ় দৃষ্টি তখনও কাটেনি। সে বল্লে—আমি কোথায়?

যতীন বল্লে—কেন, তোমার শ্বশুরবাড়ীতে—চিনতে পারচো না? কি হয়েচে তোমার? চা দেবে করে?

—হ্যাঁ।

—খাবার দেবে না?

—কি খাবে? চিঁড়ে দিয়ে ঘোল দিয়ে খেও এখন।

একদিন আশা সত্যিই এই কথা বলেছিল। যতীনের চোখে জল এল আবেগে। সে আবার তার পুরোনো পৈতৃক বাড়ীর বিস্মৃত দিনে ফিরে গিয়েচে নববিবাহিতা আশার পাশে। যতীনের অনুভূতির তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে তার তৈরি ছবি আরও স্পষ্ট নিখুঁত হয়ে উঠলো। আশা এবার আরও সজাগ হয়ে উঠে চারিদিকে চাইলে, কিন্তু তার বিস্ময়ের দৃষ্টি এখনও কাটেনি। ।

যতীন বল্লে—তাহলে তাই। আমায় তুমি ভালোবাসো আশা?

কথা বলেই নেত্য চক্কত্তির মত সে আশার হাতখানা নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে রাখলে। তারপর পেছনে চেয়ে দেখলে পুষ্প সেখানে নেই। মেয়েমানুষ, যত উচ্চস্তরের হোক না কেন, প্রেমাস্পদ অন্যকে ভালবাসচে, এতে মন স্থির রাখতে পারে না।

আশা বল্লে—হ্যাঁগা, তুমি কখন এলে?

—কোথা থেকে আসবো?

—যেন তুমি অনেকদিন বাড়ি ছিলে না!

—নিশ্চয়ই ছিলাম। কোথায় আমি যাবো? খেপলে নাকি আশা?

আশা প্রবোধপ্রাপ্ত ছোট মেয়ের সুরে বল্লে—যাওনি তাহলে।

—না আশা—কোথায় যাবো?

—আমার জন্যে একজোড়া শাড়ী এনে দিও কাল। আটপৌরে শাড়ী নেই।

—ক'হাত?

—এগারো হাত দিও, দশহাতে ঘোমটা দিতে পারিনে মার সামনে, লজ্জা করে।

—বেশ।

তারপর আশা ভেবে ভেবে বল্লে—আচ্ছা, আমার কি একটা হয়েছিল বলো তো, কিছুতেই যেন মনে নিয়ে আসতে পারচি নে।

—কি আবার হবে, কিছুই না।

—ও! তবে বোধহয় স্বপ্ন দেখেছিলাম। না?

—তাই হবে। লক্ষ্মীটি, ও সব ভাবতে নেই। তুমি আমায় ভালবাসো?

আশা সলজ্জ সুরে বল্লে—হুঁ-উ—

যতীন ভাবলে, কোন্ জগৎ সত্য? এই ছবিতে গড়া স্বপ্নের জগৎ, না বাস্তব জগৎ? না কি সবই স্বপ্ন? সেদিন সেই অবধূত যা বলে গিয়েছিল। জগৎটাই জাগ্রত স্বপ্ন ছাড়া আর কি? কোথাকার আশা, কি সে দেখচে, কে তাকে কি ভাবাচ্চে। অথচ আশা ভাবচে এই বুঝি সত্য। ভগবান কি জীবকে ছবি দেখাচেন না তাঁর সৃষ্ট জগতের মধ্যে দিয়ে, যেমন সে এখন দেখাচ্চে আশাকে?

সে সস্নেহ সুরে বল্লে—তা হলে তুমি ঘুমিয়ে পড় আশা, রাত হয়েচে—

—আজ বড্ড গরম, না? ঘুম হচ্চে না। একটা মশারি এনে দিও—বড্ড মশা—

—তা হবে। সকালে সকালে উঠে চা করে দিও তাহলে?

—আচ্ছা।

পুষ্প বাইরে থেকে বল্লে—চলো, যতীন-দা একদিনে ওর বেশি আর কিছু তুমি করতে পার না।

ওরা চলে যাওয়ার একটু পরে আশার ঘুমও ভেঙে গেল। সে ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে চারিদিকে দেখলে। এ কোথায় সে আছে? এমন স্পষ্ট স্বপ্ন সে আর কখনো দেখেনি। কতদিন পরে সে তার স্বামীকে এত স্পষ্ট ভাবে দেখেচে, এইমাত্র যেন তিনি পাশে বসে ছিলেন। কতক্ষণ স্বপ্নের কথা সে ভাবলে। সব কথা তার মনে নেই, এই-টুকু মনে আছে, তিনি যেন বলচেন—একটু চা করে দিতে পারো? চা খাবো—

সেই পুরোনো হাসি, পুরোনো আমলের স্নেহদৃষ্টি স্বামীর চোখে। আশা উদ্‌-ভ্রান্তের মত জানালার বাইরে চেয়ে রইল। কোথায় আজ সেই স্বামী, কোথায় তার সেই শ্বশুরবাড়ী! নিজের প্রতি করুণায় তার মন ভরে গেল, চোখে জল এল।

## ১৪

সেদিন পুষ্প বল্লে—যতীন-দা, মন খারাপ করে বসে আছ নাকি? চলো করুণাদেবীর কাছে যাবে।

—আমি সেখানে যেতে পারবো না। অত উঁচুতে উঠলে আমার চৈতন্য থাকে না জানো—সব সময় তাঁকে দেখতেও পাইনে। কি করবো বলো। তা ছাড়া, আমার অন্য অনেক রকম ভাবনা—

—ভাবনা তো জানি। ও ভেবে কোনো লাভ আছে? যার যেমন অদৃষ্টে আছে, তেমনি হবে। চেষ্টা তো করলে অনেক। ওর কর্মফল ওকে ওই পথে নিয়ে যাচ্ছে, তুমি আমি কি করবো বলো।

আরও কয়েক মাস কেটে গিয়েচে। আশালতার মনের অবস্থা দিনকয়েকের জন্যে একটু ভাল হয়েছিল বটে, কিন্তু স্থায়ী কোনো ফল তাতে হয়নি। নেত্য তাকে গ্রামের প্রান্তে আলাদা বাড়ী করেও দেয়নি। ভুলিয়ে তার কতকগুলো সোনার গহনা হাত করে সেই টাকায় ওকে কলকাতায় এনে রেখেচে। যতীন রোজ সেখানে যায় রাত্রে, একটা লম্বা ব্যারাকমত পুরনো বাড়ীর একটা ঘরের সংকীর্ণ রোয়াকে আশা বসে রাঁধে, এখানে সে পাশের ভাড়াটেদের সামনে সামাজিকতা বজায় রাখবার জন্যে বিধবার বেশ ঘুচিয়ে নেত্যর স্ত্রী সেজেচে, হাতে চুড়ি পরে, কপালে সিঁদুর দেয়। প্রথমে যেদিন নেত্যই তার কাছে এ প্রস্তাব করে যতীন সেখানে উপস্থিত ছিল।

নেত্য বল্লে—রাস্তা থেকেই তোমাকে এটি করতে হবে আশা। যেখানে যাবে, সেখানে আশপাশের ঘরে অনেক ফ্যামিলি বাস করে। তাদের সামনে কি বলে দাঁড়াবে, কি পরিচয় দেবে? বাড়ীওয়ালাই বা জায়গা দেবে কেন?

আশা বল্লে—সে আমি পারবো না। ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা হয়ে আবার পেড়ে কাপড় পরবো, সিঁদুর পরবো—এ হবে না আমায় দিয়ে নেত্য-দা—

নেত্য শ্লেষের সুরে বল্লে—নাও নাও আর ন্যাকামি করতে হবে না! ব্রাহ্মণের বিধবার তো সব রাখলে, এখন যার সঙ্গে বেরিয়ে এলে তার কথামত চলো।

আশা বিস্ময়ের সুরে বল্লে—বেরিয়ে এলাম!

—আহা-হা নেকু! বেরিয়ে আসার কি হাতীঘোড়া আছে না কি? আবার তুমি ঘরে ফিরে যাও তো মানিক। এতক্ষণ গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে গিয়েচে দ্যাখো গে যাও—

—বা-রে, তুমি বল্লে আমাকে কলকাতায় আলাদা বাসা করে দেবে। আমি আমার গহনা বিক্রি করে চালাবো—তারপর মাকে সেখানে নিয়ে এসে রাখা হবে। বলো নি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এখনও তো তাই বলচি, বলচি নে? আমার হাত ধরে যে-মাত্তর বাড়ীর বাইরে পা দিয়েচ, সেই মাত্তরেই তুমি বেরিয়ে এসেচ। ওকেই বলে বেরিয়ে আসা। এখন আর ফেরবার পথ নেই—যা বলি, সেই রকমই করো। তোমার ভালোর জন্যেই তো বলচি। দেখো কত সুবিধে হবে, কলকাতায় বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হবে। আখেরে ভালো হয় কিনা দেখে নিও।

যতীন সেদিন ফিরে এসে পুষ্পকে সব বলেছিল। পুষ্প বলে—আশাদি বড় নির্বোধ নেত্য লোকটা ওকে ভুলিয়ে এই কাণ্ডটা ঘটাচ্চে। কিন্তু কিছু করবার নেই।

—কেন পুষ্প? এক অবলা মেয়েকে সর্বনাশের পথ থেকে বাঁচাতে পারো না তোমরা।

—কই পারি। যে যার কর্মফলের পথে চলে, কে কাকে সামলায়?

এরপর প্রায় তিন মাস কেটেচে। আশা ও নেত্য বাসাবাড়ীতে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে বসে স্বামী-স্ত্রীর মত সংসার করেচে। নেত্য বাজার করে নিয়ে আসে, আশার সামনে বসে গল্প করে, দুবার সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়েচে, একবার পাশের ঘরের ভাড়াটেদের সঙ্গে আশা কালীঘাটেও ঘুরে এসেচে।

পুষ্প কত চেষ্টা করেচে যতীনকে ওখান থেকে আনবার। কিন্তু যতীন শোনে না, পুষ্পকে লুকিয়ে সে আজকাল প্রায়ই আশার বাসায় যায়। একদিন রাত্রে একটা স্বপ্নও দেখিয়েছিল, কিন্তু পুষ্পের সাহায্য না পাওয়ায় সে স্বপ্ন হয় বড় অস্পষ্ট, তাতে ঘুম ভেঙে উঠে আশা সারা সকালটা মন ভার করে থেকে নেত্যর কাছে বকুনি খায়।

পুষ্প বল্লে—চলো আজ করুণাদেবীর কাছে গিয়ে বলি—

—এইখানেই তাঁকে আনো। আমি কোথাও যাবো না।

—পৃথিবীর মধ্যে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবে এই রকম?

—কি করি বলো। আমরা তো খুব উঁচুদরের মানুষ নই তোমাদের মত, এই আমাদের পরিণাম। কর্মফল!

যতীনের ঠেস দেওয়া কথায় পুষ্প মনে আঘাত পেলেও মুখে কিছু বল্লে না। সে বেশ বুঝেছে যতীনদাকে এ পথ থেকে নিবৃত্ত না করলে ওর উন্নতি হবে না। যতদিন আশা বাঁচবে, তার পেছনে অস্থানে কুস্থানে ও ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—তাতে কোনো পক্ষেরই কোনো সুবিধে হবে না।

ইতিমধ্যে একদিন একটা ব্যাপার ঘটে গেল আশাদের বাসায়। আশার গ্রামের শম্ভু চক্কত্তি বলে সেই ছেলেটি অনেক খোঁজাখুঁজির পরে আশার সন্ধান পেয়ে সেখানে এল। আশা তখন রান্না করচে। শম্ভুকে ঢুকতে দেখে ওর মুখ শুকিয়ে গেল। শম্ভু এসে বল্লে —কি আশাদি, চিনতে পারো?

আশা শুকনো মুখে ভয়ের সুরে বল্লে—এসো বোসো শম্ভুদা—কি করে চিনলে ঠিকানা?

—নেত্য স্কাউণ্ড্রেলটা কোথায়? আমি একবার তাকে দেখে নিতাম। তারপর, কি মনে করে এখানে এসে আছ?

—কারু দোষ নেই শম্ভুদা, আমি নিজের ইচ্ছেতেই এসেচি!

—গাঁয়ে কি রকম হৈ চৈ পড়ে গিয়েচে তুমি জানো না। কেন তুমি এরকম ক'রে এলে? কতদূর খারাপ করেচ তা তুমি বুঝেচ?

—গাঁয়ে থেকেই বা কি করতাম শম্ভুদা। এ বেশ আছি। আমাদের মত মানুষের আবার গাঁ আর অগাঁ কি? কি ছিল জীবনে? মা মরলে কোথায় দাঁড়াতাম? এখানে খারাপ নেই কিছু। ফিরে যখন যেতে পারবো না, তখন সেকথা ভেবে আর কি হবে!

—আমি তোমাকে বোনের মত ভালবাসি আশা, চল্ তোকে এখান থেকে নিয়ে অন্য জায়গায় রেখে দেবো।

আশা কি একটা জবাব দিতে যাচ্চে এমন সময়ে নেত্য এসে হাজির। শম্ভুকে ওখানে দেখে সে খুব চটে গেল মনে মনে, তখন কিছু বল্লে না, কিন্তু তারপর আশাকে যথেষ্ট তিরস্কার ও অপমান করলে। তার ধারণা আশাই শম্ভুকে লুকিয়ে খবর দিয়ে এনেছিল।

যতীন সব দেখলে দাঁড়িয়ে। আজকাল সে সন্দেহ করে এই নেত্যর জন্যেই আশা শ্বশুরবাড়ী যেতে চাইত না। পুষ্প সব জানে কিন্তু তাকে কখনো কিছু বলেনি। তবুও

রাগ হয় না আশার ওপর—গভীর একটা অনুকম্পা, সে দ্বিতীয় স্তরের প্রেত যদি হোত, তবে নেত্যকে একদিন এমন বিভীষিকা দেখাতো যে ময়ে কাঠ হয়ে যেতো নেত্য, কেমন নেত্য সে দেখে নিত!

করুণাদেবীর কাছে এইজন্যেই সে গেল পুষ্পকে নিয়ে। একটা ক্ষুদ্র দ্বীপের মত স্থান অসীম ব্যোমসমুদ্রে, চারিদিকে উপবন, কুসুমিত বন্যলতা, কিছুদূরে একটা ঝর্ণা পড়চে পাহাড়ের মাথা থেকে। বনানীর জন্য সৌন্দর্য্য ও উপবনের শোভা এক হয়ে মিলেচে। একটা প্রাচীন বৃক্ষতলে ঝরা পাতার রাশির ওপর দেবী এলিয়ে শুয়ে পড়েচেন। কেউ কোথাও নেই, শূন্য দ্বীপ, শূন্য ব্যোমতল। দেবীর অপরূপ রূপে সেই প্রাচীন বনস্থলী উজ্জ্বল হয়ে উঠেচে। যতীন ভাবলে, এই তো স্বর্গ। এই সৌন্দর্য্য দিয়ে গড়া যে ছবি তা স্বর্গ ছাড়া আর কিছু নয়। পৃথিবীতে এমন বনবনানীর সমাবেশ কই, যদি বা থাকে এমন রূপসী মেয়ে কই, তাও যদি থাকে, এত নির্জনতা কই—যদি বা থাকে, এ-তিনের অদ্ভুত সমাবেশ কোথায়? দেবীর মাথায় কি এই তৈরি হয়েচে? হয়তো তাই। এতটুকু একটা গ্রহ বা উপগ্রহ, শুধু বনবনানীতে ঘেরা, সেখানে আবার অন্য কেউ নেই উনি ছাড়া, আবার দিব্যি পাখীর ডাকও আছে। করুণাদেবীর মুখশ্রী কি সুন্দর! আর কি সহানুভূতি ও করুণায় ঈষৎ বিষাদমাখা! মাতৃমূর্তির এমন অপূর্ব মহিমময় জীবন্ত আলেখ্য তার সামনে থাকতেও যদি সে ঈশ্বরের দয়ায় কি দেবদেবীতে বিশ্বাস না করে, তবে সে নিতান্ত নির্বোধ। শুধু পুষ্পের জন্যই সে এখানে আসতে পারচে বা দেবীকে দেখতে পাচ্চে—নইলে ওঁর দর্শন পাওয়া তার পক্ষে কি সহজ হোত?

যতীনের বক্তব্য পুষ্পই বল্লে। আশাবৌদি কলকাতার বাসাবাড়ীতে কাল রাত্রে মার পর্য্যন্ত খেয়েচে—সারারাত কেঁদেচে, যতীনের মনে বড় কষ্ট। এই আকর্ষণ তাকে সর্বদা পৃথিবীতে টানচে, এখন কি করা যায়?

করুণাদেবী সব শুনে বল্লেন—এতে কিছু করবার নেই। কন্যা যতদিন ঠেকে না শিখবে, তার জ্ঞান হবে না।

যতীন ভাবলে—এ কি হোল! এত বড় দেবীর মুখে এ কি সাধারণ পৃথিবীর মানুষের মত কথাবার্তা! এ কথা তো পৃথিবীতে যে কোন জমিদারগিন্নি কি দারোগা ইন্‌স্‌পেক্টরের বৌ শুনেই বলতো।

সে বল্লে—আপনি মন করলে কি ওকে দয়া করতে পারেন না?

করুণাদেবী হেসে বল্লে—আমি খেটেই মরি, ভেবেই মরি। দয়া কি করতে পারি সে ভাবে বাছা? এদের যেদিন ভালো হবে, সেদিন আমারও ছুটি। এ সব অতি নিম্ন-দরের আত্মা, কেউ ওদের ইচ্ছে করে কষ্ট দিচ্চে না, নিজের কর্মফলে কষ্ট পাচ্ছে। ভগবান প্রত্যেক লোককে বড় দেখতে চান, সৎ, সুন্দর, নির্মল দেখতে চান, উচ্চ প্রকৃতি জাগলো কিনা দেখতে চান—যেমন ধরো সেবা, স্বার্থত্যাগ, দয়া, ভক্তি, ভালবাসা। এ যাদের মধ্যে নেই বা জাগেনি, তাদের সেগুলো জাগিয়ে দেবার কৌশল তাঁর জানা আছে। কষ্ট দিয়ে, শোকের বোঝা রোগের বোঝা দিয়ে যে করেই হোক ও-লোকে কি এ-লোকে তার চোখ ফোটানোর চেষ্টা হয়ই, তাও যাদের না হয়, অন্য গ্রহে তাদের জন্মগ্রহণের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়, যে গ্রহ পৃথিবীর চেয়েও ধীর গতিতে চলে। সেখানে লোকে আস্তে আস্তে অনেক সময় নিয়ে সব জিনিস শেখে। জড়বুদ্ধি জীবেরা তাড়াতাড়ি শিখতে পারে না—সেটা তাদের উপযুক্ত পাঠশালা। এ-লোকেও নরকের মত যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা আছে, অতি নিম্নস্তরের পাপী জীবেরা সেখানে ঠেকে শিখে মানুষ হচ্চে। এ একটা মস্ত বড় বিদ্যালয়। দেখতে চাও? একবার নিয়ে যাবো—

পুষ্প জিজ্ঞেস করলে—তাহলে আশা বৌদির কি হবে বলুন—

—আমিও দেখি একটু ভেবে, দাঁড়াও।

পরে তিনি চোখ বুজে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। চোখ চেয়ে ওদের দিকে চেয়ে বল্লেন—এখনও তিন জন্ম। ওর হৃদয়ে প্রেম নেই। সব স্বার্থ। যে কোনো লোককে ভালবাসলেও তো বুঝতাম। এখন যার সঙ্গে আছে, তাকেও তেমন ভালবাসে না। সাংসারিক স্বার্থ। বুড়ো মার সেবা না করে ছেড়ে এসেচে। যতীনের মনে ভালবাসা আছে, তাই সেখানে যায়। কিন্তু ওর স্ত্রীর কোনো উপকার আপাতত কিছু হবে না।

যতীন বল্লে—ওর জন্যে মন বড় খারাপ, ওর কষ্ট দেখে—

—তুমি যাকে ভাবচো কষ্ট বা পাপ, ও তাকে ভাবচে সুখ, সাংসারিক সুবিধা। ও যেদিন পাপ ভেবে ত্যাগ করবে, সেদিনই না ওর উন্নতি। তোমার ভাবনায় কি হবে?

—আমি কি ওর কোনো উপকার করতে পারিনে? আপনি যদি দয়া করে ওকে পাপী ভেবে ওকে সাহায্য করেন—

—পাপ বলে যে না বুঝেচে, অনুতাপ যার না হয়েচে, পাপকেই যে আনন্দের পথ বলে ভাবচে, যার মনে ত্যাগ নেই, কর্তব্যবুদ্ধি নেই, কোনো উঁচু ভাব নেই—আনবার চেষ্টাও নেই—তাকে শুধু দয়া করলেই ভালো করা যাবে না। ওর ভার আছে যাঁদের হাতে তাঁরা অসীম জ্ঞানের প্রভাবে জানেন, এইসব নিম্নশ্রেণীর মনকে কি ভাবে সংশোধন করতে হয়। সেই পথ দিয়ে ওরা উঠবে। কোনো আত্মার প্রভাব ওর মনে রেখাপাত করবে না।

পুষ্প বল্লে—যদি আমরা রোজ ওর মনে ভাল ভাব দেবার চেষ্টা করি?

—উষর মরুভূমিতে বীজ বুনলে কি হয়? যে চায়, সে পায়। যে কেঁদে বসে, ভগবান আমায় ক্ষমা করো, আমায় পথ দেখিয়ে দাও, সে পাপপুণ্য বুঝেচে। তখন তাকে আমরা সাহায্য করতে ছুটে যাই। যে যা চায়, সে তা পায়। যে জ্ঞান চায় তাকে জ্ঞানের পথ দেওয়া হয়। যে ভগবানের প্রতি ভক্তি চায়, তাকে সাধুজনের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়, মনে ভক্তির সঞ্চার করে দেওয়া হয়।

—যে বলে আমি ভগবানকে দেখবো।

—ভগবান তাঁকে দেখা দেন।

যতীন বিস্ময়ের সুরে বল্লে—তিনি দেখা দেন?

—অবিশ্বাস করবার কি আছে বলো। সে যে-ভাবে চায় সেই রূপ ধরে তাকে দেখা দেন। ভগবানের বিরাট রূপের ধারণা কে করতে পারে। ইষ্ট মূর্তিতে দেখতে চায়, যার যা ইষ্ট, যে রূপ যে ভালবাসে, তাকে তিনি সেইরূপেই দেখা দেন। তিনি করুণার সাগর, কত বড় করুণা তাঁর—তা তুমি জানো না, বুঝতেও পারবে না। ক্ষুদ্র বুদ্ধির গম্য হয়ে ক্ষুদ্র সম্বন্ধ পাতিয়ে মা, ভাই, বোন, সন্তান, বন্ধু সেজে দেখা দেন।

—আমার প্রতি একটা আদেশ করুন দেবী, আপনার কাছে এসেচি অনেক আশা নিয়ে, শুধু হাতে ফিরে যাবো?

—আমি যা করতে পারি, এখন তা করবো না। সময় বুঝলে পৃথিবীর যে কোনো ভ্রান্ত ছেলেমেয়ের সাহায্যে আমিই সকলের আগে ছুটে যাবো, বাছা। আশালতার কথা আমার মনে রইল। কিন্তু এখনও অনেক বাকি, অনেক দেরি, যতদূর বুঝচি। তুমি পৃথিবীতে বেশি যাতায়াত কোরো না। পৃথিবীতে গেলে এমন সব বাসনা কামনা জাগবে যা তোমাকে কষ্ট দেবে শুধু—কারণ পৃথিবীর মানুষের মত দেহ না থাকলে সে সব বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না। তখন হয়তো তোমার ইচ্ছে হবে আবার মানুষ হয়ে জন্ম নিই। প্রবল ইচ্ছাই তোমাকে আবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করাবে। অথচ এখন পুনর্জন্ম নিয়ে কি করবে? গত জন্মে যা করে এসেচ তাই আবার করবে। সেই একই খেলা আবার

খেলবে। তাতে তোমার উন্নতি হবে না। অথচ যার জন্যে করতে যাচ্চ, তারও কিছু করতে পারবে না। কারণ ওসব ভালমন্দ করবার কর্তা তুমি নও। যে যার পথে চলেচে, তোমার পথ তোমার, তার পথ তার। পর্বতকে টলাতে পারবে না, বিশ্ব-জগতের নিয়ম বড় কড়া. একচুল এদিক-ওদিক করবার শক্তি নেই কারো।

—আপনারও না?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—তুমি এখনও ছেলেমানুষ। আমি তো আমি, পৃথিবীর গ্রহদেব স্বয়ং পারেন না। তিনি তো অসাধারণ শক্তিধর দেবতা, ভগবানের ঐশ্বর্য রয়েচে তাঁর মধ্যে। তবে আমরা যেখানে যাই, সময় হয়েচে বুঝে যাই। যেখানে সাহায্য করলে সত্যকার উপকার হবে আত্মার, এ আমি মনে মনে বুঝতে পারি। সে ক্ষমতা আছে আমাদের। সেখানেই যাই শুধু। ঐ যে বল্লাম, পাপ বুঝে যে সে পথ থেকে ফিরতে চায়, ভগবানকে মনেপ্রাণে ডাকে, বলে, আমি ভুল বুঝেচি, আমায় ক্ষমা করো, দয়া করে পথ দেখিয়ে দাও—ভগবান সেখানে আগে ছুটে যান—তাঁর কত বড় করুণা, কত প্রেম জীবের প্রতি—তা ক'জন মানুষে বোঝে? সবাই পৃথিবীতে টাকা নিয়ে যশ নিয়ে মান নিয়ে উন্মত্ত—

যতীন ও পুষ্প তাঁকে প্রণাম করে চলে আসতে উদ্যত হোলে তিনি ওদের দিকে চেয়ে প্রসন্ন হেসে বালিকার মত ছেলেমানুষী সুরে বল্লেন—আমার এ জায়গাটা তোমাদের কেমন লাগে?

দুজনেই বল্লে, ভারি চমৎকার স্থান, এমন তারা কখনো দেখেনি।

দেবী বালিকার মত খুশি হোলেন ওদের কথা শুনে। বল্লেন—মাঝে মাঝে এখানটাতে বিশ্রাম করি। তোমরা মাঝে মাঝে এসো। একাই থাকি।

যতীন বিনীত সুরে বল্লে—গ্রহদেব বৈশ্রবণকে দেখাবেন একবার?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—তোমার দেখচি বড্ড বড় সাধ।

যতীন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, ফেরবার পথে সে পুষ্পকে বল্লে—এমন না হোলে দেবী! কি সরলতা! জায়গাটা সম্বন্ধে আমাদের সার্টিফিকেট পেয়ে খুশি হয়ে গেলেন!

উচ্চ স্বর্গে আজ পুষ্পকে নিয়ে গেলেন প্রেমের দেবী। বহু বিচিত্র বর্ণের মেঘের মধ্যে দিয়ে সে অপূর্ব যাত্রা। অনন্তের জ্যোতি-বাতায়ন খুলে গিয়েচে যেন. সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েচে সে আলো।

দেবী বল্লেন—সারা পৃথিবীতে প্রেমের জন্য এত দুঃখও পাচ্চে মানুষে! ইচ্ছে হয় সব মিলিয়ে দিই।

—দেন না কেন দেবী?

—দিই তো। কাজই ওই। আমার যা ক্ষমতা তা করি। তবে আমাদের ক্ষমতারও সীমা আছে—দেখচো তো সুধার কিছুই করতে পারচিনি। সুধার মত লক্ষ লক্ষ নর-নারী পৃথিবীতে—তবে আমরা আঁকুপাঁকু করি নে তোমাদের মত। সময় অনন্ত, সুযোগ অনন্ত—তোমরা ভাবো অমুক দিন মরে যাবো কবে আর কাজ করবো? আমরা জগৎটাকে দেখি অন্য চোখে—

পুষ্প হেসে বল্লে—মরেচি তো অনেকদিন, তবে আর কেন এ অনুযোগ দেবী?

প্রণয়দেবী হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলেন—আহা! আজ একাদশী। সুধা শুয়ে আছে ঘরে দোর দিয়ে—দেখো এখানে এসে।

একটা আলোকের পথ যেন তৈরী হয়ে গিয়েচে এই অসীম ব্যোমের বুক চিরে। পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ভাঙা কোঠার ভাঙা ঘরকে তার নোনাধরা চুণ-বালি-

খসা দেওয়ালের ব্যবধান ঘুচিয়ে যুক্ত করচে অনন্ত তারালোক-খচিত মহাকাশের সঙ্গে, দেবযানের পথে।

পুষ্পের সারাদেহ আনন্দে ও সত্যের অনুভূতিতে শিউরে উঠলো—যেখানে প্রেম, যেখানে সত্য, যেখানে গভীর রসানুভূতি বা দুঃখবোধ, সেখানে স্বর্গের সঙ্গে মর্তের যোগ ক্ষণে ক্ষণে নিবিড় হয়ে ওঠে—অথচ সে অদৃশ্য যোগের বার্তা পৃথিবীর মানুষে জানেও না, বিশ্বাসও করে না।

কোকিল ডাকে বৈশাখের অপরাহ্ণে, ছায়াভরা মাঠে, নদীতীরে। সে সুরের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বনঝোপ যুক্ত হয় সুরলোকের আনন্দবীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে। কে জানে সে কথা।

—আর একটি দেখবে? এদিকে চেয়ে দেখ—

পুষ্প কিন্তু সে দেশ চিনতে পারলে না। খুব ফর্সা মেয়েটি, বয়স নিতান্ত কম নয় —দেখেই বোধ হয় আধ্যাত্মিক উন্নত অবস্থার মেয়ে। একটা পুরোনো সোফায় বসে বসে কি পরিষ্কার করচে। জিনিসটা পুষ্প কখনো দেখেনি, বুঝতে পারলে না।

দেবী বল্লেন—ওর স্বামী ছিল শিকারী, কার্পেথিয়ান পর্বতে শিকার করতে গিয়ে বুনো শুওরের হাতে মারা পড়ে। সে আজ সতেরো আঠারো বছরের কথা—স্বামীর তামাক খাবার নলটা যত্ন করে রোজ পরিষ্কার করে, ফুল দিয়ে সাজায়। সুন্দরী ছিল, বিধবা বিবাহ করবার জন্যে কত লোক ঝুঁকেছিল—কারো দিকে ফিরেও চায়নি। দুঃখ-কষ্ট কত পেয়ে আসচে, খেতে পায় না—তবুও স্বামী ধ্যান, স্বামী জ্ঞান।

পুষ্প কি ভেবে বল্লে—বিবাহিত স্বামী যদি না হয়, তবে কি আপনাদের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে না?

প্রণয়দেবী হেসে বল্লেন—পুষ্প!

পুষ্প সলজ্জ ভাবে চোখ নিচু করলে।

—আমাদের অবিশ্বাস ক'রো না, ছিঃ—আমি তোমাকে কতদিন থেকে দেখছি জানো, যতদিন তুমি পৃথিবী থেকে প্রথম এখানে এলে। যতীনের সঙ্গে আমিই তোমাকে মিলিয়ে দিয়েচি—নইলে তুমি ওর দেখা পেতে না। প্রেমের আকর্ষণ না থাকলে পৃথিবী ছেড়ে এসে সকলের সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে।

—এমন হয়?

—কেন হবে না? সেই তো বেশি হয়। একটি মেয়েকে জানি, সে পৃথিবী থেকে এসেচে আজ তিনশো বছর। তার স্বামী এসেচে তার আসবার পঁচিশ বছর পরেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি আজও। এই তিনশো বছর। কারণ প্রেম নেই। প্রেম না থাকলে আমরা মিলিয়ে দিই না। তাতে পরস্পরের আত্মার ক্ষতি বই লাভ হবে না কিছু।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—উ! তিনশো বছর স্বামী-স্ত্রীর দেখা হয়নি?

দেবী বল্লেন—মানে, আর হবেও না। তারা কেউ নয় পরস্পরের। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। সত্যিকার প্রেম দুটি আত্মাকে পরস্পর সংযুক্ত করে। যে-প্রেম যত কামনা-বাসনাশূন্য সে প্রেম তত উঁচু। এই ধরনের প্রেমের জন্যই আমাদের কত খাটুনি।

পুষ্প ফিরে এসে দেখলে যতীন নেই, আবার পৃথিবীতে চলে গিয়েচে আশার কাছে। পুষ্পের মনে কেমন একটা ব্যথা জাগলো—এতো করেও যতীনদা আপনার হোল না! পরক্ষণেই সে নিজের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিলে। পৃথিবীর সম্পর্কে আশা বৌদিদির অধিকার তার চেয়ে অনেক বড়, অনেক ন্যায্য!' ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে।

যতীন কলকাতার সেই ছোট্ট বাসাবাড়ীতে আবার এসে দাঁড়িয়েচে। নেত্য বাসাতে

উপস্থিত আছে বটে কিন্তু ঘুমুচ্চে। আশা বসে বসে পরদিন রান্নার জন্যে মোচা কুটচে। যতীনের মনে হোল এমনি একদিন সে কুড়ুলে বিনোদপুরের বাড়ীর রোয়াকে বসে আশাকে মোচা কুটতে দেখেছিল, যতীনের মা তখন বেঁচে, পাশেই তিনিও ছিলেন বসে সেদিন। যতীন কোথা থেকে এসে হঠাৎ এ দৃশ্য দেখে বড় আনন্দ পেয়েছিল। পল্লী-সংসারের সেই শান্ত পরিচিত পরিবেশ! এখনও তাই, সেই ছবিটিই অবিকল, কিন্তু কি অবস্থায়! কোথায় মা, কোথায় কুড়ুলে বিনোদপুরের সেই যত্নে পাতানো সংসার—কোথায় সে।

কোথায় যেন কি অবাস্তবতা লুকিয়ে ছিল আপাতপ্রতীয়মান বাস্তবতার পেছনে। আসল রূপটি চিনতে দেয়নি সংসারের। ছেলেবেলায় শোনা যাত্রার পালার সেই গান মনে পড়লো—

কেবা কার পর, কে কার আপন,
কালশয্যা 'পরে মোহতন্দ্রা ঘোরে,
দেখি পরস্পরে অসার আশার স্বপন।

সব মিথ্যে। সেই সন্ন্যাসীর দেখানো নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা মনে পড়লো। কেউ কারো নয়। সব স্বপ্ন, সব মায়া, সব অনিত্য।

পুষ্প এসে পাশে দাঁড়াতেই যতীনের চমক ভাঙলো। এ তো এসেচে, একে কিন্তু মিথ্যা বলে মনে হয় না তো? 'নৈহাটির ঘাটে বসে পৈঠার পাটে'—সেই পুষ্প কি অখণ্ড সত্যরূপে বিরাজ করচে চিরদিন এই খণ্ডিতসত্য খণ্ডিতসত্তা জীবনের আপাতপ্রতীয়মান স্থায়িত্বের মধ্যে?

আশা মোচা কুটে উঠে নেত্যকে ডাকতে লাগলো—ওগো, ওঠো—ভাত বাড়ি?

নেত্য জড়িতস্বরে কি বল্লে, তারপর চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসলো বিছানায়। বল্লে—কি? বাবাঃ, এতক্ষণ বসে বসে মোচা কুটলে? রাত কত?

—তা কি করে জানবো?

—দেখে এসো চৌধুরী মশায়ের ঘরে।

—হ্যাঁ, এখন বুড়ো খেটেখুটে এসে শুয়েচে, আমি গিয়ে ওঠাই—

—শম্ভু চক্কত্তি আজ এসেছিল?

—আমি জানিনে অতশত খোঁজ। এখন উঠে দয়া করে খেয়ে আমার হাত অবসর করে দাও—

এ কথার উত্তরে নেত্য আবার সটান্ বিছানায় শুয়ে পড়ে একটা অশ্লীল কথা উচ্চারণ করে চোখ বুজলে।

পুষ্প বল্লে—যতীন-দা, তুমি চলে এসো, এখানে থেকো না।

—পুষ্প তুমি চলে যাও, আমি আর একটু থাকি।

যতীনের মুখের ও চোখের ভাব যেন কেমন। ও মোহগ্রস্ত হয়ে উঠেচে পৃথিবীর স্থূল আবহাওয়ায়। এ সব জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা ওর পক্ষে ভালো না। চুম্বকের মত আকর্ষণ করে পৃথিবীর যত বাসনা কামনা আত্মিক লোকের জীবকে। টেনে এনে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করে—ওপরে উঠতে দেয় না। অবিশ্যি যে বাসনা কামনা বিসর্জন দিয়েচে, সে কামচর, স্বাধীন, মুক্ত। শত পৃথিবী তাকে বাঁধতে পারে না। কিন্তু যতীনের মত আত্মার পক্ষে এমন ঘন ঘন যাতায়াত বড় বিপজ্জনক।

পুষ্প কিছু বলবার আগেই যতীন আবার বল্লে—আমার বড় ইচ্ছে, করুণাদেবীকে আর একবার আশার বিষয় বলি। তোমার কি মত?

যতীনদা,—তাতে ফল হবে না। আশা বৌদির কর্ম্ম ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে।

কেউ কিছু করতে পারবে না। নইলে চেষ্টা তুমি আমি কম করিনি। ওর মন ওকে টানচে নিচের দিকে—অধঃপতনের পথে। বাধা দেবার সাধ্য কার! এক যদি ভগবান সাহায্য করেন, কৃপা করেন—

কথাটা যতীনের মনঃপূত হোল না। সে বল্লে—ভগবান সাহায্য করলে এই অবস্থায় এসে ও দাঁড়ায় আজ? তিনি চোখ বুজে আছেন।

পুষ্প বল্লে—ভুলে যাচ্চ যতীন-দা, ভগবান তাকেই সাহায্য করেন, যে অকপটে সৎ হবার চেষ্টা করচে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা ক'রে। যেচে তিনি সাহায্য করতে গেলে তাতে কোনো ফল হবে না বলেই তাঁর কাছ থেকে সাহায্য আসে না।

—কেন?

—যে ভগবানকে চেনে না, তাঁকে স্বীকার করে না, তার হোল আচ্ছাদিত চেতন। তার চেয়ে যে ভালো, তাকে বলে সংকুচিত চেতন। এই দুই ধরনের লোককে ভগবৎকথা শোনালে উল্টো উৎপত্তি হয়। আশা বৌদির আচ্ছাদিত চেতন। আলো জ্বাললে কি হবে? ঢাকনির মধ্যে আলো সেঁধোবে না। এদের ওপরে মুকুলিত চেতন, তাদের মনে ভগবানের জ্ঞান জাগতে সুরু করেচে। তারও ওপরে বিকচিত চেতন, সবার ওপরে পূর্ণ বিকচিত চেতন—যেমন বড় বড় ভক্ত কি সাধকেরা। কত নিচে পড়ে আছে আশা বৌদি আর নেত্যর দল ভাবো!

যতীন কৌতুকের সুরে বল্লে—ও বাবা, তোমার পেটে এত! নবদ্বীপের ভট্চাযিদের মত শাস্তর কথা সুরু করলে যে। তোমার কী চেতন পুষ্প, বিকচিত না পূর্ণ বিকচিত? আর আমিও বোধ হয় আচ্ছাদিত চেতন—না, কি বলো?

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে—আলবৎ। নইলে তুমি কি ভাবো তুমি খুব উন্নতি করেচো?

—না, তাই জেনে নিচ্চি তোমার কাছে।

—জেনে নিতে হবে কেন, নিজে বুঝতে পারচো না, না? কখনো ভগবানকে ডেকেচ? তাঁর দিকে মন দিয়েচ জীবনে? তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা তো দূরের কথা। আমার কথা বাদ দাও যতীনদা, আমি তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, কিন্তু বড় বড় বিদ্বান, জ্ঞানী, গুণী লোকের মধ্যেও অনেকে মুকুলিত চেতনও নয়। পূর্ণবিকচিত তো ছেড়ে দাও, বিকচিত চেতনই বা ক'জন? পৃথিবীতে বা এই লোকে কোথাও জিনিসটা পথেঘাটে মেলে না। তবে নেই তা নয়, আছে।

—একজন তেমন লোকের কাছে একদিন নিয়ে যাবে?

—আমার কি সাধ্যি যতীনদা? তাঁদের দেখা পাওয়া কঠিন, ধরা দিতে চায় না সহজে। আচ্ছা, একজন মানুষকে আমি জানি—যাবে সেখানে? চলো, একটুখানি দেখিয়ে দিই, সেখানে গিয়ে দেখে চলে আসবে, কোনো কথাবার্তা বোলো না। আশা বৌদিকে ছেড়ে একটু চলো দিকি। পৃথিবীর এসব আবহাওয়া তোমার পক্ষে যে কত খারাপ তা তুমি বুঝতে পারবে না!

যতীন হেসে বল্লে—কেন, ম্যালেরিয়া ধরবে?

—আত্মারও ম্যালেরিয়া আছে। দেহ থেকে মুক্ত হয়েচ বলে গুমর কোরো না। এমন ম্যালেরিয়া ধরে যাবে মনের আত্মার যে কেঁদে কূল পাবে না যতীনদা। তখন ডাক্তার দেখাতে হোলে এই ছাই-ফেলতে ভাঙা-কুলো পুষ্প হতভাগীকেই দরকার হবে।

পৃথিবী দেখতে দেখতে নীচে মিলিয়ে গিয়েচে ততক্ষণ। সাদা সাদা মেঘ, অনন্ত আকাশ। সূর্যের আলোর রং আরও সাদা। মানুষের স্থূল চোখ হোলে ধাঁধিয়ে যেতো।

যতীন ভাবলে, এই তো রাত দেখে এলাম কলকাতা শহরে, এখানে চোখ-ধাঁধানো সূর্যের আলো! জগতে সব ভেল্‌কিবাজি, অথচ পৃথিবীতে বসে কিছু বোঝবার জো নেই।

ভুবর্লোকের বিশাল আলোর সরণী দিক থেকে দিগন্তরে বিসর্পিত তাদের সামনে! বহু লোক যাতায়াত করচে, কেউ ধূসর বর্ণের, কেউ লাল মেটে সিঁদুরের রং, ক্বচিৎ কেউ নীল রঙের। পুষ্পকে যতীন বল্লে—দ্যাখো বেশির ভাগ আত্মাই কিন্তু ছাই রঙের আর লাল রঙের। নীলবর্ণের আত্মা পথেঘাটে কত কম।

পুষ্প হেসে বল্লে—তুমিও ওদের দলে। ভেবো না তুমি নীলবর্ণের দেহধারী আত্মা। অনেক উঁচু জীব তাঁরা। পথে-ঘাটে তাঁদের কি ভাবে দেখবে? ও যা দেখচো, ওরাও তেমন উঁচু স্তরের নয়। পঞ্চম স্বর্গের লোকের দেহ উজ্জ্বল নীল, দামী নীল রঙের হীরের মত। সে বড় একটা দেখতে পাবে না।

—তারও ওপরে?

—উজ্জ্বল সাদা। ষষ্ঠ সপ্তম স্বর্গের আত্মারা দেবদেবী তাঁদের দিকে চাইলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

—তোমার মত?

হঠাৎ যতীন লক্ষ্য করলে সে এমন এক স্থানে এসে পড়েচে যেখানকার বায়ুমণ্ডলে একটি অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও পবিত্রতা আত্মার চিরযৌবন নির্দেশ করচে যেন। কিসের সুগন্ধ সর্বত্র, সেই গন্ধে ভরা বনপথের আবছায়া অন্ধকারে শত শত চিরযৌবনা অভিসারিকা যেন চলেচে তাদের পরমপ্রিয়ের মিলন আকাঙ্ক্ষায়, কত যুগের কত রাজ্য-সাম্রাজ্যের অতীত কাহিনীর দুঃখবেদনা যেন এর পরিবেশকে কোমল করুণ করে রেখেচে—মুখে ঠিক বোঝানো যায় না, কিন্তু যতীন যেন হঠাৎ বুঝলে মনে সে অনন্তকালের শাশ্বত অধিবাসী, চিরযৌবন, অমর আত্মা—অনাদ্যন্ত বিশ্বের লীলাসহচর, সে ছোট নয়, পাপী নয়, পরমুখাপেক্ষী নয়—ভগবানের চিহ্নিত শিশু, অন্য হতভাগ্য আত্মাকে টেনে তোলবার জন্যে তার জন্মমৃত্যুর আবর্ত-পথে সুখ-দুঃখময় পরিভ্রমণ।

অদূরে একটি সাদা পাথরের মন্দির, মন্দিরের চূড়োটা তার গম্বুজের তুলনায় একটু যেন বেশি লম্বা বলে মনে হোল যতীনের। কিন্তু আশ্চর্য রকমের দুধ-ধবল কী পাথরের তৈরী, না মার্বেল, না এলাবেস্টাস্ যেন স্বয়ংপ্রভ পালিশ করা স্ফটিক প্রস্তরে ওর বিমান ও জঙ্ঘা গাঁথা।

পুষ্প বল্লে—খুব বড় একজন ভক্ত সাধকের আশ্রমে তোমায় এনেচি।

মন্দিরের চারিপাশে খুব বড় বাগান। প্রায় সবই ফুলের গাছ, কিন্তু অত সুন্দর ও সুগন্ধি ফুল এ পর্যন্ত যতীনের চোখে পড়ে নি। খুব বড় উদ্যানশিল্পীর রচনার পরিচয় সেখানকার প্রতিটি ফুলগাছের সারিতে লতাবিতানের সমাবেশে। যতীন ভাবলে—এ স্তরেও বাগান থাকে? এসব করে কে? কে গাছ পোঁতে না জানি। পৃথিবীর মত কোদাল দিয়ে মাটি কোপাতে হয় নাকি?

পুষ্প একটি নিভৃত লতাবিতানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল যতীনকে সঙ্গে করে।

ভেতর থেকে কে বল্লে—এসো মা, তোমার অপেক্ষা করচি—

পুষ্প ও যতীন দুজনে লতাকুঞ্জের মধ্যে ঢুকে দেখলে একজন জ্যোতির্ময়দেহ সুশ্রী বৃদ্ধ পাথরের বেদীতে বসে। দুজনে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলে।

ভুর ভুর করচে চন্দন ও ফুলের সুবাস লতাবিতানে, অথচ শৌখীন বিলাসলালসার কথা মনে হয় না সে সুগন্ধে, মনে জাগে অতীতকালের ভক্তদের প্রেমোচ্ছল অনুভূতি, মনে জাগে ভগবানের নৈকট্য, শান্ত পবিত্রতার আনন্দময় মর্মকেন্দ্র। দিগন্তে বিলীন প্রেমভক্তির মধুর বেণুরব কান পেতে শোনো এখানে বসে বসে, শুনে নবজন্ম লাভ করো।

বৃদ্ধ বল্লেন—আগে গোপাল দর্শন করে এসো—

মন্দিরের কাছে গিয়ে ওরা দেখলে নীল রঙের পাথরের অতি সুশ্রী একটি গোপাল-মূর্তি, যেন হাসচে—এত জীবন্ত। নানা রঙের ফুল দিয়ে বিগ্রহের পাদপীঠ সাজানো, গলায় বনফুলের মালা। পুষ্প করজোড়ে কতক্ষণ ভাবে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—যতীন ভক্ত-টক্ত নয়, সে একটু অধীর ভাবেই পুষ্পের ভাব ভাঙবার প্রতীক্ষা করতে লাগলো।

যতীন অবশেষে পুষ্পকে বল্লে—ইনি কে?

—ইনি কে আমি জানিনে। সেকালের একজন বড় বৈষ্ণব আচার্য—পৃথিবীতে নাকি এখনও এ'র আবির্ভাবের তিরোভাবের উৎসব হয়। বহুদিন পৃথিবী ছেড়ে এসেচেন।

বৈষ্ণব সাধু জিজ্ঞেস করলেন—বিগ্রহদর্শন করলে?

যতীন বল্লে—দেখেচি, অতি চমৎকার। প্রভু, আপনি কতদিন পৃথিবী থেকে এসেচেন?

—অনেককাল। এখানে ওসব হিসেব রাখবার মন হয় নি, কি হবেই বা পৃথিবীর হিসেব রেখে?

যতীনের মনে অনেক সংশয় উঁকি মারছিল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্লে—প্রভু, এখানেও বিগ্রহ?

—কেন বল তো? কি আপত্তি তোমার?

—এ তো স্বর্গ। ভগবানের সাক্ষাৎ এখানে পাওয়া যাবে। কাঠ পাথরের মূর্তি পৃথিবীতে দরকার হতে পারে, এখানে কেন?

বৈষ্ণব ভক্তটি হেসে বল্লেন—ভগবানের সাক্ষাৎ তুমি যেভাবে বলচো ওভাবে পাওয়া যায় কিনা জানিনে। আমি পৃথিবীতে এই বিগ্রহের পূজারী ছিলাম, বড় ভালবাসি ওকে ছেড়ে থাকতে পারিনে—তাই এখানে এসে এই মন্দির স্থাপন করে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেচি, ওঁরই সেবা-আরাধনায় দিন কাটে বড় আনন্দে। মন্দির আর বাগান সবই মানসী কল্পনায় সৃষ্টি করেচি, এ স্বর্গে তা করা যায় তা নিশ্চয়ই জানো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা এর নিচের স্বর্গেও দেখেচি।

—আমার দেবতা শুধু পাথরের নয়, জীবন্তও বটে। কিন্তু তোমাকে তো দেখাতে পারবো না। আমার মা দেখতে পারেন। দেখেচেনও একবার।

পুষ্প আবদারের সুরে বল্লে—আপনি দয়া করলে ইনিও দেখতে পারেন, বাবা।

সাধু হেসে বল্লেন—ইনি দেখতে পারেন না। ইনি ভাবেন, ভগবানকে নিয়ে আমি এভাবে পুতুলখেলা করচি। বালগোপাল বড় লাজুক, এ'র সামনে বার হবেন না। যে তাঁকে মন অর্পণ করে ভাল না বেসেচে, বিশ্বাস না করেচে—তিনি যেচে অপমান কুড়ুতে যাবেন সেখানে? ভগবান যখন ইষ্টদেবের বেশে লীলা করেন কৃষ্ণ সেজে, কালী সেজে—তখন তিনি মানুষের বা দেবদেবীদের মনোভাব—যেমন রাগ, লজ্জা, মান অভিমান, এমন কি ভয় পর্য্যন্ত পান। এই তো লীলা—এরই নাম লীলা। বিরাট ঐশী শক্তি যা বিশ্বচরাচর নিয়ন্ত্রণ করচে, তাকে কে ভালবাসতে পারে আপনার ভেবে? শত শত নক্ষত্র, শত শত সূর্য যার ইঙ্গিতে লয় হয়, যে পলকে সৃষ্টি, পলকে স্থিতি, পলকে প্রলয় করতে পারে—তাকে কে ভক্তি করতে পারে, যদি তিনি—

মন্দির থেকে চঞ্চল, মধুর, সজীব কণ্ঠে কে বলে উঠলো—ওখানে বসে বক্‌বক্ না করে এখানে এসে আমায় একবার জল খাইয়ে যাও না বাপু? তেষ্টায় মলুম—

সাধু চমকে উঠলেন, পুষ্প ও যতীন চমকে উঠলো।

পুষ্প হেসে বল্লে—যান, যান, জল খাইয়ে আসুন—

যতীন অবাক হয়ে বল্লে—কে ছেলেটি?

সাধু যতীনের মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—বুঝতে পারলে না? ঐ তো বালগোপাল।

তোমার খুব ভাগ্য তোমাকে গলার স্বর শুনিয়ে দিলেন। আমার পুষ্প মায়ের ভাগ্য। যাই আমি—

সাধুর মুখে স্নেহ-বাৎসল্যের রেখা ফুটে উঠলো, তৃষ্ণার্ত সন্তানকে পানীয় জল দেবার ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি মন্দিরের দিকে অদৃশ্য হোলেন।

যতীন ভাবলে, এও পুতুলখেলা, নয় আবার!

পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলে। সাধু অন্তর্যামী, সবার মনের কথা বুঝতে পারেন, অন্তত তার তো মনের অন্ধিসন্ধি খুঁজে বার করেচেন। এখানে কিছু ভাবা হবে না।

পুষ্প হঠাৎ বলে উঠলো—মনে পড়েচে, ইনি বৈষ্ণব আচার্য রঘুনাথ দাস।

বেলা পড়ে যেন অপরাহ্ণ হয়ে এসেচে। অপূর্ব পুষ্প-সুবাসে আশ্রম আমোদিত। বৈষ্ণব সাধু বল্লেন—বিকেল বড় ভাল লাগে, তাই সৃষ্টি করি। নইলে এখানে আর সকাল বিকেল কি? সূর্য নেই, চন্দ্র নেই, অন্ধকারও নেই। হ্যাঁ, কি সংশয় তোমার, যতীন? এখনও যায়নি, অন্ধকার বড় একগুঁয়ে। তাড়ানো যায় না।

—প্রভু কি করি বলুন। আপনি বৈষ্ণব আচার্য, কতদিনের লোক আপনি!

—মহাপ্রভুর সমসাময়িক। সপ্তগ্রামের নাম শুনেছিলে? সেই সপ্তগ্রামে বাড়ী ছিল আমার।

—আপনি এখানে কেন? আর সব কোথায় আপনার দলের? সাড়ে তিনশো বছর ধরে এ পুতুলখেলা নিয়ে—

—তোমার মন এখনও কাঁচা। আমি তোমাকে তো বলেচি মুক্তি চাইনি। সপ্তগ্রামে হরিদাস শিক্ষা দিয়েছিল ভক্ত চায় ভগবানের প্রতি ভক্তি, তাঁর প্রতি যেন মন থাকে। আমাদের তাতেই আনন্দ। তাঁর ভজন আরাধনা নিয়েই আছি। খুব সুখে আছি। মহাপ্রভু ভগবানে মিলিয়ে গিয়েচেন, তিনি নারায়ণের অংশ, মাঝে মাঝে আমাদের আহ্বানে প্রকট হন, এই আশ্রমে আসেন। তাঁর পৃথিবী থেকে এখানে আসার দিনে আশ্রমে উৎসব হয়, সে উপলক্ষে বড় বড় বৈষ্ণব আচার্য এমন কি জীবগোস্বামী মীরাবাঈ পর্যন্ত আসেন। ওঁরা আরও উচ্চ লোকে আছেন। অনেকে জীবকে শিক্ষা দিতে দু-একবার ইতিমধ্যে পৃথিবীতে নেমেছিলেনও।

—আর একটা কথা আপনাকে—

—বুঝেছি। তুমি যা জিজ্ঞেস্ করবে তার মুখে উত্তর চাও, না সে জগৎ দেখতে চাও? অর্থাৎ তুমি জানতে চাইচ, পৃথিবী ছাড়া অন্য জীবলোক আছে কি না—কেমন তো? বহু বহু আছে। বিশ্বের অধিদেবতার ভাণ্ডার অনন্ত। কোনো কোনো জগৎ পৃথিবী থেকেও তরুণ, সজীব। সেখানে সব মানুষ অত্যন্ত বেশি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে, তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে মরে যায়। আবার বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত জগৎ আছে—সেখানে মানুষ পৃথিবীর চেয়ে অনেক দীর্ঘজীবী, ধীরেসুস্থে জীবনের কাজ করে। পৃথিবীর হিসেবে যার বয়স পঁচিশ বছর, সেও বালক। ষাট বছর যার বয়স, সে নব্যযুবক। যাদের উন্নতি হতে দেরি হবে জানা যাচ্চে পৃথিবীতে, এমন সব আত্মাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না, দিলে সে পূর্ব জন্মের জীবদেরই পুনরাবৃত্তি করবে মাত্র। সুতরাং তাদের এই সব ধীর সানন্দ প্রৌঢ় পৃথিবীতে পাঠানো হয়। অনেকদিন সময় পায় বলে শেখবার ও শোধরাবার অবকাশ ও সুযোগ পায়। বিশ্বের দেবতার এমন আইন, সকলকেই অনন্ত মঙ্গলের পথে যেতে হবে—যে সহজে না যাবে, তাকে দুঃখ দিয়ে পীড়ন করে চোখ ফোটাবেনই। সেসব পৃথিবীতেও জীবশিক্ষার জন্যে উচ্চস্তরের আত্মারা নেমে যান দেহ গ্রহণ করে। পৃথিবী থেকেও বেশি কষ্ট পেতে হয় তাঁদের সে সবখানে। কিন্তু

ভগবানের কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা জানেন, দুদিনের দেহ, দুদিনের কষ্ট, দুদিনের অপমান। শাশ্বত-আত্মায় কোনো বিকার স্পর্শ করে না, তার জরা নেই, মৃত্যু নেই।

যতীন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল মহাপুরুষের কথা, এর মধ্যে অবিশ্বাস এনে লাভ নেই। আজ তার অত্যন্ত সুদিন, এমন একজন লোকের দর্শনলাভ করেচে সে।

বৈষ্ণব সাধু আবৃত্তি করচেন—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্!

যতীনের দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমাকে যা কিছু বলেচি, সব তাঁর কৃপা। শ্রীধর স্বামীর ঐ শ্লোক তো শুনলে? তিনিই, মূক যে, তাকে করেন বাচাল। গোপালের এমনি কৃপা, এমনি শক্তি। তাঁর বিশ্ব, তিনি যা কিছু করতে পারেন।

যতীন বল্লে—এ ভাবে কত কাল থাকবেন আর?

—অনন্ত কাল থাকতে পারি, যদি তাঁর ইচ্ছা হয়।

হঠাৎ তিনি উৎকর্ণ হয়ে বল্লেন—বৃন্দাবনে গোবিন্দ বিগ্রহের আরতি হচ্চে, চলো দেখে আসি—

পুষ্প খুশি হয়ে বল্লে—আমাদের নিয়ে যাবেন! আপনার বড় কৃপা—

বৈষ্ণব সাধুর জ্যোতির্ময় ঈষৎ নীলাভ দেহ ব্যোমপথে ওদের আগে আগে উড়ে চলেচে, ওরা তাঁর পেছন পেছন চলেচে। নভোচারী দু-একটি আরও অন্য আত্মাকে ওরা পরে দেখতে পেলে। যতীন কখনো বৃন্দাবন দেখেনি, তাই বৈষ্ণব সাধু ওকে চার-পাঁচটি বড় বড় গাছের ক্ষুদ্র বাগান দেখিয়ে বল্লেন—ওই দেখ চীরঘাট, ওখানে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য স্নান করে উঠে গোপালের দেখা পেয়েছিলেন। বড় পুণ্যস্থান, প্রণাম করো।

তার পরেই একটা বড় মন্দিরের গর্ভগৃহে সেকালের ঝুলোনো প্রদীপের আলোয় একটি সুন্দর বিগ্রহের সামনে ওরা গিয়ে দাঁড়ালে। অনেক লোক আরতি দর্শন করচে। একটি আশ্চর্য দৃশ্য যতীন এখানে প্রত্যক্ষ করে স্বর্গ-মর্তের অপূর্ব সম্বন্ধ দেখে অবাক হয়ে গেল। দেহধারী দর্শকদের মধ্যে বহু অশরীরী দর্শক এসে দাঁড়িয়ে বিগ্রহের আরতি দর্শন করচেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকটি আত্মার দিব্য জ্যোতির্ময় দেহ দেখে যতীন বুঝলে, ওঁরা উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত সাধক।

যতীনের সঙ্গী বৈষ্ণব সাধু একজনকে দেখিয়ে বল্লেন—কবি ক্ষেমদাস। উনি বৃন্দা-বনের বড় ভক্ত, এর মন্দির, এর কুঞ্জবন ছেড়ে থাকতে পারেন না।

যতীন বল্লে—একটা কথা শুনেছিলাম, আত্মিক লোক থেকে বার বার এলে নাকি আত্মার অনিষ্ট হয়?

সাধু বল্লেন—এসো, কবিকে প্রশ্নটা করি।

সাধু ও ক্ষেমদাস পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। সাধুর প্রশ্ন শুনে কবি ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—শ্রীরূপগোস্বামীর উজ্জ্বল নীলমণিতে গোপীদের বিরহের দশ-দশার বর্ণনা আছে—চিন্তা, উদ্যোগ, প্রলাপ, এমন কি মৃত্যুদশা, উন্মাদ রোগ পর্য্যন্ত। আমার এমন এক সময় ছিল বৃন্দাবনের যমুনাতট না দেখলে প্রায় তেমনি অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটতো। বৃন্দাবনের মত স্থানে এলে অনিষ্ট হয় না, কৃষ্ণে আসক্তি তো আত্মার ইষ্টই করে, ঊর্দ্ধলোকে নিয়ে যায়।

বৈষ্ণব সাধু বল্লেন—কৃষ্ণে আসক্তি কৃষ্ণপদে মতি এনে দেয়। হরিদাস স্বামী কি বলে-ছিলেন সপ্তগ্রামে মনে নেই?

ক্ষেমদাস বল্লেন—শুনেচি বটে। তবে মনে রাখবেন, আমি কবি ছিলাম, ভক্ত ছিলাম না আপনাদের মত। আপনারা ছিলেন শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর, আপনাদের মত ভাগ্য আমি

করি নি। আমার কৃষ্ণ বিশ্বের বনে বাঁশি বাজিয়ে বেড়ান, বালকস্বভাব—উদাস; কেউ যদি ডাকে তার কাছে যান, না ডাকলে আপন মনেই একা একা থাকেন। অনাদিকাল থেকে এমনি। তাঁকে যদি ভালবেসে কেউ ডাকে, তবে তিনি সঙ্গী পেয়ে খুশি হন—তিনি করুণস্বভাব, ভালবাসার বশ।

পুষ্প বল্লে—কেন একা থাকেন? রাধা কোথায়?

—ও সব কল্পনা। এই সব ভক্তপ্রভুরা বানিয়েছেন। কে রাধা? যে নারী ভালবাসে তাঁকে, সে-ই রাধা। সে-ই তাঁর নিত্যলীলার সহচরী। মীরাবাঈ যেমন।

—মীরাবাঈ আছেন?

—আছেন। তাঁরা নিত্যলীলার সহচরী ভগবানের—যাবেন কোথায়? বহু পুণ্যে তাঁদের দর্শন মেলে। বহু ঊর্ধ্বলোকে ওঁদের অবস্থিতি। আবার বিশ্ব ব্যেপে ওঁদের অবস্থান, তাও বলতে পারো। পৃথিবীর ব্যক্তিত্ব তাঁর নষ্ট হয়ে গিয়েচে বহুকাল, ও তো স্থূল দেহ ধরে লীলা করবার জন্যে যাওয়া। ওটা কিছু নয়। পৃথিবীর সেই মীরাবাঈকে কোথাও পাবে না। আছেন খাঁটি তিনি—অর্থাৎ যে শুদ্ধ, বুদ্ধ, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা মীরাবাঈ সেজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন দুদিনের জন্যে, তিনি আছেন।

যতীন বলে উঠলো—তাই আপনার মত একজন কবি বলেচেন—All the world's a stage, and the men and women merely players—অর্থাৎ—

ক্ষেমদাস মৃদু হেসে বল্লেন—বুঝেচি। গভীর সত্যবাণী। নানাদিক থেকে সত্য—নানাভাবে।

যতীন একটু বিস্ময়ের সুরে বল্লে—আপনি কি ইংরিজি জানেন?

—ভাষার সাহায্যে বুঝি নি, তোমার মনের চিন্তা থেকে ও উক্তির অর্থ বুঝেচি। ওঁর সঙ্গে আমার দেখাও হয়েছে। পঞ্চম স্তরে কবি-সম্মেলন হয়, সেখানে পৃথিবীর সব দেশের বড় বড় কবি আসেন—

যতীন ব্যাকুল আগ্রহের সুরে বল্লে, আপনি কালিদাসকে দেখেছেন? ভবভূতি?

—সে সৌভাগ্য আমার হয়েচে। পৃথিবীর সে কালিদাস নয়—যে নিত্য মুক্ত কবি-আত্মা কালিদাসরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সেই আত্মার সঙ্গে আমার পরিচয়। একবার নয়, অনেকবার নানা দেশে নানা প্রাকৃত দেহ ধারণ করে তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু আসলে তিনি অপ্রাকৃত দেহধারী চিদানন্দময় আত্মা; আজ নাম কালিদাস কাল নাম চণ্ডীদাস, পরে ক্ষেমদাস—তাতে কি?

—কবি-সম্মেলন হয় কোন্ সময়?

ক্ষেমদাস জিজ্ঞেস করলেন—তুমি বুঝি নতুন এসেচ পৃথিবী থেকে? তোমার কথাতে মনে হচ্চে। এখানে সময়ের কি মাপ? কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ—অনন্তকাল বায়ুর মত শন্ শন্ বইচে। বিদগ্ধমাধবে শ্রীরূপগোস্বামী বলেচেন তাই—অনর্পিতচরীং চিরাৎ—রূপগোস্বামীও কবি, তিনিও আসেন। আর তুমি জানো না, যাঁর সঙ্গে এসেচ এই আচার্য রঘুনাথ দাসও কবি? এঁর রচিত চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ কি পড়ে থাকবে? পড়েচ বলে মনে হচ্চে না। শোনো তবে—

কচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথাৎ শ্রীসন্ধিত্বান্দধতি দৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ।

কেমন ছন্দ? কেমন লাগচে ওঁর শ্লোক?

যতীন বিষণ্নমুখে বল্লে—আজ্ঞে বেশ!

বৃন্দাবনের গোবিন্দ-মন্দিরের আরতি বহুক্ষণ থেমে গিয়েচে। পাশের রাজপথ দিয়ে দু একখানা গাড়ী যাতায়াত করচে, মন্দিরের বড় বড় দরজায় আলো জ্বলচে, কোথা

থেকে উগ্র বকুল ফুলের গন্ধ ভেসে আসচে বাতাসে, মন্দিরের সামনে একটা হিন্দুস্থানী টাঙগাওয়ালা যাত্রীর সঙ্গে ভাড়া নিয়ে কি বকাবকি করচে। যতীন ভাবলে, স্বর্গ-মর্তের কি অদ্ভুত সম্বন্ধ! অথচ বেঁচে থাকতে পৃথিবীর লোকে কেউ এ রহস্য জানে না। মৃত্যুভয়ে ভীত হয়, এত বড় জীবনের খবর যদি কেউ রাখতো, প্রেম-ভক্তির এ সম্পর্ক যদি রাখতে জানতো ভগবানের সঙ্গে—তবে কি তুচ্ছ বিষয়-আশয়, টাকা-কড়ি, জমিদারী নিয়ে ব্যস্ত থাকে? এই মাত্র যে লোকটা সামনের রাস্তা দিয়ে মোটর চড়ে গেল ও হয়তো একজন মাড়োয়ারী মহাজন, সারাজীবন ব্যাঙ্কে টাকা মজুত করে এসেচে—জীবনের অন্য কোনো অর্থ ওর জানা নেই, কেবল তেজীমন্দী, লাভ-লোকসান এই বুঝেচে। জয়-পুর শহরে হয়তো ওর সাততলা অট্টালিকা। কিন্তু হয়তো ছেলেগুলো অবাধ্য, বেশ্যা-সক্ত, স্ত্রী কুচরিত্রা। মনে সুখ নেই—অথচ ও কি জানে, এই পাশেই মদনমোহনের মন্দিরে এই গভীর রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন লোকের কবি সাধুরা আজ সমবেত হয়েচেন, সেখানে পুষ্পের মত নারীর স্নেহ, কত শতাব্দীর পার থেকে ভেসে আসা অমর মহাপুরুষদের বাণী, বকুলপুষ্পের সুবাস, ভগবানে অর্পিত মধুর প্রেমভক্তির পরিবেশ—এইখানেই স্বর্গ-মর্তের বিশাল ব্যবধান রচনা করেচে। হায় অন্ধ পৃথিবীর মানুষ!

## ১৫

পৃথিবীর হিসেবে দীর্ঘ দু বছর কেটে গেল।

সেদিন পুষ্প ও যতীন বসে কথা বলচে বুড়োশিবতলার ঘাটে, এমন সময় পুষ্প হঠাৎ চীৎকার করে বল্লে—এই! থামো—থামো—খবরদার—

পরক্ষণেই সে ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন মুখে বহুদূর আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্লে—যতীনদা, যতীনদা—

যতীন বিস্মিত সুরে বল্লে—কি হোল? পুষ্প বল্লে—কিছু না। যতীন নাছোড়বান্দা, সে বার বার বলতে লাগলো—কি হোল বল না পুষ্প? বলবে না?

অবশেষে পুষ্প বল্লে—আশা বৌদিকে খুন করতে যাচ্চে তার সেই উপপতি নেত্যে—

—সে কি!

—ঐ যে, দেখতে পাচ্চ না?

যতীন ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বলে—চলো চলো ছুটে যাই, সামলাই গিয়ে—আমি তো কোনো দিকে কিছু দেখচি নে—ওঠো।

বিস্মিত যতীন পুষ্পের দিকে চেয়ে দেখলে যে তার যাবার কোন ব্যস্ততা নেই। সে চুপ করে বসেই রইল, কিছুক্ষণ পরে পুষ্পের বিশাল আয়ত চোখ দুটি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

যতীন বল্লে—কি হয়েচে, চলো চলো—

—গিয়ে কি হবে। এ যাত্রা রক্ষা হোল গিয়ে—

—বেঁচে গিয়েচে?

—আপাতত বটে। আহা, কি দুঃখ আশা বৌদির!

—আমি সেখানে যাবো পুষ্প। চলো দেখা যাক—

—না।

—তোমার ওই সব কথা আমার ভাল লাগে না পুষ্প, সত্যি বলচি। আমি আলবৎ যাবো সেখানে। আমার মন কেমন হচ্চে বল তো?

—সেজন্যেই তোমার আরও যাওয়া উচিত নয়। দেখে কষ্ট পাবে খুব।

—চলো পুষ্প, তোমার পায়ে পড়ি, আচ্ছা তুমি বোঝ সব, অথচ মাঝে মাঝে—

অগত্যা পুষ্প ওকে নিয়ে কলকাতায় আশার বাসায় এসে উপস্থিত হোল। তখন যতীন বুঝতে পারলে কেন পুষ্প এখানে তাকে আনতে চায় নি। নেত্য আজকাল মদ খায়, মাতাল অবস্থায় এসে দিন-দুপুরে সে আশাকে এমন মার দিয়েচে যে, সে ঘরের মেঝেতে পড়ে ভয়ার্ত চোখে দুর্দান্ত মাতালটার দিকে চেয়ে আছে। দরজার চৌকাঠের এপারে একখানা নেপালী কুক্‌রি পড়ে, সম্ভবত নেত্যর হাত থেকে ঠিকরে পড়ে থাকবে। ওদের দোরের বাইরে আশপাশের ঘরের ভাড়াটেরা জড়ো হয়ে উঁকি মেরে মজা দেখচে। নেত্য মত্ত অবস্থায় টলচে ও হাত নেড়ে নেড়ে জোর গলায় আস্ফালন করচে—ওকে আমি আজ খুন করে ফেলবো—আচ্ছা পাল মশায়, আপনি বিচার করুন, ওকে কে খেতে দিচেচ, পরতে দিচেচ? ও দেশে না খেয়ে মরছিল কিনা ওকে জিজ্ঞেস করুন না? আমি মশাই হক্ কথা হক্ কাজ বড় ভালবাসি। আমি আনলাম ওকে এখানে, খাওয়াই পরাই, অথচ সেই শম্ভু ব্যাটা এসে তলায় তলায় ফুর্তি মারে। কত দিন পই পই করে বারণ করিচি—করি নি? তেমন পুরুষ বাপে নেত্যনারাণের জন্ম দেয় নি—আজ তোকে খুন করে ফাঁসি যাবো, সেও থোড়াই কেয়ার করে এই শর্মা। এত বড় তোর বদমাইসি! কম করেচি আমি তোর জন্যে? তোর নিজের বিয়ে করা ভাতার কোনো দিন তোকে খেতে দেয়নি, আর আমি কিনা…দিয়েচে কোনো দিন সেই যতীন?

এই সময় আশা আধ-বসা অবস্থায় উঠে ঝাঁঝের সঙ্গে বল্লে—খবরদার! তিনি স্বর্গে গিয়েচেন, তাঁর নামে কিছু বোলো না—

নেত্য বিদ্রূপের সুরে বল্লে—ওরে আমার স্বামী-সোহাগী সতী রে! মারো মুখে ঝাঁটা, বলতে লজ্জাও করে না? আমি বলচি, না তুই বলতিস্ সেই যতনেটা বেঁচে থাকতে? আবার স্বামী-সোহাগ দেখাতে এসেচেন, মরণ নেই? ভারি স্বামী ছিল মুরোদের, সব জানি. বিয়ে করে একখানা কাপড় কিনে দেবার, এক মুঠো অন্ন দেবার ক্ষমতা হয় নি—

আশা আবার উঠে বল্লে—আবার ওই কথা! তিনি মরে স্বর্গে গিয়েচেন, তাঁর নামে কেন বলবে তুমি?

নেত্য হঠাৎ তেড়ে এসে আশার কাঁধে এক লাথি মেরে বল্লে—স্বামী সোহাগ উথলে উঠলো বদমায়েশ মাগীর, যে বেরিয়ে এসেচে তার মুখে আবার—গলায় দড়ি দিগে যা—

আশার চেহারা আগের চেয়ে খুব খারাপ হয়ে গিয়েচে, গায়ের রঙেও আগের মত জলুস নেই. লাথি খেয়ে সে কিন্তু এবার ঠেলে উঠলো। বল্লে—তাই দেবো, গলায় দড়ি দিয়ে তোমায় পুলিশের হাতে যদি তুলে না দিই—

—চুপ—পুলিশ তোর বাবা হয়!

—আবার মুখে ওই সব কথা?

এইবার একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক এগিয়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। বল্লে—এসব আপনাদের কি কাণ্ড? আপনারা না ভদ্দর লোক? আশপাশের বাড়ীতে গেরস্তর ঝি-বউ সব রয়েচে, এখানে মদ খেয়ে চেঁচামেচি চলবে না। হ্যাংগামা করতে হয়, ন্যাক্‌রা করতে হয়, সরকারী রাস্তা পড়ে রয়েচে। আমার বাড়ী ওসব করলে পুলিশে খবর দিতে হবে—

পালমশায় এবার বোধ হয় সাহস পেয়ে এগিয়ে এসে বল্লেন—আমিও তাই বন্নু। বলি এখানে ওসব কোরোনি—তা মাতালের সামনে এগোতে কি সাহস হয়!

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি আশাকে ধরে ঘরের বাইরে আনতে আনতে বল্লে—মাতালের সামনে তক্‌কো কত্তে আছে ছিঃ মা—দেখচো না ওর এখন কি ঘটে জ্ঞান আছে? এসো আমার ঘরে—

আশা চলে যায় দেখে নেত্য জড়িত কণ্ঠে বাজখাঁই আওয়াজে বল্লে—এই, কোথাও যাবিনি বলে দিচ্চি—হাড় ভাঙবো মেরে—খবরদার! এই! আমি এখন চা আর ডিম ভাজা খাবো—করে না দিয়ে যদি নড়বি—নিয়ে যেও না মাসী—

প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি যেতে যেতেই বল্লে—আচ্ছা, চা করে ডিম ভেজে আমার ঘর থেকে পাঠিয়ে দিচ্চি বাবা—আপনি একটু শান্ত হয়ে শুয়ে থাকুন—

পালমশায় উপস্থিত লোকজনদের দিকে চেয়ে বল্লে—চলো সব, চলো, কি দেখতে এসেচো সব? দুটো হাত পা বেরিয়েচে কারো, না ঠাকুর উঠেচে? বন্নু তখন ওখানে যেওনি, যে যার ঘরে যা খুশি করুক না, তোমার কি? আসুক দিকি আমার নিজের ঘরে। দেখি কত বড় কে বাপের ব্যাটা!

শেষের কথা ক'টি পৌরুষগর্বের উচ্চারণ করবার সময় তিনি নেত্যনারায়ণদের ঘর থেকে বেশ একটু দূরে বারান্দার প্রায় ওপাশে চলে গিয়েচেন যদিও, তবুও চলতে চলতে একবার পেছন ফিরে দেখে নিলেন, দুর্দান্ত মাতালটা তাঁর কথা শুনলো কিনা।

যতীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—এতদূর নেমেচে ওর অবস্থা! এ আমি ভাবিনি—

পুষ্প বল্লে—ভাবা উচিত ছিল, এ সব জিনিসের এই কিন্তু পরিণাম—এখান থেকে চলো যাই—

যতীন চুপ করে বসে ছিল, আশার দুর্দশা তার মনে গভীর রেখাপাত করেচে। সে দুঃখিত ভাবে বল্লে—তুমি কেবলই এসে চলে যেতে চাও, কিন্তু আমি কোথায় গিয়ে শান্তি পাবো পুষ্প? আমার কর্তব্য পালন করিনি বলেই আজ ওর এই দুর্দশা। আমি যদি স্বামীর কর্তব্য পালন করতাম, যদি আশার জন্যে তেমন টাকাকাড়ি রেখে যেতে পারতাম, তাহোলে—

—তোমার ভুল এখনো গেল না।

—কেন, ঠিক কথা বলচি কি না? ভুলটা কোথায়?

পুষ্প মৃদু হেসে ওর পাশে এসে বল্লে—তোমাকে এত ভাল ভাল জায়গায় নিয়ে গেলাম, তোমার বুদ্ধিটা যেমন স্থূল তেমনই রইল—

—কেন?

—আশা বৌদি নিজের কর্মফলে এখনও অনেকদিন এই রকম ভুগবে। তুমি ওর কর্মের বন্ধন কাটাতে পারো সাধ্যি কি? টাকা রেখে যেতে, টাকা সুদ্ধু চলে যেতো। বড় লোকের ছেলেদের তো অনেক টাকা দিয়ে বাপ-মা মরে যায়—তারা উচ্ছন্ন যায় কেন?

—আমি এখানে থাকবো পুষ্প। ওকে ফেলে যেতে পারবো না এ ভাবে—

—তুমি কেন, দরকার হোলে আমিও থাকবো। এখানে থাকতে আমার রীতিমত কষ্ট হয়—তবুও আমি তোমার জন্যে, যদি আশা বৌদির এতটুকুও উপকার করতে পারতাম তবে এখানে থাকতে কিছু আপত্তি করতাম না। কিন্তু তুমি এখনও অনেক জিনিস বোঝো নি। এসব নিষ্ফল চেষ্টা। করুণাদেবীর মুখে শুনেচি করুণার পাত্র মেলানো বড় দুর্ঘট। নয়তো করুণাদেবীর মত শক্তিশালিনী দেবী আশা বৌদিকে এখান থেকে উদ্ধার করতে পারেন না? এক্ষুনি পারেন—কিন্তু তাঁরা জানেন, তা হয় না। জীব নিজের চেষ্টায় উন্নতি করবে, বাঁশ দিয়ে ঠেলে উঁচু করে দিলে জীব উন্নতি করে না! নয়তো ভগবান এক পলকে সব পাপী উদ্ধার করতে পারতেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝে কাজ করতে হয়। সে তুমি আমি বুঝিনে, কিন্তু করুণাদেবী, প্রেমদেবীর মত দেবদেবীরা অনেকখানি বোঝেন—তাই তাঁরা অপাত্রে—

—আমি না বুঝতে পারি, কিন্তু তুমি ঠিক বোঝো। তোমার দেখবার ক্ষমতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। তবুও তোমার সঙ্গে এখানে ওখানে গিয়ে আমার অনেক উন্নতি

হয়েচে আগেকার চেয়ে—এখন বুঝিয়ে বল্লে বুঝি। তোমার সেই সন্ন্যাসীর মতে এখন বোধ হয় আমার মুকুলিত চেতন—নয়তো বুঝিয়ে বল্লেও বুঝতাম না, মনে সংশয় জাগতো, অবিশ্বাস জন্মাতো, তা হোলে সে সব তত্ত্ব আমার কোনো কাজে লাগতো না।

এই সময় নেত্যনারাণ ডাকতে লাগলো চেঁচিয়ে—ও আশা, শোনো এদিকে—এই আশা—

প্রৌঢ়া বাড়ীওয়ালী বারান্দায় বার হয়ে বল্লে—একটু চা খাচ্চে, আপনাকেও পাঠিয়ে দিচ্ছি তৈরী হোলে। আশা এখন যেতে পারবে না।

নেত্য গরম মেজাজে বল্লে—কেন যেতে পারবে না—শুনতে পাই কি? ও আমার মেয়েমানুষ, আমি যখন ডাকবো, আলবৎ আসবে—ওর বাবা আসবে—

এই কথাটা যতীনের বুকে যেন গরম শূলের মত বিঁধলো। আশা তার স্ত্রী, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে যার সংগে সে পরিণয়সূত্রে আবন্ধ হয়েচে—সেই আশা অপরের 'মেয়েমানুষ'? নেত্যর হুকুমে তাকে চলতে হবে? যতীনের মাথা যেন ঘুরে উঠলো। এক মুহূর্তে সমস্ত দুনিয়া বিস্বাদ, মিথ্যে, জোলো হয়ে দাঁড়ালো—মস্ত একটা ফাঁকি, মস্ত একটা ধাপ্পাবাজির মধ্যে পড়ে গিয়েচে সে। পুষ্প-টুষ্প, সন্নিসি-টন্নিসি সব এই মস্ত জুয়োচুরির অন্তর্গত ব্যাপার। নইলে অগ্নিসাক্ষী করে, হোম করে, বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করে যাকে সে সহধর্ম্মিণী করেছিল—

কিংবা এই হয়তো নরক!

সে হয়তো নরক ভোগ করচে—স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করেনি, জোর করে তাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে এনে কাছে রেখে সংশোধনের চেষ্টা করে নি, ক্লীবের মত নিশ্চেষ্ট হয়েছিল, সেও তমোগুণ। তার জন্যেই এই দারুণ নরক তাকে স্বচক্ষে দেখতে হচ্চে, কে যেন টেনে নিয়ে আসচে এখানে, এই শোচনীয় দৃশ্য দেখতে কে যেন তাকে বাধ্য করচে, নিয়তির মত নিষ্ঠুর সে আকর্ষণ, রেহাই দেবে না তাকে।

পুষ্প বল্লে—চলো যতীনদা, আর এখানে থেকে কষ্ট পেয়ো না—

যতীন দুঃখমিশ্রিত হতাশার সুরে বল্লে—তুমি অতি করুণাময়ী। তুমি জানো যে এ আমার কর্ম্মফলের ভোগ, এ নরক। তুমি দয়া করে তাই কেবল এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাইচ, আমি সব বুঝতে পেরেচি এবার। কিন্তু পুষ্প দয়াময়ী, আমার সাধ্যি কি, আমি যাই? চুম্বক যেমন লোহাকে টানে, আশার ভাগ্য ও আমার কর্ম্মফল পরস্পরকে তেমনি টানচে। টেনে আনচে কোথায় তোমাদের সেই তৃতীয় স্তর থেকে—আমায় সে টানে আসতেই হবে এবং আমি কোথাও যেতেও পারবো না।

পুষ্প দৃঢ়স্বরে বল্লে—তুমি দুর্ব্বল হয়ে হাল ছেড়ে বসে থেকো না, সেও কি পুরুষের কাজ, বীরের কাজ? তা ছাড়া তোমাকে এই বন্ধন থেকে বাঁচাবো আমি। নইলে তুমি বুঝতে পারচো না কি বিপদ তোমার সামনে—।

কিন্তু যতীন কিছুতেই না যেতে চাইতে পুষ্প কিছুক্ষণের জন্যে পৃথিবীতে থেকে চলে গেল, বল্লে—পৃথিবীর ভোরের দিকে সে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু রাত দুটোর পর নেত্য মদ্যপানের অবসাদে ঘুমিয়ে পড়াতে যতীন ভাবলে এবার সে স্বস্থানে ফিরতে পারে। আশা বাড়ীওয়ালীর ঘরেই ঘুমুচ্চে, সুতরাং এখন আর কোনো ভয় নেই, উদ্বেগ নেই। যেন ভয় বা উদ্বেগ থাকলেই সে ভয়ানক কিছু সাহায্য করতে পারতো!

পৃথিবী ছেড়ে বাইরের আকাশের তলায় এসে সে দেখলে শূন্যপথের সাধারণ চলাচলের মার্গগুলি একেবারে জনশূন্য। কেউ কোথাও নেই। যতীন একটু বিস্মিত হয়ে গেল। পৃথিবীর লোক না দেখতে পাক কিন্তু অসীম ব্যোমের নানা স্থান দিয়ে বিশেষত

ভূপৃষ্ঠ থেকে একশো দেড়শো গজের ওপর থেকেই মেঘপদবীর সমান্তরালে বা তদূর্ধ্বে বহু পথ সীমা-সংখ্যাহীন অনন্তের দিকে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেচে। এই সব পথ কোনো বাঁধাধরা সুরকি সিমেণ্টের তৈরী রাস্তা নয়—আত্মিক জীব, দেব-দেবী, উচ্চ জীবগণের গমনাগমন দ্বারা সুনির্দিষ্ট একটা অদৃশ্য জ্যোতিরেখা মাত্র।

সাধারণত বিশ্বের এই রাজমার্গগুলিতে আত্মিক পুরুষেরা সর্বদা যাতায়াত করেন, কিন্তু আজ সেখানে একেবারে কেউ নেই—আরও ওপরে এসে যে স্থান ধূসরবর্ণ আত্মাদিগের অধিষ্ঠানভূমি, সেও জনহীন।

যতীন বুঝতে পারলে না, এরকম ব্যাপারের কারণ কি। আজ এত বছর সে এসেচে আত্মিকলোকের তৃতীয় স্তরে—কিন্তু এমন অবস্থা সে দেখেনি কখনো। তার মনে যেন কেমন ভয়ের সঞ্চার হোল। অথচ কিসের ভয় সে নিজেই জানে না। যে একবার মরেচে, সে আর মরবে না, তবে ভয়টা কিসের?

হঠাৎ যতীন দেখলে একটি লোক যেন আতঙ্কে চারিদিকে চাইতে চাইতে ঝড়ের বেগে উড়ে দ্বিতীয় স্তরের আত্মিক লোক থেকে আরো ঊর্ধ্বলোকের দিকে পালাচ্চে। পৃথিবী হোলে বলা চলতো লোকটা দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্চে। ব্যাপার কি? এর নিশ্চয় কোনো গুরুতর কারণ আছে।

যতীন তাকে কিছু বলতে গেল, কিন্তু তার পূর্বেই লোকটা অন্তর্হিত হোল—মনে হোল পলায়মান ব্যক্তি যেন হাতের ইঙ্গিতে তাকে কি বল্লে—কি বিষয়ে সাবধান করতে গেল।

লোকটি অদৃশ্য হবার কিছু পরেই যতীনের মনে হোল কী এক ভীষণ টানে তাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্চে। অতি ভীষণ সে টানের বেগ, তিমির-প্রসারক যেন কোন্ বিশাল চৌম্বক শক্তি জগৎব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ করে তার জাল বিস্তার করেচে—যতীনের সামনে, পাশে, দূরে, চারিদিকে ঝড়ের মত কোথা থেকে সেই ভীষণ শক্তির লীলা এক মুহূর্তে ব্যাপ্ত হয়ে গেল। যতীন যেন ভীম আবর্তে তলাতল পাতালের অভিমুখে কোথায় চলেচে...তার জ্ঞান লোপ পেয়ে আসচে...কেবল এইটুকু সে লক্ষ্য করলে, শুধু সে নয়, ঝড়ের মুখে তার মত বহু জীবাত্মা কুটোর মত কোথায় চলেচে বিষম ঘূর্ণিপাকের টানে!...তারপর একটা আর্ত চীৎকার স্বর, এক কি বহু সম্মিলিত কণ্ঠের আর্তনাদ, যতীন ঠিক বুঝতে পারচে না, তার সংজ্ঞা নেই, অতিপ্রাকৃত কী এক বিষম শক্তির অমোঘ আকর্ষণ তাকে খেলার পুতুলে পরিণত করেচে...

ভয়ানক অন্ধকার তার চারিদিকে, এই কি তলাতল পাতাল? পৃথিবী কোথায়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, চন্দ্র সূর্য কোথায়, পুষ্প কোথায়? করুণাদেবী কোথায়, হতভাগিনী আশা কোথায়—সব লুপ্ত, একেবারে! কোন্ রসাতলে সে চলেচে দুর্লঙ্ঘ্য আকর্ষণে।

অনেকক্ষণ...অনেক যুগ যেন কেটে গিয়েছে...জ্ঞান নেই যতীনের। অন্ধকার ছাড়া আর কোনদিকে কিছু নেই। বহুদিন সে কী এক গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে ছিল। সব অন্ধকার...বিস্মৃতি...

পুষ্পের ডাকে তার চৈতন্য হোল। পুষ্প তাকে ডাকচে, ও যতীনদা, যতীনদা, বেরিয়ে এসো।

পুষ্প ও আর একজন তাকে প্রাণপণে ডাক দিচ্চে, যেন কতদূর থেকে...

যতীন বলে উঠলো—অ্যাঁ!—

—শীগগির চলে এসো—ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করো—ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ, ওঁ কৃষ্ণ—পুষ্প, পুষ্প ডাকচে!

যতীনের জ্ঞান একটু একটু ফিরে এসেচে—এ কোন্ স্থান!

কে যেন ওর হাত ধরলে এসে। পুষ্পের কণ্ঠস্বর ওর কানে গেল আবার। পুষ্প যেন কাকে বলচে—এবার যতীনদা বেঁচে গেল। তবে এখনও ঠিক জ্ঞান হয়নি—

আবার আত্মিকলোকের নির্মল বায়ুস্তরে ওর নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস সহজ ও আনন্দময় হয়ে আসচে। যতীন জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলে, সামনে পুষ্প ও পুষ্পের মা। সে বিস্ময়ে ওদের দিকে চেয়ে বল্লে—কি হয়েছিল বল তো? এ কি কাণ্ড! এমন তো কখনো—

তারপর সে চারিদিকে চেয়ে দেখে আরও অবাক হয়ে গেল। সে পৃথিবীর এক গরীব গৃহস্থের পুরোনো কোঠাঘরের মধ্যে। পৃথিবীতে রাত্রিকাল, সম্ভবত গভীর রাত্রি। বর্ষাকাল। বাইরে ঘোর অন্ধকার, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়চে বাড়ীর পেছনের বাঁশ-বনে। ঘরের এক কোণে কিছু পেতল কাঁসার বাসন একটা জলচৌকির ওপরে, একটা পুরোনো তক্তপোশ, দুতিনটি বস্তা—একটার ওপর আর একটা সাজানো—সম্ভবত ধান। ঘরের মেঝের একপাশে একটা জলের বালতি, ওদের ঠিক সামনে মেঝের ওপর মলিন কাঁথা পাতা একটা বিছানার একপাশে ছোট ছোট বালিশ পাতা—আর একটা ছোট্ট বিছানা, কিন্তু সে ছোট বিছানাটা খালি। আর বিছানার সামনে মেঝের ওপরেই মলিন শাড়ী পরনে একটি মেয়ে বসে অঝোরে কাঁদচে, মেয়েটির কোলে একটি মৃত শিশু, সম্ভবত ছ'সাত মাসের। ঘরের দরজার কাছে একটা পুরোনো হ্যারিকেন লণ্ঠনে বোধ হয় লাল তেল জ্বলচে, কারণ আলোর চেয়ে ধোঁয়া বেশি হয়ে লণ্ঠনের কাঁচের একটা দিক কালো করে ফেলেচে। ঘরের মধ্যে আরও দুতিনটি মেয়ে ও পুরুষমানুষ সবাই ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে ঘিরে নিঃশব্দে বসে।

মেয়েটি কাঁদচে আর বিলাপ করচে—ও আমার ধনমণি, ও আমার সোনা, হাসো, দেয়ালা করো, আমার মানিক, চোখ চাও—আমার কোল খালি করে পালিও না আমার সোনা—কোথায় যাবা আমায় ফেলে?

যতীন বিস্ময়ের দৃষ্টিতে পুষ্পের ও পুষ্পের মার দিকে চেয়ে বল্লে—এ সব কি ব্যাপার! এরা কারা? আমি কোথায়?

মেয়েটি একমনে বিলাপ করেই চলেচে কোলের মৃত শিশুর দিকে চোখ রেখে।

—কাল থেকে তুমি একবারও মাইএ মুখ দ্যাওনি যে বাবা আমার! মাই খাবা? মায়ের মাইএ মুখ দেবা না, ও মানিক আমার? আর মুখ দেবা না? চোখ চাও দিনি—

মেয়েটির আকুল ক্রন্দনে যতীনের মনের মধ্যে এক অদ্ভুত ধরনের চঞ্চলতা দেখা দিল, পরের কান্না শুনে এমন কখনো তার হয়নি—সম্পূর্ণ অননুভূত কোন্ অনুভূতিতে ওর চোখে জল এসে পড়লো।

পুষ্প বল্লে—চলে এস যতীন দা, চলো সব বলচি। তুমি পুনর্জন্মের টানে পড়ে পৃথিবীতে জন্মেছিলে আজ ছ'সাত মাস। ওই তোমার মা। আজ আবার দেহ থেকে মুক্তি পেলে। ওই মৃত শিশুই তুমি—কি বিপদেই ফেলেছিলে আমাদের।

যতীন অবাক হয়ে বল্লে—পুনর্জন্মের টান! সে কি! আমি এই বাড়ীতে—

—এই ঘরেই জন্মেছিলে। এরা ব্রাহ্মণ, গ্রামের নাম কোলা বলরামপুর, জেলা যশোর। ভগবানের কাছে বহু ডাক ডেকে আর করুণাদেবীর দয়ায় আজ উদ্ধার পেলে—নতুবা দেহ ধরে এই সব অজ পাড়াগাঁয়ে এখন বহুকাল কাটাতে হোত—পুনর্জন্মের ঠ্যালা বুঝতে পারতে। বার বার পৃথিবীতে যাওয়া-আসার কুফল এখন বুঝতে পারচো তো? কতবার না বারণ করেছি?

যতীনের মন তখন কিন্তু পুষ্পের ওসব আধ্যাত্মিক তিরস্কারের দিকে ছিল না। তার সামনে বসে এই তার পৃথিবীর মা, গরীব ঘরের মা, তারই বিয়োগব্যথায় আকুলা,

অশ্রুমুখী। গত ছ'মাসের শৈশবস্মৃতি কোনো দাগই কাটেনি তার শিশু-মস্তিষ্কে। কিন্তু কত বিনিদ্র রজনী যাপনের মৌন ইতিহাস ওই দরিদ্রা জননীর তরুণ মুখে! তারই মা, তারই নবজন্মের দুঃখিনী জননী, যাঁর বত্রিশ নাড়ী ছিঁড়ে ছ'মাস পূর্বে এই দরিদ্র গৃহে কত আশা আনন্দের ঢেউ তুলে একদিন সে পুনরায় ধরণীর মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। কি অদ্ভুত মোহ, কি আশ্চর্য মায়ার বাঁধন. মনে হচ্চে, স্বর্গ চাইনে, করুণাদেবীকে চাইনে, পুষ্পকে চাইনে, আশাকে চাইনে, আধ্যাত্মিক উন্নতি-টুন্নতি চাইনে—এই পৃথিবীর মাটিতে পৃথিবীর এই মায়ের কোলে সুখদুঃখে সে আবার মানুষ হয়! এই টিপ্ টিপ্ বৃষ্টিধারা, এই বর্ষার রাত্রিটি. এই গরীব মায়ের তারই জন্যে এ আকুল বুকফাটা বিলাপ —এ সব জীবনস্বপ্নের কোন্ গভীর রহস্যময় অংক অভিনয়ের দৃশ্যপট! ভগবান হিরণ্যগর্ভের অধিষ্ঠিত স্বপ্ন।

ওর মনে পড়ল যাত্রায় শোনা গানের দুটো লাইন—

এ নাটকের এ অংকে পেয়েছি স্থান তোর অংকে,
হয়তো যাবো পর অঙ্কে পর অংকে পুত্র সেজে।

ওদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া বল্লে—আর কেঁদো না বৌ. যা হবার হয়ে গেল, এখন উঠে বুক বাঁধো—মনে করো ও তোমার ছেলে নয়—ভারত করতে যদি ও আসতো তা হোলে কোলজোড়া হয়ে থাকতো. তা ভারত করতে তো আসে নি—কেঁদো না—

একজন আধবুড়ো গোছের লোক বল্লে—বিষ্টি মাথায় এখন আর কোথায় যাবো—সকালের আর বেশি দেরি নেই. সাধন আর হরিচরণকে নিয়ে আমি যাবো এখন—

প্রৌঢ়া বল্লে—বিষ্টিরও বাপু কামাই নেই—সেই যে আরম্ভ করেচে বিকেলবেলা, আর সারারাত—

কথা বলতে বলতে কাক কোকিল ডেকে রাত ফর্সা হয়ে গেল। পুষ্পের বার বার আহ্বানেও যতীন সেখান থেকে নড়তে পারলে না। পুত্রহারা জননীর আকুল কান্না, ও আছাড়ি-বিছাড়ির মধ্যে সেই আধ-বুড়ো লোকটি আর দুজন ছোকরা মৃত শিশুদেহ নিয়ে বৃষ্টিধারা মাথায় বাঁশবনের পথে চললো। যতীন, পুষ্প ও পুষ্পের মা গেল ওদের সঙ্গে। বাড়ী থেকে দু রশি আন্দাজ দূরে ছোট্ট একটা নদী. কচুরিপানার দামে আধ-বোজা ; ওরা শাবল দিয়ে গর্ত খুঁড়ে মৃতদেহটা নদীর ধারে পুঁতে ফেললে। তখনও ভাল করে দিনের আলো ফোটেনি. বৃষ্টিধারায় চারিধার ঝাপসা। পথে-ঘাটে লোকজন নেই কোথাও—বর্ষাকালের ধারামুখর প্রভাতকাল।

## ১৬

পুষ্প যতীনকে সঙ্গে নিয়ে পৃথিবীর বৃষ্টিধারা-মুখর ঝাপসা আকাশে ঊর্ধ্বে এক সু-উচ্চ পর্বতচূড়ায় এসে বসলো। পুষ্পের মা বল্লে, আমি যাই মা পুষ্প, বসো তোমরা।

নিম্নে পৃথিবীর চারিদিকে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎগর্ভ মেঘপুঞ্জ থেকে বিদ্যুৎ খেলচে. দিক্‌চক্রবালে সুনীল আকাশে সূর্যোদয় হচ্চে, অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ রাঙা। ওরা যেন পার্থিব বাসনা কামনার বহু ঊর্ধ্বের কোনো নির্মল দেবলোক থেকে পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে। বাংলা দেশের উত্তরে এ বোধ হয় হিমালয় পর্বতের চূড়া। দূরে নিকটে তুষাররাশি সূর্যালোকে ঝক্‌মক্ করচে। যতীনের মনে হচ্ছিল এই সবই মায়া, ভেল্‌কিবাজি, ভগবানের ভেলকি্‌বাজি। মৃত্যুর অসত্যতা সে ভাল ভাবে বুঝেচে। মৃত্যু বলে তাহোলে কোনো জিনিস নেই : এই তো সে যশোর জেলারই কোলা-বলরামপুর গ্রামে মরে গেল শেষ রাত্রে অথচ এখানে সে পর্বতশিখরে বাহাল-তবিয়তে সমাসীন।

মরণ নেই, বিচ্ছেদ নেই, দুঃখ নেই, আমরা অমর—জীবনমরণের সঙ্গে, সুখদুঃখের সঙ্গে—সনাতন, নিত্য, অনশ্বর আমাদের এ ক্ষণিক লীলাখেলা।...

পুষ্প যতীনের মনের ভাব বুঝতে পারলে। হাজার হোক, যতীনদা পুরুষমানুষ, ইউনিভার্সিটির ছাত্র ছিল, জিনিসগুলো চট্ করে ধরতে পারে। পেটে একেবারে বিদ্যে না থাকলে অন্ধকার ঘোচে? সে গম্ভীর মুখে বল্লে, এবার বেঁচে গেলে বটে, কিন্তু বার বার আশা বৌদির কাছে যাতায়াতের ফলে তোমার এই বিপদ। অনেকবার তোমায় সাবধান করেছিলাম, শোনো নি। পুনর্জন্মের আবর্ত মাঝে মাঝে আত্মিক স্তরে ঝড়ের মত এসে পৌঁছয়, কোথা থেকে আসে তা জানিনে, ক'টা ব্যাপারই বা বুঝি জগতের! সেই সময় যে কেউ সামনে পড়ে, তাকে নিয়ে এসে পৃথিবীতে ফেলে ঘুরিয়ে। ও থেকে রেহাই নেই। তাই এসে জন্মেছিলে পৃথিবীতে—

—আমার মনে আছে সে ভীষণ টানের কথা—জ্ঞান ছিল না আমার।

—তোমার উচিত হয়নি আশাদের বাসায় অতক্ষণ থাকা। ও একটা ঝড়ের মত, ভূমিকম্পের মত বিপর্যয়; তবে তৃতীয় স্তরের নীচের অঞ্চলেই ও আবর্তের সৃষ্টি, চতুর্থ স্তরের আত্মারা তত বিপদগ্রস্ত হন না ওতে—যদিও পালিয়ে যান সকলেই; ও একটা অন্ধশক্তি—ওকে বিশ্বাস নেই। কোথায় ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে পুনর্জন্ম ঘটাবে পৃথিবীতে। অনেকেই পৃথিবীতে জন্ম নিতে চায় না, সকলেই ওটাকে ভয় করে।

—তুমি আমাকে কোনদিন এই ব্যাপারটার কথা বলো নি তো?

—ভূমিকম্পের কথা পৃথিবীতে সবাইকে সবাই বলে বেড়ায়? হয়তো জীবনেই ঘটলো না, নয় তো এসে সব ওলটপালট করে দিয়ে গেল—এও তেমনি। পৃথিবীর বাসনা কামনা আসক্তি যখন মনের মধ্যে বেশি হয় বা যখন তৃতীয় স্তরের নীচেকার আত্মিক লোকে থাকে—তখনই ওই আবর্ত বড় বিপজ্জনক। সেইজন্যেই তোমায় বার বার বারণ করতাম। একা আর তোমাকে বেরুতে দেবো না—

—তুমি জানতে পারলে কখন?

—তখুনি। আমি তখন জপে বসেচি—

লজ্জায় পুষ্প নিজেকে হঠাৎ সামলে নিলে, সে জপ-ধ্যান করে লুকিয়ে, যতীনদার সামনে সে মস্ত বড় কোনো যোগিনী সাজতে চায় না।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—তারপর?

—তারপর তখুনি বুঝলুম, তুমি মাতৃগর্ভে ঢুকে গিয়েচ। সঙ্গে সঙ্গে তোমার তো সব বিস্মৃতি এসে গেল, আমি মরি ছুটোছুটি করে। ছুটি করুণাদেবীর কাছে, আমার গুরুদেবের কাছে ছুটি। করুণাদেবী বল্লেন, মার মনে দুঃখ দিয়ে তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না—

যতীন হেসে বল্লে—পৃথিবীতে মরে গেলুম, আর তোমাদের এখানকার ভাষায় বেঁচে গেলুম, এ বেশ মজার কথা বলচো কিন্তু পুষ্প। আরও দুবার এর আগে এমনি বলেচ 'বেঁচে গেলে যতীনদা'—আরে, মরেই তো গিয়েচি আজ সকালে পৃথিবীতে?

পুষ্প হেসে বল্লে—তারপর শোনো। করুণাদেবী মাকে কাঁদাতে পারবেন না—গুরুদেব বল্লেন—তোমাকে মাতৃগর্ভে দশমাস দশদিন থাকতে হবে—তারপর ভূমিষ্ঠ হতে হবে, তবে তিনি চেষ্টা করবেন—

—কি চেষ্টা করবেন—শিশুহত্যার?

—তোমার অজ্ঞান অন্ধকার কাটেনি দেখচি এখনও—

—না, আমার মনে খট্‌কা লেগেচে। পুষ্প, আমায়—তোমাদের ভাষায়—'বাঁচিয়ে' খুব ভাল করেচ, কিন্তু ওই মেয়েটির কান্না—আমার মায়ের ওই কান্না—

যতীনের চোখে জল এসে পড়লো।

পুষ্প হেসে বল্লে—চলো গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাই। এতদিন তোমায় বলিনি তাঁর কথা—তোমার মন আজ ভাল না, চলো আমার সঙ্গে—

—সে কতদূর?

—পঞ্চম স্বর্গের দ্বিতীয় স্তরে—তোমাকে আবরণ দিয়ে শক্তি দিয়ে নিয়ে যাবো, নইলে তোমার জ্ঞান থাকবে না অত ওপরে। কিছু দেখতেই পাবে না—

যতীন খানিকক্ষণ কি ভাবলে, তারপর বল্লে—বোসো পুষ্প, দেখে আসি মা কি করচেন—

পুষ্প ধমক দিয়ে বল্লে—কে মা? কিসের মা? বৈষ্ণবী মায়ায় ভুলো না। অনন্ত পথে কত মা, কত বাবা, কত ছেলে, কত স্ত্রী। প্রত্যেকেই অ-বিনাশী আত্মা, প্রত্যেকেই লীলা করচে। চলো—

—না পুষ্প, আমার সত্যিই এখনো তোমার মত জ্ঞান জন্মায় নি মনে। এখনো মায়া-দয়া মন থেকে একেবারে বিসর্জন দিতে পারিনি। তোমাদের ব্রহ্মজ্ঞান নিয়ে তোমরা থাকো—আমি ওর মধ্যে নেই, সত্যি বলচি। আমাকে যেতেই হবে মাকে দেখতে। আজ সকালে মার সেই বুকফাটা কান্না আমারই জন্যে, সে আমি ছেলে হয়ে কি করে ভুলি?

পুষ্প মৃদু হেসে একটু ধীরভাবে বল্লে—উঃ, কি বাঁধন, তাই দেখচি! মায়ার শক্তি আছে বটে! এড়ানো বল্লেই কি এড়ানো যায়? মানুষকে নিয়ে পৃথিবীর লীলা তা হোলে হয় কি করে!

পরে সে হঠাৎ সুস্বরে গেয়ে উঠলো দুটো মাত্র কলি—

'এ বাঁধন বিধির সৃজন, মানব কি তায় খুলতে পারে?
কারাগার ভাঙতে কি পারো, ও যে মায়ার পাঁচিল আছে ঘিরে!'

যতীন ব্যঙ্গের সুরে বল্লে—থাক্, থাক্, ব্রহ্মবিদ্যে এখন তুলে রেখে দাও, ওসব. সইবে না ধাতে।

পুষ্প হেসে বল্লে—কেমন গলা, যতীনদা?

—চমৎকার!

—তা এখন মার কাছে না গিয়ে এর পরে যেও।

—আমি একবার দেখে আসি, বোসো—

আবার সেই কোলা-বলরামপুর গ্রাম। বেলা দুপুর। বৃষ্টি থেমেচে, কিন্তু আকাশ মেঘ-মেদুর। সজল বর্ষার বাতাস বইচে, সারারাত্রি বর্ষণের ফলে পথে-ঘাটে জল দাঁড়িয়েচে। বৃষ্টিসিক্ত লতাঝোপের পত্রপুঞ্জ থেকে টুপটাপ বৃষ্টির জল ঝরে পড়চে এখনও।

রান্নাঘরের দাওয়ায় মেয়েটি খেতে বসেচে। কলাইয়ের দাল, মোচা ছেঁচকি আর কাঁচ-কলা ভাজা। সকালবেলার সেই প্রৌঢ়াও পাশে বসে খাচ্চে। সে খেতে খেতে বল্লে—একটু ডাল দেবো বৌ?

—না, আমি আর কিছু খাবো না মাসী। যা খেয়েচি সকালবেলা, পেট ভরে গিয়েচে—

—ছিঃ, অমন কথা বলতে নেই বৌ, আবার কোলজোড়া ছেলে পাবে, হাতের নোয়া সিঁথির সিঁদুর বজায় থাক্।

মেয়েটি ভাত খাওয়া ছেড়ে হাত তুলে বল্লে—কি মুখ চোখের ছিরি, মাসী—ও যে বাঁচবে না সে আমি জানি—আমার কপালে কি অমন ছেলে বাঁচে। সেবার কিসে কামড়ালো রাত্তিরে, ছেলে ককিয়ে কেঁদে উঠলো, আমি তাড়াতাড়ি টেমি জেবলে দেখি ছেলের কাঁথার তলায় এতবড় কাঁকড়া বিছে! সেই রাত্তিরে কাঁটানটের শেকড় বেটে, জলপড়া এনে নাপিত-

বাড়ী থেকে দিই। আহা, আশ্বিন মাসে একবার এমন কাশি হোল যে বাছা দম আটকে বুঝি যায়—কি যে বল্লে শিবু ডাক্তার, হুপিং কাশি না কি—যে ক'দিন ছিল, ক'টই পেয়ে গিয়েচে বাছা আমার!

প্রৌঢ়া বল্লে—কেঁদো না বৌ, ছিঃ,—ভাতের থালা সামনে কাঁদতে নেই দুপুর বেলা। অলক্ষণ।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে বল্লে—আর আমার লক্ষণ অলক্ষণ সব হয়ে গিয়েচে মাসী—এখন তোমরা বলো আমিও তার সঙ্গে চলে গিয়ে হাড় জুড়ুই। আমি কি করে খোকার মুখ না দেখে থাকবো, ও মাসী!

মেয়েটি এবার ডুকরে কেঁদে উঠলো ডাল ভাত মাখা হাত তুলে হাঁটুর ওপর রেখে।

—ছিঃ বৌ, ওকি! খাও, খাও, আরে অমন করে না। তুমি তো অবুঝ নও, আবার হবে, এই-স্ত্রী মানুষ, ভাবনা কি? কোল জুড়ে আবার পাবে—

যতীনকে নিয়ে টেনে বার করাই কঠিন সেখান থেকে। পুষ্প অনেক কষ্টে তাকে কোলা-বলরামপুরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ী থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এল বুড়োশিবতলায়।

বল্লে—খুব মন কেমন করচে মার জন্যে?

—সত্যিই, এত কষ্ট দিয়ে এসে অপরের মনে, আমার কোনো সুখ হবে না এ স্বর্গে। এ যেন পানসে হয়ে গিয়েচে। জগতে যখন এত কষ্ট—তখন আমি সুখে থেকে কি করবো পুষ্প। পৃথিবীই আমার ভাল, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেখানে জমি চাষ করি, স্ত্রীপুত্রকে খাওয়াই, মাকে খাওয়াই। দেখলে না মায়ের খাওয়া গেল? আমি সেই মায়াবাদী সন্নিসিকে পেলে একবার জিজ্ঞেস করি, সবাই যদি সমাধি লাভ করে ব্রহ্মে লয় পাবে, তবে জগৎসংসার চলবে কাদের নিয়ে? সব নিয়েই তো সংসার। চাষা যদি লাঙল না চষবে, তাঁতি কাপড় না বুনবে, মজুর যদি তোমার আমার হয়ে না খাটবে—তবে একদিন সংসার চলে কেমন চলুক তো? তুমি তো বলচো সব মিথ্যে, সব ভুল—

—এ কথার উত্তর আমি তোমায় এখুনি দিতে পারি, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করবে না আমার মুখ থেকে শুনলে। তাই এর জবাব দিলাম না।

—জবাবে দরকারও নেই। তুমি কেন আমাকে নিয়ে এলে পৃথিবী থেকে?

—কেন নিয়ে এলুম! শুনবে তবে? আমি আনিনি। তোমার অদৃষ্ট তোমাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়েছিল, অদৃষ্টই আবার এনেচে। পৃথিবীতে পুনর্জন্মের সময় তোমার আসেনি—দৈবদুর্বিপাকে পুনর্জন্মের টানে জন্মাতে বাধ্য হয়েছিলে। ও একটা দুর্ঘটনা—যেমন ভূমিকম্প। ও থেকে তোমার কর্মফল তোমাকে মুক্ত করে আনতো—এনেওচে। আমি কে? আমি সাহায্য করেচি মাত্র। পুনর্জন্মের জন্যে অত ভেবো না—ও যখন হবে, তখন কেউ রুখতে পারবে না।

—আমার ভাল লাগে না...পৃথিবীতে এত কষ্ট! এখানে নির্ঝঞ্ঝাটে কোন্ প্রাণে... ওদিকে আশা, এদিকে আমার মা—

—পৃথিবীর মানুষ তুমি এখন আর নও এই কথাটা ভুলে যাচ্চ। পৃথিবীর মানুষ যখন ছিলে, তখন যে কথা বলচো তা বল্লে মানাতো। বিধাতার নিয়মই এই, পৃথিবীর জীবন থেকে এখানে আসতে হয়। সকলের জন্যে কষ্ট করবো বল্লেই তোমার শুনচে কে? নিয়মের অধীনে তোমাকে চলতে হবে। ভগবান তোমার আমার চেয়ে ভাল বোঝেন। তাঁর আইন মেনে নিতেই হবে। কেন এরকম হোল, এর জবাব তিনিই দিতে পারেন। আমার সেই গুরুদেবের কাছে যাবে? তিনি তোমায় বোঝাতে পারবেন।

—না, আমার গুরু-টুরুতে দরকার নেই পুষ্প, তুমি ক্ষ্যামা দাও—ঢের হয়েচে। আমার বড় ইচ্ছে সেই মায়াবাদী সমাধিবাজ সন্নিসিটার সঙ্গে—

—মহাপুরুষদের সম্পর্কে তোমার মুখের ভাষাগুলো একটু ভদ্র করো যতীনদা—

এমন সময় বুড়োশিবতলার ঘাটে এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো।

হঠাৎ দুজনেই আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলো, পশ্চিম দিকের আকাশ যেন প্রজ্বলন্ত উল্কার মত কোন্ আলোতে আলোকিত হয়ে উঠেচে বহুদূর পর্যন্ত। আরও একটু পরে ওরা দেখতে পেলে, বহুদিন আগেকার দেখা সেই পথিক দেবতা শূন্যপথে চলেচেন। মনে হোল যেন তিনি ওদের দিকেই আসচেন, সেই রকম একটা নীল আলো ওদের সাগঞ্জ-কেওটার ঘাট অবধি এসে পড়লো, কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর পথ গেল বদলে। তিনি আরও দূরের কোন্ গ্রহলোকের দিকে যাত্রা করলেন। যতীন প্রথমটা চিনতে পারেনি। বললে —উনি কে পুষ্প ?

—চিনতে পারলে না যতীনদা? উনি সেই পথিক দেবতা, এককল্প পূর্ব থেকে যাত্রা করেচেন এই বিশ্বের শেষ দেখবেন বলে কিন্তু এখনও এর একাংশও দেখে উঠতে পারেননি— কত নীহারিকা, কত নক্ষত্রলোক, কত গ্রহলোক তিনি ঘুরেচেন, এমন কত লক্ষ লক্ষ পৃথিবী—তবু এর কোন হদিস তিনি পাননি। মনে নেই, সেই এখানে ক্লান্ত হয়ে এসে পড়েছিলেন ? পৃথিবী শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেটা আবার কোন্ গ্রহ ! সূর্য কোন্‌টা চিনতে পারেননি।

—হ্যাঁ. হ্যাঁ, মনে পড়েচে।

পুষ্প একটু প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের সুরে বল্লে. তাই তো বলচি যতীনদা, এই সামান্য সৌরজগতের এই ক্ষুদ্র গ্রহ পৃথিবীর মায়া তুমি কাটাতে পারচো না, অথচ দেখ তুমি যে লোকে এসেচো সেখানে একটু সাধনা করলেই তুমি অমনি কত লক্ষ লক্ষ সৌরজগৎ, তার কোটি কোটি গ্রহের জীবনযাত্রা দেখতে পাবে! কত দেখবার আছে. কত জানবার আছে যতীনদা, সে সব তোমার দেখতে জানতে ইচ্ছে করে না?

যতীন তখনই কোন জবাব দিতে পারলে না, কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। তারপর সহসা উত্তেজিত সুরে বল্লে—আমি সব দেখব, বুঝবো পুষ্প। আমার চোখ উনি অনেকখানি যেন খুলে দিয়ে গেলেন। চলো করুণাদেবীর কাছে—

—এখুনি ?

—এতটুকু দেরি নয়।

আবার সেই উচ্চ আত্মিকলোকের বায়ুস্তর, চক্ষের নিমেষে পুষ্পের সাহায্যে যতীন শত শত যোজন. যোজনের পর যোজন পার হয়ে চললো। করুণাদেবীর আশ্রম সেই ক্ষুদ্র গ্রহটিতে ওরা পেঁাছে দেখলে কেউ কোথাও নেই। সেই কুসুমিত উপবন, সেই প্রাচীন বৃক্ষতল যেখানে রাজরাজেশ্বরীর মত রূপসী দেবী সেদিন এলিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, আজ সে স্থান জনশূন্য।

যতীন হতাশার সুরে বলে—তাই তো! এ যে দেখচি—

—জগৎ-সংসারের কাজে সর্বদা ঘুরচেন. কি জানি কোথায় গিয়েচেন—

—কিন্তু কি সুন্দর দেশ এটা! আমার ইচ্ছে করে এখানেই থাকি। বুড়োশিবতলার ঘাট এমন করে নেওয়া যায় না ?

—অনেক বেশি শক্তি দরকার এমন দেশ গড়তে. আমার তা নেই যতীনদা। এদেশ শুধু বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য নিয়ে সুন্দর হয় নি, মনের ওপর এর প্রভাব বুঝতে পারচো নিশ্চয়ই। আমরা যেন অনেক উঁচু জীব হয়ে গিয়েচি; শ্রান্তি নেই. ক্লান্তি নেই, দেহ-মন কত উঁচু ধরনের হয়ে গিয়েচে।

এমন সময় একটি বিস্ময়কর আবির্ভাবের মত করুণাদেবী হঠাৎ যেন জ্যোতিঃপদ্মের মত ফুটে উঠলেন সেই বনস্থলীর প্রান্তে। স্নেহ ও প্রসন্নতা দেবীর বিশাল চক্ষু দুটির

ঘন নীল তারকায়। হেসে বল্লেন—আমি তোমাদের দেখে এক জায়গা থেকে ফিরে এলাম—

পুষ্প লজ্জিত ও অপ্রতিভের সুরে বল্লে—আপনার কাজে বাধা দিলাম দেবী?

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—না। আমিও ইচ্ছে করেছিলাম তোমরা আজ এখানে আসবে—বসো, এসো এই গাছের তলায়।

যতীন ও পুষ্প গাছের তলায় ওঁর পাশে বসে পথিক দেবতার অদ্ভুত আবির্ভাবের ব্যাপার বল্লে। করুণাদেবী সব শুনে বল্লেন—ভগবান বা ব্রহ্মের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী কোনো নাস্তিক দেবতা, তবে মহাশক্তিধর বটে। আমার জানা নেই।

যতীন বল্লে—এত যিনি দেখে বেড়াচেচন তিনি নাস্তিক?

—ওঁরা অন্য বিবর্তনের প্রাণী।

—পৃথিবীর নয়?

—না, অন্য কল্পের। সে শুনবে এখন। চলো, যেখানকার কাজ ফেলে এখানে এসেচি, সেখানে তোমাদের নিয়ে যাই।

দুজনেই চোখ বোজে। যতীনের জ্ঞান যাতে থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে, নয়তো সে উচ্চস্তরে গিয়েও কিছু দেখতে পাবে না, বুঝতে পারবে না। এক মুহূর্তে ওরা অনুভব করলে খুব অদ্ভুত এক জায়গায় এসেচে। ওরা এক নিমিষে যেন বিরাট আত্মা হয়ে গিয়েচে, বাধাবন্ধনহীন সর্বসংস্কারমুক্ত দেবাত্মা। দেশ ও কাল উপন্যাসের কাহিনী যেন,—এই ছিল কোথায়, এই এল কোথায়। দেশ অতিক্রম করতে হোল না, কালের ব্যবধান অনুভূত হোল কই?

সেও এক বিচিত্র দেশ। বাতাসে যেন নব প্রস্ফুটিতা মৃণালিনীর সুগন্ধ। এক বিশাল সুনীল সমুদ্রের ঢেউ তটশিলায় এসে আছড়ে পড়চে; সমুদ্রের মাঝে মাঝে ম্যাজেন্টা রঙের, ধূসর কৃষ্ণ রঙের ছোট-বড় পাহাড় ইতস্তত ছড়িয়ে। সমুদ্রের তীরে একটি অরণ্য-বৃক্ষের তলে এক রূপবান জ্যোতির্ময় তরুণ দেবতা বসে একমনে চিন্তা করচেন।

যতীন এমন দৃশ্য কখনো দেখেনি, এমন অপূর্ব রূপবান মহাজ্যোতিষ্মান দেবমূর্তি। সে শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল।

পুষ্প তাঁকে দেখে কিন্তু অবাক হয়ে গেল অন্য কারণে। এঁকে সে অনেক বছর আগে দেখেছিল, যেদিন সে যতীনকে পঞ্চমস্তরে নিয়ে যেতে যেতে তার সংজ্ঞাহীন দেহ দ্বারা বিপদগ্রস্ত হয়েছিল। সেই তরুণ দেবতা, যিনি সেদিন শৈলশিখরে বসেছিলেন।

দেবতা করুণাদেবীর দিকে চেয়ে বল্লেন—এরা কে?

পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি আমাকে দেখেচেন এর আগে—সেই একদিন—

করুণাদেবী বল্লেন—এদের কথা তোমাকে বলেছিলাম। এর নাম পুষ্প, ওর নাম যতীন। তোমার পৃথিবীরই নাম বাপু—

দেবতা প্রসন্ন দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে বল্লেন—ও, বুঝেচি।

পরে যতীনের দিকে চেয়ে বল্লেন—কিন্ত একে নিয়ে এসে ভাল করলে না। এর এখনো অনেক দেরি। পার্থিব তৃষ্ণা এর এখনও যায়নি। এত উঁচু স্বর্গে একে আনলে এর ফল হবে এই, আগামী জন্মে এর স্মৃতি ওকে কষ্ট দেবে—কোন কিছুতে মন বসাতে পারবে না। তুমি তো জানো, তৃতীয় স্তরের কোনো লোককে এখান আনা সেই ব্যক্তির পক্ষেই ক্ষতিকর।

করুণাদেবী ঝগড়া করার সুরে বল্লেন—বেশ করেচি, যাও। তুমি ওর সব স্মৃতি মুছে নিও, নয়তো আমি দেবো। দেখাতে নিয়ে আসিনি শুধু, ওর অনেক প্রশ্ন আছে, জানতে ইচ্ছে হয়েচে।

যতীন ভাবছিল তার কি মহাপুণ্য ছিল, আজই এমন দুটি জ্যোতির্ময় দেবতার দর্শন-

লাভের সৌভাগ্য তার ঘটলো! কি অদ্ভুত রূপ!

সে বিনীত সুরে বল্লে—যদি দেখার সৌভাগ্যই ঘটলো, তবে দেবতা, আমায় এমন করে দিন, যাতে এখানে বার বার আসতে পারি বা আপনার দেখা পেতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিন।

তরুণ দেবতা করুণাদেবীর দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন—ওই দেখলে তো কি বলচে? এদের অজ্ঞানতা ঘুচতে অনেক বিলম্ব।

পুষ্প হাত জোড় করে বল্লে—আপনি ওঁকে দয়া করে ক্ষমা করুন। উনি নতুন এ স্তরে এসেচেন, এখানকার কিছুই জানেন না।

যতীন অপ্রতিভ না হয়ে বল্লে—আপনি দয়া করলেই সব হবে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের ওদিকে একজন কে এসেছিলেন, তাঁর কথা যা শুনলাম তাতে আমি অবাক্ হয়ে গিয়েচি। আমার সব জানবার ইচ্ছে হয়েচে, তিনি কত গ্রহনক্ষত্র বেড়িয়ে এসেচেন—আমায় এর আগে বলেছিলেন সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন—

দেবতা বল্লেন—কে?

করুণাদেবী বল্লেন—পথিক কেউ হবে। দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়ানোই তাঁর কাজ বলে মনে হোল। নাস্তিক দেবতা।

তরুণ দেবতা একটুখানি চুপ করে থেকে বল্লেন—নাস্তিক কি? মনে হয় না। ওদের উপাসনাই ওই। বিশ্বে-ব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক আবিষ্কারক আছে, এদের শক্তি যথেষ্ট, তেজ অসীম। তাদের মধ্যে কেউ হবে। আচ্ছা, তোমরা আমার সঙ্গে চলো আর একটা জায়গা দেখিয়ে আনি—

যতীন বল্লে—দেবতা, আপনার কথা আমি ওই মেয়েটির মুখে আগে শুনেচি। তবে আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য হয়নি আমার।

—না, কি করে দেখবে। পুষ্প আর তুমি এক স্তরের লোক নও—

পুষ্প বল্লে—উনি এক বিপদে পড়েছিলেন—চুম্বকের ঢেউএ পড়ে পৃথিবীতে গিয়ে জন্ম নিয়েছিলেন—সবে এসেচেন সেখান থেকে।

দেবতা ধীরভাবে বল্লেন—তা সম্পূর্ণ সম্ভব। খুব সাবধানে চলাফেরা কোরো। ওই যে পথিক দেবতার কথা বলছিলে, ওঁরা এ কল্পের জীব নন। পূর্ব কল্পে ওঁদের দেবত্ব-প্রাপ্তি হয়েচে—মুক্ত আত্মা হয়ে বহু ঊর্ধ্বে উঠে বহু তেজ সঞ্চয় করেচেন, কিন্তু ওঁরাও পুনর্জন্মের আকর্ষণকে ভয় করে চলেন। তবে এই লোকটির এখনও অনেক জন্ম বাকি—একে পৃথিবীতে জন্মাতে হবে অনেকবার।

যতীন বার বার ওই কথা শুনে একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছিল। সে বিরক্তি না চাপতে পেরে বলে উঠলো—দেব, তার জন্যে আমি দুঃখিত নই। পৃথিবীতে জন্ম নিলে কষ্টটা কি?

—আমি জানি। যে জানে সে ও বিশ্বের সব কিছু এবং বিশ্বদেব একবস্তু এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই—তার পক্ষে পৃথিবী বা স্বর্গ সমান হয়ে গিয়েচে। যে জানে পৃথিবীর সব কিছুই তিনি, তার কাছে পৃথিবী ও স্বর্গ একই সুরে বাঁধা মোহন সঙ্গীতে। তোমাদের জ্ঞানী লোকেরা তাই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণকে বংশীধারী কল্পনা করেচেন। কিন্তু এ চোখে পৃথিবীর সবাই দেখে কি? সাধারণ মানুষ কর্ম অনুসারে প্রথম তিন স্তরে গতাগতি করে, ম'রে ভূলোক থেকে ভূবর্লোকে আসে, সেখানে থেকে উন্নতি করে স্বর্গলোকে আসে—আবার সেখান থেকে জন্মায় পৃথিবীতে, আবার মরে, আবার জন্মায়, আবার মরে। এ'কে বলে মানব-আবর্ত। চাকার মত ঘুরচে এই আবর্ত—চলো, একটা ব্যাপার তোমায় দেখাই, পৃথিবীতেই চলো, সেখানে তোমরা সহজ ও স্বচ্ছন্দ অবস্থায়

থাকবে। চলো তোমাদের দেশেই নিয়ে যাই—

মহাশূন্যের পথহীন পথে করুণাদেবী ওদের নিয়ে আগে আগে চল্লেন। দূরে একটা কি বিশাল গ্রহ নিরন্ধ্র অন্ধকার সমুদ্রে পাক খেয়ে ঘুরচে। হু-হু করে নেমে এল—একটু পরে পৃথিবীর এক তুষারাবৃত পর্বতশিখর ডিঙিয়ে ওরা এক নদীর ওপরকার শূন্যে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

দেবতা পিছনে পিছনেই আসছিলেন। বল্লেন—এটা চিনতে পারচো কী নদী?

যতীন বল্লে—না দেব, ঘোর অন্ধকার পৃথিবীতে—কিছু দেখতে পাচ্চিনে—এখন বোধ হয় রাতদুপুর।

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—এত বড় নদী বাংলাদেশে ক'টা আছে। আন্দাজ করে বলো।

—আজ্ঞে, হয় গঙ্গা, নয় পদ্মা।

—ওই রকমই, এটা গঙ্গা।

দেবতা হেসে বল্লেন—তুমিও ঠিক ভাল বলতে পারলে না, গঙ্গা তো বটে। মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গা—

যতীন বিস্ময়ের সুরে বল্লে—আপনি বাংলাদেশের খবর সব জানেন দেখচি।

করুণাদেবী মৃদু সস্নেহ হাস্যে ওকে নেপথ্যে বল্লেন—ও রকম বোলো না। উনি কে তা তোমরা জানো না। পরে বলবো।

একটা ছোট্ট খাল। একটা আমবাগান। মুর্শিদাবাদ জেলা, সুতরাং বনবাগান বেশি নেই. মস্ত বড় মাঠ একদিকে, একদিকে ছোট্ট একটি গ্রাম। যতীন বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলো সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যেই গ্রামের ঘরের আনাচে-কানাচে অনেকগুলি নিম্ন-স্তরের ধূসর ও মেটে সিঁদুরের রঙের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্চে—কেউ এ-বাড়ী, কেউ ও-বাড়ী। তারা যদি মানুষ হোত তবে আনাচে-কানাচে এদের এমনতর গতিবিধি দেখে সন্দেহ হোত এরা নিশ্চয়ই চোর বা ডাকাত।

যতীন অবাক হয়ে বল্লে—তাই তো. এরা কি করচে এখানে?

পুষ্প হাসিমুখে বল্লে—আমি বুঝতে পেরেচি অনেকটা. যদি তাই হয়. যা ভেবেচি—

যতীন বল্লে—কি পুষ্প?

তরুণ দেবতা বল্লেন—পুষ্প বুঝেচে। ওরা পৃথিবীতে জন্ম নেবার জন্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। প্রতি রাত্রেই এমনি লোকের বাড়ীর আশে-পাশে ঘোরে। কিন্তু ভিড় বেশি—সবাই সুবিধে পায় না। তৃষ্ণাই পুনর্জন্ম গ্রহণ করায়। ভুবর্লোকে ওদের ভাল লাগচে না, সেখানে পৃথিবীর স্থূল বাসনা কামনার পরিতৃপ্তি হয় না—সুতরাং ওরা চাইচে আবার দেহ ধরতে। কিন্তু তার প্রার্থী অনেক। ওদেরই মত। সুতরাং জন্ম নিতে চাইলেও জন্ম নেওয়া হয় না। উচ্চতর আত্মারা বংশ দেখে, পিতামাতা দেখে জন্ম নেওয়ার সময়ে। এদের সে সব নেই, যে কোন বংশ. জাত, কুল হোলেই হোল। দেহ ধারণ নিয়ে কথা।

যতীন বল্লে—দেব. এরা কতদিন ধরে এমন ঘোরে?

—পৃথিবীর হিসেবে কেউ কেউ দশ বছর পর্যন্ত ঘোরে। এই এক যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা—এই অবস্থাকে প্রেতত্ব বলো তোমরা। কারো স্বাধীন কাজে আমরা কোনো বাধা দিই না—জীব যখন নিজের ভ্রম বুঝবে তখন সে নিবৃত্ত হবে। যতদিন তৃষ্ণা. ততদিন তাকে বাধা দিয়ে ফল হবে না। সে ভুবর্লোকে ঘোর অসুখী অবস্থায় থাকবে—তার চেয়ে, যাও বাপু, পৃথিবীতেই গিয়ে সুখী হও। চলো. এখানে কষ্ট হচ্চে—আর নয়—

ওরা যেখানে এসে বসলো. সেটা একটা পর্বতশিখর. বড় চমৎকার পাইন এবং দেওদার গাছের নির্জন অরণ্যানী। গাছের ডালে ডালে অগণিত পরগাছায় রঙ-বেরঙের ফুল। পায়ের নীচে পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে আছে, গভীর রাত্রি। আকাশের মাঝখানে চওড়া

জ্বলজ্বলে ছায়াপথ, অসংখ্য ঝক্‌ঝকে তারকারাজি। ব্রহ্মাণ্ডের বিরাটত্বের সংকেত।

তরুণ দেবতা বল্লেন—এই হোল হিমালয়। বাংলাদেশের ওপরেই—ওই দ্যাখো দূরে একটা নদী নেমেচে পাহাড় থেকে—

যতীন বল্লে—তা হলে বোধ হয় তিস্তা—

—তুমি দেখলে তো মানুষের অবস্থা?

—আশ্চর্য লাগলো, এমন হয় তা জানতাম না, দেব। আপনি যাকে মানব-আবর্ত বল্লেন, ওর উচ্চতর অবস্থা কি?

—উচ্চতর সাধনা মানুষকে দেবযান-পথে উচ্চতর লোকে নিয়ে যায়। স্বঃ জনঃ, মহঃ, তপঃ ও সত্যলোক বলেচেন ভারতবর্ষের জ্ঞানী-লোকেরা। এত কল্পকাল সেখানে থাকে উচ্চতর জীবাত্মা।

—কল্প কি?

—প্রত্যেকবার সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি। এই কালব্যাপ্তির নাম কল্প। কল্পান্তে উচ্চতর জীবাত্মারও পতন হয়। তবে সত্যলোকেরও দূরপারে ব্রহ্মাণ্ডের বহিঃস্থিত যে ব্রহ্মলোক, সেখানে যাঁরা যান ভগবানের সঙ্গে তাঁরা এক হয়ে যান। মানব-আবর্তে তাঁরা আর ফিরে আসেন না।

—এরই নাম মুক্তি?

—একেই ভারতবর্ষের ঋষিরা মুক্তি বলেচেন। চলো তোমাকে একটি ভারতবর্ষের প্রাচীন কবির কাছে নিয়ে যাবো। উপনিষদ বলে দার্শনিক কবিতা ভারতবর্ষের, তিনিও তার একজন রচয়িতা। ভ্রাম্যমান কবি, সব সময় পাহাড়ে সমুদ্রতীরে বনানীর নির্জনতায় কাল কাটান। পৃথিবীর মধ্যে এই হিমালয় এবং আরও অনেক উচ্চতর পর্বতের বনে বৃক্ষ-লতার প্রায়ই মাঝে মাঝে রূপের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। আর মিশর দেশের এক উচ্চ আত্মার সঙ্গে পরিচয় করাবো।

—তা হোলে তো, দেব, পৃথিবীর আসক্তি তাঁর এখনও যায়নি? অর্থাৎ আমি উপ-নিষদের সেই কবির কথা বলচি—

—তাঁর আসক্তি বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের ধ্যান। কোনো পার্থিব তৃষ্ণা নয়। তাই জনলোকের অধিবাসী, নিজের আনন্দের জন্যে নেমে আসেন পৃথিবীতে। তাঁর আগমনে পৃথিবীর অনেক উপকার। বহু লেখক ও কবিকে অদৃশ্যভাবে প্রেরণা দান করেন, সেই জন্যেই তিনি পৃথিবীতে আসতে ভালবাসেন। পৃথিবীর হিসেবে বলতে গেলে বহু শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে এ কাজ তিনি করেচেন—তাঁর কাজই ওই। আমার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট বন্ধুত্ব। আমার নিজের কাজে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন আমায়।

এবার পুষ্প বিনীতভাবে বল্লে—দেব, একদিন আমাদের কুটিরে পদার্পণ করবেন দয়া করে? আপনার বন্ধু সেই তাঁকেও নিয়ে? পরে দেবীকে দেখিয়ে বল্লে—ইনিও যাবেন আমায় বলেচেন দয়া করে।

তরুণ দেবতা বল্লেন—যাবো।

পুষ্প তাঁর পাদস্পর্শ করে প্রণাম করে বল্লে—আমাদের ওপর আপনার এ করুণার জন্য ধন্যবাদ।

যতীন বল্লে—প্রভু, আমার সঙ্গে এক মায়াবাদী সন্ন্যাসীর দেখা হয়েছিল, তিনি তাঁর নিজের শক্তি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করে আমায় নির্বিকল্প সমাধিলাভ করিয়েছিলেন, সে এক অপূর্ব অনুভূতি। সে কথা আমি এখনও ভুলিনি—

—তিনি কোন যোগী সাধক হবেন। ব্রহ্মে লীন হওয়ার আস্বাদ ইচ্ছামত ভোগ করেন—মুক্ত পুরুষ। তাঁর ইচ্ছামত কায়াব্যূহ রচনা করে যে কোনো দেহে অনুপ্রবেশ করতে

পারেন। সমস্ত ঐশ্বর্য ওঁদের সংকল্প মাত্রেই উপস্থিত হয়—

—প্রভু, ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনো দেশে এই ব্যাপারের চর্চা ছিল?

—নিশ্চয়ই। যে কোনো দেশে যে কোনো সৎ, ঈশ্বরে ভক্তিমান লোক মানব-আবর্তকে জয় করতে পারেন। বিশ্বের যিনি কর্তা, তিনি কোনো বিশেষ দেশ বা বিশেষ জাতিকে কৃপা করেন না।

—আচ্ছা আমাদের দেশে যাঁরা বলেন, ভগবানের নাম জপ করলে মুক্তি, যেমন ধরুন বৈষ্ণব সম্প্রদায়, তাঁদের মত কি সত্য?

—ভক্তি দ্বারা তাঁরা ভগবানে আত্মস্থ হয়ে দেবযান প্রাপ্ত হন। জীব মাত্রেই ব্রহ্মের অংশ জানবে। উপাধি ও নামরূপ ত্যাগ করে পরব্রহ্মে লীন হওয়ার নামই মুক্তি। বিভিন্ন পথ, বিভিন্ন মত। কিন্তু জ্ঞানী লোক ধ্যানদৃষ্টি দ্বারা সেই একই সত্যকে উপলব্ধি করচেন বহু প্রাচীন যুগ থেকে। শুধু এ কল্প নয়, পূর্ব পূর্ব কল্পেও তাই হয়েছিল। পূর্ব পূর্ব কল্পের মুক্ত পুরুষেরা এ কল্পে পৃথিবীতে দেহ ধরে তাঁদের পূর্ব জীবনের সাধনলব্ধ জ্ঞান প্রচার করতে নামেন। তাঁরাই তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শংকর, চৈতন্য, বাল্মীকি, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ইত্যাদি—

এই পর্যন্ত বলেই তিনি চুপ করে গেলেন। হঠাৎ পূর্বদিগন্তে অরুণ সূর্যোদয় দূরদূরান্তরের তুষারাবৃত শৈলশিখর অনুরঞ্জিত করে অপূর্ব মহিমায় স্বপ্রকাশিত হোল এক মুহূর্তে। পলকে পলকে শিখর থেকে শিখরান্তরে বর্ণসমুদ্রের বিভিন্ন রঙের ঢেউ গেল ছড়িয়ে। সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল সে মহিমময় সৌন্দর্যের দিকে।

করুণাদেবী বলে উঠলেন সাগ্রহে—চলো মানস-সরোবরে—চলো, চলো—

তখনি ঠিক পটপরিবর্তনের মত একটা ব্যাপার ঘটে গেল। এই ছিল অরুণরাগে রঞ্জিত শৈলশিখর ও অরণ্যানী, তখনি যতীন ও পুষ্প বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলে তাদের সামনে কোনো বিশাল জলাশয়ের নীল জলরাশি বিস্তৃত।

অপরকূলে তুষারাবৃত শৈলচূড়া, সবে প্রভাত হয়েচে কিন্তু সেই তুষারময় মেরুবৎ প্রদেশে কোনো বিহংগকাকলী নেই কোনোদিকে। সমগ্র পার্বত্যহ্রদের গম্ভীর সৌন্দর্য যতীন ও পুষ্পকে মুগ্ধ করলে।

করুণাদেবী বল্লেন—ওই দূরে রাবণহ্রদ, সামনে এটা মানস-সরোবর।

তরুণদেবতা বল্লেন—সামনের ওই পাহাড়ের চূড়া গুরলা মান্ধাতা আর ওই দূরে কৈলাস—

পুষ্পের মনে পড়ে গেল কৈলাস পর্বতে অনেক সিদ্ধ মহাপুরুষ লোকচক্ষুর অগোচরে বাস করেন—ওঁদের কাউকে দেখবার ইচ্ছা অনেকদিন থেকেই আছে তার। করুণাদেবীর কাছে সেকথা তুলতেই তিনি তরুণদেবতাকে পুষ্পের বাসনা জানালেন।

তিনি বল্লেন—একজন জীবন্মুক্ত সাধু ওখানে আছেন, আমি দু-একবার তাঁকে সাহায্য করেছিলাম কোনো কাজে। তবে তিনি আমাকে দেখেননি—চলো নিয়ে যাই।

কৈলাসপর্বত ও সম্মুখবর্তী গুরলা মান্ধাতা চূড়ার মধ্যে বরফের বিশাল ক্ষেত্র—যতীন কখনো গ্লেসিয়ার বা তুষারপ্রবাহ দেখেনি, ওর মনে কথাটা উঠলো, যা সামনে দেখচে, সেটাই বোধ হয় গ্লেসিয়ার। তরুণদেবতা ওর মনের ভাব বুঝে বল্লেন—তুমি যা ভাবচো তা এ নয়। চলো এখান থেকে তোমায় শতপন্থ বরফস্রোত দেখিয়ে আনবো—

ওরা কৈলাস পর্বতে গিয়ে দেখলে কৈলাস একটি সম্পূর্ণ আলাদা পর্বত, তার তুষার-মণ্ডিত পিনাকসদৃশ শিখরের নিম্নভাগে অনেকগুলি গুহা সাধু যোগীদের আবাস। একটি গুহায় একজন শীর্ণকায় সাধুকে দেখিয়ে দেবতা বল্লেন—এঁর কথা বলছিলাম। উনি এখন স্থূলদেহের স্থূলচক্ষে আমাদের দেখতে পাবেন না—নির্বিকল্প সমাধিস্থ

অবস্থায় ইনি ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যান, তখন আমাদেরও অনেক ওপরে চলে যান উনি। তবে স্থূল দেহে ওঁরা সাধারণ মানুষের সমান।

যতীন বল্লে—আচ্ছা, এঁরা একা আছেন কেন?

—নির্জনতা আত্মার উন্নতির একটি প্রধান উপায়। নিম্নজগতের কোনো প্রভাব এই উত্তুঙ্গ জনহীন পর্বতচূড়ায় এঁদের দেহমন স্পর্শ করে না। নির্জনতায় এঁরা শক্তি অর্জন করেন—ব্রহ্মজ্যোতিঃ এঁদের মনে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে এ অবস্থায়।

—আমি এঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পারি?

—কি করে? তুমি স্থূল দেহ ত্যাগ করেচ, উনি এখন দেহে অবস্থান করচেন। তা সম্ভব নয়।

—আচ্ছা, ওই যে একজন তিব্বতী লোক মানস-সরোবরের ধারে বেড়াচ্ছিল তখন, ওরা কি অবস্থায় আছে? ওদের মুক্তি বা উন্নতি—

দেবতা হেসে বল্লেন—ওদের থাক্ আলাদা। নিম্নস্তরের চৈতন্য নিয়ে জন্মেচে—সংকুচিত চেতন। ওরা মরবে, অমনি অল্পদিন পরেই আবার দেহ নিয়ে পৃথিবীতে জন্মাবে, কারণ ভূবর্লোকে ওদের চৈতন্য মোটেই থাকে না। যদিও থাকে, খুব কম। দেহ না নিলে উপায় হয় না—সুতরাং দীর্ঘ সময় ধরে ওদের প্রায় স্থূলদেহেই বর্তমান থাকতে হয়—পৃথিবীর কামনা বাসনার ঊর্ধ্বে ওদের উঠতে অনেক দেরি। সভ্য সমাজের এমন অনেক আছে—খুনী, দস্যু, অলস, চোর, পরপীড়ক ইত্যাদি।

করুণাদেবী হেসে দেবতার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—এ তুমি খুব ভালোই জানো কারণ তোমার হাতের কাজ এটা, কে কতদিন ভূবর্লোকে বাস করবে কি নতুন জন্ম নেবে। উঃ, দু-একটা ব্যাপার এমন নিষ্ঠুর আর করুণ হয়ে ওঠে তখন আমি অনুরোধ করতে বাধ্য হই—

তরুণদেবতা হাসলেন মাত্র—সে হাসির মধ্যে অসীম দয়া, অনন্ত জ্ঞান ও গভীর শক্তির আভাস।

পুষ্প চুপি চুপি দেবীকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, উনি কে? এই অদ্ভুত দেবতা?

—উনি?

পরে হেসে দেবতার দিকে চেয়ে বল্লেন—এইবার ওদের বলি?

বলেই চুপ করে গেলেন।

পুষ্প বিস্ময়ের সঙ্গে বল্লে—আমাদের সঙ্গে এমন ভাবে মিশচেন! এত বড় উনি! অথচ—

দেবতা এবার হেসে এগিয়ে এসে বল্লেন—মানুষ কি কীট? তোমরাও তিনি। তোমাদের ঋষিরাই বলেচেন—কিঞ্চাইং ন তু ত্বাং ভৃত্যবৎ যাচে, যোঽসৌ আদিত্য-মণ্ডলস্থো ব্যাহৃতাবয়বঃ পুরুষঃ সোঽহং ভবামি—আমি ভৃত্যভাবে তোমার সাক্ষাৎকার যাচ্ঞা করচিনে—সবিতৃমণ্ডলে যে ওঙ্কারময় পুরুষ, আমিই সেই। তুমি আমি ভিন্ন কোথায়? ছোট ভাবো কেন, তাই তো ছোট হয়ে থাকো। বড় হও, বীর্যবান হও। সচেতন হয়ে যদি তোমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও দাঁড়াও বিদ্রোহের পথে—সেও ভাল। তার দ্বারা শক্তি অর্জন করবে। যে দুর্বল, তার দ্বারা কি কাজ হবে? যে শক্তিমান, অথচ বিদ্রোহী—তাকে ঠিক পথে নিয়ে আসতে আমরা জানি।

যতীন কৌতূহলের সঙ্গে বল্লে—এই যে যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে রক্তারক্তি,...এও কি আপনার ইচ্ছার অনুযায়ী?

—তুমি বুঝতে পারলে না। প্রত্যেক ঘটনা মানুষকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। যুদ্ধ জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ—এর দ্বারা জাতি শক্তিমান হয়। কি হয় যুদ্ধে? মানুষ মারা

যায়। মানুষের আরামের ব্যাঘাত ঘটে। এই তো? কিন্তু মৃত্যুর অসত্যতা এতদিনে তুমি নিশ্চয় বুঝেছ। আরামের অত্যন্ত সুযোগ মানুষকে অলস, পশুবৎ করে তোলে। আমার পৃথিবী কতকগুলি আরামপ্রিয়, রোমন্থনকারী, নিজের অবস্থায় মহাপরিতৃপ্ত গোরুর দলে ভরে তুলতে আমি চাইনে। শক্তিমান হয়ে উঠুক সব। কে কা'কে মারচে? সব মিথ্যে। দুদিনের আরাম কিসের? অনন্ত বিশ্ব তোমাদের পায়ের তলায়। সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ, যা যখন ভাববে, মুক্ত পুরুষে তাই তখন পায়। পৃথিবীর স্থূল বাসনা কামনাকে জয় করো—আরামের ইচ্ছা মন থেকে তাড়াও। নয়তো ঘুমিয়ে পড়বে।

করুণাদেবী বল্লেন—এদের বৃহস্পতি গ্রহের দুই উপগ্রহে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দাও না?

—দেখাবো। সে দুটো ধীরগামী জগৎ, যারা পৃথিবীতে সুবিধেমত উন্নতি করতে পারচে না, আমরা তাদের ওই সব মন্থরগতি জগতে পাঠিয়ে দিই জন্ম নিতে। সেখানে গেলে আশ্চর্য ব্যাপার দেখবে।

করুণাদেবী বল্লেন—ওদের এখুনি নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিই—

আবার মানস-সরোবর ও হিমালয় ওদের পায়ের তলায় দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। আবার অসীম ব্যোম—অন্ধকারে ডুবে পৃথিবী দিগন্তহীন আকাশে অদৃশ্য হোল। আকাশের অদ্ভুত দৃশ্য, দিনমানে সব দিক নক্ষত্রযুক্ত।

তারপরে নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় প্লাবিত আকাশপথে এক বিশাল মহাগ্রহ ওদের দিকে যেন দ্রুত ছুটে আসচে। করুণাদেবী বল্লেন—বৃহস্পতি!

কিন্তু বৃহস্পতি খুব বড় মশালের আলোর মত ওদের দক্ষিণে দূরে পড়ে রইল। ওরা অন্য একটি ক্ষুদ্র পৃথিবীর খুব নিকটে এসে তার বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়লো।

যতীন বল্লে—কিসে যেন পড়েছিলুম, পৃথিবী ছাড়া সোলার সিস্টেমের অন্য কোনো কিছুতে মানুষ নেই!

গ্রহদেব বল্লে—সে সব কথা এখন থাক্। এই পৃথিবীটা দেখে নাও আগে—

পৃথিবীর মত অবিকল সে স্থান, খুব বেশি ফুল, ছোট বড় নদী। বসন্তের হাওয়া বইচে, বিহঙ্গের সুস্বর সর্বত্র, নির্মল জলাশয়। গ্রহটির একদিকে রাত্রির অন্ধকার, অন্য-দিকে দিবসের আলো। যে অংশে ওরা গেল সেখানে মানুষের কর্মব্যস্ততা নেই, নিশ্চিন্ত মনে সকলে নিজের নিজের বাড়ীতে বসে আছে। গৃহস্থাপত্য অতি সুন্দর, সব রকম শিল্পকলার অদ্ভুত উন্নতি হয়েচে সেখানে, দেখেই মনে হোল, সর্বত্র সংগীত, বাদ্য, নৃত্য। অত্যন্ত সুন্দরী মেয়েরা বনে উপবনে ভ্রমণ করে বেড়াচে পরম নিশ্চিন্ত মনে, যেন তাদের হাতে অতি সুদীর্ঘ অবকাশ, যেন সারা দিনমান শুধু কমলের বনে অলস পাদ-চারণ জীবনের সব মুহূর্তগুলি ভরে দেবে অমৃতে। শান্ত ও অপরূপ সৌন্দর্যের রূপায়তন সে পৃথিবীর সুশ্যামল প্রান্তরে, ফুলফোটা বনে ঝোপে গন্ধে ভরা কুঞ্জতলে। বৃহস্পতির আলো পড়ে যে অংশে রাত্রির অন্ধকার, সে অংশের শোভাও চমৎকার—তবে সমগ্র পৃথিবীটি একটি নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব শান্তির গভীরতায়, ব্যস্ততাহীন জীবন-মুহূর্তগুলির পুঞ্জীভূত ভারে যেন ঘুমিয়ে আছে, এলিয়ে আছে, কিসের অলীক স্বপ্নে দিনরাত্রি বিভোর।

করুণাদেবী বল্লেন—এই দেখ যে পৃথিবীর কথা তোমায় বলেছিলাম।

—স্লো—মানে ধীরগামী পৃথিবী?

করুণাদেবী হেসে ফেলতেই যতীন অপ্রতিভ হয়ে বল্লে—না, ইংরিজিটা আপনি হয় তো জানেন কি না—মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—ও ভাষা কি আপনারা—মানে ম্লেচ্ছ ভাষা—

গ্রহদেব বল্লেন—তুমি এখনও বুঝলে না। আমাদের কোনো ভাষা নেই, যখন যে

পৃথিবীতে, যে মানুষের সংগে কথা কই—তাদের ভাষাই আমাদের ভাষা। পৃথিবীতে প্রচলিত যে কোন ভাষাই হোক—তা আমাদের আপন। ইটালী দেশের কোনো লোকের সংগে কথা বলবার সময় তাদের ভাষাতেই বলবো—

—আপনাদের মধ্যে কথাবার্তা তাহোলে কি ভাষায়—কেন, বাংলাতেই তো আপনাদের মধ্যে বলছিলেন ?

করুণাদেবী বল্লেন—মুখ দিয়ে কথা বলার দরকার হয় না কোনো স্বর্গেই—চতুর্থ-স্তরের ওপরে কোথাও। মনের মধ্যে পরস্পরের কথা ফুটে ওঠে—আরও ওপরে স্বর্গে রঙীন্ আলোর বিদ্যুৎশিখার মত আলোর ভাষায় আদানপ্রদানে কথাবার্তা চলে। আমাদের ভাষা তোমাদের মত "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো" তা হয় না। মরমেই আগে পশে—কান শুনতেই পায় না—শোনবার দরকার হয় না। কিন্তু তোমাদের সংগে ব্যবহার করতে হচ্চে বলেই আমরা মুখের ভাষা ব্যবহার করি।

পুষ্প বল্লে—এই পৃথিবী কিন্তু আমার বেশ লাগচে। একটু বেড়ানো গেলে মন্দ কি ?

বৈশ্রবণ বল্লেন—বেশ তো, ভাল করেই দেখতে পারো।

এক হ্রদে কতগুলি সুসজ্জিত নরনারী নৌকাতে প্রমোদবিহার করছিল। দেবতা সেখানে গিয়ে বল্লেন—ক'বছর এরা এমনিধারা জল-বিহার করচে জানো ? তোমাদের পৃথিবীর মাপে তিনটি বছর। তাড়াতাড়ি নেই কিছু এদের।

যতীন সবিস্ময়ে বল্লে—তিনটি বছর !

—ঐ যে বল্লাম ধীরে সুস্থে এখানে সব হয়। নৌকাতে জলবিহার চলচে তো চলচেই। ওদের গিয়ে বল যদি, বিস্মিত হবে।

যতীনের মনে পড়ে গেল বাল্যে কলেজের ক্লাসে পড়া টেনিসনের কবিতার সেই মৃণাল-ভোজীর দেশ বা Land of Lotus-eaters!...সেখানেও সব লোক—

পরে কার সংগে কথা বলতে যাচ্চে ভেবে সে লজ্জায় চুপ করে গেল।

দেবতা বল্লেন—চলো আরও দেখবে।

এক পাহাড়ের শ্যাম সানুতে বনপুষ্পবিকশিত নির্জন অঞ্চলে সে দেশের কবিকুলের মজলিস বসেচে। সেখানে সুদীর্ঘসময়-ব্যাপী গোধূলিতে তারা আরামে কাব্য আলোচনা করচে, পরস্পর পরস্পরকে আবৃত্তি করে শোনাচে নৈসর্গিক শোভা, বনপুষ্পের লাবণ্য সম্বন্ধে নানা কবিতা। নারীপ্রেম নিয়ে কত সংগীত রচনা করে বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে অতি সুকুমার মাধুর্যের সংগে ললিত স্বরে গাইচে—যেন জীবন অনন্ত, সময় অনন্ত। সে সংগীতের ঘুমপাড়ানি মাধুর্য্য সত্যিই চোখে ঘুম নিয়ে আসে, শুনে যতীনের সত্যিই মনে হচ্ছিল দিগন্তের পান্ডুর শোভা শৈলসানুতটে যে শান্তি ও শ্রী বিস্তার করচে তাতে সব ভুলিয়ে দেয়, জীবনের যুদ্ধ অবাস্তব কাহিনী—জীবন শুধু এমনি নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব গোধূলি দিয়ে ভরা—আর কোথাও ছুটোছুটি করে কি হবে, এখানেই ঘুমিয়ে পড়া যাক্ দিব্যি।

যতীন বল্লে—আমাদের পৃথিবীতেও এরকম নেই কি দেব ?

—আছে, সে অন্য রকম। এরা এদেশের বসন্তকাল ব্যেপে এরকম উৎসব চালাচে এদের বসন্তের স্থায়িত্ব কত জানো? ন'বছর পৃথিবীর হিসেবে।

যতীন হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে রইল দেবতার মুখের দিকে।

করুণাদেবী ওর বিস্ময় দেখে কৌতুক অনুভব করলেন। বল্লেন—নইলে তোমার ভাষায় স্লো ওয়ার্ল্ড হবে কি করে ?

ও আরও অবাক হয়ে বল্লে—বা রে, আপনি যে ইংরিজি—

—সব ভাষাতেই কথা বলতে পারি আমরা, বল্লাম যে। ভাষা কিছুই নয় আমাদের কাছে। তারপর শোনো, এদের বছর কতদিনে জানো ? পৃথিবীর ষাট বছরে এদের দেশের

এক বছর। ঐ দেখ বৃহস্পতি গ্রহ ঘুরচে কত আস্তে আস্তে। সূর্য থেকে যে গ্রহ যত দূরে, তার আবর্তন তত স্লো। আবার এই উপগ্রহের একটা নিজস্ব আবর্তন আছে নিজের কক্ষে—সব মিলিয়ে দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ রাত্রি দীর্ঘ পথ, দীর্ঘ বছর এখানে। মানুষও ধীর গতিতে চলে, বহু সময় নিয়ে কাজ করে, বহু সময় নিয়ে আমোদ করে, বদলায় অনেক সময় নিয়ে। পৃথিবীর মত তাড়াহুড়ো নেই, ব্যস্ততা নেই।

—এদের আয়ু ?

—তিনশো বছর প্রায়, তোমার পৃথিবীর হিসেবে। ধীরগামী আত্মা, পৃথিবীর পঞ্চাশ-ষাট বছর বয়সে যারা উন্নতি করতে পারবে না, কিছু বুঝতে পারবে না—এখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়ে দেওয়া হয়। এখানে তারা যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে তার ব্যবস্থা আছে।

—কি রকম ব্যবস্থা বড় জানতে ইচ্ছে হচ্চে—

দেবতা হেসে বল্লেন—রুদ্র ব্যবস্থা কিছু নেই, পৃথিবীতে যেমন আছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যাধি, মহামারী, বিপ্লব, দুর্ভিক্ষ। এখানকার মানুষেরা একটু অলস, একটু ধীর-বুদ্ধি —এদের ওপর দয়া করতে হয় অনেকখানি। সবই তাঁর ব্যবস্থা (এখানে গ্রহদেবের মুখশ্রী শ্রদ্ধায়, সম্ভ্রমে, ভক্তিতে কোমল হয়ে এল), তিনি তাঁর অসীম করুণায় এ ব্যবস্থা করেচেন —আমরা তাঁর নিয়োজিত ভৃত্য মাত্র। এ কি দেখচো। এর চেয়েও ধীরগামী জগৎ আছে, তবে এ সৌরমণ্ডলে নয়। তিনিই এই সব অলস জড়বুদ্ধি জীবের জগতে উচ্চস্তরের দেবদূত পাঠিয়ে দেন, তাঁরা দেহধারণ করে আসেন এদের শিক্ষা দিতে। তাঁরাই এ সকল পৃথিবীর শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শ্রীচৈতন্য, শঙ্কর, ব্যাস, দ্বৈপায়ন—সবাইকে তাঁর লীলা-সহচর না করে নিলে তাঁর সুখ নেই। তাঁর অপার অনন্ত করুণার কথা তোমরা কি জানো ? কেবল দুঃখ হয় মানুষে তাঁকে আগাগোড়া ভুল বুঝছে। কে তাঁকে জানে বা জানবার চেষ্টা করে ? মানুষ যদি এক পা এগিয়ে যায়, তিনি তিন পা এগিয়ে আসেন মানুষের দিকে। অথচ সবাই নিজেকে নিয়ে উন্মত্ত পৃথিবীর সুখ নিয়ে দিশাহারা—তিনি উদাসীন, কেউ তাঁকে চায় না দেখে অপেক্ষা করে করে দোর থেকে চলে যান। কেউ গ্রাহ্যও করে না। জগৎজোড়া বনফুলের মালা তাঁর গলায়—অথচ—

পুষ্পের চোখে জল এসে গেল গ্রহদেবের অপূর্ব কণ্ঠস্বরে। সে হাত জোড় করে বল্লে—প্রভু, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো ?

গ্রহদেব তখনও আত্মস্থ বিভোর অবস্থায় বলেই চলেচেন আগের কথার জের টেনে—

—দেখ, তোমরা পৃথিবীর ছেলেমেয়ে। আমি তোমাদের ভালবাসি, কারণ তোমাদের জন্মজন্মান্তর নিজের হাতে গড়ে তুলেচি। তাঁর জ্যোতির্বাতায়ন অসীম শূন্যে খোলা রয়েচে, আশ্চর্যের বিষয় সেদিকে কেউ চায় না। সবাই অন্ধ। নরক থেকে বাঁচাতে চাই, কিন্তু পারিনে। অন্ধের মত ছুটে যায় সেদিকে। ওঁকে দেখ—উনি সত্যলোকেরও উর্দ্ধতন স্তরের দেবী কিন্তু নিজের সুখ চান না। পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের দুঃখে প্রাণ কাঁদে বলে কোনো ঊর্দ্ধ লোকেই থাকতে পারেন না। উনি সৌরমণ্ডলের সমস্ত জগতের মা। তোমরা কি আমাদের দেখা পেতে ? আমাদের দেখার মত চোখ পেয়েচ শুধু ওঁর কৃপায়। নইলে ওঁর নিজের স্তরে উনি জনঃ মহঃ, তপঃ লোকের জীবের অদৃশ্য। এখানে কোনো লোকের অধিবাসী তাদের উর্দ্ধ লোকের অধিবাসীকে দেখতে পায় না—দেখা সম্ভব নয়। ওই মেয়েটিকে ভালবাসেন বলে আজ তোমাদের এই সব সৌভাগ্য। উনি আমারও উর্দ্ধ লোকের দেবী, দয়া করে আমায়—

করুণাদেবী সলজ্জ সুরে বল্লেন—পুষ্প, শোনো তবে—উনি কে জানো ? উনি গ্রহদেব বৈশ্রবণ। তোমাদের পৃথিবীর সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্তা। যুগযুগান্তর থেকে তাঁর নির্দেশমত উনি তোমাদের পৃথিবী পরিচালনা করচেন। পূর্ব কল্পের দেবতা উনি। তার

পূর্ব কল্পে উনি দেবযান-পথে জন্মমৃত্যুর আবর্ত অতিক্রম করেন—বহুদূর পথের যাত্রী উনি। ওঁর স্বরূপ ওঁকে সত্যলোকের জীবেরাও দেখতে পায় না—চোখ ঝল্‌সে যায় ওঁ'র তেজে। দয়া করে তোমাদের দৃষ্টির উপযুক্ত কায়া ধারণ করে দেখা দিলেন তাই দেখতে পাচ্চ।

সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে, ভয়ে ও ভক্তিতে ক্ষুদ্র পৃথিবীর ছেলে-মেয়ে পুষ্প ও যতীন একেবারে নির্বাক্ হয়ে রইল। পুষ্প কি প্রশ্ন করতে চেয়েছিল তা ভুলেই গিয়েছিল, এই সময় মনে আসতে সে আবার হাতজোড় করে বল্লে—প্রভু, আমাদের জন্মান্তরে কত সৌভাগ্য ছিল যে আপনাদের সাক্ষাৎ...একটা প্রশ্ন আমার আছে—

বৈশ্রবণ বল্লেন—আমাকে ধন্যবাদ দিও না পুষ্প। কৃতজ্ঞতা জানাও সেই মহামহেশ্বর, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিদেবতা যিনি, তাঁকে। আমরা তাঁর ভৃত্যদের নির্দেশে চলি—তাঁর দাসানুদাস। এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁর ইঙ্গিতে চলে—অথচ কে জানে তাঁকে? তোমাদের পৃথিবীর জ্ঞানী লোকেরা জানতেন—তাই বলে গিয়েচেন—অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি—এই ব্রহ্মাণ্ডের আশেপাশে এই রকম অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড আবরণের সহিত প্রজ্বলন্ত অবস্থায় অবস্থিত। সে সব ব্রহ্মাণ্ড আমিও দেখিনি। তুমি যে পথিকদেবতার সাক্ষাৎ পেয়েছিলে, তাঁর মত বিরাট দুর্দ্ধর্ষ আত্মারা তাঁর কৃপায় বহু সৌরমণ্ডল, বহু নীহারিকা, নক্ষত্রজগৎ অতিক্রম করে এই অনন্ত বিশ্বে ঘুরে বেড়াবার অধিকার ও শক্তি পেয়েচেন। বিগত কল্পে আর একজন এমন দেবদূতকে আমি জানতাম—তিনি পৃথিবীর এক আবর্তকাল অর্থাৎ প্রায় বাইশ হাজার বছর ধরে বিদ্যুতের অপেক্ষাও দ্রুতগতিতে পরিভ্রমণ করেও শুধু আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডটার কূলকিনারা পান নি। তা ছাড়াও তো অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি—কোথায় তার ঠিকানা, কোথায় তার কূলকিনারা, কোথায় তাদের সীমা! এখন ভাবো, এই সমুদয় বিশ্ব যাঁর ইঙ্গিতে চলেচে—পৃথিবীর ছেলেদের খেলবার ক্রীড়নকের মত বন্ বন্ করে ঘুরচে—তাঁকে কে জানতো যদি তিনি নিজের দয়ায় কৃপা করে—

পুষ্প অনেকক্ষণ থেকে যে প্রশ্ন করতে চাইছিল, এবার তার সুযোগ পেয়ে মরীয়ার সুরে বল্লে—প্রভু, আমিও ঐ প্রশ্ন করতে চেয়েছিলুম—আপনি অন্তর্যামী, বুঝতে পেরেই তার উত্তর দিলেন। আমিও জানতে চাইছিলুম ভগবানকে আপনি কি দেখেচেন? দয়া করে আমার এই কৌতূহল—

করুণাদেবী এবার উত্তর দিলেন, কারণ গ্রহদেব তখন আপন ভাবে বিভোর। বিশ্বের ভগবানের কথা মনে ওঠাতে অন্য প্রশ্নের দিকে তাঁর মন ছিল না, যদি মন নামক অতি ক্ষুদ্র মানুষী ইন্দ্রিয় তাঁর মত বিরাট দেবতাতে আরোপ করা চলে। বল্লেন—না পুষ্প, উনি দেখেন নি। আমিও দেখি নি। অথচ তাঁকে অনুভব করেচি। তিনি কোথায় নেই? বিশ্বের প্রতি বাষ্পকণায়, জ্যোতিঃকণায়, পৃথিবীসমূহের প্রতি তৃণে প্রতি ধূলিকণায় তিনি। তিনি আছেন তাই আমরা আছি, তোমরা আছ, বিশ্ব আছে। তিনি সকলেরই। তুমি চাও, তোমার—আমি চাই, আমার।

গ্রহদেব বল্লেন—পুষ্প, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে বুঝতে যেও না। পারা যায় না। সে ইন্দ্রিয় তোমাদের নেই—তবে শুধু তাঁকে ভালবাসা দ্বারা মন ও বুদ্ধিকে অতিক্রম করে এমন ভূমি লাভ করা যায় যে-ভূমি থেকে তাঁকে অনুভব করা যায়। নয়তো যার সে ক্ষমতা নেই—সেও যদি আকুল হয়ে ডাকে—তার মন ও বুদ্ধির গম্য হয়ে নিজেকে খুব ছোট করে সে ভক্তকে তিনি দেখা দেন। পৃথিবীতে কত লোক ইষ্টরূপে তাঁকে ভজনা করে। ছোটর কাছে ছোট হয়ে দেখা দেন তিনি—কত কৃপা তাঁর। কিন্তু যে রূপ তাঁর নিজের—সে রূপে তাঁকে কে দেখতে পায়—

—প্রভু, কেউ কি পায় না?

—ব্রহ্মলোকের বহু ঊর্ধ্বে তাঁর নিজের লোক। দেখি নি, তবে জ্ঞান দ্বারা অনুভব করতে পারি। সেখানে হাজার হাজার কল্পের পূর্বেকার মুক্ত আত্মারা আছেন—কখনও দেখিনি তাঁদের। তাঁরা মহাশক্তিধর, বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি লয় করবার ক্ষমতা রাখেন। তাঁরাই তাঁকে স্বরূপে হয়তো দেখেন। কিন্তু মানুষের রূপে দেখতে চাও, তুমিও পাবে। ভক্তি ভরে চাও। অত বড়ও কেউ নেই, আবার অত ছোটও কেউ নেই।

যতীন বল্লে—প্রভু, এই পৃথিবীর মানুষে ভগবানকে জানে?

সব পৃথিবীর অবস্থাই সমান। সত্য জানতে চায় ক'জন? এখানে তো দেখচো, ইন্দ্রিয়জ সুখ নিয়ে সবাই মত্ত। সেই বিরাট মহাশক্তির ধারণা করা এদের পক্ষে সহজ নয়। অবশ্য এরা পৃথিবীর জীবের চেয়ে অধিকতর জড়বুদ্ধিসম্পন্ন। বহুকাল যুগ-যুগান্ত কেটে যাবে এদের সমস্ত জড়তা, মনের মালিন্য দূর করে সে ধারণা উদ্বুদ্ধ করতে। কিন্তু বিশ্বের ভগবানের অসীম ধৈর্য। কাউকে তিনি অবহেলা করেন না। তবে অনেক দেরি হয়ে যাবে। যারা নিরলস আত্মা, আধ্যাত্মিক জ্যোতি যাদের মধ্যে জ্বলচে স্বয়ম্প্রভ মহিমায়, তারা এক জন্মেই ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখে। যেমন বলেছিলেন তোমাদের গ্রহের এক প্রাচীন কবি—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—আমি অন্ধকারের ওপারের সেই আদিত্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে জেনেচি—ওগো শোনো সবাই শোনো শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। কত আনন্দ! আনন্দের ভাগ সবাইকে না দিলে যেন চলচে না। কিন্তু ভাবো, ক'জন সেজন্যে ব্যগ্র? আদিত্যবর্ণ পুরুষকে না জানলেও তাদের জন্মের পর জন্ম, যুগের পর যুগ, এমন কি কল্পের পর কল্প পরম আরামে অন্ধের মত কেটে যাচ্চে চির অন্ধকারে। তার ওপারে কি আছে কে সন্ধান রাখে?

যতীনের মনে একটা প্রশ্ন জাগলো। প্রশ্নটা সে করলে—তাঁদের মত অসীম শক্তিধর দেবতা কৃপা করলে তো একদিনে সব উদ্ধার হয়! সত্যের প্রচার করে দিলেই তো হয়।

দেবতার মুখে অনুকম্পার হাসি ফুটে উঠলো। বল্লেন—তা কি হয়? যে পৃথিবী যে সত্যের জন্যে প্রস্তুত নয়, যে মানুষকে যে কথা বল্লে সে বুঝবে না—সেখানে সে সত্য প্রচার করা হয় না—সে মানুষকে সে কথা জোর করে শোনানো হয় না। স্বাতী-নক্ষত্রের জল ঝিনুকে পড়লে মুক্তা হয়—কিন্তু ধুলোয় পড়লে?...ভগবান মহাজ্ঞানী। যা হয় না, তা তিনি করেন না।

পুষ্প বল্লে—তবে মানুষের মুক্তি কেমন করে হবে?

—মানুষ যখন স্বেচ্ছায় এগিয়ে যাবে। তাঁর প্রতি উন্মুখ যে মন, সে মনের সকল ভ্রান্তি তিনি ঘুচিয়ে দিয়ে সত্যের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন।

—দেব, সহজ কথায় বলুন আমরা কি করবো? আমাদের কি কর্তব্য?

—ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি—তাঁকে জেনেই মৃত্যুকে অতিক্রম করতে হবে।

—কি ভাবে প্রভু? মৃত্যুকে অতিক্রম করা মানে কি?

—সাধারণ মানুষ মরচে, আবার জন্মাচে, আবার মরচে। এ'কে বলে মানব-আবর্ত। এ'কে জয় করাই মৃত্যুকে অতিক্রম করা। তাঁকে না জানলে কিছুতেই এ আবর্ত এড়ানো যায় না। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই।

—পথ বলে দিন দেবতা—আমরা শরণাগত।

গ্রহদেব গম্ভীর মুখে বল্লেন—তাঁকে ডাকো, তাঁর কাছে আলো ভিক্ষা চাও। তাঁর কাছে প্রার্থনা কর সর্বদা। পরকে ভালোবাসো। যেখানে প্রেম, ভক্তি, স্নেহ, ক্ষমা—সেখানে তিনি। তিনিই তাঁকে বুঝবার শক্তি দেবেন। তাঁর জন্যে যে সর্বত্যাগী, তাকে হাত ধরে তিনিই নিয়ে যান। পরের জন্যে যে সর্বত্যাগী, তাকে হাত ধরে তিনিই নিয়ে

যান।

—এই মানুষের ধর্ম।

—এর চেয়ে বড় ধর্ম নেই পৃথিবীর মানুষের। যারা নিরলস হয়ে তাঁকে ডাকে, ভালবাসে—পরের সেবা করে, এক অমানব পুরুষ তাদের হাত ধরে দেবযান পথে জন্ম-মৃত্যুর দুস্তর অকূল মহাসমুদ্র পার করে নিয়ে যান। ভগবান নিজেই সেই অমানব পুরুষ, অপার করুণায় যিনি নিজেই এগিয়ে এসে হাত ধরেন অসহায়ের, শরণাগতের। পৃথিবীর সৃষ্টির আদিকালের বাণী এ। কারণ যা সত্য, তা চিরযুগেই সত্য—এই একই বার্তা যুগে যুগে পৃথিবীতে প্রচার করা হয়েচে, দূতের পর দূত এসেচে গিয়েচে. 'অন্ধ জাগো! না—কিবা রাত্রি কিবা দিন!' চোখ আছে, কেউ দেখে না ; কান আছে কেউ শোনে না!

ওরা সে পৃথিবীর একটি সুরম্য হ্রদ-মত জলাশয়ের ধারে বসেচে। যতীন চেয়ে চেয়ে দেখছিল, ওদের দক্ষিণে পৃথিবীর দেবদারুজাতীয় বৃক্ষের মত এক প্রকার ঘন সবুজ বৃক্ষের সারি, কিন্তু তাতে থাবা-দোপাটির মত রঙীন ফুল এত ফুটেছে যে, বড় বড় শাখাপ্রশাখা নির্মল স্ফটিকের মত জলরাশির কূলে কূলে নুয়ে পড়েছে। বেলা উত্তীর্ণ হয়েচে, নীলকৃষ্ণ দিগন্তরেখার দিকে চেয়ে হঠাৎ সে দেখলে বিশালকায় এক দশমী কি একাদশীর চন্দ্র উদয় হচ্চে! অত বড় চন্দ্র। আকাশের এক দিক জুড়ে আলোয় আলো করে তুলেচে সারা দিক্‌চক্রবাল।

সে অবাক্ হয়ে বল্লে—ও কি রকম চাঁদের মত ওটা—অত বড়—

করুণাদেবী হেসে বল্লেন—বৃহস্পতি। ওর জ্যোৎস্না পড়বে এখুনি। পৃথিবীর জ্যোৎস্নার চেয়ে অনেক বেশি জ্যোৎস্না আর অদ্ভুত শোভা। আর একটা ব্যাপার, তোমাদের পৃথিবীর মত অমাবস্যা এখানে নেই, উপগ্রহের ক্ষুদ্র দেহ অতবড় বৃহস্পতি গ্রহকে ঢাকতে পারে না, সুতরাং সপ্তমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত কলা হয়—কিন্তু দু'বৎসব ধরে শুক্লা রাত্রি চলে।

সে মুগ্ধ হয়ে গেল এই সুদূরতর পৃথিবীর অদ্ভুত জ্যোৎস্নাময় রজনীর শোভায়। হ্রদের ওদিকে জলজ ঘাসের আড়ালে তরুদলের ভ্রষ্ট কুসুমরাশি পদদলিত করে একদল পরমা রূপসী নারী জলে নামলো স্নান করতে। কে জানতো আবার এমন সব স্থান আছে, সেখানেও মানুষ আছে! ভগবানের যে কথা গ্রহদেব কিছু আগে বলছিলেন, তাতে তার মন ভরে আছে। যে আদিত্যবর্ণ পুরুষের মানস থেকে এই সব পৃথিবী, এই জ্যোৎস্না পাহাড় পর্বত, বেণু-বীণার ঝংকারের মত সুস্বরা ওই সুন্দরীদের উৎপত্তি, তাঁতেই লয় কল্পান্তে, সৃষ্টি আর প্রলয় যাঁর নিঃশ্বাস আর প্রশ্বাস—তিনি কোথায়? কে তাঁকে জানে? কি ভাবে তাঁকে জানা যায়? কে দেখিয়ে দেবে তাঁকে?

হঠাৎ চমক ভেঙে সে দেখলে তারা তিনজনে মাত্র আছে। গ্রহদেব বৈশ্রবণ কখন অন্তর্হিত হয়েচেন। করুণাদেবী বল্লেন—উনি এ সব পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে বেশিক্ষণ থাকতে পারেন না।

পুষ্প বল্লে—আমাদের বড় সৌভাগ্য যে, ওঁর দেখা পেয়েচি—অবিশ্যি আপনার দয়ায়।

ফেরবার পথে আকাশে উঠে পুষ্পকে দেবী দেখালেন, পৃথিবীটার চারিদিকে আকাশে কুয়াশার মত, মেঘের মত পিঙ্গল প্রভায় আবেষ্টিত করে রেখেছে কি সব। বল্লেন—পৃথিবীর তাবৎ অধিবাসীদের বাসনা কামনা মেঘের মত জমা হয়েচে ও বায়ু-মণ্ডলে। ওদের কাছে অদৃশ্য, যেমন আমরা ওদের কাছে অদৃশ্য। তোমাদের পৃথিবীতেও আছে এই রকম—এর চেয়েও বেশি। এই সব ঠেলে আমাদের যাতায়াত বড় কণ্টকর—তোমাদের পৃথিবীর শহরগুলোতে তো আরও বেশি। টাকার নেশা, সুরার নেশা, রূপের নেশা—

ওর আকাশ ধূসর বাষ্পে ছেয়ে রেখেচে—তাতে বিষ আছে, আমাদের পক্ষে সে ঠেলে যাওয়া কত কষ্ট! কি করি, পৃথিবীর মত স্থূল দেহের আবরণ তৈরি করে যেতে হয়। কিন্তু গেলে কি হবে, আমাদের পর্যন্ত বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলে. ভালভাবে কিছু দেখতে পাইনে. নিজের স্বরূপ আবৃত করে গিয়েও কিছু করতে পারিনে। যাও তোমরা তাহলে···

ওদের পায়ের তলায় বুড়োশিবতলার ঘাটে দেখা গেল দিব্যি দুপুরবেলা! দূর পৃথিবীর জ্যোৎস্না ছায়াবাজির মত গিয়েছে মিলিয়ে, তার অপরূপ রূপসী জলকেলিরতা নারীদের নিয়ে।

যতীন বল্লে—নাঃ. এতদিনে বুঝলুম জগৎটা মায়া!

পুষ্প কৌতুকের সুরে বল্লে—অত বড় দীর্ঘনিঃশ্বাসটা ফেল্লে যে? ওটা কি দার্শনিক দীর্ঘশ্বাস না সেখানকার ওই সুন্দরীদের অদর্শনে—

—যাও. ওসব ভাল লাগচে না। মন বড় চঞ্চল—আমি এখুনি যাবো। আমার মা কাঁদচেন আমার জন্যে।

—কোন্ মা?

—আরে, কোন্ মা আবার? পৃথিবীর এই সেদিনের—

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে বল্লে—জগৎটা মায়া বলছিলে না যতীনদা?

যতীন বিরক্তির সুরে বল্লে—সব তাতেই তোমার ঠাট্টা। আমার ব্যথা আমিই জানি।

—বেশ ভালই। যাও গিয়ে দেখে শুনে এসো. মায়ের বাছা—আহা!

—তুমিও চলো। পথে নানা বিপদ. চুম্বকের ঢেউ—ঢেউ কখন কি রকম হবে. ওসব আমি বুঝতে পারিনে। শেষকালে আবার কোথায় গিয়ে ঠেলে উঠবো জন্ম নিয়ে. বিশ্বাস কিছু নেই। তার চেয়ে চলো সঙ্গে।

কোলা বলরামপুর গ্রামে ঝাঁ ঝাঁ করচে শরতের দ্বিপ্রহর। নিবিড় বাঁশবনে ঘুঘু ডাকচে উদাস-মধ্যাহ্নবেলায়. বনে বনে তিৎপল্লার হলুদ ফুল ফুটেছে। যতীন অনেকদিন পরে বাংলার শরতের এ সুপরিচিত দৃশ্যগুলি দেখলে। বাঁশঝাড়ে সোনার সড়কির মত নতুন বাঁশের চারা ঠেলে উঠেছে. বনসিমতলায় বেগুনি ফুল ফুটে ঝোপের মাথা আলো করচে—বর্ষার শেষে জল মরে যাচ্চে ডোবায়. পুকুরে নদীতে—তীরের টাটকা কাদায় সাদা বক গেঁড়ি গুগুলি খুঁজে বেড়াচ্চে. জলের ধারেই কাশফুলের ঝাড় থেকে হাওয়ায় কাশ-ফুলের সাদা তুলোর মত পাপড়ি উড়চে।

যতীন বল্লে—কি চমৎকার. পুষ্প! বাংলার সব পাড়াগাঁয়েই এমন। মন খারাপ হয়ে গেল। এর সঙ্গে জীবনের কত স্মৃতি জড়ানো! ছেলেবেলায় এম্নি শরতে পুজোর ছুটিতে স্কুল-বোর্ডিং থেকে বাড়ী আসতুম···দ্যাখো দ্যাখো এই গেরস্তর বাড়ীটিতে কি শিউলি ফুলটা তলায় পড়ে রয়েচে! আহা!

পুষ্প বল্লে—দুপুরের রোদে এখনও শুকোয় নি—ঘন ছায়া কিনা!

যতীন স্বপ্নালস চোখে বল্লে—কতকাল পরে যেন নিজের মাটির ঘরটিতে ফিরে এলুম পুষ্প। এমনি স্নিগ্ধ, এমনি আপন। চলো—

ঘরের মধ্যে বিছানা পাতা—তাতে যতীনের সেই তরুণী মা আধময়লা লেপকাঁথা গায়ে শুয়ে মলালোরিয়ায় ভুগচে। শুধু এখনে নয়. পাশের বাড়ীতেও তাই—জানলার কাছে ছোট তক্তপোশে আর একটি বৌ শুয়ে জ্বরে এপাশ-ওপাশ করচে. তার পাশে দুটি ছোট ছোট ছেলে—জ্বরে ধুঁকচে তারাও। রান্নাঘরে একটি বৃদ্ধা কলাই-এর ডালে সম্বরা দিয়েচেন, তারই সুগন্ধ জ্বরাক্রান্ত বাড়ীর বাতাসে। পাশের বাড়ীর বৌটি চিঁচিঁ করে

বলচে—একটু জল দিয়ে যাও পিসিমা।

বৃদ্ধা বলচে—একা মানুষ কতদিকে যাবো, ক'টা হাত পা? কাল গিয়েচে একাদশী, আর এই খাটুনি। একটু সবুর করো। গোরু দুটো সেই কোন্ সকালে বেঁধে দিয়ে এসেচি নদীর ধারের বাচ্ড়ায়, একটু জল দেখিয়ে আসবার সময় পাইনি এত বেলা হোল।

যতীন এসে ওর নতুন মায়ের বিছানার পাশে দাঁড়ালো। একটু আগে ওর মা ওর কথা মনে করে কেঁদেচে জ্বরের ঘোরে। এই তো গত বর্ষায় ও মায়ের কোল ছেড়ে গিয়েচে, সে স্মৃতি ওর মায়ের মনে এখনও অতি স্পষ্ট। চোখের জল গড়িয়ে পড়েচে বালিশের গায়ে। মাতৃহৃদয়ের নিঃশব্দ ব্যথার অভিব্যক্তি। যতীন বুঝলে, মায়ের এই চোখের জল, বুকের চাপা কান্নাই তাকে আজ সপ্তস্বর্গের পার থেকে টেনে এনেচে এখানে। মাতৃ-শক্তির আকর্ষণ অদম্য, কেউ তাকে তুচ্ছ করতে পারে না, হোলই বা মাটির ঘরের দুদিনের মা। সব মা-ই তো দুদিনের।

পুষ্প বল্লে—যা ভাবচো তা নয় যতীনদা। মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চেও না পৃথিবীকে, পৃথিবীর স্নেহ-ভালবাসাকে। তোমার সাধ্যি কি এই মাতৃশক্তিকে অবহেলা কর? নিজের নিজের জায়গায় কারো শক্তি কম নয়।

যতীন কৃত্রিম রাগের সুরে বল্লে—ওঃ এখন যদি সেই সমাধিবাজ সন্নিসিটাকে পেতাম—বুঝিয়ে দিতাম তাকে—

মহাপুরুষদের নামে অমন বোলো না, ছিঃ! তিনি যে ভূমিতে উঠে জগৎকে মায়া দেখেচেন, তোমার সে জ্ঞান কোথায়? যে অবস্থা যার, তাই তার কাছে সত্যি আর সহজ। তোমার কাছে এই সত্যি। বদ্ধ জীব তুমি।

—তাহোলেই পুষ্প, জগৎটা কি কতকটা ভেল্কির মত লাগচে না? বদ্ধ জীব বলে গালাগালি তো দিচ্চ—

—আবার তোমার বোঝবার ভুল। যাক্, ও সব বড় বড় কথা। তিনি যখন বোঝাবেন তখন বুঝো। এখন তোমার মায়ের সেবা করো—আমি যাই পাশের বাড়ীর বৌটির কাছে—জ্বরের ঘোরে বমি করচে ওই শোনো—আহা!

—তার ওপর বাড়ীতে তো দেখচি এক খাণ্ডার পিস্‌শাশুড়ী ছাড়া মুখে জল দেবার কেউ নেই—

যতীন বসে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঘরের চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। অতি দরিদ্রের ঘরকন্না, ময়লা কাঁথা, ছেঁড়া মাদুর আর মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ির গেরস্থালি। খানিক আগে পাশের ঘরের মেজেতে কে পান্তাভাত খেয়ে এঁটো থালা-বাসন ফেলে রেখেচে—একটা বেড়ালছানা থালার আশেপাশে ঘুরচে। হয়তো তার মা জ্বর আসবার আগে পান্তাভাত ক'টা খেয়ে থাকবেন, গরীবের ঘরে জ্বরের উপযুক্ত পথ্য জোটে নি। কেন তাকে পুষ্প নিয়ে গেল এখান থেকে? এই ঘরে মায়ের কোলটি জুড়ে সে বেশ থাকতো। তারপর একদিন সুখেদুঃখে বড় হয়ে উঠতো, ভাল চাকুরী করে এই দরিদ্রের ঘরণী মায়ের সেবা করতো। ভাঙা বাড়ী সারাতো, মাকে ভালো ভালো শাড়ী, কানের দুল, হাতের বালা চুড়ি কিনে দিতো, ম্যালেরিয়ার সময় এখান থেকে নিয়ে যেতো দেওঘর মধুপুরে। ওইখানে সজ্‌নেতলায় বড় রান্নাঘর তৈরি করে দিত, সানাই বাজনার মধ্যে একদিন বিয়ে করে বৌ এনে মায়ের বুকে সুখের ঢেউ তুলতো, নানা দিক দিয়ে মায়ের শত সাধ পূর্ণ করতো। আজ এই যে অসহায়া অশিক্ষিতা পল্লী-বধূ জ্বরের ঘোরে তাকেই স্মরণ করে কিছুক্ষণ আগেও কেঁদেচে—কি অপূর্ব! স্নেহের অমৃতই ওর বুকে জমা রয়েচে তার জন্যে। এর জন্যে তার মন পিপাসিত—কি হোল তার

স্বর্গে গিয়ে? স্বর্গ তো পালাচ্ছিল না।

এই সময় ডাকপিওন বাইরের উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে বল্লে—মনিঅর্ডার আছে।

বাড়ীতে আর কেউ নেই. যতীনের মা ধড়মড় করে উঠে বল্লে—ও শৈল, শৈল—কোথায় গেলি? মাগো, আমায় সবাই মিলে খেলে। কেউ যদি বাড়ী থাকবে—ও শৈল—

রোগিণীর আহ্বানে কোথা থেকে আট দশ বৎসরের একটি বালক ছুটতে ছুটতে এসে বল্লে—কি কাকীমা—কি হয়েচে?

—আমার মাথামুণ্ডু হয়েচে? দুপুর বেলা বেরোয় কোথায় সব, বাড়ীতে কেউ নেই—মনিঅর্ডার এসেচে, নে পিওনের কাছ থেকে; আমার এমন জ্বর এয়েচে যে মাথা তুলতে পারচিনে—শৈল কোথায়?

—দিদি তাস খেলচে পাঁচুদের বাড়ী—

বালক মনিঅর্ডারের ফর্মখানা হাতে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকলো! ওর কাকীমা বল্লে—ক'টাকা?

বালক ঘাড় নেড়ে বল্লে—সে জানে না। বাইরে থেকে পিওন চেঁচিয়ে বল্লে—সাত টাকা মা ঠাকরুণ—সইটা করে দেন—

পিওন ফর্ম সই করিয়ে টাকা দিয়ে চলে গেল। বালক টাকা নিয়ে এসে রোগিণীর হাতে দিতে রোগিণী তিন চার বার গুনে গুনে বালিশের পাশে রেখে দিলে। যে ভাবে বৌটি আদরে যত্নে সতর্কতার সংগে টাকা কয়টি বার বার গুনলে তাতেই যতীনের মনে হোল এই দরিদ্র সংসারে গৃহলক্ষ্মীর কাছে ওই সাতটি টাকা সাতটি মোহর। সে যদি বড় হয়ে মায়ের হাতে থলিভর্তি টাকা এনে দিতে পারতো! আজ সত্যিই তার মনে হোল, পুষ্প তাকে যতই টানুক, উচ্চ স্বর্গের উপযুক্ত নয় সে। মাটির পৃথিবী তাকে স্নেহময়ী মায়ের মত আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় শত বন্ধনে, তার মনে অনুভূতি জাগায় এই সংসারের ছোটখাটো সুখদুঃখ, আশাহত অসহায় নরনারীর ব্যথা। তার এই মাকে একলা ফেলে আশালতাকে নিষ্ঠুর ভাগ্যের হাতে সঁপে দিয়ে সে কোন্ স্বর্গে গিয়ে সুখ পাবে?

যতীনের অদৃশ্য উপস্থিতি ও স্পর্শহীন স্পর্শ ওর মাকে কথঞ্চিৎ সুস্থ করে তুললে। পুষ্প এসে বল্লে—তোমার মাকে ছবি দেখাবো যতীনদা? যেন এক অদৃশ্য দেবতা ওঁর ছেলের মত এসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চে—মিষ্টি কথা বলচে—দেখাবো?

—পাশের বাড়ীর বৌটি কেমন?

—ঘুম পাড়িয়ে এলুম। মাথা ধরেছিল, সারিয়ে দিয়ে এলুম।

—খান্ডার পিসশাশুড়ী কি করচে? বুড়িটা?

পুষ্প হেসে বল্লে—পিসশাশুড়ীর অত দোষ দিও না। বৌটির চরিত্র ভাল না।

যতীনের মনে পড়লো আশালতার কথা—সে একটু তিক্তস্বরে বল্লে—মেয়েমানুষ কিনা, তাই অপর মেয়েমানুষের চরিত্রের দিকটাতে আগে নজর পড়ে। কই আমাদের তো পড়ে না? দেখেই বুঝে ফেল্লে?

পুষ্প বল্লে—তা নয়, ওর মনে সব কথা লেখা রয়েচে আমি পড়ে এলুম। ও চিন্তা করচে ওর একজন প্রণয়ীকে. নাম তার হরিপদ, এই দুপুরে নদীর ঘাটে গিয়ে তার সংগে লুকিয়ে দেখা করার কথা ছিল. জ্বর এসেচে ঠেসে দুপুরের আগেই।

—যেতে পারেনি বলে ভাবচেন বুঝি? আহা!

—হঠাৎ অত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে উঠলে যে ওর ওপর? অত দরদই বা এল কোথা থেকে? জানো. যতীনদা—আমার একটা ব্যাপার হয়েচে আজকাল. লোকের কাছে কিছুক্ষণ বসলে বা থাকলে আমি তার মনের চিন্তা সব বুঝতে পারি। ও বৌটির পাশে গিয়ে বসে দেখি ও শুধু কে হরিপদ, তার কথাই ভাবচে। যাক্ গে, তোমার মা, কেমন?

—এখন একটু ভালো। মায়ের মনিঅর্ডার এসেচে সাত টাকা কোথা থেকে। দেখতে যদি মায়ের আনন্দ! পুষ্প. কেন আমাকে নিয়ে গেলে? এ দরিদ্র সংসারের উপকার করতে পারতাম বেঁচে থাকলে। আমি হয়তো চাকরী করে—

—আমি নিয়ে যাই সাধ্যি কি আমার? যিনি দীনদুনিয়ার মালিক তাঁর ইচ্ছে না থাকলে—

—তুমি কি দীনদুনিয়ার মালিকের সঙ্গে পরামর্শ করে এ কাজ করেছিলে পুষ্প?

এই সময় যতীনের মা বিছানা থেকে উঠে বাইরের রোয়াকে রোদ্দুরে গিয়ে বসলেন। ম্যালেরিয়া-রোগীর ভাল লাগে রোদ্দুরে বসতে। দুটি প্রতিবেশিনী এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলো যতীনের মায়ের সঙ্গে। একজন বলচে—জ্বরটা কখন এল আজ বৌ?

—দুটো ভাত খেয়ে উঠেচি. থালা তুলিনি—অমনি সে কি ভূতোনন্দি জ্বর। কিন্তু এখন যেন ভালো মনে হচ্চে। হঠাৎ জ্বরটা আজ যেন কমে গেল।

—হ্যাঁরে, আজ নাকি টাকা এসেচে তোর? ক'টাকা এল?

—হ্যাঁ দিদি, সাত টাকা।

—বাঁচা গেল! ক'দিন তো একরকম না খেয়ে ছিলি। বট্‌ঠাকুর টাকা পাঠাতে অত দেরি করেন কেন? সামনে পুজো—অত দেরি করেই যখন পাঠালেন তখন আরও কিছু—

—কোথায় পাবে দিদি যে পাঠাবে। এই তো সেদিন বাড়ী থেকে গেল। পনেরো টাকা তো মোটে মাইনে—মনিব যে উন্‌পাঁজুরে লোক. দু-এক টাকা আগাম চাইলে তো দেবে না। ওবও তো শরীর ভাল না সবই জানো। সেবার সেই বড় অসুখের পরে আর শরীর ভাল সারলো না। ওই মানুষকে একা পাঠিয়ে যে কত অশান্তিতে ঘরে থাকি—তার ওপর আমার খোকা যাওয়ার পর উনি একেবারে—

যতীনের মা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন। প্রতিবেশিনীরা সান্ত্বনার কথা বলতে লাগলো। একজন বল্লে—যাও বৌ. রোদ্দুরে বোসো না. বমি হবে। ঘরে শোওগে। কি করবে বলো. সবই অদেষ্ট।

যতীনের মা চোখের জলে ভেজা সুরে বল্লেন—তোমরা আশীর্বাদ করো দিদি. উনি ভালো থাকুন। ওই সাত টাকাই আমার সাত মোহর। পুজোর সময় আসতে পারবেন না বলে লিখেচেন কুপনে—সেই কি কম কষ্ট আমার। পোড়ারমুখো মনিব মহালে পাঠাবে খাজনা আদায় করতে—ছুটি পাবেন না—

পুষ্প হঠাৎ বলে উঠলো—আমি বলচি তিনি বাড়ী আসবেন, আসবেন!

যতীন অবাক হয়ে পুষ্পের দিকে চেয়ে রইল। পুষ্পের মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতি ফুটে উঠেছে. ওর কণ্ঠস্বর যেন দৈববাণীর মত শক্তিমান ও অমোঘ।...

কথা শেষ করে যখন পুষ্প ওর দিকে চাইলে তখন পুষ্পের চোখে জল।

যতীন বল্লে—কি হোল তোমার, পুষ্প?

পুষ্প তখনও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসেনি। বল্লে—সতীলক্ষ্মী উনি—জয় হোক ওঁর। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে মাকে।

তারপর দুজনে আরও অনেকক্ষণ সেখানে রইল। যতীনের মায়ের জ্বর ছেড়ে যায় নি. তিনি আবার শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন. কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করে তিনি জ্বর কমবার সঙ্গে সঙ্গে নির্জীবভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন।

যতীন বল্লে—ভালো কথা. মাকে এবার সেই ছবিটি দেখাও না? যেন এক দেববালক ওঁর মাথার শিয়রে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্চে—এই অবস্থার স্বপ্ন বেশ স্পষ্ট হবে।

পুষ্প বল্লে—না। কি জানো যতীনদা, ভেবে দেখেচি তারপর। ওসব ছবি যে দেখে, সে সংসার করতে পারে না। মন চঞ্চল হয়ে যায়। পৃথিবীর মন একরকম, ভুবর্লোকের মন আলাদা। এর সঙ্গে ওকে জড়াতে নেই। ওসব দর্শন হয় কাদের যারা আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করবে। সংসারী লোকদের অমন ছবি দেখাতে নেই। আমি দেখাতে পারি, তোমার মা জেগে উঠে কাঁদবেন, উদাস হয়ে থাকবেন দিনকতক, সংসারের কিছু ভাল লাগবে না। প্রতিদিনের সাংসারিক জীবনে মন দিতে পারবেন না। কি দরকার সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে।

যতীন আগ্রহের সুরে বল্লে—নয়তো মাকে একবার ঘুমের মধ্যে ভুবর্লোকে নিয়ে যাই না কেন? বেড়িয়ে দেখে আসুন।

—উনি এখনও তার উপযুক্ত হন নি। কিছু বুঝতে পারবেন না, হয়তো ওঁর সূক্ষ্ম শরীর অজ্ঞান হয়ে পড়বে সেখানে। সব এক আজগুবি স্বপ্ন বলে ভাববেন। বৃথা পরিশ্রম। চলো যাই, বেলা গেল।

নিকটেই এক ঝোপে তিৎপল্লার হলুদ ফুলে রঙীন প্রজাপতির ঝাঁক উড়তে দেখে ওরা সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। পুষ্প বল্লে—কি সুন্দর, না? শুঁয়োপোকা থেকে কেমন চমৎকার রঙীন জীব তৈরী হয়েচে দ্যাখো। শুঁয়োপোকা মরে যায়, গুটি কেটে প্রজাপতি উড়ে বেরোয়! মাটিতে কত আস্তে চলে শুঁয়োপোকা—আর কেমন দ্যাখো প্রজাপতি নীল আকাশের তলায় ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্চে। শুঁয়োপোকা কল্পনা করতে পারে মরবার পরে সে প্রজাপতি হবে?

যতীন হেসে বল্লে—মানুষ কল্পনা করতে পারে সে মৃত্যুর পর সে বিশ্বের নীল আকাশের তলায় বিদ্যুদ্গতিতে উড়ে বেড়াতে পারবে? শুঁয়োপোকার মন অন্ধ, মানুষও তেমনি অন্ধ।

প্রদোষালোকে ম্লানায়মান ধরণী গতির বেগে ওদের পায়ের নীচে কোথায় অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে গেল। সেই ধরণীর এক প্রান্তে যতীনের দরিদ্রা জননী গভীর ঘুমে অচেতন রইলেন জানতেও পারলেন না তাঁর ভাঙা ঘরে এ অদ্ভুত আত্মিক আবির্ভাবের রহস্য।

সেদিন পুষ্পই প্রথম তাঁকে দেখলে। সেদিন ওরা বুড়োশিবতলার ঘাটে ফিরে আসছিল পৃথিবী থেকে—ফেরবার পথে একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের ওপর বসেচে—হঠাৎ আকাশের বিদ্যুৎলেখার মত উজ্জ্বল জ্যোতি দর্শন করে পুষ্প বল্লে—দ্যাখো দ্যাখো—কোন্ দেবতা আসচেন! যতীনও দেখতে পেলে। একটা বিশাল উল্কা যেন আগুনের অক্ষরে শূন্যের গায়ে তার বার্তা ঘোষণা করচে।...

চক্ষের পলকে সেই পথিক দেবতা কায়া ধারণ করে ওদের সামনে আবির্ভূত হোলেন। পুষ্প ও যতীন উভয়েই চিনলে—যে দেবতা একবার মহাশূন্যে পথ হারিয়ে ওদের কুটির-প্রাঙ্গণে বিভ্রান্ত অবস্থায় এসে পড়েছিলেন, সেই ভ্রাম্যমাণ আবিষ্কারক দেবতা।

দেবতা বল্লেন—তোমাদের কথা স্মরণ রেখেচি। আবার দেখা করবো বলেছিলাম, মনে আছে কন্যা?

পুষ্প ও যতীন দেবতার পাদবন্দনা করলে। পুষ্প বল্লে—দেব, আপনি ভ্রমণের গল্প করুন।

যতীন বল্লে—একটা কথা দেব, আমাদের পৃথিবীর পণ্ডিতরা অনুমান করচেন আমাদের এই সৌর-জগতের বাইরে অন্য কোনো নক্ষত্রে গ্রহ নেই। একথা কি সত্য?

দেবতা হেসে বল্লেন—ভুল কথা। বিশ্বের এই অঞ্চলেই বিভিন্ন নক্ষত্রে লক্ষ লক্ষ গ্রহ বর্তমান। বহু শ্রেণীর জীব তাতে বাস করচে। তোমাদের পৃথিবী যতটুকু এর চেয়ে

অনেক বৃহত্তর ও সুন্দরতর গ্রহ বিশ্বের এই অঞ্চলে বহু নক্ষত্রে বর্তমান।

—যতীন বল্লে—দেব, বিশ্বের এই অঞ্চল বলে আপনি কতটুকু জিনিসের কথা বলচেন ?

—বিদ্যুতের বেগে যদি যাও, তবে এক কোটি বৎসর লাগবে তোমাদের এই নক্ষত্র-মণ্ডল পার হতে। এ রকম লক্ষ লক্ষ নাক্ষত্রিক বিশ্ব ছড়ানো রয়েচে চারিধারে। আমি বিশ্বের এ অঞ্চল বলতে তোমাদের ছায়াপথের নিকটবর্তী অঞ্চলের কথা বলচি।

পুষ্প বল্লে—আমাদের একবার নিয়ে যাবেন বলেছিলেন ওই সব দূর দেশে?

চক্ষু মুদ্রিত কর। গতির প্রচণ্ড তেজ তোমরা সহ্য করতে অভ্যস্ত নও—জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। দুজনেই চক্ষু মুদ্রিত করো—প্রস্তুত হও—মধ্যপথের কোনো নক্ষত্র বা গ্রহলোক তোমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না।

গতির কোনো অনুভূতিই ওদের হোল না, চক্ষের পলক ফেলতে যত বিলম্ব হয়, ততটুকুও বোধ হয়নি—পথিক দেবতা বল্লেন—চোখ চেয়ে দেখতে পারো—

পুষ্প ও যতীন সম্মুখের দৃশ্য দেখে চমকে উঠলো। তারা এ কোথায় এসেচে—এক বিরাট অগ্নিমণ্ডল তাদের সামনে—সে অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে বহুলক্ষ বিশালকায় কটাহে যেন লক্ষ কোটি মণ ধাতু বিগলিত হচ্চে একসঙ্গে—লক্ষ লক্ষ মাইল ঊর্ধ্বে উঠেচে রক্তবর্ণ স্বয়ম্প্রভ বাষ্পশিখা—রক্ত-আগুনের শিখার মত। বাল্যকালে জলস্তম্ভের ছবি দেখেছিল যতীন পৃথিবীর পাঠশালার কোন পুস্তকে—এখন ওর চোখের সামনে ধারণার অতীত বিশালকায় অগ্নি ও প্রজ্বলন্ত বাষ্পের খাড়া সোজা উঁচু স্তম্ভের চক্ষের নিমেষে উঠে যাচ্চে যেন দশ হাজার মাইল, যেদিকে চাওয়া যায় দাউ দাউ করচে শুধু আগুন—অথচ পৃথিবীর আগুনের মত নয় ঠিক—জ্বলন্ত বাষ্পরাশি হয়তো। অগ্নিমণ্ডলের চারিদিকে শুভ্র ও রক্ত-আগুনের ছটা—গ্রহণ যোগে দৃশ্যমান সূর্যের চারিপাশে দৃষ্ট সৌরকিরীটের (corona) মত। কোন্ রুদ্র ভৈরবের প্রচণ্ড আবির্ভাব এ! এখানে না আছে নারী, না আছে শিশু, না আছে বনকুসুমের শোভা, না আছে জীবের জীবনস্বরূপ বারি। কিন্তু এই রুদ্রের বামমুখ প্রত্যক্ষভাবে দেখবার সুযোগ ঘটে না কারো—এ ভয়ঙ্কর মূর্তিকে দেখতে পেয়ে অন্তরাত্মা যেমন থর থর কেঁপে উঠলো ওদের, তেমনি ওদের মনে হোল, এই অদ্ভুত ভয়ংকরের আবির্ভাবের ও অস্তিত্বের সামনে তাদের সকল ক্ষুদ্রত্ব ও সংকীর্ণতা এখানকার বাষ্পমণ্ডলের কটাহে বিগলিত বহু লোহ, তাম্র, নিকেল, এলুমিনিয়ম, কোবাল্ট, প্রস্তর, স্বর্ণ, রৌপ্যের মতই দ্রবীভূত হয়ে নয় শুধু, বাষ্পীভূত হয়ে যায়—যেমন যাচ্চে ঐ সব ধাতু নিমেষে তাদের দৃষ্টির সম্মুখে।

দেবতা বল্লেন—এ একটা নক্ষত্র। কিন্তু কামচারী বা বিদ্যুৎচারী না হোলে তোমরা এর বিরাটত্ব কিছুই বুঝতে পারবে না। তোমাদের জড়জগতের অবস্থানকালের কোনো মাপকাঠি ব্যবহার করে এ নক্ষত্রের সীমা পাবে না। চেষ্টা করো—চলো—

পুষ্প ও যতীন যে বেগে যেতে ইচ্ছা করল, তাকে পৃথিবীতে রেলগাড়ীর বেগ বলা যেতে পারে। দেবতা গতির বেগ কমিয়ে ওদের সঙ্গে চলেছেন। ওরা সবেগে যেন উড়ে চলেচে একটা অগ্নির মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে ও একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের অগ্নিশিখার মধ্যে দিয়ে—ওদের চারিপাশে ঘিরে অগ্নি-দেবতার রক্ত-চক্ষু। বহুক্ষণ ওরা গেল, পৃথিবীর হিসেবে দশ বারো ঘণ্টা। ওদেরও ক্লান্তি নেই, যাত্রাপথেরও শেষ নেই—মহা অগ্নি-সমুদ্রেরও কূলকিনারা নেই।

দেবতা বল্লেন—তোমরা যদি জড় বস্তুর উপাদানে তৈরি হতে এই জ্বলন্ত নক্ষত্রের বহুদূরে থেকে তোমাদের দেহ জ্বলে পুড়ে বাষ্প হয়ে উড়ে যেতো—আকর্ষণের বশে সে বাষ্পটুকু এই বৃহত্তর বাষ্পমণ্ডলে প্রজ্বলন্ত অবস্থায় প্রবেশ করে মিশিয়ে যেতো...

পুষ্প বল্লে—আর সহ্য করতে পারবো না—আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলুন দেব দয়া করে।

দেবতা প্রসন্ন হেসে বল্লেন—বিশাল বিশ্বের রূপ সবাই সহ্য করতে পারে না, দেখতে চায়ও না। শক্তিমতী হও। ভগবান তাকেই এসব দেখান, যে তাঁর বিশ্বের বিরাটত্ব দেখে ভয় পাবে না। আমি সুদীর্ঘ জন্ম-জন্মান্তর ধরে এ সাধনা করেছিলাম—তারপর জড় জগৎ থেকে এসে বহুকাল ধরে শুধু বিশ্বভ্রমণ করে বেড়াচ্চি। এই আমার সাধনা—এতে আমি সিদ্ধিলাভ করেচি। কিন্তু আমিই দিশাহারা হয়ে যাই সময় সময়। তোমরা কী দেখেচ, এক কণিকাও নয়।

পুষ্প বল্লে—আর কী দেখাবেন বলুন দেব, এ আগুনের দৃশ্য আমার আর সহ্য হচ্চে না—

—তোমাকে এর চেয়েও বৃহত্তর নক্ষত্রের অগ্নিমণ্ডলে নিয়ে যাবো, চলো। শক্তিমতী হও। এবার চোখ চেয়ে চলো। তোমাকে চোখ তখন মুদ্রিত করতে বলেছিলাম কেন জানো? তোমাদের জড়জগতের অতি নিম্নস্তর অতিক্রম করতে হবে আসবার পথে। সে অতি কুশ্রী স্তর। তোমরা দেখলে ভয় পেতে—তাই দেখাই নি।

যতীন আগ্রহের সুরে বল্লে—নরক? সে দেখতে বড় ইচ্ছে, দেব! দয়া করে—

দেবতা গম্ভীর স্বরে বল্লেন—প্রত্যেক জড় জগতের অমনি নিম্নতর আত্মিক স্তর আছে। জড় জগতের অপুষ্ট আত্মা ওখানে আসে। পৃথিবীর নরক তবুও ভালো, কারণ গ্রহ হিসাবে পৃথিবীর জীবদের আধ্যাত্মিক প্রগতি অনেক বেশি! তোমাদের দেখে তা মনে হচ্চে। এমন গ্রহ তোমাদের দেখাতে পারি যেখানকার জীবের চৈতন্য নিম্নস্তরের। তোমাদের পৃথিবীতে এমন শ্রেণীর জীব নেই।

ওরা অনন্ত ব্যোমের যে অংশ দিয়ে যাচ্ছিল, যতীন তার চারিদিকে চেয়ে কোনো পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল দেখতে পেলে না—সপ্তর্ষিমণ্ডল, কালপুরুষ, ধ্রুবনক্ষত্র, এমন কি বৃশ্চিক পর্যন্ত না! অসীম বিশ্বের কোন্ সুন্দর অংশে তারা এসে পড়েচে যেখান থেকে সপ্তর্ষিমণ্ডল বা বৃশ্চিক কিংবা ক্যাসিওপিয়া দেখা যায় না? প্রশ্নটা সে পথপ্রদর্শক দেবতাকে করলে।

দেবতা হেসে বল্লেন—আমি তোমাদের ওসব নক্ষত্র চিনি না। তোমাদের জড়জগৎ থেকে চিরকাল দেখে আসচো বলে ওগুলো পৃথিবীর জীবের কাছে সুপরিচিত। বিশ্বের পথিক আমি, আমার কাছে ও-রকম লক্ষকোটি ধ্রুব আর সপ্তর্ষি অগণ্য জ্যোতির্লোকের ভিড়ে মিশিয়ে গিয়েচে।

পুষ্প অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছিল আকাশের ওপরদিকে বকের পালকের মত বহু-দূরব্যাপী রঙীন মেঘরাশি এক জায়গায় স্থির ছবির মত দৃশ্যমান।

পুষ্প কৌতূহলী হয়ে বল্লে—ওই মেঘের মত কী ওগুলো দেব?

—আমি জানি কিন্তু কখনো দেখিনি। ওগুলো বহু উচ্চ স্তরের জীবলোক।

—জড়দেহধারী জীব?

—না। তোমরা যাকে বলবে আত্মিক লোক—

—অনেক উঁচু স্তরের আত্মা?

—খুব উঁচু।

যতীন ওদের কথা শুনছিল—সাগ্রহে বল্লে, একটা প্রশ্ন করবো যদি কিছু মনে না করেন স্যার—আই মিন্—মানে, দেব।

পুষ্প ভ্রূকুটি করে বল্লে—তোমার এখনও পৃথিবীর সংস্কার গেল না যতীনদা?

দেবতা ওদের মনোবৃত্তি অনেক সময় ঠিক বুঝতে পারেন না: ক্রোধ, অশ্রদ্ধা, হিংসা

প্রভৃতি মনোভাবের বহু ঊর্ধ্বে তাঁরা। তিনি অনেক পরিমাণে সরল বালকের মত। পুষ্প লক্ষ্য করচে—করুণাদেবীও অনেক সময় বারো বৎসরের পার্থিব বালিকার মত কথা বলেন, ব্যবহার করেন। উচ্চতর দেবচরিত্রের এদিকটা আজকাল বেশি করে ওদের দুজনেরই চোখে পড়চে।

যতীন আরও বিনয়ের সঙ্গে বল্লে—একটা প্রশ্ন ছিল—আপনি ওখানে যান নি কেন?

দেবতা বল্লেন—ওর উত্তর খুব সোজা। ওসব লোক আমার নিকট অদৃশ্য।

পুষ্প ও যতীন দুজনেই বিস্ময়ে স্তব্ধ। পুষ্প বল্লে—আপনার কাছেও অদৃশ্য? দেব, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

এইবার সামনে বহুদূর থেকে ওরা দেখতে পেলে সারা আকাশ জুড়ে একটা বিশাল অগ্নিক্ষেত্র ওদের দিকে যেন ছুটে আসচে। ঘোর শুভ্রবর্ণ মহাপ্রজ্বলন্ত বাষ্পপরিবেশ, মাঝে মাঝে তা থেকে সহস্র যোজনব্যাপী বাষ্পাগ্নি বহু ঊর্ধ্বে উঠে মহারুদ্রের মত সর্বধ্বংসকারী প্রলয়ের হুঙ্কার ছাড়চে। সে দৃশ্য দেখে পুষ্পের চেতনা লোপ পাবার মত হোল।

যতীন সেই কালাগ্নির ভৈরব দৃশ্যের দিকে পেছন ফিরে বল্লে—ভীষণ ব্যাপার, আমাদের পক্ষে এ দৃশ্য না দেখাই ভালো। ভয় করে প্রভু।

দেবতা হেসে বল্লেন—শুধু বিশ্বদেবের মোহনমূর্তিই দেখবে? তাঁর করাল, রুদ্র রূপ দেখলে ভয় পাবে কেন? ধ্বংসদেবের বিষাণ-ধ্বনি শোনাবো তোমাদের। আত্মার দুর্বলতা দূর কর।

—কিন্তু আপনার শিষ্যা যে অচেতন হয়ে পড়েচে! ও মেয়েমানুষ, ওকে ও রূপ আর নাই বা দেখালেন প্রভু?

সেই বিরাট কালাগ্নিবেষ্টিত মহাদেশ তখন ওদের অদূরে। যতীনের দেখে মনে হোল একটা প্রজ্বলন্ত বিশ্বপৃথিবী তার সামনে। অল্প পরেই দেবতার অদ্ভুত শক্তিবলে ওরা দুজনেই সেই বিরাট অগ্নিমণ্ডলের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। ওদের চারিধারে শুধু শুভ্র জ্বলন্ত হিলিয়াম ও ক্যালসিয়াম বাষ্পরাশি মহাবেগে ঘূর্ণমান, কোথাও রাঙা শিখা নেই—শুধুই শ্বেতশুভ্র—আবার বহুদূর অগ্নিময় দিগন্তে লক্‌লকে রাঙা হাইড্রোজেন-শিখা অজগরের মত ফুঁসে গর্জে তেড়ে উঠচে চক্ষের পলকে লক্ষ লক্ষ মাইল। ধ্বংস-দেবের বিষাণ-ধ্বনির মত ভৈরব হুঙ্কার সে কালাগ্নিমণ্ডলের চারিদিক থেকে একসঙ্গে অনবরত শোনা যাচ্চে। একটা গোটা ব্রহ্মাণ্ড যেন দাউ দাউ করে জ্বলচে! অতি ভীষণ, রৌদ্ররূপ প্রকৃতির।

ভয়ে, বিস্ময়ে যতীন আড়ষ্ট হয়ে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে। রৌরব নরকের বর্ণনা সে কিসে যেন পড়েছিল তার পৃথিবীর বাল্যজীবনে। এই কি সেই রৌরব নরক? কোন্ দেবতার তাণ্ডবনৃত্যের পদচিহ্ন এর প্রতি অগ্নিশিখাটির গায়ে আঁকা, উদ্ধত ও ভয়াবহ মৃত্যুদহন এর কালাগ্নিপরিবেশের প্রতি অণু পরমাণুর মর্মস্থলে?

দেবতা বল্লেন—ভয় পেয়ো না। এই থেকেই সৃষ্টি। দাঁড়িয়ে দেখ।

শুধু অন্ধবেগে ধাবমান অণুপরমাণুপুঞ্জের সংঘর্ষে উৎপন্ন এই বিশাল অগ্নিময় মহাদেশ যেন চারিদিক থেকে ওদের ঘিরেচে—এর শেষ কোথায়? অতি নীলাভ শুভ্র অগ্নিগর্ভ বাষ্পপুঞ্জ, ঊর্ধ্বে, নিম্নে, দক্ষিণে, বামে—ভীমবেগে সঞ্চরণশীল, আলোড়নে ও আক্ষেপে উন্মাদ সে বহ্নিমান ব্রহ্মাণ্ড ধরার মানুষ সহ্য করতে পারে না। যতীন অনুভব করলে সেও উন্মাদ হয়ে যাবে এ দৃশ্য বেশিক্ষণ দেখলে। মনে পড়লো গ্রহদেবের সেদিন-কার কথা, সেই অদ্ভুত সত্য কথা—অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতান্যেতা-দৃশানানন্ত-কোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি—পৃথিবীর প্রাচীন দিনের জ্ঞানীরা যে বাণী

উচ্চারণ করে গিয়েছিলেন তপস্যা দ্বারা সত্যকে অনুভব করে।

হঠাৎ পথিক দেবতা যেন ভাবাবেগে সমাধিস্থ হয়ে নিস্পন্দ হয়ে গেলেন ক্ষণকালের জন্যে। সুন্দর চক্ষুদুটি মুদ্রিত করে সেই অগ্নিশিখার মধ্যে তিনি স্থির প্রশান্ত বদনে দাঁড়িয়ে আপন মনে অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন—হে অনল, হে সর্বেশ্বর, হে পরাবর-স্বরূপ, কারণে তুমি বর্তমান, কার্যেও তুমি বর্তমান, তুমিই ধন্য—ধ্বংসের মধ্যে তোমার সৃষ্টি সার্থক হোক। জয় হোক তোমার!

ওদের দিকে ফিরে বল্লেন—চলো। কন্যা এখনও অচেতন? এই নক্ষত্রের অগ্নিমণ্ডল ছাড়িয়ে গেলেই জ্ঞান ফিরে পাবে।

যতীন সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে ছিল দেবতার সেই ধ্যানপ্রশান্ত গম্ভীর রূপের দিকে। অদ্ভুত এ মূর্তি। সাক্ষাৎ সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্তী জ্যোতির্ময় নারায়ণ যেন তার সম্মুখে। সে মুখে অনায়াস করুণা ও গভীর মৈত্রীর চিহ্ন ব্রহ্মাণ্ডের জরামরণচক্রে বদ্ধ জীব-কুলকে যেন অভয় দান করচে। কে বলেছিল এঁকে নাস্তিক?

দেবতা বল্লেন—জানো, প্রত্যেক গ্রহ বা নক্ষত্র, প্রত্যেক জড় বা বাষ্পপিণ্ড যা আকাশে ছড়ানো আছে—তোমাদের সূর্য নামক সেই ক্ষুদ্র নক্ষত্রও এর মধ্যে—প্রত্যেকটি এক এক চুম্বক। এরা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করচে। সমস্ত ব্যোম ব্যেপে এই বিরাট চৌম্বক ক্ষেত্র—কোনো জড়দেহধারী জীবের সাধ্য নেই এই বিশাল চৌম্বকক্ষেত্রের আকর্ষণ-শক্তিকে জয় করে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়।

যতীন বল্লে—দেব, আমাদের সূর্যও বড় চুম্বক?

—তোমাদের পৃথিবীও। সূর্য তো বটেই। প্রত্যেক নক্ষত্রও।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা বহুদূরে চলে এল নক্ষত্রটা থেকে—ওদের মাথার ওপরে বহুদূরে সেটি একটি বিশাল বহ্নিগোলকের মত জ্বলচে তখনও।

হঠাৎ যতীনের মনে পড়লো সেই পূর্বের কথাটি।

সে বল্লে—দেব, আপনি তখন বলেছিলেন ওই সব মেঘের মত দেখা যাচ্চে যা, ওগুলো আপনার কাছেও অদৃশ্য জীবলোক?

দেবতা বল্লেন—জীবলোক বলিনি—স্থূলদেহধারী জীব নেই ওতে। আত্মিকলোক বলেচি।

পুষ্পের এবার জ্ঞান হয়েচে। সে বিস্ময়ের সঙ্গে ওদের দিকে চেয়ে চোখ খুলে বল্লে—এ কোথায় চলেচি?

যতীন হেসে বল্লে—তার চেয়ে কোথা থেকে আসচি বল্লে প্রশ্নটা সুষ্ঠু হোতো। আমরা আসচি বহুদূরের নক্ষত্রলোক দেখে।

—আমি কোথায় ছিলাম?

—অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে।

পুষ্পের এবার জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এল। সে বল্লে—মনে পড়েচে এবার। দূর থেকে যা দেখেচি, তাই যথেষ্ট। উনি দেবতা—তা বলে আমরা সামান্য মানুষ—ও সহ্য করতে পারা কি—

যতীন প্রতিবাদ করে বল্লে—আমরা এখনও সামান্য মানুষ? এতকাল স্থূলদেহ ছেড়ে এসে এখনও সামান্য মানুষ?

পথিক দেবতা হেসে বল্লেন—তোমার পূর্ব প্রশ্নের উত্তর আর এ প্রশ্নের উত্তর এক-সঙ্গেই দিচ্চি শোনো। ওই যে সব মেঘের মত দেখা যাচ্চে বহুদূরে, ওগুলো বহু উচ্চস্তরের আত্মিক লোক। ওতে যাঁরা বাস করেন তাঁরা এবং তাঁদের বাসভূমি দুই-ই আমার কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। অথচ আমি কতকাল ধরে শুধু ভ্রমণ করেই বেড়াচ্চি—

কত যুগ যুগ এসেচি আত্মিক লোকে—আর তোমরা দুদিন এসেই—

যতীন বিস্ময়ে কেমন হয়ে গেল। এই মহান্ দেবতা—ইনিও ছোট? তাহোলে তারা কোথায় আছে? কীটস্য কীট—তাই বুঝি অত অহংকার? কিন্তু কি বিশাল, অনন্ত এ ব্রহ্মাণ্ড—কত অসংখ্য জীবলোক, আত্মিক লোক, অনাদি, অনন্ত সময় ব্যেপে কি অনন্ত বিবর্তন! তাদের সবারই ওপর সেই বিশ্বনিয়ন্তা। সত্যিই ভগবানের নাগাল কে পাবে? তিনি কোথায় আর তারা কোথায়!

যতীন বল্লে—আপনি শুধু ঘুরে ঘুরে বেড়ান কেন, দেব?

—কেন বলো তো?

—আজ আপনাকে যে চোখে দেখলাম—অনুগ্রহ করে কিছু মনে করবেন না স্যার —মানে—মানে—

পুষ্পের ভ্রূকুটি ওকে নির্বাক করে দিলে।

দেবতা নিজেই বোধ হয় ওর মন বুঝে জবাব দিলেন।

—এই ভ্রমণই আমার উপাসনা। কত সৌন্দর্য দেখেচি, কত ভয়ানক রূপ দেখেচি তাঁর—যেমন তোমরা আজ দেখলে। এও কিছু নয়—এর চেয়ে অতি ভীষণ রূপ আছে সৃষ্টির। সে সব সহ্য করতে পারবে না তোমরা। আমি এর মধ্যেই তাঁকে দেখি।

যতীনের চেয়ে পুষ্পের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা বেশি, সে বল্লে—প্রভু, আপনি তাঁকে দেখেচেন?

ওরা একটা অপরিচিত গ্রহের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল, আকাশপথ থেকে তার বিচিত্র ধরনের গাছপালা, পাহাড়-পর্বত সব দেখা যাচ্ছিল। গ্রহে তখন রাত্রি গভীর। লোকালয় বড় কম তাতে, কেবলই ভীষণ অরণ্যানীসমাচ্ছন্ন শৈলমালা ও উপত্যকা। ওর একটা সাথী উপগ্রহ থেকে নীল জ্যোৎস্না পড়ে সে সব এমন একটা সৌন্দর্যে ভূষিত করেচে—পৃথিবীতে কেন, এ পর্যন্ত স্বর্গলোকেও সে রকমটা দেখেনি ওরা। অপার্থিব তো বটেই অদৈবও বটে। বনে বনে নীল জ্যোৎস্না—মুগ্ধ হয়ে গেল ওরা সে গ্রহের গভীর রাত্রির নীলজ্যোৎস্নাস্নাত গভীর উত্তুঙ্গ শৈলারণ্যের রূপে।

দেবতা বল্লেন—কি দেখচো? এ একটা জীবজগৎ। খুব উঁচু স্তরের জীব এতে বাস করে। চলো, এর বনের মধ্যে বসি। তোমাদের পরিচিত স্থূল জগৎ থেকে বহু জন্মের পর যখন লোকের মন তাঁর দিকে যায়, তখন তারা এখানে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। শুধু তোমাদের পৃথিবী থেকে নয়—ওই ধরনের আরও অনেক নিম্নস্তরের স্থূল জগৎ থেকে। আত্মার সেই বিশেষ অবস্থা না হোলে এই সব গ্রহে আসা চলে না। এখানে কর্মবন্ধন কম। ভগবানে যারা আত্মসমর্পণ করেচে, তাদের মন বুঝে অন্তর্যামী বিশ্ব-দেবতা এখানে —এবং আরও এর মত বহু গ্রহ আছে, সেই সব লোকে—জন্মগ্রহণ নির্দেশ করেন। দেখচো না এখানে জীবের বসতি কম। ভিড় নেই। জীবনের যুদ্ধ সরল ও সহজ। সব রকম ভ্রম, কুসংস্কার, অজ্ঞানতার বাঁধন যারা কাটিয়েচে, তারাই এখানে আসে শেষ জন্মের জন্যে। আর স্থূল শরীর গ্রহণ করতে হয় না তাদের এখানকার মৃত্যুর পর।

—তাহোলে পৃথিবীর লোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ ক'রে শুধু যে পৃথিবীতেই ফিরে আসবে তা নয়?

—পৃথিবীর সঙ্গে আমার পরিচয় কম—তবুও আমি জানি, কোনো জীবাত্মা পুনর্জন্মের সময় সে যে-স্থূলজগৎ থেকে এসেছিল, সেখানেই জন্মাবে—তার কি মানে আছে! অবস্থা অনুসারে জীবের গতাগতি নির্দিষ্ট হয়। যেখানে পাঠালে যে উন্নতি করতে পারবে, তাকে সেখানেই পাঠানো হয়। অনন্ত উন্নতিতে জীবাত্মার অধিকার তিনিই দিয়েচেন, যিনি এই বিশ্ব রচনা করেছেন। কে বুঝবে তাঁর করুণা ও মৈত্রী! খুব উচ্চ

অবস্থার আত্মা না হোলে বোঝা যায় না!

ছায়াশীতল শিলাতট ঘন বনশ্রেণীতে ঘেরা। ওরা এসে সেখানে বসেচে। যতীন আর পুষ্প চেয়ে চেয়ে দেখলে এসব গাছপালা তাদের চেনা নেই, পৃথিবীতে এত বড়, এত অদ্ভুত চমৎকার তরুশ্রেণীর সমাবেশ কোথায়? উগ্র লোভ এখানকার বন নষ্ট করেনি, ব্যবসাতে টাকা উপার্জনের জন্যে। বনকুসুমের সুগন্ধ, ঝর্ণার কলধ্বনি, পক্ষী-কূজন, অব্যাহত শান্তি ও পবিত্রতা—সব মিলিয়ে জায়গাটা যেন তপোবনের মত মনে হচ্চে। উনি যা বলচেন সে হিসেবে দেখলে সমগ্র গ্রহটাই তাহোলে একটা সুবিশাল তপোবন। পুষ্প সময় বুঝে আগের প্রশ্নটি এখানে আবার করলে। বল্লে—আপনি তাঁকে দেখেচেন প্রভু?

পথিক দেবতার মুখ সহসা সম্ভ্রমে ও ভক্তিতে কোমল হয়ে এল। তিনি বালকের মত সরল স্বরে বল্লেন—না।

—আপনিও দেখেন নি তাঁকে!

পুষ্পের স্বরে বিস্ময় ফুটে উঠেচে।

—আমি তাঁর রূপ দেখেচি তাঁর বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে. তাঁকে চোখে দেখা যায় আমি জানি। কিন্তু আমি তপস্যা করিনি তাঁকে সে ভাবে পেতে। আমি ভবঘুরে, তাঁকে দেখে বেড়াতে চাই তাঁরই সৃষ্ট লোক-লোকান্তরে। ভ্রাম্যমাণ আত্মা হয়েই আমার আনন্দ। তাই অনেকে আমাকে নাস্তিক বলে।

যতীনের হঠাৎ মনে পড়লো করুণাদেবীর কথা। তিনিও তাই বলেছিলেন।

পুষ্প বল্লে—প্রভু, এই গ্রহে স্ত্রীলোক আছে?

—কেন থাকবে না? নারী বিশ্বে শক্তির অংশ। এসো—দেখবে। গ্রহে এ অংশটাতে রাত্রি। অন্য অংশে দিনমান—এদের ঘর সংসার দেখাবো—খুব শান্ত জীবন-যাত্রা এদের। বহু প্রবৃত্তি ও বাসনার সঙ্গে, বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হয়ে অভিজ্ঞ হয়ে এ জন্মে পূর্বজন্মের জ্ঞান ও সংযমের প্রভাবে এরা সমাহিত ও আত্মস্থ হয়েচে।

—এদের সমাজ কেমন? ইচ্ছে করে প্রভু—জানি—

—এই গ্রহের কথা আমি ঠিক জানি না—তবে বিশ্বের এই অঞ্চলে এ রকম বহু গ্রহ আছে। সব উচ্চস্তরের জীবজগৎ। জীবে জীবে যুদ্ধ রক্তপাত নেই এই সব গ্রহে। অত্যন্ত পরার্থপর এখানকার মানুষ। পরের জন্যে প্রাণ দেবে। অনেক জাতি নেই, ভেদ-বুদ্ধি অত্যন্ত কম। সহজে খাদ্য মেলে স্থূল-দেহ ধারণের উপযুক্ত। আয়ু দীর্ঘ নয় কিন্তু, অল্প সময়ের মধ্যে বেশি কাজ করতে হয়—কাজেই আলস্যের স্থান নেই। অসার বস্তুতে লোভ নেই—যেমন অত্যন্ত খাদ্য সঞ্চয়, বড় আবাসবাটী, উজ্জ্বল পরিচ্ছদ—মান, যশ—অহংকার, অভিমান।

যতীন বল্লে—কিন্ত নারী রয়েচে যে প্রভু, ওরা থাকলেই—

পুষ্প ভ্রূকুটি করে বল্লে—কি রকম যতীনদা?

দেবতা হেসে পিতার ন্যায় সস্নেহে পুষ্পের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে বল্লেন—কন্যার মনে আঘাত দিও না—ও ঠিক বলেচে। ওরা থাকলেই হয় না গোলমাল। বাসনা থেকে পাপ, গোলমাল। এখানকার জীব বাসনা ক্ষয় করে এসেচে বহু জন্ম ধরে। এদের নিম্নস্তরের বাসনা জাগে না তীব্রভাবে। উচ্চজ্ঞানের, শিল্পের সংগীতের সাধনা বা ভগবৎসাধনা নিয়ে এরা থাকে। ভগবানের জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ-দর্শন এদের অনেকের হয়েচে। সুতরাং যে সব জিনিস জীবনে স্বপ্নের মত অস্থায়ী তাদের অসারত্ব এরা বুঝেচে। অত্যন্ত সাধু, নিস্পৃহ, সরল উচ্চস্তরের জীবন এখানকার—মানে, এই সব গ্রহের।

যতীন বল্লে—বাঃ, চমৎকার জীবন তো এখানকার—ইচ্ছে হয় জন্ম নিই—

দেবতা ওর দিকে চেয়ে বল্লেন—তোমাকে এখানে একদিন তো জন্ম নিতেই হবে।

এতদিন যা হয় চললো। কিন্তু তার মধ্যে বাড়ীওয়ালী নানারকম উপার্জনের ইঙ্গিত করেচে। এক মারোয়াড়ী লোহাওয়ালা তাকে দেখেচে দোতলার ছাদ থেকে—আশা যখন ওদের বাসায় তেতলার ছাদে কাপড় তুলতে গিয়েছিল। বেলঘরে না সোদপুরে তার বাগানবাড়ী, মস্ত বাগান— ইত্যাদি।

তাকে সদুপদেশও দিয়েচে—এই তো বয়েসখানা চলে যাচ্চে গো—আর দুটো বছর। তারপর কেউ ফিরে চাইবে? না বাপু। বলে, মেয়েমানুষের রূপ আর জোয়ারের জল। হ্যাঁ, দেমাক থাকতো যদি সোয়ামী পুত্তুর থাকতো। নিজের চেহারাটা আয়নায় দেখেচ একবার?

আশা একা ঘরে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে আছে—তার মনে যে নিরাশার অন্ধকার ছেয়েচে, কোনোদিন তা ফুটে আলো বেরুবার সম্ভাবনা আছে কি? হাতের পয়সা ফুরিয়েচে, আর বড়জোর দশটা দিন। তারপর?

গভীর রাত্রি কলকাতায়। আশা এখনও ঘুমোয়নি—দুশ্চিন্তায় ঘুম নেই চোখে।

যতীন আকুল হয়ে ওর শিয়রে বসে ডাকলে—আশা, আশা লক্ষ্মীটি—আমি এসেচি আশা—

পুষ্পও বসলো পাশে। পুষ্প যে ভবিষ্যৎ দেখচে, যতীন তা দেখবার শক্তি রাখে না। পুষ্প খুব দুঃখিত হোল। কর্মের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আশা-বৌদির সঙ্গে যতীনদার গাঁট-ছড়া বজ্র-আঁটুনিতে আঁটা। দুঃখ হয়, কিন্তু সে জানে, কিছু করবার নেই তার। সে এখানে গাড়ীর পঞ্চম চক্রের মত অনাবশ্যক। সে না থাকলেও কর্মের রথ দিব্যি চলবে।

যতীন বল্লে—পুষ্প, আমায় সাহায্য করো—

—ভাবচি।

—কি ভাবচো?

—ভাবচি তোমার অদৃষ্ট যতীনদা—

—এখন কি হেঁয়ালি উচ্চারণ করবার সময় পুষ্প?

হায়! সে যা বলতে চাইচে, যতীনদাকে যদি কেউ তা বুঝিয়ে দিতে পারতো! যতীনদা চিরকাল তাকে ভুল বুঝে আসচে, এখনও বুঝবে তা সে জানে। কিন্তু কি করবে সে, এ তারও অদৃষ্টলিপি।

পুষ্প দুঃখিত সুরে বল্লে—তা বলিনি। তুমি বল্লে বুঝবে না আমার কথা। আশা বৌদির এ অবস্থা দেখে—আমি মেয়েমানুষ—আমার কষ্ট হচ্চে না তুমি বলতে চাও? কিন্তু কিছু সাহায্য করতে পারবো না তুমি আমি। আশা বৌদিদির কর্মফল—এক ভগবান যদি বাঁধন কাটেন তবেই কাটে। তোমার আমার দ্বারা হবে না।

—এই রকম অবস্থায় ফেলে রেখে যাই কি করে তোর বৌদিদিকে—বল্ পুষ্প—তা পারি? যতীনের কাতর উক্তিতে পুষ্পের চক্ষুদুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো—আশালতার দুরবস্থার জন্যে নয়, অন্য কারণে। সে বল্লে—পৃথিবীতে থাকতে, উপকার করতে পারতে। এ অবস্থায় আমি তো কোনো উপায় দেখচিনে। আচ্ছা—দেখি—একটু ভাবতে দাও—

পুষ্প একটু পরে বল্লে—এখানে থাকবে না। চলো যতীনদা। এখান থেকে যেতেই হবে। নইলে তোমার আসন্ন বিপদ।

যতীন বল্লে—তুমি বড় ভয় দেখাও, পুষ্প। চলো করুণাদেবীর কাছে যাই, তাঁকে সব বলি।

—বলবে কি, তিনি অন্তরের কথা জানতে পারেন। ওঁরা হোলেন উচ্চ স্বর্গের দেব-দেবী। স্মরণ করলেই বুঝতে পারেন—কিন্তু সময় না হলে আসেন না। বৃথা দেখা দেন না। তা ছাড়া কলকাতার এই বিশ্রী পাড়ায় তাঁকে আমি এনে এর সঙ্গে জড়াতে চাইনে।

সারারাত যতীন ও পুষ্প আশার শিয়রে বসে রইল। পাশের একটা বাড়ীর খোলা জানালা দেখিয়ে বল্লে—দ্যাখো যতীনদা, ওখানে ওরা কি করচে! দেখে এসো না?

—কি?

—তুমি গিয়ে দেখে এসো, অমন জায়গায় যাবো না। দম বন্ধ হয়ে আসে।

যতীনের কৌতূহল হোল, সে গিয়ে দেখলে, কয়েকটি ভদ্রলোক, সাজে পোশাকে বেশ অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয়—একটি ঘরে বসে তাসের জুয়ো খেলচে। পাশের টেবিলে একটি বোতল, কয়েকটি গ্লাস—এক টিন সিগারেট, দু'চারটি শূন্য চায়ের কাপ ডিশ্—একটা বড় প্লেটে খানকতক অর্দ্ধভুক্ত পরোটা ও অন্য একটা পাত্রে কিছু ডালমুট। সিগারেটের ছাই ও ডালমুট ঘরের মেজের দামী কার্পেটের ওপর ছড়ানো—যদিও সিগারেটের ছাই ফেলবার পাত্র টেবিলের ওপর রয়েচে কিন্তু আধপোড়া সিগারেট আর সিগারেটের ছাইতে পাত্রটা বোঝাই। ওরা ছোট ছোট তাকিয়া পাশে রেখে একমনে খেলেই চলেচে। বিছানার পাশে রাশীকৃত দশটাকার নোট একটার পর আর একটা হিসেবে সাজানো, ওপরে একটা পেপারওয়েট্ চাপানো। ওরা মাঝে মাঝে বোতল থেকে ঢেলে মদ খাচ্চে, সিগারেট ধরাচ্চে, মাঝে মাঝে একখানা কাগজে পেন্সিল দিয়ে হারজিৎ-সূচক হিসেব রাখচে। এদের মধ্যে একজনের বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হয়েচে, দেখলেই বোঝা যায়, মাথার চুলে কালো রং খুঁজে বের করা কঠিন। ফুলফোর্সে মাথার ওপর ইলেকটিক পাখা ঘুরচে, দেওয়ালের ঘড়িতে রাত দেড়টা বাজে।

একজন ডেকে বল্লে—ও প্রমীলা,—টুসু—খাবার দিয়ে যাও।

দু'তিনবার ডাকের পর একটি সুন্দরী রমণী ঘুমু-ঢুলঢুলু চোখে একটা বড় প্লেটে কতকগুলো কাটলেট নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে বল্লে—নাও সব—রাত কম হয়নি, আমার ঘুম পেয়েছে—কাল আবার হাসপাতালের ডিউটি সকাল থেকে শুরু—

একজন বল্লে—সোডা ফুরিয়েচে—টুসু। লক্ষ্মীটি, একটা সোডা আমাদের যদি দিয়ে যাও—

আর একজন বল্লে—অমনি ওই সঙ্গে গোটাকতক পান—

সুন্দরী মেয়েটি রূপে ঘর আলো করেচে। ওর পরনে দামী সিল্কের শাড়ী, কাজ করা ব্লাউজ, অনাবৃত কণ্ঠদেশ, বক্ষঃস্থলে জড়োয়ার কাজ করা নেকলেস্ চিক্ চিক্ করচে। সে যেতে যেতে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কৌতুক-মিশ্রিত সুরে বল্লে—পারবো না এত রাত্রে পান সাজতে বসতে—

পঞ্চাশোর্দ্ধ বয়সের সেই লোকটি কপট মিনতির সুরে বল্লে—আমার দু'হাত বন্ধ, মুখের সিগারেটটা ধরিয়ে যদি দিয়ে যেতে টুসু—

যতীন সেখানে আর দাঁড়ালো না। পুষ্পকে এসে বল্লে—তাস খেলচে। তাসের জুয়ো—টাকা জিত্চে।

পুষ্প বল্লে—একবার দেখে এসেচি জানালা দিয়ে। ওরা অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক—দেখে মনে হয় টাকার ভাবনা নেই—অথচ টাকার এমন নেশা?

—তুমি এসব বুঝবে না পুষ্প। টাকার নেশা নয়, জুয়োর নেশা—

—ঐ হোল। ওই মেয়েটি কে?

—মেয়েটি টুসু। ভাল নাম যেন প্রমীলা—

পুষ্প হেসে বল্লে—তা তো বুঝলাম, ওদের কে? কি সম্বন্ধ ও বাড়ীর সংসারে?

যতীন কিছু বল্লে না, সরলা পুষ্প কত কথা জানে না সংসারে। ওর নিষ্পাপ মনে—দরকার কি?

পুষ্প আপন মনেই যেন বল্লে—কিন্তু ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ওর মধ্যে কেন? ওঁকে

দেখে কষ্ট হয়। এখনও ভোগের নেশা এত! পরকালের চিন্তা করবার সময় হয়নি আজও?

—তোমার মত সবাই হবে? বাদ দাও না, বাজে কথা বলো কেন?

পুষ্প দুঃখিত কণ্ঠে বল্লে—আমার বাবার মত দেখতে। সত্যিই কষ্ট হোল। ভগবানের দিকে মন দেবার ওঁর সময় যে পার হয়ে গেল!

—তোমার তাতে কি? বড্ড বাজে কথা তোমার পুষ্প—

—আশাবৌদি ঘুমিয়ে পড়চে।

—কি হবে ওর পুষ্প? সত্যি কথা বল। তুই আমার চেয়ে অনেক বেশি দেখতে পাস্।

—দেখতে পাই কে বলেচে?

—আমি সব জানি—

পুষ্প গম্ভীর সুরে বল্লে—কেউ কিছু নয়। মানুষের মিথ্যে অভিমান। তিনি যা করবেন, তাই হবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করি এসো দুজনে।

—এখানে?

—এখানেই। তাঁর নামে সব পবিত্র হয়ে যাবে। তিনি এখানেই কি নেই? কে বলেচেন নেই? তিনি তাঁর অসীম কৃপা ও করুণায় এই হতভাগিনী আশাবৌদির মঙ্গল করুন।

করুণাদেবীর বিনা সাহায্যেও আজকাল পুষ্প মহর্লোকের সর্বত্র যাতায়াত করতে পারে, এমন কি আরও ঊর্ধ্বতর লোক পর্যন্ত। যতীনকে অত উচ্চস্তরে কোনো শক্তিমান আত্মার বিনা সাহায্যে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে পুষ্প অনিচ্ছাসত্ত্বেও একাই মাঝে মাঝে যায়। সে বলে এতে অনেক কিছু সে দেখে, শোনে ও শেখে। অনেক ভাল ভাল আত্মার সংস্পর্শে এসে মানসিক ও আত্মিক শক্তির প্রসার হয়।

সেদিন যতীন ছাড়লে না, বল্লে—আমি যদি উচ্চস্তরে অজ্ঞান হয়ে পড়ি—তুমি সেখানে আমাকে ফেলে যেও। যতদূর জ্ঞান থাকে ততদূর নিয়ে যাও না? আমিও বেড়িয়ে দেখতে, জানতে ভালবাসি না কি ভাবচো? রেলভাড়াব টিকিট তো লাগচে না।

—দ্যাখো যতু-দা, এখনও পৃথিবীর ওই উপমা ও চিন্তার ধরনটা ছেড়ে দাও। তোমায় এই জন্যেই বারণ করি বার বার পৃথিবীতে যেতে। ওখানে নানা আসক্তি, ইচ্ছা, ভোগ-প্রবৃত্তি, সর্বত্র ছড়ানো রয়েচে পৃথিবীর আকাশে বাতাসে। স্থূল দেহ ভিন্ন ওই সব ইচ্ছা পূরণ করা যায় না। স্থূল জগতের স্থূল প্রবৃত্তি সূক্ষ্ম দেহে কি করে চরিতার্থ করবে? কাজেই ওই সব আসক্তি যেমন তোমার মনে আসন গেড়ে বসবে, তখনই তোমাকে স্থূল দেহ ধারণ করতে বাধ্য করবে। সুতরাং আবার পুনর্জন্ম।

—তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই তোমার মত।

—সে আমি জানি। সেজন্যেই তো তোমার জন্যে ভয় হয়—চলো তোমাকে মহর্লোকে নিয়ে যাই—

ওরা ব্যোমপথে অনেক ঊর্ধ্বে এমন এক স্থানে এল, যেখানে উচ্চলোকের জ্যোতির্ময় অধিবাসীদের যাতায়াতের পথ। তার পরেই এক অদ্ভুত সুন্দর দেশ; অতি চমৎকার বন-পর্বতের মেলা, বনকুসুমের অজস্রতা। অথচ এখানে কোনো অধিবাসী নেই, অনেক-দূর গিয়ে একটা নীল হ্রদ, চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। পুষ্প বল্লে—চলো যতু-দা, ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে একটি গ্রাম আছে, অনেক জ্ঞানী মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে বাস করেন—তোমায় দেখিয়ে আনি।

বনবীথির অন্তরালে শুভ্র স্ফটিকসদৃশ কোনো উপাদানে তৈরী একটি বাড়ী, দেখতে অনেকটা গ্রীক মন্দিরের মত। হ্রদের নীলজলেব এক প্রান্তে কুসুমিত লতাবেষ্টিত এই সুন্দর গৃহটি যতীনের এত ভাল লাগলো! এমন সুন্দর পরিবেশ আর্টিস্টের কল্পনায়

ছাড়া যতীন অন্তত পৃথিবীতে কোথাও দেখেনি। আপন মনেই সে বলে উঠলো—কি সুন্দর!

একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ ঘরের মধ্যে বসে। কিন্তু ঘরের আসবাবপত্র সবই অপরিচিত ধরনের। পৃথিবীতে ব্যবহৃত কোনো আসবাব সে ঘরে যতীন দেখলে না। লোকটিকে দেখেই মনে হোল অনেক উচ্চ অবস্থার আত্মা ইনি। ওদের অভ্যর্থনা করে বসিয়ে তিনি বল্লেন—তোমরা কোথা থেকে আসচো?

যতীন বল্লে—ভুবর্লোকের সপ্তম স্তর থেকে।

তিনি বিস্মিত হয়ে বল্লেন—না, তা কেমন করে হবে? তা হোলে তো আমাদের এই জনপদ, এই ঘরবাড়ী বা আমাকে কিছুই দেখতে পেতে না? নিশ্চয় তোমরা উচ্চতর স্তরের অধিবাসী।

যতীন বল্লে—এটা কোন্ লোক?

—মহর্লোকের প্রথম স্তর। ভুবর্লোকের অধিবাসীদের পক্ষে এখানকার বাড়ীঘর, মানুষ, বন, পর্বত সব অদৃশ্য। আমার অবস্থার আত্মা না হোলে আমার এ গৃহে আমাকে পাবেই না। মহর্লোক কোনো একটা স্থানও বটে, বিশেষ একটা অবস্থাও বটে। স্থান ও অবস্থার একত্র যোগ না ঘটলে এ লোকে চৈতন্য জাগরিতই হবে না যে। তা নয়, তোমাদের মধ্যে একজন কেউ উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েচ, নইলে এখানে আসতে পারতে না।

—সে এই মেয়েটি। আমি নই—

পুরুষটি হেসে বল্লেন—আমিও তা অনুমান করেচি।

পুষ্প সলজ্জ প্রতিবাদের সুরে বল্লে—আমি কি-ই বা—ওঁর জন্যেই—

যতীন বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলে—আপনি পৃথিবী চেনেন তো স্যার?

—আমি আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে পৃথিবীর অধিবাসী ছিলাম। সেই আমার শেষ জন্ম। সেবার ছিলাম গ্রীসে, তার পূর্বে দুই জন্ম ভারতবর্ষে ও একজন্ম সুপ্রাচীন মিশরে কাটাই।

—তার পূর্বে?

—তার পূর্বে পৃথিবীতে ছিলাম না। অন্য গ্রহে সৌর-জগতে বহু জন্ম নিয়েচি। কত অদ্ভুত গ্রহ আছে, অদ্ভুত জীবকুল আছে! বিচিত্র লীলা ভগবানের।

হঠাৎ পুষ্প বল্লে—আপনি ভগবানকে দেখেচেন, দেব?

—না।

—আপনি বিশ্বাস করেন তিনি দেখা দেন?

—না।

—আশ্চর্য! ভগবানে বিশ্বাস করেন না?

—তাঁর কোন রূপে আমার বিশ্বাস নেই, এই কথা বলচি। ভগবানকে তোমরা যে চোখে দ্যাখো, আমরা সম্পূর্ণ অন্য চোখে দেখি। তিনি অচিন্ত্যনীয় মহাশক্তি, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিরাজমান। দেহধারী হয়ে দেখাও দেন, আমার এই গ্রামের একটি মেয়ে প্রায়ই তাঁর দেখা পায়।

পুষ্প আশ্চর্য হয়ে বল্লে—তবুও আপনি বিশ্বাস করেন না?

—যে যেভাবে কল্পনা করে, তাকে সেইভাবেই তিনি দেখা দেন। এতে আমি বুঝি, এই তোমরাই আমার ভগবান হতে পার। নিত্যমূর্তি কি আছে তাঁর? সবই তাঁর মূর্তি —এই গাছপালা, এই বনভূমি, এই তুমি মেয়েটি—ঐ অনন্ত আকাশ, ব্রহ্মাণ্ডকুল—

কথা বলতে বলতে ভক্তি, জ্ঞান ও পবিত্রতার জ্যোতিতে তাঁর মুখের শ্রী হোল অপূর্ব; তীক্ষ্ন নীল আলোক বড় বড় চোখ দিয়ে কখনো ঠিকরে বেরুতে লাগলো—কখনো শান্ত

হয়ে আসতে লাগলো। ভগবানের কথায় তাঁর কণ্ঠস্বর ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে এল।

পুষ্প তার ভুল বুঝে বল্লে—আমায় ক্ষমা করুন দেব, আমি বুঝতে পারিনি আপনাকে। আপনি তাঁকে ভক্তি করেন।

যতীন বল্লে—পৃথিবীতে বহুদিন যান নি?

—পৃথিবীর বসন্তকালে পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে ফুল ফোটে, সেই সময় পৃথিবীর মহাঅরণ্যে পর্বত-সানুতে নদীতীরে বেড়িয়ে দেখে আসি। কখনো কোনো অসহায়া নারীর দুঃখ দেখি কোনো জনপদে, তার দুঃখ মোচন করবার চেষ্টা করি। নীলনদীর জ্যোৎস্নারাত্রে নির্জনতটে বসে ভগবানের ধ্যান করি। শুধু পৃথিবী নয়, বহু গ্রহে এমনি আমাদের যাতায়াত।

—আপনি যা করচেন, শুধু আপনাদের মত উচ্চলোকের অধিবাসীরাই তা করতে পারেন। আচ্ছা, পৃথিবীর মানুষের কর্তব্য কি?

—প্রেম—এক ওর মধ্যেই সব।

—আপনি একথা পৃথিবীতে প্রচার করেন না কেন?

—কতবার প্রচার করা হয়েচে! আমার চেয়ে উচ্চতর ও শক্তিধর দেবতারা মানুষের দুঃখে পৃথিবীর শত কষ্টের মধ্যেও দেহ ধরে একথা বলতে গিয়েছিলেন। স্বয়ং ভগবান অবতার গ্রহণ করে নেমে গিয়েচেন বলতে। প্রেম—একটি কথা। কেউ শোনেনি।

—তাহোলে কি আপনারা হাল ছেড়ে দেবেন?

—অদ্ভুত চরিত্র ভগবানের। বার বার সুযোগ দেন। বিরক্ত হন না। অপূর্ব তাঁর ধৈর্য, অপূর্ব তাঁর ক্ষমা। অন্য কেউ হোলে আর সুযোগ দিত না—কিন্তু নাছোড়বান্দা তিনি। আবার লোক পাঠান অদ্ভুত ধৈর্যের সঙ্গে। তোমাদের পৃথিবীতে ভগবানের তুল্য অবহেলিত প্রাণী আর কে? কেউ তাঁর কথা ভাবে না।

এই পর্যন্ত বলেই অপূর্ব ঈশ্বরীয় প্রেমে মহাপুরুষের চোখ দুটি নক্ষত্রের মত জ্বল জ্বল করতে লাগলো। পুষ্প শ্রদ্ধায় উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে বল্লে—আপনি ঠিক বলেচেন দেব, পৃথিবীতে কেউ ভাবে না ভগবানের কথা। যে ভাবে সেও টাকা চায়. সাংসারিক সুখ চায়। প্রেমভক্তি দুর্লভ হয়ে পড়েচে।

মহাপুরুষ বল্লেন—প্রেমভক্তি ছেড়ে দাও। ও অনেক উঁচু কথা। অতি সাধারণ ভাবেও ক'জন ভগবানের চিন্তা করচে। আমি পৃথিবীতে যাই. জনপদে বা তোমাদের বড় বড় নগরে যাই না। দুর্নিবার লোভ, অর্থাসক্তি ঐশ্বর্য-কামনা, নারী, সুরা. কাম, হিংসা-দ্বেষ বাতাসে ছড়ানো ঘন ধোঁয়ার মত। ভাই ভাইএর বুকে ছুরি বসাচ্চে। সত্য বিদায় নিয়েচে। পৃথিবীর এখনকার দর্শন হচ্চে খাওয়া-পরার দর্শন। কিসে ভালো খাবো, ভাল পরবো। আমি আপন মনে মরুভূমিতে বেড়াই জ্যোৎস্নারাত্রে, হিমালয় কি অন্য কোন পর্বতচূড়ায় বসে থাকি, নীলনদ বড় ভালবাসি তার তীরে একা বসে থাকি। অথচ এক কথা—প্রেম, এই যদি ওরা শিখতো—জীবে প্রেম, ভগবানের প্রেম!

তিনি এই পর্যন্ত বলে চুপ করতে পুষ্প বল্লে—বলুন দেব, অমৃতের মত বাণী আপনার।

—আমার? আমার কিসের কন্যা? এ বাণী স্বয়ং ভগবানের। তিনি অনেক উঁচু, তাই মানুষের দেহ ধরে পৃথিবীতে গিয়ে একথা বলে এসেছিলেন। কেন না মানুষের দেহ ধরে না গেলে মানুষের সাধ্য কি যে অসীমকে গ্রহণ করে? একবার নয়, বার বার গিয়েছিলেন। ক্লান্তিহীন তাঁর আশীর্বাদ। কিন্তু কে শুনচে? ধনজনের মোহে, লোভের মোহে, বিলাসের মোহে—স্থূল ভোগের মোহে সবাই উন্মত্ত। একবারও যদি নির্জনে উচ্চতর সত্যের ধ্যান করতো মানুষে!

যতীন মুগ্ধ হয়ে শুনছিল। আজ এখানে আসা তার সার্থক হয়েচে বটে। সে বল্লে —তবে কি তাদের উদ্ধার নেই, দেব?

—একটা কথা মনে রেখো। জোর করে মানুষের ওপর কোনো সত্য, কোনো বাণী চাপানো যায় না। মানুষ তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ভগবানের বাণী অন্তরালে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করে। বুদ্ধিহীন বা স্থূলবুদ্ধি ভোগাসক্ত মন হঠাৎ ভগবানকে গ্রহণ করতে পারে না! পারলেই যে মুক্তি—যে ভগবানকে ভালবাসে, সে ভগবানের সমান হয়ে যায়। এত সহজে তা হবে কোথা থেকে? কাজেই মহাযুগ মন্বন্তর চলে যায় স্বাভাবিক নিয়মে মানুষের মুক্তি পেতে। স্বারোচিষ মন্বন্তরে যারা মানুষ হয়ে জন্মেছিল পৃথিবীতে সর্বপ্রথম—এইবার তারা মানব-আবর্ত কাটিয়ে দেবযান-পথে মহর্লোকে যেতে শুরু করচে। ওদের এতদিন পরে পৃথিবীতে গতাগতি শেষ হোল।

—এর চেয়ে আগেও হয়?

—তুমি বুঝলে না—এ তো হোল স্বাভাবিক নিয়মে, লক্ষ বৎসর পরে। এক জন্মেই মুক্তি হয়—যদি সত্যের জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগে, ভগবৎপ্রেমে বহ্নিশিখা জ্বলে ওঠে মনে। এদের জন্যে ভগবান কত সাহায্যের ব্যবস্থা করেচেন, তা যদি জানতে! যে সত্যকে জানতে চায়, ভগবান তাকে জানবার সব রকম সুযোগ দেন। চলো তোমাদের একটা জিনিস দেখিয়ে আনি—ক'দিন থেকে আমি দেখছি তোমাদের পৃথিবীতে—

যতীন ও পুষ্পকে নিয়ে সেই উচ্চলোকের পুরুষটি চক্ষের নিমিষে পৃথিবীতে নেমে এলেন। সুন্দর জ্যোৎস্নারাত্রি পৃথিবীতে, ভারতবর্ষে। যে নদীতীরে এসে ওঁরা দাঁড়ালো, সে নদীটি খরস্রোতা, তীরে শস্যক্ষেতের মধ্যে এক জায়গায় বড় একটা গাছ। পুষ্প ও যতীন নদীটি চিনতে পারলে না। বৃক্ষের তলে একটি তরুণ যুবক ধ্যানমগ্ন। যুবকের রং টকটকে গৌর, মুখের চেহারা লালিত্যপূর্ণ, বেশ বড় বড় চোখ—কিন্তু এই অল্প বয়সেই সে দাড়ি রেখেচে—রেশমের মত নরম, চকচকে দাড়ি। যতীনের মনে হোল যীশুখ্রীষ্টের ছবির মত মুখখানা ওর দেখতে।

পুষ্প জিজ্ঞেস করলে—এ কি নদী দেব?

—এ রাভি নদী। এটি ভারতবর্ষের পাঞ্জাব প্রদেশ। ছেলেটির বাড়ী ওই জনপদে, সবাই ঘুমুলে গভীর রাত্রে নদীতীরে বৃক্ষতলে ও রোজ একা এসে ভগবানের চিন্তা করে, গান করে আপন মনে। ওই দ্যাখো ওর মা খাবার দিয়ে যায় এ সময়—আসচে—

একটি মেয়ে—মেয়েটি প্রৌঢ় বটে, কিন্তু সুন্দরী—দূরের গ্রাম থেকে একটা পাত্রে খাবার নিয়ে এসে ছেলেটির সামনে রাখলে। জিজ্ঞেস করলে—বাড়ী যাবি?

ছেলেটি বল্লে—তুমি যাও মা, আমি এক ঘণ্টা পরে যাবো।

—ঠাণ্ডা লাগাস্‌নে বেশি, বাচ্চা।

ওর মা সন্দেহে ছেলের দিকে দু'তিন বার চেয়ে যে-পথে এসেছিল সেই পথে চলে গেল এবং অতি অল্পক্ষণ পরে এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়লো যতীন ও পুষ্পের। আকাশপথ আলো হয়ে উঠলো ক্ষণকালের জন্যে এবং সেই আলোর রেখা ধরে এক দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ নেমে এসে ওই ধ্যানরত যুবকের পাশে দাঁড়ালেন। আগন্তুক দেবতার রূপে ও দেহজ্যোতিতে স্থানটি যেন আলো হয়ে উঠলো, যদিও যুবকটি তার কিছুই বুঝতে পারলে না।

পুষ্প ও যতীন সবিস্ময়ে বল্লে—উনি কে?

—উনি সত্যলোকের প্রাণী। পৃথিবীতে ওঁরা তো দূরের কথা, আমাদেরই আসতে কষ্ট হয়, অথচ দ্যাখো ওই সত্যপ্রিয় ভগবদ্ভক্ত যুবকটিকে প্রেরণা দিতে নিজে এসেচেন। যেখানে ভগবানের নামগান হয় সেখানে ভগবান স্বয়ং আসেন—এ তোমরা অবিশ্বাস ক'রো না।

তারপরে ওরা তিনজনেই দূর থেকে সত্যলোকের সেই মহাপুরুষকে প্রণাম করলে। তিনি ওদের দিকে চেয়ে সদয় হাস্য করলেন ও দুটি আঙুল ওপর দিকে তোলার ভঙ্গিতে আশীর্বাদ করলেন। পুষ্পর চোখে জল এল। কি সুন্দর রূপ দেবতার।

পরক্ষণেই তিনি অন্তর্হিত হয়ে গেলেন।

পুষ্পদের সংগী পুরুষটি বল্লেন—দেখলে? নীলনদের তীরে বহু হাজার বৎসর পূর্বে যাপিত আমার একটি গোপন রাত্রির কথা আজও আমার মনে হয়। একা ছিলাম সে রাত্রে। বসন্তকাল ছিল, পুষ্পিত হয়ে ছিল নদীতলের ওষধি ও বনতরুরাজি—ক্ষুদ্র একটি পর্বতের চূড়ায় নদীর অপর পারে আমি জ্যোতির্ময় আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি। আমার সারাজীবন পরিবর্তিত হয়ে যায়—দশ জন্মের প্রগতি একজন্মে সাধিত হয়। ভগবানের কৃপা নইলে হয় কি? কিন্তু তার জন্য ক্ষেত্র তৈরী হওয়া দরকার। পরকে ভালবাসো, জীবকে সেবা করো। আসক্তি ত্যাগ করো। ভগবানে মন দাও। মনের কুয়াশা না কাটলে সত্যের আলোকপাত কি হয়?

—আপনারা দয়া করুন পৃথিবীর জীবকে—তাহোলেই হবে।

—আমার ইচ্ছা আছে, আর একবার পৃথিবীতে দেহধারণ করবো। যা পারি প্রচার করে করে আসি।

—পৃথিবীতে গিয়ে ভুলে যাবেন না?

—দেহ ধরলেই বিস্মৃতি আসে। তবে তার ব্যবস্থা আছে। অন্য দিব্য পুরুষেরা গিয়ে আমায় বাল্যে ও যৌবনে নানাভাবে মনে করিয়ে দেবেন। ওঁরা দেখা দিতে পারেন আমায় স্বপ্নে কিংবা রাত্রিকালে, নয়তো ঘটনার এমন যোগাযোগ ঘটাবেন যে আমার আত্মা ক্রমশ জেগে উঠে বুঝতে পারবে পৃথিবীতে সে কেন এসেচে; ভোজ খেতে, নারী ও সুরা নিয়ে আমোদ করতে আসেনি। ভগবানের বিশ্বে এসবের ব্যবস্থা আছে—যে ভাল কাজ করতে চায়, তাকে সাহায্য দেওয়া হয়। তিনি যে বিরাট মহাশক্তি, সেই শক্তিকে তুষ্ট করতে পারলে জীব পলকে প্রলয় করতে পারে, অসাধ্য সাধন করতে পারে, মহাশক্তির সদয় সাহায্য সে পায়। এ রহস্য কে বোঝে? পৃথিবীতে সবাই অর্থ নিয়ে ব্যস্ত, সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট এই করুণাময়ী মহাশক্তির রহস্যভেদ করতে ব্যস্ত ক'জন?

পুষ্প বল্লে—প্রভু, আপনি বলছিলেন আপনার গ্রামে একটি মেয়ে ভগবানের দেখা পায়—সে কি রকম?

—সে উচ্চ অবস্থার মেয়ে। তার শেষ জন্ম হয় পৃথিবীতে, সাতশো বছর পূর্বে। মানব-আবর্ত কাটিয়েচে। স্বামী-ভাবে ভগবানকে চিন্তা করে। ভগবানের দেখা পায় সেইভাবে। আমি জানি ভগবানের এসব মায়িক রূপ। তাঁর রূপের কি কোনো সীমা আছে? ভগবানকে যে আন্তরিকভাবে ডাকে, তিনি তার কাছে যাবেনই। যে রূপে চায়, সে রূপেই যাবেন। এ একটা অমোঘ নিয়ম। যেমন চুম্বকের কাছে লোহা ছুটে যাবেই —তেমনি। ভগবান যাবেনই ভক্তরূপ চুম্বকের কাছে। তাঁকে টেনে নেবে আকর্ষণ ক'রে। ভগবান লোহা, ভক্ত চুম্বক। এ ওকে টানচে ও একে টানচে। পৃথিবীর লোককে এ সকল কথা বিশ্বাস করানো কঠিন। বিশ্বাস করলে তো মানুষ আর মানুষ থাকে না, ভগবান হয়ে যায়।

ওরা সব মহর্লোকের সেই গ্রামটিতে ফিরে এল। তারপর তিনি ওদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন আবাস-বাটী দেখালেন জনপদের। পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে নানা রঙের ফুল, কোনো স্থানে কোনো অপার্থিব পশুর মূর্তি, স্ফটিকে তৈরি। কোথাও বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী, কোথাও সরোবর। দূরে দূরে এইসব বনবীথি ও উদ্যানের মধ্যে মধ্যে অতি সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ ও অট্টালিকা। শুভ্র স্ফটিক প্রস্তর ছাড়া অন্য কোনো উপাদান

এই প্রাসাদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়নি। গাছে গাছে কুসুমিত লতা মালার আকারে জড়িয়ে, আরতির পঞ্চপ্রদীপের শিখার মত কোনো কোনো রক্তবর্ণ পুষ্প ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ফুটে আছে। জনপদের কিছুদূরে নিভৃত অরণ্য শিলাবাঁধানো পথের দুপাশে, অথচ সে সব অরণ্যে জুঁই, গোলাপ, কাঞ্চন ফুলের মত দেখতে আলোর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীর আকারের সুগন্ধি বনকুসুম অজস্র ফুটে আছে। পাহাড়ের কোলে গুহা ও প্রস্তরনির্মিত মন্দির —যেন বহুকালের বলে মনে হয়।

ওদের সঙ্গী বল্লেন—ওই সব গুহাতে মহর্লোকের প্রাচীন সাধুরা ভগবানের চিন্তাতে নিমগ্ন থাকতেন। এখন বহুদূর পথে, অনেক ঊর্ধ্বলোকে তাঁরা চলে গিয়েচেন, পৃথিবীর হিসেবে হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। এখন ওগুলি তীর্থস্থান হিসেবে বিদ্যমান আছে, তবে ওই বনস্থলী, নিভৃত গিরিগুহা ও মন্দিরগুলিতে বসলেই আত্মা স্বভাবত অন্তর্মুখী ও আবৃতচক্ষু হয়ে নিজের হৃদয়কন্দরের অন্ধকার গহনে ডুব দিয়ে নিজের স্বরূপ বুঝতে উন্মুখ হয়ে ওঠে।

যতীন বল্লে—আচ্ছা, আপনাদেরও কি ধ্যানধারণা সাধনার প্রয়োজন হয়?

—আমরা তো অনেক নিম্নলোকের জীব! সত্যলোকের ঊর্ধ্বস্তরের দিব্য মহা-জ্যোতির্ময় ব্রহ্মস্বরূপ জীবেরাও ধ্যান ও সাধনা দ্বারা আত্মশক্তি উদ্বুদ্ধ করেন। ভগবানের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ সাধিত করেন। আমরা ধ্যান-ধারণা দ্বারা জন, তপঃ ও সত্য-লোকের অধিবাসীদের সঙ্গে আদানপ্রদান চালাই। তাঁদেব অদৃশ্য সাহায্য প্রার্থনা করি।

—তাঁরা কি আপনাদের কাছেও অদৃশ্য?

—সম্পূর্ণ। বিনা ধ্যান-ধারণায় তাঁদের মত উচ্চ জীবদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ সম্ভব নয়। আমাদের চোখে তাঁরা সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

—তাঁদেরও ঊর্ধ্বে লোক আছে?

—আছে, অনেক আছে। সত্যলোকেরই ঊর্ধ্বতন স্তরের জীবেরা ঐ লোকের নিম্ন স্তরের জীবদের নিকট অদৃশ্য। তার ঊর্ধ্বে ব্রহ্মলোক তার ঊর্ধ্বে সর্বলোকাতীত পর-ব্রহ্মলোক বা গোলক।তারও ঊর্ধ্বে নির্গুণ ব্রহ্মলোক—কিন্তু সেখানকার খবর কেউ দিতে পারে না—কেউ জানে না। এসব লোকের তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য—সাধারণ জীবেরা এর খবর রাখে না বা তাদের কোনো আবশ্যকও নেই এসবে। তবে আমারও এইসব লোক সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই—কারো থাকে না। ঊর্ধ্বলোকের কোনো কোনো দেবতা দয়া করে দেখা দিয়ে যেমন বলেচেন, তেমনি জানি।

—গ্রাম নগর বেঁধে বাস করেন কেন?

—আমরা বহুযুগ পূর্বের আত্মা। আমাদের সমসাময়িক আত্মা এ লোকে আর নেই। আমরা পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরে উন্নতিলাভ করচি। নিজেদের মনের সাহায্যে এই জনপদ নির্মাণ করে একত্রে বাস করি, ভগবানের উপাসনা ধ্যানধারণা করি—সাধ্যমত পৃথিবীতে বা অন্য গ্রহে গিয়ে স্থূল জগতের জীবদের উপকার করবার চেষ্টা করি। পৃথিবীতে যেমন গ্রাম জনপদ, সূক্ষ্ম জগতের এই সব জনপদ, বনবীথি, উদ্যানেরই প্রতিচ্ছায়া মাত্র সে সব। তাদের বিকার আছে, এদের বিকার নেই।

পুষ্প বল্লে—ভগবানকে স্বামী রূপে পেয়েচে সেই মেয়েটিকে একবার দেখাবেন না? ওঁর ভাগ্য অদ্ভুত তো!

দেবতা হেসে বল্লেন—ও সব হোল নারীর সাধনা। প্রেমভক্তির সাধনা—ভগবানের মায়িক রূপে দেখা পায়। তুমিও দেখা পেতে পারো কন্যা, যদি তোমার প্রেম জন্মে থাকে তাঁর প্রতি। ভগবান কল্পতরু-স্বরূপ, যথার্থ পিপাসু ও আকুল ব্যক্তিকে নিরাশ করেন না। তবে আমি ওগুলোকে পুতুলখেলা বলে বিবেচনা করি। নারীর ধর্ম, পুরুষের নয়।

পুরুষ হবে জ্ঞানী, বীর, ত্যাগী।

পুষ্প বল্লে—কিন্তু মনে রাখবেন দেব, ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমভক্তির সাধনা শিখিয়েচেন—

—জ্ঞানেরও, কর্মেরও। তাঁতে তিনেরই অপূর্ব সমন্বয়।

—শ্রীকৃষ্ণকে আপনি যাই বলুন, তিনি প্রেমের দেবতা। প্রেমময়, ভাবময়, সৌন্দর্যময়—এই তাঁর আসল রূপ।

—তুমি নারী, তোমার পক্ষে ওই ভাবই স্বাভাবিক বটে। তবে জেনে রেখো, জগতের বহু গ্রহে বহু জীবকুল বাস করে। ভগবান প্রত্যেক গ্রহে অসীম বিশ্বের সমস্ত জীবকুলের সম্মুখে তাদের ভাবানুযায়ী মায়িক রূপ নিয়ে দেখা দেন। তিনি অসীম, অনন্তরূপী, তাঁর কোনো শেষ নেই! কত লক্ষ শ্রীকৃষ্ণ আছেন, কত লক্ষ রামচন্দ্র আছেন তোমাদের পৃথিবীর তাঁর মধ্যে—একথা মনে রেখো।

—তাতে কি। সসীম মানুষ তাঁর কোটি কোটি মায়িক রূপ ধারণা করতে পারবে না! একটিমাত্র সুন্দর রূপের ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করুক। তাহোলেই তাঁকে পাবে তো?

—নিশ্চয়। এ তো হোল সহজ পথ। ভক্তির পথ সহজ পথ, নারীর পথ। জ্ঞানের পথ বীরের পথ, পুরুষের পথ—সে কথা তোমাকে তো আগেই বলেচি। ভগবানকে পাবে—ও পথেও, এ পথেও।

পুষ্প বল্লে—সেই সহজ সুন্দর পথের সহজ সুন্দর দেবতা শ্রীকৃষ্ণ যদি আমার মনের গোপন মন্দিরে বিরাজ করেন, তবে আমার জন্মমরণ ধন্য হবে, দেব। জীবনের এপারে বা ওপারে আর কিছুই চাইনে।

এই সময়ে একটি সুন্দরী নারী সেখানে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ অপূর্ব দিব্যভাবপরিপূর্ণ। অঙ্গকান্তি তরল জ্যোৎস্নার মত, বড় বড় চোখ দুটিতে অসীম সারল্য ও অন্তর্মুখিতা। মহাপুরুষ পুষ্পের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বল্লেন—এই সেই কন্যা। এর নাম সুমেধা—ভারতবর্ষেরই কন্যা—

পুষ্প প্রণাম করে বল্লে—দেবি, ভগবানের সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল—

নারী হেসে বল্লেন—আমি সব শুনেচি—তাঁর স্বরূপ কি শুনবে? আমি খুব ভাল করে দেখেচি। তিনি বালকস্বভাব, পথের বাঁকে বসে থাকেন উৎসুক হয়ে, ধরা দেবার জন্যে। কিন্তু তাঁর পেছনে ছুটতে গেলে তিনি বালকের মত হেসে ছুটে দূরে পালিয়ে যান—

যতীন অভিভূত ও মুগ্ধভাবে বলে উঠলো—বাঃ মা, বাঃ, কি সুন্দর অনুভূতির কথা!

পুষ্পও মুগ্ধদৃষ্টিতে সেই অনিন্দ্যসুন্দরী লাবণ্যময়ী ভাবময়ী নারীর দিকে চেয়ে রইল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে বল্লে—তারপর? তারপর?

—তারপর কি জানো? সেই সময় যদি তুমি হতাশ হয়ে ছুট দেওয়া বন্ধ করো—তবে ভগবান নিরাশ হবেন, দাঁড়িয়ে যাবেন, বালকের মত। তিনি চান জীব তাঁর পেছনে পেছনে খানিক ছোটে, হাঁপায়। ভগবান জীবের সঙ্গে বালকের মত খেলা করেই মহাখুশি। না থেমে তবুও ছুটলে ভগবান শেষে অকারণেই আবার ফিরে আসবেন, হাসতে হাসতে ধরা দেবেন। অতএব ভগবানকে নিরাশ করো না, তাঁকে একটু জীবকে নিয়ে খেলা করতে দাও—তিনি বড্ড একা—

দেবীর চোখ স্নেহে ও প্রেমে ছলছল করে উঠলো।

পুষ্প বল্লে—চমৎকার! আজ অতি সুন্দরভাবে বুঝলাম, সহজভাবে বুঝলাম! আপনার অনুভূতি সহজ বলেই সহজভাবে বুঝেচেন তাঁকে।

যতীনের মন পুষ্পের এ কথায় সায় দিলে।

ওদের সঙ্গী কিন্তু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন উদাসীনের মত—যেন তিনি এসব ভাবালুতার বহু ঊর্ধ্বে, জ্ঞান ও তপস্যার দৃঢ়ভূমির উপর স্বপ্রতিষ্ঠ।

যতীন ও পুষ্প তাঁকেও প্রণাম করে বিদায় প্রার্থনা করলে।

মেয়েটি ওদের হাসিমুখে বল্লে—আবার এসো তোমরা। আমি এখানে শীগ্গির উৎসব করবো—বনকুসুম-উৎসব। জনলোকের অনেক নারীপুরুষ আসে, সবাই বনফুলের মালা দেন আমার বিগ্রহের গলায়। আমি তোমাদের নিমন্ত্রণ পাঠাবো।

পুষ্প বল্লে—দেবি, কল্প-পর্বতের সঙ্গীত শুনতে যান না আপনি? আবার তো সেদিন আসচে। আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

—আমি প্রতিবারই যাই। আমাদের গ্রামের সকলেই যায়। ভগবানের প্রতি অনুরাগ জন্মায় ওই সঙ্গীত শুনলে—অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতির দরজা খুলে যায় বলে অনেক উচ্চস্তরের নরনারী আসেন সেদিন। যেও সেখানে—আমিও যাবো।

গ্রামের প্রান্তে বনবীথির অন্তরালে একটি শুভ্র স্ফটিকের মন্দিরে মেয়েটি ওদের দুজনকেই নিয়ে গেল। সেখানে পা দিয়েই পুষ্প বুঝতে পারলে এ অতি পবিত্র স্থান—দেবতার আবির্ভাব দ্বারা এর অণু-পরমাণু ধন্য ও কৃতার্থ হয়ে গিয়েচে, এখানে এসেই তার মনে হোল এখানে নির্জনে বসে ভগবানের চিন্তা ও ধ্যান করি। রঘুনাথ দাসের আশ্রমের মত এর পুণ্যময় প্রভাব।

মেয়েটি হঠাৎ বল্লে—সমুদ্র দেখবে ভাই?

পুষ্প অবাক হয়ে বল্লে—কোথায়?

—ওই দ্যাখো—

পুষ্প সত্যই দেখলে, সেই বনবীথির ওপারে বিশাল সুনীল মহাসাগর ঢেউ এর ওপর ঢেউ তুলে বহুদূরে দিগন্তে মিশে গিয়েচে—কোনো কূল নেই, কিনারা নেই। তার অনন্ত জলরাশির ওপর নীল মহাব্যোমের প্রতিচ্ছায়া—সে এক অদ্ভুত দৃশ্য, সমুদ্রতীরে এক শিলাখণ্ডে বিশালবৃক্ষতলে মেয়েটি ওর হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বসালে। পুষ্পের মনে হোল ওর সমস্ত সত্তা এই আনন্দ মহাসমুদ্রের কূলরেখা ধরে বহুদূরে অনন্তে বিলীন হয়ে যাচ্চে, জগৎস্বপ্ন যেন লয় হয়ে যাচ্চে স্বসংবেদ্য আত্মানুভূতির শান্ত গভীরতায়। মেয়েটি খিল খিল করে হেসে উঠলো মুখে আঁচল দিয়ে। কি মধুর হাসি তার সুন্দর মুখের। বল্লে—কেমন ঠকিয়েচি ভাই?

পুষ্প বল্লে—সমুদ্র কোথা থেকে এল এখানে? আমিও তাই ভাবচি।

—সমুদ্রতীরে এই গাছতলায় বসলে তাঁর কথা বড় মনে হয়—তাই তৈরি করে রেখেচি।

—সব সময় থাকে?

—সব সময়। তবে অন্য কেউ আমার মনের ভূমিতে না পৌঁছুলে দেখতে পায় না। আমার কাছে সর্বদাই সত্যি—অন্যের কাছে অবাস্তব।

—এ গ্রামের অন্য লোকের কাছেও?

—আমি ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। তুমি ভাই ভালবাসবে বলে তোমাকে আমার ভূমিতে নিয়ে এসে দেখালাম। বলো ভালো?

—আপনাকে আমি কি বলে ধন্যবাদ দেবো জানিনে দেবী। কত ভালো যে লাগচে এই বন, এই পাথরের বেদী, এই নীল সমুদ্র—এখানে ভগবানের আসাযাওয়ার পায়ের চিহ্ন আছে।

—আছেই তো। উনি যে আসেন লুকিয়ে আমার কাছে। জানো না ভাই?

মেয়েটির গলার সুরে পুষ্পের মমতা জাগালো। শ্রদ্ধাও। এই শিলাস্তৃত সমুদ্র-বেলায় দেবতার শুভংকর আবির্ভাবের কথা লেখা রয়েচে। পুতুলখেলা হয়তো। হোক্

পুতুলখেলা। সে নারী, এই তার ভাল লাগে।

সে হঠাৎ একটা প্রশ্ন করলে—আচ্ছা, একটা কথা বলুন। মেয়েরা কি খারাপ? পৃথিবীতে কেন একথা সাধু-মহাজন বলে এসেচেন?

—মেয়েরা সাধনপথের বিঘ্ন, তাই।

—কেন?

—বিভ্রান্ত করে দেয় পুরুষের মন। প্রকৃতির কাজ করবার জন্যে মায়ার সৃষ্টি করে। পুরুষেরা মজে অতি সহজেই। সখি, তোমার এই মুখখানি নিয়ে এই মহর্লোকেই একবার পরীক্ষা করে দ্যাখো না?

—সত্যি আমরা কি এতই হেয়?

—হেয় বা খারাপ এমনি হয়তো কিছু না, বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া। যে ভগবানকে পেতে চায়, যে জ্ঞানের সাধনা করতে চায়, ভক্তির সাধনা করতে চায়—সে নারী থেকে দূরে থাকবে এই বিধান। অন্য লোকে যত খুশি মিশুক—কে বারণ করচে? সাধনার পথের পথিক যারা নয় তাদের কি বাধা আছে নারীসঙ্গের? নারী প্রেমের সাধিকা হয় অতি সহজে, পুরুষে তা পারে না। নারী পাপের পথেও নিয়ে যায়, কল্যাণের পথেও নিয়ে যায়। কারণ, চিত্তনদী উভয়তোমুখী, বহতি পাপায়, বহতি কল্যাণায়। খুব সাবধানে না চললে সর্বনাশ আসে ওদের থেকে। সাপ খেলাতে সবাই জানে না। আনাড়ি সাপুড়ে সাপের হাতে মরে।

—স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ কি চিরকালের?

—যেখানে প্রেম থাকে। নয়তো কিসের সম্বন্ধ? যেখানে প্রেম আছে, প্রেমের দেবী মিলিয়ে দেন। স্বামী-স্ত্রী না হোলেই বা কি। প্রেম নিয়ে বিষয়—কিন্তু এ ধরনের প্রেম সাধনালব্ধ বস্তু। দেহের বা রূপের মোহ এ প্রেমের জন্ম দিতে পারে না। রূপজ প্রেম দিয়ে প্রকৃতি তার কাজ করিয়ে নেয় মাত্র।

—আপনি কি করে এসব জানলেন?

মেয়েটি হেসে বল্লে—কত যে ঠকেচি ভাই কত শত জন্ম ধরে। কত নেমে গিয়েছিলাম কত ভুগেছিলাম—জন্ম-জন্মান্তরের সে সব স্মৃতি ও সংস্কার আমাকে জ্ঞানী করেচে। একজন্মে দুজন্মে সাধু হওয়া যায় না ভাই—মহর্লোকেও আসা যায় না—

—আবার আপনি জন্মাবেন?

—পৃথিবীতে আমার শেষ জন্ম হয় বহুকাল আগে—পৃথিবীর সে হিসেব ভুলে গিয়েচি। আর সেখানে যাবো না। ভগবান আমায় দয়া করেচেন।

—যদি আপনার মত মেয়ের দরকার হয় পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার?

—সে অবস্থায় ভগবানের নির্দেশ পাবো। জীবের সেবা করবার ভার—সৌভাগ্যের কথা সে। তিনি যদি আমায় না ছাড়েন ভাই, নরকে যেতেই বা কি? উনি হাত ধরে নিয়ে গেলে নরক আর বলি কোথায়! কিসের স্বর্গ কিসের নরক? থাকুন তো উনি আমার সঙ্গে!

মেয়েটির চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো দর-দর ধারে।

পুষ্প অবাক হোল ওঁর অনুভূতির তীব্রতায়। শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে ভ'রে উঠলো তার মন।

মেয়েটি আবার বল্লে—ভগবান এই আলোর কমল বিশ্বজগৎ হয়ে ফুটে আছেন। তাঁর করুণার আলো। কাউকে তিনি ভোলেন না, অবহেলা করেন না ভাই—তাঁর মত প্রেমিক কে? যে ডাকে, যে তাঁর শরণ নেয়, তিনি তারই দোরে ছুটে যান, পাপী পতিত মানেন না। কিন্তু ভাই, কেউ কি তাঁকে চায়?

সমুদ্রতীরের বিশাল বৃক্ষতলে নীল ঊর্মিমালার দিকে চেয়ে ওরা দুজন দাঁড়িয়ে। মেয়েটি সুন্দর ভঙ্গিতে হাত তুলে দূরে দেখিয়ে বল্লে—ওই মহাসমুদ্রের মত অন্তহীন তাঁর করুণা! কেউ বুঝতে পারে না, বলে তাঁকে নিষ্ঠুর। তিনি দু'তিন জন্মের মঙ্গল করেন একজন্মের কর্মক্ষয় ক'রে। পৃথিবীর লোকে সদ্য সদ্য ফল চায়। বোঝে না তিনি কি করতে চাইচেন। ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে অনেক সময় আসে তাঁর করুণা। কাজেই অবুঝের গালাগালি তাঁকে সহ্য করতে হয়।

পুষ্প বল্লে—আপনি দেবী, কি আনন্দ হোল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। আমার সঙ্গী মহর্লোকে বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না, জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন। আজ আমি যাই—

—আবার এসো ভাই, আসবে ঠিক? আমার পায়ে হাত দেওয়া কি ভাই? তুমিও তো কম নও। আমি তোমাকে চাই। এসো—আনন্দে থাকো ভাই।

মেয়েটির অব্যর্থ আশীর্বাদ। সত্যিই এক অপূর্ব আনন্দের প্রসন্ন হিল্লোল বয়ে গেল পুষ্পের মনে। এ জগতে ভয় নেই, অমঙ্গল নেই—মেয়েটি বলেচে, ভগবানের আশীর্বাদ রয়েচে বিশ্বের ওপরে।

ফিরে এসে বুড়োশিবতলার ঘাটে বসে সেদিন সন্ধ্যায় পুষ্প যতীনকে ওই অদ্ভুত মেয়েটির গল্প শোনালে।

সেদিন ফিরে আসবার পর আরও কিছুকাল কাটলো। বুড়োশিবতলার ঘাটে যে সংসার পেতেছিল পুষ্প, তাতে যেন ভাঙন ধরেচে। আজ সাত বছর আগে প্রথম যেদিন যতীন এখানে আসে, সেদিনটি থেকে পুষ্পের কত সাধ, কত আনন্দ, ছেলেবেলার সেই প্রিয় সাথীকে নিয়ে এখানে সংসার পাতবে। তাই অনেক আশা করে সাজিয়েছিল বুড়োশিবতলার ঘাটের সংসার।

ওপারের শ্যামাসুন্দরীর মন্দিরে আরতি-ঘন্টাধ্বনি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্প আগে নিজেদের ঘরে প্রদীপ দেখায়, গৃহদেবতার সামনে সুগন্ধি ধূপ জ্বালিয়ে ফলফুলের অর্ঘ নিবেদন করে, মনে মনে দেবদেবীকে স্মরণ করে। রঘুনাথদাস ওকে একটি সুন্দর স্ফটিক-বিগ্রহ এনে দিয়েচেন, তিনি বলেন একজন শিল্পী মননশক্তি দ্বারা ভূবর্লোকের পদার্থে ইচ্ছামত রূপান্তর ঘটিয়ে এই সব দেবদবীর মূর্তি তৈরি করেন—এই লোকেরই চতুর্থ স্তরে কোথায় তিনি থাকেন। পুষ্প বলেছিল একদিন সেখানে গিয়ে দেখে আসবে।

কিন্তু কি জানি পুষ্পের ভাগ্যে কোথায় যেন কি গোলমাল আছে। সব মিথ্যে হয়ে যায় কেন? হঠাৎ আশা বৌদিদি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেচে।

সেই মুহূর্তেই পুষ্প টের পেয়ে গেছে! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যতীন তার কিছুই জানে না। যতীনের মুখের দিকে চেয়ে ওর কষ্ট হোল। আশা প্রারব্ধ কর্মের ফলে ভূবর্লোকের কোন নিম্নস্তরে হয়তো ঘুরচে—যতীনদার সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব নয় এ অবস্থায়, পুষ্প এ সত্য বুঝেচে।

সুতরাং মিছি মিছি কেন যতীনদাকে আশার মরণের কথা জানিয়ে কষ্ট দেওয়া। পৃথিবীতে থাকলেও তারা যেমন কোনো সাহায্য করতে পারেনি, এখানেও ঠিক তেমনি অবস্থা দাঁড়াবে। এ-লোকেও নিম্নস্তরের অধিবাসী আশার কাছে সে ও যতীনদা যেমনি অদৃশ্য ছিল পৃথিবীতে থাকতে, তেমনিই থাকবে।

কিন্তু আশা কোথায় আছে একবার দেখা দরকার।

সেদিন সে রঘুনাথদাসের কাছে গেল, যতীনকে কিছু না জানিয়ে। দেখা পাবে কিনা সন্দেহ ছিল, কারণ এ সব মহাপুরুষ নিজের খেয়ালে থাকেন, আজ আশ্রম আছে, কাল

নেই। সর্বপ্রকার মায়াবন্ধনের অতীত এ'রা। ভগবানের দেহে লয় না হয়ে ভক্তিসেবার জন্যে চিন্ময় আশ্রমে চিন্ময় বিগ্রহ স্থাপন ক'রে সেবামৃত আস্বাদ করচেন মাত্র। আজ আছেন কাল হয়তো নাস্তি। দেখাই যাক্।

রঘুনাথদাস আচার্যকে তার বড় ভাল লাগে। প্রেমে স্নেহে বালকস্বভাব বৃদ্ধ সাধু ঠিক যেন তার বাবার মত। আজ তার মনে হোল এ বিপদে এ'রই আশ্রয় নিতে হবে। অতি উচ্চস্তরে সাধুর আশ্রম, সেখানে পে'ছোনো তার পক্ষে সব সময় সহজ নয়—তবে ভগবানের কৃপা ভরসা।

আশ্রমটি একটি বিশেষ মণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। সাধুর আবাসস্থানের মাহাত্ম্যে দূর থেকেই পুষ্পের মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হোল—এ ভাব সে পূর্বেও এখানে আসবার সময় গাঢ় ভাবেই অনুভব করেচে। সেই অপূর্ব আনন্দরস...বার বার জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত থেকে মুক্ত, কোন্ লীলাময়ের অনন্ত লীলারাজ্যে সে নিত্য অভিসারিকা চিরযৌবনা প্রেমিকা...জগন্মণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভের পার্শ্বচারিণী।

সেই শ্বেত স্ফটিকের দুগ্ধধবল গোপাল-মন্দিরটি দূর থেকে দেখেই পুষ্প উদ্দেশে প্রণাম করলে। মন্দিরের চারিপাশের পুষ্পবাটিকাতে কত ধরনের ফুল ফুটে আছে, পূর্ব-পরিচিত এই সুন্দর লতাকুঞ্জটিতে রঘুনাথদাস বসে নামগান করচেন। এবার তিনি একা নন, দুটি বালক ও দুটি উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী কুমারী সেখানে বসে তাঁর সঙ্গে হাততালি দিয়ে গানে যোগ দিয়েচে। কেমন চমৎকার সুগন্ধ এখানকার! সেবারও এখানে আসতেই পুষ্প পেয়েছিল—অগুরু, চন্দন, সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া, কত কি ফুলের সুবাস মিলে এই স্বর্গীয় সুগন্ধটার সৃষ্টি করেচে। আশ্চর্য, কোনো পার্থিব ধরনের বাসনা একেবারে থাকে না এই সুমধুর গন্ধময়, নিস্তব্ধ, চিরশান্তিময় পরিবেশের মধ্যে।

ওকে দেখে রঘুনাথদাস বল্লেন—এসো মা। আমি তোমার কথা ভাবছিলাম, বোসো।

পুষ্প ওঁকে প্রণাম করতেই আচার্য বল্লেন—অপুনর্ভব হও।

বিস্ময়ে পুষ্প শিউরে উঠে বল্লে—কি বল্লেন আচার্যদেব! ওকি কথা?...জানেন—

তিনি হেসে বল্লেন—ঠিক বলেচি মা।

—আপনি তো জানেন, আমার বাসনা কামনা কিছুই এখনো যায়নি, পৃথিবীতে আমার যাতায়াত বন্ধ হোলে কি করে চলবে? বলুন আপনি। জন্ম এখন থেকেই বন্ধ হবে?

রঘুনাথদাস পুষ্পের গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে অনেকটা যেন আপনমনে সুর করে বল্লেন—

কিয়ে মানুষ জনমিয়ে পশুপাখী, অথবা কীটপতঙ্গে।
করমবিপাকে গতাগতি পুনপুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে।

এমন দিব্য মধুর সুরের সে গান, বিদ্যাপতির বাণী যেন মূর্ত হয়ে উঠলো সুগায়ক রঘুনাথদাসের কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়ে।

তারপর পুষ্পকে বল্লেন—যাও, গোপালকে দেখা দিয়ে এসো। বড় অভিমানী—সামলে রাখতে হয়।

পুষ্প হেসে বল্লে—ওসব আপনার সঙ্গে, কই আমাদের সঙ্গে তো কোনোদিন একটা কথাও—

—হবে। দেখতে পাচ্চি মা, দেখতে পাচ্চি। গোপালের চিহ্নিতা সেবিকা তুমি। সাধে কি বলেচি অপুনর্ভব হও? আমার মুখ দিয়ে মিথ্যা বার হয়নি।

—আপনি বুড়ো দাদু হয়ে বসে আছেন, দিন দিন ছেলেমানুষ হচ্চেন কেন? ও রকম বল্লে মেয়ের অপরাধ হয় না?

বৃদ্ধ প্রসন্নমুখে বল্লেন—ঠিক মা ঠিক। যাও দেখে এসো—

একটু পরে পুষ্প আবার এসে তাঁর কাছে বসলো। এখানে সে কিজন্যে এসেছিল তা যেন ভুলে গিয়েচে। এ পবিত্র আশ্রমে বসে কি করে ঐ সব কথা বলবে! হয়তো শেষ পর্যন্ত বলতে পারতো না, কিন্তু রঘুনাথদাসই বল্লেন—তোমাকে অন্যমনস্ক বলে মনে হচ্চে কেন?

—আপনি অন্তর্যামী, সব জানেন। লজ্জা করে আপনাকে মুখে বলতে—

রঘুনাথ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসে রইলেন চোখ বুজে। তারপর গম্ভীরভাবে বল্লেন —কি চাও মা?

—সেই হতভাগীর সঙ্গে দেখা করতে বড় ইচ্ছে হয়। কি ভাবে আছে,—যদি কোনো উপকার করতে পারি।

—সেই মেয়েটি প্রেতলোকে রয়েচে। তার চোখ খোলেনি, মনও অপরিণত। তার ওপর আত্মহত্যা-রূপ মহাপাপের ফলে প্রকৃতি একটা প্রতিশোধ নেবে।

—একবার দেখা হয় না?

—সে কোথায় আছে জানি না। ভুবর্লোকের নিম্নস্তর, যাকে সাধারণত নরক বলে থাকে পৃথিবীর ভাষায়—সে অনেক বড় জায়গা। তারও আবার অনেক স্তর আছে—চলো দেখি—

—প্রভু, আমার সঙ্গে তার একভাবে খানিকটা যোগ আছে, সুতরাং আমি গেলে তাকে বার করা সহজ হবে।

—ওসব না। সে মেয়েটি পৃথিবীর যে গ্রাম থেকে এসেচে—তারই নিকটবর্তী কোনো নিম্নলোকে ভ্রাম্যমাণা। স্থূল ধরনের বাসনা কামনা নিয়ে পৃথিবীর আকর্ষণ ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকে ওঠা অসম্ভব।

একটু পরে পুষ্প রঘুনাথদাসকে নিয়ে প্রথমে এল কুড়ুলে-বিনোদপুর, সেখানে কোন সন্ধান না পেয়ে গেল আশার বাপের গ্রাম রসুলপুরে। কয়েকটি নিম্ন শ্রেণীর ধূসরবর্ণের আত্মা গ্রামের বাঁশবনে, তেঁতুলগাছের ডালে, মাঠের মধ্যে বাবলা গাছে পা ঝুলিয়ে বসে হাওয়া খাচ্চে। একটি দুষ্ট আত্মা গ্রামস্থ ব্রাহ্মণপাড়ার পুকুরপাড়ের এক নোনা গাছে বসে স্নানরতা স্ত্রীলোকদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। প্রায় তুরীয় অবস্থায়। পুষ্প মনে মনে হেসে বল্লে—দ্যাখো পোড়ারমুখোর কাণ্ড! ইচ্ছে হয় গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে আসি—হাঁ করে যেন কি গিলচে—হি--হি—

অবিশ্যি ওই সব নিম্নস্তরের আত্মার কাছে তারা অদৃশ্যই রইলো।

রঘুনাথদাস বল্লেন—চলো, এখানকার কাছাকাছি নিম্নলোকে—এখানেই আছে।

অল্প পরেই ওরা এক বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তরের ন্যায় ঊষর স্থানে এসে পড়লো। তার চতুর্দিকের চক্রবাল-রেখা ধূমবাষ্পে সমাচ্ছন্ন—যেন মনে হয় কাঁচা বনে লতাপাতা পুড়িয়ে অজস্র ধূমসৃষ্টি করে দাবানল জ্বলচে। অথচ অগ্নিশিখা দৃশ্যমান নয়—শুধুই মরুময় ধূ ধূ প্রান্তর, মাঝে মাঝে বৃক্ষলতাহীন প্রস্তরস্তূপ। ওরা সেই জনহীন মরুদেশের ওপর দিয়ে শূন্যপথে ধীরগতিতে যেতে যেতে দেখলে সে রাজ্য সম্পূর্ণরূপে জনহীন, জলহীন, বৃক্ষ-লতাহীন। সেখানকার আকাশ নীল নয়, ঘোলাটে ঘোলাটে শুভ্র লঘু বাষ্পে ঢাকা। পুষ্পের মনে হোল ভাদ্র মাসের গুমটের দিনে পৃথিবীর আকাশে যেমন সাদামেঘ জমে থাকে—অনেকটা তেমনি।

পুষ্প বল্লে—এই জায়গাটা যেন কেমন বিশ্রী—

রঘুনাথদাস বল্লেন—এই সব ভুবর্লোকের নীচু স্তর, পৃথিবীতে যাকে নরক বলে। এ অনেকদূর ব্যেপে রয়েচে—হাজার হাজার ক্রোশ চলে যাও, পৃথিবীর ঠিক ওপরে

পৃথিবীর চারিপাশ ঘিরে এ রাজ্য বর্তমান! অথচ পৃথিবীর লোকের কাছে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। এখানকার বাসিন্দারা আবার ভুবর্লোকের কোনো উচ্চ স্তর দেখতে পায় না।

—হাজার হাজার ক্রোশ! এমন জনহীন!

—তারও বেশি। যতদূর চলে যাও, এ অদ্ভুত লোকের আদি অন্ত পাবে না। বহু হাজার ক্রোশ চলে যাও, এমনি। এ কোনো বাইরের অবস্থা নয়। এখানকার বাসিন্দাদের মানসিক-অবস্থা-প্রসূত। এরাও অনেক সময় যতদূর যায়—এ জনহীন মরু-পাথরের দেশের আদি-অন্ত পায় না খুঁজে, অন্য কোন প্রাণীকেও দেখতে পায় না। চন্দ্র নেই, সূর্য নেই, তারা নেই—এই রকম চাপা আলো—কখনো কালো হয়ে আসে, ঘোর কালো, পৃথিবীর অমাবস্যার মত। উপনিষদে এ লোকের কথা বলে গিয়েচে—অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতা—এই সে ভীষণ অন্ধ-তমিস্রা লোক—একশো বছর পর্যন্ত হয়তো টিকে যায় সেই অন্ধকার কোন কোন পাপী আত্মার কাছে। সে হতভাগ্য আশ্রয় ও আলো খুঁজে, সঙ্গী খুঁজে হয়রান হয়ে পড়ে।

পুষ্প শিউরে উঠলো। অস্পষ্ট স্বরে বল্লে—একশো বছর ধরে অমাবস্যা!

রঘুনাথদাস হেসে বল্লেন—কন্যা, জন্ম-মরণ-ভীতি-ভ্রংশী শ্রীকৃষ্ণমুরারির শরণ নাও—যেন এখানে কোনদিন আসতে না হয়। এ হোল হিরণ্যগর্ভদেবের রাজ্য, তিনি এখানে শাসক ও পালক।

—তিনি কে?

—ব্রহ্মের তিন রূপ—স্থূলরূপে বিরাট, সূক্ষ্মরূপে হিরণ্যগর্ভ, কারণ-স্বরূপ ঈশ্বর।

—প্রভু, পৃথিবীর গ্রহদেব বৈশ্রবণ কে?

—তিনি পূর্বকল্পের মহাপুরুষ। পৃথিবীর প্রজাপতি।

—তবে আপনার গোপাল কে?

রঘুনাথদাস প্রসন্ন হাস্যে বল্লেন—গোপাল সব। আমি ওকেই জানি। ওই ব্রহ্ম, ওই আত্মা, ওই ভগবান। আমি আর কারো খবর রাখিনে। ব্রহ্মের সাকার রূপ, জ্ঞানচক্ষে দেখলে মায়িক রূপ বটে। কিন্তু আমার চোখে গোপাল ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ করে রেখেচে। আমার আর কোনো তত্ত্বে দরকার কি। ভক্তির চোখে ভাবের চোখে দেখতে শেখো ভগবানকে। তাঁর ঐশ্বর্য ভুলে যাও। তাঁকে বন্ধু ভাবো, পুত্র ভাবো, পতি ভাবো—এমন কি দাস ভাবো।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—দাস ভাববো? কি বলেন ঠাকুর!

রঘুনাথ চীৎকার করে বল্লেন—কেন ভাববে না? দাবি করে ভাবো। প্রেমের সঙ্গে দাবি করে ভাবো। তিনি ভক্তের দাসত্ব করেচেন—করেন নি? তিনি যে প্রেমের কাঙাল—তাঁকে যেভাবেই ডাকো, ডাকলেই সাড়া দেবেন। তবে প্রেমের সঙ্গে ডাকা চাই। ভয় করে ডেকো না। ভয় করবার কিছু নেই তাঁকে।

পুষ্প মেয়েমানুষ, এ°সব কথায় ওর চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল গড়িয়ে পড়লো। যুক্তকরে নমস্কার করে বল্লে—আপনার আশীর্বাদ, ঠাকুর। নরকে এ কথা বল্লেন, নরক যে পুণ্যস্থান হয়ে উঠলো!

এমন সময় পুষ্প দেখতে পেলে আশাকে। একটা কালো পাথরের অনুর্বর টিলার ওপর সে মলিনমুখে চুপ করে বসে আছে।

রঘুনাথদাস বল্লেন—তুমি যাও মা। আমি এখানে থাকি।

—কিন্তু আমাকে যে ও দেখতে পাবে না?

—পাবে, যাও। কিন্তু একটা কথা মা—

—কি?

—ওই কন্যাটির এখনও জ্ঞান হয়নি।

পুষ্প বিস্মিত হয়ে বল্লে—সে কি প্রভু! ও তো দিব্যি জেগেই বসে আছে।

—ও মেয়েটি ধূম্রযান দক্ষিণমার্গের পথিক। ওর গতির পথ বেঁকে আছে ধনুকের মত পৃথিবীর দিকে। তুমি দেখতে পাচ্চ না মা! ও অল্পদিন হোল পৃথিবী থেকে এসেচে—তার ওপর স্বাভাবিক নিয়মে মৃত্যু হয়নি। আত্মহত্যা করেচে। ওর মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণাই হয়নি। যাও, কাছে গিয়ে বুঝতে পারবে।

পুষ্প কাছে যেতেই আশা বল্লে—তুমি আবার কে গো? হ্যাঁগো, এটা কি আলিপুরের বাগান?

পুষ্প সস্নেহে বল্লে—কেন বৌদি? এটা কি বলে মনে হচ্চে?

—বাড়ীওয়ালী মাসী বলেছিল আলিপুরের বাগান দেখাতে নিয়ে যাবে। সেখানে একটি কি বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে। আমি বলি, ছি ছি কি ঘেন্না, বলি—নেত্যদার সঙ্গে চলে এসেছিলাম সে আলাদা কথা। অল্প বয়েসে বিধবা হয়েছিলাম. কে খেতে পরতে দেয় সংসারে...না হ্যাঁ, সত্যি কথা বোলবো। মা বুড়ো হয়েচেন, তার ঘাড়ে আমার আর একটি বিধবা দিদি...আচ্ছা, মাহেশের রথতলা এখান থেকে কতদূর? তুমি কে?

পুষ্প ওর পাশে গিয়ে বসলো। ওর দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লে—আমি তোমাকে চিনি। তুমি আমার বৌদিদি হও।

—তা এখানে কি মানুষ নেই? এটা কোন্ জায়গা? খিদে-তেষ্টা পেয়েচে কিন্তু একখানা খাবারের দোকান নেই। মাহেশের রথতলাতে আমার এক দূর সম্পর্কের ভগ্নীপতি থাকে। সেখানে যাবার খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু এই অবস্থায় যেতে লজ্জাও করে—

—তুমি এখানে এলে কার সঙ্গে?

—এলাম কার সঙ্গে তা মনেই পড়ে না। একদিন বাড়ীওয়ালী মাসী বল্লে—তোমায় আলিপুরের বাগানে নিয়ে যাবো—সেখানে একটি বাবু তোমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে চায়। ঘরে সেদিন কিছু খাবার নেই। বাড়ীভাড়া কুড়ি টাকার জন্যে তাগাদা করে করে বাড়ীওয়ালী তো আমার মাথা ধরিয়ে দিতে লাগলো। রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে শুলাম, তারপর যে কি হোল, আমার ভাল মনে হচ্ছে না।

—বাড়ীওয়ালী তোমায় আলিপুরে নিয়ে গিয়েছিল?

—কি জানি ভাই, তারপর আমার আর কিছু মনে নেই। এখানে আজ ক'দিন আছি তাও মনে নেই। খিদে-তেষ্টা পেয়েচে—অথচ খাবার পাইনে। না আছে একটা লোক, না আছে একটা দোকান-পসার। আচ্ছা, এর বাজারটা কোন্ দিকে?

পুষ্প কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে—আশা বৌদি, যতীনদাকে মনে পড়ে?

আশা কেমন যেন চম্‌কে উঠে. ওর দিকে অল্পক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে বল্লে—তুমি তাঁকে কি করে জানলে?

—জানি আমি। দেশের লোক যে গো! একগাঁয়ে বাড়ী।

আশার দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। হাত দিয়ে মুছে বল্লে—তিনি স্বর্গে চলে গিয়েচেন, তাঁর কথা আর আমার মুখে বলে কি লাভ?

—সে কথা বলচিনে বৌদি, সত্যি কথা বলো তো আমার কাছে, তাঁর কথা তোমার মনে হয় কি না?

আশা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে বল্লে—হয়। যখন হয় তখন

বুকের মধ্যে কেমন করে উঠে—

—কেন বৌদি ?

—আমি হতভাগী তাঁকে একদিনও সুখ দিইনি। তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, বুঝতাম না—কেবলই বাপের বাড়ী এসে থাকতাম শ্বশুরবাড়ী থেকে—

—কেন ?

—শ্বশুরবাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার বড় কষ্ট পেতাম। ছেলেমানুষ তখন—

—তোমার একথা সত্যি নয় বৌদি। আমার কাছে সব খুলে বলো না ভাই ?

আশা চুপ করে নখ খুঁটতে লাগলো। এ কথার কোনো জবাব দিলে না। পুষ্প বল্লে—বলবে না ভাই ?

আশা বল্লে—কি হবে শুনে সে সব কথা। আমার বুদ্ধির দোষেই যা কিছু সব হয়েচে। আমি আমাদের গ্রামের মজুমদার-পাড়ার একটা ছেলেকে ভালবাসতাম।

—বিয়ের আগে থেকে, না বিয়ের পরে ?

—বিয়ের আগে নয়, কিছুদিন পরে।

—বিয়ের পরে অন্য কারো সঙ্গে ভাব করতে গেলে কেন ? এটা খুব অন্যায় হয়েচে তোমার বৌদিদি। হিন্দুর মেয়ে, দ্বিচারিণীর ধর্ম কে শেখালে তোমায় ?

আশা চুপ করে রইল। পুষ্পের কড়াসুরে বোধহয় একটু ভয় খেয়েই গেল।

—কথার উত্তর দিলে না যে ?

—আমার অদেষ্ট ভাই। ও কথার কি উত্তর দেবো ?

—কিন্তু আমি তোমায় বলচি তুমি এখনও সেই লোকটাকেই ভালবাসো। যতীনদার ওপর তোমার কোনো টান নেই। আমি সব বুঝতে পারি ভাই। আচ্ছা, তোমার ঘেন্না হয় না ? যার জন্যে এত কষ্ট, যে তোমাকে ফেলে চলে গেল, যার জন্যে তোমাকে আফিং খেয়ে মরতে হোল, আবার সেই ইতর লোকটার জন্যে এখনও ভাবনা ? যতীনদা দেবতার মত স্বামী তোমার, তাকে একদিন দেখলে না মরবার সময়ে, তার কুলে কালি দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে এলে—

আশার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বল্লে—আফিং খাওয়ার কথা তো কেউ জানে না—তুমি কি করে জানলে ? আমি তো—

—আফিং খেয়ে তুমি মারা গিয়েচ বৌদি। তুমি বেঁচে নেই—মরে প্রেতলোকে এসে কষ্ট পাচ্চ—

আশা এবার যেন খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। এটা তাহলে ঠাট্টা! তবুও আফিং খাওয়ার কথা এ কি ভাবে জানলে! পরক্ষণেই একথা ওর মনে হোল—কে এ মেয়েটা, গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেচে ? এত হাঁড়ির খবরে ওর কি-ই বা দরকার ? ওর গলা ধরে কে কাঁদতে গিয়েচে তা তো জানি নে। সে যা খুশি করেচে, তার জন্যে ওর কাছে এত কৈফিয়ৎ দেবার বা কি গরজ। শ্বশুরবাড়ীর লোক বোধ হয়, ওই গাঁয়েরই মেয়ে—তাই এত গায়ে ঝাল।

মৃদু হেসে বল্লে—তা যাই বলো ভাই—মরে ভূত হওয়াই বই কি এক রকম—

পুষ্প দৃঢ়কণ্ঠে বল্লে—তা নয়। আমি ঠাট্টা করিনি। মারা তুমি গিয়েচ। আফিং খেয়ে ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে ছিলে কলকাতার বাসায়, মনে নেই ? তারপর তুমি মরে যাও, মরে এই প্রেতলোকে এসেচ।

আশার মুখে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস ও সন্দিগ্ধতার চিহ্ন ফুটে উঠতে দেখে ও বল্লে—এখনও বিশ্বাস হোল না বৌদি ? আচ্ছা, তোমার বিশ্বাস করাবো। চলো—তোমাদের গাঁয়ে তোমাদের বাড়ী যাবে ?

আশা কিছু না ভেবেই ঝোঁকের মুখে বল্লে—সেখানে আর কি মুখ নিয়ে যাবো—

—গেলেও কেউ টের পাবে না। সত্যি-মিথ্যে চলো চট্ করে পরীক্ষা করে নিয়ে আসি। তোমার প্রেতদেহ হয়েচে। এ দেহ পৃথিবীর মানুষের চোখে অদৃশ্য।

পুষ্পের কথার ভাবে ও সুরে আশা কি বুঝলে যেন, ওর হঠাৎ ভয়ানক আতঙ্ক হোল। কি সব কথা বলে এ! যদি সত্যিই তাই হয়? সে যদি সত্যিই মরেই গিয়ে থাকে?

ঠিক সেই সময় একটি নিম্নশ্রেণীর প্রেত দুটি অল্পবয়সী মেয়েকে একাকী দেখে পূর্বসংস্কারবশত ওদের দিকে ছুটে এল। মুখে দু-একটি অশ্লীল কথাও উচ্চারণ করলে, ঘোর কামাসক্তিতে তার চোখ ও মুখের অবস্থা উন্মত্ত পশুর মত।

ওর বিকট হাবভাব দেখে আশা ভয়ে পুষ্পকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে বল্লে—ওই দ্যাখো ভাই কে একটা আসচে—মাগো—

পুষ্পও ভয় পেয়েছিল, সেও প্রথমটা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল—কিন্তু হঠাৎ একটা আশ্চর্য কান্ড ঘটলো, লোকটা ওদের কাছে এসে পড়ে পুষ্পের দিকে চেয়েই জড়সড় হয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। তারপর দিগ্বিদিগ্ জ্ঞানশূন্য ভাবে ছুট্ দিলে সোজা।

হঠাৎ আশা ভয়ে ও বিস্ময়ে পুষ্পের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে বল্লে—ওকি! তোমার কপাল দিয়ে আগুন বেরুচ্চে যে!...এ কি! ওমা—কি সর্বনাশ।

পুষ্প অবাক হয়ে নিজের কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেল। সে আবার কি! পর-ক্ষণেই ওর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো দরদর করে। সে হাত দিয়ে মুছে বল্লে—ভাই বৌদি—

আশার ভয় ও বিস্ময় তখনও যায়নি। সে দূর থেকেই আপন মনে বললে—বাবাঃ—কি এ! আর দেখা যাচ্চে না। কি আগুন!...

তারপর সে ছুটে এসে পুষ্পের পা দুখানা জড়িয়ে ধরে বল্লে—কে আপনি? আমায় বলুন কে আপনি? আপনি তো সহজ কেউ নয়। স্বর্গ্গো থেকে দেবি এসেচেন আমায় দয়া করতে?

আশার মুখ দিয়ে অজ্ঞাতসারে একটা বড় সত্য কথা বেরুলো।...

যতীন সব শুনলে। আশার এই পরিণতি! সেই আশা। কি জানি কেন শুধুই মনে পড়ে ওদের কাঁটালগাছের দিকের ঘরের সেই ফুলশয্যায় বৃষ্টিধারামুখর রাত্রিটি, সেই সব দিনের কথা আজও যেন মনে হয় কাল ঘটে গেল। কেন এমন অসারতা সংসারে, কেন এমন মিথ্যার উৎপাত! যা ভালো বলে মনে হয়, জীবন যাতে পরিপূর্ণ হোল মনে হয়—তা কেন দুদিনও টেকে না? অমৃত বলে যা মনে হয়, তা থেকে বিষ ওঠে কেন?...

এই ঘোর বিষাদের দুর্দিনে যতীন সবদিক থেকে সব আলো একেবারে হারিয়ে ফেললে। কালো কালিতে সব লেপে একাকার হয়ে গেল। কেবল পুষ্প তাকে কত করে বুঝিয়ে রাখতো।

যতীন বল্লে—জীবনে আর কি রইল আমার? ওর সঙ্গে দেখাটা করিয়ে দাও—

—তোমাকে ও দেখতে পাবে না।

—তবে তোকে দেখতে পেলে যে?

—সে রঘুনাথদাস ঠাকুরের মহিমায়। তুমি কষ্ট পাবে। বৌদির সে কষ্ট তুমি কি করে দেখবে?

তখনকার মত যতীন বুঝে গেল। পুষ্পও কিছু নিশ্চিন্ত হোল। একটা অন্য ঘটনাতেও যতীনের মন একটু অন্যদিকে চলে গেল। ওদের গ্রাম কুড়ুলে-বিনোদপুরের

রায় সাহেব ভরসারাম কুণ্ডুর বড় ছেলে রামলাল কুণ্ডুকে একদিন খুব বিষণ্ণ অবস্থায় দ্বিতীয় স্তরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে দেখলে। একটা গাছের তলায় সে বসে আছে গালে হাত দিয়ে. যতীন দেখে ওকে চিনতে পেরে তখনই ওকে দেখা দেওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করলে—নয়তো ওর দেহ রামলালের নিকট অদৃশ্যই থাকবে।

রামলাল ওকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইল। বল্লে-- যতীন না?

—হ্যাঁ। তুমি কবে এলে?

—আসা-আসি বুঝিনে, এ জিনিসটা কি বল তো? বাড়ী যাই, সবাইকে দেখি— বাবা. মা, বৌ—কেউ কথা বলে না। আমি মরে গিয়েচি বলে আমার নাম নিয়ে সবাই কাঁদচে।

—ঐ তো তুমি মরে এখানে এসেচ। এ জিনিসটাই মৃত্যু।

—আমারও সন্দেহ হয়েছিল. বুঝলে? কিন্তু ভাল বুঝতে পারিনি।

—কেন, তোমাকে কেউ নিয়ে আসেনি?

--আমার ঠাকুরদাদা এসেছিল. এখনও মাঝে মাঝে আসে। বড় বক্ বক্ করে, আমার পছন্দ হয় না।

রামলাল যতীনের বয়সী, বড়লোকের ছেলে। সুরা ও নারীর পেছনে গত দশ বছরে লাখখানেক টাকা উড়িয়ে দিয়েচে। অত বড় ব্যবসা ওদের, কখনো কিছু দেখতো না, বৃদ্ধ বাপ দোকান আগলে বসে থাকতো, রামলাল দোকান বা আড়তের ধারেও যেতো না। যতীন এসব জানে।

তারপর রামলাল হি-হি করে হেসে বল্লে—ঠাকুরদাদা কি করে জানো? রোজ দোকানে গিয়ে বাবার পাশে বসে থাকে, বেচাকেনা দেখে। বাবা হাত-বাক্সের সামনে যেখানে বসে না? ঠিক ওর পাশে রোজ ঠাকুরদা গিয়ে দুঘণ্টা তিনঘণ্টা করে বসে। মানে. ঠাকুর-দাদার নিজের হাতে গড়া আড়তটা. ওর মায়া বড় বেশি।

--বলো কি! উনি তো মারা গিয়েচেন আজ কুড়ি বাইশ বছর। তখন আমি কলেজে পড়ি. বেশ মনে আছে। এখনও রোজ তোমাদের আড়তে গিয়ে বসেন?

রামলাল আবার হি-হি করে হাসতে লাগলো। বল্লে—আচ্ছা ভাই, সেকথা যাক্‌গে। এখানে কেমন করে মানুষ থাকে বলতে পারো? আজ কতদিন এসেচি ঠিক মনে নেই, তবে মাস দুইএর বেশি হবে না। একটা মেয়েমানুষের মুখ দেখতে পাইনি এর মধ্যে' এক ফোঁটা মাল পেটে যায়নি--ফুর্তি করবার কিছু নেই। ছ্যাঃ, নিরিমিষ জায়গা বাপু, যা বলো। মানুষ এখানে টাঁকে?

পরে চোখ টিপে বল্লে—বলি. সন্ধানে-টন্ধানে আছে?

যতীন ওর পাশে বসলো। মনে মনে ভাবলে—A wasted life! আমার নষ্ট হচ্চে যেজন্যে, তা আমার নিজের দোষ নয়, কিন্তু এ নিজে জীবনটাকে বিলিয়ে দিয়ে এসেচে নিজের হাতে।

রামলাল বল্লে—আছ কোথায়?

—এখানেই।

--মাঝে মাঝে এসো। বড্ড একা পড়ে গিয়েচি। আচ্ছা, হরিমতিকে দেখতে পাও? বুঝতে পেরেচ?—গাঙু গোসাঁইএর মেয়ে হরিমতি। তাকে এসে পর্যন্ত খুঁজচি—এক সময়ে তার সঙ্গে ছিল কিনা!

যতীন একটু অবাক হয়ে গেল। গাঙু গোসাঁইএর যে মেয়ের কথা এ বলচে, তাকে নিষ্ঠাবতী বৈষ্ণবী হিসেবে সে জানতো। তবে সে যুবতী এবং সুন্দরী ছিল বটে। আশা-

লতা যেবার বাপের বাড়ী চলে গেল, সেই বছর সে কি জানি কেন গলায় দড়ি দিয়ে মারা যায়। হরিমতির চরিত্র ভালো ছিল বলেই তার ধারণা আছে এ পর্যন্ত।

যতীন বল্লে—না, ওসব দেখিনি। তুমি এখন ওসব ছাড়। মরে চলে এসেচ পৃথিবী ছেড়ে। মদ মেয়েমানুষ এখানে কি কাজে লাগবে তোমার? হরিমতিকে তা হোলে তুমিই নষ্ট করেছিলে, তোমারি জন্যে তাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হয়?

—না ভাই। তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি। সে ভালো চরিত্রের মেয়ে গোড়া থেকেই ছিল না। অঘোর কুণ্ডুর সঙ্গে তার গোলমাল হয় তা আমি জানি। জানাজানি পাছে হয় তাতেই সে গলায় দড়ি দিয়ে মরে। আমায় অত খারাপ ভেবো না। ফুর্তি-টুর্তি করতাম বটে, তা বলে—

—বেশ, তবে ও পথ একেবারে ছেড়ে দাও, নইলে যেমন কষ্ট পাচ্চ এমনি কষ্ট পাবে।

যতীন সেইদিন থেকে প্রায়ই রামলালের স্তরে গিয়ে তাকে বোঝাতো। রামলাল বাড়ী-ঘর পায়নি, গাছতলাই তার আশ্রয়স্থান। যতীন তাকে উপরের স্বর্গের কথা বলতো, ভগবানের কথা বলতো—কিন্তু রামলাল নিম্নস্তরের আত্মা, অতি স্থূল আসক্তিতে ওর মন বাঁধা। সে-সব ও কিছুই বোঝে না, ভালও লাগে না।

একদিন রামলালের ঠাকুরদাদা ৺কেবলরাম কুণ্ডুর সঙ্গে দেখা! কেবলরাম ঘুঘু ব্যবসাদার, সামান্য অবস্থা থেকে বিখ্যাত ধনী ও আড়তদার হয়েছিল। ওকে দেখে বল্লে—আরে, তুমি ভবতারণের ছেলে! খুব মনে আছে তোমায়। আহা-হা, অল্প বয়সে তোমরা সব চলে এলে, বড্ড দুঃখের কথা। আমার নাতির দেখো না, ভরসারাম মরে গেলে অত বড় ব্যবসাটা গেল। কে দেখবে? এই তো সন্দে পর্যন্ত আড়তে বসে ছিলাম। রোজ গিয়ে দেখি। বড্ড মায়া ঐ আড়তটার ওপর। ভরসারাম তো বাঁধা আসরে গাইলে। কষ্ট কাকে বলে তা তো জানলে না। একলক্ষ আশি হাজার টাকা ক্যাশ রেখে আসি ব্যাঙ্কে, উইলে দুভাইকে সমান ভাগে ভাগ করে—

যতীন বল্লে—কুণ্ডু মশাই, এখন ওসব ছেড়ে দিন। আপনি আজ কুড়ি বছর এসেছেন, আজও দোকান আড়ত নিয়ে আছেন কেন? আপনি না গলায় তুলসীর মালা দিতেন? হরিনাম করতেন?

—সে এখনও করি। তা বলে—

—আচার্য রঘুনাথদাসের নাম জানেন?

কুণ্ডু মশাই দুহাত জোড় করে প্রণাম করে বল্লে—কে তাঁর নাম না জানে? আমরা তাঁর দাসানুদাস—

—আপনি যদি আড়ত দোকানে যাওয়া ছেড়ে দিতে পারেন, তবে সেখানে নিয়ে যাবো। তাঁর কাছে।

কেবলরাম কথাটা বিশ্বাস করলে না। ভাবলে এ একটা কথার কথা বুঝি। উচ্চ স্বর্গের অনেক কথা যতীন সুতরাং ওকে বোঝাতে বসলো। পুষ্পের সঙ্গে একদিন দেখা করিয়ে দিলে। কেবলরাম হাত জোড় করে প্রণাম করে বল্লে—তুমি কে মা?

পুষ্প হেসে বল্লে—তোমার নাতনী, দাদু—

কেবলরাম কেঁদে ফেললে। বল্লে—আমি পাপী, নরাধম' আমার সে ভাগ্যি কি আছে মা?

—মা নয়, আমায় দিদি বলে ডাকো দাদু—পুষ্প আবদারের সুরে বল্লে।

কেবলরাম সেদিন থেকে পুষ্পের ক্রীতদাস হয়ে গেল। পুষ্প ম্যাজিক জানে নাকি? যতীন এক এক সময়ে ভাবে। পুষ্প কেবলরামকে ভরসা দিলে, এক দিন উচ্চ স্বর্গের বৈষ্ণব ভক্তদের লোকে ওকে নিয়ে যাবে। কেবলরাম মানুষটা সরল। বলে—দিদি, তুমিই

তো দেবী, তুমি কম নও। ব্রাহ্মণের মেয়ে, তার ওপর আগুনের মতো আভা তোমার রূপের। আমি আর কোথাও যেতে চাইনে—তুমি দাদু বলে ডাকলে এই আমার স্বর্গ হয়ে গেল! আমরা কীটস্য কীট।

আত্মা ওঠে ভালবাসায়! ভালবেসে, ভালবাসা পেয়ে। পুষ্প পিতামহের সমান বৃদ্ধ কেবলরামকে পৌত্রীর মত ভালবেসে ওকে তোলবার চেষ্টা করচে—যতীন বুঝতে পারলে। যতীনের শত লেক্‌চারেও এ কাজ হোত না। যতীন ভাবে— নাঃ, এসব কাজ পুষ্প পারে। পতিত-উদ্ধার কাজ আমার নয়। আমার নিজের কুকুর পথ্যি করে কোথায় তার ঠিক নেই।

কিন্তু রামলালের সাহায্য পুষ্পকে দিয়ে হবে না। পুষ্প অতি সুন্দরী নারী। রামলালের আসক্তি এখনও নিম্নমুখী, মোহে পড়ে যাবে, রামলালের মন গড়ে উঠতে অনেক দেরি। অন্যভাবে ওকে সাহায্য করতে লাগলো যতীন।

রামলালের দেখা পেয়ে যতীনের খানিকটা ভাল লাগে। হাজার হোক, দেশের লোক, সমবয়সীও বটে। দুটো পৃথিবীর কথাবার্তা বলা যায়। দেবদেবীদের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেচে। শুধু বড় বড় কথা আর কাঁহাতক শোনা যায়—পুষ্পের মুখেই, বা অন্য যেখানে মাঝে দু-দশবার গিয়েচে, সেখানেই কি? পুষ্প বোঝে সব, বুঝে দুঃখিত হয়। রামলালের সঙ্গে অত মেলামেশা সে পছন্দ করে না।

যতীন রামলালের কাছে এসে বলে—রামলাল-দা, কি তোমার ইচ্ছে করে?

—একটা ইচ্ছে আছে, অন্য কিছু হোক না হোক, একটা সিগারেট যদি খেতে পারতাম, একেবারে কিছু নেই—ছ্যাঃ, এখানে মানুষ থাকে কি করে?

—তোমার স্ত্রীকে তো রেখে এসেচ, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করে না?

রামলাল ইতস্তত করে বল্লে—হ্যাঁ—তা—হ্যাঁ—সে তো প্রায়ই দেখচি।

—যাও সেখানে?

—হ্যাঁ, তা—যাই। যাবে—চলো না গাঁয়ে একবার।

যতীন গেল কুড়ুলে-বিনোদপুরে। পুষ্পের বারণ আছে এসব জায়গায় আসবার। এলেই পার্থিব আসক্তি ও তৃষ্ণা আত্মাকে পুনরায় জড়িয়ে ধরে। রামলাল ওর নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল, যতীন নিজের বাড়ী এল; ওর ছেলেমেয়ে আছে শ্বশুরবাড়ীতে, কিন্তু তাদের ওপর এতদিন যতীনের কোনো বিশেষ মায়া ছিল না, এখানে এসে তাদের জন্যেও মন কেমন করে উঠলো। ওদের বাড়ীটা একদম ভেঙে চুরে জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে এই সাত আট বছরে। ঐখানে ঐ ঘরে সে আর আশা থাকতো, আশার হাতের চুনের দাগ এখনও ইঁট-বের-করা দেওয়ালের গায়ে এক জায়গায়। ওখানে বসে আশা পান সাজতো, ষোল বছর আগের চুনের দাগ, কি তারও আগের হবে।

বিয়ের পরে প্রথমে আশা খুব পান খেতো এবং ওইখানটিতে বসে রোজ সকালে এক বাটা পান সাজতো সমস্ত দিনের মত। গুজব উঠলো এই সময়, পানে একরকম পোকা হয়েচে, অনেক লোক মারা যাচ্চে পোকা-ধরা পান খেয়ে, যতীন আর বাজার থেকে পান আনতো না পাঁচ ছ'মাস। আশা বলতো—তুমি না খাও, আমার জন্যে এনো, না হয় মরে যাবো পান খেয়ে, তোমার আবার বিয়ে বাকি থাকবে না। পান না খেয়ে থাকতে পারিনে —লক্ষ্মীটি—

কাল যেন ঘটে গিয়েচে সে সব দিন। আশা, আশালতা। স্বপ্ন...বহুদূর অতীতের স্বপ্ন আশালতা।

সন্ধ্যা হয়েচে। বোষ্টম বৌ ছাগল নিয়ে যাচ্ছে বাড়ীতে তাড়িয়ে—আহা, বুড়ো হয়ে পড়েচে বোষ্টম বৌ। তা তো হবেই, আট বছর হয়ে গেল। আচ্ছা তাকে যদি এখন দেখে

বোষ্টম বৌ তো কি না জানি ভাবে।

হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে উঠলো—তুমি কখন এলে গো?

যতীনের অন্তরাত্মা পর্যন্ত বিস্ময়ে শিউরে চমকে উঠলো সে পরিচিত কণ্ঠের ডাকে। সে পেছন ফিরে চাইলে, আশা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার পেছনে। পরনে লালপাড় শাড়ী, ঠিক যেমনটি পরতো কুড়ুলে-বিনোদপুরের এ ঘরে; বয়েস তেমনি, চোখে না বুঝতে পারার বিস্ময়ের মূঢ় দৃষ্টি।

-আশা! তুমি এখানে! কি করে এলে।

আশা অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে আছে। যেন এখনো ভাল করে বিশ্বাস করতে পারচে না।

যতীন ওর দিকে এগিয়ে গেল হাত বাড়িয়ে। বল্লে—আশা, চিনতে পারচো না আমায়?

আশা ওর মুখের দিকে তখনও চোখ রেখে বল্লে—খু-উ-ব।

—তুমি কোথা থেকে এলে?

—কি জানি কোথা থেকে যে এলুম। আজকাল কেমন হয়েচে আমার, সবই যেন কি মনে হয়। কোন্‌টা সত্যি কোন্‌টা স্বপ্ন বুঝতে পারিনে। সব ওলট-পালট হয়ে গিয়েচে কেমনতর। হ্যাঁগো, তুমি ঠিক তো?...

পরে ব্যস্ত হয়ে বল্লে—দাঁড়াও, একটা প্রণাম করে নিই তোমায়—

প্রণাম করে উঠে বল্লে—কতকাল দেখিনি। ছিলে কোথায়? সংসার যে ছারেখারে গেল, বাড়ী ঘরদোরের অবস্থা এ কি হয়েচে! আমি এতকাল আসিনি। বাপের বাড়ী থেকে আমাকে আনলেও না। নিজেও ভবঘুরে হয়ে বেড়াচ্চ। ছেলেমেয়ে দুটোর কথাও তো ভাবতে হয়।

যতীন সস্নেহ কণ্ঠে বল্লে—ঠিক, ঠিক। তুমি ভাল আছ আশা?

—আমি ভাল নেই।

—কেন, কি হয়েচে? আশা, আমায় খুলে বলো সব—

—মাথার মধ্যে সব গোলমাল। কিছু বুঝতে পারিনে। সব স্বপ্ন বলে মনে হয়। কত কি যে ঘটে গেল জীবনে, বুঝিনে কোন্‌টা স্বপ্ন, কোন্‌টা সত্যি। এই তুমি দাঁড়িয়ে আছ সামনে, আমার যেন কেমন মনে হচ্চে। যেন মনে হচ্চে কে বলেছিল, তুমি—না ছিঃ সে কথা বলতে নেই।

--আশা, আবার ঘর সংসার পাতাই এসো—

—পাততেই হবে। আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েচে—এক জায়গায় ছিলাম, মরুভূমি আর পাহাড়, লোক নেই জন নেই, কি ভয়ানক জায়গা। সেখানে যেন এক দেবীর সঙ্গে দেখা হোল, তাঁর কপাল দিয়ে আগুনের মত হল্‌কা বেরুচ্চে। কি তেজ! বাবাঃ—কি রকম সব ব্যাপার। ও সব স্বপ্ন, কি বলো?

—নিশ্চয়ই, আশা।

—তুমি এলে ভালই হোল। ঘরদোর ঝাঁটপাট দিই। উনুনগুলো ভেঙে জঙ্গল হয়ে গিয়েচে। চড়ুই পাখীর বাসা হয়েছে কড়িকাঠে। হাটবাজার করে এনে দাও। সেই মরু-ভূমির মত জায়গা থেকে কে যেন আমায় এখানে টেনে নিয়ে এল। থাকতে পারলাম না।

পরে কাছে এসে অপরাধীর সুরে বল্লে—হ্যাঁগো, আমায় বাপের বাড়ীতে ফেলে রেখে-ছিলে কেন এতদিন? রাগ করেছিলে বুঝি?

যতীন স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল, সে দৃষ্টিতে গভীর অনুকম্পা, অতলস্পর্শ অনুকম্পা—সর্ববাসনাশূন্য উদার ক্ষমা...কোনো কথা বল্লে না।

আশা মুগ্ধদৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে হাসি-হাসি মুখে বল্লে—বেশ চেহারা হয়েছে

তোমার।

হঠাৎ আশা চীৎকার করে উঠলো—একি! ওমা, একি হোল! কোথায় গেলে গো? এই যে ছিলে? ওমা এ সব কি!

যতীন বুঝলে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েচে আশার কাছে। পৃথিবীতে কতক্ষণ সে থাকবে, পৃথিবীর আসক্তি ও চিন্তায় তার দেহ স্থূলস্তরের দর্শনযোগ্য হয়েছিল অল্প সময়ের জন্যে, ওর চিন্তার প্রবল আকর্ষণ নরক থেকে আশাকে এনেছিল এখানে। আশাও আর থাকতে পারবে না। এখুনি ওকে চলে যেতে হবে। উভয় স্তরে জীবের কোন যোগাযোগ নেই।

রামলাল পর্যন্ত এসে যতীনকে আর দেখতে পেলে না। যতীনের দেহ আবার তৃতীয় স্তরের মত হয়ে গিয়েচে।

রামলাল বল্লে—কোথায় গেলে, ও যতীনদা? থাকো থাকো, যাও কোথায়? ও যতীনদা—

ততক্ষণে নরকের প্রবল আকর্ষণে আশাও তার নিজের স্তরে নীত হয়েচে।

যতীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। এ জগতের এই নিয়ম!

আশা সত্যিই বলেচে, কোন্‌টা স্বপ্ন কোন্‌টা আসল তা বোঝবার যো নেই।

সে কোন্ দেবতা, যাঁর শরণ সে নিতে চায়, এ স্বপ্নের শেষ কবতে চায়। করুণাময় এমন কে মহাদেবতা আছেন, যাঁর কৃপাকটাক্ষে আশা তো আশা, কত মহাপাপী উদ্ধার হয়ে যায় চোখের এক পলকে, মহারুদ্রের জ্যোতিস্ত্রিশূলের এক চমকে অনন্ত ব্যোম ঝলমল করে ওঠে পুণ্যেব আলোয়, পাপতাপ পুড়ে হয় ছারখার, অবাস্তব স্বপ্নের অবসানে। হে অনন্তশয়নশায়ী নিদ্রিত মহাদেবতা, জাগো, জাগো!

ওদের বাড়ীর পেছনের বাঁশবনে কর্কশস্বরে পেঁচা ডাকচে। শীতকালে রাধালতায় থোকা থোকা ফুল ফুটেচে বেড়ার ঝোপজঙ্গলে। ঝিঁঝিঁ ডাকচে ডোবার ধারে। মনে হয় চাঁদ উঠচে পূর্বদিকের আকাশে। আকাশের নক্ষত্রদল পাৎলা হয়ে এসেচে। বোধহয় পৃথিবীর কৃষ্ণা প্রতিপদ কিংবা দ্বিতীয়া তিথি।

পুষ্প করুণাদেবীর দেখা পায়নি বহুদিন।

তিনি নানা ধরনের কাজে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন, পুষ্প সেজন্যে তাঁকে তেমন ডাকে না। আজ অনেক দিন পরে পুষ্পের মনে হোল, করুণাদেবীব একবার খোঁজ করা দরকার। সে ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে উচ্চস্বর্গে উঠে গেল, তাঁর সেই ক্ষুদ্র গ্রহটিতে, সেই কুসুমিত উপবনে। যখনই সে এখানে আসে তখন কি এক বিস্ময়কর আবির্ভাবের আশায় সর্বদা সে থাকে, কি সৌন্দর্য ও শান্তির লীলাভূমি এই পবিত্র দেবায়তন। সুগন্ধ কিসের সে জানে না, কোন্ ফুলের সে সুগন্ধ তাও জানে না—কিন্তু অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয়, সারা মন খুশি হয়ে ওঠে হঠাৎ।

মহারূপসী দেবী ওকে হাসিমুখে হাত ধরে একটি বিশাল বনস্পতিতলে স্ফটিক বেদীতে নিয়ে গিয়ে বসালেন। পুষ্প চেয়ে চেয়ে অবাক হয়ে ভাবলে—এ গাছ তো এত বড় দেখিনি, এত বড় গাছই তো ছিল না।

করুণাদেবী মৃদু হেসে বল্লেন—কি ভাবচ, গাছটার কথা? ও তৈরি করেচি। বনস্পতিতে ভগবানের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব। তাই দেখি সারা সময় চোখের সামনে।

—কি গাছ?

—পৃথিবীতে ছিল না কোনো দিন, নাম নেই।

—আমি আপনার কাছে কোনো অপরাধ করেছিলাম কি? দেখা দেননি কতদিন।

আমার কষ্ট তো জানেন সব। আপনি একবার চলুন, যতীনদা বড় কাতর হয়ে পড়েচে, আশা-বৌদি নরকে। আত্মহত্যা করেছিল।

করুণাদেবী অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসলেন। বল্লেন—সব জানি। আমার পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের সন্ধান রাখিনে আমি! আমিই যতীনের ব্যাকুলতা দেখে তার সঙ্গে ওর স্ত্রীর দেখা করিয়ে দিই। নইলে নরক থেকে পৃথিবীতে গিয়ে দেখতে পেতো না যতীনকে। এই দেখাতে আশার উপকার হবে—

যতীনদা সেই থেকে কিন্তু পাগলের মত হয়েচে—

—যতীন অজ্ঞান।

—আপনি ভাল বোঝেন সব, দেবী। আপনি যতীনদা'কে সুখী করুন। ওর কষ্ট দেখতে পারিনে। আশা বৌদির ভাল হয় কিসে?

করুণাদেবী ওকে কাছে টেনে নিয়ে ছোট্ট মেয়েটির মত ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে ওর গালে হাত বুলিয়ে অতি ধীর শান্ত সুরে বলতে লাগলেন—পুষ্প, তোকে ভালবাসি বড়। মনে আছে সব। ভাল হবে শেষে, কিন্তু—লক্ষ্মী, পুষ্প—

—কি দেবী?

করুণাদেবীর চোখে জল! পুষ্প অবাক হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে কেমন মায়া হোল এই রাজরাজেশ্বরীর মত রূপবতী মহাশক্তিধারিণী দেবীর ওপর, কোলে শায়িতা ছোট্ট খুকী যেন, তার মেয়েটির মত। ভগবান এমন ভাবেই বোধ হয় মানুষের কাছে ধরা দেন ঐশ্বর্য লুকিয়ে। সে নিজের অজ্ঞাতসারে অসীমস্নেহে করুণাদেবীর চোখের জল মুছিয়ে দিলে নিজের বস্ত্রাঞ্চলে।

দেবী বল্লেন—তোকে বড় দুঃখ পেতে হবে—

পুষ্পের বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে উঠলো। কেন, কিসের দুঃখ? কি কথা বলতে চাইচেন দেবী?

দেবী আবার বল্লেন—যতীন ও তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে আমার সঙ্গে। তার দরকার আছে। তুই চলে যা পুষ্প, আমি যাবো তোরই বাড়ীতে একটু পরে। তারপর আমার সঙ্গে তোদের পৃথিবীতে একবার যেতে হবে।

—দেবী, গ্রহদেবের দেখা পাবো?

—সময়ে পাবে পুষ্প। তিনি কিছু পূর্বে এখানে ছিলেন।

উচ্চস্বর্গে দেবলোকের প্রেমিক-প্রেমিকা। পুষ্প যতই এঁদের দুজনকে দেখে, ততই আনন্দে ও শান্তিতে মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।

পুষ্প ও যতীনকে সঙ্গে নিয়ে করুণাদেবী একটি পুরাতন শহরে এলেন।

বাড়ীঘর সব পুরোনো ধরনের, পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে চলেচে, রাস্তাঘাট সেকালের ধরনের সরু সরু। একটা পুরোনো বাড়ী গলির মধ্যে, সেই বাড়ীর পাশে ছোট্ট একটা বাগান। বেলা গিয়েচে, সন্ধ্যার কিছু আগে। বাড়ীটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পুষ্প ও যতীন দুজনেরই মনে হোল, এখানে ওরা যেন এর আগে এসেচে। যেন কতকাল আগে, ঠিক মনে করতে পারচে না।

হঠাৎ যতীন বল্লে—এটা কোন্ জায়গা দেবী, আমি এ বাড়ী চিনি বলে মনে হচ্চে—

তার মন আজ আনন্দে পূর্ণ, কারণ বহুদিন পরে আজ সে করুণাদেবীর দেখা পেয়েচে। এ যে কত সৌভাগ্যের কথা, এতদিন এখানে থেকে সে ভাল বুঝেচে।

দেবী বল্লেন—বেশ, বাড়ীর ভেতর যাও—

যতীনের মনে হোল এ বাড়ীর ভেতরের উঠোনে একটা পেয়ারার গাছ আছে, সে কতকাল আগে সেই গাছ থেকে পেয়ারা পেড়ে খেতো। বাড়ীর মধ্যে ঢুকতেই একটি

ছোট ঘর। একটা কুলুঙ্গির দিকে চাইতেই যেন বহু পুরোনো দিনের সৌরভের মত কোথাকার কত হারানো দিনের বহু অস্পষ্ট স্মৃতির সৌরভ এল কুলুঙ্গিটা থেকে। এক সুন্দরী নববধূর মুখ যেন মনে পড়ে, ঐ কুলুঙ্গিতে সে তার মাথার কাঁটা রাখতো শোবার আগে, এই ঘরের সঙ্গে যেন এক সময়ে কত সম্পর্ক ছিল ওর। বাড়ীটাতে অনেক ছেলে-মেয়ে চলাফেরা করচে, দুটি মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক রান্নাঘরে কাজকর্ম করচে। ঐ তো সেই পেয়ারা গাছটা। ওর তলায় বসে সে কত খেলা করেচে একটি মেয়ের সঙ্গে—মেয়ে-টিকে সে বড় ভালবাসতো। আজও যেন তার মুখ মনে পড়ে—কোথায় যেন চলে গিয়েছিল মেয়েটি।

পুষ্প ওর পেছনে পেছনে এসে বাড়ীর মধ্যে ঢুকচে। সে বল্লে—যতীনদা, ওই সেই পেয়ারা গাছ—

—কোন্ পেয়ারা গাছ—

—মনে পড়চে ওর তলায় তুমি আর আমি খেলা করতাম, অনেক কাল আগে—স্পষ্ট মনে হচ্চে—

—তুই তবে সেই মেয়ে পুষ্প—আমারও সব মনে পড়েচে। তুই মরে গিয়েছিলি আমার আগে। সে সব দিনের দুঃখুও যেন মনে আসচে।

—তুমি মারা গিয়েছিলে যতীনদা। আমায় ওই বলে গালাগালি দিও না, বালাই ষাট, আমি মরবো কেন?

—দেবী সঙ্গে নেই তাই তোর বাড় হয়েচে, তুই যা তা বলচিস আমায় পুষ্প! আচ্ছা, বল্ তো, এক জায়গায় এ বাড়ীতে এক বুড়ো লোক বসে থাকতো, তার কি যেন হয়ে-ছিল, বসেই থাকতো। মনে পড়চে তোর?

—মনে হয়েচে, দেওয়ালের গায়ে বালিশ ঠেস্ দিয়ে।

যতীনের মনে হচ্ছিল যেন সে একটি সুপরিচিত স্থানে বহু, বহু কাল পরে আবার এল। এ বাড়ীর সব ঘরদোর সে চেনে, অনেক কাল আগে এ বাড়ীতে সে বেড়িয়েচে প্রত্যেক ঘরদোরে। বহু প্রিয়জনের দূরাগত স্মৃতি যেন একটি গুরুভার বেদনার মত বুকে চেপে বসেচে।

বাড়ীর ছেলেমেয়েরা রান্নাঘরে খেতে বসেচে। খুব গোলমাল করচে নিজেদের মধ্যে। ওদের প্রতি এমন একটি স্নেহ হয়েচে যতীনের, এরা অতি আপনার জন, কতদিনের সম্বন্ধ এদের সঙ্গে। যতীন দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো। ছেলেমেয়েদের খাওয়া হয়ে গেল, ওদের মা এবাব হাতায় করে দুধ পাতে পাতে দিচ্চে। অনেক পুরোনো হয়ে গিয়েচে বাড়ীটা, তার জানা বাড়ী এর চেয়ে ভাল, নতুন ছিল। সে সব বুঝতে পেরেচে, করুণা-দেবী তাদের কেন এখানে এনেচেন।

পুষ্প বল্লে—যতুদা, আমাদের পূর্বজন্মের দেশ। কোন্ গ্রাম এটা বলতে পারো? তুমি আমি এখানে জন্মেছিলাম।

—তুই মরে গিয়েছিলি আমার আগে—রাগ করিস্‌নি বলচি বলে।

—আমার মনে পড়েচে।

—গত জন্মেও তাই। এই রকমই হচ্চে জন্মে জন্মে। তুই মারা যাচ্চিস, আমি তোর পেছনে যাচ্চি। কিন্তু আর একটি মেয়ের কথা বড় মনে পড়চে। তাতে আমাতে কিছু-দিন এখানে ছিলাম। তারপর সেও কোথায় গেল চলে।

ওরা বাইরে এল। করুণাদেবী বল্লেন—মনে পড়লো?

কিন্তু এ যে অদ্ভুত মনে পড়া। কত নিবিড় বর্ষারাতের টিপ টিপ জলপতনের সঙ্গে, কত বসন্তের প্রথম রোদে পোড়া মাটির গন্ধের সঙ্গে জীবনের মস্ত বড় যাত্রাপথ একসুরে

বাঁধা, আনন্দের নিবিড় স্মৃতি সেখানে বেদনার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েচে—গভীর বেদনা, যা শুধু জন্ম-জন্মান্তরের হারানো প্রিয়জনের বার্তা বহন করে আনে অন্তরতম অন্তরে। মনে হয়, সবই কি তবে মিথ্যে, সবই স্বপ্ন?

যতীনের দিশেহারা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে ওর মনের কথা পরিস্ফুট হোল। করুণাদেবী বল্লেন—ওই জন্যে তোমাদের এনেচি। এখানে তোমাদের ঠিক এবারকার জন্মের আগের জন্মভূমি।

পুষ্প বল্লে—এ কোন্ গ্রাম দেবী? নাম মনে নেই।

—ত্রিবেণী। গঙ্গার তীরে। ঐ গঙ্গা—

—তা হোলে গত দুই জন্মে আমরা কাছাকাছিই ছিলাম, গঙ্গারই ধারে। এবার তো হালিসহরের এ পার সাগঞ্জ-কেওটায়।

—স্থানের আকর্ষণ অনেক সময় এমন হয় যে গত জন্মের ভূমিতে কোনো না কোনো সময় আসতেই হবে। তবে জন্মান্তরীণ স্মৃতি সব আত্মার থাকে না পৃথিবীর স্থূল-দেহে। কখনো কেউ জাতিস্মর হয়। জাতিস্মর হওয়া উচ্চ অবস্থার লক্ষণ।

যতীন এতক্ষণ চুপ করে ছিল। তার মন ভাল নেই। জগৎ ও জীবন দেখচি সব ভেল্‌কির মত। কোন্‌টা সত্যি? কোন্‌টা মিথ্যে? বাজে জিনিস সব। বাঁচা মরা কিছুরই মধ্যে কিছু নেই। কেন এ বিড়ম্বনা?

সে জিজ্ঞেস করলে—দেবী, এরা আমার কে? এখন যারা আছে?

—তোমার পৌত্রের পৌত্র।

—আর পুষ্পের?

—পুষ্প অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়। আশা এ বাড়ীতে তোমার প্রথমা স্ত্রী ছিল। সে অল্পবয়সে তোমায় ছেড়ে চলে যায় এবারের মত। আমিই তোমাদের মিলিয়ে দিয়েছিলুম তিনজনকে আবার এ জন্মে। কিন্তু কর্মের ফল আমি খণ্ডন করতে পারিনি তোমাদের—চেষ্টা করলাম, কিন্তু কর্মশক্তি নিজের পথ ধরল ঠিক।

যতীন হতাশ সুরে বল্লে—আপনি যখন পারলেন না, তখন আর কি উপায় দেবী। আপনি স্বয়ং যখন—

করুণাদেবী বল্লেন—কর্মের বন্ধন স্বয়ং ভগবান কাটতে পারেন চোখের পলকে। তিনি ছাড়া আর কে পারে।

—আমি কি করেছিলাম দেবী, কেন আমার এ দুর্ভাগ্য দুই জন্ম ধরে?

—এরও আগের জন্ম দেখবে? কিন্তু ছবি দেখাবো। সামনের আকাশে চাও—সে স্থান এখন আর নেই, প্রাচীন গৌড়ের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র গ্রাম। সে জন্মে প্রথমা স্ত্রীর মনে কষ্ট দিয়ে দুবার বিবাহ করেছিলে। সে তোমায় বড় ভালবাসতো। সেজন্যে তাকে আর আপনার করে পেলে না পর পর দু'জন্মেও। সতী লক্ষ্মীর মনে বড় কষ্ট দিয়ে ত্যাগ করেছিলে।

—সেও কি আশা?

—না।

—তবে সে কে দেবী? বলুন দয়া করে—সে কি অন্যত্র চলে গিয়েচে?

—সে এই তোমার পাশেই দাঁড়িয়ে। সতীলক্ষ্মী তোমায় ছাড়েনি, কিন্তু তোমার কর্মফলে তুমি ওকে পাচ্চ না। আমি পর পর দু'জন্ম চেষ্টা করচি, কিন্তু পেরে উঠচি কই!

পুষ্প অবাক হয়ে দেবীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। এ সব কথা তার মনে নেই।

করুণাদেবী বল্লেন—তারও পূর্ব জন্মে তোমার কর্ম আরও খারাপ। যাক্ এ সব

কথা। তোমাকে তিন জন্মের কথা জানতেই হবে, এর কারণ আছে। পুষ্প, তুই কষ্ট পাবি আমি জানি। আমি চেষ্টা করবো সে দুঃখ দূর করতে। যতীনকে ওর পূর্বজন্ম দেখালাম, কারণ ওর আত্মার প্রয়োজন হয়েচে।

পুষ্প বিবর্ণ মুখে বল্লে—কেন দেবী?

করুণাদেবী ওর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন—যতীনকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হবে।

পুষ্প জানে। সে জানে তার প্রশ্ন নিরর্থক। সে অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেচে। এই ভয়ই তার মন করছিল।

যতীন চমকে উঠলো। এত অল্পদিনে আবার পুনর্জন্ম কেন? কোথায় রইল আশা, কোথায় রইল পুষ্প—কার কাছে যাবে সে পৃথিবীতে?

তখনি তার মন বলে উঠলো—কেন, মায়ের কাছে। যার কোল আঁধার করে সে চলে এসেচে।

করুণাদেবী বল্লেন—যতীন, তোমার অন্তরাত্মা চাইচে ঐ দুঃখিনী মায়ের কোলে আবার ফিরে যেতে। তোমার মায়ের অন্তরাত্মা কাঁদচে তোমার জন্যে। সেখানে যেতে হবে তোমাকে। এ বাঁধন এড়াবার যো নেই। মাতৃশক্তি জগতের মধ্যে খুব বড়। তা ছাড়া আশার জন্যে তোমাকে যেতে হবে ভূলোকে। ভূবর্লোকের কোন উচ্চস্তরে ও যেতে পারবে না—বেচারী! গ্রহদেবকে আমি বলেচি, আশার অন্তরাত্মা কাঁদচে, অনুতাপে সব পাপ মোচন হয়। আশাকেও আবার পৃথিবীতে পাঠাবো—তুমি জন্মগ্রহণের কিছু পরে। এই পাঁচ ছ'বছর ওকে নরকেই থাকতে হবে। তার আত্মা তাতে উন্নতি করবে। নিজের ভুল ক্রমশ বুঝবে। এই জন্মে আমি আবার তোমাদের মিলিয়ে দেবো। বোধ হয় তোমাদের প্রারব্ধ ও জন্মে কেটে যাবে।

পুষ্প পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে সব শুনলে। আকাশ পৃথিবী তার কাছে অন্ধকার হয়ে গিয়েচে ততক্ষণে। জন্ম-জন্মান্তর যে জীবনের মাস, ঋতু ও বৎসর মাত্র, তাও যে শূন্য, অন্ধকাব। ভূমা নয়, অল্পেই তার সুখ ছিল।

করুণাদেবী সব জানেন। পুষ্পকে তিনি বুঝিয়ে বল্লেন। আশার জন্যেও স্বার্থত্যাগ তাকে করতে হবে, যতীনের জন্যেও। এই জন্মে আশার সব ভুল মুছে দেওয়ার চেষ্টা তিনি করবেন। আচার্য রঘুনাথদাস আশার আত্মার জন্যে তাঁর ইষ্টদেবকে জানিয়েছিলেন।

ভক্তের ক্ষমতা বড় তুচ্ছ নয়। গ্রহদেবের আসন টলেচে।

পুষ্প বল্লে—বুঝেচি। তিনি মহাপুরুষ, সেদিন যখন নরকে নিয়ে গেলেন আমায়, তখনই আমাব মনে হোল নরক পবিত্র হোল! আপনারও আসন টললো—আমি ডাকলে আপনি ছাই আসেন!

করুণাদেবী বালিকাব মত সকৌতুকে খিল্ খিল্ করে হাসলেন। বল্লেন—তুই আমার ওপর রাগ করলি বুঝি? ছিঃ—লক্ষ্মী দিদি—

পুষ্পের অভিমান তখনও যায়নি। সে দুষ্টু মেয়ের মত ঘাড় বেঁকিয়ে চুপ করে রইল।

দেবী বল্লেন—তোকে আমার কাছে নিয়ে যাবো পুষ্প।

—না। আমাকেও পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিন না, দিন না দয়া করে। সত্যি বলচি। স্বর্গে আমার দরকার নেই।

—পৃথিবীতে পাঠিয়ে কি হবে? এবার যে চেষ্টা করবো ওদের দুজনকে মিলিয়ে দিতে। পৃথিবীর মিলন না হোলে আশার প্রারব্ধ কিছুতেই কাটবে না। এ আত্মত্যাগ

তুই করতে পারবি আমি জানি। ওরা জন্ম নিলেই তো সব ভুলে যাবে, কোনো কথা মনে থাকবে না এ জন্মের। আমি আবার দেখা করিয়ে দিই, যে যাকে চায় মিলিয়ে দিই। নতুবা জীবের কি সাধ্য?

পুষ্প বল্লে—আমাকেও পাঠিয়ে দিন, সব ভুলে থাকি।

করুণাদেবী ওকে কাছে নিয়ে এলেন আদর করে। পুষ্পের দেহ শিউরে উঠলো, কি অপূর্ব সুগন্ধ দেবীর সারাদেহে, কি অপূর্ব স্পর্শসুখ! সে মেয়েমানুষ, তবুও এই রূপসী দেবীর স্নিগ্ধস্পর্শে ওর সারাদেহে যেন তড়িৎসঞ্চার হোল। অমৃতস্পর্শে আত্মা যেন নিজের অমরত্ব, অনন্তত্ব অনুভব করলে এক মুহূর্তে।

সস্নেহে বল্লেন—পুষ্প, তোকে পৃথিবীতে আর জন্ম নিতে হবে না। শুক্লা গতির পথে তোর অনাবৃত্তি লাভ ঘটেচে। ওরা এখনও অপরিণত, শেখবার বাকি আছে, কর্ম এবার নষ্ট হয়ে যাবে হয়তো। পৃথিবীর জীবন বেশিদিনের নয়। আত্মার পক্ষে চোখের পলক মাত্র। আমি এবার যাই পুষ্প।

পুষ্প বল্লে—আমায় পৌঁছে দিয়ে যান—

—নিশ্চয়, চল যাই।

যাবার সময় করুণাদেবী বলে গেলেন, তাঁকে স্মরণ করলেই তিনি আসবেন।

যতীন একা বসে ছিল বাড়ীতে। পৃথিবীতে আবার জন্ম নিতে হবে। শত সুখ-দুঃখের বন্ধনে আবার জড়ানো, মন্দ কি? সেই গরীব ঘরের বৌটির কোল আলো করে আবার শিশু হয়ে কত বাল্যলীলা করবে, নতুন আস্বাদ, আবার আসবে আশা—হতভাগিনী আশা—নববধূরূপে তার ঘরে, আবার কত বর্ষারাত্রি, কত বসন্তপ্রভাত ওর সাহচর্যে কাটবে। পৃথিবীতে যেতে তার কষ্ট নেই, মধুর সেখানকার শৈশব, মধুর কৈশোর, মধুর যৌবন। চিরযৌবনের হাওয়া যেন বয় তার অমর আত্মায়, পৃথিবীতে মাস যাবে মাস আসবে, নতুন ধানের গন্ধ বেরুবে ক্ষেতে ক্ষেতে, ক্ষুধায় বনের মেটে আলু তুলে নুন দিয়ে পুড়িয়ে খাবে, তার মা যখন বৃদ্ধা হয়ে যাবে তাকে খাওয়াবে, আশা সংসার পাতবে নতুন লক্ষ্মীর হাঁড়িতে ধান দিয়ে।...

কেবল কষ্ট হয় পুষ্পের জন্যে। এতদিন ওর সঙ্গে থেকে কি মায়াই হয়েচে ওর ওপরে। কেন এমন বিচ্ছেদ? কি কষ্ট পাবে পুষ্প, তা সে জানে। আশা যদি কষ্ট না পেতো, যতীন কিছুতেই যেতো না।

পুষ্প এসে ওর হাত ধরে বল্লে—যতীনদা!

—কি পুষ্প?

—আমায় ভুলো না।

—আচ্ছা, পুষ্প—তুই বলতে পারিস, কেন আমাদের জীবনে এ দুর্ভাগ্য, কেন বার বার তোকে হারাচ্চি? তোর বৌদিদিকে হারাচ্চি?

—আমায় নিয়ে যাও সঙ্গে—

—ছিঃ পুষ্প। দেবী যা বলেন তাই তোমার আমার পক্ষে শুভ। ওঁর কথা শোনো।

—আমি কারো কথা শুনবো না, আমি যাবো।

—কি, এবারও একসঙ্গে খেলা করবি পুষ্প? তেমনিধারা সাগঞ্জ-কেওটার ঘাটে? বেশ—অদ্ভুত সে সব দিন।

যতীন চোখ বুজে ভাবতে লাগলো। পুষ্প ওর হাত ধরে বসে রইল, বল্লে—তাই তো সাগঞ্জ-কেওটার বুড়োশিবতলার ঘাট এ লোকেও ভুলতে পারিনি। জন্মান্তরের স্মৃতিতেও অক্ষয় যেন হয়। তোমার যাওয়ার পথে দেবতারা ফুল ফেলুন যতুদা—আমি হতভাগিনী চিরকাল একাই থাকবো। এই আমার ভাগ্য।

যতীন ওর মুখের দিকে চেয়ে বল্লে—আমার মুক্তিতে দরকার নেই, কোনো কিছুর দরকার নেই। সমাধি-টমাধি, দেবী-টেবী সব বাজে। তোকে ছেড়ে যাবো না।

—আশা ?

—তার অদৃষ্টে যা হয় হবে পুষ্প।

—ঠিক কথা যতুদা ?

—প্রাণের সত্য কথা বল্লাম। এখন আমার অন্তর যা বলচে। সব তুচ্ছ হয়ে গিয়েচে আমার কাছে—তুই থাক্ পুষ্প আমার !

—জগতের, বিশ্বের বহুদূর সীমানায় চলে যাও যতুদা, তোমায় মুক্তি দিলাম। ভালবেসো, ভুলো না।

—ওসব থিয়েটারী ধরনের কথা কোথায় শিখলি রে ? তোদের দোহাই, মুক্তি-টুক্তির কথা আমায় শোনাস্‌নে। চল্ তুই আর আমি পৃথিবীতে যাই, ছোট্ট নদীর ধারে কুঁড়ে-ঘরে সংসার পাতবো। সেই আমাদের স্বর্গ, সেই আমাদের সব।

পুষ্পের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো ঝরঝর করে। সে কোনো কথা বল্লে না।

সেদিনই যতীনের মনে হোল কে যেন কোথায় তাকে ডাকচে...সব সময় তার প্রাণের মধ্যে কিসে যেন মোচড় দিচ্চে...আশা, অভাগিনী আশা, ভূবর্লোকের নীচের স্তরে অসহায়া একাকিনী পড়ে আছে, কেউ নেই তাকে দেখবার।

সত্যি আশা তাকে ডাকচে। তার অন্তরাত্মা শুনতে পেয়েচে অভাগিনীর ডাক।

সে পুষ্পকে কথাটা বল্লে।—তোর বৌদিদি বড্ড কাঁদচে পুষ্প। সেদিন কুড়ুলে-বিনোদপুরের বাড়ীতে হঠাৎ দেখা হওয়ার পর থেকে ওর ডাক প্রায়ই শুনি।

—আমি যাই সেখানে যতুদা, তুমি যেও না। দেখে আসি।

—কিছু ভাল লাগে না ওর জন্যে।

—কেন তোমাকে যেতে বারণ করি, ও সব নীচের স্তরে তোমায় যেতে দিতে আমার মন সরে না।

—তুই তো যাস্ দিব্যি।

—আমি গিয়েছিলাম আচার্য রঘুনাথের কৃপায়। মহাপুরুষদের বিশেষ দয়ায় বিশেষ শক্তি হয়। নয়তো ওই স্তরে নানান রকমের নিম্নশ্রেণীর শক্তি খেলা করচে সর্বদা, মহা-পুরুষদের কৃপায় বিশেষ শক্তি লাভ করে সেখানে গেলে ওই সব দুষ্ট শক্তি কোনো অনিষ্ট করতে পারে না। নয়তো বিপদ পদে পদে—এই জন্যেই তোমাকে ওখানে যেতে দিতে চাইনে যতুদা। চলো দেখি কি উপায় হয়।

রঘুনাথদাসের আশ্রমে যাবার পথে কবি ক্ষেমদাসের সঙ্গে দেখা। তিনি আপন মনে একটি বৃক্ষতলায় চুপ করে বসে ; অতি সুন্দর নির্জন স্থানটি, বনপুষ্প ফুটে আছে ঝর্ণার ধারে। ওরা কাছে গিয়ে দেখলে পৃথিবীর দিকে তিনি একদৃষ্টে চেয়ে কি যেন দেখছেন। ওদের দেখে সস্মিত মুখে সম্ভাষণ করলেন। যতীন ও পুষ্প দুজনেই ওঁকে প্রণাম করে পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

ক্ষেমদাস বল্লেন—কোথায় যাচ্চ তোমরা ?

পুষ্প বল্লে—রঘুনাথদাসের আশ্রমে। বড় বিপদে পড়ে যাচ্ছি। আপনিও শুনুন দেব—যদি কিছু উপায় হয়। তারপর সে আশার কাহিনী সব খুলে বল্লে।

ক্ষেমদাস সব শুনে ধীরভাবে বল্লেন—এই দুঃখ সনাতন। আত্মা নিরন্তর সাধনা করচে নিজেকে জানবার। আমার নিজের জীবনেও এমনি হয়েছিল। আমি তাই এখানে বসে বসে ভাবছিলাম, আবার পৃথিবীতে পূর্ণিমার জ্যোৎস্না উঠচে যেমন উঠতো

পাঁচশো বছর আগে, অনাদ্যন্ত মহাকাল নিজের কাজ করে চলেচে যেমন করতো হাজার বছর কি দু-হাজার বছর আগে—আমি পৃথিবীতে একটি মেয়েকে কত ভালবাসতাম, আমাদের গ্রামের সদানন্দী মাঠের ফুলবাগানে কত বেড়াতাম দুজনে এমনি জ্যোৎস্নারাত্রে—লুকিয়ে লুকিয়ে,—এখন সে কোথায়?

অনেকটা অন্যমনস্ক ভাবেই কবি মাথা দুলিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লেন—সত্যি তাই ভাবি, কোথায় সে?

পুষ্প অবাক হয়ে বল্লে—কেন, আপনি তাঁর দেখা পাননি আর?

—না। বিশ্বের ভিড়ে কোথায় হারিয়ে গেল। দ্যাখো, আমরা কবি, জগতে রূপরসের উপাসক। এ'কেই বড় করেচি জীবনে। যাঁরা বলেন সব মায়া, তাঁদের কথা বুঝি না। মায়া লয় হোলে এই রূপরসের জগৎটাও লয় হয়। তা আমরা চাইনে—তাই দুঃখ পাই, কিন্তু দুঃখের মধ্যেও জানি ভগবানই সৃষ্টি করেচেন এই জগৎ। সবই তিনি। কষ্ট পেলেও জানি তাঁর হাতে কষ্ট পাচ্ছি। প্রেমময়ের তাড়নায় কষ্ট কি? সব মুখ বুজে সহ্য করি। এটাও মানি, এই রূপরসের সাধনার মধ্যেই আমাদের সিদ্ধি। এ পথেও তাঁকে পাওয়া যায়। চলো, নরকে আমি নিজে যাবো, খুঁজে বার করি তোমাদের সেই মেয়েটিকে। তার দুঃখ আমি কবি আমি বুঝি—

যতীন বল্লে—প্রভু, আমার পুনর্জন্ম ঠিক হয়ে গিয়েচে সেই মেয়েটিকে নিয়ে। করুণাদেবী জানিয়েচেন—

ক্ষেমদাস বল্লেন—তিনি যা করেচেন, তোমাদের মঙ্গলের জন্যেই। তিনি পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবী—তাঁকে তোমরা করুণাদেবী বল, দুর্গা বল, লক্ষ্মী বল, সীতা বল, সরস্বতী বল—সবই এক। তবে এখন মেয়েটির কাছে যাবার কোনো প্রয়োজন নেই। উপায় হয়ে গিয়েচে।

যতীন আশ্চর্য হয়ে গেল শুনে। অত বড় বড় পৌরাণিক দেবীর সঙ্গে সে করুণা-দেবীকে এক আসনে বসায়নি। উনি যদি দুর্গা হন, কালী হন, সীতা হন, লক্ষ্মী হন—তবে তার আর জন্মমরণের ভয় কিসের? আশারই বা ভয় কিসের? হাসিমুখে সে মহাগৌরবে নরকে যেতে প্রস্তুত।

ক্ষেমদাস ওর মনের ভাব বুঝে বল্লেন—জন্ম নিতে দুঃখ কিসের? পৃথিবীর রূপরস আবার আস্বাদ করে এসো। সেই জ্যোৎস্না, সেই বনবিতান, কোকিলের কুহুতান, সেই মায়ের কোলে যাপিত একান্তনির্ভরতার শৈশব, প্রথম যৌবনে প্রিয়ার প্রথম দর্শন—যাও যাও, ওরই মধ্যে ভগবানে মন রেখো—কর্ম যতদিন না কাটে—

কিয়ে মানুষ জনমিয়ে পশুপাখী অথবা কীটপতঙ্গে
করমবিপাকে গতাগতি পুন-পুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে।

মেয়েটির কাছে যাবার কোনো দরকার নেই। দেবী যখন তার ব্যবস্থা করেচেন, তখন আমাদের সেখানে যাওয়া ধৃষ্টতা হবে। দেবী সর্বমঙ্গলা তাকে শ্রেয়ের পথে চালিত করবেন।

ঠিক সেই সময়ে একজন জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের আবির্ভাব হোল বৃক্ষতলে। যতীন তাঁর দিকে চেয়েই চমকে উঠলো, ইনি সেই সন্ন্যাসী, যিনি একদিন স্পর্শদ্বারা তার মধ্যে সবিকল্প সমাধির অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছিলেন! সেই যোগী পুরুষই—নীল বিদ্যুতের মত আভা বেরুচ্চে, সারা দেহ থেকে ওঁর।

যতীনের দিকে চেয়ে তিনি মৃদু হেসে বল্লেন—মনে আছে?

যতীন তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিলে, পুষ্পও তাই করলে। ক্ষেমদাস চুপ করে বসে রইলেন।

তিনি আবার বল্লেন—মনে আছে? বলেছিলাম সময় পেলে দেখা দেবো। এই সেই মেয়েটি বুঝি? এ'র তো খুব উচ্চ অবস্থা দেখচি। ক্ষেমদাসের দিকে চেয়ে বল্লেন—কবি যে! কি করচ বসে বসে?

ক্ষেমদাস বল্লেন—তোমাদের মত সমাধির চেষ্টায় আছি—

—ও তোমাদের অনেক দূর। মায়িক-জগতের বন্ধন এখনও তোমাদের কাটেনি। আবার এদেরও মাথা খাচ্চ কেন ও কথা বলে?

—আমিও ঠিক ওই কথাই তোমায় বলতে পারি। অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান-ট্যান এই সব কচি কচি ছেলেমেয়ের মাথায় ঢোকাচ্চ কেন!

সন্ন্যাসী হেসে ক্ষেমদাসের কাছে এসে দাঁড়িয়ে সস্নেহ সুরে বল্লেন—তুমিও ঐ দলেরই একজন। কবি কিনা, মিথ্যা কল্পনার রাজ্যে বাস করো।

পুষ্প সময় বুঝে বল্লে—প্রভু, জানেন এ'র প্রতি পুনর্জন্মের আদেশ হয়েচে!

সন্ন্যাসী বল্লেন—নয়তো কি ভেবেচ ইনি মায়ার অতীত হয়ে যাতায়াতের চক্রপথ এড়িয়ে ব্রহ্মত্ব লাভ করেচেন? আত্মানং বিদ্ধি—আত্মাকে জানো—আত্মাকে না জানলে যাতায়াত বন্ধ হবে না—

ক্ষেমদাস বলে উঠলেন—বয়েই গেল। ক্ষতিটা কি?

—বাজে কথা বলো না কবি। তোমার ক্ষতি না হতে পারে। তোমার মত চোখ আর মন নিয়ে ক'জন পৃথিবীতে যাবে? সাধারণ লোক গিয়ে অর্থ, যশ, মান, নারী নিয়ে উন্মত্ত থাকবে। প্রকৃতির সৌন্দর্য মায়ার খেলা হোক—তবুও স্বীকার করি, দেখতে জানলে তা দেখেও সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভের প্রতি মানুষের মন পৌঁছতে পারে। ও যে একটা সোপান। কিন্তু তা ক'জনের চোখ থাকে দেখবার? আর্তের সেবা করে কজন? কাজেই মানুষের দুঃখ যায় না। মনে আনন্দ পায় না; ভোগ করতে করতে একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করে জরার অধিকার শুরু হয়েছে! তখন মৃত্যুভয়ে বলির পশুর মত জড়-সড় হয়ে থাকে। তা ছাড়া আছে শোক, বিচ্ছেদ, বিত্তনাশ, অপমান, আশাভঙ্গের যন্ত্রণা। কোথায় সুখ বলো?

—দুঃখের মধ্যেই আনন্দ হে সন্ন্যাসী—দুঃখ ভোগ করতে করতেই আত্মা বড় হয়ে ওঠে, বীতস্পৃহ হয়, বীতমন্যু হয়, বীতশোক হয়। ভগবানের দিকে মন যায়। জন্মে জন্মে আত্মা বললাভ করে, জন্ম-জন্মান্তরের চিতার আগুনে পুড়ে সে ক্রমশ নির্মল, শুদ্ধ, জ্ঞানী হয়ে ওঠে। ভগবানেরই এই অবস্থা—এ তুমি অস্বীকার করতে পারো? ক'জন তোমার মত নর্মদাতীরে সারাজীবন তপস্যা করে ভগবানের দর্শন পেয়েচে? বহু ভুগে, বহু ঠকে, বহু নারী, সুরা, অর্থ বিত্ত ভোগ করে মানুষ ক্রমশ বিষয়ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়ে আসে—বহু জন্ম ধরে এমন চলে—তখন জন্ম-জন্মান্তরীণ স্মৃতি তাকে বলে আবার কোনো নতুন জন্মে—ও থেকে নিবৃত্ত হও, ও পথ তো দেখলে গত কত শত জন্ম ধরে, আবার সেই একই ফাঁদে পড়ো, সেই রকম কষ্ট পাবে। ভোগের দ্বারা আত্মাও তখন অনেকটা বীতস্পৃহ হয়ে উঠেচে—তখন সে ভোগ ছেড়ে ত্যাগের পথ খোঁজে।

—হ্যাঁ, তোমার কথা কাটি কি করে? তুমি কবি, অন্য পথে গিয়ে সত্যদৃষ্টি লাভ করেচ। কিন্তু একটা কথা বোঝো—যদি এক জন্মেই হয় তবে ভগবানের ওপর বোঝা চাপিয়ে শত শত জন্ম ধরে এ অনাগত চক্রে ঘোরাঘুরি কেন?...

ক্ষেমদাস সুকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন হাত দুটি সুন্দর ভঙ্গিতে নেড়ে নেড়ে—

কিয়ে মানুষ জনমিয়ে পশুপাখী অথবা কীটপতঙ্গে
করমবিপাকে গতাগতি পুন-পুন মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে—

সন্ন্যাসী বিরক্তির সুরে বল্লেন—আঃ, ও সব ভাবুকতা রাখো। আমার কথার উত্তর

দাও।

ক্ষেমদাস বল্লেন—কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ—কলিতে বহু দোষ, কিন্তু একটা গুণ এই যে, কৃষ্ণনাম কীর্তন করলেই পরামুক্তি। তাই বলেচে—

এই পর্যন্ত বলেই আবার সুর করে কি বলতে যাচ্ছিলেন, সন্ন্যাসী ধমক দিয়ে বল্লেন—আবার ওই সব! গান আসচে কিসে এর মধ্যে? তা ছাড়া আমি তোমাদের ওই কৃষ্ণটৃষ্ণ মানিনে জানো? ওসব মায়িক কল্পনা—ভগবানের আবার রূপ কি!

—তুমি শুষ্ক পথে ভগবানের সঙ্গে নিজের সত্তা মিলিয়ে অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করেচ। ভক্তিপথের কিছুই জানো না। প্রেমভক্তি এখনও বাকি তোমার।

—মরুক গে। আমার কথার উত্তর দাও—

—উত্তর কি দেব? ভোগ না হোলে নিবৃত্তি হয় না। ভগবান তা জানেন, তাই শত জন্মের মধ্যে দিয়ে জীবকে তিনি ভোগ আস্বাদ করিয়ে নিয়ে বেড়াচেচন। সবারই হবে তবে বিলম্বে।

সন্ন্যাসী শান্ত ভাবে বল্লেন—হাঁ ঠিক।

—তুমি মেনে নিলে?

—নিলাম। কিন্তু তুমি আমার কথার ঠিক উত্তর দিলে কৈ? যদি এক জন্মে হয় তবে হাজার জন্মের মধ্যে দিয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটি কেন?

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—তার কারণ, সবাই তোমার মত মুক্তিকামী নয়, তোমার মত জ্ঞানী নয়—গত জন্মে তুমি যে উচ্চ অবস্থা নিয়ে জন্মেছিলে, যে জন্ম-জন্মান্তরীণ স্মৃতির ফলে তোমার মন মুমুক্ষু হয়েছিল, সংসারের আসক্তির বন্ধন কাটিয়েছিল—তুমিই বলো না, সে কি তুমি একজন্মে লাভ করেছিলে? তুমি তো ষড়ৈশ্বর্যশালী—মুক্ত পুরুষ—তোমার অজানা তো কিছুই নেই—বলো তুমি?

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে বল্লেন—তা ঠিক। গত জন্মের পূর্ব তিন জন্মেও আমি যোগী ছিলাম। আমার সে সময়ের গুরুভ্রাতা এখনও হিমালয়ের দুর্গম শিখরে তুষারাবৃত গুহায় দেহধারী হয়ে বাস করচেন। প্রায় আটশো বছর বয়েস হোল। লোকালয়ের কিছুই জানেন না। গত সাতশো বছরের মধ্যে তিনবার নীচে নেমে গিয়েছিলেন ভারতের লোকালয়ে। একবার নেমে শুনলেন শঙ্করাচার্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করচেন। দ্বিতীয়বার নামলেন অনেকদিন পরে; নামতে নামতে শুনলেন যবনেরা ভারতে প্রবেশ করেচে—শুনে আর না নেমে গিয়ে উঠে নিজের আসনে চলে গেলেন, অনেকদিন আর নামেন নি।

পুষ্প ও যতীন রুদ্ধকণ্ঠে শুনছিল। পুষ্প অধীর কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলে—আর একবার কখন্ নেমেছিলেন?

—আমি তখন এ জন্মের পরেও দেহত্যাগ করেচি—এই সেদিন, পৃথিবীর হিসেবে বড়জোর সত্তর আশি বছর হবে। বড় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ভারতব্যাপী, আমরা অনেকে দলবদ্ধ হয়ে নেমে যাই ভারতে যদি কোন প্রতিকার করতে পারি। ওঁকেও নিয়েছিলাম আমাদের সঙ্গে। কুম্ভমেলা সেবার প্রয়াগে। উনি মেলা দর্শন করে দশদিন থেকে ওপরে উঠে যান—সেই শেষ, আর লোকালয়ে যান নি।

ক্ষেমদাস প্রশ্ন করলেন—এখনও দেহে রয়েচেন কেন?

—যোগ-প্রক্রিয়ায় দেহ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গিয়েচে, তাই দেহ ধারণ করেই আছেন। বাসনা-কামনা-শূন্য মুক্তপুরুষ তিনি, দেহে থাকাও যা, দেহে না থাকলেও তা। তাঁর পক্ষে সব সমান। স্বেচ্ছাক্রমে বিশ্বের সর্বত্র তাঁর অবাধ গতি, ব্রহ্মলোক পর্যন্ত। আমিও তাঁকে বলেছিলাম—আর দেহে কেন? উনি বল্লেন—হাম্ তো আত্মানন্দ আত্মারাম, হামারা ওয়াস্তে যো হ্যায় ব্রহ্মলোক, সো মেরা হিমবান, মেরা আসন। এহি পর পরমাত্মা বিরাজ-

মান হ্যায়। লোকালোক তো মায়া—

ক্ষেমদাস বল্লেন—হ্যাঁ, ওসব অনেক উচ্চ অবস্থার কথা। আমাদের জন্যে নয় ওসব। আমরা ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে আনন্দ পাই, এই অপূর্ব সৌন্দর্যরসের আস্বাদ করবে কে আমরা ছাড়া? তোমরা তো ব্রহ্ম হয়ে বুড়ি ছুঁয়ে বুড়ি হয়ে বসে আছ।

পুষ্প কুণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলে—প্রভু, আমাদের একবার সেই সাধুর কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাবেন?

সন্ন্যাসী বল্লেন—না মা। তিনি লোকের ভিড় পছন্দ করেন না। তবে চলো আমার পূর্বজন্মের আর একটি গুরুভগ্নীর কাছে তোমায় নিয়ে যাবো—তিনিও আজ পর্যন্ত দেহে আছেন। গভীর বনের মধ্যে গুপ্তভাবে থাকেন—প্রায় সময়ই সমাধিস্থ থাকেন। চলো হে কবি, সমাধি দেখলে তোমার জাত যাবে না—

ক্ষেমদাস বল্লেন—না হে, আমি যাবো না। তুমি এদের নিয়ে যাও—আমার ও ধর্ম নয়। কবির ধর্ম স্বতন্ত্র।

সন্ন্যাসী হেসে এসে ক্ষেমদাসের হাত ধরে বল্লেন—ভগবানের মহিমা সর্বত্র। কেন যাবে না? চলো—

—বেশ, তাহলে তুমি কথা দাও আমার সঙ্গে ভক্ত বৈষ্ণবের আশ্রমে যাবে? যদি শ্রীকৃষ্ণকে দেখাতে পারি সেখানে? প্রেমভক্তি নেবে?

সন্ন্যাসী পুনরায় হেসে বল্লেন—হবে, হবে। আচ্ছা যাবো, কথা দিলাম। প্রেমভক্তি নিই না নিই স্বতন্ত্র কথা। তোমাকেও তো আমি ষট্‌চক্রভেদ করে অদ্বৈতজ্ঞান পাইয়ে দিচ্চি না জোর করে?

কিছুক্ষণ পরে ওরা সবাই সন্ন্যাসীর পিছু পিছু পৃথিবীর একস্থানে নেমে এল। স্থানটি দেখেই ওরা বুঝলে, লোকালয় থেকে বহু দূরে কোনো এক নিবিড় অরণ্যের মধ্যে ওরা দাঁড়িয়ে। সম্মুখে একটি পার্বত্য নদী, কিন্তু নদীগর্ভে কোথাও মাটি বা বালি নেই—সমস্তটা পাষাণময়, চওড়া সমতল, মসৃণ। প্রায় একশো হাত পরিমিত স্থান কি তার চেয়ে বেশি এমনি আপনা-আপনি পাথর-বাঁধানো। তারই মধ্যভাগ বেয়ে ক্ষুদ্র নদীটি ক্ষুদ্র একটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে মর্মর-কলতানে বয়ে চলেচে। উভয় তীরে নিবিড় জঙ্গল, মোটা মোটা লতা এ-গাছ থেকে ও-গাছে দুলচে; গভীর নিশীথকাল পৃথিবীতে, আকাশে ঠিক মাথার ওপরে চাঁদ, গভীর নিঃশব্দতার মধ্যে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না-লোকে সমস্ত অরণ্যভূমি মায়াময় হয়ে উঠেচে।

ওরা মুগ্ধ হয়ে সে অপূর্ব অরণ্য-দৃশ্য দেখচে, এমন সময়ে বনের মধ্যে বাঘের গর্জন শোনা গেল, দ্বিতীয়বার শোনা গেল আরও নিকটে। যতীন সভয়ে বলে উঠলো—ওই! চলুন পালাই—

অল্প পরেই ওপারের বনের লতাপাতা নিঃশব্দে সরিয়ে প্রকাণ্ড রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হাঁড়ির মতন মুখ নদীজলে নামতে দেখা গেল এবং তার জল খাওয়ার 'চক্ চক্' শব্দ বনের ঝিল্লীরবের সঙ্গে মিলে এই গম্ভীর রহস্যময় রজনীর নৈঃশব্দ মুখর করে তুলতে লাগলো।

পুষ্প বল্লে—ভয় কি যতীনদা তোমার এখন বাঘের?

ক্ষেমদাস মুগ্ধ দৃষ্টিতে এই অপূর্ব শোভাময় জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জন বনকান্তারের দৃশ্য উপভোগ করছিলেন। দুহাত জুড়ে নমস্কার করে বল্লেন—সুন্দর। সুন্দর! নমস্কার হে ভগবান, ধন্য তুমি, আদি কবি তুমি জগৎস্রষ্টা! কর্ণামৃতে ঠিকই বলেচে:—মধু-গন্ধি...

সন্ন্যাসী বল্লেন—ব্রহ্মই জগৎ হয়ে রয়েচেন, য ওষধিষু যো বনস্পতিষু—তিনিই সর্বত্র।

সামনে যা দেখচো এও তিনি, তাঁর বিশ্বরূপের এক রূপ—তবে অত ভাবুকতা আমাদের আসে না, ইনিয়ে-বিনিয়ে বর্ণনা করা আসে না।

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—আসবে কি হে! তাহোলে তো তুমি উপনিষদ তৈরী করে বসতে। তোমার সঙ্গে উপনিষদের কবিদের তফাৎ তো সেইখানে। তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন, আবার কবিও ছিলেন। তোমার মত নীরস ব্রহ্মবিৎ ছিলেন না। ভগবানও কবি। উপনিষদে কি বলেনি তাঁকে, কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ?

সন্ন্যাসী বল্লেন—চলো চলো, যে জন্যে এসেচি। উপনিষদে কবি বলেচে যিনি দ্রষ্টা তাঁকে। যিনি প্রজ্ঞার আলোকে এক চমকে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান দর্শন করেন, চিন্তা দ্বারা যাঁকে বুঝতে হয় না, তিনিই কবি।

যতীন বল্লে—প্রভু, এ কোন জায়গা পৃথিবীর?

—এ হোল বাস্তার রাজ্য, মধ্যভারতের। এই নদীর নাম মহানদী, উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে সমুদ্রে পড়েচে। এখানে নদীর শৈশবাবস্থা দেখচ, সবে বেরিয়েচে অদূরবর্তী পাহাড়-শ্রেণী থেকে। এখন এসো আমার সঙ্গে—

নদীর ওপারে কিছুদূরে ঘন বনে একটি পর্ণ-কুটীরের কাছে ওরা যেতেই একটি সন্ন্যাসিনী তাড়াতাড়ি বার হয়ে এসে ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন। বল্লেন—আসুন আপনারা। আমার বড় সৌভাগ্য আজ—

যতীন ও পুষ্পের মনে হোল ইনি যেন ওদের অপেক্ষাতেই ছিলেন। সন্ন্যাসিনীকে দেখে যতীন অবাক হয়ে গেল, সন্ন্যাসী বলেচেন ওঁর পূর্বজন্মের গুরুভগিনী—অথচ ইনি তো কুড়ি বৎসরের তরুণীর মত সুঠাম, সুরূপা, তন্বী। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, রূপ যেন ফেটে পড়চে, মাথায় একঢাল কালো চুলের রাশ।

সন্ন্যাসী বল্লেন—ভাল আছ ভগ্নী?

সন্ন্যাসিনী হেসে হিন্দীতে বল্লেন—পরমাত্মা যেমন রেখেচেন। এ'রাও তো দেখচি বিদেহী আত্মা। এ'দের এনেচ কেন?

পুষ্প ও যতীন সন্ন্যাসিনীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। ক্ষেমদাস যুক্তকরে নমস্কার করলেন।

সন্ন্যাসী বল্লেন—এ'রা এসেচেন তোমায় দেখতে। ইনি বিখ্যাত বৈষ্ণব কবি ক্ষেমদাস—

সন্ন্যাসিনী বল্লেন—আইয়ে মহারাজ, আপকা চরণধূলিসে হামারা আশ্রম পবিত্র হো গিয়া—পরমাত্মাকি কৃপা।

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, আপনি দেবী, আপনার দর্শনে আমরা পুণ্যলাভ করলাম।

সন্ন্যাসিনীর সুন্দর মুখের লাবণ্যময় হাসি অরণ্যভূমির জ্যোৎস্নাস্নাত সৌন্দর্যকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেচে। কুটীরের দ্বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বল্লেন—এহি নদীমে আজ পূর্ণিমাকী রাতমে স্বর্গসে উতার কর্ অপ্সরীলোগ্ নহ্‌তে থে। হাম বহুৎ বরষসে দেখতে হে'। আপকো মালুম হ্যায়?

ক্ষেমদাস বল্লেন—না মা, আমরা তো জানি না। আমাদের দেখাবেন?

—আপ দেখনে মাংতা?

—হাঁ মা, দেখালেই দেখি।

সন্ন্যাসী বল্লেন—এ'র বয়েস কত বল তো যতীন?

যতীন সঙ্কুচিত ভাবে বল্লে—আমি কি বলবো? দেখে তো মনে হয় কুড়ি-বাইশ।

সন্ন্যাসিনী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলেন বালিকার মত।

সন্ন্যাসী বল্লেন—তুমি তোমার জ্ঞান-মত বলেচ, তোমার দোষ নেই। তোমার ধারণা নেই এ বিষয়ে।

সন্ন্যাসিনী বল্লেন—তুম ক্যা বোলতা হ্যায় রে বাচ্চা? হামারা তো এহি আসন পর পঁচিশ বরষ বীত গিয়া—ইসকা পহ্‌লে পঞ্জাবমে রাভি নদীকী তীরমে করিব সত্তর বরষ আসন থা। গুরুজীকা অনুজ্ঞাপর এহি বনমে মহানদীকে কিনারপর আশ্রম বনায়া।

যতীন মনে মনে হিসেব করে বল্লে—তা হোলে আমার প্রপিতামহীর চেয়েও আপনি বড়—

সন্ন্যাসী বল্লেন—ওঁর বয়েস দেড়শো বছরের কাছাকাছি—বরং কিছু বেশী হবে তো কম নয়।

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, দেহধারী হয়ে আছেন যে এখনো?

সন্ন্যাসিনী হেসে বল্লেন—বহুৎ নেতি ধৌতি কিয়া—ইসিয়ে শরীর বন্‌ গিয়া। আভি ধ্বংস নেহি হোগা কোই পান্‌ ছ' শো বরষ। কোই হরজ নেহি, রহে তো রহে।

যতীন আপন মনে ভাবলে—বাবাঃ, এই দুর্গম বনের মধ্যে উনি একা কি করে থাকেন! বাঘের ভয় করে না? এ তো বাঘের আড্ডা দেখে এলাম।

সন্ন্যাসিনী ওর মন বুঝেই যেন বল্লেন—যখন সমাধিতে থাকি তখন বাঘ আসে, বিষাক্ত সাপ এসে মাথায় ওঠে। গায়ে বেড়ায়। সমাধি ভাঙলে ওদের যাতায়াতের চিহ্ন দেখে বুঝতে পারি।

সন্ন্যাসী বল্লেন—আজকাল কি আহার ছেড়েচ?

—না। কন্দমূল খাই, বেলগাছ আছে আশ্রমের পেছনে অনেক, বেল খাই। সামান্যই আহার।

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, তুমিও কি প্রেমভক্তির বিপক্ষে? তুমিও নীরস অদ্বৈতবাদী?

সন্ন্যাসিনী হেসে বল্লেন—মাৎ পুছিযে। প্রেমভক্তি বহুৎ কৃপাসে লাভ হোতা হ্যায়—হামারা তো তিন যুগ গুজার গিয়া, ও বস্তু নেহি মিলা। কাঁহা মিলেগা বাৎলাইয়ে মহাত্মা কৃপা কর্‌। আপ দিজিয়ে হাম্‌কো!

ক্ষেমদাস বল্লেন—আমার শক্তি নেই মা। আমি কবি, এই পর্যন্ত। ও সব দেওয়া নেওয়ার মধ্যে আমি নেই। তবে তোমাকে আমি ঊর্ধ্বলোকে বৈষ্ণবাচার্যদের আশ্রমে নিয়ে যেতে পারি, তাঁদের কাছে উপদেশ পেতে পারো। তবে দরকার কি মা? তোমরা তো প্রতিক্ষণে সমাধি-অবস্থায় ব্রহ্মকে আস্বাদ করচো—কি হবে প্রেমভক্তি?

—আমার কাছে গৃহস্থদের নানা দেবদেবী আসেন, নানা দেশ থেকে আসেন—একা থাকি বলে মাঝে মাঝে সঙ্গ দিতে আসেন। লম্বদামোদর, গোপাল, উগ্রতারা, মৃন্ময়ী, শ্যামরায়, অষ্টভুজা—আরও কত কি নাম। এসে গল্পগুজব করেন, সুখদুঃখের কথা বলেন। সেদিন এক ঠাকুর এসে হাজির আপনাদের বাংলাদেশের মুর্শিদাবাদ জেলার কি গ্রাম থেকে—নাম শ্যামসুন্দর। আমায় এসে ছলছল চোখে বল্লেন—যে গ্রামে আছেন, সেখানে নাকি গৃহস্থেরা অনাদর করচে, ঠিকমত ভোগ দিচে না, খেতে পান না—এই সব। তা আমি বল্লাম—আমার কাছে কেন তুমি? আমি তোমাদের মানিনে। যারা মানে তাদের কাছে গিয়ে প্রকট হও, তোমার নালিশ জানাও, আমাকে বলে কি হবে? বালক বিগ্রহ, ওর চোখে জল দেখে কষ্ট হোল—পাষণ্ডী গৃহস্থেরা কেন সেবা করে না কি জানি। ওই সব দেখে আমার মন কেমন করে, মনে হয় প্রেমভক্তি হোলে এঁদের নিয়ে আনন্দ করতাম।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—মায়া, মায়া, নির্বিকল্প ভূমি থেকে নেমে এসে তুমি আবার ঐ সব মায়িক ঠাকুরদেবতার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে চাও?

ক্ষেমদাস বল্লেন—মা, তোমাকে প্রেমভক্তি দেবার জন্যই ওই সব দেবদেবী আসেন—আরও আসেন তুমি মেয়েমানুষ বলে—হাজার অদ্বৈতবাদী হোলেও এখন তোমাদের

মন এই এ'দের মত কঠোর, নীরস, শুষ্ক হয়ে ওঠেনি। তাই তোমার কাছে আসেন, কই এ'র কাছে তো আসেন না? এলে আমল পাবেন না বলেই আসেন না। ভগবানও প্রেম-ভক্তির কাঙাল, যে ভক্ত তারই কাছে লোভীর মত ঘোরেন। যে প্রেমভক্তি দিতে পারবে না, তার কাছে তো তিনি—

সন্ন্যাসী বাধা দিয়ে বিরক্তির সুরে বল্লেন—আঃ, তোমার ওই সব অসার, ফাঁকা ভাবুকতাগুলো রাখবে দয়া করে? ওতে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে সত্যি বলচি। যত খুশি প্রেমভক্তি বিলোও গিয়ে তোমার সেই বৈষ্ণবাচার্যের আখড়ায়—আমাদের আর শুনিও না—যত খুশি কাব্যরচনা কর বৃন্দাবন আর চাঁদের আলো আর কদম্বমূল নিয়ে সেখানে বসে।

ক্ষেমদাস বল্লেন—তোমাকেও একদিন ভক্তির ক্ষুরে মাথা মুড়ুতে হবে হে কঠোর জ্ঞান-মার্গী সন্ন্যাসী। আমার নাম যদি ক্ষেমদাস হয়—

সন্ন্যাসী বল্লেন—আচ্ছা, এখন বন্ধ করো। তুমি আমাকে বলচো নীরস। তোমাকে আমি এমন এক জ্ঞানীর কাছে নিয়ে যাবো যিনি সম্পূর্ণ নাস্তিক, জড়বাদী। পঞ্চভূতের বিকারে এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েচে বলেন। ঈশ্বর মানেন না, সৃষ্টিকর্তা মানেন না; আত্মাকে বলেন পঞ্চভূতের বিকার, জড়ের ধর্মে আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়েচে, আপনা-আপনিই একদিন লয় হবে—এই মত পোষণ করেন।

—কে? লোকায়ত দর্শনের কর্তা চার্বাক?

—চার্বাক নন, তাঁর প্রভাবান্বিত কোনো শিষ্য?

-কি অবস্থা লাভ করছেন?

—স্থাণুবৎ অচলাবস্থা। খুব উচ্চস্তরেই আছেন, পুরুষকারের বলে উন্নতভূমি লাভ করেচেন, কিন্তু মুক্তি হয়নি। এর মধ্যে দুবার পৃথিবী ঘুরে এসেছেন। বলেন, এও জড়ের ধর্ম! মুক্তি বলে কিছু নেই। ঈশ্বর মিথ্যা! কাকে তিনি উপাসনা করবেন? পুনর্জন্মে দুঃখিত নন। জন্মান্তরীণ স্মৃতি জ্বলজ্বল করচে মনে।

—কি অবলম্বনে আছেন?

—জড়ের ধর্ম পরীক্ষা করেন। তরুণ শিষ্যদের মধ্যে প্রচার করেন। পৃথিবীতে বহু তরুণদলকে যুগে যুগে প্রভাবান্বিত করচেন জড়ধর্মের একচ্ছত্রত্ব প্রতিপাদনের জন্য। ব্যাসক্তি শূন্য, উদার পুরুষ।

—মৃত্যুর পরে দেহধ্বংসে আত্মা থাকে দেখেও জড়বাদী?

—হাঁ। বলেন, ওটাও জড়ের ধর্ম। গুটিপোকা দেহত্যাগ করে প্রজাপতি হচ্চে এও তো দেখা যায়। আবশ্যক কি ঈশ্বরকে টেনে আনবার?

ক্ষেমদাস কানে আঙুল দিয়ে বল্লেন—ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু, শুনতে নেই এসব কথা।

—কেন শুনতে নেই? এই দ্যাখো তোমাদের অনুদারত্ব। আমরা বলি, ব্রহ্মই জগতের সব হয়ে আছেন। নাস্তিক যিনি তিনি ব্রহ্মের বাইরে নন। ব্রহ্মের মধ্যে থেকে তিনি একথা বলচেন। এমন একদিন আসবে, ব্রহ্মজ্ঞান তিনি লাভ করবেন। বাদ পড়বেন না।

সন্ন্যাসিনী বল্লেন—আমারও তাই মত।

ক্ষেমদাস অধীরভাবে বল্লেন—বেশ, বেশ। ওসব আলোচনা এখন থাক। চলো যাওয়া যাক্। রাত্রি প্রভাত হয়ে এল—জ্যোৎস্না ম্লান হয়ে আসচে। ওই শোনো ময়ূর ডাকচে বনে।

সন্ন্যাসিনীকে পুনরায় বন্দনা করে সকলে সেই গভীর বন পরিত্যাগ করলেন। কুটীরের আশেপাশে অনেক বন্য দেবকাঞ্চন ফুল ফুটে আছে ম্লান জ্যোৎস্নালোকে। অদূরের শৈলচূড়া শেষরাত্রের হিমবাষ্পে অস্পষ্ট দেখাচ্চে। বন্য কুক্কুটের রব রজনীর শেষ যাম ঘোষণা করচে।

ক্ষেমদাস আকাশপথে বল্লেন—কি সন্ন্যাসী, যাবে তো রঘুনাথদাসের আশ্রমে?

সন্ন্যাসী রাজী হওয়াতে ওরা চক্ষের নিমেষে বৈষ্ণবাচার্যের আশ্রমের সামনে এসে পড়লো। ওরা সকলে রঘুনাথদাসের আসনের দিকে গেল—পুষ্প গেল গোপাল-বিগ্রহ দেখতে ও তার প্রাণের ব্যথা গোপালের পায়ে নিবেদন করতে। নীল স্ফটিকের অপূর্ব বিগ্রহের মুখে যেন করুণার হাসি লেগেই আছে। পুষ্প বাইরে এসে দাঁড়ালো, ঐ বিরাট অনন্ত বিশ্ব, আকাশের পটে কোটি কোটি নক্ষত্ররাজি (বৈষ্ণবাচার্যের আশ্রমে এখন রজনীর প্রথম যাম)—সেই যে সেদিন মহাপুরুষ উপনিষদের বাক্য উচ্চারণ করে শুনিয়ে-ছিলেন—অস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য সমন্ততঃ স্থিতানি এতাদৃশান্যনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি সাবরণানি জ্বলন্তি—এই ব্রহ্মাণ্ডের আশেপাশে আরও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড জ্বলচে—সব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি অধীশ্বর, সেই বিরাট দেবতা কেন এখানে ক্ষুদ্র বিগ্রহে নিজেকে আবদ্ধ রেখেচেন কিসের টানে কে বলবে?

পুষ্প প্রণাম করলে সাষ্টাঙ্গে। সে বিরাটের কতটুকু ধারণা করতে পারে, মেয়েমানুষ সে। সে অতি ক্ষুদ্র নারী মাত্র। দয়া করে মধুররূপে ধরা না দিলে সে ক্ষীরোদসাগরশায়ী মহাবিষ্ণুর কিংবা তাঁর চেয়েও এককাটি সরেশ নিরাকার পরব্রহ্মের কি ধারণা করতে সমর্থ? মন্দিরে প্রণাম করে উঠে ব্যাকুল কণ্ঠে প্রার্থনা করলে—হে ঠাকুর, আশা বৌদিদিকে কৃপা কর। এবার যতীনদা ও আশার জন্ম তোমার আশীর্বাদে যেন সার্থক হয়ে ওঠে। আর যেন আশার কুপথে মতি না হয়, হে ঠাকুর। ওর প্রারব্ধ কর্ম এবার যেন ক্ষয় হয়। ওকে দয়া কর।

মন্দিরের নিভৃত কুঞ্জতলে অপূর্ব পুষ্পসুবাস। যেন বহু জাতী, যূথী, মালতী, হেনা, নাগকেশর একসঙ্গে প্রস্ফুটিত হয়েচে। সন্ন্যাসী ও ক্ষেমদাস শ্বেতপ্রস্তরের চত্বরে বৃক্ষতলে বসে রঘুনাথদাসের সঙ্গে আলোচনা করচেন।

রঘুনাথদাস বলচেন—আপনি আমার বিগ্রহটি দর্শন করে আসুন। আপনার ভক্তি হবে। উনি ভক্তি আকর্ষণ করেন। আপনার আগমনে আমার আশ্রম আজ ধন্য হয়ে গেল। কিছুকাল এখানে থাকুন।

সন্ন্যাসী বল্লেন—আপনি মহাপুরুষ, আপনার নিকটে থাকবো এ তো পরম সৌভাগ্য। তবে এবার নয়, আমি ঘুরে আসবো। বিগ্রহ দর্শন করে আসি।

বিগ্রহ দর্শন করে একটু পরেই ফিরলেন। বল্লেন—আপনার বিগ্রহ দেখচি বড় বিপজ্জনক বস্তু—সত্যিই আমাকে উনি আকর্ষণ করছেন। আমায় বল্লেন—আমায় কেমন লাগচে? আমি বল্লাম—আমি তোমাকে মানি না। একরকম জোর করে চলে এসেচি—

বলে আপন মনেই হাসতে লাগলেন।

রঘুনাথদাস বল্লেন—আমার গোপাল আপনার ভক্তি আকর্ষণ করতে চাইচেন। আপনি দেবেন না?

—ক্ষমা করবেন আচার্যদেব। আমার সংশয় যেদিন ছিন্ন হবে সেদিন এসে আপনার আশ্রমে দীক্ষা নেবো প্রেমভক্তির। এখন ওসব আমি পুতুল-পুজোর সমান মনে করি।

রঘুনাথদাসের প্রশান্ত মুখমণ্ডলে মৃদুমন্দ হাসি ফুটলো। ঈষৎ দর্পভরে বল্লেন—আমার গোপালের ক্ষমতা থাকে, আপনাকে তিনি ভজাবেন। পুতুল কি কথা বলে? আপনি ব্রহ্মবিৎ, ভেবে দেখুন। আপনার মত ভক্ত উনি চাইচেন। ব্রহ্মভূমি থেকে নেমে এসে ভগবানের লীলাসঙ্গী হয়ে থাকুন।

—আপাতত আমার একটি গুরুভগ্নী প্রেমভক্তির জন্যে ব্যাকুলা। তাকে দিন দয়া করে।

—কোথায়?

—সম্প্রতি দেহে বর্তমান আছেন, মহানদীর তীরের বনমধ্যে তাঁর আসন। পরমাত্মার দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েচেন। বহুকাল থেকে দেহধারিণী। আপনি আহ্বান করলে তিনি এখানেই আসবেন।

—আমি অকিঞ্চন। আমার কি সাধ্য প্রেমভক্তি দিই। গোপাল দেবেন—

পুষ্প এই সময়েই হঠাৎ জানু পেতে বসে করজোড়ে বিনীত কণ্ঠে বল্লে—ওই সঙ্গে আমাকেও দিন আচার্যদেব। আমার একমাত্র অবলম্বন।

ক্ষেমদাস উৎসাহে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন—সাধু! সাধু!

রঘুনাথ পুষ্পের মাথায় হাত দিয়ে বল্লেন—আমি কে মা? গোপালের কাছে চাও। আমি আশীর্বাদ করি তুমি পাবে।

পুষ্প যতীনকে দেখিয়ে বল্লে—এঁকে আশীর্বাদ করুন। ইনি শীঘ্র পুনর্জন্ম গ্রহণ করবেন। আদেশ হয়ে গেছে।

রঘুনাথ যতীনের দিকে ভাল করে চেয়ে বল্লেন—পুনর্জন্ম হচ্চে? খুব ভাল। ভগবানে মন যেন থাকে আশীর্বাদ করচি। পুনর্জন্মে ভয় কি, যদি কৃষ্ণপদে মতি থাকে।

যতীন পুষ্প ভিন্ন উপস্থিত সকলের পাদস্পর্শ করে প্রণাম করলে।

পুষ্প বল্লে—প্রভু, আবার আপনাদের দেখা ইনি পাবেন?

সন্ন্যাসী বল্লেন—নিশ্চয়, দেহ অন্তে। আমরা আর কোথায় যাচ্চি।

রঘুনাথ বল্লেন—ইচ্ছা করে প্রভু, আর একবার পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে ভক্তিধর্ম প্রচার করে আসি। জীবের বড় কষ্ট। দেখে শুনে বড় কষ্ট পাই। জীবের মঙ্গলের জন্য প্রয়োজন বুঝলে একবার ছেড়ে শতবার যেতে প্রস্তুত আছি। সেদিন মহাপ্রভুকে বলেছিলাম, উনি বল্লেন—এখন পৃথিবীতে অন্য সময় এসেচে, লোকজনের অন্যপ্রকার মতি। এখন আমাদের পূর্বতন পন্থায় কাজ হবে না। গ্রহদেব বৈশ্রবণ এ বিষয়ে সেদিন মহাপ্রভু ও আরও উর্ধ্বলোকের কয়েকটি মহাপুরুষের সঙ্গে পরামর্শ করেচেন! তাঁরা বলেন, পৃথিবী এখনও তৈরী হয়নি। গ্রহদেব বৈশ্রবণ কয়েকজন শক্তিমান আত্মা পাঠাচ্চেন পৃথিবীতে, এঁরা ধ্বংস ও দুর্দৈব আনবেন পৃথিবীতে গিয়ে। পৃথিবী আলোড়িত হবে—লোকের দৃষ্টি উর্ধ্বমুখী হবে। ভোগবাদ ও জড়বাদের অবসান না হোলে জীবের মঙ্গল নেই। ঢেলে সাজাতে হবে গোটা পৃথিবীটাকে। আপনিই তো ইচ্ছা করলে করতে পারেন।

সন্ন্যাসী মৃদু হেসে চুপ করে রইলেন।

যতীন অসতর্ক মুহূর্তে সবিস্ময়ে বলে উঠল—কে? ইনি!

ক্ষেমদাস বল্লেন—হাঁ, ইনি। অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ, ওঁরা গ্রহদেবের সমান। ইচ্ছামাত্র সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ঘটাতে পারেন। ব্রহ্মসূত্রে বলেচে—সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ। মুক্তপুরুষের সমস্ত ঐশ্বর্য সংকল্পমাত্র উদয় হয়।

সন্ন্যাসী হেসে বল্লেন—ঝোঁকের মাথায় একটু বেশি বল্লে কবি। ভোগমাত্রমেষাম্ অনাদিসিদ্ধেনেশ্বরেণ সমানম্—শঙ্করাচার্য কি বলেচেন প্রণিধান কর। মুক্তের ভোগ ঈশ্বরের সমান হয়, শক্তি কি তাঁর সমান হয়?

—আমি ঈশ্বরের কথা বলিনি, গ্রহদেবের কথা বলেচি।

—গ্রহদেব শক্তিমান বটে কিন্তু ঈশ্বরের বিনা অনুজ্ঞায় তিনি কিছুই করতে পারেন না।

—সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করতে সমর্থ কি না?

—হ্যাঁ। কিন্তু ঈশ্বরের অনুমতিক্রমে।

—আপনি?

—না। আমার ওপর সে ভার ন্যস্ত নেই। আমি আদার ব্যাপারী, সৃষ্টি স্থিতির

খোঁজে আমার দরকার কি? সৃষ্টি বলচোই বা কাকে? নির্গুণ ব্রহ্ম যখন দেশ ও কালের সীমার মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করেন, তখন তাকে বলে সৃষ্টি—উর্ণনাভ যেমন নিজের দেহনিঃসৃত রস তন্তুরূপে প্রসারিত করে।

রঘুনাথদাস বল্লেন—মহাপুরুষ, ক্ষেমদাস ঠিকই বলেচেন। আপনি পারেন সব, অসাধারণ শক্তি আপনাদের। সেই শক্তি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কোনো কাজে আসচে না। ভগবানের দাসভাবে ভক্তভাবে তাঁকে সেবা করে সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করুন। কিংবা পৃথিবীর বা অন্য গ্রহলোকের জীবকুলের সেবা করুন। জীবের সেবায় স্বয়ং ভগবান তাঁর পার্শ্বচরদের নিয়ে সর্বদা নিযুক্ত। আপনি মহাজ্ঞানী, আপনাকে আমি কি উপদেশ দেব?

সন্ন্যাসী বিনীতভাবে নমস্কার করে বল্লেন—আপনার আদেশ শিরোধার্য।

যতীন অবাক হয়ে ভাবলে, এত বড় লোক, কিন্তু কি অদ্ভুত বিনয় এদের। সত্যি, বড় ভাল লাগচে।

ক্ষেমদাস হঠাৎ বলে উঠলেন—বৃন্দাবনে আরতি হচ্চে গোপাল-মন্দিরে। আমি আর থাকতে পারবো না। চল।

আজও পৃথিবীতে সুন্দর জ্যোৎস্না। বৃন্দাবনের বনপথে আলোছায়ার খেলা দেখে ওরা সবাই মুগ্ধ। শহরে ইলেকট্রিক আলো জ্বলচে, মোটর যাচ্চে ধুলো উড়িয়ে, লোক গিজ্‌গিজ্ করচে। চানাচুরওয়ালা সুর করে মোড়ে দাঁড়িয়ে সওদা ফিরি করচে। গোপালের মন্দিরের আরতির সময়ে কত অশরীরী ভক্ত, কত জ্যোতির্ময় আত্মা সেদিনকার মত মন্দিরের মধ্যে উপস্থিত। অনেকে স্বর্গীয় পুষ্প বিগ্রহের অঙ্গে বর্ষণ করতে লাগলেন আরতির সময়ে।

পুষ্প চেয়ে দেখতে দেখতে ওঁদের মধ্যে করুণাদেবীকে দেখে চমকে উঠলো। আরও একটি দেবী আছেন ওঁর সঙ্গে। দুজনে মন্দিরের এক কোণে সাধারণ গৃহস্থঘরের নারীদের মত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আরতি দর্শন করচেন। পুষ্পকে তাঁরা ডাকতেই সে কাছে গেল। পুষ্প দেখলে, অপরা দেবীটি তারই পূর্বপরিচিতা প্রণয়দেবী।

প্রণয়দেবী বল্লেন—অনেকদিন তোমায় দেখিনি। আরতি শেষ হয়ে যাক্, বাইরে চলো, কথা আছে।

সঙ্গে সঙ্গে পুষ্পের মনে পড়লো কেবলরাম কুণ্ডুর কথা। প্রণয়দেবীর 'অনেকদিন দেখিনি' এই কথাতে ওর মনে পড়লো। সেই নিম্নস্তরের বিষয়াসক্ত আত্মাকে সে দাদু বলে ডেকেচে। অথচ অনেকদিন তার কাছে যাওয়া হয়নি বটে। তাকে আজ এখুনি বৃন্দাবনে এনে গোপালমন্দিরে আরতি দেখাতে হবে। ধন্য হয়ে যাবে কেবলরাম—স্বর্গমর্তের মিলনদৃশ্য এভাবে দেখার সৌভাগ্য আর তার হবে না।

আচ্ছা, আশা-বৌদিকে আনলে হয় না? ধন্য হয়ে যায়, উদ্ধার হয়ে যায় একদিনে সে!

করুণাদেবীকে সে কথাটা জিজ্ঞেস করলে। দেবী বল্লেন—আশার আধ্যাত্মিক বুদ্ধি এখনও সুপ্ত। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন সে, দেখেও দেখবে না এ সব। অত সহজে পাপী উদ্ধার হয় না পুষ্প, তাহোলে আমরা বসে থাকতাম না—নরক উজাড় করে পাপী হাজারে হাজারে নিয়ে এসে ফেলতাম।

পুষ্প লজ্জিত হোল।

প্রণয়দেবী বল্লেন—তোমাদের তিনজনের ওপর আমার দৃষ্টি বহু জন্ম আগে থেকে রেখেচি। এখনও অনেক গতাগতি বাকি ওদের দুজনের। পুনর্জন্ম ভিন্ন আশার আত্মা কিছুতেই কর্মক্ষয় করতে পারবে না। তুমি ব্যস্ত হয়ো না পুষ্প, যা করবার তিনিই করবেন। আমরা তাঁর দাসী মাত্র।

পুষ্প ওঁদের অনুমতি নিয়ে চক্ষের নিমিষে কেবলরামের স্তরে এসে দেখলে, বৃদ্ধ সেখানে নেই। তবে বোধহয় আবার কুড়ুলে-বিনোদপুরে ওর ছেলেদের আড়তে গিয়ে বসেচে। কিন্তু একা যেতে পুষ্পের বড় ভয় করে। পৃথিবীর স্থূলস্তরে নিম্নশ্রেণীর দুষ্ট আত্মাদের উপদ্রব বড় বেশি, এরা অনেক সময় দেহধারী ও বিদেহী সকলকেই বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে। বৃন্দাবনে ছিল এতক্ষণ, পৃথিবীর হোলেও সে একটা পবিত্র দেবস্থান, ওখানে প্রেতযোনির উপদ্রব খুব কম।

ভগবানের নাম স্মরণ করে সে কুড়ুলে-বিনোদপুরে কুন্ডুদের গদিতে এসে দেখে বৃদ্ধ কেবলরাম তার বড় ছেলে বিনোদের পাশে হাতবাক্স সামনে বসে আছে। সন্ধ্যার সময়, হাটুরে খরিদদারের ভিড় দোকানে। বিনোদের দুই কর্মচারী হেঁকে বলচে—দুজোড়া ফুলন শাড়ী, ছ' নং—

বিনোদ খাতায় টুকতে টুকতে মাথা তুলে বলচে—টাকা না লোট্?

খরিদদার বলচে—আজ্ঞে লোট্ কুন্ডু মশায়। দুমণ পাট ব্যাচ্‌লাম রাম তেলির আড়তে—সব লোট্ দেলে। লোট্ এখন ক'নে ভাঙাতি যাই আপনাদের দোকান ছাড়া? বাবু, কিছু কম নেন্ দামটা।

বিনোদের কিছু বলবার পূর্বেই তার পার্শ্বোপবিষ্ট কেবলরাম বলে উঠলো—ওতে লাভ নেই এক পয়সাও। তুমি পুরোনো খদ্দের বলে শুধু কেনা-দামে দেওয়া।

পুষ্প বুঝতে পারলে, এ অতি কপটকথা। বৃদ্ধের মন বলচে জোড়াপিছু দেড় টাকা লাভ হয়েচে এই পাড়াগাঁয়ে মূর্খ খদ্দেরের কাছে। এই সময় বিনোদ বল্লে—যাও, দু'আনা কম দাওগে জোড়ায়, তুমি পুরোনো খদ্দের, তোমার সঙ্গে অন্যরকম।

কেবলরাম পুত্রের ওপর চটে উঠে বল্লে—তবেই তুমি ব্যবসা করেচ! খদ্দেরের এক কথায় অমনি জোড়ায় দু'আনা ছাড়!

অবিশ্যি ওর কথা দোকানদার বা খরিদ্দার কেউ শুনতে পেল না! পুষ্প ওর পাশে গিয়ে ডাকলে—ও দাদু। পুষ্পের কণ্ঠস্বর শুনে বৃদ্ধ চমকে উঠে ওর দিকে চাইলে। পুষ্প হাসিমুখে বল্লে—আচ্ছা, কেন এই সন্দেবেলা বসে বসে মিথ্যে কথাগুলো বেমালুম কইচ দাদু? ছিঃ—

কেবলরাম অপরাধীর ন্যায় উঠে দাঁড়ালো। পুষ্প বল্লে—আবার তুমি এই দোকানে এসে বসে আছ। পৃথিবীর আসক্তি তোমার গেল না? কি হবে তোমার দোকানপসার আর খদ্দেরে? টাকার লাভলোকসানেই বা তোমার কি হবে?

কেবলরাম বিষণ্ণভাবে বল্লে—যাই কোথায় দিদি বলো? এই গদি আর আড়ত ছাড়া গত পঞ্চাশ বছর আর কিছু চিনিনি। কোথাও ভাল লাগে না। এখানটাতে এলে পুরোনো অভ্যেসের বশে আড়তের কাজ করে যাই। নইলে কি করি বলো? তুমিই তো দিদি দর্শন দাওনি কতদিন!

—আচ্ছা এখুনি চলো আমার সঙ্গে...দেরি ক'রো না, বেরিয়ে এসো।

মুহূর্তের মধ্যে কেবলরামকে নিয়ে পুষ্প গোপাল-মন্দিরে এল। ধূপধুনার সুগন্ধি ধূমে মন্দিরের গর্ভগৃহ ভরে গিয়েচে, আরতি তখনও পূর্ববৎ চলচে—পাঁচমিনিটের জন্য মাত্র পুষ্প অনুপস্থিত ছিল। কেবলরাম পুষ্পের কৃপায় সজ্ঞান অবস্থায় আছে, জ্যোতির্ময় মহাপুরুষদের সে দেখে ভয়ে সম্ভ্রমে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েচে। সন্ন্যাসীর তেজঃপুঞ্জ দেহকান্তির দিকে আড়ে আড়ে চেয়ে দেখলে। আরতির শেষে যখন সবাই মন্দির-দ্বারপথে বেরিয়ে আসচে, তখন একজন বিদেহী ভক্ত ক্ষেমদাসকে জিজ্ঞেস্ করলে—প্রভু, শুনেচি বৃন্দাবনে যমুনাতীরে জ্যোৎস্না-রাত্রে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা হয়—আমি কি দেখতে পাবো? আমি এখানে নতুন এসেচি।

ক্ষেমদাস বল্লেন—আপনি গিয়ে দেখতে পারেন। লোকে দেখে অনেকে, ভাগ্যবান ভক্ত হওয়া চাই।

কেবলরাম অবাক হয়ে পুষ্পকে বল্লে—এটা কোন্ জায়গা দিদি?

ক্ষেমদাস বল্লেন—তুমি চিনতে পারলে না? এটা বৃন্দাবন, গোপাল-মন্দির।

পুষ্প বল্লে—আর ইনি বৈষ্ণব কবি ক্ষেমদাস—

কেবলরাম থতমত খেয়ে ক্ষেমদাসের পায়ে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম করলে। তারপর করুণাদেবীর সামনে ওকে এনে ফেলতেই ও আরও আড়ষ্ট ও কাঁচুমাচু হয়ে গেল। করুণাদেবী রহস্য করে বল্লেন—তোমার নাতনীর দৌলতে স্বর্গ পাবে তুমি।

কেবলরামের চোখ ধাঁধিয়ে গেল এই দুই দেবীর অপরূপ রূপের জ্যোতিতে। সে হাতজোড় করে বল্লে—স্বর্গ তো এখানে। আমার মত পাপী যে বৃন্দাবনে এসে আরতি দেখেচে, আপনাদের মত দেবী, এ'দের মত মহাপুরুষের দেখা পেয়েচে—আর তো কিছু বাকি নেই স্বর্গের।

পুষ্প ধমক দিয়ে বল্লে—এখন ছেড়ে দিলে আবার কুড়ুলে-বিনোদপুরের দোকানে গিয়ে বসবে তো? আর মিথ্যে কথা বলবে!

কেবলরাম জিভ কেটে বল্লে—আর না।

—ঠিক?

—হঠাৎ ছাড়তে পারবো না—মিথ্যে কথা বলে কি হবে। কোথায় যাই বলো তো সন্দেবেলাটা!

—কেন, এই গোপাল-মন্দিরে এসে আরতি দেখবে রোজ। কবি ক্ষেমদাস রোজ এখানে এ-সময় থাকেন, তোমায় যত্ন করবেন দাদু।

—কেউ কিছু বলবে না?

—না, দেবমন্দিরে সবারই অধিকার! যখনই তোমার দেবদর্শনে স্পৃহা জেগেচে, বুঝতে হবে, তখনই তুমি উচ্চতর স্তরের জীব হয়ে যাবে! ইচ্ছামাত্রেই সিদ্ধি। চলো যমুনার ধারে দাঁড়িয়ে দেখো—

ওরা চীরঘাটের কাছে যমুনার তীরে এসে জ্যোৎস্নালোকে কিছুক্ষণ বসলো। ওদের সঙ্গে সঙ্গে করুণাদেবী ও প্রণয়দেবীও এলেন। কেবলরাম সরল লোক, ওর মনে কেমন একধরনের ভক্তির উদয় হোল। যমুনার দিকে চেয়ে ওর দুচোখ বেয়ে জল পড়তে লাগলো। করুণাদেবীকে বল্লে—মা, আমার কি পুণ্য ছিল পূর্বজন্মের? বৃন্দাবন, যমুনার তীর, আপনাদের মত দেবীর দেখা পাওয়া—আজ আমার হোল কি তাই ভাবচি।

করুণাদেবী বল্লেন—কেবলরামকে রেখে এস পুষ্প, তারপর আমাদের পৌঁছে দেবে—

পুষ্প হেসে বক্রদৃষ্টিতে অদ্ভুতভাবে চেয়ে বল্লে—আমি পৌঁছে দেবো আপনাদের! কেন ঠাট্টা করেন বলুন তো!

ফেরবার পথে কেবলরাম বল্লে—তোমায় কি যে বলি দিদি। তুমি সাক্ষাৎ দেবী, নইলে এত দয়া! সেখানে নিয়ে গিয়েছিলে, আমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি নেই সেখানে যাই। একটা কথা দিদি বলচি। আমার নাতি রামলাল আজ দুবছর হোল এখানে এসেচে পৃথিবী থেকে। তোমায় বলতে লজ্জা হয়, সম্প্রতি রসুলপুরের এক বাগদী মাগীর পিছু পিছু ঘুরচে ছমাস। সে যদি জল আনতে যায়, ও তার পিছু পিছু যায়; সে যদি রান্না-ঘরে রাঁধে, ও পাশে বসে থাকে। অন্য সময় সেই মাগীর বাড়ীর উঠোনে এক তেঁতুল-গাছে দ্যাখো দিনরাত বসে। কত ধমক দিলাম—কথা শোনে না। একটা উপায় করো তুমি লক্ষ্মীটি। সে মাগী ওকে দেখতেও পায় না, ওর ঘুরেই সুখ। এ কি বন্ধন বলো দিকি,

দিদি ? ওই তো নরক। তুমি দেবী, ওকে তুমি বাঁচাও এ নরক থেকে।

গভীর রাত্রিকাল। পুষ্প একা সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে দেখা করতে গেল। ওঁকে দেখা পর্যন্ত কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করচে ওঁর প্রতি! না দেখা করে যেন ও থাকতে পারচে না। সন্ন্যাসিনী ওকে দেখে হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলেন। বল্লেন—আপনি সেদিন এসেছিলেন না?

—হ্যাঁ, মা। আপনার দর্শনে পুণ্য, তাই দেখতে এলাম।

সন্ন্যাসিনীর প্রজ্ঞানেত্র উদ্ভাসিত, সুতরাং পুষ্পকে স্থূল আবরণে নিজ দেহকে আবৃত করতে হয়নি। সন্ন্যাসিনী বল্লেন—আপনি বিদেহী, পৃথিবীর ফলমূল নিয়ে অতিথি-সৎকার করতে পারলাম না। ত্রুটি মার্জনা করবেন।

পুষ্প লজ্জিত হয়ে বল্লে—ওকথা বলে আমায় অপরাধী করবেন না মা। আমি কত ক্ষুদ্র।

সন্ন্যাসিনী হেসে বল্লেন—আপনি ক্ষুদ্র কে বল্লে—আপনি এখানে আসবেন আমি সমাধিতে জেনেচি। আপনি আমার প্রেমভক্তি শিক্ষার উপায় করবেন।

পুষ্প সবিস্ময়ে বল্লে—আমি!

—বিশ্বের ভগবান কাকে দিয়ে কি কাজ করান, তা তো বলা যায় না।

—মা, আপনার বাড়ী কোথায় ছিল ? পিতামাতা কে ছিলেন? জানবার বড় কৌতূহল হচ্চে।

—আমার দেশ ছিল পাঞ্জাবে। অল্পবয়সে আমি দীক্ষা নিই, বিবাহ হয়নি, চির-কুমারী। নানাস্থান ঘুরে অযোধ্যায় আসি। সেখানে সে সময়ে মাঠের মধ্যে গাছের তলায় এক সিদ্ধ মহাপুরুষ বাস করতেন—সকলে তাঁকে পাগলা বাবা বলতো। পাগলের মত থাকতেন। তিনি আমায় দয়া করে যোগদীক্ষা দেন। সে সন্ন্যাসীর সঙ্গে সেদিন আপনারা এসেছিলেন, ওঁরও গুরু তিনি।

—তিনি আছেন কোথায় এখন?

—প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর হোল তিনি দেহ রেখেচেন। তিনি যে কত কালের লোক কেউ জানতো না। আমি কখনো সে প্রশ্ন করিনি। এখন বিদেহী অবস্থায় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েচেন। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। মাঝে মাঝে এখনও দেখা দেন। তিনিই বলেছিলেন, তুমি নারী, তোমাকে প্রেমভক্তি শিখতে হবে। অদ্বৈতভূমি থেকে নেমে তোমাকে লীলারস আস্বাদ করতে হবে। তাই অপেক্ষায় আছি। আপনি যে আসবেন তাও তিনি বলেছিলেন।

পুষ্পের চোখ বেয়ে দর দর ধারে জল পড়লো। মনে মনে ভাবলে—ভগবানের কি খেলা! আমার মত নিতান্ত দীনহীনা, অতি সামান্য মেয়েমানুষের ওপর তাঁর কি অসীম অনুগ্রহ। এ কি অদ্ভুত কান্ড, কখনো তো এমনি ভাবিনি।

ও বল্লে—আপনার কাছে সেই ঠাকুরেরা আর এসেছিলেন?

—হ্যাঁ দেখুন, ওই এক কান্ড। কেন আমার কাছে? মৃন্ময়ী বলে এক দেবী সেদিন এসেছিলেন, কোন্ গ্রামে ভাঙা মন্দিরে থাকেন—কতক্ষণ গল্প করে গেলেন। তাঁর সাধ নতুন মন্দিরে কেউ প্রতিষ্ঠিত করে। আমি বল্লাম, কোনো ধনী গৃহস্থকে স্বপ্ন দিন। আমার কি হাত? আমি কি করতে পারি?

—ওদের কি আপনি এমনি স্থূলচক্ষে দেখেন?

—না, সমাধি অবস্থায় দেখা দেন। আমি বলি, আমি তোমাদের মানি না, চলে যাও। ততই আমার কাছে ভিড়। দেখুন তো মুশকিল!

—এও ভগবানের কৌশল আপনাকে প্রেমভক্তি শিক্ষা দেওয়ার। নীরস অদ্বৈতজ্ঞানী মনকে সরস করবার আয়োজন।

—আমি ওসব মানি না।

—তবে প্রেমভক্তি কি করে লাভ হবে?

—সাকার উপাসনা মায়িক। যে মৃন্ময়ী দেবীর পূজা করবে, সে দেবীকে নিয়েই মশগুল থাকবে; যে শ্যামসুন্দরের পূজা করবে, সে তাঁর দর্শন পেয়েই খুশি থাকবে। ও সব এক প্রকারের বন্ধন। ওতে বন্ধ হয়ে থাকলে আরও উচ্চভূমিতে উঠে ব্রহ্মদর্শন তার হবে না. নিজের আত্মাকে ব্রহ্মে সে লীন করতেও পারবে না। মায়া তাকে আবদ্ধ করবে।

—আপনি যা জানেন, আমি তা জানিনে দেবী। তবে আমি এইটুকু জানি প্রকৃত ভক্ত যে, সে মুক্তি চায় না, ব্রহ্মত্ব চায় না। ভগবানের দাস হয়ে থাকতে চায়, রস আস্বাদ করতে চায়। ভক্তির পথেই সে সমাধিলাভ করে, ব্রহ্মদর্শনও তার হয়। তবে এসব আমার শোনা কথা—আমি অজ্ঞান, কি জানি বলুন। আমার সঙ্গে বৃন্দাবনে চলুন, গোবিন্দ-মন্দিরে আরতির সময় কত ভক্তের দর্শন পাবেন। তাঁরা সব বলে দেবেন।

—যাবো, আমায় নিয়ে যাবেন। একটি গৃহস্থের বৌ আছে, বড় উচ্চ অবস্থা। একপাল ছেলেমেয়ে—ছেলেকে কোলে নিয়ে হয়তো আদর করচে—অমনি সমাধিস্থ হয়ে পড়ে। সেদিন আমার কাছে সূক্ষ্মদেহে এসেছিল। সেও প্রেমভক্তি চায়—তাকেও নিয়ে যাবো।

—কি করে বিনা দীক্ষায় এমন উচ্চ অবস্থা পেলে সংসারে থেকে?

—পূর্বজন্মের অবস্থা ভাল ছিল। কর্মবন্ধনে আটকে পড়ে এ জন্মে সংসার করতে হয়েচে। সামান্য কর্ম ছিল, এ জন্মে শেষ হয়ে যাবে। তার বাড়ী এই জঙ্গলের বাইরে এক লোকালয়ে। আহীর জাতের মেয়ে। ওর অবস্থা দেখে আমি পর্যন্ত অবাক হয়ে গেছি। আমার কাছে এসে কত কাঁদে।

পুষ্প বিদায় নিয়ে চলে এল। মানুষেই দেবতা হয়ে গিয়েচে এ যে সে কত প্রত্যক্ষ করলে এই জগতে এসে। যে মূল বাসনা আসক্তি ত্যাগ করে শুদ্ধ মুক্ত হয়েচে—সে-ই দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েচে, ভগবান তাকেই কৃপা করেচেন। দৃষ্টি উদার ও স্বচ্ছ না হোলে কেউই উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, অথচ মানুষকে দেবত্বে নিয়ে যাবার জন্যে ঊর্ধ্বলোকে কত ব্যবস্থা, কত আগ্রহ। তবুও কেন অন্ধত্ব ঘোচে না মানুষের, কেন রামলালের মত আশা-বৌদিদির মত জীবেরা ভূবর্লোকের অতি স্থূল আসক্তির বন্ধনে দেবত্বের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত আছে?

বুড়োশিবতলার ঘাটে যতীন একা চুপ করে বসেছিল। পুষ্পকে দেখে খুব খুশি হোল। বল্লে—যত দেখছি, আমিও অবাক হয়ে যাচ্চি, পুষ্প। আমার চোখ খুলে যাচ্চে। তুই কিছু ভাবিসনে, পৃথিবীতে জন্ম নেবো কত বছরের জন্যে? ষাট সত্তর কি আশি? অনন্ত জীবনের তুলনায় ক'দিন? কিসের জন্য মৃত্যু? সব ছায়া, মায়া—একমাত্র আমি অমর, অনন্ত, শাশ্বত। আমাকে কেউ কোনদিন ধ্বংস করতে পারবে না। আজকাল তোর সংসর্গে থেকে আমার চোখ খুলে গিয়েচে।

পুষ্প ওকে রামলালের কথা বল্লে। যতীন সব শুনে হাসতে লাগলো। আজকাল এই শ্রেণীর লোকের জন্যে তার গভীর অনুকম্পা জাগে। পথ দেখিয়ে দেবার কেউ নেই তাই এমনি হয়েচে—ওদের দোষ নেই।

পুষ্প বল্লে—তুমি ওর জন্যে কিছু করো। আমি সেখানে যাবো না, গেলেও তার উপকার হবে না। এক মোহ থেকে আর এক মোহে পড়ে যাবে—

—তোর সাহায্য ছাড়া হবে না পুষ্প, আমি অবিশ্যি গিয়ে দেখচি।

যতীন রামলালকে খুঁজে বার করলে। সে একটি নীচজাতীয়া মেয়ের বাড়ীর উঠানে বসে ছিল। মেয়েটি ঢেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান ভানচে। তার বয়স ত্রিশ-বত্রিশের কম নয়, কালো ও অত্যন্ত কৃশকায়। সম্ভবত মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়াতে ভোগে। মুখখানা নিতান্ত মন্দ নয়, চোখ দুটো বড় বড়—সমস্ত দেহের মধ্যে চোখ দুটোই ভালো।

রামলাল যতীনকে দেখে বল্লে—যতীনদা যে! তোমাকে কে সন্ধান দিলে হে? বুড়োটা নিশ্চয়ই। বেঁচে থাকতে জ্বালিয়েচে আবার মরেও যে একটু ফুর্তি করবো তার যো নেই। হাড় ভাজা ভাজা করলে। সেদিন এসেছিল, আমি হাঁকিয়ে দিয়েচি। বল্লাম—আমি যা ইচ্ছে করবো, তোমার বিষয়ের ভাগ তো পিত্যেশ করিনি যে তোমায় ভয় করবো। এখন আমি স্বাধীন।

যতীন হেসে বল্লে—বুড়োর দোষ নেই। সে তোমার ভালোর জন্যেই সন্ধান দিয়েচে। এই ভাবে বাঁশগাছে তেঁতুলগাছে কতদিন কাটাবে?

—দিব্যি আছি। দোহাই তোমার, তুমি আর লেকচার ঝেড়ো না।

—কিন্তু এতে তোমার লাভটা কি? কেন এর পেছনে পেছনে ঘুরচো—

—আমার দেখেই সুখ। ওর নাম সোনামণি। সোনামণি ধান ভানে, আমি ঐ খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি; আমতলার পুকুরঘাটে নাইতে যায় একা একা—আমি সঙ্গে যাই, যতক্ষণ না নাওয়া হয়, আমি নোনাগাছে বসে বসে দেখি। রাত্রে ও রাঁধে—আমি রান্নাঘরের কোণে চুপ করে বসে থাকি। বেশ চমৎকার দেখতে সোনা, অমন চেহারা ভদ্দর-লোকের ঘরে হয় না। শরীরের বাঁধুনি কি!...আমি তো কোনো অনিষ্ট করচিনে কারো, বসে থাকি এই মাত্র।

—নিজের অনিষ্ট নিজেই করচো। ওপরে উঠতে পারবে না। পৃথিবীর বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে।

—থাকি থাকবো। বেশ ফুর্তিতেই আছি—আমি ওপরে উঠতে চাইনে, নীচেও নামতে চাইনে। স্বগ্‌গে-টগ্‌গে তোমরা থাকো গিয়ে! আর ওই বুড়োটা যে দোকানের গদিতে বসে আছে দিনরাত, তাতে বুঝি দোষ হয় না? ওটাকে পারো তো তোমাদের স্বগ্‌গে নিয়ে যাও টেনে, আমাকে ছেড়ে দিয়ে যাও এখানে, বেশ আছি। কেন আর জ্বালাও দাদা, বেঁচে থেকে এমন আনন্দে থাকিনি। বেঁচে থাকতে এমন করলে আমায় ওর স্বামী লাঠি নিয়ে তাড়া করতো— এ বেশ আছি, কেউ টের পায় না।

—চলো আমার সঙ্গে এক জায়গায়, তোমায় নিয়ে যাবো—

—আমায় মাপ করো ভাই। সোনামণিকে ফেলে আমি পাদমেকং ন গচ্ছতি—

—থাক্, আর দেবভাষাকে ধ্বংস করে লাভ নেই! এখন আমার সঙ্গে চলো—যাবে?

রামলাল যতীনের ইঙ্গিতে সোনা বাগ্‌দিনীর বাড়ীর উঠোন থেকে অল্পদূরে একটা বাঁশ-ঝাড়ের তলায় গিয়ে দাঁড়ালো। কতদিন পরে শীতের দিনের ঝরা শুকনো বাঁশপাতার ধুলো-ভরা গন্ধ আজ যতীনের নাকে এসে লাগচে। যেন সে দেহেই বেঁচে আছে—পৃথিবী মায়ের বুকের দুলাল। বনমুলোর গাছ কুচি কুচি সাদা ফুলে ভর্তি—দুচারটে বাঁশঝাড়ের পরেই দিগন্তব্যাপী ধানের ক্ষেত, সবে ধান কাটা হয়ে গিয়েচে অঘ্রাণের শেষে। শুকনো ধানের গোড়া এখনো ক্ষেতের সর্বত্র।

যতীন বোধ হয় একটু অনামনস্ক হয়ে পড়েছিল, রামলাল অধীর ভাবে বল্লে—কি বলচো বলো যতীনদা।

যতীন বল্লে—ও কি? আবার ও পাড়ার পুকুরঘাটের দিকে চাইচো কেন? কে আছে ওখানে?

রামলাল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—নাঃ—বামুনের মেয়ে।

—আবার কি ?

—ওই যে সাদা কোঠাবাড়ীটা—ওই বাড়ী থেকে রোজ বেরিয়ে পুকুরঘাটে নায়। বামুনবাড়ী।

—তাই হয়েচে কি ?

—ষোল সতেরো বছর বয়েস। দেখবে ?...এসো, এসো—এতক্ষণ নামচে জলে। নামটি বেশ, সন্ধ্যারাণী। ফর্সা, একরাশ চুল, একটু পরে ভিজে কাপড়ে নেয়ে বাড়ী ফিরবে। মুখখানি বড় চমৎকার। ছিপছিপে লিকলিকে সরু বেতের মত হেলে পড়ে পড়ে। মুক্তোর মত ঝক্‌ঝক্ করে দাঁতগুলো যখন হাসে। সর্বদাই হাসচে।

—তাতে তোমার কি ?

—আমার কিছু না। বামুনের মেয়ে। ওরা মুখুয্যে।

—মরে গিয়েচে, এখন আবার বামুন শুদ্দুরই বা কি ? ওতে কি তোমার লাভ ?

রামলাল জিভ্ কেটে দুহাত তুলে নমস্কার করে বল্লে—বাপ্‌রে ! ও কথা বলতে নেই। বামুন জাত ! আমরা হলাম তেলী তামলী। আমি শুধু চোখে দেখেই খুশি। আমার ও সব উঁচু নজর নেই দাদা। সোনামণির হেঁসেলে বসেই আমার সব। ওকে পেয়েই আমার বেশ চলে যাচ্ছে।

—পেলে আর কি করে তা তো বুঝলাম না।

—ওরই নাম পাওয়া। দেহে নেই, কি করবো বলো। সত্যি, একটা কথা দাদা। পৃথিবীতে জন্মাবার কৌশলটা বলে দিতে পারো ? দেহ না ধরলে কোনো সুখ নেই। মেয়েদের ভালো করে পাইনি জীবনে। ওদের না পেয়ে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গিয়েচে আমার।

—কেন, তুমি তো বিয়ে করেছিলে ?

রামলাল বিরক্তির সঙ্গে মুখ খিঁচিয়ে বল্লে—আরে দূর, বিয়ে !—সে ওই বুড়োটার পাল্লায় পড়ে। নাতবৌএর মুখ না দেখে নাকি মরবে না ! আমার ঘাড়ে যা তা একটা চাপিয়ে দিয়ে বুড়ো তো পটল তুললো। আজকাল কেমন সব স্কুলে কলেজে পড়া মেয়ে দেখিচি কলকাতায়। তাদের শাড়ী পরবার কায়দাই আলাদা। কথাবার্তার ধরনই আলাদা। -না সত্যি যতীনদা, তুমি আমার যথার্থ উপকার করবে, আমায় জন্ম নেওয়ার কৌশল-টুকু বলে দাও দাদা। মেয়েমানুষের সঙ্গে দুদিন প্রাণভরে ভালবাসা করে মিলেমিশে আসি দুনিয়াতে ফিরে। আমার বুকের ভেতরটা সর্বদা হু হু করে দাদা। ও জিনিসটা আমি জানিনি—সত্যিকার মেয়েমানুষ পাইনি। স্বগ্‌গে টগ্‌গে তোমরা যাও—আমি তো কারো কোনো অনিষ্ট করতে চাইচিনে ভাই। আমার নেয্য অধিকার চাইচি। সবাই দিব্যি কত ফুর্তি করচে—আমি অল্পবয়সে মরে গেলুম, যে বয়সে ভোগ করার কথা সেই বয়সে। আমার একটা হিল্লে করো, তোমার পায়ে পড়ি দাদা। মেয়েমানুষ না পেলে স্বগ্‌গে গিয়ে আমার কোনো সুখ হবে না। বুড়োটার সঙ্গে দেখা হোলে তাকেও বোলো। তিনি এখন আসেন আমায় উপদেশ দিতে ! তুমি জানো, বিয়ের আগে বঙ্কু পালের মেয়ে সরলার সঙ্গে আমার একটু ভাব হয়েছিল। মেয়েটা কেষ্টনগরে মেয়ে-ইস্কুলে পড়তো। দুবার আমার সঙ্গে লুকিয়ে আলাপ করেছিল ! টাকা পাবে না বলে ঐ বুড়ো সেখানে আমার বিয়ে দিতে চাইলে না ! সেও দিব্যি মেয়ে ছিল।

—এখন সে কোথায় ?

—কেষ্টনগরে বিয়ে হয়েচে। শ্বশুরবাড়ী থাকে। আমি সেদিন গিয়ে একবার দেখে এসেচি। কষ্ট হয় বলে যাইনে। তার চেয়ে আমার সোনামণিই ভালো। কি চমৎকার একটি তিল ওর নাকের বাঁ-দিকে—দেখনি ?...চল্লে ? তাহলে—শোনো শোনো—তোমাদের তো

অন্তর্ধান হোতে সময় লাগে না একমিনিটও। এই আছো এই নেই। তোমরা হোলে স্বর্গের মানুষ। তাহলে—আমার একটা উপায়—

যতীন ততক্ষণে বুড়োশিবতলার ঘাটে এসে পৌঁছেচে। পুষ্পের প্রশ্নের উত্তরে বল্লে—হোল না। একেবারে বুভুক্ষু আত্মা। ওকে পুনর্জন্মে পাঠাবার ব্যবস্থা করো পুষ্প। মেয়েমানুষের কথা বলতে অজ্ঞান। ভোগ না করলে ওর নারীতে আসক্তি যাবে না।

পুষ্প হেসে বিজয়িনীর মত দর্পিত সুরে গ্রীবা বাঁকিয়ে বল্লে—স্বর্গে মেয়েমানুষের অভাব? যদি বলো আজই তাকে দেখিয়ে দিয়ে আসি কাকে মেয়েমানুষ বলে! করুণা-দেবীকেও নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দিই—মূর্ছা হয়ে পড়ে যাবে তক্ষুনি।

যতীন মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর বিদ্যুল্লতার মত অপূর্ব কান্তির দিকে চেয়ে বল্লে—তুমিই যথেষ্ট। আর তাঁকে নিয়ে যেতে হবে কেন। মূর্ছা তো দূরের কথা একদম পাগল হয়ে ক্ষেপে যাবে। কিন্তু তার দরকার নেই। বিভ্রান্তই করে দেওয়া হবে, উপকার কিছু হবে না তাতে।

পুষ্প কৃত্রিম রাগের সুরের রেশ তখনও টেনেই বল্লে—না, আমার রাগ হয়েচে শুনে যে, সে মূর্খ বলে স্বর্গে নারী নেই! নারীকে খুঁজতে যেতে হবে পৃথিবীতে!

—তোমরা চোখ ধাঁধিয়ে বেচারীকে পাগল করেই দিতে পারো, কিন্তু সে যা চায় তা দেবে কোথা থেকে? ওকে পাঠিয়ে দাও পৃথিবীতে। একজোড়া আগ্রহভরা কালো ভ্রমর-চোখের চাউনি ওর দরকার হয়েচে।

—আচ্ছা, যতুদা, আমি যদি ওকে একেবারে আজন্ম ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী করে দিতে পারি?

—জন্ম নেওয়ার পরে?

পুষ্প হাসি হাসি মুখে বল্লে—হ্যাঁ। নয়তো কি, এখানে?

—কিলিয়ে কাঁটাল পাকানো দরকার কি? আত্মাকে তার স্বাভাবিক পথে তার স্বাভাবিক গতিতে যেতে দাও।

—এই কথাটিই আশা-বৌদির বেলা তুমি এতদিন বুঝতে চাইতে না যতুদা। অপরের বেলাতে বেশ তো বুঝলে।

যতীন চুপ করে রইল।

ওপারের হালিসহরের শ্যামাসুন্দরীর মন্দিরে সন্ধ্যার আরতিধ্বনি শোনা গেল। গঙ্গার বুকে সান্ধ্য আকাশের প্রতিচ্ছবি।

সেদিন আশা একা পাথরের ওপরে বসে খুব কাঁদছিল।

একজন বিকটাকৃতি সাধুপুরুষের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল একদিন এই মরুভূমির ও পাহাড়ের দেশে। তিনি ওকে বলেচেন—পৃথিবীর মৃত্যুর পরে সাত লোক, প্রত্যেক লোকে আবার সাতটা স্তর। প্রত্যেক বার মানুষকে মরে নতুন দেহ ধরে নতুন স্তরে জন্ম নিতে হয়—ইত্যাদি। আশার মাথায় ওসব জটিলতা ঢোকে না—এক এক সময়ে সে বেশ বুঝতে পারে সে মরেই গিয়েচে বটে। কিন্তু মরেও তো নিস্তার নেই, দুবার তো মরা যায় না—না হয় আবার চেষ্টা করে দেখতো। কোথায় গেল মা, বাবা, স্বামী, ছেলেমেয়ে—এ কি বিশ্রী জীবন, না আছে আশার আলো, না আছে আনন্দ, না আছে ভালবাসা, স্নেহ, দয়া। কেন মিছে বেঁচে থাকা? অথচ মরতেও তো পারে না। এ কি বন্ধন!

সেই যে একদিন স্বামীকে সে দেখলে, যেন তার পুরোনো শ্বশুরবাড়ীর ঘরে সে গেল—কথাবার্তা বল্লে স্বামীর সঙ্গে। কি অদ্ভুত আনন্দে দিনটা কেটেছিল—যত অল্প সময়ের জন্যেই দেখা হোক না কেন। নাঃ—কোথায় কি যে সব হয়ে গেল ওলটপালট।

সংসার গেল ভেঙে। সে হোল অল্পবয়সে বিধবা। কত আশার স্বপ্ন দেখেছিল সে বিয়ের রাত্রে—সব মেয়েই দেখে। কেন তার ভাগ্যে এমন হোল! এই এক জায়গা—এমন ভয়ঙ্কর স্থান সে কখনো দেখেনি। মাঝে মাঝে ওর চারিধারে অন্ধকার ঘিরে আসে, মাঝে মাঝে আলো হয়। গাছ নেই পালা নেই—পাথর আর বালি। চারিধারে উঁচু উঁচু পাথরের ঢিবিমত। যতদূর যাও, কেবল এমনি। মানুষ নেই, জন নেই।

মাঝে মাঝে কিন্তু অতি বিকট আকারের দু-একজন লোক দেখা যায়। অসহায় স্ত্রীলোককে একা পেয়ে তাদের মধ্যে দুবার দুজন আক্রমণ করতে ছুটে এসেছিল। একবার কে এক দেবী (—কোথা থেকে এসেছিলেন, তাঁর নাম পুষ্প—বৌদিদি বলে ডেকেছিলেন তার মত সামান্য মেয়েকে—) তাকে উদ্ধার করেন। আর একবার কেউ রক্ষা করতে আসেনি—একা ছুটতে ছুটতে সে এক পাহাড়ের গুহায় ঢুকে গেল। আশ্চর্যের বিষয়, যে তার পিছু পিছু ছুটে আসছিল—সে তাকে আর খুঁজে পেলে না।

গৃহস্থের মেয়ে, গৃহস্থঘরের বৌ—একি উৎপাত তার জীবনে!

কি জানি, সেদিন শ্বশুরবাড়ীতে কি ভাবে যে সে স্বামীকে দেখেছিল...সেই থেকে তার মন অন্যরকম হয়ে গিয়েচে। কেবলই সাধ হয় আবার সেই শ্বশুরবাড়ীর ভাঙা কোঠার ঘরে সে তার ছোট্ট সংসার পাতবে, বাঁশবাগানের দিকের রান্নাঘরটিতে বসে বসে কত কি রান্না করবে। ডাল, মোচার ঘণ্ট, সুক্তুনি (উনি সুক্তুনি বড় ভালবাসেন), কই মাছের ঝোল মানকচু দিয়ে...

উনি এসে বলবেন—কি গো বৌ, রান্না কি হয়ে গেল?

—এসো...হয়েচে। হাত পা ধুয়ে নাও—জল গরম করে রেখেচি। বড্ড শীত আজ।

মাটির প্রদীপ জ্বলচে রান্নাঘরের মেঝেতে কাঠের পিলসুজে। তালপাতার চেটাই পেতে স্বামীকে আশা বসতে দিলে। মুখ দেখে মনে হোল উনি খুব ক্ষুধার্ত।—হ্যাঁগা, একটু চা করে দেবো?

—তা দাও, বড্ডই শীত।

—কাপগুলো সব ভেঙে ফেলেচে খোকা। কাঁসার গেলাসে খাও—ওবেলা দুটো কাপ কিনে নিয়ে এসো না গা কুড়ুলের বাজার থেকে।...চা খেতে খেতে উনি কত রকম মজার গল্প করচেন। সে বসে বসে শুনচে একমনে। সুন্দর দিনগুলি স্বপ্নের মত নেমেছিল তার জীবনে। আনন্দ...অফুরন্ত আনন্দ...সে সতী, পবিত্র, সাধ্বী। স্বামী ছাড়া কাউকে জানে না।

হঠাৎ আশা চমকে উঠলো। সে কার মুখের দিকে চেয়ে আছে? কে তার সামনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করচে? তার স্বামী নয়—এ তো নেত্যনারাণ! কুড়ুলে-বিনোদপুরের বাড়ী নয়—এ কলকাতার মাণিকতলার সেই বাড়ীউলি মাসীর বাড়ী, সেই রান্নাঘর, তাদের ছোট্ট কুঠুরিটার সামনে ফালিমত রান্নাঘরটা। ওই তো রান্নাঘরে তার হাতে তৈরী সেই দড়ির শিকে, হাঁড়িকুড়ি ঝুলিয়ে রাখবার জন্যে সে নিজের হাতে ওটা বুনেছিল মনে আছে। ওই তো সেই তাদের ঘরখানা, জানালা দিয়ে একটুখানি দেখা যাচ্চে, মুগের ডালের হাঁড়ি, বিছানার কোণটা।...উঃ! বিছানাটা দেখে ওর গা কেমন ঘিন্ ঘিন্ করে উঠলো। এই যে খানিকটা মাত্র আগে সে নিজেকে সতী সাধ্বী, স্বামী-অনুরক্তা, পরম পবিত্রা, আনন্দময়ী রূপে বর্ণনা করে মধুর আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল, কোথায় গেল ওর সে আত্মপ্রসাদের পবিত্রতা ও নির্ভরশীলতা! সে ঐ বিছানায় একসঙ্গে শোয়নি নেত্যদার সঙ্গে? এই পুরু ঠোঁটওয়ালা, চোখের কোণে কালি ইন্দ্রিয়াসক্ত নেত্যদা, যার মুখ দিয়ে এই মুহূর্তে এখনি মদের গন্ধ বার হচ্চে...যার অত্যাচারে তাকে আফিং খেয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে মরতে হয়েছিল। ওই তো সেই তক্তাপোশ, যার ওপরে সে ছট্‌ফটু করে-

ছিল আফিং খেয়ে।

আশা চমকে শিউরে উঠতেই নেত্যনারাণ দাঁত বার করে বল্লে—বলি, আর একটু চা দেবে, না একেবারে গরম গরম ভাতই বাড়বে? বড় রাত হয়ে গেছে। খেয়ে-দেয়ে চলো শুয়ে পড়া যাক্। যে শীত পড়েচে!

আশা কাঠ হয়ে বসে রইল। এ কোথা থেকে কোথায় সে এসে পড়ল। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস এ!

নেত্যনারাণ বল্লে—সত্যি, আমিও যে দিনকতক তোমায় খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েচি কত, তারপর—

আশার মুখ দিয়ে আপনা-আপনিই বেরুলো—কি তারপর?

—তারপর কে যেন টেনে নিয়ে এল আমায় এখানে। উঃ সে কি আকর্ষণ! আমি বলি কোথায় যাচ্চি—তারপরেই দেখি আমি একেবারে বাড়িউলি মাসীর বাড়ীতে মানিকতলায়। একেবারে তোমার কাছে। চল গিয়ে শুইগে যাই। রাত হোল অনেক।

বিরক্তি, ভয়, হতাশা ও অপবিত্রতার অনুভূতিতে আশার সর্বশরীর যেন জ্বলে উঠলো আগুনের মত। সে যে এইমাত্র তার শ্বশুরবাড়ীর সেই পবিত্র কোঠাবাড়ীতে তার স্বামীর সঙ্গে ছিল—প্রথম বিবাহিত জীবনের সেই স্মৃতিমধুর রাত্রির ছায়ায়; কেন এই অপবিত্র কলঙ্কিত শয্যাপ্রান্তে তার আহ্বান? এ কি নিষ্ঠুরতা।

ও বলে উঠলো—আমি যাবো না। তুমি তো আমায় ফেলে বাড়ী পালিয়ে ছিলে? কেন আবার এলে তবে? আমায় ছেড়ে দাও। আমি যাবো না ঘরে।

নেত্যনারাণ ঝাঁঝালো সুরে বল্লে—যাবে না শুতে? তবে কি সারারাত এখানে বসে থাকতে হবে নাকি?

—আমি আর মানিকতলায় নেই—আমরা মরে গিয়েচি। তুমি আর আমি দুজনেই। চলে যাও তুমি আমার কাছ থেকে—তুমিও মরে গিয়েচো।

নেত্যনারাণ অবাক হয়ে বল্লে—কি যে বলো তুমি। ঠাট্টা করচো নাকি? এই দ্যাখো সেই মানিকতলায় আমাদের ঘর, চিনতে পারচো না? যাবে কোথায় নিজেদের আস্তানা ছেড়ে? ক্ষেপলে নাকি? চলো—চলো—

আশা কলের পুতুলের মত ঘরের মধ্যে গিয়ে বিছানাটিতে শুয়ে পড়লো। ওর সর্ব-শরীর ঘৃণায় রি রি করচে, বমি হয়ে যাবে যেন এখনি। সমস্ত দেহ মন যেন অপবিত্র হয়ে গিয়েচে ওর, সকালে উঠে গঙ্গায় একটা ডুব দিয়ে না এলে এভাব যেন যাবে না। যাবে সে গঙ্গা স্নানে—ভোরে উঠেই যাবে বাড়ীউলি মাসীকে নিয়ে।

নেত্যনারাণ ঘরে ঢুকে দোরে খিল বন্ধ করে দিলে।

আশা অসহায় আর্ত সুরে বলে উঠলো—ওকি! খিল দিলে যে?

নেত্য ওর দিকে চেয়ে কড়া, নীরস কণ্ঠে বলে উঠলো—কী ন্যাকামী করচো সন্দে থেকে! সরে শোও, ওপাশে যাও!

আশা বিদ্রোহিণীর ভঙ্গিতে বিছানাতে উঠে বসে বল্লে—খিল খুলে দাও বলচি। আমি থাকবো না এ ঘরে। আমি তোমার সঙ্গে থাকবো না এক ঘরে—বাড়িউলি মাসীর সঙ্গে শোবো—

নেত্যনারাণ ভীষণ রেগে আশার চুলের মুঠি ধরে বিছানায় ঘুরিয়ে ফেলে দিয়ে বাজখাই সুরে বল্লে—তোর মেয়েমানুষের না নিকুচি করেচে—ভালো কথার কেউ নও তুমি। যত বলচি রাত হয়েচে শুয়ে পড়। তোর হাড় ভেঙে চূর্ণ করবো বেশি নেকুগিরি যদি করবি। ভুলে গিইচিস্ নেত্যনারাণকে—হাত ধরে একদিন বেরিয়ে এসেছিলি মনে নেই? সেদিন কে আশ্রয় দিত তোকে, আমি যদি না এখানে আনতাম! কোন্ বাবা

ছিল তোর সেদিন ?

—খবরদার, বাবা তুলো না বলচি—আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে।

— তবে রে বেইমান মাগি—তোকে মজা না দেখালে—

কথা শেষ না করেই নেত্যনারাণ আশাকে আথালি-পাথালি কিলচড় মারতে লাগলো। খাট থেকে মেজের ওপর ফেলে দিলে তলপেটে লাথি মেরে।...

কেউ নেই কোনো দিকে। আশা মেজের ওপর গড়িয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠলো, আর্ত অসহায় সুরে—ওর বেদনার্ত পশুর মত চাপা রুদ্ধ চীৎকারে মানিকতলার বাড়ী-উলি মাসীর বাড়ীটা কেঁপে কেঁপে উঠেছিল যেন। কেন এমন হোল ? সে যে ভাল হোতে চেয়েছিল, সে যে সব ভুলতে চেয়েছিল, সে যে শ্বশুরবাড়ীতে গিয়েছিল প্রথমযৌবনের বিবাহিত দিনের স্মৃতিমধুর অবকাশে...সেই মাধবী রাত্রির শুভ আহ্বান কেন এ কলঙ্কিত বাড়ীর কলঙ্কিত শয্যাপ্রান্তে উপপতির নিষ্ঠুর আহ্বানে পরিণত হোল ? হা ভগবান।

পরদিন সকালে উঠে আশা ছুট্ দিলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে।

কেউ ওঠেনি বাড়ীতে। বাড়ীউলি মাসী ঘুমুচ্ছে, পাশের ঘরে পাল মশাই এরা ঘুমুচ্চে...এই ফাঁকে খিল খুলে আশা পালাচ্চে সুপ্ত কলকাতা শহরের রাস্তা দিয়ে। সে কোথায় যাচ্ছে, কি বৃত্তান্ত কিছুই জানে না। গতরাত্রির অপবিত্র স্মৃতিতে ওর গা ঘিন ঘিন করচে...না, আর এসব নয়। তাকে ভালো হতে হবে। সে চায় না এ পাপ সঙ্গ। উপপতির আসঙ্গলিপ্সা তার মন থেকে মুছে ধুয়ে গিয়েছে কবে, বমি হয় সে কথা ভাবলে, মরার পরেও যেন গা বমি বমি করে। যতদূর হয় চলে যাবে, গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হবে, এ পাপপুরীর ত্রিসীমানায় আর সে আসবে না। ভগবান তাকে রক্ষা করুন। সে বেঁচে নেই, যেখানে খুশি সে যেতে পারে। কলকাতা শহর অনেকদূরে মিলিয়ে গেল।

পৃথিবীর পাপস্মৃতি আর তাকে কষ্ট দেবে না। অনেকদূরে সে চলে এসেচে বাড়ীউলি মাসীর কাছ থেকে। এ তার শৈশবের নিষ্পাপ দিনগুলিতে সে ফিরে গিয়েচে।

সে যেন তাদের গ্রামে মুখুয্যেদের পুকুরপাড়ে নিতাই ভড়দের বাড়ী নিতাই ভড়ের মেয়ে সুবির সঙ্গে খেলা করতে গিয়েচে। ঐ তাদের পাড়ার পুকুরপাড়ের সেই বড় তেঁতুলগাছটা। ওই নিতাই ভড়ের বাড়ীর উঠোনের ধানের গোলা। নিষ্পাপ, সুন্দর শৈশব-কাল। এখানে শুধু তার মাকে সে জানে, কোনো স্মৃতি তার মনে নেই—হেমন্তের প্রথম শিশিরার্দ্র গ্রাম্য মাঠে নব ধান্যগুচ্ছের আন্দোলনের মত তার জীবনের আনন্দে চঞ্চল, ঝরা শিউলিফুলের সুবাস সুরভিত জীবনের অতি মধুর প্রভাত...

—সুবি—ও সুবি—খেলবিনে আজ, বাইরে আয় ভাই—

সুবি বাইরে এসে বল্লে হাসিমুখে—আশাদি, কোথায় ছিলি রে ? ক'দিন খেলতে আসিসনি—

আশা খুশি হোল।' এ তার সত্যিকার শৈশব। সে বেঁচে গেল। এই তার সুন্দর, মধুর আশ্রয়। তার মা—এখুনি তার মা ডাকতে আসবে তাকে। খুশির সুরে পরম নির্ভরতার সঙ্গে আশা ডাকলে সুবিকে। সুবি ছুটে এল, ওর হাতে একটা পেঁপের ডাল।

—কি হবে রে পেঁপের ডাল ?

—বাজাবো। এই দ্যাখ্—

সুবি পেঁপের ডালের ফুটোতে মুখ দিয়ে পোঁ পোঁ করে বাজাতে লাগলো।

আশা হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো খুশি হয়ে। কি মজা ! কি মজা !

সুবি বললে—চল্ মুখুয্যেদের নন্দিনী দিদি শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেচে—দেখে আসি।

—না ভাই, মা বকবে।

—বাড়ীতে বলে আয় না? নন্দিনী দিদিকে দেখেই চলে আসবো—

—চল্ তবে। কিন্তু ভাই দেরি করা হবে না—

ওরা কত জায়গায় খেলা করে বেড়ালে। বনমূলো-ফুলের বড়া ভেজে খাওয়ার অভিনয় করলে।

শৈশবের অতিপরিচিত সব খেলার জায়গা। নন্দিনী দিদি কত বড়, ওদের মায়ের বয়সী, ওদের দুজনের আর কি বয়সটা? নদীর ওপর মেঘ আসচে, কতদূর থেকে অকাল-বর্ষার মেঘ ভেসে আসচে আকাশ ভরে। হেমন্তে কাশ ফুলের শোভা।

সুবি বল্লে—বেলা বেশি হয়েচে—বাড়ী ফিরি—

—হ্যাঁ চল্ ভাই—মা বকবে—

মা তাকে বকবে সে জানে। টক কাঁচা তেঁতুল খাওয়ার জন্যে বকবে, এতক্ষণ বাইরে থাকার জন্যে বকবে। তারপর রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ওকে খাইয়ে দেবে। উত্তরের ঘরে ওর জন্যে মাদুর পেতে অন্নপূর্ণা দিদি ছেলেমেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে। খেয়ে গিয়ে অন্নপূর্ণা দিদির পাশে ও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়বে।

সুবি বল্লে—আমাদের বাড়ী দুটি ভাত খাবি আশা?

—দূর, তোরা জেলে। জেলের বাড়ী বুঝি বামুনের মেয়ে খায়?

—লুকিয়ে?

সুবি হাসলে। ওর বড্ড বন্ধু সুবি। কষ্ট হয় সুবির মনে দুঃখু দিতে। তবু সে বল্লে—না ভাই সুবি, কিছু মনে করিস্ নি। আমার বাড়ীতে ভাত তো হয়েইচে—

—বড়ি-ভাতে ভাত খাবিনি আমার সঙ্গে? মা নতুন বড়ি দিয়েচে—

—দূর, বড়ি বুঝি এখন দেয়? বড়ি দেয় সেই মাঘ মাসে। নতুন কুমড়ো নতুন কলাই এর ডাল উঠলে। মিথ্যে কথা বলিস্‌নি সুবি।

—মিথ্যে বলিনি। পুরোনো ডালের বুঝি বড়ি হয় না? চল্ আমার সঙ্গে—

আশা বাড়ী ফিরচে। বেলা অনেক হয়ে গিয়েচে। মুখুয্যেদের পুকুরঘাটে আর কেউ নাইচে না, সবাই নেয়ে বাড়ী চলে গিয়েচে। তেঁতুলের ডালে মোটা মোটা কাঁচা তেঁতুল ঝুলচে দেখে ওর জিবে জল এল।

দুটো তেঁতুল পাড়লে হোত। কিন্তু কি করে পাড়ে? সুবিকে বল্লে হোত, সে অনেক রকম বুদ্ধি ধরে, একটা কিছু উপায় করতে পারতো।

পুকুরপাড়েই সরু রাস্তা ধরে খানিকদূর গিয়ে ওদের বাড়ী। সারি সারি পেঁপে গাছ। একটা ধানের গোলা। তাদের মুচিপাড়ার ধানের ক্ষেত থেকে বছরের ধান এসে গোলা ভর্তি হয়। এখুনি সব চোখে পড়বে।

কিন্তু একটু যেন অন্যরকম।

পেঁপে গাছের সারি নেই। ধানের গোলা নেই। তাদের বাড়ীর চটা-ওঠা ভাঙা পাঁচিলটা নেই। এ কোথায় সে যাচ্ছে? তাদের বাড়ীটা নয়। আতঙ্কে ওর বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় দিতে লাগলো। বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীর সেই দোরটা। মানিকতলার বাড়ীউলি মাসী। আশা চীৎকার করে পেছনে ফিরে পালাবার চেষ্টা করতেই নেত্যনারাণ দোর খুলে বের হয়ে এসে বল্লে—কোথায় ছিলে এতক্ষণ চাঁদ? কাল দু'এক ঘা দিয়েছিলাম বলে রাগ হয়েচে বুঝি?

তারপরেই সে আশার মুখের কাছ হাত নেড়ে নেড়ে ইতরের ভঙ্গিতে গাইলে তুড়ি দিতে দিতে—

দুটো কথা কি তোমার প্রাণে সয় না?
একঘরে ঘর করতে গেলে ঝগড়া কি, প্রাণ, হয় না?
দুটো কথা কি—

এসো এসো শোবে এসো—বেলা হয়ে গিয়েচে।

ব্যাধবিদ্ধা হরিণীর মত আশা ছটফট করতে লাগলো নেত্যনারাণের হাতে।

তারপর সে দুম দুম করে নিষ্ঠুরভাবে মাথা কুটতে লাগলো ঘরের চোকাঠে। সে আজ মরে যাবে। এ কলঙ্কিত জীবন সে রাখতে চায় না। ব্যথা লাগচে, রক্তারক্তি হচ্চে—কিন্তু সে মরতে পারবে না। সে অমর। অনন্ত কাল ধরে সে মাথা কুটলেও মরবে না।

নেত্যনারাণ তাকে হাত ধরে ওঠাতে লাগলো। বলতে লাগলো—কি পাগলামি করো, ক্ষেপলে নাকি? চলো শুই গিয়ে—

সন্ধ্যাবেলা উনুনে আঁচ দিয়েচে ঘরে ঘরে। নেত্যনারাণ বাড়ী নেই, কোথায় গিয়েচে। ও এসে বাড়ীউলি মাসীর দরজায় দাঁড়ালো। কোথায় সে পালাবে তাই ভাবচে। এ কি ভয়ানক নাগপাশের বন্ধনে তাকে পড়তে হয়েচে। আর সে এ বাড়ীতে থাকতে পারবে না। ঐ ঘরে কত রাত্রে কত কুলবধূর জীবন কলঙ্কিত হয়েচে। তারপর ঐ ঘরের ঐ তক্তপোশে বিষ খেয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে তার সে শোচনীয় মৃত্যু! আবার সে বেরিয়ে পড়লো।

এই কলকাতা শহরের সর্বত্র তার স্মৃতির বিষ ছড়ানো। কালীঘাট? কালীঘাটে কি করে যাবে, নেত্যদা সেখানেও একবার তাকে নিয়ে গিয়ে সেখানে বিষ ছড়িয়ে এসেচে। আবার সে ছুটে চলে যাবে কুড়ুলে-বিনোদপুরে স্বামীর ঘরে। সেখানে যেতে পারলে সে বাঁচে।

কিন্তু একদিন কেমন করে হঠাৎ গিয়ে পড়েছিল—সেইদিন গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। কিন্তু সেখানে যাবার পথ সে জানে না। চিনে আজ আর যেতে পারবে না। ভুলে গিয়েচে সে পথটা।

তার এক সইএর বাড়ী আছে সুবর্ণপুর। সেখানকার রজনী ডাক্তারের মেয়ে। কুমারী-জীবনের বন্ধু। রজনী ডাক্তারের বাড়ীর পাশে ছিল ওর বড়দিদির শ্বশুরবাড়ী, যে বড়দিদি বিধবা হয়ে ইদানীং ওদের সংসারে ছিলেন। জামাইবাবুর সঙ্গে একবার দিদির ওখানে বেড়াতে গিয়ে সুবর্ণপুরে রজনী ডাক্তারের মেয়ে বীণার সঙ্গে আলাপ হয়।

তাদের কাঁটালতলায় দুর্গাপিঁড়ি পাতা দেখে আশা বলতো—ভাই সই, কাঁটালতলায় দুর্গাপিঁড়ি কেন?

বীণা বলতো—দুর্গাপিঁড়ি ঘরে তুলতে নেই আমাদের। বাপঠাকুরদার আমল থেকে কাঁটালতলাতেই থাকে—

সইএর বিয়ে হয়েছিল কাঁচরাপাড়ার কাছে বাগ বলে গ্রামে। বাগের দত্তদের বাড়ী, তারা ওখানকার নাম-করা জমিদার। সই যদি তাকে আশ্রয় দেয়, সেই পবিত্র কুমারী-জীবনে সে লুকুতে পাবে! কলকাতার বাড়ীউলি মাসীর বাড়ী থেকে সে চলে যাবে সোজা—সুবর্ণপুর গ্রামের সেই কাঁটালতলায়, যেখানে সইদের দুর্গাপিঁড়ি পাতা থাকে সারা বছর।

উনুনের আঁচের ধোঁয়ায় অন্ধকারে অস্পষ্ট সিঁড়ির পথ বেয়ে সে নেমে এল রাস্তায়। কি জানি কেন, বাড়ীটা থেকে সামান্য একটু দূরে চলে এলেও ও নিজেকে পবিত্র মনে করে। মনের সব গ্লানি কেটে যায়...সে নির্মল, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ আত্মা...এতটুকু পাপের বা মলিনতার ছোঁয়াচ লাগেনি তার সারা দেহমনে।

হঠাৎ কেমন করে সে রজনী ডাক্তারের কোঠাবাড়ীটার উঠোনে নিজেকে দেখতে পেলে। সেই কাঁটালতলায়।

—ও সই!

—ও মা—কত কাল পরে এলি তুই? ভাল আছিস্ সই?

বীণার বিয়ে হয়নি, সিঁথিতে সিঁদুর নেই। বীণা এসে ওকে জড়িয়ে ধরলে কত আদরে।

আশা আনন্দে ও উৎসাহে অধীর হয়ে উঠলো। বীণাকে বল্লে—সই, তুই আমাকে ধরে রাখ্ ভাই। কোথাও যেতে দিস্ নি।

—না, থাক্ এখানে। কোথাও যেতে দেবো না—

—ভাই, এ সত্য না স্বপ্ন?

—কেন রে?

—আজকাল আমার কি যে হয়েচে, কোন্‌টা স্বপ্ন, কোন্‌টা সত্যি বুঝতে পারিনে। দুটোতে কেমন যেন জড়িয়ে গিয়েচে।

—না ভাই। ওই সেই দুর্গাপিঁড়ি-পাতা কাঁটালতলা। আমাদের ইতুপুজোর ঘট ওখানে সাজানো আছে। এখন সন্দেহ গেল রাজকুমারী?

—ঠাট্টা করিস্ নি। আমার ভয়-ভয় করে সর্বদা। কি হয়েচে আমার বলতে পারিস্?

—তোর মাথা হয়েচে। নে, আয় দুটো মুড়ি আর ফুট্-কলাই ভাজা খা। তুই ভালবাসিস্—মনে আছে?

—খুব।

সারাদিন দুই সই-এ কত গল্পগুজব কতকাল পরে। সব ভুলে গিয়েচে আশা—সে পবিত্র, পবিত্র। সামনে তার সুদীর্ঘ জীবন পড়ে আছে। সই-এর সঙ্গে গল্পে কত ভবিষ্যৎ জীবনের রঙীন স্বপ্ন আঁকে সে রজনী ডাক্তারের বাগানের বাতাবীলেবুতলার ছায়ায় বসে। শ্বশুরবাড়ী হবে পাড়াগাঁয়ে বড় গেরস্থ ঘরে, আট দশটা ধানের গোলা থাকবে বাড়ীতে, সে বাড়ীর বৌ-হিসেবে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাবে গোলার সামনে বেদীতে …ধান মেপে মেপে গোলায় তুলবে। স্বামী হবে উকিল বা ডাক্তার। সারাদিন পরে খেটেখুটে এসে বলবে—ও বড়-বৌ—আলো দেখাও—

বীণা হাসে। সেও তার মনের কথা বলে।

গ্রামের একটি ছেলেকে সে ভালবাসে। যদি তার সঙ্গে বিয়ে হয়—

ও সব কথা কেন? ও কথা সে শুনতে আসেনি। তবুও সে জিজ্ঞেস্ করলে—কে ভাই ছেলেটি?

—ব্রাহ্মণ। সত্যনারাণ চাটুয্যের মেজছেলে। তাকে দেখাবো একদিন।

যতক্ষণ সে সইএর বাড়ী রইল সে হয়ে গেল একেবারে ঠিক তেরো চোদ্দ বছরের সরলা মেয়েটি। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল। কাঁটালতলায় ছায়া পড়লো, রাঙা রোদ একটু একটু দেখা যায় গাছের তলায়। এ সময়ে আশাকে বাড়ী ফিরতে হবেই।

সইকে বল্লে আমার সঙ্গে একটু এগিয়ে চল্ না আমাদের বাড়ী পর্যন্ত সই?

—চল্ এগিয়ে দিয়ে আসি—

বাঁশবাগানের তলা দিয়ে অন্ধকার সন্ধ্যার পথে দুই সই-এ চলেচে। ওই জামাইবাবুদের বাড়ীটা। বড়দি এতক্ষণ চা করে নিয়ে বসে আছে ওর জন্যে।

বীণা বল্লে—ওই তোদের বাড়ীর দরজাটা—আমি চলি সই। এর পরে একলা যেতে পারবো না—

বীণা চলে গেল অন্ধকার বাঁশবনের পথটা দিয়ে একা একা। আশা সইএর অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে চেয়ে রইল—তারপর যখন আর দেখা গেল না তখন সামনের দিকে চেয়েই ভয়ে ওর বুক কেঁপে উঠলো…কি ওখানে?

ও চীৎকার করে ডাক দিলে—ও সই—ও বড়দি—

ওর সামনে বাড়ীউলি মাসীর দরজা, যে দরজাটা খুলে সকালে আজই পালিয়ে গিয়েছিল লুকিয়ে। ওর চীৎকার শুনে দরজাটা খুলে নেত্যনারাণ দুপাটি দাঁত বের করে এগিয়ে এসে বল্লে—বাপরে! কি তোমার কাণ্ড! কোথায় গিয়েছিলে সারাদিন?...

তার পর ওর হাত ধরে টানতে টানতে বলে—চলো, চলো, রাত হয়ে গিয়েচে—শোবে এসো, শোবে এসো...

কতকাল যে কেটে গেল মাণিকতলার বাড়ীউলি মাসীর সেই বাড়ীটাতে। তার কোনো হিসেব নেই, কোনো লেখাজোখা নেই—আশার মনে হয় বাল্যকাল থেকে তার বিবাহের সময়, তারপর তার সমস্ত বিবাহিতা জীবন নিয়ে যতটা সময়ের অভিজ্ঞতা তার আছে—তেমনি কত বাল্যজীবন, কত বিবাহিত জীবন, কত বৈধব্যজীবন এবং কত মাণিকতলার জীবন তার কেটে গেল—সে কিন্তু সেই এক ভাবেই রইল একই জায়গায় স্থাণুবৎ অচল।

নেত্যদা তাকে ছাড়ে না। কতবার সে পালিয়ে গিয়েচে—জীবনের কত জানা অজানা কোণে। কত বছরের ব্যবধান রচনা করচে সে বর্তমান জীবনের ও সেই সব অতীত দিনের শান্তি ও পবিত্রতামণ্ডিত অবকাশের।

কিন্তু কোনো ব্যবধান টেঁকে না।

সব এসে মিশে যায় বর্তমানের এই কলকাতা মানিকতলার বাড়ীউলি মাসীর বাড়ীর দরজায় এই ঘরটাতে, ওই তক্তপোশটাতে।

এখন যেন তার মনে হয়—এসব যা ঘটেচে, এ আসল নয়, সব যেন অবাস্তব, স্বপ্নবৎ ...এ সব ছায়াবাজি...জীবনটাই যেন একটা মস্ত ছায়াবাজি হয়ে গেল তার...

সই, মা, ভাই, বোন, স্বামী, ছেলে-মেয়ে কিছুই নিত্য নয় তার জীবনে...আসে আবার চলে যায়...বাড়ীউলি মাসীর এ বাড়ীটাই কি এদের মধ্যে একমাত্র সত্যি? আর নেত্যদা, আর এই সরু রান্নাঘরটা...আর ওই ছোট ঘরের ছোট তক্তপোশটা? এর কি কোনো শেষ হবে না, এ দিনের এই সব টিকে থেকে যাবে চিরকাল?

কোন্‌টা সত্যি, কোন্‌টা স্বপ্ন আজকাল সে বুঝতে পারে না। যেটাকে সত্যি ভেবে হয়তো আঁকড়াতে যায়—সেটাই মিথ্যে হয়ে স্বপ্ন হয়ে যায়। তার কি কোনো রোগ হোল? এমন সাধের, এমন আদরের, এমন আশা-আনন্দের জীবনের শেষকালে এ কি ঘটলো? কোথায় চলে গেল স্বামী, কোথায় গেল বাপের ভিটে, শ্বশুরের ভিটে? এ কি-ভাবে পাগল বা বুদ্ধিহীন কিংবা রোগগ্রস্ত অবস্থায় সে পড়ে রইল?

নেত্যনারাণ এসে বল্লে—রান্না করবে না আজ? বসে আছ যে—

—আমি জানিনে। তুমি আমায় বিরক্ত করতে এসো না।

—কেন আজ আবার রাজরাণীর কি মেজাজ হোল?

—তুমি চলে যাও এখান থেকে—

নেত্যনারাণ ওর কাছে এসে বল্লে—বড্ড ঠাট্টা কর তুমি মাঝে মাঝে। কোথায় যাই বল তো? এখন আমি চলে গেলে তুমি খাবে কি? রূপের ব্যবসা যে খুলবে, সে আর হবে না। আয়নাতে চেহারাখানা দেখেচো এদানিং?

আবার কি-সব যাচ্ছেতাই কথা। অনবরত অপবিত্র অশ্লীল ধরনের এই সব কথা কেন তাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সর্বদা শুনতে হয়। ও ভেবে ভেবে বল্লে—আমরা তো মরে গিয়েচি—খাবার আর দরকার কি?

নেত্যনারাণ ওর দিকে চেয়ে বল্লে—মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? তবে খাচ্চ কেন? রোজ রোজ রান্নাবান্না করচো কেন? বাজার করচি কেন?

—কেউ খাচ্চে না। কেউ বাজার করচে না। সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন!

কিন্তু নেত্যনারাণের চোখের বিস্ময়ের দৃষ্টি এত অপকট যে, নিজের বিবেচনার ওপর আশা আস্থা হারালে। নিজে যা বলতে চাইছিল, শেষ করতে পারলে না। মিনতির সুরে বল্লে—আচ্ছা নেত্যদা, তোমার কি মনে হয়? এমন কেন হচ্চে বলতে পারো? এ সব কি? সত্যি না স্বপ্ন?

—তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

—তাই বলে কি তোমার বিশ্বাস?

—নইলে আবোল-তাবোল বকবে কেন? স্বপ্ন কিসের? আমি রইচি, আমি হাট-বাজার করচি, খাচ্চি দাচ্চি—সব স্বপ্ন হোল কি ভাবে? এই ঘরবাড়ী দেখতে পাচ্চ না? —বাড়ীউলি মাসী, ও বাড়ীউলি মাসী—শুনে যাও এদিকে। কি বলচে শোনো ও!

বাড়ীউলি মাসী বল্লে—কি গা?

—ও বলচে এ সব নাকি মিথ্যে। তুমি, ঘরবাড়ী, এই বিছানা—সব স্বপ্ন।

—কি জানি বাপু, ও সব তোমরা বসে বসে ভাবো। আমাদের খেটে খেতে হয়, শখের ভাবনা ভাববার সময় নেই। বেলা হোল দুপুর, উনুনে আঁচ পড়েনি। পালেদের বৌ সেই কোন্ সকালে একবাটি চা খাইয়েছিল ডেকে। যাই—

নেত্য ওর দিকে চেয়ে বল্লে—শুনলে?

আশা বোকার মত শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে হতাশ ভাবে বল্লে—কি জানি বাপু! আমার যেন এক এক সময় মনে হয় এ সব স্বপ্ন দেখচি তুমি আর আমি। এ ঘর নেই, বাড়ী নেই, খাট নেই, বিছানা নেই—ওই রাস্তা, লোকচলাচল সব মিথ্যে, সব স্বপ্ন। কেবল তুমি আর আমি আছি—আর এই যে সব দেখচি সব স্বপ্ন দেখচি আমরা দুজনে।

—বা রে, বাড়ীউলি মাসী এলো, কথা বলে গেল, ও-ও কিছু নয়?

পরে বিভ্রান্তকে বোঝাবার সুরে সদয়ভাবে বল্লে—ও সব তোমার মাথার ভুল। সব সত্যি—দেখচো না বাড়ীউলি মাসী এসে কি বলে গেল। একবার তোমাকে হোমিও-প্যাথিক ওষুধ খাওয়াতে হবে। রাত্তিরে ভাল ঘুম হচ্চে না, না কি?

আশা বল্লে—তবে মাঝে মাঝে পাই আবার হারাই কেন?

অনেকটা অন্যমনস্ক সুরে কথাটা বলে ফেলেই ও চাপতে চেষ্টা করলে। বল্লে—কি জানি, যা বলচো, তাই বোধ হয় হবে। আচ্ছা আমরা এখানে কতকাল থাকবো? চলে যাবো এখান থেকে।

—কেন যাবো? বেশ আছি।

—আমাকে আমার গাঁয়ে রেখে এসো—লক্ষ্মীটি?...

নেত্য রেগে উঠে বল্লে—মেরে হাড় গুঁড়ো করবো। সেই শম্ভু বাঁদরটার জন্যে মন কেমন করচে বুঝি? আমি সব জানি।

—না না, সত্যি না নেত্যদা। তোমার দুটি পায়ে পড়ি। আমার এখানে থাকতে ভাল লাগচে না। ভয় হচ্চে। মনে হচ্চে যেন একটা জায়গায় এসে পড়েচি, এখান থেকে বেরুবার পথ নেই। এই ছোট্ট ঘরটা, ওই তক্তপোশটা...এ বাড়ীর যেন চারিদিকে দেয়াল দিয়ে আমাদের কে আটকেচে। এখান থেকে কেউ বেরুতে দেবে না। এ সবও সত্যি নয়, ও সব মিথ্যে, সব ছায়াবাজি। যা এই সব দেখচি না?...সব ভুল।

নেত্য ব্যঙ্গের সুরে বল্লে—আবার আবোল-তাবোল বকুনি? মাথা কি একেবারে গেল?

আশা আপন মনেই বলে যাচ্ছিল—এ থেকে তোমার আমার কোনোদিন উদ্ধার নেই। জানো, আমি অনেক চেষ্টা করেচি পালাবার, বাইরে যাবার। কিন্তু পারিনি—কে আবার এই সবের মধ্যে আমায় এনে ফেলেচে। অথচ আমি চাই উদ্ধার পেতে এ সব থেকে, এখান

থেকে অনেক দূরে চলে যেতে—যেখানে এসব নেই। কেন পারিনে জানো? অনেক চেষ্টা করেচি আমি পালাবার—পারিনি।

আশা অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়লো। নেত্য না-বোঝার দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল উদ্বিগ্নভাবে।

নেত্য নানারকম অত্যাচার শুরু করলো ক্রমে ক্রমে আশার ওপর। ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রাখে, মারধর তো করেই। বাড়ীউলি মাসী যোগ দিয়েচে নেত্যদার দিকে। ওকে বলে —বল্লুম, এক মাড়োয়ারী বাবু জুটিয়ে দিচ্ছি—তা হোল না। লোকে কি যার সঙ্গে বেরিয়ে আসে, তার সঙ্গেই ঘর করে চিরকাল? কত দেখনু আমার এ বয়সে। ওই যে পাশের বাড়ীর বিন্দি, আপন দেওরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল, তা কই এখন? কোথায় গেল সে রসের নাগর দেওর? নোয়াওলা খোট্টা বাবু রাখেনি ওকে? কেমন ছাপর খাট, গদি, এক পিরুস্তুত রুপোর বাসন! দুপয়সা গুছিয়েচে—

কি ঝকমারি করেচে আশা। এই কথাবার্তা তার গায়ে ছুঁচের মত বেঁধে আজকাল। কেউ ভাল কথা যদি বলতো দুটো এখানে। কালি ঢেলে ঢেলে তার সারা গায়ে কালি মাখিয়ে দেয় এরা।

কিন্তু কাটলো বহুকাল। অনেক দিন, বৎসর, মাস—অনেক জীবন, জন্ম মৃত্যু যেন জড়িয়ে এক হয়ে গিয়েচে। সত্যিতে স্বপ্নতে জড়িয়ে এক হয়ে গিয়েচে। এমন শক্ত হয়ে পাক জড়িয়ে গিয়েচে এবং আরও যাচ্চে দিন দিন যে, কেউ খুলতে পারবে না। একদিন সে আফিং আনিয়ে নিল পালেদের ছেলের হাত দিয়ে। সেদিন নেত্যনারাণ কোথায় বেরিয়েচে—ভালোই হয়েচে, একেবারে সব যন্ত্রণার অবসান সে আজ করবে। ঘরে খিল দিয়ে শুয়ে রইল আফিং খেয়ে—তারপর ক্রমে ঝিমিয়ে পড়লো। পেটে কোথায় যেন ভীষণ বেদনা করচে...সব যন্ত্রণার আজ একেবারে শেষ হবে। সকলের মুখে অশ্লীল কথা শুনতে হবে না। কিন্তু কোথা থেকে নেত্যনারাণ ফিরে এসে ওর ঘরের দোর ভেঙে খিল খুলে ওর মাথার চুল ধরে সারা বারান্দা হাঁটিয়ে বেড়াতে লাগলো। কিছুতেই ওকে বসতে দেয় না, গালে চড় মারে—বলে—বসতে চাও? ন্যাকামি করে আবার আফিং খাওয়া হয়েচে—ওঠো বেঁচে, তারপর তোমার হাড় আর মাস—

বাড়ীউলি মাসী কোন্ ফাঁকে কাছে এসে চুপি চুপি বলে—বন্নু বাপু, দিব্যি মাড়োয়ারী বাবু জুটিয়ে দিচ্চি। অমন কত হচ্চে আজকাল। কেন মিছিমিছি আফিং খেয়ে কষ্ট পাওয়া?...দিব্যি সুখে থাকবে। ওই পাশের বাড়ীর বিন্দি। ছাপর খাট, কলের গান, বাসনকোসন। ও যে আপন দেওরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল—

ওর মন আর পারে না। অবসন্ন, ক্লান্ত মন যেন বলে ওঠে—ভগবান, আমি আর পারিনে। আমায় বাঁচাও—এ থেকে উদ্ধার করো—

কে যেন ওর কথা শোনে। আশার স্বপ্নাচ্ছন্ন, অবসন্ন মন বোঝে না কে সে। অনেক দূরের, অনেক আকাশের পারের কোন্ দেশ থেকে সে যেন উড়ে আসে পাখায় ভর করে। একবার আশার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে যেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী, মহিমময়ী দেবীমূর্তি ভেসে ওঠে। বরাভয়করা স্মিতহাস্যমধুরা...অপরূপ রূপসী জ্যোতির্ময়ী নারী। আর মনে আছে এক সাদা বড় পাহাড়ের ছবি, সবাই মিলে, তাকে ছুঁড়ে যেন সেই সাদা পাহাড় থেকে বহুদূরে নীচের দিকে ফেলে দিচ্চে।

দেবী যেন হাসিমুখে বল্লেন—যাও, ভাল হও—ভুল আর কোরো না।

কে যেন প্রশ্ন করলে—আশা-বৌদি স্বামীর সঙ্গে মিলবে কি করে? ও তো সব ভুলে যাবে।

দেবী বল্লেন—আমি সব মিলিয়ে দিই। ওরা তো নতুন মানুষ হয়ে চললো, ওদের সাধ্য কি ?

তারপর গভীর অতলস্পর্শ অন্ধকার ও বিস্মৃতি। অন্ধকার...অন্ধকার।

পুষ্প একদিন সেই নির্জন গ্রহটিতে একা গেল। ওর বড় কৌতূহল হয়েছিল বন-কান্তার, অরণ্যানী ও শৈলমালায় পরিপূর্ণ ওই ছায়াভরা গ্রহের জীবনযাত্রা দেখতে।

এবারও রাত্রি নেমেচে গ্রহটিতে।

জীবকুল সুপ্ত। অপূর্ব সুন্দর দেশ। বোধহয় ঐ গ্রহে তখন বসন্ত ঋতু। সেই দিক্-দিশাহীন অরণ্যে কান্তারে নাম-না-জানা কত কি বন-কুসুম-সুবাস। বনে বনে ছাওয়া সারা দেশ। বনের গাছপালার মধ্যে দিয়ে বেঁকে এসে ওর সাথী তারার নীল জ্যোৎস্না পড়েচে। নৈশ পক্ষীকুলের ক্বচিৎ পক্ষ-বিধূনন।

গ্রহের দিকবিদিক সে চেনে না। পৃথিবীতে গেলে ভবে উত্তর দক্ষিণ দিক বুঝতে পারে। এ গ্রহের লোকে কাকে কোন্ দিক বলে কে জানে ? কিন্তু এর মাঝামাঝি থেকে একটু বাঁ দিকে ঘেঁষে এক উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণী বহুদূর ব্যেপে চলে গিয়েচে. অনেক ছোট বড় নদী এই শৈলগাত্র থেকে নেমে চলেচে নীচেকার বনাবৃত উপত্যকায়। দু-একটি বড় জলপ্রপাত বনের মধ্যে।

ওর আকাশে বাতাসে বনে বনানীতে কেমন একটি শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ আনন্দ। এর বাতাসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যে নেবে, সে-ই যেন হয়ে উঠবে আনন্দময় ব্রহ্মদর্শী ভক্ত, ধীর ও নির্লোভ, তৃষ্ণাহীন ও উদার। এর বনতলে জীবের অমরত্বের কথা লেখা আছে, লেখা আছে এ বাণী যে এই বনতলে তাঁর আসন পাতা। উচ্চ জগৎ বটে।

হঠাৎ ও দেখলে একটি বনপাদপের তলে শিলাসনে স্বয়ং কবি ক্ষেমদাস বসে।

ও দেখে বড় খুশি হয়ে কাছে গেল। ক্ষেমদাস বল্লেন—এসো এসো, যিনি আদি কবি, বিশ্বস্রষ্টা, তাঁর বিষয়ে আমি কবিতা রচনা করচি।

—আপনি এ গ্রহ জানেন ?

—কেন জানবো না ? এ রকম একটা নয়—দীর্ঘ বনফুলের মালার মত একসারি গ্রহ আছে বিশ্বের এ অংশে। আমি জানি। তবে এখানে আসতে হয় যখন এ গ্রহে রাত্রি।

—কেন ?

—এখানকার লোক উচ্চশ্রেণীর জীব; ওরা আমাদের দেখতে পাবে দিনের আলোয়। এখন ওরা সুপ্ত। বসো ওই শিলাসনে। বেশ লাগে এখানে। লোকালয় এ গ্রহে খুব কম। বনে হিংস্র জন্তু নেই। কেমন নীল জ্যোৎস্না পড়েচে দেখেচো ? বড় ভালবাসি এ দেশ।

—আপনি এখানে আসেন কেন ?

—একটি তরুণ কবি আছে এ গ্রহে, তাকে প্রেরণা দিই। ভগবদ্ভক্ত। এই শিলাসনেই সে খানিক আগেও বসে ছিল। প্রতি রাত্রে নির্জনে এসে বসে। সৃষ্টির এ সৌন্দর্যের স্তবগান রচনা করে। ওই তার উপাসনা। তুমি জানো আমারও ওই পথ। তাই তার পাশে এসে দাঁড়াই।

—তিনি দেখতে পান আপনাকে ?

—না। আমাকে বা তোমাকে দেখতে পাবে না। তোমার সঙ্গী যতীনকে দেখতে পেতো। সে এখন কত বড় ছেলে।

পুষ্প সলজ্জভাবে বল্লে—ন'বছরের বালক।

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—আবার নব জন্মলীলা। বেশ লাগে আমার। আবার মাতৃক্রোড়ে যাপিত শৈশব। চমৎকার !

পুষ্প হেসে বল্লে—সন্ন্যাসী এখানে উপস্থিত থাকলে আপনার কথা মেনে নিতেন?

—জানি, সে বলে বার বার দেহ ধারণ করা মুক্তির পথে বাধা। সে বলে, ও থেকে উদ্ধার নেই। সেই একই জীবনের পুনরাবৃত্তি, চক্রপথে উদ্দেশ্যহীন গতাগতি। সেই একই লোভ, তৃষ্ণা, অহঙ্কার নিয়ে বার বার অসার জন্ম ও মরণ। এই তো?

—কথাটা কি মিথ্যে?

—না। মানি। কিন্তু সে কাদের পক্ষে? যারা জীবনের উদ্দেশ্যকে খুঁজে পায়নি বা ভগবানের দিকে চৈতন্য প্রসারিত করেনি তাদের পক্ষে। যারা জানে না স্থূল দেহের পরিণাম ধূমভস্ম নয়, জন্মের পূর্বেও সে ছিল, মৃত্যুর পরেও সে থাকবে, ভূলোকে শুধু নয়, ব্রহ্ম থেকে জীবে নেমে আসতে যে সাতটি চৈতন্যের স্তর আছে, এই সাত স্তরের প্রত্যেকটি স্তরে এক একটি লোক, সে এই সব লোকেরই উত্তরাধিকারী, ভগবানের সে লীলা-সহচর। যারা এ কথা জানে না, জানবার চেষ্টা করে না, জেনেও গ্রহণ করে না বিষয়ের মোহে—তাদের পক্ষে সন্ন্যাসীর কথা পরম সত্য। কিন্তু আমার পক্ষে নয়।

পুষ্প একমনে শুনছিল। এই পবিত্র গ্রহের তপোবনসদৃশ অরণ্যকান্তারে এ দেশের ঋষিকবিরা যেখানে নিদ্রাহীন গভীর রাত্রে ভগবানের স্তবগাথা রচনা করেন—এ গ্রহের উপনিষদ জন্ম লাভ করে তাঁদের হাতে—এই স্থানেই ক্ষেমদাসের উপদেশ উচ্চারিত হবার উপযুক্ত বটে। পুষ্প ব্যগ্রসুরে বল্লে—বলুন, দেব, বলুন—

ক্ষেমদাস আবার বল্লেন—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি—যে তাঁকে জেনেচে সে দেহ-ধারণ করেও মুক্ত, যেমন দেখেছিলে সন্ন্যাসীর গুরুভ্রাতাকে, বন-মধ্যস্থ সেই সন্ন্যাসীকে। যাঁদের চৈতন্য জাগ্রত হয়েচে, দেহ থেকেও তাঁরা জীবন্মুক্ত। ভগবানকে যারা ভালবাসে মনপ্রাণ দিয়ে, দেহধারণ করেও তাঁরা জীবন্মুক্ত। তাঁরা জানেন এই বিশ্বের সমস্ত গ্রহ, সব তারা, সব বসন্ত, সব জীবলোক আমার। আমি এদের মাধুর্য উপভোগ করবো। তাঁর সৌন্দর্যের স্তবগান রচনা করে যাবো। আমি তাঁর চারণ-কবি। আমি ছাড়া কে গান গাইবে এই বিশ্বদেবের অনন্ত সৌন্দর্য-শিল্পের? তাঁর গান গেয়েই যুগে যুগে অমর অজর হয়ে আমি বেঁচে থাকবো। শত জন্মের মধ্যেও যদি তাঁর সেবা করে যাই আর আসি আমার তাতে ক্ষতি কিসের?

ক্ষেমদাস চুপ করলেন।

পুষ্প বল্লে—এ দেশের সেই কবিকে দেখা যায় না?

—এতক্ষণ সে ছিল এখানেই। সেও ভগবানের চারণ-কবি। এই প্রকৃতির সৌন্দর্যের সে স্তবগীতি রচনা করে। সে এখন ঘুমিয়েচে।

—বিবাহিত?

—এ দেশের নিয়ম বুঝি না। স্ত্রীলোকদের অদ্ভুত স্বাধীনতা এখানে। তারা যার ঘরে যতদিন ইচ্ছা থাকে। আবার যেখানে সত্যকার প্রেম আছে, সেখানে পৃথিবীর স্বামী-স্ত্রীর মত আজীবন বাস করে। আমাদের কবির সঙ্গে তিন-চারটি নারী থাকে—কিন্তু তারা কেউই পৃথিবীর তুলনায় সুন্দরী নয়। এদেশের মেয়েরা সুশ্রী নয়। অবশ্য নারী তিনটির সঙ্গে ওর কি সম্পর্ক জানি না। এদেশে হয়তো তাতে দোষ হয় না। যে দেশের যে নিয়ম।

ওরা কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেলে বনের মধ্যে গাছতলাতে দু-তিনটি লোক নিদ্রিত। ক্ষেমদাস বল্লেন—ওই দ্যাখো কবি শুয়ে। ঐ পাশেই তিনটি নারী।

পুষ্প আশ্চর্য হয়ে বল্লে—গাছতলাতে কেন সবাই?

—এখানে লোকের ঘরবাড়ী নেই পৃথিবীর মত। ওদের দেহ অন্য ভাবে তৈরী। রোগ নেই এখানে, হিংস্র জন্তু বা সর্প নেই। দেহের কোনো ক্ষতি হয় না। অল্প আয়ু বলে

ঘরবাড়ী করে না কেউ।

—তবে মরে কিসে?

—এদের স্বেচ্ছামৃত্যু। জ্ঞানী ও নিস্পৃহ আত্মা কিনা! নির্দিষ্ট সময় অন্তে যেদিন হয় এরা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হবে। মন যেদিন এদের তৈরী হবে সেদিন স্বেচ্ছায় দেহ-ত্যাগ করবে। মৃত্যুতে এরা শোক করে না। এরা জানে মৃত্যু দেহের পরিবর্তন মাত্র।

—পুনর্জন্ম?

—এখানে যারা জন্ম নেয়, তারা অনেক জন্ম ঘুরে এসেচে। পৃথিবীতে বহু জন্ম কেটেচে এদের। শেষ জন্ম এখানে কাটায়। তার পরেই মহর্লোকে চলে যায় একেবারে, আর ফেবে না। কিন্তু তুমি একটা কথা বোধ হয় জানো না—পৃথিবীর চেয়ে নিকৃষ্টতর গ্রহও অনেক আছে। নিম্ন শ্রেণীর আত্মাদের পুনর্জন্ম অনেক সময় ওই সব নিকৃষ্টতর লোকে হয়।

—সে সব স্থান কি রকম?

—একটাতে তোমাকে এখুনি নিয়ে যেতে পারি। চোখেই দেখবে, না কানে শুনবে? তবে একটা কথা। সে সব দেখে কষ্ট পাবে। মেয়েমানুষ তুমি, সে সব গ্রহলোক দেখলে তোমার মনে হবে ভগবান বড় নিষ্ঠুর।

চক্ষের পলকে ওরা একস্থানে এসে পৌঁছলো। সে স্থানটির সর্বত্র ঊষর মরুভূমি ও কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর স্তূপ। কিন্তু সে স্তূপ প্রস্তর নয়—তা কি, পুষ্প জানে না। উলঙ্গ বিকট-দর্শন অর্দ্ধমনুষ্যাকৃতি জীব দু'একজনকে সেই কৃষ্ণবস্তু স্তূপের ওপর বসে থাকতে দেখা গেল। মাঝে মাঝে তারা উঠে মাটির মধ্যে হাত দিয়ে গর্ত খুঁড়ে কি বার করচে ও পরম লোলুপতার সঙ্গে মুখে পুরচে।

ক্ষেমদাস বল্লেন—চলো এখান থেকে। ওরা কীটপতঙ্গ খুঁজে যাচ্চে। ওই ওদের আহার। ওই ওদের আহার সংগ্রহ রীতি। একজনের বস্তুস্তূপে আর একটি জীব যদি আসে, তবে দুই জীবে মারামারি করবে। এ ওকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করবে। এ জগতে স্নেহ, প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা, দয়া, সেবা, ন্যায়বিচার, শিক্ষা, সংগীত কিছু নেই। আছে কেবল দুর্দান্ত আহার-প্রচেষ্টা। জীবে জীবে কলহ।

পুষ্প বল্লে—চলুন এখান থেকে। হাঁপ লাগচে। কি জড় পদার্থে গড়া এ দেশ, প্রাণ যেন কেমন করে উঠলো। এও কি ভগবানের রাজ্য? উঃ—

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—এখনও দেখোনি। চলো আরও দেখাই—এর চেয়েও ভয়ানক স্থান দেখবে। যেখানে পিতামাতা পুত্রকন্যার সম্বন্ধ পর্যন্ত নেই। যেখানে—না সে তোমাকে বলব না।

পুষ্প অধীর ভাবে বল্লে—কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলেন? উঃ—বলেই সে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে। হাত জোড় করে বল্লে—আমার একমাত্র সম্বল ভগবানে ভক্তি, আর আমার কিছু নেই জীবনে। দেব, দয়া করে সেটুকুও আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না—কৃপা করুন—আমি নিতান্ত অভাগিনী!

ক্ষেমদাস হেসে বল্লেন—পাগল! সেই অনন্ত মহাশক্তির এক দিকই কেবল দেখবে? রুদ্রদেবের বাম মুখ দেখলেই ভক্তি চটে যাবে অত ঠুনকো ভক্তি তোমাব অন্তত সাজে না। তুমি আমি তাঁর উদ্দেশ্যের কতটুকু বুঝি? চলো ফিরি। ওই জন্য আনতে চাইনি তোমাকে এখানে। এতেই এই, এর চেয়েও নিকৃষ্ট লোকে নিয়ে গেলে—

—না দেব। আমায় পৃথিবীতে অন্তত নিয়ে চলুন। আমাদের পৃথিবীতে—চলুন গঙ্গাতীরে—

মহাশূন্য বেয়ে সেই মুহূর্তে ওরা এসে পৃথিবীতে একস্থানে বৃক্ষতলে দাঁড়ালো।

বর্ষাকাল পৃথিবীতে, ভীষণ বৃষ্টি হচ্চে। স্থানটা পাহাড়ে ঘেরা, পাহাড় ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েচে বৃষ্টির ধারায়।

ক্ষেমদাস বল্লেন—নিয়ে এলাম গংগাতীরে। ওই অদূরে গংগা—

—এটা কোন্‌ স্থান?

—হরিদ্বার।

পুষ্পের চোখ জুড়িয়ে গেল ধারামুখর অপরাহ্নের বহুপরিচিত, অতি প্রিয় শোভায়। তার মন বলে উঠলো—এই তো আমাদের পৃথিবী, আমাদের স্বর্গ। ভগবান এখানে কত ফুলে ফলে নিজেকে ধরা দেন, কত জ্যোৎস্নার আলোয়, কত অসহায় শিশুর হাসিতে। আজ চিনলাম তোমায় ভাল করে, আমাদের মাটির স্বর্গকে, আর চিনলাম মানুষকে। মানুষই মাটি দিয়ে গড়া দেবতা—দুদিন পরে সত্যিকার দেবতা হয়ে যাবে। জয় নীলারণ্য-কুন্তলা, অতল-সাগর-মেখলা চিরন্তনী সুন্দরী পৃথিবীর। জয় জয় মানুষের। জয় বেণুবেণ-শিহরিতা দিগন্তলীন-প্রান্তর-শোভিতা ভূতধাত্রী মাতার।

ক্ষেমদাস বল্লেন—এবার তোমার মন শান্ত হয়েচে। বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এখন একটা কথা বলি। কি দেখে অস্থির হয়ে উঠলে?

পুষ্প সলজ্জ হেসে চুপ করে রইল। ক্ষেমদাস বল্লেন—না, বলো, বলতেই হবে। ভগবান কি নিষ্ঠুর—এই ভেবেছিলে। না?

—হাঁ!

—তিনি কি নিষ্ঠুর—ওঃ! এই তো?

পুষ্প হাসি-হাসি মুখে নির্বাক।

ক্ষেমদাস বল্লেন—তোমার মত মেয়েরও বিস্মৃতি? তোমারও ভুল? একেই বলে মোহিনী মায়া। মায়ায় কে না ভোলে। ব্রহ্মা বিষ্ণু তলিয়ে যান।

—কেন দেব, বলুন!

—না, তাই দেখচি। নতুবা তোমারও ভুল।

—থাক্‌ আমার ব্যাখ্যা। আমি তৃণের চেয়েও হীন। আপনি কি উপদেশ করচেন তাই করুন না?

ক্ষেমদাস হাসিমুখে বল্লেন—ভগবান কার উপর নিষ্ঠুর হবেন? সবই তো তিনি। নিজেই নিজের লীলায় তন্ময় হয়ে আছেন বিভিন্ন রূপে। তিনিই সব। সে জ্ঞান যেদিন হবে সেদিন ওই নিকৃষ্ট লোকের নিকৃষ্ট জীব দেখেও বলে উঠবে আনন্দে—তেজো যৎ তে কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি—

ক্ষেমদাস চলে গেলেন। যাবার সময় বল্লেন—বৃন্দাবন থেকে ঘুরে আসি। তোমার সংগে আবার শীঘ্রই দেখা করবো—একদিন চলো সেই সন্ন্যাসিনীর কাছে যাবো।

পুষ্প স্থির ভাবে বসে রইল শৈলশিখরে। এখানে তার যতুদা আছে, কত জন্মের প্রিয় সাথী সে। তাকে ফেলে কোথায় কোন্‌ লোকে গিয়ে সুখ পাবে সে? একটি গোয়ালার মেয়ে দুধ দুয়ে নিয়ে আসচে বাজারে। নরনারী প্রদীপ ভাসাচ্চে গঙ্গাবক্ষে। দূর থেকে আলো দেখা যাচ্চে জলের ওপর।

বুড়োশিবতলার পুরানো ঘাটের সামনে গঙ্গাবক্ষে পালতোলা নৌকোর দল চলেচে। গোধূলির আবছায়া আকাশে শুভ্রপক্ষ বকের দল উড়ে চলেচে ওপারে হালিসহরের শ্যামাসুন্দরীর ঘাটের দিকে। প্রাচীন দেউলমন্দিরের চূড়া সান্ধ্য দিগন্তের বননীল-রেখায় এখানে ওখানে যেন মিশে আছে।

পুষ্প ঘাটের রানায় বসে ক্ষেমদাসের সংগে কথা বলছিল।

ক্ষেমদাস বৃন্দাবন থেকে এইমাত্র ফিরেচেন। জ্যোৎস্নারাত্রে যমুনাতীরে কিছুক্ষণ বসে ছিলেন চীরঘাটের কাছে। আরতি দর্শন করবার পরে। মন ভূমানন্দে বিভোর।

পুষ্প বল্লে—কবি, স্ফটিকের কথা কি বলছিলেন?

ক্ষেমদাস গঙ্গার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বল্লেন—ওই দ্যাখো, রাঙা আকাশের ছায়া পড়েচে জলে। জল যদি ঘোলা হোত, আকাশের ছায়া পড়তো না। স্ফটিককে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্মল হতে হবে, তবে আলো তার মধ্যে দিয়ে আসবে।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ আত্মাতে যদি এতটুকু ত্রুটি থাকে কোথাও, তবে ভগবানের আলো তার মনে নামে না। সম্পূর্ণ নির্মল স্ফটিক হওয়া চাই এতটুকু খুঁৎ থাকলে চলবে না।

—ভগবানের দাবি এত বেশি কেন?

—উপায় নেই। ভগবানের আলো যদি মনের দর্পণে ঠিক অখণ্ড ভাবে পেতে কেউ চায়, তার জন্যে এই ব্যবস্থা। লোকে মুখে বলে সাধুতা ও পবিত্রতার কথা। কিন্তু জেনো এ দুটি বস্তু অতি ভীষণ, ভয়ঙ্কর।

পুষ্প বল্লে—বুঝতে পারচি কিছু কিছু। নিজের জীবনে দেখচিনে কি? তবুও বলুন।

—সাধুতা, পবিত্রতা—শুনতে খুব ভালো। কিন্তু এদের আবির্ভাব বিষয়ী লোকের পক্ষে কষ্টকর। কামনাকলুষিত আধারে ভগবানের জ্যোতি অবতরণ করবে কি ভাবে? এ জন্যে আধার-শুদ্ধির প্রয়োজন। যাকে ভগবান কৃপা করেন, শুদ্ধ আধার করে নিতে তার সব কিছু ভোগ কামনার জিনিস ধ্বংস করে তাকে নিঃস্ব, রিক্ত করে দেন। ভগবানের কৃপা সেখানে বজ্রের মত কঠোর, নির্মম, ভয়ংকর। সর্বনাশের মূর্তি ধরে তা আসে জীবনে, ধ্বংসের মূর্তিতে নামে। সে রকম কৃপার বেগ সামলাতে পারে ক'জন?

পুষ্প চুপ করে রইল। এর সত্যতা সে নিজের জীবনে বুঝেচে।

ক্ষেমদাস বল্লেন—দ্যাখো, আমি ভক্তিপথের পথিক, তুমি জানো। সন্ন্যাসী যে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলে, তাঁকে বুঝতে হোলে জ্ঞানের পথ দরকার। জ্ঞান ভিন্ন ব্রহ্মকে উপলব্ধি করা যায় না। আমি সাকারের উপাসক, মধুর ভাবে মধুর মূর্তিতে তাঁকে পেতে চাই—তাই আমি বৃন্দাবনে গিয়ে সেই রস আস্বাদ করি। সন্ন্যাসী বলে, ও অপ্রাকৃত মূর্তির উপাসনা কর কেন? আমি বলি, তোমার নিয়ে তুমি থাকো, আমার নিয়ে আমি থাকি। ও বলে, ব্রহ্ম আবর্তিত হতে হতে জীব হয়েচে, জীব হয়ে স্বরূপ ভুলে গিয়েচে। ব্রহ্ম দেশ-কালের মধ্যে ধরা দিয়ে জীব হয়েচে। কেন হয়েচে? লীলা। আমি বলি, বেশ, এক যখন বহু হয়েচেন লীলার আনন্দকে আস্বাদ করতে, তখন আমিও তাঁর লীলাসহচর তো? আমাকে বাদ দিয়ে তাঁর লীলা চলে না। এই তো প্রেমভক্তি এসে গেল। কেমন?

পুষ্প বল্লে—বনের সেই সন্ন্যাসিনী কিন্ত প্রেমভক্তির কাঙাল। আমি সেবার রঘুনাথদাসের আশ্রমে নিয়ে গিয়েছিলাম, বৃন্দাবনে নিয়ে গিয়েছিলাম—সেই থেকে গোপাল-বিগ্রহের ভক্ত হয়ে উঠেচেন।

—সে যে মেয়েমানুষ। শুষ্ক জ্ঞানপথে সে তৃপ্তি পায় না—লীলারস আস্বাদ করতে চায়। আমি চল্লাম খুকি, তুমি আজ তো বৃন্দাবনে গেলে না, কাল এসে নিয়ে যাবো। সন্ন্যাসী তোমাকেও কি বলেছিল না?

—বলেছিলেন, এখনও অপ্রাকৃত লোক আঁকড়ে আছ কেন? তোমার তো উচ্চ অবস্থা, উচ্চস্তরে চলো।

পৃথিবীর হিসেবে আজ কয়েক বছর হোল পুষ্প এই স্বরচিত বুড়োশিবতলার ঘাটে সম্পূর্ণ একা। করুণাদেবীও ওকে উচ্চতর স্তরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তত

উচ্চস্তরে গমন করলে আর সে পৃথিবীতে যাতায়াত করতে পারবে না বলেই এই গঙ্গার ঘাট আঁকড়ে পড়ে আছে। এই তার পরম তীর্থ—তার মহর্লোক, জন-লোক, তপোলোক, সত্যলোক, ব্রহ্মলোক—লোকাতীত পরমকারণ পরব্রহ্মলোক। কোথাও পোষাবে না তার। কত সহস্র স্মৃতিতে ভরা এই প্রাচীন ভাঙা ঘাটটি।

কেউ নেই আজ এখানে।

যতীনদা চলে গিয়েচে আজ দশটি বছর।...

ঊর্ধ্বে যতদূর দৃষ্টি যায়—আজ এতকাল পরে তার কাছে শূন্য অর্থহীন!

এক এক সময়ে মনে হয় সেই ভ্রাম্যমাণ বহূদক দেবতা যদি আসেন! তাঁর মুখে বহু জগতের, বহু নক্ষত্রলোকের, বহু বিশ্বের গল্প শোনে। নিজে তিনি বেড়িয়ে দেখেচেন, এখনও দেখচেন—শেষ করতে পারেন নি।

সন্ন্যাসী এসে প্রায়ই বলেন—মহর্লোকে তোমার আসন, এখানে কি নিয়ে পড়ে আছ কন্যে? সেই পৃথিবীর গঙ্গা, পৃথিবীর হালিসহর সাগঞ্জ, নৌকো—এসব মায়িক কল্পনা তোমার সাজে না। ছি ছি—

পুষ্প সকৌতুকে বলেছিল—নিয়ে যান না তার চেয়ে উচ্চতর লোকে, যাচ্চি এখনি।

সন্ন্যাসী বলেন—জ্ঞান থাকবে না বেশিক্ষণ। কারণ এসব লোক আত্মিক অবস্থা মাত্র। কোনো স্থান নয়। সে উচ্চতর চৈতন্য জাগ্রত হোলে পৃথিবীতে জড়দেহধারী হলেও তুমি সত্যলোকের অধিবাসী। যেমন দেখেছিলে আমার সেই গুরুভ্রাতাকে। চিদানন্দময় আত্মা সেখানে আপনার অস্তিত্বের আনন্দে বিশ্বের সংগে এক সুরে গাঁথা। মুখে বলা যায় না সে অনুভূতির কথা।

পুষ্প বল্লে—বুঝবার ক্ষমতা নেই আমার দেব। তবে শুনলাম বটে। আপনার দয়া।

—বিধাতৃপুরুষদেরও উচ্চস্তরের দেবতাদের দেখা পাওয়ার জন্যে তপস্যা করতে হয় জানো তো? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সাতজন বিধাতৃপুরুষ আছেন, এঁদের ওপর ঈশ্বর। বিধাতৃপুরুষেরা ইচ্ছা করলেই ভগবানের লোকে যেতে পারেন না—গেলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। এজন্যে তপস্যা দ্বারা শক্তি অর্জন করতে হয়—তবে সেই সাময়িক তপস্যার সাময়িক শক্তি নিয়ে ঈশ্বর সমীপে যেতে পারেন। অথচ বিধাতৃপুরুষেরা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করচেন।

—ভগবান তবে কি করচেন, তিনি কি ঠুঁটো জগন্নাথ?

—তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্চে, কন্যে। একটা তৃণও নড়ে না তাঁর ইচ্ছা না হোলে।

—তিনি দয়ালু? ডাকলে সাড়া দেন?

—এখনও এ সন্দেহ? এইজন্যে আমি বলি, প্রার্থনা ক'রো না তাঁর কাছে কিছু। প্রার্থনা করলেই তিনি মঞ্জুর করেন। তিনি পরম করুণাময়। জীবের দুঃখ দেখে থাকতে পারেন না। হয়তো এমন অসংগত প্রার্থনা করে বসলে, যা মঞ্জুর হোলে তোমার আত্মার অমংগল। এইজন্যে কিছু চাইতে নেই তাঁর কাছে—তিনি আমাদের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রেখে সব কিছু করে যাচেচন বা বিধাতৃপুরুষদের কর্মে সম্মতি দিয়ে যাচ্ছেন। এইজন্যে অনেক সময় ভগবানকে নিষ্ঠুর বলে মনে হয়। জীবের কল্যাণের জন্যে তিনি ব্যবস্থা করচেন, আমাদের তা মনঃপূত হচ্চে না।

—ক্ষেমদাস তাই বলেন।

—কে? আমাদের কবি? ওর কথা বাদ দাও। আজ এত বছরেও ওর ভাবালুতা ওকে ছেলেবেলার ওপরে উঠতে দিলে না! গোপাল আর বৃন্দাবন, আর আরতি, আর চোখের জল—আর চাঁদের আলো...

সন্ন্যাসী সেদিন বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। পুষ্পের হাসি পায় ওঁর সব কথা ভেবে।

মেয়েমানুষের মনের কথা এরা কি করে জানবে? শুধ, বুধ আত্মা ওরা—ব্রহ্মের মত হয়ে গিয়েচে। শত স্নেহ প্রেম প্রীতির বাঁধনে যে মেয়েমানুষের মন বাঁধা। এও সেই বিধাতৃপুরুষদেরই গড়া নিয়ম তো, সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়।

পৃথিবীতে কি সন্ধ্যা হয়ে এসেছে?

পুষ্প একবার নীচের দিকে চেয়ে দেখলে, তারপর পৃথিবীর সন্ধ্যায় দেহ মিলিয়ে নেমে এল কোলা-বলরামপুর গ্রামে। যতীনের মা রান্নাঘরের মধ্যে ভাত চড়িয়ে উনুনের পাশে বসে আলুবেগুন কুটচে। সে আর ঠিক তরুণী নয় এখন, বিগত-যৌবনের চিহ্ন সারা দেহে পরিস্ফুট। নতুন ধান এসেচে সামনের উঠানে, শীতের সন্ধ্যা, পাশের বাড়ীর আমতলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আগুন জেবলে পোয়াচেচ।

যতীনের মা রান্নাঘর থেকে বল্লে—ও অভয়—কোথায় গেলি?

পাশের বাড়ীর আমতলায় যে সব ছেলেমেয়ে আগুন পোয়াচেচ, তাদের ভেতর থেকে একটি আট-ন' বছরের বালক উত্তর দিলে—কেন, কি হয়েচে?

—ঠাণ্ডা লাগাস্ নি বাইরে। ঘরের মধ্যে আয়।

বালকের এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সমবয়সীদের মজলিস ছেড়ে এসে রান্নাঘরে ঢুকতে। সে বল্লে—আমি বাইরে বসে ধান চৌকি দিচ্চি যে—

—না, তোমায় ধানচৌকি দিতে হবে না। চলে আয় ঘরে। এই উনুনের পাড়ে বসে আগুন পোয়া। ছেলের লেগেই আছে সর্দি কাসি—আবার রাত পর্য্যন্ত বাইরে বসে থাকা--

আর একটি ছেলে ওকে বল্লে—যা, কাকিমা বকবে—

অভয় মুখ ভার করে মায়ের কাছে উনুনের পাশে এসে বসলো। ওর মা বল্লে—সেই গরম জামাটা আজ গায়ে দিস্ নি?

—আহা হা—সে তো ছেঁড়া!

--তা হোক, নিয়ে আয়, বড্ড শীত পড়েচে।

—না মা।

অভয়ের মা ছেলের গালে এক চড় কষিয়ে দিয়ে বল্লে—তোমার একগুঁয়েমিগিরি ঘুচিয়ে দেবো আমি একেবারে। দুষ্টু ছেলে—এখুনি বলবেন, মা আমার জবর এয়েচে--- তখন নিয়ে এসো সাবু, নিয়ে এসো ওষুধ—যা নিয়ে আয় জামা, মাঝের ঘরের আনলায় আছে--

পুষ্প খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বল্লে—ও যতুদা, কেমন মজা? এ আমি নয় যে একগুঁয়েমি করে নিস্তার পাবে—

পুষ্প এই সময়টা মাঝে মাঝে এখানে এসে কাটায়। অভয়ের মা ছেলেকে খাওয়ায়, কাছে বসে পড়ায়—প্রথমভাগ, ধারাপাত—পুষ্প বসে বসে দেখে। বেশ লাগে ওর।

স্বপ্নের মত মনে হয় সংসারের জীবনমৃত্যু...সন্ন্যাসীই জ্ঞানী, সব মায়া আর স্বপ্ন।

আশা বৌদিকেও একদিন সে দেখে এসেচে। সে এখন বহু দূর মুরশিদাবাদ জেলায় এক মাঝারি গোছের গেরস্তবাড়ীর ছোট একবছরের খুকি।

সে করুণাদেবীকে বলেছিল সেদিন--এরা মিলবে কি করে দেবী? কি করে জানবে এরা?

দেবী হেসে উত্তর দিয়েছিলেন--ওদের সাধ্য কি? আমরা সে যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবো সময় এলে। দেখতেই পাবি, পুষ্প।

অভয়ের মা ছেলেকে খাইয়ে দাইয়ে পাশের ঘরে ঘুমুতে পাঠায়। পুষ্প এসে সেই সময় খোকার শিয়রে এসে বল্লে--খোকা ঘুমুল পাড়া জুড়ুল, ঘুমোও যতুদা, ঘুমোও—

দুষ্টুমি করলে মায়ের হাতের চড় মনে আছে তো ?

অভয় ঘুমিয়ে পড়লে হয়তো এক একদিন কোনো রূপসী দেবীর স্বপ্ন দেখে, মায়ের মত স্নেহে তার শিয়রে বসে ঘুম পাড়াচ্চে। মায়ের মতই বলে মনে হয় তাকে।

নৈশ আকাশ দিয়ে তারপর পুষ্প উড়ে চলে যায় তার নিজ লোকে। অগণ্য জ্যোতি-র্মণ্ডল অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড মহাব্যোমে সর্বত্র ছড়িয়ে,—অগণ্য জীবকুল, অগণ্য জীবন-মৃত্যুর প্রবাহ।

পুষ্পের মন বলে ওঠে—কোথায় আছ হে কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু, মহাদেবতা, মুখের আবরণ অপসারণ কর—অপাবৃণু, অপাবৃণু, আমরা তোমার স্বরূপ দেখি—ধন্য কর আমাদের জন্মমরণ, দয়ালু দেবতা!

স্বর্গ ও মর্তের সেই মোহনায় পুষ্প এসে দাঁড়ালো।

ওর কিছুদূরে নীল শূন্যে আগুনের লেখা এঁকে বিরাট এক ধূমকেতু অগ্নিপুচ্ছ দুলিয়ে নিজের গোঁ ভরে চলে গেল।—সে মুহূর্তের হিসেব নেই। ওদের পায়ের তলায় কোন্ গ্রহের এক নদীতীর, হয়তো বা পৃথিবীরই—শান্ত অপরাহ্ণ, একদল সাদা বক মেঘের কোলে কোলে উড়চে নলখাগড়া বনের ঊর্ধ্বে আকাশে।

আজ পুষ্প যেন দেখতে পেলে সেই দেবতাকে—নক্ষত্রজ্যোৎস্নায় ভাসানো এই অপূর্ব জীবন-উল্লাসের স্রোতে সে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভেসে চলেচে যে মহাদেবতার ইঙ্গিতে। কোথায় যেন তিনি মহাসুপ্তিমগ্ন, তাঁর অপূর্ব সুন্দর মুখখানি, সুন্দর চোখ দুটি ঘুমে অচেতন। কি সুন্দর দেখাচ্চে সেই স্বপ্নালসনিমীলিত আয়ত চোখ দুটি! পুষ্প বল্লে—উনি উঠবেন কখন ? চরণ বন্দনা করি।

পুষ্পের মনের মধ্যে থেকেই প্রশ্নের উত্তর এল—উনি ওঠেন না। অনন্ত শয্যায় অনন্ত নিদ্রায় মগ্ন উনি। এক এক নিঃশ্বাসে যুগযুগান্ত কেটে যায়। তুমি ওঁর চরণ বন্দনা করবে? ওঁর উপাসনা হয় না। কে করতে পারে ওঁর উপাসনা ? উনি কাউকে দেখেন না, কারো উপাসনা গ্রহণ করেন না। বিশ্বজগৎ ওঁর স্বপ্ন—উনি ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে জগৎস্বপ্ন লয় হয়ে যাবে যে! সৃষ্টি অন্তর্হিত হবে। কিন্তু তা হয় না—সৃষ্টিও অনন্ত, ওঁর সুপ্তিও অনন্ত। উনিই বিশ্বের আদি কারণ—সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ক্ষীরোদশয়নশায়ী মহাদেবতা ব্রহ্মাণ্ডের। তুমি আমি, স্বর্গ নরক, জন্ম মরণ, দেব দেবী, ঈশ্বর, পাপ পুণ্য, দেশ ও কাল—সবই তাঁর স্বপ্ন। সব তিনি। তিনি ছাড়া আর কিছু নেই—কে কার উপাসনা করবে? ওঁর স্বপ্ন ছাড়া আর উনি ছাড়া আর কি আছে?

ভক্তিভরে প্রণাম করলে পুষ্প। উপাসনা হয় না তো হয় না।

ঘন ঘুমে অচেতন সেই দেবদেবের সুন্দর চোখ দুটি, স্বর্গ ও মর্তের দূরতম প্রান্তে, শুকতারার অস্তপথে, ছায়াছবির মত মিলিয়ে গেল।

—শেষ—

# স্মৃতির রেখা

কাল তোমাকে দেখতে পেয়েছি। শেষরাত্রের কাটা-চাঁদের ও শুকতারার পেছনে তুমি ছিলে। এই শেষরাতের আকাশের পেছনে, এই ফুলফোটা নিমগাছের ডালের সঙ্গে, এই সুন্দর শান্ত ঘন নীল আকাশে এক হয়ে কেমন করে তুমি জড়িয়ে আছ। কত প্রাণী, কত গাছ-পালার বংশ তৈরী হ'ল, আবার চলে গেল—ঐ যে পায়রার দল উড়ছে, ঐ যে নারকেল গাছটার মাথা ভোরের বাতাসে কাঁপছে, ঐ যে বন-মুলোর ঝাড় ছাদের আলসেতে জন্মেছে, আমার ছাত্র বিভূতি—দু'হাজার বছর আগে এরা সব কোথায় ছিল? দু'হাজার বছর পরেই বা কোথায় থাকবে? এদের সমস্ত ছোটখাটো সুখদুঃখ আনন্দ-হতাশা নিয়ে ছোট্ট বুদ্বুদের মত অনন্ত গহন গভীর কালসমুদ্রে কোথায় মিলিয়ে যাবে, তার ঠিকানাও মিলবে না—আবার নতুন লোকজন ছেলেপিলে আসবে, আবার নতুন ফুলফলের দল আসবে, আবার নতুন সব সুখদৈন্য হর্ষহতাশা আসবে, কত মিষ্টি জ্যোৎস্না-রাত্রির মাধবী বাতাস আবার বইবে, পুরোনো উজ্জয়িনীর কেশধুপবাস যেমন মদির ছিল, ভবিষ্যৎ কোন বিলাস-উজ্জয়িনীতে নতুন কেশরাশি পুরোনো দিনের চেয়ে কিছু কম মদির হয়ে উঠবে না, কত গ্রাম্য-নদী ভবিষ্যতের অনাগত গ্রাম-বধূদের সুখদুঃখ সম্ভার নিয়ে বয়ে চলবে...আবার তারা যাবে, আবার নতুন দল আসবে।

কিন্তু তুমি ঠিক আছ। হে অনন্ত, যুগে যুগে তুমি কখনো বদলে যাও না। সমস্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, সমস্ত ধ্বংস-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অপরিবর্তিত, অনাহত তুমি যুগ থেকে যুগান্তরে চলেছ। এই দৃশ্যমান পৃথিবী যখন আকাশে জ্বলন্ত বাষ্পপিন্ড ছিল, তারও কত অনন্তকাল পূর্ব থেকে তুমি আছ, এই পৃথিবী যখন আবার কোন দূর অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে, যখন আবার জড় পদার্থের টুকরোতে রূপান্তররিত হয়ে দিকহারা উল্কার গতিতে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে অনন্ত ব্যোমে ছোটাছুটি করবে, তখনও তুমি থাকবে। কালের অতীত, সীমার অতীত, জ্ঞানের অতীত কে তুমি—তোমাকে চেনা যায় না। অথচ মনে হয়, এই যেন বুঝলাম, এই যেন চিনলাম! শেষরাত্রের নদীর জলে যখন চিকচিকে মিষ্টি জ্যোৎস্না পড়ে, শেওলার কূলে তাল দেয়, তখন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, ছোট্ট ছেলে তার কচি মুখ নিয়ে ভুরভুরে কচিগন্ধ সমস্ত গায়ে মেখে যখন নরম হাত-দুটি দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে, যেন মনে হয় সেখানে তুমি আছ, ওরায়ন যখন পৃথিবীর গতিতে সমস্ত রাত্রির পরে দূরে পশ্চিম আকাশে ঝুলে পড়ে, সেই রুদ্র প্রচন্ড অথচ না-ধরা-দেওয়া-গতির বেগে তুমি আছ, জনহীন মাঠের ধারে গ্রাম্য ফুলের দল যখন ঠাসাঠাসি করে দাঁড়িয়ে অকারণে হাসে তখন মনে হয় তাদের যে সরল প্রাণের প্রাচুর্য—তার মধ্যে তুমি আছ।

তাই বলছিলাম যে, কাল শেষরাত্রে তোমাকে হঠাৎ দেখলাম। অন্ধকার প্রহরের শেষ-রাত্রের চাঁদ—তার পার্শ্ববর্তী শুকতারার পেছনে। তোমায় প্রণাম করি—

আজ কলেজের কালভার্ট বেয়ে উঠছিলাম। বেলা পাঁচটা, ঠিক সন্ধ্যেটা হয়ে এসেছে, ছোট ছোট সেই অজানা রাঙা ফুলগাছগুলোর দিকে চেয়ে কেমন হঠাৎ আনন্দ এসে পৌঁছলো—নাথনগরের আমগাছগুলোর ওপর সূর্য অস্ত যাচ্ছে, কেমন রাঙা হয়ে উঠেছে সেদিকের আকাশটা—এই সামান্য জিনিসের আনন্দ, কচিমুখের অকারণ হাসি, রাঙা ফুলগাছটা, নীল আকাশের প্রথম তারা, ঐ যে পাখীটা বাঁকা ডালে বসে আছে, সবসুদ্ধ মিলে এক এক সময় জীবনের কেমন গভীর আনন্দ এক এক মুহূর্তে আসে।

মানুষ এই আনন্দ জানতে না পেরেই অসুখে, হিংসায়, স্বার্থদ্বন্দ্বে সুখ খুঁজতে গিয়ে নিজেকে আরও অসুখী করে তোলে. আজ যে মার্টিন লুথারের জীবনী পড়ছিলাম,

তাতে মনে হোল এক এক সময় এক-একজন ব্রাত্যমন নিয়ে পৃথিবীতে এসে শুধু যে নিজেই স্বাধীন মত ব্যক্ত করে চলে যায় তা নয়, জড়মনকেও বন্ধনমুক্ত করে দেবার সাহায্য করে। যেমন সহস্র বৎসরের পুঞ্জীকৃত অন্ধকার এক মুহূর্তের একটা দেশলাইয়ের কাঠির আলোতেই চলে যায়—তেমনি।

কাউকে ঘৃণা করলে হবে না। এ জগতে যারা হিংসুক, স্বার্থান্ধ, নীচমনা তাদের আমরা যেন ঘৃণা না করি...শুধু উচ্চ জীবনানন্দ তাদের দেখিয়ে দেবার কেউ নেই বলেই তারা ঐ রকম হয়ে আছে। কোন্ মুক্ত পুরুষ অনন্ত অধিকারের বার্তা তাদের উপেক্ষিত বুভুক্ষাশীর্ণ প্রাণে পৌঁছে দেবে?

॥ ২৭শে অক্টোবর, ১৯২৪, কলিকাতা ॥

হঠাৎ পুরোনো দিনগুলো মনে এল। মনে এল কতকগুলি ছায়াভরা বৈকাল, কতকগুলি সুন্দর জ্যোৎস্নাভরা রাত্রির সন্ধ্যা, সবগুলিই কেমন গভীর, অনন্ত, রহস্যময়। সময় তাদের দু' পাশ বেয়ে ছুটে চলে তাদের কোন দূরে নিয়ে ফেলেছে যেমন ভবিষ্যৎও মানুষের মনে বড় গভীর ও অনন্ত বলে মনে হয়, অতীতও অল্পদিনের হলেও তার চেয়েও গভীর বলে মনে হয়, রহস্যময় বলে মনে লাগে, হারিয়ে-যাওয়ার-গভীরতা-মাখানো রহস্য তাদের অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো—অনেকদিন হ'ল প্রাচীন অতীতে মিশে গেলেও তাদের গন্ধ, শব্দ, রূপ এখনও আমার মনের মধ্যেই আছে। মনের যেখানে তাদের আশ্রয়, একদিনে—কিসে বলা যায় না, হঠাৎ সেই তারে ঘা পড়ে যায়, তখন অতীত মুহূর্তগুলি তাদের অতীত গন্ধে রূপে বর্ণে শব্দে, সুখে দুঃখে, হাসি অশ্রুতে, আশায় নিরাশায়, মঙ্গল অমঙ্গলে, সৌন্দর্যে রসে একেবারে প্রত্যক্ষ বাস্তব হয়ে মুহূর্তের জন্যে উদয় হয়। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে, তারপরই আবার চোখের ভ্রমজালের মত পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যায়—

॥ ২৯শে এপ্রিল, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

হঠাৎ যেন মনে হ'ল হাজার বছর আগে যে সব পাখী বনে বনে গান গেয়ে চলে গিয়েছে, আজ এই ছায়াভরা সন্ধ্যায় তারাই যেন আবার কোথা থেকে গেয়ে উঠলো। যে সব ছেলে-মেয়ে হাজার বছর আগে মা-বাপের কোলে মিষ্টি হাসি হেসে কতদিন হ'ল ছেলেবেলায় দেখা স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, আজ সন্ধ্যায় সেই সব অস্পষ্ট দূর অতীতের ছেলেপিলের মিলিয়ে যাওয়া হাসিরাশি—নদীর ধারে বনে বনে মাঠে মাঠে ঝোপে ঝোপে —ফুল হয়ে ফুটে গোধূলির আঁধার আলো করে আছে।

তার ক্ষুদ্র জগতে সন্ধ্যা হয়ে এল। রায়েদের কাঁঠালতলায়, পুকুরধারে, টুনুদের উঠোনে, নেড়াদের বাড়ীর সামনের বড় গাছটার তলায় অন্ধকার হয়ে এল, খেলাঘরের ক্ষুদ্র জগতের চারদিক অন্ধকার হয়ে এল।

জগতের অসংখ্য আনন্দের ভাণ্ডার উন্মুক্ত আছে। গাছপালা, ফুল, পাখী, উদার মাঠ-ঘাট, সময়, নক্ষত্র, সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না রাত্রি, অস্ত সূর্যের আলোয় রাঙা নদীতীর, অন্ধকার নক্ষত্রময়ী উদার শূন্য...এসব জিনিস থেকে এমন সব বিপুল, অব্যক্ত আনন্দ, অনন্তের উদার মহিমা প্রাণে আসতে পারে, সহস্র বৎসর ধরে তুচ্ছ জাগতিক বস্তু নিয়ে মত্ত থাকলেও সে বিরাট, অসীম, শান্ত উল্লাসের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান পৌঁছয় না। জগতের শতকরা নিরানব্বই জন লোক এ আনন্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মৃত্যুদিন পর্যন্ত অনভিজ্ঞই থেকে যায়—শতবর্ষজীবী হলেও পায় না...অনুরূপ শিক্ষা, সাহচর্য, আদর্শ, যে রূপ-আনন্দের পথ দেখিয়ে দেবার জন্য প্রয়োজন হয়, দুর্ভাগ্যক্রমে তা সকলের জোটে না।

সাহিত্যিকদের কাজ হচ্ছে এই আনন্দের বার্তা সাধারণের প্রাণে পেঁাছে দেওয়া। তারা ভগবানের প্রেরণা নিয়ে এই মহতী আনন্দবার্তা, এই অনন্ত জীবনের বাণী শোনাতে জগতে এসেছে, এই কাজ তাদের করতে হবেই—তাদের অস্তিত্বের এই শুধু সার্থকতা...

॥ ৩০শে এপ্রিল, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

আজ বসে বসে অনাগত দূর ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েদের কথা মনে পড়ছে। তাদের কচি কচি মুখ, তাদের হাসি, তাদের পাগলামি, তাদের সরল শিশু চোখের দুষ্টুমির চাউনি, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মনে পড়ছে—ফুলের মত মুখে কচি ফুলের মত হাসি...আমার সেই সব অনাগত শিশু প্রপৌত্র, বৃদ্ধ-প্রপৌত্র ও অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্রদের জন্যে কি রেখে যাব তাই ভাবছি। আগামী হাজার বছরের মধ্যে লাখে লাখে, কোটিতে কোটিতে কত শিশুফুল ফুটে উঠছে নির্মল শুভ্র হাসিভরা সুন্দর সৌম্য মেশামেশি গলাগলি করে—তারা সব একসঙ্গে যেন পরস্পর ঠেলাঠেলি করতে করতে তাদের শিশু-মুখগুলি তুলে, অজস্র খইয়ের মত, ফোটা ঘেঁটুফুলের দলের মত—নীল আকাশে অনাদি অনন্ত কালের রঙের খেলার নীচে—চিরযুগব্যাপী অপরাহ্নের শান্ত ছায়াভরা মাঠে বসন্তের হাসি দেখছে...ওদের দেখতে পাচ্ছি বেশ—আসবে, ওরা আসবে।

অনন্ত মেঘভরা আকাশে এখানে ওখানে দু-একটা তারা দেখা যাচ্ছে। এই সামান্য দুদিনের অতি একঘেয়ে সংকীর্ণ পৃথিবীর জীবন ফুরিয়ে গেলে মনে হয় ওরাই আমাদের ভবিষ্যৎ ঘরদোর হবে। হয়ত ওদের অদৃশ্য সাথী তারাগুলো, বড় বড় বিশ্ব, কত সভ্যতা, কত নূতন প্রাণী, নতুন বিবর্তন ওগুলোর মধ্যে। কত স্নেহ ভালবাসা প্রেম জ্ঞান স্মৃতি প্রীতি, কত নতুনতর জীবনযাত্রা, কত অভিজ্ঞতা, কত বিচিত্রতা ওদের জগতে আছে, কে জানে! এই পার্থিব অস্তিত্বের ওপারে সেই সব নতুনতর জীবন হয়ত আমাদের জন্যে অদৃশ্যভাবে অপেক্ষা করছে—এই পরিদৃশ্যমান নক্ষত্রজগতের থেকেও কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে। ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ দূরতম প্রান্তের মোহানায় হয়ত আরও কত লক্ষ বিশ্ব আছে। তাদের প্রত্যেকটিতে হয়ত কত নতুন সূর্য, নতুন গ্রহ, নতুন নক্ষত্রমণ্ডল আছে। কত নতুন প্রাণী, কত বিচিত্র জীবনযাত্রার ইতিহাস, কত কল্পনার সম্পূর্ণ অতীত ভাবের লীলা, সে সব দূর বিশ্বের চিরদিনের সম্পত্তি—কে জানে?

॥ ২২শে জুন, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

এখন থেকে বিশ কি ত্রিশ হাজার বছর পরের কথা। এই প্রকাণ্ড কলকাতা শহরের ওপরে কয়েক শত ফিট পলি জমে গিয়েছে, মনুমেণ্টের চূড়োটারও অনেক উপর পর্যন্ত মাটি জমে গিয়েছে, তার উপর দিয়ে এক বিরাট বিশাল মহাসমুদ্র প্রবাহিত হচ্ছে, কত মাছ কত প্রবাল কত ভীষণদর্শন সব সামুদ্রিকপ্রাণী তার কুক্ষির মধ্যে...

অনাগত সেই সুদূর ভবিষ্যতের দুটি মানুষ একটা জাহাজে চড়ে সমুদ্র-যাত্রা করছে, একটি বালক, বয়স দশ এগার বৎসর। অপরটি তার এক আত্মীয়, প্রৌঢ়। নিজের দেশ ছেড়ে তারা বিদেশে চলেছে জীবিকার্জনের আশায়। প্রৌঢ় তার আবাল্য সহচরদের ছেড়ে চলেছে, মনে কত কষ্ট হচ্ছে। বহু পুরাতন পিতৃপিতামহের পুণ্যপাদপূত জন্মভিটা ছেড়ে যাচ্ছে। কাজেই চিরপরিচিত স্থান আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে যাবার দুঃখে সে চুপচাপ উদাসভাবে জাহাজের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে দূরে ক্রম-বিলীয়মান শ্যাম তটভূমির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ছোট্ট ছেলেটি সবে বছর দশেক হল পৃথিবীতে এসেছে। তার মধ্যে বছর পাঁচেক তো তার জ্ঞানই হয়নি। অতএব সবে বছর পাঁচেক হল তার দেখবার শুনবার চোখকান ফুটেছে মাত্র—সে চঞ্চলভাবে

এদিকে ওদিকে চাইছে—আঙুল দিয়ে উৎসাহপূর্ণ স্বরে এটা ওটা দেখিয়ে বলছে—"ঐ দ্যাখো কাকাবাবু, কেমন পাহাড়টা, ঐ দ্যাখো, ওটা?—পাহাড়ের ওপর বন? বাঃ বেশ তো? ঐ দ্যাখো কাকাবাবু কেমন একটা পাখী"—প্রৌঢ় বসে বসে ভাবছে অমুকের কাছে যে দেনাটা ছিল সেটা আদায় করে আসবার কোনো ব্যবস্থা হয়নি। বড় ভুল হয়ে গেছে তো! অমুকের জমিটার দর আর একটু বেশী দিলে হয়ত দিয়ে দিত—জমিজমা এই সময় না কিনলে-কাটলে ভবিষ্যতে কি করে ছেলেপিলেদের চলবে? তার প্রপিতামহ কোন্ প্রাচীনকালে যে জমিজমা করে রেখে গেছেন তাতেই এখনও চলছে—সে সব কি আজকের কথা! তখন সত্যযুগ ছিল, অমুকের দর শুনেছি অমুক ছিল। আর এখন! বাপরে, আগুন, ছোঁয়াও যায় না (দীর্ঘনিঃশ্বাস)...ছেলেটা এই সময় জিজ্ঞাসা করলে—কাকাবাবু, আমরা যে অমুক শহরে যাচ্ছি সেটা কি খুব বড় জায়গা?

—ওঃ, কত বড় জায়গা তা দেখিস—পাড়াগাঁয়ের মধ্যে ও-রকম জায়গা কোথায়?

—কাকাবাবু, শহরটা কি খুব পুরানো?

কাকাবাবু (মুরুব্বিয়ানার হাস্যে)—হিঃ হিঃ, বলে কিনা খুব পুরানো! ওরে পাগল, আমার প্রপিতামহ অমুক জায়গার দেওয়ান ছিলেন, তখনও ঐ শহর এত বড়ই ছিল... তবে তার চেয়ে এখন অবিশ্যি আরও ঢের উন্নতি হয়েছে। ও-শহর আরও পুরানো—কত পুরোনো তা বলা যায় না, মোটের ওপর অনেক কালের প্রাচীন জায়গা...

তাদের সমস্ত কথাবার্তার সময় অনাগত ভবিষ্যতের এই দুটি নতুন মানুষ জানতো না তাদের জাহাজ যে সমুদ্র বেয়ে যাচ্ছে তার নীচে, অনেক অনেক নীচে, বালি কাদা খোলা পাথর, উদ্ভিজ্জ-পচা এ'টেল মাটির স্তরের নীচে, ভিন্ন যুগের এক বিশাল নগর, তার মেমোরিয়াল মনুমেণ্ট প্রাসাদ অট্টালিকা চত্বর বিদ্যালয় গৃহস্থবাটী বাগান আশা-ভরসা সুখ-দুঃখ নিয়ে সবসুদ্ধ একেবারে পুঁতে গিয়ে চাপা পড়ে রয়েছে। হয়ত সেই দশবছরের ছেলেটি তার কোনো দূর জন্মান্তরে সেই শহরের অধিবাসী ছিল, কোনো বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল, কত সাথী, কত বন্ধু, কত তরুণী—কত প্রেম, কত স্নেহ...সে কি জানে সে পৃথিবীতে নতুন আসেনি? তিনশত ফিট নীচে মহাসমুদ্রের তলের কয়েক ফিট নীচে, বালি কাদা উদ্ভিজ্জ-পচা-মাটি-স্তূপের নীচে সুদূর, বহুপ্রাচীন, বিস্মৃত অন্ধকার অতীতের এক বিলুপ্ত জগতে তার একবারের জীবন কেটেছে—এমনি সুখ আশা, সুখ দুঃখেই কেটেছে, যা তার কাছে আজ নতুন লাগছে। তার সেই প্রাচীন, সুদূর অস্তিত্বের মধ্যে আর বর্তমান নতুন জীবনকোরকের কাঁচ দলগুলির এক বিরাট মহাসমুদ্র, কয়েকশত ফিট পচা কাদার স্তর, আর সহস্র সহস্র বৎসরের এক বিরাট যবনিকা পড়ে রয়েছে।

সামনের সাদা ঐ মেঘ-ভরা আকাশ, প্রভাতের নবোদিত সোনার সূর্যকিরণ, নীল পাহাড়ের উপরকারের প্রভাতকিরণসমুজ্জ্বল বনশোভা শরতের শান্ত রৌদ্রলীলা যে এক অদ্ভুত আশ্চর্য জগতের আভাস দিচ্ছে, এই সব পরিচিত, প্রাচীন, সনাতন এবং অতি-একঘেয়ে বলে মনে হওয়া জগতের পিছনে যে কি বিরাট পরিবর্তনের গতির উদ্দাম নৃত্যের ভাঙাগড়ার খামখেয়ালী লীলা চলেছে, কি অবাধ মুক্ত লীলাচঞ্চল দৃঢ় জীবন-স্রোত বয়ে চলেছে, দুদিনের জীবনে যাকে একঘেয়ে চির-পুরাতন বলে মনে হচ্ছে, সে যে কি বিরাট চঞ্চল, কি গতিশীল, কি প্রচণ্ড, কি রোমান্স যে তার পিছনে, সে কথা ওই নব-আগন্তুক অপরিপক্কবুদ্ধি শিশু কি বোঝে?

সে শুধু চেয়ে আছে। তার মুগ্ধ, আনন্দদীপ্ত শিশুনয়ন দুটি তুলে সমুদ্রের মধ্যের ছোট পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে, যার চূড়ায় কোন্ এক ধনীর মস্ত একটা সাদারঙের প্রাসাদ, আর নীচে জেলেরা চড়ায় ছোট নৌকা নিয়ে মাছ ধরছে।

"পূরা যত্র স্রোতঃপুলিনমধুনা তত্র সরিতম্"

প্রাচীন যুগের অধুনালুপ্ত যে মহাসমুদ্র প্রাচীন পৃথিবীর পৃষ্ঠে হাজার হাজার লুপ্ত জন্তু বুকে করে প্রবাহিত হ'ত, সেই প্রাচীন মহাসমুদ্রের তীরে যেন এরা চুপ করে বসে থাকত। তাদের মাথার উপরকারের নীল আকাশে অহরহ পরিবর্তনশীল মেঘ-স্তূপের মত চঞ্চল এই বিশ্ব তার প্রাচীন আদিমযুগের লতাপাতা, জীবজন্তুসহ তাদের চারধারে এমনি করেই মায়াপুরী রচনা করে রইত। এমনি প্রভাতের সূর্যের আলো প্রাচীন যুগের সাগরবেলায় পড়তো। আর প্রভাতসূর্যের আলো এমনিই শীকরসিক্ত প্রাচীন ধরনের ঝিনুক শাঁখা কড়ি পলার ওপরে রামধনুর রং ফলাতো। সবসুদ্ধ নিয়ে প্রাচীন মহাসমুদ্রের বেলাভূমি আজকার অন্ধকার খনি-গর্ভে চুনাপাথরে রূপান্তরিত হয়ে আছে। মহাকালের গহন-গভীর রহস্যে নৃত্য-ক্ষুব্ধ চরণ-চিহ্নের মত।

॥ ২৯শে জুলাই, ১৯২৫, কলকাতা ॥

অন্ধকার সন্ধ্যা। বর্ষার মেঘে আকাশ ছাওয়া। জলার ধারে বনে বড় বড় তালগাছগুলো অল্প-অল্প-বার-হওয়া তুঁতে রঙের আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে আছে। বর্ষার জলে সতেজ ঘন সবুজ ঝোপ-ঝাপ, গাছপালায় বর্ষণক্ষান্ত ভাদ্র-সন্ধ্যার মেঘান্ধকার ঘনিয়ে আসছে—এখানে ওখানে জোনাকির দল জ্বলছে, জলের ধারে কচুবনে ব্যাঙ ডাকছে, আকাশে এক ফালি চাঁদ উঠেছে, চারিদিক নীরব, কোনো দিকে কোনো শব্দ নেই।

দেখে বসে বসে মনে হ'ল যেন সৃষ্টির আদিম যুগের এক জলার ধারে বসে আছি। যে জলার ধারের বনগাছ এখন প্রস্তরীভূত হয়ে পাথুরে কয়লায় রূপান্তরিত হয়েছে —সে পঞ্চাশ ষাট লক্ষ বা কোটি বৎসর আগেকার এক প্রাচীন আদিম পৃথিবীর জলার ধারে চারধারের গাছপালাগুলো আদিম ধরনের সাদাসিধা গাছপালা...Stigmaria, Sigiioria Lepidodenpren Longifolium. ইত্যাদি। পৃথিবী জনহীন, মনুষ্য-বাসের বহু বহু পূর্বের পৃথিবী এ। আদিম গহন গভীর অন্ধকার অরণ্যে শুধু আদিম যুগের অতিকায় অধুনালুপ্ত Saurian-রা ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখী নেই, ফুল নেই, মানুষ নেই. সৃষ্টির কোনো সৌন্দর্য নেই আকাশে, অথচ প্রতিদিন সুন্দর সোনার সূর্যাস্ত হচ্ছে। প্রতি রাত্রে রূপোলী চাঁদের আলোর ঢেউ আদিম অরণ্য আর জলার বুকে বেয়ে যাচ্ছে। দেখবার কেউ নেই, বুঝবার কেউ নেই। কতদিন পরে মানুষ আসবে, পৃথিবী যেন সেজন্যে উন্মুখী হয়ে আছে—সে আসবে তবে তার শিল্পকলা-সঙ্গীত কবিতা চিত্রে ধ্যানে উপাসনায় চিন্তায় প্রেমে আশায় স্নেহে মায়ায় পৃথিবীর জন্য সার্থক হবে। অনাগত সে আদুরে ছেলেটির জন্মে পৃথিবীমায়ের বুকটি তৃষিত হয়ে আছে।

কিন্তু ছেলেটি যখন এলো, তখনই কি দেখলে, না সকলে দেখে? ঐ যে অন্ধকার বনের উপরের মেঘান্ধকার স্তব্ধ আকাশে, ছিন্নভিন্ন মেঘের ফাঁক দিয়ে তৃতীয়ার চাঁদ-টুকু দেখা যাচ্ছে, কে ওর মর্ম বোঝে? তাই মনে হয় ভগবান যেন মাঝে মাঝে দুঃখ করেন। তাঁর এই বিপুল রহস্যেভরা সৃষ্টির সৌন্দর্য ভাল করে বুঝলে বা বুঝতে চেষ্টা করলে এমন লোক খুব কম। তিনি যে যুগ যুগ ধরে তপস্যার পর শান্ত মৃত্যুঞ্জয়, অমৃতবস মন্থন করে তুললেন—এই বিরাট, বিদ্রোহী, জড়-সমুদ্র মন্থন করে...তাঁর অনন্ত যুগের তপস্যার ফল এই অমৃত কেউ পান করলে না, কেউ আগ্রহ দেখালে না পান করবার। কোন্ যে তার বরপুত্রেরা মাঝে মাঝে পৃথিবীতে পথ ভুলে এসে পড়ে, তারা এ জগতের তুচ্ছ জিনিসে ভোলে না, তাদের মন পৃথিবীর সুখ দুঃখ ভোগলালসার অনেক ঊর্ধ্বে, ঐ অমৃতলোকে, ঐ cosmic সৌন্দর্যে ডুবে আছে, অনেক বড় vision তারা দ্যাখে, সকলের জন্যে বিজ্ঞানে ও জ্ঞানে, গানে কবিতায়, ছবিতে কথায় লিখেও রেখে যায়, কিন্তু

তাদের কথা শোনে বোঝে খুব কম লোকেই—তার চেয়ে সুদের হিসেব কষলে ঢের বেশী আনন্দ এরা পায়।

॥ ২১শে আগস্ট, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

সব ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলি পৃথিবীতে নেমে আসছে, নীল অকূল থেকে পৃথিবীর মাটির তীরে। মুখে তাদের প্রাণ-কাড়া দুষ্টুমির হাসি, চোখে দেবদূতের সরলতা। কোঁকড়া চুলে ঘেরা টুকটুকে মুখগুলি—সকলেরই হাতে তাদের ছোট্ট ছোট্ট সব মশাল।

চন্দন কাঠের তৈরী চন্দন কাঠের গুঁড়ো দিয়ে বাঁধা মশালগুলি, জ্বললে গন্ধে দিক আমোদ করে।

ওদের দিকে কেউ চাইছে না। বাঁশবনের অন্ধকার ছায়ায় সারাদিন ওদের কাটল, রাত আসছে, কিন্তু ওদের মশালগুলো কে জ্বালাবে?

অনেক লোকে জ্বালাতে এল, কেউ জ্বেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল, নিবে যে গেল তা পিছন ফিরে চেয়েও দেখলে না। কেউ বহুবার চেষ্টা করেও জ্বালাতে পারলে না, কেউ চেষ্টা করলে না জ্বালবার। কেউ চোখ নীচু করে চেয়েও দেখল না যে শিশুদের হাতে মশাল আছে।

অথচ সব সময় শিশুরা অনন্ত নির্ভরপূর্ণ মিনতির চোখে চেয়ে রয়েছে সকলেরই দিকে, কে তাদের মশাল জ্বেলে দেবে? কে সে নিপুণ অথচ প্রেমিক মশালচী?

কত শিশু বুঝতে না পেরে আশাভঙ্গ হয়ে নিজেদের হাতের মশাল ফেলে দিলে, হয়ত যা জ্বলতে পারত অতি সুন্দর, যুগ যুগ ধরে বিশ্বের দিগ্‌দিগন্ত যে সৌরভে আকুল হয়ে উঠত, তা অনাদৃত হয়ে পড়ল কাদায়। অবোধ শিশুদের বলে দেবার, দেখিয়ে দেবার, মশাল তুলে জ্বেলে দেবার তো কেউ নেই।

গহন অরণ্যের অন্ধকার বীথি বেয়ে কে একজন আসছে। বাঁশবনের ছায়া স্নিগ্ধ হয়েছে কার সুন্দর মুখের হাসিতে? তার হাতে মস্ত মশাল, শুভ্র আলোয় সমস্ত অন্ধকার আলো হয়ে গেল এক মুহূর্তে।

গহনান্ধকার বেণুবীথির অজানা ওপার থেকে সে এসেছে, চিররাত্রির অন্ধকার দূর করতে। ভগবানের বিশ্বের সে এক মশালচী।

আয়রে, আয় আয়, আয়।

হাসি মুখে কোঁকড়ানো চুল দুলিয়ে, আলোর জ্যোতিতে আকৃষ্ট হয়ে শিশুপতঙ্গের দল সব ছুটে এল ওদের ছোট্ট ছোট্ট চন্দন-মশলায় বাঁধা মশাল হাতে নিয়ে। চারধার ঘিরে কাড়াকাড়ি, সবাই আগে চায়।

কত ধৈর্যের সঙ্গে নতুন মশালচী আলো জ্বালতে লাগল, যাদের নিবে যাচ্ছিল তাদের বার বার ফুঁ দিয়ে—কত অসীম ধৈর্যের সঙ্গে। সকলেরই জ্বলল।

ছোট্ট ছোট্ট জ্বলন্ত মশাল হাতে শিশুরা নাচতে নাচতে আনন্দভরা হাসিমুখে অন্ধকার কুঞ্জপথের এদিকে ওদিকে বেরিয়ে কোথায় সব চলে গেল। আর কোথাও কেউ নেই। অপর কোন অরণ্যানীর গহন নীরব পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূর করতে, অপর কোন অনাগত বংশধরদের হাতের মশাল অমনি করে জ্বেলে দিতে। নিত্যকালের ওরা হ'ল যে মশালচী।

॥ ২৮শে আগস্ট, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

পনের বৎসর আগের এক সন্ধ্যা হঠাৎ বড় স্পষ্ট হয়ে মনে পড়লো। বাড়ীর পিছনের বড় কাঁঠালগাছটায় রাঙা শেষ সূর্যাস্তের রোদটুকু লেগে আছে, গাছে পাতায়, বাঁশবনে, কাঁঠালগাছের তলায়। পথের ধারের শেওড়াবনে অন্ধকার নেমে আসছে, ঝিঁঝিঁ পোকা

ডাকছে, পাঁচিলের পুরানো কোন্ কোণে, মাটির ঘরের দাওয়ায়, খড়ের চালের নীচে। সন্ধ্যায় শাখ বেজে উঠলো, চারধারে কাক, ছাতারে, ঘুঘু নালকণ্ঠ শালিখ পাখীরা ছায়াভরা আকাশ বেয়ে বাসায় ফিরচে—তখনকার সেই দিনটির আশা আনন্দ আকাঙ্ক্ষা আকুল আগ্রহ—

আজকের এই সন্ধ্যায় আকাশটির রং যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে বদলাচ্ছে, কোথাও ওই তুঁতের রং এখনই কালো হয়ে উঠছে, কোথাও রোদের সোনার রং ধূসর হয়ে গেল। মেঘের পাহাড় সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে, সমুদ্র দেখতে দেখতে পাহাড় হয়ে উঠল। রক্তের পুকুর চোখের সামনে নীল মাঠ হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীটাও ঐ রকম মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তনশীল—সূর্যাস্তের এই আকাশে যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে বহুরূপীর মত রং বদলাচ্ছে ঠিক ঐ রকমই আকাশ যেন একটা মস্ত দর্পণ—পৃথিবীর এই অহরহ পরিবর্তনশীল রূপ ওতে যেন সব সময় ধরা পড়ছে। তাই সেটাও একটা বিরাট ছায়াবাজীর মত দেখা যায়।

তরল আনন্দ অধ্যাত্ম জীবনের পরিপন্থী। Sadness জীবনের একটা অমূল্য উপকরণ—Sadness ভিন্ন জীবনে profundity আসে না—যেমন গাঢ় অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারা সংখ্যায় ও উজ্জ্বলতায় অনেক বেশী হয়, তেমনই বিষাদবিদ্ধ প্রাণের গহন গভীর গোপন আকাশে সত্যের নক্ষত্রগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ও জ্যোতিষ্মান হয়ে প্রকাশ পায়—তরল জীবনানন্দের পূর্ণ জ্যোৎস্নায় হয়ত তারা চিরকালই অপ্রকাশ থেকে যেত।

সেই হিসাবে এই emotional sadness জীবনের একটা খুব বড় সম্পদ।

॥ ২৮শে আগস্ট, ১৯২৫ ॥

এই প্রশ্ন একদিন নিউটনের, কেপ্‌লারের, গ্যালিলিওর মনে উদয় হয়েছিল। সকলেরই মনে এ প্রশ্ন উদয় হওয়া উচিত। জগতে দুদিনের জন্যে আসা—এই জগতের ফলে, জলে, স্নেহে, দয়ায় মানুষ হয়ে এটা কি উচিত নয় যে জগতের জন্যে কিছু ক'রে যাবো? আমার ছাত্রটি যেমন কচি, সুন্দর, ঐ রকম অবোধ শত শত অনাগত শিশুমনের জন্যে উত্তরকালে আমার কি দেবার থাকবে? আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, শত শত কি সহস্র বৎসর পরেও এমন কেউ কেউ ওদের মধ্যে থাকবে যে হয়তো শান্ত পর্বতের ছায়ায়, নির্জন সন্ধ্যায় শান্তিপূর্ণ কোনো গ্রাম্য নদীতীরে, অথবা অন্ধকার গহন-রাত্রে শিশিরভেজা ঘাসের উপর, তারার আলোয় শুয়ে ওরা এইগুলি পড়বে আর মনে আনন্দ, বল, উৎসাহ আলো পাবে—এই তো জনসেবা, পৃথিবীতে এসে এই করেই তো সার্থকতা—একশত বৎসর পরে আমার নাম দশ বৎসর আগেকার পাতা মাকড়সার জালের মত কোথায় কাল-সাগরে মিলিয়ে যাবে—তবে কি রেখে যাবো আমার দুঃখের মত দুঃখী ঐ সব অনাগত কচি কচি শিশু মনগুলির খোরাকের জন্যে? কি রেখে যাবো? কি সম্পত্তি, কি heritage তাদের জন্যে দেবো?

শান্ত, আঁধার অপরাহ্নে বাড়ীর পিছনের বন যখন সন্ধ্যার অন্ধকারে ঢেকে আসে, পুরোনো নোনাধরা দেওয়ালের কোণে যখন বাদুড়ের দল হুটপাট করতে শুরু করে, নদীর ওপারে শিমুলগাছের মাথা থেকে শেষ বৈকালের ম্লান রোদের ছায়াও যখন মিলিয়ে যায়, তখন বহু দূর ভবিষ্যতের রাশি রাশি ফুলের মত মুখ, শিরীষের পাপড়ির মত নরম এই সব অনাগত বংশধরগণের কথা মনে পড়ে। এই সন্ধ্যার মত অন্ধকারও ওদের মধ্যে কত ছেলের জীবনে আসবে। সন্ধ্যায় এখন আকাশে যেমন জ্বলজ্বলে শুকতারা সন্ধ্যা হবার সঙ্গে সঙ্গেই আসে আবার সূর্যের প্রথম আলোর আগেই মিলিয়ে যায়, ওদের জীবনেও অমনি দুঃখরাত্রের সত্যের উজ্জ্বল শুকতারা যদি না ফোটে তো কে তাদের আশা দেবে? তাই কিছু করে যেতে হবে—জীবনটা ছেলেখেলার জিনিস নয়।

এটা একটা serious জিনিস। যারা হেসে খেলে তুচ্ছ আমোদ-প্রমোদে স্ফূর্তি করে কাটালে তাদের কথা ধরি না, কিন্তু যারা জীবনটাকে serious ভাবে নিতে যায়, নিঃস্বার্থ ভাবে নিজের সুখ না দেখে, তাদের উচিত এই উত্তরকালের শিশু, বৃদ্ধপৌত্র, অতিবৃদ্ধ-প্রপৌত্রগণের জন্য কিছু সঞ্চয় করে যাওয়া।

এতে আপন পর কিছু নেই, কি তুমি দেবে এদের? এদের জন্যে কি রাখছো তুমি? জীবনের mission কি তুমি অবহেলা করবে? উপেক্ষা করে ভগবানের পবিত্র মহৎ দানকে পায়ে দলে যাবে?

কোনো কার্য 'কর' বললেই করা হয় না, এ জিনিস সহজ নয়। অনেকদিন ধরে ভাবতে হয়, বাইরের কোনো জিনিস থেকে বাধা-বিঘ্ন না আসে। চিন্তা; শুধু গভীর চিন্তা। অনবরত বাধাহীন চিন্তাতে শান্তমনে গভীর সত্যের উদয় হতে পারে, interrupted হলে সারাজীবনেও তার নাগাল পাওয়া যাবে না, যা কিনা হয়ত এক বৎসরের নির্জনবাসেই আসতে পারত...

'By keeping it constantly before one's mind By always thinking and thinking upon it, much is done under these conditions ··much might be sacrificed to obtain these conditions."

জনসেবার জন্যে sacrifice করবার যদি প্রয়োজন হয়, তবে এও এক জনসেবা, এর জন্যেও বিরাট স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন আছে। এ সাময়িক হুজুগের জনসেবা নয়। ধীর, শান্ত সমাহিত ভাবে উত্তরকালীন অনাগত জনগণের সেবা।

॥ ৯ই অক্টোবর, ১৯২৫ ॥

মানুষের সামান্য সুখদুঃখ, আমবন কাঁঠালবাগানের পাতার আড়াল বেয়ে দিব্যি চলছে। Annytaর মত কত মেয়ে কত দুঃখী...সন্ধ্যার আকাশে কত শত গ্রহ-নক্ষত্র—কত জগতের ছড়াছড়ি—বিরাট নাক্ষত্রিক শূন্য—ঠান্ডা জনহীন—পৃথিবীর ফুলফল লতাপাতা সামান্য সুখদুঃখ—গ্রহ-নক্ষত্র লাটিমের মত ক্রীড়া-কন্দুকের মত আকাশে ঘুরছে। এই আনন্দলীলায় সব প্রাণীই যোগ দিচ্ছে। সুখদুঃখ জন্মমৃত্যু সবই খেলা, দুদিনের। কিছুতেই ব্যথিত হবার কিছুই কারণ নেই। নদী বেয়ে যে শব ভেসে যাচ্ছে কে জানে হয়ত দূর কোন অজানা নক্ষত্রে ওর মৃত্যু নবজীবন লাভ করেছে। ওর মৃত্যুযন্ত্রণা সার্থক হয়েছে। এই বিচিত্র বিশ্বলীলার সকলেই যে যাত্রী। ফুল, ফল, গাছ, পাখী, মানুষ সকলেই।

কিন্তু ক'জন জগতের বাইরের এই বিরাট শূন্যের দিকে চেয়ে পৃথিবীর জীবনের সুখদুঃখের ঊর্দ্ধের কথা ভাবে? Crowd mind-এর বাইরে সকলেই নয়—সকলেই গড্ডলিকা। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে নিশ্চিন্ত আছে। জগতের বড় বড় মনীষাসম্পন্ন চিন্তাবীর কয়জন? উপনিষদের ঋষি পথে-ঘাটে সুলভদর্শন নন। সকলেই শঙ্কর নন, প্লেটো নন, নিউটন ফ্যারাডে গ্যালিলিও কোপারনিকাশ গাউস ইনস্টিন নন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ধূলিরাশির আবরণ ভেদ করে ক'জনের চোখ বাইরের অনন্ত ঊর্দ্ধ আকাশের ঘূর্ণ্যমান.. সদাচঞ্চল বিরাট বিশ্বজগতের দিকে যাবে?

দুই এক জনের—তারা জনপ্রবাহের কেউ নয় তার অনেক ঊর্দ্ধে।

॥ ১৭ই নভেম্বর, ১৯২৫ ॥

সন্ধ্যার সময় টেবিলে আলো জ্বলছে। লেখার পাতাগুলো ছড়ানো আছে। ফুলদানিটাতে chrysanthemum, কলাফুল। এই সন্ধ্যা, এই লেখবার টেবিল অত্যন্ত

রহস্যময়, অর্থযুক্ত—হয়ত একাশ বৎসর পরে আমার কোনও চিহ্নও পৃথিবীতে খুঁজে মিলবে না, কিন্তু আমার এই লেখা* হয়ত থেকে যাবে। হয়ত লোকের মনে আশা সান্ত্বনা দেবে। হয়ত পাঁচশত বছর পরে—যদি আমার লেখা বেঁচে থাকে তবে- -আমি—এই আমি—এই অত্যন্ত জীবন্ত প্রত্যক্ষ আমি, অনেক প্রাচীনকালের এক লেখক হয়ে যাবো। আমার বই-পত্তর বড় বিশেষ কেউ ছোঁবে না। তখনকার দিনের নতুন নতুন উদীয়মান লেখকদের বই সব খুব চলবে। অনাগত ভবিষ্যতের সে-সব বংশধরগণের জন্যে আমি আলো জেবলে তেল খরচ করে, আমার যথাসাধ্য বুদ্ধির অর্ঘ্য, যতই সামান্য হোক, যতই অকিঞ্চিৎকর হোক তবুও দেবো, দিতেই হবে। মনের মধ্যে সে প্রেরণা যেন অনুভব করছি। তারপরে তা বাঁচুক আর না বাঁচুক। আমি আর দেখতে আসবো না। আমার ফুলদানীর এই অত্যন্ত বড় বড় ও সুন্দর chrysanthemum ফুলটা আর বছর এ সময় কোথায় থাকবে? আশি বছর পরে আমি কোথায় থাকবো?

এই তো যুগ-যুগের শিক্ষকতা। যুগ-যুগের জনসেবা সে। এক জন্মের suffering সেখানে সার্থক। উত্তরকালের শত শত অনাগত তরুণমনে যখনই দুঃখ আসবে, তাদের কাঁচ প্রাণে আশা, বল, আনন্দ দেওয়া, জীবনের পথ দেখিয়ে দেওয়া—এক জন্মের জন্য জীবন নয়, দু'দশ বৎসরের সাময়িক উত্তেজনা নয়, যুগ-যুগের জনসেবা। সে দিকে মনে রেখে কাজ করতে হবে। সাময়িক হাততালির দিকে নয়। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় চৈতন্য-চরিতামৃতে কি করেছেন? বুদ্ধদেব কি করেছেন? স্বয়ং চৈতন্য কি করেছেন? তাঁদের এক জন্মের Suffering—ব্যাকুলতা, ধ্যান সব ধন্য হয়েছে—কারণ যুগে যুগে তাঁদের কাহিনী পড়ে লক্ষ লক্ষ কুয়াশাচ্ছন্ন মন আলোর সন্ধান পাচ্ছে। suffering, এদিক থেকে মস্ত জিনিস, কেউ যেন সে কথা না ভোলে। জীবনে যদি বড় দুঃখ পাও, সে দুঃখ লিখে রেখে যেও উত্তরকালের জন্য। Sincere দুঃখের কাহিনী চিরদিন অমর থাকবে, তা চিরদিন লোকের মনে বল দেবে। পূর্ণ-অন্ধকার অমাবস্যার পরই শুক্ল-পক্ষের চাঁদ ওঠে--দুঃখের রাত্রিতেই তারা খুব উজ্জ্বল হয়।

॥ ২০শে নভেম্বর, ১৯২৫ ॥

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। এইমাত্র দিয়ারা থেকে আসছি। আজ ইসলামপুর থেকে ভাগলপুর আসবার সময়ে শুয়রমারীর খেয়া-ঘাটে এপারে যে নৌকা লেগেছিল, যাতে ছেঁড়া-খোঁড়া হলদে রং-এর বই খুলে মাঝিরা পড়ছিল—জনসেবকদের কথা মনে এলে যেন এর কথা মনে আসে—নৌকাতে যে মেয়েটি ময়লা কাপড় পরে বসেছিল ও নদীতে নেমে কাপড় হাঁটু পর্যন্ত তুলে চলে গেল, ওর কথাও যেন মনে থাকে। মুরাঠা বেঁধে ওবা নাকি কোন্ কুটুমবাড়ী নেমন্তন্ন খেতে গেল। আর ওই যে ছেলেটা বললে তার বাড়ী রজীদপুর, ওর কথাও—সাবোর স্টেশনের বাইরে লতাকাটি পাতা কুড়িয়ে আগুন পোয়ানো, গাড়ীতে ওই লোকটাকে বিড়ি খেতে বারণ করা, এই সময়ে আলো জ্বালিয়ে বড় বাসার টেবিলটায় বসে এই সব লেখা অনেককাল মনে থাকবে। শুয়রমারীতে আজ ঘি খুঁজলেই পাওয়া যেত—মুকুন্দি বলেছিল—কার্তিক খুঁজলে না ভাল করে। এখানে মোটেই শীত নেই। ইস্‌মাইলপুর কাছারীতে কদিন কি শীতই পেয়েছি। আগুন রোজ সন্ধ্যায় না পোয়ালে রাত কাটতো না। রামচরিত রোজ খড়ের বোঝা নিয়ে এসে আগুন করত। সেদিনকার শিকারটা খুব জোর হয়েছিল। বন্দুক নিয়ে কাদায় কাদায় বেড়ানো—প্রথম কুন্ডীটাতে এত হাঁস ছিল একটাও মারতে পারা গেল না। শুধু এদিক ওদিক দৌড়ে দৌড়ে হয়রান—

* 'পথের পাঁচালী' লেখা হচ্ছিল।

॥ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৫, ভাগলপুর ॥

লেখাপড়া একটা খুব বড় মানসিক দুঃসাহসিকতা। যারা সারাদিন ঘরে বসে বসে পড়ে, তাদের শরীর ঘরটার চারধারের দেওয়ালে বন্ধ থাকলেও মন উড়ে যায় অনেক অনেক দূরে—অসীম শূন্য পার হয়ে কোটি কোটি অজ্ঞান নক্ষত্রলোকের দেশে দেশে। সময়ের কুয়াশা ভেদ করে তাদের মন ফিরে যায় একেবারে পৃথিবীর সে-যুগে যখন মানুষসৃষ্টি আরম্ভ হয় নি, জলাজঙ্গলে অজ্ঞাত ভীষণ-দর্শন অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞাত গাছপালায় ভরা আদিম যুগের জঙ্গলে। এই জগতে সবচেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে অজানার আনন্দ—জানা জিনিসে কোনো সুখ নেই।

এই নতুন জিনিসের আনন্দ, অজানার আনন্দে বিশ্বজগৎ ভরা। মানুষের সঙ্কীর্ণ ইন্দ্রিয়শক্তির চারপাশ ঘিরে, তার চোখের সামনে, তার কানের সামনে, তার অনুভব ও স্পর্শশক্তির সামনে, তার মনের সামনে অনন্ত অসীম রহস্যময় অজানার মহাসাগর। তার দূর দিক্‌চক্রবালের ওপারে ঘন আবছায়া কুয়াশার অস্পষ্ট কল্লোলও শোনা যায় না—এত দূর সেদিক। এই অসীম অজানা সাগর মানুষকে অজানার আনন্দ দেবার জন্য যেন তার চারধার ঘিরে আছে। কে আছে যার সাহস, বুদ্ধি, মন এত দৃঢ় যে অজানার দরিয়ায় পাড়ি জমাতে চলে? কূল আঁকড়ে তো সকলেই পড়ে রইল। দিক্‌দিশাহারা অকূল-রহস্য মহাজলধিতে কে 'বাচ' খেলতে চলবে—কোথায় সে বীর ব্রাত্য, মুক্ত আত্মা?

সংসারের ধূলোয় পড়ে সবাই লুটোপুটি খাচ্ছে—সুদের হিসাবে দিন যাচ্ছে, গাঁজা খেয়ে আনন্দলাভের চেষ্টা করছে, সংসারের সবাই আনন্দকে খুঁজছে। কিন্তু আনন্দের জলধি যে সামনে অক্ষুণ্ণ রইল তার দিকে তো চাইবে না।

সে উচ্চ আনন্দের ভাণ্ডারকে ব্যবহার করবার মত শিক্ষা-দীক্ষা সকলের থাকে না, অধিকার সকলের থাকে না।

এই জন্যই মনে হয় সংসারে কাউকে ঘৃণা করলে হবে না। মানুষ এই উচ্চ ব্রাত্য আনন্দের খবর না জানতে পেরেই অ-সুখে হিংসায় ধূলোয় কাদায় পড়ে লুটোপুটি খায়। স্বার্থদ্বন্দ্বে নিজের সুখ খুঁজতে নিজেকে আরও হীন, অসুখী করে তোলে। তাদের দোষ নেই। হতভাগ্য তারা—সকলে আনন্দকেই খুঁজছে। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষার অভাবে আনন্দের পথ না জেনে ভুল পথ ধরেছে। শুধু অবগুণ্ঠনময় বিশ্বজগতের অনন্ত রহস্য-লোকের অজানা জীবনানন্দের পথ দেখিয়ে দেবার কেউ নেই বলেই তারা এমন হয়েছে। নইলে একবার চোখ ফুটলে তারা সকলেই ঠিক পথই ধরত, কারণ নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। কেউ নেই—কেউ নেই—তাদের মুখের দিকে চাইবার কেউ নেই। কোন্ মুক্তপুরুষ অনন্ত অধিকারের বার্তা নব আনন্দের তড়িৎলেখায় তাদের উপেক্ষিত অন্ধ বুভুক্ষাশীর্ণ প্রাণে পৌঁছে দেবে?

॥ ১২ই ডিসেম্বর, ১৯২৫ ॥

হঠাৎ জানালার ধারে এসে দাঁড়ালাম—বাইরে শীত কমে গেছে—জ্যোৎস্নাসিক্ত লম্বা ছায়া পড়েছে—আলো-আঁধারে গাছগুলোর লম্বা লম্বা ছায়া—মনে হোল এই যে সুন্দর পৃথিবী, এই জ্যোৎস্না ছায়া, ঐ রহস্যময় চিন্তা পাঁচশো বছর পরে কোথায় থাকবে?

ঐ দূরে যে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে, এই বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো—আজ যারা সব জীবন্ত স্পষ্ট মূর্তিমান—আজ আমার জীবনের যে দুঃখ সুখ আমার কাছে স্পষ্ট জীবন্ত, তারা সব কোথায় থাকবে? কোথায় মিশে যাবে—কোন্ দূর অতীতে? আবার তাদের জায়গায় নূতন অনুভূতি—এতদিনের অচঞ্চল, গতিহীন জড় সংসার যেন হঠাৎ তার

চোখে সচল গতির বেগে জন্ত হয়ে উঠল, যা এতদিন ছিল বন্ধ, হয়ে উঠলো রহস্যময় জীবন্ত গতিশীল—পথিক বিশ্ব এই অনন্তের মধ্য দিয়েও ঠিক আছে, তার বুকে যুগে যুগে কত বিনষ্ট অবোধ জীবের ব্যথা, কত অতীতের কত বেদনা-ভরা বুক তার, যুগ-যুগের বিরহ জন্মমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে, প্রচণ্ড বিদ্যুৎ, সৃষ্টির কত ফুল কত রহস্য নিয়ে যে চলে আসছে। হয়ত অনেক দিন পরে সৃষ্টি যখন সুন্দর হয়ে ওঠে আগের চেয়েও, তখন দূর স্বর্গের কোন্ কোণে মস্ত বড় জ্যোতির্বাতায়ন খুলে রেখে অতীতদিনের জীবের কাহিনী তার মনে পড়ে যায়—অনন্তের পাষাণ আনন্দ বেয়ে যারা কত কতদিন মিশিয়ে গেছে—বুক হয়ত তার অনন্তের ব্যথায় ভরে ওঠে।

॥ ২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৫ ভাগলপুর ॥

অসীম অনন্ত রহস্যভরা আকাশ—স্তব্ধ রাত্রি। পৃথিবী সুপ্তির অন্ধকারভরা। এখানে ওখানে দুই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে মাত্র ; মাঝে মাঝে বাতাস লেগে নিমগাছের ডালপালার মধ্যে সির্ সির্ শব্দ হচ্ছে। আকাশ অন্ধকার, পৃথিবী অন্ধকার। আকাশে বাতাসে একটা নীরবতা। অন্ধকার আকাশে নিমপাতার ফাঁক দিয়ে একটা তারা যেন অসীম রহস্যের বুকের স্পন্দনের মত ঢিপ ঢিপ করছে। তারাটা ক্রমে নেমে যাচ্ছে—আগে যেখানে ছিল ক্রমে তা থেকে নীচে নামছে। এই অনন্ত, সনাতন জগৎটা যে কি ভয়ানক রুদ্র লীলা প্রচ্ছন্ন করে রেখে দিয়েছে তা ঐ সঞ্চরমাণ তারাটিকে দেখলে বোঝা যায়। অন্ধকারের পিছনে একটা অসীম অনন্ত সৌন্দর্যলোক যেন আবছায়া আবছায়া চোখে পড়ে। ঐ তারার হয়ত একটা স্বাতী নক্ষত্র আছে। তা পার্থিব চোখের বাইরে, হয়ত তাতেও একটা আমাদের মত উন্নত ধরনের জীব থাকত। কি হয়ত আমাদের চেয়েও উন্নততর বিবর্তনের প্রাণীর বাস। কি তাদের সভ্যতা, কি তাদের ইতিহাস, কি তাদের প্রেম স্নেহ, জ্যোৎস্না সৌন্দর্য...জানতে ইচ্ছা যায়। এই রহস্যভরা বিশ্বের বুকের স্পন্দনটা কান পেতে শুনতে ইচ্ছে হয়—আরও কত নক্ষত্র, কত জগৎ, কত প্রেম, কত মহিমা, কত সৌন্দর্য, অব্যক্ত, বিশাল, বিপুল, অসীম চারধারে ছড়ানো। তা লোক-কোলাহলে শোনা যায় না। এই রকম গভীর রাত্রিতে এই রকম নির্জন জানালার ধারে বসে একমনে আঁধার-ভরা আকাশের স্পন্দমান নক্ষত্ররাজির দিকে চেয়ে থাকলে গভীর রাতের দক্ষিণ বাতাস যখন কালো গাছপালার মধ্যে সির্ সির্ বয়ে যায় তখন যেন মাঝে মাঝে অস্পষ্ট তার বুকের স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়।

আনন্দের রহস্যের গভীরতায়, বিপুলতায় মন ভরে ওঠে। জীবনের অর্থ হয়। পৃথিবীর জীবনের পারে যে জীবন, অসীম রহস্যময় অনন্তের পথের মহিমায় যাত্রাপথের পথিক যে জীবন, তার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়। দৈনিক জীবনের সাংসারিক কর্মকোলা-হলে যে মহিমাময় শাশ্বত জীবনের সন্ধান আমরা পাই না, জগতের সুখ দুঃখের ওপারে যে অনন্ত জীবন সকলেরই জন্যে চঞ্চল প্রতীক্ষায় রয়েছে, অসীম নীল শূন্য বেয়ে যার উন্দাম রহস্যভরা পথযাত্রা, সে জীবন একটু একটু চোখে পড়ে।

"ভয় নেই, ব্যাঙ্কে টাকা জমিও না, অসময়ে দেখবার ভয়ে ব্যাকুলও হয়ো না। আমি অনন্ত জীবন তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছি। কোনো ভয় নেই, পৃথিবীর কোন শান্ত, গ্রাম্য নদীর কূলের চিতায় তোমার হুঁশিয়ার জীবন যখন শেষ হয়ে যাবে সেদিন থেকে এ অসীম শূন্য অনন্ত রহস্য তোমার সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াবে। আপনা-আপনিই হবে, কোন ব্যাঙ্কে জমাবার কোনো প্রয়োজন নেই। জ্যোৎস্না ভালবাস? ফুল, ফল, পাখী ভালবাস? গান ভালবাস? পৃথিবীর ভাগ্যহত ছেলেমেয়েদের করুণ দুঃখের কাহিনী শুনে চোখে জল আসে? মন আকুল হয়ে ওঠে? আর্তের কান্না শুনে অন্যমনস্ক হয়ে যাও?

তবে তুমি অনন্ত জীবনের উত্তরাধিকারী। তোমার সুখের সীমা হবে না। সে খুশি আনন্দের মধ্যে দিয়ে নয়, দুঃখের মধ্যে দিয়ে। নক্ষত্রে নক্ষত্রে দেখে বেড়িও, কত দীন দরিদ্র, আতুর জীব কঠিন সংগ্রামে পিষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নির্জন নদীর তীরে কেউ হয়ত বসে বসে কাঁদছে—ওদের চোখের জল মুছে দেবার চেষ্টা করো, তাদের সঙ্গে কেঁদো, সে-ই তোমার স্বর্গ হবে। চোখের জলেই এ বিশ্বসৃষ্টি ধন্য হয়েছে। চোখের জল, কান্না, অত্যাচার ' থাকলে বিশ্বের সৌন্দর্য থাকতো না। সব সুখ, সব পরিপূর্ণতা, সব ঐশ্বর্য, সব সন্তোষ, শান্তি, কেমন মরুভূমির মত ভয়ানক খাঁ খাঁ করতো—মাঝে মাঝে আর্তদের চোখের জলের শ্যামশান্তিভরা ওয়েসিস আছে বলেই তা করুণ মধুর হয়েছে।

"জ্যোৎস্না যখন ওঠে, তখন অনেক আগে মরে-যাওয়া ছেলের কথা ভেবো—দেখবে, জ্যোৎস্না মধুর করুণ হয়ে আসছে। পাখীর গানে করুণ গৌরীর উদার মীড় ধ্বনিত হচ্ছে। যে বুড়ীটা গ্রামের পাঁচজনের ঝাঁটালাথি খেয়ে কিছুদিন আগে ঘরে ছেঁড়া কাঁথার মধ্যে জল অভাবে মৃত্যুতৃষ্ণা নিবারণ করতে না পেরে মরেছিল তার কথা ভেবো—মন উদার শোক ও শান্তিতে ভরে আসবে—জগতের পবিত্র কারুণ্যের, আশাহত ব্যর্থতার মধ্যে দিয়ে অনন্তের অনাহত ধ্বনি কানে বাজবে। যে পরের ব্যথায় কাঁদতে শেখেনি জগতে সে অতি দুর্ভাগা। এক অতি অদ্ভুত জীবনরস থেকে সে বঞ্চিত হয়ে আছে।"

কুকুরের ঘেউ ঘেউ যেন একটু থেমেছে। অন্ধকার যেন আরও একটু গভীর হয়েছে। তারাটা আরও নেমে গিয়ে গাছের ডালের আড়ালে পড়েছে—কি রুদ্র প্রচণ্ড তাণ্ডব গতি কি শান্ত নিরীহতার আড়ালেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

ঝির-ঝির বাতাসে নিমফুলের গন্ধ আসছে—বাতাবী লেবুফুলের গন্ধ আসছে।

এখনও আবার ফাল্গুন চৈত্র মাসে পাড়াগাঁয়ের বনে বনে ঘেঁটু ফুল ফোটে, বৈঁচি-গাছের নতুন কচি পাতা গজায়, দক্ষিণ বাতাস বয়, পাতার ফাঁকে ফাঁকে দোয়েল কোকিল ডাকে। কিন্তু তারা আর নেই, সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে তারা কোথায় কতদূর চলে গিয়ে কোন দূর অতীতে মিশে গিয়েছে।

॥ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬, ভাগলপুর ॥

ভাবতে ভাবতে মনে হোল সাত বৎসর আগে এই দিনটিতে আমি প্রথম চাকরি নিয়েছিলাম। সেই মাইনর স্কুলের খাট, সেই লেপে শোওয়া—অন্ধকার আকাশে চেয়ে দেখলাম। যদিও আমি ভাগলপুরে আছি, এখন এত বড় একটা মিটিং করে এলুম, কাল সকালে হেমেন আসছে, ইসমাইলপুরে নায়েবের চার্জ বুঝে নিতে যাবে, কিন্তু এই সবের মধ্যে পুরোনো দিনের ছবিগুলো বড় মনে পড়লো, অনেক দূরে এক গ্রাম্য নদীতীরে কেমন নাটা-কাঁটার বন, ধলচিতের খাল, নোনা কাদা, গোল-বেগোল, তারপর সেই পুকুরের ধার, সেই জানালা, সেই বর্ষার দিনে দরমাহাটার মোড়ে পাথুরে চুন ফেলা, সেই পানচালায় শোয়া, সেই কালী ডাকছে, ওঃ বড্ড কম।

জীবন কি করে অগ্রসর হচ্ছে? সাত বছরের এই পরিবর্তন, পাঁচ হাজার বছর পরে কি হবে? এই বিভূতি, এই নায়েব, এই অম্বিকাবাবু, এই হেমেন, এই আমি কোথায় থাকবো? পাঁচ হাজার বছর আগে যারা ইজিপ্টে থাকতো তারাও হয়ত ঠিক এই রকম ব্যক্তিগত আশা নিয়ে যতীনবাবুর মত অহঙ্কার করতো, বিভূতির মত ফোর্থ ক্লাসে পড়বার স্বপ্ন দেখতো—কিন্তু তাদের আশা অহঙ্কার প্রেম স্নেহ স্বার্থ নিয়ে কোথায় তারা আজ? দু-একটা ভাঙা ছেঁড়া মমি ছাড়া সেই বিশাল সভ্যতার অতীত জনসঙ্ঘের কি চিহ্ন পাওয়া যায়?

ঐ রকম আমাদেরও হবে। আমরাও আমাদের দ্বন্দ্ব, মারামারি, অহঙ্কার, আশা,

দাম্ভিকতা, ভালবাসা, স্নেহ, দয়া নিয়ে বুদ্বুদের মত মহাকাল-সাগরে কোথায় মিলিয়ে যাবো। আমাদের জায়গায় আবার নতুন একদল আসবে। তাদের ঠিক এই রকমই সব হবে। তারাও বলবে—আমরা বড় হবো, আমরা জমি কিনবো, বিষয় কিনবো, সুদে টাকা ধার দিয়ে বড়মানুষ হবো, বই লিখে নাম করবো—তারা বুঝতে পারছে না, তাদেরই পায়ের মাটির তলায় এক নয় কত লক্ষ লক্ষ generation তাদেরই মত ভেবে কেঁদে হেসে আশা করে অহঙ্কার করে সুখী অসুখী হয়ে বগল বাজিয়ে নেচে কুঁদে হামবড়াই করে বর্তমানে ধুলোমাটি হয়ে পৃথিবীমায়ের বুকেই কেঁচোর মাটির মত মিলিয়ে রয়েছে।

এখানে ওখানে, অন্ধকার আকাশে, বহিঃশূন্যে—বিশ্বসৃষ্টির উপকরণ, পাথর, ধাতুর পিণ্ডগুলো মাঝে মাঝে পৃথিবীর আকর্ষণে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে এসে জ্বলে উঠে রয়েছে—ঐ একটা—আবার একটা—আবার ঐ—শূন্যটা একেবারে ধাতুর পাথরের উপকরণে ভরা—

ঐ বিশ্বজগৎ, সংসারের কোলাহল ঊর্ধ্বের বড় জগৎটা ঐ অন্ধকার শূন্যে আত্মপ্রকাশ করছে।

ঐ যে গতি, ও বিশ্বের গতির প্রতীক। শুধু প্রতীক নয় ও, তারই গতি। স্বয়ং সঞ্চরমাণ, ভ্রাম্যমান, ঘূর্ণ্যমান বিশ্ববস্তুর অংশ। আপনা-আপনি নিয়মে চলেছে। ওর দিকে চাইলে নিউটনের, কেপলারের, হেল্‌ম্‌হোল্‌ৎজের, শঙ্করের, বরাহমিহিরের জগৎ মনে পড়ে—সে জগৎ ডাক্তার শরৎ সরকারের জগৎ নয়, গভর্নমেণ্ট প্লিডার অমুকের জগৎ নয়, অমুক বড়মানুষ পেটো মহাজনের জগৎ নয়, অমুক স্টেটের অমুক ম্যানেজারের জগৎ নয়। কত পৃথিবীর, বিশ্বের ভাঙ্গা টুকরো ও! কত ইতিহাস ছিল তাতে! কত জীব কত সভ্যতা কত উত্থানপতন কি বিরাট রহস্য ওর আড়ালে প্রচ্ছন্ন রয়েছে! কি অনন্ত ধ্যানের চিন্তার সৌন্দর্যস্বপ্নের ধারণার জ্ঞানের বিষয় ওই পাথরের ধাতুর টুকরোগুলো তা কে ভেবে দ্যাখে?

আবার আকাশে চাও, Sirius-এর পাশের, কত গ্রহনক্ষত্রের পাশের অদৃশ্য জগৎগুলোর কথা ভাবো! অন্ধকারে গা লুকিয়ে কোথায় ওরা অনন্ত পথে ঘুরছে? কি জীববাস তাতে? তাতে এরকম কত জীবের উত্থান-পতন? কত দিনের ইতিহাস?

তবে ওই পরিবর্তনের মধ্যে, এই তাসের ঘরের মধ্যে, এই মেঘের প্রাসাদদুর্গের মধ্যে আসল জিনিসটা কি? জনসেবা—এ জীবনের নয়। যুগযুগের জনসেবা। বিশ্বকে উপলব্ধি ক'রে সত্যকে উপলব্ধি ক'রে শাশ্বত সৌন্দর্যকে উপলব্ধি ক'রে, ধ্যানে কল্পনায় ছবিতে তাকে এঁকে যাওয়া। নয়ত এমন কাঁদিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল কাঁদবে, এমন হাসিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল হাসবে, এমন ভাবিয়ে যাওয়া যে মানুষ চিরকাল ভাববে, এমন দেখিয়ে যাওয়া যে তারা চিরদিন দেখবে।

শিক্ষকতা নয়, জনসেবা—দীন নিরহঙ্কার অথচ দৃঢ় পবিত্র হয়ে অবহিত মনে এই অতি মহৎ সার্থক সেবা।

বৎসরে বৎসরে এরকম বসন্ত কত আসে—কত নতুন মুখের আশা, কত নতুন স্নেহ প্রেম—মাথার উপরে নিঃসীম নীল শূন্য অনন্তের প্রতীক—এই নীল আকাশের তলে বৎসরে বৎসরে এরকম কাঁচ পাতা ওঠা গাছপালা, বেলফুলের ঝোপের নীচে বৈঁচি-ষাঁড়া-বাঁশ বনের আড়ালে যে শান্ত জীবনগতি বহুদিন ধরে ছাতিমবনের আমবনের ছায়ায় ছায়ায় বেয়ে চলছে, তারই কথা লিখতে হবে। ওদের হাসিখুশি ছোটখাটো সুখদুঃখ, আশা ভরসার যে কাহিনী ওই দিয়ে দিতে হবে—তাদের জীবনের যে দিক আশাহত, ব্যর্থতায়, দীনতায়, চোখের জলে, অপমানে উদাসকরুণ, চাঁদের আলো যাদের চোখের জলে চিক্ চিক্ করে, ফাল্গুন-দুপুরের অলস গরম দমকা হাওয়ায় যাদের দীর্ঘশ্বাস ভেসে বেড়ায়, নিস্তব্ধ

শান্ত সন্ধ্যা যাদের বনের মত ঝুলি ঝুলি অন্ধকার ভরা নির্জন—তাকেই আঁকতে হবে—মানুষের এই suffering এতো বড়।

বেড়াতে বেড়াতে চারধারের কাশজঙ্গলের গন্ধ ভেসে আসছে। চড়ুইপাখী কিচ্‌কিচ করছে। সন্ধ্যার শান্তি ও অন্ধকার—অনেক দূরে এই ফাল্গুন মাসে দক্ষিণ হাওয়া বইছে। বনে বনে বাতাবী লেবুর গন্ধ ভেসে আসছে। এখন শান্ত সন্ধ্যায় মিষ্টি বাতাবী লেবুফুলের গন্ধ পুকুরের ঘাটের পথে বইছে। রাঙা কাঞ্চনফুলের ছায়া পুকুরের জলের ওপর পড়েছে। ভিজে কাপড়ে বধূটা ঘাট থেকে বাড়ী যাচ্ছে। আর এখানে? এখানে চারিদিক কাশের গন্ধে ভরপুর। মহিষের ধুরুইয়া চিৎকার করছে। হু-হু পশ্চিম বাতাসে বালি উড়ে চারধার অন্ধকার করে দিয়েছে। ঝাউয়া খুবড়ী রামজোত, লোধাই, এই বসন্ত, এই নেবুফুল, সৃষ্টির আনন্দ—এই সব তুচ্ছ জিনিসে জীবনের মাদকতাময় আনন্দ—magic of life যুগে যুগে, বিবর্তনে এরকম আসবে—এই আনন্দ, এই উৎসব যুগ-যুগের মাঝখান দিয়ে অনন্ত কাল ধরে চলেছে—তারই মধ্যে জন্মেছি আমি—এরকম কত যাবো, কত আসবো—কত চড়কে কলেজ স্কোয়ারে বেড়াবো, কত সরস্বতী পুজায় গান শোনা, "ফাগুন লেগেছে বনে বনে", কত Abyssinian horseman, কত চাঁপা-পুকুর, কত অন্ধকারময়ী রাত্রি, কত বর্ষাসন্ধ্যায় কত অজানা বঁধুর মিলন গল্প, কত জনের সঙ্গে বাহুতে বাহুতে বাঁধা কত উৎসবের দিন—কত সুকুমার, কত হুগলী ব্রিজ, কত কেওটার সিঞ্চেতার গন্ধ, কত গুডফ্রাইডের ছুটিতে ছায়াভরা বৈকালে বোর্ডিং থেকে বাড়ী যাওয়া, কত ফাল্গুন দিনে প্রতিভা-সুন্দরী পড়া, কত জানালায় ধুপগন্ধ—কত জন্মের মধ্য দিয়ে বারে বারে জন্ম থেকে জন্মান্তরে নূতন নূতন অজানা মায়েদের কোলে শিশু হয়ে আসা যাওয়া, নব নব জীবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস-আনন্দ।

হে আনন্দময, যুগে যুগে তোমার মহারহস্যময় জীবনধারা বিজয়ীবৎ বিমৃত্যু, বিশোক, পথহীন মহাপথ ছেয়ে কত কল্প, মন্বন্তর মহাযুগের মধ্য দিয়ে, শত সহস্র জন্ম মৃত্যুর মাঝ দিয়ে কোথায় সে ভেসে চলেছে।

নিয়ে চল, নিয়ে চল, নিয়ে চল

মহাকালের মহাকলেবরের মধ্য দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে চল—

অনন্ত নীল ব্যোম্-সমুদ্রে এখানে ওখানে পাটকিলে রংয়ের মেঘদ্বীপের দিকে—

॥ ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭, ভাগলপুর ॥

## Life! Life!

কাল রাত্রে অন্তরের মধ্যে জীবনের বিশাল তরঙ্গোদ্দাম অনুভব করলাম—ওরকম অনেকদিন হয়নি। শক্তির, উৎসাহের, কল্পনার, আনন্দের, উদ্দীপনার, সৌন্দর্যের মাধুর্যের কি বিরাট প্রাণ-মন মাতানো, পাগল করা, উদ্দাম, বাধাবন্ধহীন গতি-বেগ! নদীর কুল-ছাপিয়ে নিয়ে যাওয়া ক্ষেপাজোয়ারের কি দুর্মদ, ফেনিল, প্রণয়লীলা! মনের মধ্যে জীবন যেন বলছে—এই যে গন্ডী তুমি তোমার চারিদিকে রচনা করে বসে আছো এরা তোমারই ভৃত্য তোমারই দাস। তুমি কেন ভুল করে এদের হাতে ইচ্ছে করে খাঁচার পাখীর মত বন্দী হয়ে আছো? তুমি এদের চেয়ে অনেক বড়। জীবনটা ভালো করে দেখতে হবে। উপভোগ করতে হবে। জীবন উৎসের মূল শুকিয়ে দেয় অলস নিষ্কর্মা জীবনযাত্রায়। শত্রুকে তাড়াতে হবে।

কুল ছাপিয়ে বেরিয়ে চলো! উদ্দাম উন্মত্ত বিজয় বিমৃত্যু গতির বেগে বার হয়ে পড়ো। কি ঘরের কোণে বসে মোকদ্দমার ফাইল আর স্টেটমেন্ট ঘাঁটছো!—তোমার মাথার ওপর অনন্ত নাক্ষত্রিক জগৎ রহস্যময় অজ্ঞাত, নব নব ঘূর্ণমান গ্রহরাজিকে বুকে

নিয়ে চলেছে। ধূমকেতু নীহারকণা নীহারিকা সুদূর লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী আলোকবর্ষ পারের দেশ, নতুন অজানা বিশ্বরাজি, নতুন অজানা প্রাণীজগৎ, বিশাল প্রজ্বলন্ত হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম্, লোহা, নিকেল, কোবাল্ট; এলুমিনিয়াম্; —প্রচণ্ড জাগতিক তেজ X-ray বিদ্যুৎ, চৌম্বকশক্তি, ইলেকট্রোম্যাগ্নেটিক ঢেউ, অনন্ত শূন্যপথে ভ্রমণশীল জ্বলন্তপুচ্ছ জানা অজানা ধূমকেতুরাজি, ঘূর্ণ্যমান ধাতুপিণ্ড, প্রস্তরপিণ্ডের অতি অদ্ভুত রহস্যভরা ইতিহাস—এই জন্ম-মৃত্যু, পায়ের নীচের লক্ষকোটী প্রাণীর মরে যাওয়ার লীলাউৎসব। মৎস্যযুগ, অঙ্গারযুগ, সরীসৃপযুগের প্রাণীদের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল, কত ফুল ফল বন নদী পাহাড় ঝর্ণা, কত কূলহীন, দিকহীন গর্জমান মহাসমুদ্র—অনাদি, অনন্ত, লীলাময়, রহস্যময়, অজ্ঞেয় জীবন-মৃত্যুর প্রবাহ। এর মধ্যে তুমি জন্মেছ। আত্মাকে প্রসারিত করে দাও এদের মধ্যে। চুপ করে চোখ বুজে বসে এই গতিশীল তাণ্ডব-নৃত্য-চঞ্চল মহাকালের মহাযাত্রাব উৎসবের কথা ভাবো—কোথায় যাবে তোমার দুদিনের বদ্ধজীবনের দৈন্য, কোথায় যাবে তোমার রুদ্ধ ঘরের অনির্মল দুষ্ট হাওয়ার ভাণ্ডার—প্রাণের বেগে গতির বেগে ছুটে বেরিয়ে পড়ে দ্যাখো জীবন কি মহিমময়, কি বিরাট, কি ঋদ্ধিশীল! কি অক্ষয় অনাদি অনির্বাণ জীবন, সঙ্গীতের কি মধুর লয়-সঙ্গতি।

ঘুঙুর বাঁধা পায়রা হয়ে ছাদের আলসে আঁকড়ে পড়ে থেকো না, বাজপাখীর মত ওড়ো, মাথার ওপরে যে অনন্ত অকূল শাশ্বত নীলাকাশ—তার ঘননীলের মধ্যে পাখা ছেড়ে দাও, উড়ে যাও—উড়ে যাও—সুন্দর বৈকালে, আমের বউলের গন্ধ ভেসে আসছে, পাখী ডাকছে, বনঝোপের পাতা সর্ সর্ করছে—জীবনে এ বৈকাল কতবার আসে কতবার যায়, কিন্তু প্রত্যেক অপরাহ্নই যেন নিত্য-নূতন মনে হয়, কারণ সামনে যে অজানা রাত্রি আসছে। অজানার আনন্দই মানুষের জীবনের সব চেয়ে বড় আনন্দ। অন্ধকারে সূর্য ডুবে গেল, কিন্তু আবার সকালে উঠবে। আবার নতুন জীবন নতুন ফুল ফল দূর্বা শিশির পাখীর গানে আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। আবার কত হাসি কত কুমারীর ঘাটে যাওয়া, কত জানালায় ধূপগন্ধ—

অশান্ত প্রাণীপাখী আর মানে না—সব দিকের বন্ধনহীন, নিঃসঙ্গ, উদাস, অনন্ত অকূল নীলব্যোমে মুক্তপক্ষে ওড়বার লোভে ছটফট করছে—জীর্ণ পিঞ্জরদলে শুধু অধীর অকূল পক্ষবিধুনন' উড়তে চায়—উড়তে চায়—পরিচিত, বহুবাব দৃষ্ট, একঘেয়ে, গতানুগতিক গণ্ডীর মধ্যে আর নয়, একেবারে অপরিচয়ের অকূল জলধিতে পাড়ি দিতে চায়, হয়ত দূরে দূরে কত শ্যামসুন্দর অজানা দেশসীমা, তুহিন শীতল ব্যোমপথে দেবলোকের মেরুপর্বত। আলোর পক্ষে ভর দিয়ে শুধু সেখানে যাওয়া যায়, অন্যভাবে নয়—সেখানেও ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদী বয়ে যায়—দেববধূগণ পীত হরিৎ তারকার আলোকে মৃদুপদবিক্ষেপে জলখেলা করতে নামে।

জীবনটাকে বড় করে উপভোগ করো, খাঁচার পাখীর মতো থেকো না। জগতের চলচঞ্চল গতি দেখে বেড়াও দেশে দেশে। দিল্লী আগ্রা গিয়ে দ্যাখো মোগল বাদশাহের সিংহাসন ঐশ্বর্য ছায়াবাজীর মত কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। পাহাড়ে ওঠো, কেদারবদরীর পথে বেড়াও, অবসাদ দূর হবে, মন দৃঢ় হবে।

॥ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭, ভাগলপুর॥

সকালে হাওড়ায় চেপে কেমন বর্ষাস্নাত মেঘমেদুর ভূমিশ্রীর মধ্যে দিয়ে সারাদিন ট্রেনে করে এলাম! নিউ কর্ড লাইনের দুধারে কেমন সবুজ বর্ষাসতেজ গাছপালা, ঝোপ-ঝাপ, ধানের মাঠ। বাড়ীতে বাড়ীতে বান্না চাপিয়েছে—ঘরে ঘরে যে সুখ-দুঃখের লীলাদ্বন্দ্ব

চলছে, কেমন ঘরের পেছনে খড়ের ঘরের কানাচে ছোট ডোবায় পদ্মবনগুলি! বড় বড় পদ্মপাতাগুলো উল্টে রয়েছে, সাদা সাদা পদ্ম ফুটে—কেমন যেন সব ভাই বোন নীল আকাশের দিকে চেয়ে সারাদিন পদ্মের চাকা তুলে তুলে যায়—এই ছবি মনে আসে। মাঠের ধারের বনে দীর্ঘ ছাতিম গাছটা, নীচে আগাছার বন-জঙ্গল। বীরভূমের মাঠে মাঠে ছোট ছোট চাষার চালা ঘর, লাউ-কুমড়োর লতা উঠেছে রাঙামাটির দেওয়াল বেয়ে, মেয়েছেলেরা গাড়ী দেখছে—সেই যে ছোট ঘরখানা থেকে গাড়ীর শব্দ শুনে মা ও মেয়ে ছুটে (বয়স দেখে মনে হলো) বার হয়ে এলো, আমার এসব কথা আজীবন মনে থাকবে।

॥ ২রা আগস্ট, ১৯২৭ সাল ॥

বড় বাসার ছাদ ভাসিয়ে কি চমৎকার—যেন ঠিক শরতের রৌদ্র উঠেছে আজ। নীল আকাশের এমন চমৎকার স্বচ্ছ নীল রং অনেকদিন দেখিনি। কি সুন্দর সাদা সাদা পেঁজা তুলোর মত মেঘের রাশি হালকা গাড়ীতে উড়ে চলেছে। চেয়ে চেয়ে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবলই পুরোনো দিনের কথা মনে আসে—সেই আমাদের খড়ের ঘরখানা, অতীতের কত মধুমাখা দিনগুলোর কথা, সকালে বিলবিলের ধারে সেই বর্ষায় মনসা ভাসান শুনতে যাওয়ার উৎসাহ, সেই পেয়ারা খেতে খেতে পুব-মুখো যাওয়া। মা বসে বসে সেলাই করতেন। নীরব দুপুরে বাইরের দাওয়ায় বসে পড়তাম—সেই সব দিনগুলো! সেই বন্ধুদের বাড়ী বিলাতী কার্ডের ছবি দেখে দেশকে প্রথম চিনেছিলাম, কিন্তু কি চমৎকার লাগে। (আবার চব্বিশ বৎসর আগের একটা এমনি দিন থেকে জীবন আরম্ভ হয় না? আমি অমনি লুফে নেবো।)

বহুদূরের নক্ষত্রে, গ্রহে কেমন সব জীবনধারা? সময়ের মাপকাঠিটা তাদেরও কি আমাদের মত ওই রকম ছোট, না বড়?...সেখান থেকে এসে আবার পাকড়াটোলার পথটায় আসন্ন সন্ধ্যায় ঘোড়া ছুটালাম। কখনো মাঠ, কখনো ঝোপ-ঝাপ, কখনো উলুবন, কখনো শুধু আকাশ, কখনো ভুট্টাক্ষেত—এই রকম থরে থরে নূতন পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই উন্মুক্ত গতি বড় ভাল। সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘোড়া ছুটলে অন্ধকারে ধূসর পাহাড়টাও যেন সঙ্গে সঙ্গে নাচতে থাকে—দূর আকাশে শুকতারা উঠেছে, কি জানি কোন্ দূরের জগৎ, সেখানে কি ধরনের জীবনযাত্রা!

॥ ৬ই আগস্ট, ১৯২৭ সাল ॥

দূরের দিগন্তপ্রসারী মাঠের শ্যামলতা, চারিধারের স্নিগ্ধ শান্তি, পাখীর ডাক, প্রথম শরতের নীল আকাশ এ সবের দিকে চেয়ে মনে হোল কত যুগ-যুগের এমন ধারা স্পন্দন যেন এসে মনে পেঁছিবে। একটা কথা মনে ওঠে—মানুষের অমরত্ব ব্যষ্টি হিসাবে সত্য না সমষ্টি হিসাবে সত্য? হাজার বছর পরে মনুষ্য জাতি কিরকম উন্নততর ধরনের সভ্য হবে, সে প্রশ্ন আমার কাছে যতই কৌতূহলজনক হোক, আমি—এই আমার অত্যন্ত পরিচিত আমিত্বটুকু নিয়ে হাজার বছর পরে কি রকম দাঁড়াবো—এই প্রশ্নটা আরও বেশী কৌতূহলপ্রদ। কে এর উত্তর দেবে?

আজকার এই পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে হঠাৎ মনে যেন ভাসা ভাসা রকমের এই কথা এল যে, মানুষের এই যে সৌন্দর্যানুভূতি, এই গভীর ভাবজীবন—ভগবান কি জানেন না এসব পূর্ণতা প্রাপ্ত হতে কত সময় নেয়? যিনি সুদীর্ঘ যুগ ধরে এই পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি সময়ের এ উপযোগিতাটুকু নিশ্চয়ই জানেন। তা হোলেই কি দাঁড়ায় না যে মৃত্যুর পরেও ব্যষ্টি-জীবন চলতে থাকবে—থেমে যাবে না।

তাই তো মনে হয়, সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ধরে এই আলো পাখী ফুল আকাশ-বাতাসের

মধ্যে দিয়ে কত শত শৈশবের হাসি খেলার মধ্যে দিয়ে কতবার কত আসা যাওয়া।

আজ দুপুরের নরম রোদে বড় বাসায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছেলেবেলাকার কত এরকম দুপুরের কথা মনে হোল—সেই সইমা, দিদিদের কুলতলা, সইমার বাড়ী রামায়ণ পড়া, সেই হাটবার—সব দিনগুলো একেবারে সেদিনের লুপ্ত স্মৃতি নিয়েই যেন আবার এল—

গভীর রাত্রি পর্যন্ত বড় বাসার ছাদে বসে মেঘলা রাতে কত কথা মনে আসে—আবার যদি জন্মই হয় তবে যেন ঐরকম দীন-হীনের পর্ণকুটিরে অভাব-অনটনের মধ্যে, পল্লীর স্বচ্ছতোয়া গ্রাম্যনদী, গাছপালা, নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, মোহভরা দুপুরের মধ্যেই হয়—

যে জীবনে এ্যাডভেঞ্চার নেই, উত্থান-পতন নেই—সে কি আবার জীবন? সেই পুতু পুতু ধরনের মেয়েলি একঘেয়ে জীবন থেকে ভগবান তুমি আমায় রক্ষা করো।

॥ ৯ই আগস্ট, ১৯২৭ সাল ॥

পূর্বদিকের জানালাটা দিয়ে আজ বেশ ঝির ঝির করে হাওয়া বইছে—একটু মুখ তুলে জানালার ওপর গরাদের ফাঁক দিয়ে চেয়ে দেখলেই বটেশ্বরনাথ পাহাড়টা দেখা যায়। খাটের পাশে টাটকা তাজা বেল ফুলের ঝাড়টা টবে বসানো, একরাশ ফোটা-ফুল বিছানায়। শুয়ে শুয়ে এমার্সন পড়তে পড়তে মনে হোল ১৯১৮ সালের এমনি রাত—সেও ১৪ই ভাদ্র। অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিং-এর একটা এঁদো ঘরের গুমোট গরমে প্রথম সিট নিয়ে এই রাত্রিটা কাটিয়েছিলাম। কত আনন্দে, কত উৎসাহে—কি অপূর্ব মোহ, সেদিনের রাত্রির ঘুমঘোরে আমাকে আচ্ছন্ন করেছিল—তার পরদিন সকালটিতে আমার সেই নতুন জামাটি গায়ে দিয়ে কত যত্নে দাড়ি কামিয়ে গাড়ী ধরতে ছুটেছিলাম। সে সব দিনের ইতিহাস আর কোথাও লেখা থাকবে না—নেইও। শুধু এক তরুণ-মনে তা আঁকা আছে—আর পঞ্চাশ বছর পরে, কি আর পাঁচশো বছর পরে—সেসব দিনের অপূর্ব পুলকের কাহিনী শতাব্দী-পূর্বের প্রথম বসন্তের পুষ্পস্তবকের ন্যায় লুপ্ত হয়ে যাবে। তবু যেন মনে থাকে একদিন সে অমৃতধারা বাস্তব জগতের ছিল।

তাই যখন মিউজিয়মে মমি দেখি তখন সেসব চূর্ণায়মান সাদা হাড়টির বুকে, এই পৃথিবীর নীল আকাশ, রাগরক্ত সন্ধ্যা, বাতাস, আলো, কোনো সুশ্রী শিশুর মুখটি, তরুণীর চোখের দীপ্তি, কোন্ নিভৃত অপরাজেয় অজানা ফুলের সুবাস—এই সব একদিন যে আনন্দের বাণ ছুটিয়েছিল—তিন হাজার বছর অতীতের যে লুপ্ত হাসিগান, মনের শান্তি,—বহুদিন লুপ্ত যেসব জ্যোৎস্নারাত্রি, প্রাসাদশিখরে পদচারণশীল সম্রাট থটমোমিনের চক্ষুকে মুগ্ধ করেছিল—মরুভূমির দূরপ্রান্তলীন সে সব সান্ধ্যসূর্যরক্তচ্ছটা, সে ঊর্ধ্বমুখ উষ্ট্রশ্রেণী, খর্জুর কুঞ্জের শ্যামলতা আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে। তখনও পৃথিবী এমনি সুন্দর ছিল, ঐ জানলার ছোট্ট ছায়াভরা ঝোপে খঞ্জন পাখী এমনি নাচত—সে মাধবী রাত্রি, সে নাচ আজকালকার কালে কারুর জানা না থাকলেও একদিন তারা সত্য সত্যই বজায় ছিল।

এমনি আমরাও চলে যাবো। কত হাজার বছর পরে আমাদের হাড় মাটির তলা থেকে হয়তো প্রস্তরীভূত অবস্থায় বেরুবে। তখনকার সে হাজার বছর পরের ভবিষ্যৎ-বংশধরগণ যেন না ভাবে এগুলো বুঝি চিরকাল এইরকম দাঁত-বার-করা সাদা হাড়ই ছিল—তারা যেন ভুলে না যায়, এককালে সেগুলোও তাদের মতই এই বিশ্বের আলো জ্যোৎস্নার সকাল-সন্ধ্যার অংশীদার ছিল। তাদের বীণায় যে সুরপুঞ্জ বেজে বেজে নীরব হয়ে গিয়েছে তাদের বুকে অদৃশ্য কালমুহূর্তগুলিতে তার লিখন আছে। হে আমাদের স্নেহ-ভাজন উত্তরপুরুষগণ, সে কথা মনে রেখো।

কাল এমনি কেটে যায়, বৎসরে বৎসরে ঝোপেঝাপে ফুলদল এমনি ফোটে আবার ঝরে পড়ে, একদল পাখী গান শেষ ক'রে মরে হেজে যায়। তাদের ছানারা মানুষ হ'য়ে আবার গান ধরে—গান বন্ধ হয় না তা বলে ফুলফোটা বন্ধ থাকে না তা বলে।

শুধু আমাদের পৃথিবীতে নয়, অনন্ত আকাশের অসীম গ্রহতারার মধ্যে হয়ত কত লুকানো অদৃশ্য জগৎ আছে। তাদের মধ্যের জীবেদের সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। উচ্চস্তর বিবর্তনের প্রাণী হলেও জন্মমৃত্যু আছেই আছে। এত বড় নাক্ষত্রিক বিশ্বের যখন আরম্ভ ও শেষ আছে তখন প্রাণীর কথা তুচ্ছ।

অনন্তকালের মুহূর্তগুলি এই রকম শত শত দৃশ্য অদৃশ্য বিশ্বের কত শত প্রাণীর বুকের কথায় ভরা, কত হাসি ব্যথার গানে সুরময়।

অনন্ত দেবের বাঁশির তান অনন্ত যুগমুহূর্ত ছেয়ে ভেসে আসছে—কান পেতে শুনলেই শোনা যাবে। শুধু আনন্দ দেওয়াই তার লক্ষ্য। এক পলকে জীবনকে চিনে নাও —দুঃখের পথ বেয়ে যেতে হবে কিন্তু সামনে আনন্দধাম—দুঃখনদীর ওপারে।

উঃ! কি সত্যি কথাই বেরিয়েছে উপনিষদের ঋষির মুখ দিয়ে—

আনন্দাদ্ধ্যেব খলু ইমানি সর্বানি ভূতানি জায়ন্তে...

কিন্তু এই সকল আবোল তাবোল ভাবনার মধ্যে এটুকু ভুলে গেলে চলবে না যে ১৯১৮ সালে এইক্ষণ অশ্বিনীবাবুর বোর্ডিং-এর আলুভাতে ভাত খেয়ে মির্জাপুরের বেনের দোকানটা থেকে এক পয়সার চিনেবাদাম কিনে কাগজে মুড়ে পকেটে নিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে শেয়ালদায় গাড়ী চেপেছি, অর্থাৎ গাড়ী ছেড়েছেও।

তারপর সারাদিন আর একথা মনে ছিল না—বিকেলের দিকে খুব ঘোড়া ছুটিয়ে বর্ষাস্নাত আকাশের তলে মাঠে মাঠে বেড়ালাম, তখনও মনে হয় নি। এই এখন আবার রাত আটটার পর জানলার ধারে বসে লিখতে লিখতে টবের গাছটার ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধে সে কথা মনে পড়ল।

এখন সেই বাঁশবনে ঘেরা বাড়ীতে অন্ধকার রাত্রি, হয়ত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির মাঝে আনন্দের কাহিনী দেখব। কতকাল হয়ে গেছে। বাইরে অন্ধকার মাঠের দিকে চেয়ে ভাবলাম আজ যদি যাই? সেই জামাটা পরে? অন্ধকার রাত্রে ভাঙা দরজার ইটগুলো পেরিয়ে পোড়ো ভিটাতে বর্ষাসতেজ সেওড়া ভাঁটবন। বনচাল্‌তা গাছ—বড় চারাটা। বাঁশঝাড় নুয়ে পড়েছে—ঘন বনে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, পিছনের গভীর বাঁশবনে শিয়াল ডাকছে। নয় বছর আগেকার সে রাতটার আনন্দের ইতিহাস কোথায় লেখা থাকবে? ঐ পোড়ো ভিটার অন্ধকারে ঘুপসি বাঁশবনের শন্ শন্ শব্দে, গভীর রাত্রিতে গভীর বনের দিকে হুতুম পেঁচার ডাকে।

এ সব রাতে একমনে ভাবতে ভাবতে শুধু এর অসীম রহস্যভরা জীবন বড় চোখে পড়ে—এ কোথায় এসেছি? কোথায় চলেছি? সংসারের কল-কোলাহলে যা কখনো মনেও ওঠে না, এ সব নীরব অন্ধকার রাত্রিতে জানালার ধারে বসে গুনগুন করে কোন গানের একটা লাইন গাইতে গাইতে এইসব চিন্তা সেটা বড় ধরা দেয়। তাই সকল জ্ঞানের পথিকেই নির্জনতার, পরিপূর্ণ অবসরভরা নির্জনতার বড় প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। দূরের ঐ তারাটার দিকে চেয়ে চেয়ে মনে হয় এ রকম হাসি-আশাভরা জীবনস্রোত হয়তো ওখানেও চলেছে—কে জানে? বিশাল Globular Cluster-এর দেশ, বড় বড় Star Clouds, ছায়াপথ, কি অজানা বিরাটত্ব, অসীমতা ভরা এ বিশ্বে জন্মেছি। Sagittarius অঞ্চলের নক্ষত্রঠাসা আকাশটার কথা মনে হলেই মন শিউরে ওঠে—পুলকে অনির্বচনীয় বিস্ময়ে আত্মহারা হয়ে ওঠে।

তাই এই নির্জন রাত্রিতে মনে হল সুখ আছে এক জিনিসে। কি সে? মনকে প্রসারিত

ক'রে এই অনন্তের অসীমতার সঙ্গে এক ক'রে দেবার চেষ্টা করো। মনে ভাবো অনন্ত আকাশের এই ছোট্ট একরত্তি পৃথিবীটার মত শত শত লক্ষ লক্ষ অজানা জগৎ—তার মধ্যের অজানা প্রাণীদের সে সব কত অজানা অদৃষ্ট ধরনের জীবনযাত্রা, কত সুখদুঃখ, কত আনন্দ। সে সব কি অজানা উচ্ছ্বাস—তোমার মন অসীমতার রহস্যে ভরে উঠবে। ক্ষুদ্রত্ব ভেসে যাবে অনন্তের অমৃতের জোয়ারে।

মনকে সে ভাবে যে তৈরী করেছে, জগৎ তার প্রিয় সাথী—চিরদিনের বন্ধু।

"জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য
চিত্ত ভাবনাহীন"

কিন্তু ক'জন চিনতে চায় জীবনকে এ ভাবে? সকলেই যে চোখ বুজেই থাকে—খোলে না।

অনন্ত যে তোমার চারধারে প্রসারিত, তোমার পায়ের তলার তৃণদলের শ্যামলতায়, তোমার কোলের শিশুর মুখের হাসিতে, তোমার আঙিনায় পাখীর ডাকে, সন্ধ্যায় ঝিঁঝিঁর সুরে, নৈশপাখীর পাখার আওয়াজে—কিন্তু আমি শুনবো না, আমি দেখবো না, আমি চোখ বুজে আছি—কার এত স্পর্ধা আমার চোখ খোলে?

॥ ২৮শে আগস্ট, ১৯২৭, আজমাবাদ কাছারী ॥

আজ আমি ও রাসবিহারী ঘোড়া করে একটুখানি যেতেই ভারী বৃষ্টি এল। রাসবিহারী সিং বললে নিকটে এক রাজপুতের বাংলো আছে চলুন।—ঘোড়া ছুটিয়ে দুজনে সেই বাড়ী গিয়ে উঠলাম। তার নাম সহদেব সিং। বাড়ী মজঃফরপুর জেলা। রাশি রাশি ফসল ঘরটার মধ্যে গাদা করা, অড়র ভুট্টা ঝুলছে। বললে, বীজ রেখে দিয়েছে। বৃষ্টি থামলে দুজনে ফিরে চলে এলাম।

॥ ২রা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সাল ॥

আজ সকালে মধু মন্ডলের ডিহির প্রাচীন বকাইন গাছটার ছায়ায় ঘোড়া দাঁড় করিয়ে জমি মাপলাম। বৈকালে ঘোড়া চড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম ভীমদাসটোলার নীচেকার আলটায় অত্যন্ত জল বেড়েছে—ঘোড়ার একবুক জল হ'ল পার হবার সময়। ওপারের বটেশ্বরের পাহাড়টা কি অপূর্ব নীল রং দেখাচ্ছে! ডান দিকে লাল রংয়ের অস্ত-আকাশ—উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে একা। সীমাহীন প্রান্তর, ফুলেভরা সবুজ কাশবন, অস্ত-আকাশে রক্ত মেঘ, নীল পাহাড়, ঢালু দুর্বাঘাসের মাঠ, ধুতুরা ফুলের উলুখড়ের ঝোপ, বড় পাকুড় গাছটার তলায় হলুদ-রাঙা, জরদা রং-এর সন্ধ্যামণি ফুলের বন, এদিকে ওদিকে পাখী ডাকছে, ক্ষেতে গরু চরছে—বাঁধের নীচে জলের ধারে বকের দল বসে আছে, স্নিগ্ধ খোলা মাঠের সান্ধ্য বায়ু—মনটা যেন এই অপূর্ব সীমাহীনতার মধ্যে, দূরপ্রসারী শ্যামল প্রান্তরের মধ্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে গেল।

দূর প্রান্তে চেয়ে চেয়ে ভাবলাম বহুদূরের আমাদের বনজঙ্গলে-ভরা অন্ধকার ভিটা, বাঁশবনের কথা। এই সুন্দর অপরূপ শরৎ সন্ধ্যায় গ্রামের লতাপাতা থেকে ওঠা ভরপুর কটুতিক্ত গন্ধটার কথা, সেই বাঁশঝাড়ে শালিখ-ডাকা বাংলাদেশের মায়াসন্ধ্যার কথা, তরুণীরা মাটির প্রদীপ হাতে গৃহ-আঙিনায় তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা দেখাচ্ছে, ঘরে ঘরে রাত্রির আবাহন—মঙ্গলশঙ্খের রব।

এসময়ে চাঁপাপুকুরের পুকুরঘাটে, তাদের তেতলার ঘরটায়, চট্টগ্রামের দূর প্রান্তের সেই ঘরটাতে, বারিদপুরের বাড়ীটায়, ঝালকাটীর মণির বাড়ীতে না জানি কি হচ্ছে!

মণি বড় হয়েছে—বোধ হয় বিয়েও হয়ে গিয়ে থাকবে।

আমি স্বপ্ন দেখি সেই দেবতার—যিনি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়, যুগান্তের পর্বতশিখরে নীরব চিন্তামগ্ন। কত শত জন্মের স্মৃতি, হাজার বৎসরের হাসিকান্নার কাহিনী, নির্জন গ্রহের নির্জন পর্বতে, যুগ যুগ অক্ষয় তরুণ দেবতার কথা মনে পড়ে—ধীর, নির্জন, নীরব ধ্যান শুধু অতীতের। সম্মুখে তার বিশাল অজানা বিশ্ব। দেবতা হয়েও সব জানেনি, সকলের সীমা পায়নি গ্রহে, শত প্রেম কাহিনীর জালে জালে জড়ানো তরুণ সুন্দর মূর্তি তার। নিস্তব্ধ অন্ধরাতে বসে বসে শুধু সে একমনে অপরূপ জীবন-রহস্য ভাবে—ভাবে—

চারধারে বিশ্বের আঁধার ঘিরে আসে, মাথার ওপরে তারা ওঠে, কোন্ সুদূর লোকের পার থেকে অনন্ত অজানার সুর যেন কানে বাজে—একটা ছবি মনে আসে সেটা নীচে আঁকলাম, ছবিটা আমার মনে আছে, কিন্তু আঁকাটা এখানে হবে না, কারণ আঁকতে আমি জানিনে, তবুও এইটা দেখে মনের ছবিটা মনে ফিরে আসবে।

॥ ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ ॥

সকালে আজ কিরকম করে বৃষ্টিটা এল! কাটারিয়ার দিক থেকে ভয়ানক মেঘ করে এল। ঘন কালো মেঘের রাশ ঘুরতে ঘুরতে ঝড়ের মুখে হু হু উড়ে আসতে লাগলো। মাটিতে জল কি মিশ-কালো ছায়াটা ফেললে! বড় অশ্বত্থ গাছের ধারের বন্যার জলটা যেন কালো সোনার রং হয়ে উঠল। বকের দল ভয়ে ভয়ে ওপর থেকে মেঘের সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মুখে উড়ে উড়ে এপারে আসতে লাগল। কাকের দল কা কা করে ডাকতে ডাকতে দিশাহারা ভাবে উড়ে আসতে লাগল। তারপর এল ভীষণ ঝড়। শোঁ শোঁ শব্দে ভীষণ বেগে গাছপালা লুটিয়ে নুইয়ে ফেলে মেঘগুলোকে ঘুরতে ঘুরতে বটেশ্বরের পাহাড়ের দিকে নিয়ে চলল। কোথায় কোন সমুদ্রের জলের রাশি কি কৌশলে মাথার উপর দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে যেন! তারপর এল বৃষ্টি।

বৈকালে ঘোড়ায় করে বার হয়ে সহদেবটোলার পথটা ধরলাম। দুধারে কেমন বাংলা-দেশের মত কাঁটার ঝোপ, তেলাকুচা লতার গায়ে পাকা তুলতুলে সিঁদুরের-মত-রং তেলা-কুচা ফল ঝুলছে। ওড়কলমীর নোলক ফুটে আছে, বনসিদ্ধির জঙ্গল, আলোকলতার জঙ্গল, মটরলতা, স্নিগ্ধ বনদৃশ্যকে ভাল করে উপভোগ করবার জন্য আস্তে আস্তে ঘোড়া চলতে লাগল। তার পরে সুখটিয়ার বন্য কুলের জঙ্গল দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একে-বারে দেখি সামনে কালোয়ার চকহাট। সেখান থেকে জঙ্গল বেয়ে একহাঁটু জলকাদা দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে একেবারে গেলাম কলবলিয়ার ধারে। কাশবনটার কাছে থেকেই দেখলাম ফিকে হলুদ রংয়ের গোল সূর্যটা মেঘের মধ্যে থেকে বেরিয়ে কলবলিয়ার ওপরে তিরাশি সেকেন্ড যেন অপেক্ষা করলো, তার পরেই সে তার তপ্ত মুখখানা লুকিয়ে ফেলতে আর দেরি করলো না।

আবার অন্ধকারে ঘোড়া ছাড়লাম। কুলের জংগল দিয়ে কাশবনের ভেতর দিয়ে, জল-কাদা ভেঙে ঘোড়া এসে উঠল গ্রান্ট সাহেবের জমির অশ্বত্থ গাছটার কাছে। সেখানে পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। একে মেঘান্ধকার, তাতে কৃষ্ণাপঞ্চমী—ঘোড়াও পথ দেখে না, আমিও না। পথে এক জায়গায় অনেকটা জল পার হতে হোল ঘোড়াটাকে। অন্ধকারে অন্ধকারে গোমলা ঘাসের ক্ষেতের মধ্যেকার সুঁড়িপথ দিয়ে চলে আসতে লাগল। চারধারে লোক নেই, জন নেই, আকাশে একটা তারা নেই। সামনে পড়লো আবার জল, সেই জলটায় আবার কুমীরের উপদ্রব আছে। যাই হোক, ধীরে ধীরে ঘোড়াটাকে জল পার করিয়ে মকাই ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে একপ্রহর রাত্রে কাছারীতে পৌঁছলাম।

॥ ১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ সাল ॥

বিকালের দিকে অনেক দিন পরে বেড়াতে গিয়ে যতীনবাবুর দোকানে কথা বলছি—হেমন্তবাবু টেনে নিয়ে গেলো ম্যাচ্ দেখতে, সেখানে অনেকের সঙ্গে দেখা হোল। হেমন্তবাবু উকীল, যতীশবাবু ইত্যাদি। ওখান থেকে ফিরে দুজনে গেলাম হেমেনের কাছে। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হ'ল। তারপর ক্লাবে গেলাম। বাসায় ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত জ্যোৎস্নাভরা ছাদে বসে রইলাম একা। শুতে যেতে আর ইচ্ছা করে না। ইচ্ছে করে শুধুই বসে বসে এই দীর্ঘ নির্জন রাত্রি ভাবতে আর নানা রকম কল্পনা করে কাটাতে।

'আনমনে রচি বসি তন্দ্রাদীর্ঘ দিবসের অলস স্বপন'—ভাট্পাড়ার সেই বধূ দুটি, যাঁরা বিজয়ার দিনে আমাকে—সম্পূর্ণ অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও আগ্রহ করে ডেকে জলখাবার খাইয়েছিলেন—আজ হঠাৎ তাঁদের কথা মনে পড়ল। সত্যকারের স্নেহ কি ভালবাসার ঘটনা বিফলে যায় না—তাঁদের সে অনাবিল স্নেহের ফল এই হয়েছে যে তাঁরা আমার মনে একদিনের জীবনপুলকের সঙ্গিনীরূপে স্থায়ী আসন পেয়েছেন। আর এই প্রায় তিন বৎসর পরে এই দূর দেশে যখনই ভালবাম তাঁদের কথা, তখনই আনন্দ পেলাম।

মোপাসাঁর সেই পলাতক লক্ষ্মীছাড়া খুড়োর গল্পটা মনে এল—সেই জাহাজের ডেকে সেই ছোট ছেলেটি যখন তার হতভাগ্য নির্বাসিত খুড়োকে দেখলে তখন তার বালক-হৃদয়ের সেই উচ্ছ্বসিত অথচ গোপন সহানুভূতিটুকু!

তাই মনে হোল সাহিত্যে এই ভাবজীবন ফুটানোর প্রচেষ্টাই আসল। সাধারণ মানুষের ভাবজীবন খুব গভীর নয়—অনেকের মন এমন ভাবে তৈরী যা কিনা কোন বিষয়েই গভীরত্বের দিকে যাবার উপযোগী নয়। অথচ এই গভীরত্বের অভাবে জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মনের এ দৈন্য অর্থে পূরণ হয় না, ঐশ্বর্যে নয়। সাংসারিক বা বৈষয়িক সাফল্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ সব অপূর্ব অনুভূতি আসে অনেক সময় বিচিত্র জীবনপ্রবাহের ধারার সঙ্গে, উপযুক্ত গড়ে ওঠা মনের সঙ্গে।

এই মোপাসাঁর মত লোকেরা আসেন আমাদের এই বড় অভাবটা পূর্ণ করতে। তাঁদের ভাগ্যের লিখন এই, জীবনের উদ্দেশ্য এই। নিজের গভীর ভাবজীবনের গোপন অনুভূতির কাহিনী তাঁরা লিখে রেখে যান উত্তরকালের বংশধরদের জন্যে। হতভাগ্য দীনহীন খুড়োর দৈন্যের করুণ দিকটা একদিন কোন নিভৃত তুষারবর্ষী রাত্রে আগুনের কুণ্ডের আরাম-কেদারায় বসে কথাটা মনে হয়ে মোপাসাঁর তাঁর চোখে জল এনেছিল, আজ সর্ব-দেশের নরনারীর চোখে জল আনছে—আজ কতকাল পরে সেই কল্পনাদৃষ্ট বৃদ্ধ ও তার দীন বাজিকরের ছিন্ন বেশ, কয়লা কালিঝুল-মাখা হাত-পা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

সাহিত্য শিল্পীদের জীবনের প্রতিবিম্ব। যে যুগে তারা জন্মেছে, তাদের চেষ্টা হয় সকল দিক থেকে সে যুগের একটা স্থায়ী ইতিহাস লিখে রেখে যাওয়া। এই বর্তমান যুগে যাঁরা জন্মেছেন, তাঁরা এই সময়ের একটা কাহিনী লিখবেন। অন্তরের এক মুহূর্তের কথা, তবুও জগতের ভাণ্ডারে থেকে যাবে। এই যুগের শেক্সপীয়র হোমার বাল্মীকি কালিদাস রবীন্দ্রনাথ তাজমহল, Great War এই কলকারখানা, সামাজিক বিপ্লব, এই বিভূতি, শুনু, ভারতে স্বরাজ নিয়ে মহাদ্বন্দ্ব বাদলায় এই ম্যালেরিয়া, বার্ণার্ড শ' বা ওয়েল্স, ইবানেজ, মেটারলিঙ্কের প্রতিভা আমেরিকার ধনী ভ্রমণকারীদের এই পৃথিবী-ময় ছড়িয়ে যাওয়া, জাপানের ভূকম্পন—এই সবসুদ্ধ জড়িয়ে এই যুগটার নানা দিকের কাহিনী, ইতিহাসে লেখা হবে। প্রত্যেক লোকই তার নিজের অনুভূতি লেখবার অধিকারী। ফুল, ফল, লতা, পাখী, সমুদ্র, মা-বাপ-ছেলেমেয়ে সব আছেই—আমি তাদের কি রকম দেখলাম সেইটাই আসল কথা। জীবনটাকে আমি কি রকম পেলাম, সেইটাই সকলে

জানতে চায়। যত অজ্ঞাতনামা লেখকই কেন হোক না, তার সত্যিকার অনুভূতি কখনো কৌতূহল না জাগিয়ে পারে না—পড়বেই সেটাকে সকলে। সকলেই খেলার তাঁবুর বাহির-দুয়ারে অপেক্ষা করছে—রহস্যভরা খেলাটা সকলের ভাল লাগে, কিন্তু ভাল বুঝতে পারে না—তাঁবুর বাইরে এলেই পরস্পরের অভিজ্ঞতার আদানপ্রদান ও তুলনা হয়—'মশাই কিরকম দেখলেন?' প্রত্যেক মানুষই নতুন চোখে দেখে—প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন। তাই সকলেরই কথা কৌতূহল জাগায়। সাহিত্য শুধু জগৎটাকে কে কি চোখে দেখেছে তারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কাহিনী। বর্ণিত নায়ক-নায়িকার পিছনে শিল্পী তাঁর আবাল্য দীর্ঘ জীবনের সকল সুখদুঃখ, হাসিকান্না নিয়ে প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। কল্পনাও কিছু না কিছু অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে, তবে শূন্য ভর করে—যেমন সনেটের পিছনে তেমনি হ্যামলেটের পিছনে শেক্সপীয়র গুপ্ত থেকেও ধরা দিয়েছেন।

তাই এই যুগে জন্মে আমি সকল রকম বিচিত্র জীবনধারার অভিজ্ঞতা চয়ন করে তার কাহিনী লিখে রেখে যাবো। আমি জগৎকে কি রকম দেখলাম? আমার শৈশব কি রকম কাটল? কোন্ কোন্ সাথীকে আমি আনন্দ-মুহূর্তে দেখলাম? কাদের চোখের হাসি আমার মনকে অমৃতরসে স্নিগ্ধ করলে। গতিশীল পলাতক অনন্তের প্রবাহ থেকে তাদের উদ্ধার করে লেখার জালে তাদের বেঁধে যাবো—সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ ধরে ভবিষ্যৎ-বংশধরেরা তাদের কাহিনী জানবে। আর হয়তো এ পথে আসবো না, হয়তো আবার যুগযুগান্ত পরে ফিরে আসবো—কে জানে? বহুকাল পৃথিবীর সন্তানগণের মনে এ লেখা ঐ ইতিহাস কৌতূহল জাগাবে—তাজমহলের ধ্বংসস্তূপ যেন মাহেঞ্জোদরোর খদ, গভীর মাটির রাশির মধ্যে যাকে খুঁড়ে বার করতে হবে—Great War-এর কথা মহাভারতের কি হোমারিক যুদ্ধের কাহিনীর মত প্রাচীন অতীতের কথা হয়ে দাঁড়াবে—কলকাতা শহরটা বঙ্গোপসাগরের তলায় ঢুকে যাবে—সেই সুদূর অতীতের নতুন যুগের নতুন শিক্ষাদীক্ষায় মানুষ এ সব কাহিনী আগ্রহের সঙ্গে পড়বে। বলবে—আরে দেখ, সেই সে কালেও লোকে এমনি ভাবে বিয়ে করতে যেতো! এই রকম জমি নিয়ে মারামারি করত, মেয়ের বিদায়ের সময় কাঁদতো! ভারী আশ্চর্য হয়ে যাবে তারা।

যুগযুগান্তের শ্মশানে জীবনদেবতা বসে বসে শুধু হাসবেন।

॥ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ ॥

আজ অনেকদিন পরে পরিচিত সেই বনটার ধারে গিয়ে বসলাম। সন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই। পশ্চিম আকাশে অপূর্ব রাঙা মেঘের পাহাড়, সমুদ্র, কত বিচিত্র মহাদেশের আবছায়া। সামনের ত্রলংনগুলো অন্ধকারে কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে! চারধারে একটা গভীরতা, অপরূপ শান্তি, একটা দূরবিসর্পিত ইঙ্গিত।

এই স্থানটা কি জানি আমার কেন এত ভাল লাগে! যখনই আমি এখানে সারাদিন পরে আসি তখনই আমার মনে হয় আমি সম্পূর্ণ অন্য এক জগতে চলে গিয়েছি। এই গাছপালা, মটরলতা, পাখীর গান সন্ধ্যাকাশে বর্ণের ইন্দ্রজাল—এ অন্য জগৎ—আমি সেই জগতে ডুবে থাকতে চাই—সেটা আমারই কল্পনায় গড়া আমারই নিজস্ব জগৎ, আমার চিন্তা, শিক্ষা, কল্পনা, স্মৃতি সব উপকরণে গড়া!

নীচের জলাটা যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের জলা—সেখানে অধুনালুপ্ত হিংস্র অতিকায় সরীসৃপ বেড়াতো—সামনের অন্ধকার বনগুলো কয়লার যুগের আদিম অরণ্যানী—আমি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দেখি কত রহস্য, কত অপরূপ পরিবর্তনের কাহিনী, কবেকার ইতিহাস ওতে আঁকা, কত যুগযুগের প্রাণধারার সঙ্গীত।

বড় বাসার ছাদে বসে বসে ছেলেবেলার দুই একটা বড় ঘটনার কথা ভাবতে চেষ্টা

করেছিলাম। একটু বিশ্লেষণ করে দেখলাম। এই রকম করে বলা যেতে পারে—শৈশব তো সকলেরই হয়—ওতে ভাববার কি আছে! এ আর নতুন কথা কি? তা নয়। এই ভেবে দেখাটাই আসল। না ভাবলে ভগবানের সৃষ্টি মিথ্যা হয়ে পড়ে। জগতে যে এত সৌন্দর্য তার সার্থকতা তখনি যখন মানুষ তাকে বুঝবে, গ্রহণ করবে, তা থেকে আনন্দ পাবে। নইলে আকাশের ইথারে তো চব্বিশ ঘণ্টা নানা ভাবের স্পন্দন চলছে, কিন্তু যে বিশিষ্ট ধরনের স্পন্দনের ঢেউ-এর নাম সঙ্গীত তা এত আনন্দদায়ক হল কেন? দিনের পর দিন সূর্য অস্ত যায়, পাখী গান করে, খোকাখুকিরা হাসে—যদি কেউ না দেখতো, না শুনতো—তবে মানুষের দৈনন্দিন বা মানসিক জীবনে তাদের সার্থকতা কিসের থাকতো? কিন্তু মানুষের মনের সঙ্গে যখন এদের যোগ হয় তখনই এদেরও সার্থকতা, মনেরও সার্থকতা। মনের সার্থকতা এই যে বিপুল সৃষ্টির আনন্দকে সে ভোগ করে নিজেও বড় হয়ে উঠল, আত্মাকে আর এক ধাপ উঠিয়ে দিলে—এদের সার্থকতা এই যে এরা সে উন্নতির আনন্দের কারণ হোল।

তাই আমাদের শাস্ত্রেও যোগকে অত বড় করে গিয়েছে। এই বিশ্বের অনন্ত আত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মার যোগই মানবজীবনের লক্ষ্য। সে কি রকম? মানুষ সাধারণত ছোট হয়ে থাকে—হিংসাদ্বেষ, অর্থচিন্তা তার কারণ। অনন্ত অধিকারের বাণী সে শোনেনি বলেই সে নিজেকে মনে করে ছোট—বাইরের আলো পায় না বলেই এই দুর্দশা। এই ভূপতিত, ধূলিলুণ্ঠিত আত্মাকে উঁচুতে ওঠাতে পারে তার মন। মন মুদিখানার দোকান থেকে বার হয়ে পোদ্দারী আড্ডা খোলে এসে। বাইরের অনন্ত নক্ষত্র-জগতের দিকে প্রশান্ত জিজ্ঞাসু চোখ চেয়ে থাকুক—কান পেতে নদীর মর্মর, পাখীর সুর, রন্ধ্র থেকে উপচীয়মান সঙ্গীত শুনুক—এই হোল যোগ। সঙ্গে সঙ্গে মনকে প্রসারিত করে দিক অনন্তের দিকে—এই হোল যোগ। আর সে ছোট থাকবে না—বড় হয়ে যাবে। ঐ অনন্ত শূন্যের উত্তরাধিকারী সে যে নিজে একথা বুঝবে—কি অনন্ত আনন্দ তার জন্যে অপেক্ষা করছে তা বুঝবে—অনন্তের দিকে বিসর্পিত তার আত্মাই তখন তাকে বড় করে তুলবে।

এই অবস্থা ঘটেছিল এক সুদূর অতীতে সেই চিন্তাশীল ঋষির—যিনি জোর গলায় জ্ঞানের চিন্তার স্পর্দ্ধায় বলেছিলেন—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ—তিনি বুঝেছিলেন, তমেব বিদিত্বাদিমৃত্যুমেতি— নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। মৃত্যুকে জয় করে বড় হতে গেলে এই অন্ধকারের পরপারের সেই আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষ যাঁকে মহর্ষি নিজে বুঝেছেন এবং এটুকুও বুঝেছেন যে তাঁকে না বুঝলে মৃত্যুকে ছাড়িয়ে ওঠার আর পথ নাই—তাঁকেই জানতে হবে।

যে অমৃত-প্রভাতে আদিম ভারতের কোন্ তপোবনে এ মহাবাণীর জন্ম হয়েছিল, সে তপোবনের, সে প্রভাতের বন্দনা করি।

সত্যই তো। অনন্ত বিশ্বকে মানলেই তো মানুষ দেবতা হয়ে ওঠে, তার ওপর এই বিশ্বজ্ঞানকে ছাড়িয়ে তার ওপারে তার কর্তব্যজ্ঞান যে লাভ করেছে সে অতিমানব—এ বিষয়ে ভুল নেই।

অতিমানব সে-ই, যে চিন্তায় বড়, অনন্তের সঙ্গে যে নিজের আত্মাকে এক করতে পেরেছে।

মনোবাজ্যে মানুষের অতি অমূল্য অধিকার। একে খুব কম লোকেই জানে, খুব কমই এর সঙ্গে পরিচিত। ভাববার সময় মানুষে পায় না। অথচ এই মনই মানুষের অন্ধকারের পরপারের জ্যোতির্ময় অনন্ত জীবনের বেলাভূমিতে যাবার একমাত্র অদৃশ্য পুষ্পক রথ।

তোমাকে যে দেশের জঙ্গল কাটতে হবে সেটা ঠিকই, বুভুক্ষিতকে অন্ন দিতে হবে ঠিকই, কিন্তু এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, চিন্তার দ্বারা তুমি মানবজাতিকে যে আনন্দের স্তরে ওঠাতে পারো, সাময়িক একমুঠো অন্নদানে সে সাহায্য হবে না। নিজে বড় হও তারপর সেই আনন্দের বার্তা পরকে শোনাও—আশার বাণীতে তাদের জরামরণ ঘুচে যাবে।

ভগবান তাঁর অনন্ত জীবনের আনন্দ সকলকে বিলিয়ে দিতে চান এই জন্যেই যে তাঁর মত উচ্চ জীবনের কল্পনা, ধ্যান, বুদ্ধি সকলের হয় এই তিনি চান। তার উপায়ও তিনি করেছেন, তবুও যদি ছোট হয়ে থাকা যায় তবে কে কি করবে?

সংসারে কলকোলাহলের ঊর্ধ্বে নিত্যকালের মশালচীদের যাবার পথ. তোমার ব্যাকুলতা দেখে তোমার মশাল তাঁরা জেবলে দেবেন, হয়তো অনেকের মত তোমার মশাল এমনিই থেকে যাবে।

"Let us not fag in paltry works which serve one not and lag alone. Let us not lie and steal. No God will help. We shall find all their terms going the other way—Charless Wain. Great Bear Orion, Leo, Hercules, every God will leave us. Work rather for these interests which the divinities honour and promote—justice, love, freedom, knowledge, utility."

॥ ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭ ॥

ভবঘুরের রক্ত পেয়ে বসেছিল. তাই আজ বেরিয়ে পড়লাম আমি ও অম্বিকা। সকালে হেমন্তবাবু এসে প্রথম মাইল পোস্ট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। চারধারে সবুজ ধান-ক্ষেত, জলাতে কুমুদ ফুল ফুটে আছে, দূরে তালগাছের সারি ও নীল পাহাড়শ্রেণীর সীমারেখা। বারো মাইল চলে এসে রামবাবুর বাড়ী রয়ে গেলাম। সেখানকার অভ্যর্থনা, পান, করঞ্জার সিরাপ দিয়ে চাটনি কখনো ভুলবো না। রামবাবুর বাগানটিতে ছায়াভরা পেঁপেগাছ ফুলগাছ বড় ভাল লাগল। সেখান থেকে বার হয়ে বৈকালের দিকে কি সুন্দর দৃশ্য! খড়কপুর পাহাড়ের ওপর সূর্য অস্ত গেল। পাহাড়ের কি নীল রং, ধানের রং কি সবুজ! সন্ধ্যার সময় এসে রজৌল থানায় পৌঁছে মুসলমান দারোগাটির আতিথ্য গ্রহণ করলাম। বেশ ভাল লোক—আজকাল এই হিন্দু-মুসলমানে বিবাদের দিনে এরূপ আতিথ্য দেখলে বড় আনন্দ হয়—মানুষের আত্মা সব সময়ে যেন বাইরের কুয়াশাতে দিশা-হারা হয়ে থাকে না—বরং যখন আপনি-আপনি থাকে তখনই সে মুক্ত, অনন্ত সুখী থাকে—এর আমি অনেক প্রমাণ আগে পেয়েছি, এখানেও পেলাম।

এই থানা, সামনের মৃণাল-ফোটা বৃহৎ পুকুরটা, এই কি সুন্দর হাওয়া—সন্ধ্যার পর এই থানার আয়না বসানো টেবিলটার ধারে বসে লিখছি—এ সব যেন কোথায় এসে পড়েছি!—সেই—সেই সময় পাকাটি হাতে শিবাজীর মত যুদ্ধ-যাত্রা মনে পড়ে—সেই মার তালের বড়া ভাজা, কলকাতা থেকে এসে খাওয়া—বাবার দেশভ্রমণের কার্তিক—সেই বড়দিনের সময় আমবনের কাছে বেড়ানো—কত পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে। ভগবান, তুমি সামনে টেনে নিয়ে যাচ্ছ—সামনে নিয়ে চল। সেই সোনারপুরে এমন সময়ে মা মারা যাওয়ার দিনটি থেকে খুব নিয়ে চলেছ—সেই কিশোরীবাবুর বাড়ী, জ্যোৎস্নাময় পূর্ণিমার কথা মনে পড়ে।

॥ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯২৭, রজৌন থানা॥

কাল রজৌন থানা থেকে বেরিয়ে অত্যন্ত খারাপ রাস্তায় মাঠের বাঁকা আলপথে এসে পৌঁছনো গেল। চানন নদীর কূল থেকে কি সুন্দর দৃশ্যটা! গুপিবাবুর বাড়ীতে সেদিনটা থেকে আজ ভোর পাঁচটাতে জামদহের পথে রওনা হলাম। চাননের বাঁধ থেকে দূরে পূর্বদিকে তালের সারির আড়াল দিয়ে সিঁদুর রং-এর অরুণ আলো দেখা দিচ্ছে—আরও দূরে ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়—এধারে কাকোয়ারা ওধারে বৌংশীর পাহাড়। পথে কেবলই দূরে দূরে পাহাড়, উঁচু নীচু ঢেউ-খেলানো লাল কাঁকরের পথ—চাননের জল স্থানে স্থানে জমে আছে—দূরে দূরে তালের সারি, শাল গাছের বন—রাঙা বালির ওপর দিয়ে শীর্ণকায় নদী বয়ে যাচ্ছে—সাঁওতাল পরগণার ছায়াময়ী অতি পরিচিত অথচ প্রতিবারেই-নতুন-মনে-হওয়া ভূশ্রী।

সন্ধ্যা সাতটা। ডাকবাংলোর টেবিলে নির্জনে বসে লিখছি। নীচের চানন নদী ওপরের পাহাড় অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না—সামনের আমবনের মাথার ওপর তারা উঠেছে—লছমীপুরের ম্যানেজার নদীয়াবাবু ও-অংশে কাছারী করছেন—প্রজারা কথাবার্তা বলছে—এই সুন্দর অপরিচয়ের মধ্যে বসে মনে হোল কতদিন আগেকার গানটা—'বিশ্ব যখন নিদ্রামগন গগন অন্ধকার'—ঠিক এই সময়—কলকাতার বোর্ডিংটা। আজ দ্বিতীয়া—সামনেই পূজো আসছে, ষোলই আশ্বিন। সেবার পূজো ছিল চব্বিশে। সেই সময়কার দূর-কালের সে জীবনটার সঙ্গে আজকার নির্জন জীবনের মধ্যকার এই শালবন-বেষ্টিত পাহাড়, নদীতীরের ডাকবাংলা, এই নিভৃত সন্ধ্যা, সম্পূর্ণ অন্য ধরনের জীবনটা মনে পড়ে। আমি এই রকম অতীতের ও বর্তমানের এই রকম বিভিন্ন জীবনযাত্রার কথা ভাবতে বড় ভালবাসি। বড় ভাল লাগে, কোথায় যেন একেবারে ডুবে যাই। আজ সকালে মহিষারড়ি, লকড়ী কয়লা প্রভৃতি অদ্ভুত রকমের গ্রামগুলো ও অপূর্ব পথের দৃশ্য, অম্বিকাবাবুর ললিত ডেপুটিকে প্রশংসার কথা অনেক দিন মনে থাকবে। কাল সকালে লছমীপুর যাবার প্রস্তাব হয়েছে—দেখা যাক। ভগবান আশীর্বাদ করুন, দেওঘরে অবশ্যই পৌঁছে যাবো। ডাকবাংলায় জলের বড় অভাব—পূরণ ছুটাছুটি করছে। নাগেশ্বর প্রসাদ, লছমী মুন্সী দেওয়ান শ্রীধরবাবুর নামে পত্র নিয়ে আজ সন্ধ্যার আগে ঘোড়ায় করে লছমীপুর চলে গেল। পায়ে এমন বড় ফোস্কা হয়েছে যে ওপথে বড় চড়াই-উৎরাই শুনে একটু ভাবছি। জয়পুর পর্যন্ত মিশিরজী পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ঠিক হলো।

আমি এই সব তুচ্ছ খুঁটিনাটি লিখি এই জন্যেই যে, সবসুদ্ধ দিনটাকে ও তার আবহাওয়াটাকে অনেক দিন পরে আবার ফিরে পাওয়া যাবে। বড় আনন্দ হয়।

॥ ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, জামদহ ডাকবাংলা ॥

জামদহ ডাকবাংলা থেকে বেরিয়ে লছমীপুরের পথে কি সুন্দর দৃশ্যটা দেখলাম—চাননের ওপারে পাহাড়ের মাথার ওপর প্রভাতের অরুণ-আভা, উঁচুনীচু পাহাড়ের উপত্যকার মধ্যে মধ্যে ক্ষীণস্রোতা নদী—শালবন, বড় বড় পাথরের টিলা। গভীর উপত্যকার মধ্যে শালবনবেষ্টিত লছমীপুর গড়ে এসে পৌঁছানো গেল বেলা আটটাতে। দেওয়ান শ্রীধরবাবুকে কালিবাড়িতে খবর দেওয়া গেল। লছমীপুর প্রাসাদে পৌঁছে দেওয়ানখানায় বসে রইলাম। তার আগেই কালীপদ চক্রবর্তী গুরুঠাকুরের ওখানে চা খাওয়া গেল। সেখানে খাওয়া-দাওয়া করে দুর্গম জঙ্গলের পথে হরপুর রওনা হলাম। উচ্চ মালভূমির উপর গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে পথ। দুধারে খদির, হরিতকী, বয়েড়া, বাঁশ, আবলুশ, আমলকী, কৎবেল, বেলের জঙ্গল। প্রথম জঙ্গল পার হয়ে দ্বিতীয় জঙ্গলটা শুধু ঘন আবলুশ ও কেঁদ জঙ্গল। এত বড় বড় পাথর যে জুতো ছিঁড়ে বুঝি পাথর পায়ে ফোটে। অম্বিকাবাবু, ভারী বিরক্ত হোল—এত গভীর বন দিয়ে কেন আসা? বনে ভালুক,

বাঘ ও হরিণ প্রচুর। জঙ্গল শেষ করে রাঙা মাটির উঁচু-নীচু পথ। শালের ও মহুয়ার বন পার হয়ে হয়ে অবশেষে জয়পুরের ডাকবাংলায় পৌঁছানো গেল। ওঝাজি লছমীপুরের কাছারী থেকে নিয়ে এসে আহার ও রন্ধনের আয়োজন করলে।

বেশ কাটল আজ সারাদিনটা। বনোয়ারীবাবুর কথা যেন মনে থাকে বহুদিন। রাণীসাহেবার এক ভাই এলেন। বাবরীচুলের গোছা, স্প্রিং-এর মত কপালে ও মুখের দুপাশে পড়েছে। পকেটে একটা বড় টর্চ যেন একটা পিতলের বাঁশী, হাতে সোনার হাতঘড়ি। বং কালো, আবলুশ কাঠ হার মেনেছে। পথে সাহেবের বাংলা থেকে অম্বিকাবাবু কি সুন্দর ফুল তুলে নিলে। আমি আমলকী, হরীতকী, বয়েড়া তুলে পকেট বোঝাই করলাম।

এত বড় বন আমি এর আগে কখনো দেখিনি। সারাদিন লছমীপুরের আমলাদের উপর অম্বিকাবাবু ও আমি খুব হুকুমটা চালালাম যাহোক্।

॥ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৭, জয়পুর ডাকবাংলা ॥

কাল সকালে উঠে গেলাম পুজো দেখতে আমলাকুণ্ডু কাছারী। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলে চা খেয়ে সন্ধ্যার একটু আগে ঘোড়া করে বেরিয়ে পড়লাম। আসবার সময় নৌকায় উন্মুক্ত গঙ্গার উপর জ্যোৎস্না কি অমল, উদার...

এই সব জ্যোৎস্নায় যেন কার মুখ মনে পড়ে! এই মৃদু হাওয়ায় তার স্পর্শ আছে.. ছেলেবেলাকার সেই নবীন শিশিরসিক্ত প্রভাতগুলি দিদির মুখের হাসি মাখানো, মায়ের হাসি মাখানো। সেই পাকাটির গন্ধ, নূতন গ্রামে এসেছি, একটু ভারী ম্যালেরিয়া ভরা যেন হাওয়াটা, উঠানে শিউলিফুল ফুটেছে, সম্মুখে বিস্তৃত অজানা জীবন মহাসাগর। সেই রঘুনাথজী হাবিলদারের কালো তরুণ চোখ দুটি ও শিবাজীর হাতের কম্পায়মান উন্নত বর্শা মনে পড়ে।

নবীন তাজা প্রভাতে পুজোর ঢাক বাজছিল গ্রামান্তরে ছাব্বিশ বছর আগে—ছাব্বিশ বছর আগের পাখীর দল, ফুলের গুচ্ছ আমার গ্রামের পথে পথে বনে বনে অমর হয়ে আছে।

এই যে আজ পুজোতে কহলগাঁতে ঢাক বাজে, পঁচিশ বছর আগে কি বেজেছিল ঠিক এই রকম! এই রকম হাসিভরা ছেলেমেয়ের দল...তারা কোথায় সব চলে গিয়েছে! আড়াই শত বছর পরে যারা আসবে তারা অনাগত ভবিষ্যতের সম্পদ, তাদের ভেবে মন কেমন মুগ্ধ হয়।

কয়দিন সুরেনবাবুর ওখানে রামচন্দ্রপুরে কাটিয়ে আজ হেঁটে ফিরে এলাম। কয়দিন বেলিবনে বসে বসে কি আড্ডা! কাল বৈকালে চকতোর নদীর ধারে বেড়াতে বেড়াতে কত কথা গল্প হোল। আমি, সুরেনবাবু ও মুরলীধর নদীর ধারে ঘাসে বসে অস্তগামী সূর্যের দিকে চেয়ে বর্তমান সাহিত্যের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

শেষ রাত্রে জ্যোৎস্না উঠলে রওনা হলাম। সকালে আটটার মধ্যে ভাগলপুর এসে দেখি মেজ মামা এসেছেন।

॥ ৪ঠা অক্টোবর, ভাগলপুর ॥

সুরেনবাবুর ওখান থেকে গেলাম C. M. S. School-এ। সেখান থেকে এসে নির্জনে বহুক্ষণ অন্ধকারে বসে রইলাম।

মানুষ কি ধূলায় গড়াগড়ি দিতে জন্মেছে? তার অদৃষ্ট কি তাকে শস্যক্ষেত্রে ফসলের আঁটি বাঁধতে চিরকাল চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়? তামাকের দোকানে পোদ্দারের নিক্তির সাহায্যে, মণিকারের কষ্টিপাথরের সঙ্গে সুপরিচয়ের বন্ধনে?

যে মানুষের চারধারে গহন অসীম বিস্তৃত, মাথার ওপরে শূন্যে এখানে ওখানে ক্ষণে ক্ষণে মিনিটে চার-পাঁচটা করে কত না-জানা প্রাচীন জগতের ভাঙা টুকরোর তারাবাজি ধূমভস্মে পরিণত হচ্ছে, যে শান্ত সন্ধ্যায় পাখীর গানে নদীর মর্মরে রক্ত-সূর্যের অস্ত-আভায় অনন্ত জীবনের স্বপ্ন দেখে—যে মানুষ পাথরে কাপড়ে ক্যানভাসে এত সৌন্দর্যের সৃষ্টিকর্তা, নব ধর্ম প্রচার করেছে, কত লোককে কাঁদিয়েছে, নক্ষত্রজগৎকে চিনিয়েছে, ভগবানের সত্তাকে আন্দাজ করেছে—তার অদৃষ্ট কি পৃথিবীর ধূলোর সঙ্গে সত্য সত্যই জড়িত থাকবে?

বিশ্বাস হয় না। মনে হয় কত দূর দিনে ঐ সমস্ত বিশাল নাক্ষত্রিক শূন্যের সে হবে উত্তরাধিকারী। অসীম ব্যোমপথে নব নব গ্রহতারার অজানা সৌন্দর্যের দেশে তার সে অভিযান এখন সে মনে ভাবতেও সংকুচিত হয়, তখন তা হবে নিত্য নূতন আনন্দের পুষ্পবীথি। মানুষের ভবিষ্যৎ অদ্ভুত, উজ্জ্বল, রহস্যময়, রাত্রির অন্ধকারে এই নির্জনে বসে স্পষ্ট তখন দেখতে পেলাম।

সত্যিই আর ভয় করি না, নিরানন্দ বোধ করি না। মানস-সরোবরের শতদল পদ্মের মত এই অনন্তের বোধ আমার মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে যেন। যখন নীল আকাশের দিকে চাইলেই মনে হয় আমার এ দুর্দিনের প্রবাস অনন্তের খেয়ার এপারের ঘাটে পারানির ছোট্ট কুঁড়েখানা। ঐ তো কানে আসছে উন্মত্ত গহন গম্ভীর সাগরের ক্ষুব্ধ উদাত্ত সঙ্গীত। কুঁড়ের চাল ভুলে যাই। পুঁইমাচার কথা মনে থাকে না। লাউশাকগুলো গরুতে খেয়ে ফেললে কিনা দেখবার কার মাথাব্যথা পড়েছে?

শতজন্মের পারে তাঁকে যেন আবার পাবো। কোন্ দেবতা আছেন যিনি জন্ম-মৃত্যুর নিয়ন্তা। তিনি সব দেখেন শোনেন।

কতদিন আগে এই সময়ের সেই গানটা মনে পড়ল:

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি ধাই।'

॥ ২৯শে অক্টোবর, ১৯২৭, ভাগলপুর ॥

আজ সকালে মাহেন্দ্রু ঘাট থেকে স্টীমারে হরিহরছত্র মেলা দেখতে গিয়ে কত কি দেখলাম! ভেটারিনারী হাসপাতালে জিনিসপত্র রেখে টমটমে বেরুলাম। কি ভিড়, ধুলো। সেই যে মেয়েটি ধুলোয় ধূসরিত কেশ নিয়ে বসে আছে, ভারী সুন্দর দেখতে। হাতী বাজার, উট বাজার, চিড়িয়া বাজার—কত সাহেব-মেম ধূলি-ধূসরিত হয়ে মেলা দেখে বেড়াচ্ছে। হাজিপুর থেকে, মজঃফরপুর থেকে ট্রেন সব আসছে, লোক ঝুলতে ঝুলতে আসছে বাইরে। একটা ঘোড়া কেমন নাচতে নাচতে এল। টম্‌টম্‌ওয়ালারা চীৎকার করছে—'থাক্কা বাঁচাও।' একটি মেয়ে কাঁদছে, তার স্বামী কোথায় গিয়েছে—পাত্তা পাচ্ছে না। সারন জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁবু পড়েছে।

॥ সন্ধ্যা ৭টা, ৭ই নভেম্বর, ১৯২৭, রেলওয়ে কম্পার্টমেন্ট, সোনপুর ॥

জ্যোৎস্নাভরা রাতে পুর্টলি হাতে এইমাত্র এসে পাটনায় পৌঁছানো গেল। বৈকুণ্ঠবাবুর সাজানো অফিসঘরে টেবিলটাতে বসে লিখছি। গঙ্গায় খুব বড় একটা স্টীমার, নাম মজঃফরপুর—তাতেই পার হওয়া গেল। এপারে ওপারে কি ভয়ানক ভিড়! গঙ্গার ধারে দীঘা ঘাটে ও প্যালেজা ঘাটেই এক এক মেলা বসে গিয়েছে। জ্যোৎস্নালোকিত গঙ্গাবক্ষে হু হু হাওয়ার মধ্যে যখন জাহাজ ছাড়ল তখন কল্পনা করলাম ইজিপ্ট থেকে যেন জাহাজ যাচ্ছে—ওপারে সুন্দরী ইটালীতে। মাঝের ভূমধ্যসাগরের চলোর্মি-চঞ্চল নীল বারিরাশিতে কতকাল আগেকার কত নীলনয়না কনককেশিনী সুন্দরীর ছবি যেন দেখলাম,

কত ক্লিওপেট্রা, কত হাস্যমুখী তরুণী, ইটালীর মেয়ে, গ্রীসের মেয়ে, রোমের মেয়েরা। লোকের ভিড়ে স্টীমারের ঘাটে নামা যায় না, মালগাড়ীর মধ্যে ওয়েটিং-রুম, টিকিট দেওয়ার ঘর—যেন যুদ্ধের সময়ের বন্দোবস্ত। আসবার সময় কেবলই মনে হতে লাগল—এই বিদেহ, মিথিলা। এটা ছাপরা জেলা হলেও কালকাসুন্দে গাছের একটা ছায়াভরা ঝোপ দেখে বাংলাদেশের কথা একবার একটু মনে হোল—অবশ্য ঐ পর্যন্তই মিল। এদেশের শ্যামলতাশূন্য ভূমিশ্রীর মধ্যে কি আর মরকতশ্যামশ্রীর তুলনা হয়? সেই মাকাল-লতা-দোলা বৈকালের-ছায়া-পড়া ঝোপঝাপ, নদীতীর, পাখীর ডাক, ঘন বন, লতাপাতার কটুতিক্ত সুগন্ধ বনফুলের সৌরভ। দীঘাঘাট থেকে গাড়ী ছেড়ে আসবার সময় মনে পড়ল—গিরীনদাদার মুখে শুনতাম দীঘাঘাটের ওপারে প্যালেজা ঘাট। কখনো দেখিনি। এতকাল পরে সে সাধ মিটলো। আরও মনে পড়ল, গিরীনদাদা তার পরিবারবর্গ নিয়ে বহুকাল আগে—আজ একুশ বছর আগে—এই পথে প্রথম বারাকপুর গিয়ে বাড়ী তৈরী করেন। তারপর আমাদের যে মুগ্ধ শৈশব কেটেছে, কৈশোর কেটেছে—প্রথম যৌবন, বনগ্রামের বোর্ডিং, গর্দভ উপাধি, বেচু চাটুয্যের স্ট্রীট, মনোমোহন সেনের লেন, পানিতর, কত কান্ড ঘটে গিয়েছে। এখন তিনি কি করছেন? গঙ্গায় আসতে আসতে স্টীমারে চা খেতে খেতে ভাবছিলাম বহুদূরে চাঁপাপুকুরের ঘাটটার কথা। সেই পুকুরঘাটের বাঁধা পৈঠায় এই জ্যোৎস্নালোকে এখন কি হচ্ছে? সময়ের গতি আগে থেকে কত সামনে চলে এসেছে যে! আজ এক্ষুনি আবার সেখানে যাই? সেই বাড়ী আছে, সেই পুকুরঘাট আছে, সেই ঘরদোর আছে কিন্তু সে মানুষ কৈ? পাটনা যেন হয়ে গিয়েছে বাড়ী। পাটনায় এসে বড় স্টেশনে গিয়ে বখ্তিয়ারপুরের গাড়ীর সময় জিজ্ঞাসা করে নিলাম। বৈকুণ্ঠবাবু ও তাঁর চাপরাসী প্লাটফর্মে পাঞ্জাব মেল ধরবার জন্যে দাঁড়িয়ে দেখলাম। তারপর পুঁটুলি হাতে জ্যোৎস্নাভরা রাজপথ দিয়ে হেঁটে আসতে আসতে মনে হোল কি ভবঘুরেই হয়ে পড়েছি! কোথায় বাড়ীঘর আর কোথায় সারণ জেলা, পাটনা জেলা, গয়া জেলা ক'রে কত দিন কাটলো! সেই আদিনাথ পাহাড়, আগরতলা, কুমিল্লা, উজীরপুর, সেই রাত্রে খালে বেড়ানো, ইসলামকাটি, সেই জয়পুর ডাকবাংলা—চানন নদী, শালবন। পাটনা ল প্রেসের কাছে এসে কল্পনায় আমাদের গ্রামের বাড়ীতে ফিরে গেলাম।

—ও মা—মা?

দোর খুলে গেল:—'কে, বিভূতি?'

মণি এল, জাহ্নবী এল, নুটু এল। মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কালী বাড়ী আছে?'

ওধারে নেড়াব বাবা কাশছে, বাড়ী—বাড়ী, কতদিন পরে নিজের পুরানো ভিটাতে মার কাছে গিয়েছি!

কিছুই না অবিশ্যি। ছাতিমফুলের ঘন গন্ধ বেরুচ্ছে। একটা মোটর আসবে, সবে দাঁড়ানো গেল। একটা লোক আমাকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললে, আপ কাঁহা যাইয়েগা? ভাবলে বুঝি পথ হারিয়ে গেছি। বৈকুণ্ঠবাবুর বাড়ী এসে সারাদিনের মেলার ধুলো বেশ করে ধুয়ে আরাম করে অফিসঘরের টেবিলে বসে লিখছি, কিন্তু কি বিকট মশার উৎপাত!

॥ রাত ৯টা, ৭ই নভেম্বর, ১৯২৭, পাটনা ॥

একজন পুরোনো আমলের বিদ্যার্থীর পাথর-বাঁধানো শোবার জায়গায় বসে লিখছি। কোন্ বিদ্যার্থীর সুখে-দুঃখে মণ্ডিত ছিল হাজার বছর আগেকার এই প্রাচীন দিনের কোঠাটি—এই বিদ্যার্থীর আমলটি কে জানে? কোন দেশ থেকে শেষ বিদ্যার্থী এসেছিল? কি ছিল তার ইতিহাস? কে তার বাপ-মা? তার আর কোন্ আনন্দভরা শৈশব-কাহিনী?

কোন্ দেশে কোন্ নদীর ধারের শ্যামল বন তার কৈশোরকে স্বপ্নমণ্ডিত করেছিল? কত শুভ অবসরে তার বাপমায়ের কথা ভাবতো—হয়তো তাদের তরুণী নববিবাহিতা বধূরা শতদ্রু, গঙ্গা—অজানা কোন গ্রাম্যনদীর তীরে তাদের প্রতীক্ষায় বিরহব্যাকুল হৃদয়ে দিন গুনে গুনে দেওয়ালে আঁচড় কেটে রাখতো—হাজার বছরের দুয়ার দিয়ে কতকাল আগে—সে সব ছাত্র, সে সব অধ্যাপক, তাদের বাপ-মা কোথায় স্বপ্নের মত মিলিয়ে গিয়েছে! অদূরের রাজগৃহের প্রাচীন কোন্ রাজার কোষাগার আজ অন্ধকার রুদ্ধবায়ু ভূগর্ভের কুক্ষিতে গুপ্ত,—ইট, মাটি, কাঠের স্তূপের আড়ালে সে সব দিনের কথা বসন্তের ফুলের মত ঝরে গিয়েছে। এদেরও সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহের বাঁশিও আজ হাজার বছর ধরে এই নির্জন প্রান্তরের হাওয়ায় নিঃসীম শূন্যে কানে কানে তাদের রহস্যকাহিনী গান করে এসেছে!

॥ ১১ই নভেম্বর, ১৯২৭, নালন্দা ॥

একটা প্রাচীন সাম্রাজ্যের গর্বদৃপ্ত রাজধানীর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। দুটো রাজগিরি মাটির তলে অন্ধকারে চাপা পড়ে আছে। কেবলই মনে হয়, এত প্রাচীন দিনের রথ, সৈন্য, কোলাহলভরা জয়দৃপ্ত পথ, চৈত্য, স্তূপ, কত রাজনৈতিক, কবি, সেনানায়ক, মন্ত্রী, তরুণ-তরুণী, বালক-বালিকা, শ্রেষ্ঠী, পুরোহিত যেন মাটির তলে কোথায় চাপা রয়েছে! তাদের সমাধির উপর দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছি। মহাভারতের যুগের কথা, তার ছবি—কতকাল আগে ভীম বলে যদি কেউ—কোনকালে থেকে থাকেন, তবে তিনি এসেছিলেন—সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সেই ছেলেবেলার দিনের জানালায় বসে দুপুর রোদে এই জরাসন্ধের কারাগারের কত ছবিই যে দেখেছি!

আমি বেশ মনে ভাবছি—পুরোনো সে যুগের এক তরুণ সেনানায়ক মগধের দূর প্রান্ত থেকে যুদ্ধ জয় করে ফিরে এসেছিল, তার বাড়ী ফিরে আসা, তার বিরহী মনটার তৃষ্ণা—আবার মা, বাপ, ভাই, বোন ও নববধূর সঙ্গে মিশবার যে আকাঙ্ক্ষা—হাজার হাজার বছর পরে যেন আমার মনে এসে বাজছে। ছায়ার মত, স্বপ্নের মত, তারা কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে কতকাল আগে!

পাহাড়ে পাহাড়ে জংলীবাঁশের বনে শেষ মধ্যাহ্নের ম্লান রোদের মধ্যে, বুনো পাখীর কাকলীর তানে, কতকাল আগেকার মিলিয়ে যাওয়া আশা, দুঃখ, সুখ, হর্ষপ্রেম ও স্নেহের তান করুণ হয়ে ওঠে।

এই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে ঘন জঙ্গলে বসে আছি ময়না-কাঁটা, বুনো বাঁশ, সোঁয়াকুল, কত কি বুনো গাছপালা। কি নির্জন স্থান—এই পর্বতবেষ্টিত স্থানে বোধ হয় প্রাচীন রাজগৃহ ছিল। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের ভাব ও চিন্তাদৈন্য দেখলে মনে বড় কষ্ট হয়। এত নিকটে এমন স্থান আছে—প্রাচীন বেবিলনের মত গৌরবশালী ধ্বংসস্তূপ যাব—তার কেউ একটা ভালরকম সন্ধানও দিতে পারলে না বক্তিয়ারপুর থেকে!

অনেক কাল পরে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোল। College days-এ তার মধ্যে gifts ছিল। কিন্তু interests বড় limited হয়ে গিয়েছে। তার পরে সংসারে পড়ে অর্থোপার্জন ও তুচ্ছ যশাকাঙ্ক্ষায় তার সব মন, বুদ্ধি, শক্তি ব্যয়িত হয়েছে। পঁচিশ বছর পূর্বের সে দীপ্তমুখ বালককে এই অকাল-বৃদ্ধ অপ্রসন্ন-মুখ নিস্তেজ প্রৌঢ় ভদ্রলোকের মধ্যে খুঁজে পেলাম না।

মনে বড় কষ্ট হোল। এই রকম করেই জগতে অনেক লোকের জীবন ছাইচাপা পড়ে যায়। প্রথম কারণ—কল্পনার অভাব. দ্বিতীয়—তারা দিক্‌চক্রবালের দূরসীমার প্রান্তের

সমুদ্র দিগরেখার সন্ধান পায় না, মাথার ওপরকার ছাদের কড়িবরগায় তাদের অনন্ত অনন্তের ছায়াপথকে আড়াল করে রেখেছে। জীবনে বড় আনন্দকে ধ্যানে আগে পেতে হয় এবং ধ্যান নিমগ্ন সন্ধানেই মেলে তা। হৈ-হাই বাজারের মেছোহাটার কলরবে ধ্যানকে কখনো আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে সুযোগ দেয়নি এরা। সে বেচারা সুযোগ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে তারপর কম্বল গুটিয়ে অনাফল্যের পথ বেয়ে অন্তর্হিত হয়েছে। তারপরেই আসছে সাহেবকে প্রসন্ন করে মাইনে বাড়াবার চেষ্টা। কোন ফান্দতে বেশী ব্রিফ্ যোগাড় করতে পারা যাবে সেই ভাবনা। এর ওপর মেয়ের বিয়ে তো আবশ্যি আছেই।

কেউ এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। কে খবর রাখে মগধের! আর কে খবর রাখে এই ভূমি পবিত্র হয়েছিল। সেই প্রাচীনকালে ভগবান বুদ্ধদেবের পূত চরণরেণু স্পর্শে? তারা শুধু তাড়াতাড়ি কুণ্ডে একটা ডুব দিয়ে বিষ্ণুমূর্তির পায়ে একটি ফুল ফেলে দিয়ে আহার যোগাড় করবার জন্য ছোটে। এই বিশাল পাহাড়শ্রেণী, এই নির্জন স্নিগ্ধ বনভূমি এই ভগ্নস্তূপ প্রাচীন দিনের সব চেয়ে বড় সাম্রাজ্যের রাজধানী তাদের মনে খোরাক যোগাতে পারে—তারা তার উপযুক্ত নয়।

॥ ১৪ই নভেম্বর, ১৯২৭, রাজগীর ॥

জাহ্নবী সঙ্গে ৫-৬ দিন বেশ কাটল। সময়ে সময়ে পুরোনো দিনের ছেলেবেলাকার গল্পসল্প করা যেত। রাজগৃহ বেড়াতে গেলাম, নালন্দা গেলাম—যেমন বাল্যকালে আমরা দুজনে কুঠির মাঠে, মরাগাঙের ধারে বেড়াতে যেতুম, তেমনি। বাবার মুখের গান পুরোনো সুরে বহুদিন পরে তার মুখে শুনতাম। আবার সেই সব শৈশবের আনন্দ ফিরে এসেছিল।

কাল সকালে পাটনা গিয়েই বৈকুণ্ঠবাবুর মুখে শুনলাম যে এখনই ভাগলপুর যেতে হবে। তখনই লুপ্ Express-এ রওনা হলাম। বক্তিয়ারপুর স্টেশনে ওদের মশারি ও গায়ের বোতাম ফিরিয়ে দিয়ে গেলাম। আজ সকালে ইন্সিওরেন্স-এর এজেন্ট ভদ্রলোক বলছিলেন কাল নাকি অমরবাবুর বাসা থেকে সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা গিয়েছিল। অসম্ভব নয়, কালকার দিনটা ছিল খুব ভাল। আমি কাজরা স্টেশনের বাঁকটায় এসে ট্রেন থেকে ঠিক বেলা চারটার সময় পূর্ব-উত্তর কোণে দিকচক্রবালে মির্ছারির পাহাড়ের মত শুভ্র, ঈষৎ সোনালী রং-এর একটা পর্বতশ্রেণীর মত লক্ষ্য করছিলাম বটে। হয়ত সেটা মেঘ, কিন্তু হতেও পারে হয়ত বৈকালের নির্মুক্ত আকাশে দূর থেকে হিমালয়ের তুষার-শিখরই চোখে পড়ছিল।

Hugh Walpole-এর কথাটা বড় মনে লেগেছিল সেদিনকার Englishman-এ:

**"The establishment of a contemplative order. Anyone above 50, should retire to a quite valley, free from motors and radios and spend some time in silence and contemplation—amids green woods and quietness, chirping of wild birds beneath a blue sky—if possible by the side of a running brook."**

চমৎকার কথা! জগতে এখানে ওখানে সত্যিকার মানুষেরা সব আছে, যাদের মুখে মাঝে মাঝে ভারী খাঁটি কথা সব শুনতে পাওয়া যায়।

॥ ১৬ই নভেম্বর, ১৯২৭ ॥

অমরবাবুর ওখান থেকে গল্প করে ফিরে কেদারবাবুর বাড়ীতে রামায়ণ গান শুনে বাসায় ফিরছিলাম।

পথে আসতে আসতে অনেক কালের একটা গল্প মনে পড়ল। আমার পালিসিব অধ্যাবসায়ের ঘটনাস্থল ছিল নবীন কেপ ভার্দ ব্যতীর ওদিকের এড়ো ঘরটা, এই গল্পটার ঘটনাস্থলও ছিল তাই। কোন এক জাহাজের মহাসমুদ্রের কোন অংশে জানি না অন্য সব যাত্রী, মাঝি-মাল্লাকে নামিয়ে দিয়ে জাহাজের অধ্যক্ষ অবশেষে একটিমাত্র লাইফ-বেল্ট পরতে যাচ্ছেন—এমন সময় তার চোখে পড়লো জাহাজের এক কোণে এক ক্ষুদ্র অপরিচিত বালক শীতে ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। সে একজন stowaway—লুকিয়ে জাহাজে চড়ে কোথায় যাচ্ছিল—এতদিন খাবার না পেয়ে অনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। মহানুভব পোতাধ্যক্ষ তাকে তাঁর জীবনরক্ষার শেষ উপায়টা দিয়ে মৃত্যুর জন্য নিজে প্রস্তুত হলেন এবং অল্পক্ষণেই বঞ্চাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গের গর্ভে পোতসহ নিমজ্জিত হয়ে গেলেন।

সেই কাপ্তেনের ছবিটা বেশ দেখতে পেলাম। পর্তুগালের কি স্পেনের কোন দ্রাক্ষালতার বনের ধারে বসে নীলনয়ন-বালক আপন নির্জনে দূর দেশের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতো—আটলাণ্টিক পার হয়ে অজানা দেশের ধনভাণ্ডার লুট করে তার দেশের নাবিকেরা প্রাচীন কালে দেশকে ধনশালী করে ক্ষমতাশালী করে রেখে গিয়েছে—তারও মনে মনে ইচ্ছা যে সেও একদিন সেইরকম হবে। কর্টেজ কি পিজারোর মত রাজ্য-স্থাপয়িতা দিগ্বিজয়ী বীর নাবিক। তারপর তার দরিদ্র পিতামাতার কুটীরে পোড়া রুটি খেয়ে শুয়ে রাত্রে ঘুমের ঘোরে সে দূরের স্বপ্নে আকুল হয়ে উঠতো। পিতামাতার অনেক-গুলো ছেলেমেয়ে পেট ভরে খেতে পায় না। শিক্ষার সুযোগই বা কে দেয়? একদিন স্বপ্নের সৌন্দর্যে আকুল হয়ে বালক বাড়ী থেকে পালিয়ে চলে গেল। তার কেউ খোঁজ খবর করলে না। ক্রমে সকলে ভুলে গেল তাকে।

কেবল তার মা তাকে মনে রাখলে। ধর্মমন্দিরে উপাসনার সময় সঙ্গীহীন, সেই নীলনয়ন পলাতক ছেলেটি তার ছিল নিত্য সঙ্গী। কত নির্জন রাত্রের চোখের জলে, রোগ-শয্যায় বিকারের ঘোরে তার কিশোর মূর্তি চোখে পড়েছে। মা যখন মারা গেল, ছেলে তখন স্বপ্নকে সার্থকতার মধ্যে পেয়েছে।

কত কাল চলে গিয়েছে, কত দেশের কত অদ্ভুত জীবন প্রবাহের মধ্যে দিয়ে সে বালক এখন প্রৌঢ় পোতাধ্যক্ষ। বিবাহ সে করেনি—বিশাল মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-সংগীত তার জীবনের বীণাকে চিরকাল রুদ্রতালে বাজিয়ে এসেছে। সংসারের কোন বাঁধন নেই তার। অচেনার অনন্ত পথ ছেলেবেলাকার মতই তার সামনে তবুও বিস্তৃত।

ভীত জড়সড়, ক্ষুদ্র বালককে দেখে সে মরণের রাত্রে তার নিজের দূর শৈশবের কথা মনে পড়লো। এই রকম অসহায়, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বালক ছিল সে, যখন প্রথম অজানার টানে সে বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই বালকও আজ সেরকম বেরিয়েছে, কিন্তু হতভাগ্য প্রথম বারেই যৌবনকে বিপন্ন করে বসেছে। বালকের জীবনের বিস্তৃততর সুখ আনন্দকে প্রসারলাভ করবার সুযোগ দেওয়ার জন্যে সে নিজের লাইফ-বেল্ট তখনি খুলে তাকে পরিয়ে দিয়ে বললে—'বন্ধু, তোমারই মত বয়সে আমিও বাড়ী ছেড়ে পালিয়েছিলাম, আমার জীবন তো শেষ হয়ে এসেছে—তুমি বাঁচো, ভগবান তোমায় রক্ষা করুন।'

আজ এই রাত্রে পড়াশুনার একটা অদম্য পিপাসা মনের মধ্যে অনুভব করছি। এক লাইব্রেরী বই পাই, সব বিষয়ে খুব বসে পড়ি। বিজ্ঞান কাব্য উপন্যাস—দেশবিদেশের কবিদের ও ঔপন্যাসিকদের বই পড়তে বড় ইচ্ছে করছে। জীবন বড় ক্ষণস্থায়ী। অন্য ব্যাপারে নষ্ট করে কি করবো? শুধু পিপাসা—আমার এ পড়াশুনার পিপাসা দেখছি বিকারের তৃষ্ণার মত। যত জল খাই ততই বলে, আরও জল। ততই গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

॥ ১৭ই নভেম্বর, ১৯২৭ ॥

এইমাত্র থিয়েটার দেখতে যাবো। টিকিট কিনেছি। বড় বাসার নির্জন শীত-সন্ধ্যায় গঙ্গার বুকের শেষ রোদ মিলিয়ে যাওয়া ঝিকিমিকি ছায়াভরা রোদের রেশটুকুর দিকে চেয়ে চেয়ে দূর ইছামতীর বুকের একটা অন্ধকার-ঘন তীরের কথা মনে পড়ল। ঠিক এই সময়ে—"যতবার আলো জ্বালাতে যাই—নিভে যায় বারে বারে"—সেই শীতের বিষণ্ণ প্রভাতে গানটির কথা মনে আসে। সেই সন্ধ্যা—সেই দোকান।

যাক সে কথা। আকাশের দিকে এখানে ওখানে দু'একটা নক্ষত্র জ্বলছে। দেখে মনে হোল এই পৃথিবীটুকুই কেবল জানা—তার ওপারে অনন্ত অজানা মহাসমুদ্র। কোথায় Sirius, Vega, Spiral Nebula বহির্ষদ পিতৃলোক! মরণলোকের যাত্রীদের যাতা-য়াতের বীথিপথ। অনন্ত, অজানা সেই ছেলেবেলার রাজু গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়তে যাবার সময় চারিধারের বাঁশবনে যেমন অজানা দেশ লুকিয়ে থাকতো—গুপ্তধনের দেশ, তেমনি ঠিক।

ক্লাব থেকে আভাসবাবুর সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেলাম। অমরবাবুকে দেখলাম—কথাবার্তা হোল। "ষোড়শী" বইখানা শুনেছিলাম খুব ভালো। কিন্তু একটু সন্দেহ নিয়েই গিয়েছিলাম মনে মনে। শেষ পর্যন্ত দেখলাম যে সন্দেহ করে আমি শরৎবাবুর প্রতিভার প্রতি অবিচার করেছি। বই বেশ ভাল লাগল। ওরকম নূতন ধরনের কথাবার্তা বাংলা স্টেজে বোধ হয় বেশী নেই।

পরদিন বড়-বাসার ছাদে বসে বসে সন্ধ্যাবেলা ভাবছিলাম অনেক কথা। জীবনে কত ভাল জিনিস পেয়েছি সে কথা—আগাগোড়া ভেবে দেখলাম। কি গ্রামেই জন্মেছিলাম! এই তো আরা জেলা, ছাপরা জেলা ঘুরে এলাম। কোথায় সেই পরিপূর্ণ, সুন্দর, স্নিগ্ধ শ্যামলতা, সেই বাঁশবন ঝোপঝাপ! বড় ভালবাসি তাদের, বড় ভালবাসি। কেউ জানে না কত ভালবাসি আমি আমার গ্রামকে—আমার ইছামতী নদীকে, আমার বাঁশবন, শেওড়া ঝোপ, সোঁদালিফুল ছাতিমফুল বাবলা বনকে। সে ছায়া, সে স্নিগ্ধস্নেহ, আমার গ্রামের সে সব অপরাহ্ণ—আমার জীবনের চিরসম্পদ হয়ে আছে যে।...তারাই যে আমার ঐশ্বর্য। অন্য ঐশ্বর্যকে তাদের কাছে যে তৃণের মত গণ্য করি।

এই শীতের অপরাহ্ণ, রাঙা রোদ যখন বাবলা বনে লেগে থাকে তখন শৈশবে কত-দিন শ্যামছায়া ঘনিয়ে আসা ইছামতীর তীরে নির্জনে বসে বর্ষার ভাঙনে শিমুলতলার দিকে চেয়ে জীবনের মরণের পারের এক রহস্যময় অজানা অনন্তলোকের স্বপ্ন আবছায়া ভাবে মনে আসতো—কতদিন চেয়ে থাকতাম শিমুলতলার নীচে, লক্ষ্মণ জেলের শাশুড়ি ক্ষুদে গোয়ালা যখন মারা গেল, তাদের পোড়ানোর জায়গার দিকে—কেমন যেন উদাস ভাব, দিগন্তবিস্তৃত মাধবপুরের উলুখড়ের মাঠটার বহুদূর পার থেকে কে যেন হাতছানি দিত।

তারপর সত্যি সত্যি কত ভাল জিনিসই পেলাম। গৌরী, সেই বনগাঁয়ের গাড়ীতে বসা, সেই বেলেঘাটা ব্রিজ স্টেশনে আমাদের প্রথম ও শেষ ঘরকন্না, সেই আয়না বার করে দেওয়া, সেই চিঠি বুকে করে মাথায়-কপালে ঠেকানোর কথা মনে হয়ে পুলক হয়।

তারপর চাটগাঁয়ের সুন্দর দিনগুলো—মণি! ফরিদপুরের সত্যবাবুদের বাড়ী! তারপর সুন্দর জীবনের Period চললো। সেই নয় বৎসরের ক্ষুদ্র বালককে কি ভালই বাসি! তার সেই মামা জুতো মেরেছে বলে কান্না, সেই মক্কামদিনায় যাওয়া বালিশ, সেই "শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি"!

এ সব চলে যাবে জানি। আবার নূতন আসবে জীবনে। আরও কত—কত আসবে এও ঠিক, একদিন সব বন্ধ হয়ে যাবে। একদিন স্নিগ্ধ অপরাহ্ণে বাবলা বনের ছায়ায়, ইছামতীর তীরের বনঝোপের বিহঙ্গতানের মধ্যে নীরব শান্তির কোলে এ জীবনের

দেওয়া-নেওয়া সব শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কি? মানুষ অনন্তের যাত্রী। তার পথ ঐ দূরে ক্ষীণ নক্ষত্রের পাশ কাটিয়ে দূর কোন অনন্ত লোকে, অনন্ত কালের পথিক যাত্রী সে—তার যাওয়া-আসা কি ফুরোবে হঠাৎ?

আমি এই যাওয়া-আসা স্বপ্নে ভোর হয়ে বড় আনন্দ পাই। আবার যে আসতে হবে তারপর, তাও আমি জানি। হয়ত একবার এসেছিলাম দূর কোন ঐতিহাসিক যুগে—হয়ত রোমের দ্রাক্ষালতার কুঞ্জের আড়ালে ভূমধ্যসাগরের নীলজলের তীরের কোন সম্ভ্রান্ত ধনীর প্রাসাদে। হয়ত প্রাচীন গ্রীসের গৌরবের দিনে গ্রীকবীর হয়ে জন্ম নিয়েছিলাম, আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলে ঢাল তলোয়ার ধনুক নিয়ে যুদ্ধ করেছি—নয়তো কোন পাহাড়ের ছায়ায় বসে এই রকম স্বপ্ন দেখতাম—নয়তো ইংলণ্ডে কি ফ্রান্সে কোন অবজ্ঞাত গ্রামে কৃষকবালক হয়ে জন্মেছিলাম--এল্‌ম কি ওক গাছের নীচে বসে বসে ভেড়া চরাতাম—কে জানে?

আবার বহুদূরের জন্মান্তরে হয়ত ফিরতে হবে। পাঁচশো বছর পরের সূর্যের আলোকে একদিন অসহায় অবোধ শিশু নয়ন দুটি মেলবো। পাঁচশো বছর পরের পাখীর গান, ফুলবন, জ্যোৎস্না আবার আমাকে অভ্যর্থনা করে নেবে। কোন অজানা দেশের অজানা পর্ণকুটীরে কোন অজ্ঞাত দেশের অজ্ঞাত ছায়াঝোপের তলে মাঠে বনে মুগ্ধ শৈশব কাটাব—অনাগত মা-বাপের স্নেহসুধায় মানুষ হব। পাঁচশো বছর পরের অনাগত কত বালক-বালিকা তরুণ-তরুণী, কত সুখ-দুঃখ-আশা-নিরাশা, লোকের সঙ্গে সে কত পুলকভরা পরিচয়!

কেবলই মনে হয় সৃষ্টির যিনি দেবতা, এত দয়া তাঁর কেন? এই অনন্তের সুধা-উৎস মানুষের জন্যে তিনি কতকাল থেকে খুলেছেন? এই অন্ধকারে তবু হাত জোড় করে তাঁকে ধন্যবাদ দিই।

॥ ১৮ই নভেম্বর, ১৯২৭ ॥

মানুষের সত্যিকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড় বড় ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধবিগ্রহের ঝঞ্জনায়, সম্রাট্ সম্রাজ্ঞী সেনাপতি মন্ত্রীদের সোনালী পোশাকের জাঁক-জমকে—দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলে গিয়েছেন। পথের ধারে আমগাছে তাদের পুঁটুলি-বাঁধা ছাতু কবে ফুরিয়ে গেল, কবে তার শিশুপুত্র প্রথম পাখী দেখে সানন্দে মুগ্ধ হয়ে ডাগর শিশুচোখে চেয়েছিল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট থেকে ঘোড়া কিনে এনে পল্লীর মধ্যবিত্ত ছেলে তার মায়ের মনে কোথায় ঢেউ বইয়েছিল। দু হাজার বছরের ইতিহাসে সে সব কথা লেখা নেই--থাকলেও বড় কম। রাজা যযাতি কি সম্রাট মেণ্টুহোটেপ, জুলিয়াস সীজার, থিয়োডোসিয়াস এবং তাবৎ সম্রাট্ পরিবারের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প আমরা শৈশব থেকে মুখস্থ করে এসেছি। কিন্তু গ্রীসের ও রোমের যব ও আমের ক্ষেতের ধারে ওলিভ্ বন্যদ্রাক্ষার ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে দৈনন্দিন জীবন হাজার হাজার বছর ধরে সকাল-সন্ধ্যা যাপিত হয়েছে—তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার গল্প, তাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস আমি জানতে চাই। হোমার ভার্জিলের কবিতা প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠত কিনা এদের তুচ্ছ কথা আমি জানি না, কিন্তু উত্তরপুরুষদের কৌতূহল, স্নেহ ও সম্মানের অধিকারী হোত তারা একথা ঠিক।

কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদের পাতায় সম্মিলিত সৈন্যব্যূহের ফাঁকে পড়ে যায়, সারিবাঁধা বর্শার অরণ্যের ভিতর দিয়ে দূরের এক ভদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ী নজরে আসে, অজ্ঞাত কোন লেখকের জীবন-কথা, কি কালের স্রোতে কূল-লাগা একটুকরা পাত্র, প্রাচীন ইজিপ্টের কোন কৃষক শস্য কাটবার জন্য তার পুত্রকে কি আয়োজন

করবার কথা বলেছিল—বহু হাজার বছর পর তাদের টুকরো ভাঙা ফাটা মাটির-তলায়-চাপা-পড়া মৃন্ময় পাত্রের মত পুরাতত্ত্বের কৌতূহলী পাঠকের চোখে পড়ে। তারপর কল্পনা—আর কল্পনা!

প্রস্ফুট সর্ষেক্ষেতের সুগন্ধের মধ্যে বসে প্রভাতের নীল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে আবার সেই দূরকালের পূর্বপুরুষদের কথা ভাবি।

বর্তমানে একদল লেখক উঠেছেন, যাঁরা ইতিহাসের এই ফাঁক পূর্ণ করবেন। তাঁরা ছোট-গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, জীবন-চরিত লেখকের মধ্যে যাঁরা খুব সূক্ষ্ম দ্রষ্টা তাঁরা—দিনলিপি-লেখক—এ'দের দল। চেকফ, এইচ. জি. ওয়েলস্, গোর্কি, ব্রেট হার্ট, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, শৈলজা মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র—এ'দের লেখা ভবিষ্যৎ যুগের পুস্তকাগারে দেশের ও জাতির সামাজিক ইতিহাসের তালিকার মধ্যে স্থান পাবে—খুব সূক্ষ্ম খাঁটি বিস্তৃত এবং অত্যন্ত পাকা দলিল হিসাবে এদের মূল্য হবে। রোমান্স লেখকগণও সম্পূর্ণ বাদ পড়ে যাবেন না—তাঁদের কল্পনার উল্লাসে, আবেগে অনেক সময় জীবনের সূক্ষ্ম দর্পণকে মাঝে মাঝে হারিয়ে ফেলেন বটে, কিন্তু তবুও স্কটের লেখা থেকে মধ্যযুগের ইউরোপের সম্বন্ধে যা জানতে পারি, কোন্ ঐতিহাসিক অতটা আলো সে সময়কার সমাজ, চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রা প্রণালীর উপর ফেলতে পেরেছেন?

কিন্তু আরও সূক্ষ্ম আরও তুচ্ছ জিনিসের ইতিহাস চাই। আজকার তুচ্ছতা হাজার বছর পরের মহাসম্পদ। মানুষ মানুষের বুকের কথা শুনতে চায়। কোটী কোটী মানুষ প্রলয়স্রোতে ভাসছে, ভবিষ্যতের সত্যিকার ইতিহাস হবে এই কাহিনী, মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস। কাবুল যুদ্ধ কি করে জয় করা হয়েছিল, সে সবের চেয়েও খাঁটি ইতিহাস।

এই যুগ-যুগ-ব্যাপী বিশাল মানবজাতি—শুধু তাও নয়—এই বিশাল জীবজগৎ—কোন্ মহাঔপন্যাসিকের কলমের আগায় বেরুনো উপন্যাস! অধ্যায়ে অধ্যায়ে ভাগ করা আছে। মহাসমুদ্রগর্ভে বিলীন কোন্ বিস্মৃত যুগের আটলান্টিস্ জাতির বিস্মৃত কাহিনীও যেমন এর কোন অধ্যায়ের বিষয়ীভূত ঘটনা, তেমনি আজ মাঠের ধারে বন্য-শৃগালের নখদন্তে নিহত নিরীহ ছাগশিশুর মৃত্যুতে যে বিয়োগান্ত ঘটনার পরিসমাপ্তি হোল তাও এর এক অধ্যায়ের কথা। ঐ যে কচুঝাড় বাঁশবনের আওতায় শীর্ণ হয়ে হলদে হয়ে আসছে—ওর কথাও।

কিন্তু এ উপন্যাস মানুষের পাঠের জন্যে নয়। মানুষ শুধু মাটি-পাথর খুঁড়ে, ওতে তাতে জোড়াতালি দিয়ে, দস্যুবৃত্তি করে লুকিয়ে-চুরিয়ে এর এক-আধ অধ্যায় চাবি-আঁটা পেঁটরা থেকে দিনের আলোয় এনে পড়ছে—সব বুঝতেও পাচ্ছে না।

॥ ৩০শে নভেম্বর, ১৯২৭, ইসমাইলপুর ॥

সন্ধ্যার আগে লাখপতি মণ্ডলের টোলার পিছনের কুণ্ডীটা পার হয়ে ঘোড়া কাশ-জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খুব ছুটিয়ে রামজোতের পুরনো বাগান দিয়ে নীচের কুণ্ডীটাতে গেলাম। লাখপতিদের টোলার মাথার উপরে রাঙা টকটকে লাল সূর্যটা অস্ত যাচ্ছে। শীতের সন্ধ্যায় কাশজঙ্গলের ধারে ধারে কেমন সোঁদা সোঁদা ঠাণ্ডা গন্ধ। কুণ্ডীটার ধার দিয়ে খুব জোর করে ঘোড়া ছুটিয়ে কুণ্ডী পার হয়ে সামনের যে কুণ্ডীটা, যেটার ধারে সেদিন লাল হাঁস বসেছিল—আমি যেতে যেতেই উড়ে গেল,—মারতে পারিনি—সেই কুণ্ডীটার ধারে গেলাম। পাখী কোথাও কিছু নেই। দূরপ্রসারী ঈষৎ অন্ধকার কাশজঙ্গলের মাথার উপর তাকিয়ে ভাবছিলাম—নয় বছর আগে ঠিক এমনি দিনগুলোতে বারাকপুরের বাড়ীতে সেই হরি রায়ের বাড়ীতে বসা—হরিপদদা—সেই শোকের দিনগুলো আজ কোথায়

কি হয়ে গিয়েছে!

জঙ্গলের পাশ দিয়ে দেখলাম দুটি হাঁস জলে সাঁতার দিচ্ছে কিন্তু বন্দুকটা আনিনি। কতকগুলি Snipe-ও ছিল, এদেশে বলে চাহা—বন্দুক থাকলে সুবিধা হোত।

তারপর খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে এলাম।

আজকাল ঠিক দুপুরে সন্ধ্যার আগে একবার করে বসি কাছারীর পেছনের কাশ-জঙ্গলের ধারে সর্ষেক্ষেতের পাশে। প্রস্ফুট সর্ষেক্ষেতের গন্ধে সেই ছেলেবেলার বড়দিনের বন্ধে বনগাঁ থেকে বাড়ী আসার কথা মনে পড়ে। বড় আনন্দ হয় এই মাটি, এই আধ-শুকনো, আধ-সবুজ কাশবনের স্নিগ্ধ ছায়া, তারই ধারে এই হলুদ রং-এর গন্ধে ভরপুর সর্ষেক্ষেত, এই নির্জনতা—একেবারে মাটির মায়ের কোলে বসে থাকা। এই আকাশ—আমার জানলা দিয়ে রোজ সন্ধ্যায় দেখতে পাওয়া, দূর পূব আকাশের orion-এর pointer-টা বড় মুগ্ধ করে দেয় আমাকে। আকাশের নক্ষত্রের দিকে চেয়ে নির্জন কাশবনের রহস্য আমার প্রাণে এসে লাগে। জীবনটা কী? কি গহন গভীর গোপনতা—কি যাওয়া-আসার গতিচ্ছন্দ!

কাল সন্ধ্যায় টেবিলটায় বসে লিখতে লিখতে দূর পূব আকাশের একটা নক্ষত্রের দিকে চেয়ে ভাবলাম—ঐ সব নক্ষত্রের বা তার পার্শের গ্রহের অজানা জীবনযাত্রা, আমাদের কাছে একেবারে গোপনতায় ঢাকা। কে জানে ওর মধ্যে কি প্রাণীদল, কি জীবনের গতি! এই আমি যে অত্যন্ত বাস্তব জীব এই টেবিলে বসে লিখছি—আর ঐ জ্বলজ্বলে তারাটার মধ্যে অনন্ত মহাশূন্যের ব্যবধান—কোনকালেই এ ব্যবধান পৃথিবীর জীবন ঘোচাতে পারবে না বোধ হয়। কে জানে ওদের জগতে কিরকম জীবনযাত্রা? গভীর রাত্রে রামচরিত যখন আমার ঘরে ঘুমিয়ে পড়ে, তখন বাইরে উঠে নির্জন বন-মাঠের ওপরকার নক্ষত্রভরা আকাশের দিকে চেয়ে থাকি। বহু দূরপারের গভীর কোন্ গহন রহস্য ধীরে ধীরে আমার মনে নেমে আসে—সে বলা যায় না, লেখা যায় না। জীবনের গভীর মুহূর্ত সে সব—কেবল তা মনে এই সত্য আনে যে জীবন ঐ দূর ছায়াপথের মত দূরবিসর্পিত। এটুকু শেষ নয়, এখানে আরম্ভও নয়—সুদূর কোথা থেকে এসে সুদূরের কোন্ পারের দিকে তার ডিঙ্গার মুখ ফিরানো।

প্রাণের মধ্যে এই অনুভূতিটুকু যেন সকলের সত্য হয়ে ওঠে।

॥ ২রা ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

গভীর রাত্রে নির্জন কাশবনের মধ্যের কাছারী ঘরে শুয়ে শুয়ে গিবন পড়ছিলাম। কত রাজা রাণী সম্রাট মন্ত্রী খোজা সেনাপতি, কত সুন্দরী তরুণী বালক যুবার আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বের কাহিনী। কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, উত্থান-পতন, কত অত্যাচার-উৎপীড়ন, হত্যা, পরের জন্যে কত প্রাণ দেওয়া—অতীতের ছায়ামূর্তিরা আবার গিবনের পাতায় ফিরে এল। হাজার যুগ আগের কত অশ্রুনয়না নিষ্কলঙ্কা তরুণী, কত আশাভরা বুক নিয়ে কত মা-বাপ কোথায় সব চলে গিয়েছে! অনন্ত কাল-মহাসমুদ্রে কোন অতীতকালে ছায়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে—কবে—কোথায়! এই গভীর রাত্রে তারা ফিরে এল।

পড়ছিলাম গিল্ডো, রুফাইনাস, খোজা ইউট্রোপিয়াসের অর্থলিপ্সার কথা, অর্থের জন্য তারা কি না করেছিল! বিশ্বস্ত বন্ধুর গুপ্ত কথা প্রকাশ করে তাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে দিতে দ্বিধা করেনি, নানা ষড়যন্ত্র, নানা বিশ্বাসঘাতকতা—কোথায় তাদের অর্থের সার্থকতা—কোথায় তাদের সে বৃথা শ্রমের পুরস্কার?

এই দেড় হাজার বছর পরে দাঁড়িয়ে এদের সে মূর্খতা দেখে আমি ইতিহাসের পাঠক—আমাকে করুণা প্রকাশ করবার জন্যেই কি রুফাইনাস কাউন্ট জনকে অত করে নির্দয়ভাবে

উৎপীড়ন করেছিল! সে করুণা কাউন্ট জনের জন্য নয়, উৎপীড়ক রুফাইলাস ও তার ধন-লিপ্সার জন্যে। কারণ আমি জানি তার পরিণাম।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গিবন ভ্রমশূন্যে লিখেছিলেন কি বিউরি ঠিক লিখে-ছিলেন—সে বিষয়ে আমি তত কৌতূহল দেখাচ্ছি না—আমি শুধু কৌতূহলাক্রান্ত এই মহাকালের মিছিলে। এই সম্রাট-সম্রাজ্ঞী, খোজা ভৃত্য সৈন্য সেনাপতি—তৃণের মত স্রোতের মুখে ভেসে যাওয়ার দিকটা আমায় মুগ্ধ করে।

দু হাজার বছর আগের সে সব মানুষের মত—তাদের ইতিহাস-লেখকও ছায়া হয়ে গিয়েছেন। ইংলন্ডের কোন্ প্রাচীন সমাধিক্ষেত্রে জীর্ণ তার সমাধি দীর্ঘ তৃণে আচ্ছন্ন হয়ে আছে জানি না। আর একশত বছর পরে এই আমিও স্বপ্ন হয়ে যাবো।

সন্ধ্যায় শান্ত বাঁশবনে, দেবদারু পাতার মাথায় রাঙা রোদে, বৈকালের ম্লান আলোয়, মাঠের ধারের কাশবনে, নদীর ধারে আমি কতদিন এই গতিচ্ছন্দের সত্যকে মনে মনে চিনেছি। এর স্বপ্ন আমাকে বড় মুগ্ধ করে।

হাজার যুগ আগের এই ঐতিহাসিক ছায়ামূর্তিদের মত সব মিলিয়ে স্বপ্ন হয়ে যাবে। যা কিছু বর্তমান, সব। এই অপূর্ব গতিভঙ্গি, মহাকালের এই তান্ডব নৃত্য-ছন্দ যুগ যুগ ধরে রাজা, মহারাজা, সাম্রাজ্য—এ কাহিনীকে উড়িয়ে ফেলে দিয়ে আপন মনে কোন্ বিশাল অন্তরের মৃদঙ্গের গম্ভীর বোলের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে—দিকে দিকে, যুগে যুগে, ইউট্রোপিয়াস, গিল্ডো, রুফাইলাসের দল ও তাদের কড়ির পুঁটুলি ফেনার ফুলের মত মিলিয়ে যাচ্ছে—জাতি, মহাদেশ মথিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর বিবাট চরণ-পেষণে। মহাশূন্যে তাঁর মহাবিষাণ শুধু অনন্তকাল ধরে এই চলে যাওয়ার উদাস ভেরীধ্বনি বাজাচ্ছে... অনাহত শব্দের মত তা সাধারণ মানুষের শক্তির বাইরে।

সে ধ্বনি সম্রাজ্ঞী ইউডক্সিয়া শোনেননি। শুনেছিলেন সাধু জন্ ক্রাইসোটিন্। তাই তুচ্ছ বিষয়লিপ্সা ফেলে দিয়ে দূর সিরিয় মরুভূমির নির্জন পাহাড়ের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে তিনি ধ্যানজীবন যাপন করতেন। সান্ধ্য সূর্যচ্ছটায় সিরিয় মরুভূমির বালু-রাশিতে সাধু জন্ এই গতিলীলার স্বপ্ন দেখেছিলেন নিশ্চয়ই।

॥ রাত্রি বারোটা, ৬ই ডিসেম্বর ১৯২৭, ইসমাইলপুর ॥

সন্ধ্যার পর আমার নিজের ঘোড়াটায় চড়লাম। প্রথমে ঘোড়াটায় চড়ে বেরুতেই সেটা বড় বদমায়েশী শুরু করে দিল। রামজোতের বাসার চালের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রায় ঠেসে ধরেছিল আর কি! বেগতিক বুঝে অন্য কোনদিকে না গিয়ে বাঙ্গালী ধাপের দিকে গেলাম। সেখানে কারা মাছ ধরছে। অনেক পাখী বসে আছে, কিন্তু কয়দিনই উপরি উপরি পাখী মারতে গিয়ে অকৃতকার্য হওয়ার দরুণ শিকারে আর স্পৃহা নেই। বাংলা ধাপের ওপারের জঙ্গলের মাথায় সূর্য অস্ত গেল—দিয়ারায় সূর্য-অস্ত একটা দেখবার জিনিস—কি রাঙা টক্‌টকে আগুন রং-এর সোনা! সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে—জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে দিলবরের টোলায় বার্সাবিরিদের বাসা পার হয়ে চললাম। বম্না মন্ডলের টোলা যেতে যেতে বেশ জ্যোৎস্না উঠলো। লোধাইটোলায় যখন গিয়েছি. তখন তারা আগুন পোয়াতে বসেছে। তারপরই নির্জন জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ঢোকালাম। ঘন জঙ্গলে ভাল করে জ্যোৎস্না ঢোকেনি, খাটো খাটো বনঝাউ গাছগুলো শিশিরে ভিজে গিয়েছে। জঙ্গল ক্রমে ঘনতর হোল, পথ শেষ হয়ে এল। আগে আর-বছর যেখানে রাঁইচি-খামার লুট হয়েছিল, সেই-দিকে ঘোড়া নিয়ে চলা গেল। অবশ্য একটু একটু ভয় হয়েছিল। বনে শুয়র বাঘের ভয় খুব। কাল অনেক রাত্রে ফেউ ডাকছিল। ভয়কে জয় করবার জন্যে জিদ্ করেই আরও ঘন নির্জন বনে ঘোড়া ঢুকিয়ে দিলাম। পরে অনেকটা গিয়ে ঘোড়া ফিরিয়ে আনলাম।

দূরে পূর্বদিকে চেয়ে মনে হোল আমাদের বাড়ীর নির্জন ভিটায় বাঁশবনের ফাঁক দিয়ে একটু একটু জ্যোৎস্না পড়েছে—এই শীতকালে কবে দোলাই গায়ে দিয়ে শৈশবে পাটালি চালভাজা খাবার লোভে তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে এসেছি। তারপর লোধাইটোলা ছেড়ে সোজা পথটায় ঘোড়া ছুটলো। চতুর্দশীর মাঠভরা ধপধপে জ্যোৎস্না, নির্জন মেঠো পথ—হু হু করে ঘোড়া ছেড়ে একেবারে বন্না মণ্ডলের টোলার কাছটায় এসে পড়লাম। মনে পড়লো ১৯১৮ সালের এই সময় এই দিনগুলোতে হরিপদদার সঙ্গে দাবা খেলে সকাল বিকাল কি করেই কাটাতাম। পাশের মাঠটায় অনেক লাল হাঁস (চক্রবাক্) কাল সন্ধ্যায় বসেছিল। রামচরিতের সঙ্গে মারতে এসেছিলাম, কিন্তু গুলি করতেই সব পালিয়ে গিয়েছিল। জ্যোৎস্নার মধ্যে দিয়ে শুধুই ঘোরা হোল। ইউনিভার্সিটির সিল্কের চাদর ওড়ানো মেয়েলী কলকাতার ছেলের সঙ্গে ও এই ইংরাজ explorer যুবকদের কি তফাৎ!

ঐ রকম হওয়া চাই—দুর্ধর্ষ, দুঃসাহসিক ঘোড়সওয়ার। বনেজঙ্গলে মেরুপ্রদেশের তুষারভূমিতে কাটিয়ে এসেছে—কতবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে—ভয় নেই। অথচ স্রষ্টা—out of chaos he has created something, ভগবানের তেজ, যৌবনদীপ্তি, জ্ঞান। অথচ কলকাতায় যখন ক্লাবে গিয়ে বসবে তখন শৌখীন খুব। সেও সিল্কের চাদর ওড়াবে, বেয়ারার হাতে কোকো বা কফি খাবে।

আজ সতীশের পত্র পেয়েছি বহুদিন পরে। সে দরজীর কাজ শিখতে কোন্ স্কুলে পড়ছে—কিছু সাহায্য চায়। কতকালের কথা—সেই জাঙ্গিপাড়া—সেই ঠিক এই সময়ে জাঙ্গিপাড়া রেলস্টেশনের মধ্যে রাখালবাবুর সঙ্গে বসে গল্প করা, সেই ত্রিপুরাবাবু, বুড়ো চক্রবর্তী মশায় চাল-কড়াই ভেজে আনতেন—সতীশ দুধ জ্বাল দিয়ে নিয়ে আসতো, আর রুটি করে নিয়ে আসতো। সেই একদিনের ছুটিতে কোথাও না গিয়ে জাঙ্গিপাড়াতেই কাটানো গেল। লাইনের ধারে চেয়ারে বসে তেল মাখলাম—সে এক জীবন কেটেছে।

মনের কোথায় যেন অদৃশ্য খোপে গত জীবনের স্মৃতি সব ঠাসা আছে,—পিয়ানোর চাবিতে হাত-পড়ার মত দৈবাৎ কোন পুরোনো খোপে হাত পড়ে যায়—হঠাৎ সেটা বড় পরিচিত সুরে বেজে ওঠে—অনেক কালের আগের একটা দিন অল্পক্ষণের জন্য বর্ণে গন্ধে রূপে রসে আবার ফিরে আসে। এই রকম এল কাল—হঠাৎ অনেককাল আগে রংপুর থেকে ফিরে আসার পথে রাণাঘাট এসে অমৃতকাকার সঙ্গে যে রাণাঘাট Exhibition দেখতে গিয়েছিলাম, খামোকা সেই দিনটার কথাই মনে পড়ে গেল। সেই "সাজাহান" থিয়েটার হবে অত্যন্ত জাঁকজমকের সঙ্গে তার বিজ্ঞাপন—সেই চানাচুর ভাজা কিনে খাওয়া—সেই বাবার পাতানো মায়ের বাড়ী যাওয়া—স্পষ্ট ভাবে সব কথা মনে এল।

আজ আর একটা আজগুবী কথা মনে এল। হঠাৎ কলকাতায় গিয়ে প্রসন্নদের বাড়ীটা কি মদনমোহন ঠাকুরের বাড়ীর সামনে সেই শৈশবের মাঠগুদামটা ভাড়া নিয়ে বাস করা যায়? করবো নাকি? পঁচিশ বছর পরে আবার যদি সেই পঁচিশ বছর আগের দিনগুলো ফিরে আসে তবে তো!

॥ ৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

কাল রাত্রে সর্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ ছিল। অনেক রাত পর্যন্ত আমি গোষ্ঠবাবু দূরবীন দিয়ে চাঁদ দেখলাম। খুব যখন অন্ধকার হয়ে গেল তখন গিয়ে শুয়ে পড়ি। আজ সকালে উঠে প্রথমে জিনিসপত্র রওনা করে দিলাম। পরে খাওয়ার পরে ঘোড়া করে রওনা হলাম, মিত্র সঙ্গে সঙ্গে এল। লোধা মণ্ডলের টোলা ছাড়িয়ে এসে কাদা ততটা নেই, সেদিন অনাদিবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার দিন যতটা ছিল—পরে এসে পরশুরামপুর ঘাটে পৌঁছুনো গেল। কাছারীটা চিনতাম না—অড়হরের ক্ষেত বেয়ে বেয়ে এসে কাছারী

পৌঁছানো গেল। গত বৎসর মোহিনীবাবু ধামশ্রেণী গিয়েছিলেন—সেই ধামশ্রেণী। শৈশবের কত স্মৃতি মাখানো! জিজ্ঞাসা করলাম, রাণী সত্যবতীর ঠাকুরবাড়ীতে আজকাল রাত্রে সে রকম ভোগ হয় কিনা—সেই মজাপুকুরটা আছে কিনা! সেখান থেকে ঘোড়া ছেড়ে কারু মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে আসতে আসতে কলবলিয়ার ধারের পথ বেয়ে দেখি বনোয়ারী পাটোয়ারী আজমাবাদ চলেছে। তারই হাতে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বড় খামখানা দিয়ে দিলাম। কলবলিয়ার পথ বেয়ে বেয়ে কখনো জোরে কখনো আস্তে ঘোড়া ছুটিয়ে ভগবানদাস-টোলার মধ্যে এলাম। পাছে পথ ভুলে যাই, এইজন্য সব সময়ে ডান দিকে বটেশ্বরনাথের পাহাড়টার দিকে নজর রাখছিলাম। সে টোলা ছাড়িয়ে সোজা কলবলিয়ার ধারে ধারে ঘোড়া ছুটিয়ে এলাম। কলাই ক্ষেতে ক্ষেতে তিনটাঙার প্রজারা কলাই তুলছে। একটা বাবলা বন পেরিয়ে একটা সুন্দর পথে এলাম। বামদিকে পথের ছায়াঝোপ, কি সব ফুল ফুটে আছে, বেশ ছায়া পড়েছে—সেইদিকটা কিছুক্ষণ ধীরে ধীরে ঘোড়া করে এলাম, পরেই আবার একটা উলুখড়ের মাঠের ভেতর দিয়ে ঘোড়া খুব জোরে ছুটিয়ে দিয়ে সামনে দেখি কুতরুটোলা। তারপরই পরিচিত সহদেব সিং-এর বাসার পাশ দিয়ে লছমন মণ্ডলের টোলার অড়হর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে সোজা চলে এলাম কাছারী। পথে পথে উৎসব-বেশে সজ্জিতা নরনারী চন্দ্রগ্রহণের মেলা দেখে গল্প-গুজব করতে করতে কোশকীপুর অঞ্চলে ফিরে যাচ্ছে। এ যেন বহু দূর থেকে অজানা পথ বেয়ে মোটরে কি এরোপ্লেনে করে নিজে পথ চিনে চিনে কখনো ধীরে কখনো জোরে এঞ্জিন চালিয়ে চলে এলাম--পথে পাহাড়, নদী, অজানা বনজঙ্গল, বেশ লাগল আজকার দিনটায়।

সন্ধ্যার সময় বসে আরাম চেয়ারটায় ঠেস্ দিয়ে অনেক কথা ভাবছিলাম। এই চেয়ারটা যেদিন থেকে তৈরী হয়েছে--ভ্রমণ শুরু হয়েছে সেদিন থেকে। সেই সত্যবাবুর বাড়ীর দেউড়িতে সন্ধ্যার সময় গিয়ে চেয়ারটা নিয়ে নামলাম—সেই ঢোকে ঢোকে জল খেয়ে তৃপ্ত হলাম--পরদিন থেকে যাত্রা শুরু হোল। মহারাণী স্বর্ণময়ী রোড, ৪৫ মীর্জাপুর স্ট্রীট। সেই ফরিদপুরে সত্যবাবুর বাড়ী, গোয়ালন্দর স্টীমারে মাদারিপুর, বরিশালে অনাদিবাবুর বাড়ী, চাটগাঁয়ের স্টীমার, কক্সবাজারের স্টীমারের ডেকে, সীতাকুণ্ডে, নরসিংদিতে, জ্যোতির্ময়ের ওখানে ঢাকায়—আবার ৪৫, মীর্জাপুর স্ট্রীটে। বড়-বাসায়, ইসমাইলপুরে,--কত জায়গায়। এই তো সেদিন কানিবেনের জঙ্গল হয়ে, জামদহ, জয়পুরের ডাকবাংলায় শালবনের মধ্যে নির্জন রাত্রি যাপন করে গেলাম দেওঘর। তারপর গেলাম রামচন্দ্রপুরে, বেণুবনে, বক্রতোয়ার ধারে ধারে, লক্ গেটে সূর্যাস্তের সময় কত বেড়ালাম। এই তো গেলাম পাটনা--শোণপুরে মেলা দেখলাম। জ্যোৎস্নারাত্রিতে প্যালেজা ঘাটে স্টীমারে বসে চা খেতে খেতে গঙ্গা পার হয়ে পাটনায় বৈকুণ্ঠবাবুর ওখানে ফিরে এলাম। হাসান ইমামের যে নতুন বাড়ীটা উঠছে তারই কাছে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কথা ভাবা, তারপর সেই কালীর সঙ্গে নালন্দা, সেই রাজগীর যাওয়া, সেই বাঁশের বন, শোনভাণ্ডার, সেই চেনো, হরনৌৎ, শো--অদ্ভুত নামের স্টেশন সব—সেই গড়িয়ার জলায় জ্যোৎস্না দেখতে দেখতে সাড়ে আটটার গাড়ীতে রাজপুর ফেরা, সেই জাঙ্গিপাড়াকে ভাবতাম কতদূরের দেশটা! কতদিন পরে আজ মনে হোল সেই তারামোহনের পুরোনো বাড়ীটার কাছ দিয়ে পথ বেয়ে কাদের বাড়ী গিয়েছিলাম—সেই কলকাতায় হাওড়ার পুলের কাছে অন্ধ ভিখারিণীকে রাত্রিতে জিজ্ঞাসা করা---

এই অনবরত ভ্রাম্যমাণ জীবন। ঘুরতে হবেই যে—পথে যে নেমেছি—এই যে এখন তহশীলদার খবর দিলে বংবার লোক লালকিষণ সিংকে মেরেছে--এদেশের এই এখন খুনকার --আমাদের গ্রামেও হয়ত এইরকম খুনকার আছে—হানিডাঙ্গায় কি বর্ধনবেড়েতে ডাকাতি হয়েছে—যাই হোক আমি পথে নেমেছি। আমি কিছুর মধ্যে নেই, অথচ সবের

মধ্যেই আছি—জগতের এই অপূর্ব গতির রূপ আমার চোখে পড়েছে। আমি আজন্ম পথিক—পথে বেরিয়েছি সত্যবাবুর বাড়ীতে যে দিন থেকে সেই—অনেক কাল আগে সেই ১৯০৮ সালে, এক সন্ধ্যায় বেহারী ঘোষের বাড়ী মানিকের গান হোল—পরদিন জিনিসপত্র নিয়ে সেই যে বোর্ডিং-এ এলাম—কি ক্ষণে বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছিলাম জানি না—সেই বিদেশবাস শুরু হোল। পরে আর বারাকপুরকে বারোমাসের জন্য একবারও পাইনি—হারিয়ে হারিয়ে পেয়ে আসছি—কত জগদ্ধাত্রী পূজার ছুটিতে, গুডফ্রাইডের ছুটিতে, বড়দিনে, পূজায়—শনিবার পেয়ে এসেছি ছেলেবেলায়—এখনও অন্য ভাবে পাই।

এখনও তো শৈশবের স্বপ্ন দেখা সে সব দেশ দেখতে বাকী আছে, পথে যখন বেরিয়ে পড়েছি তখন সত্যই কি সে সব বাদ থেকে যাবে?

॥ ৯ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

আজ ও কালকার ঘোড়া চড়াটা ভাল লাগল। আজ একটু বেলা গেলেই বেরুলাম। লালকিষণ সিং-এর বাসার পথটা দিয়ে, কালোয়ার চক হাটের পথ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন সূর্য ডুবু-ডুবু। যেতে হবে বটেশ্বরনাথ পাহাড়ের এপার। খুব জোরে সুখটিয়া কুলবনের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। ঘোড়ার এই চলাটা আজকাল বড় আরামের মনে হয়। সহদেব সিং-এর টোলার কাছাকাছি সেই বনঝোপভরা পথটায় অন্যদিন থামি, কিন্তু আজ বেলা যাওয়াতে আর না থেমে সোজা বেরিয়ে গেলাম। কুতরুটোলার মধ্যে মেয়েরা ইঁদারায় জল নিতে আসছে, সেই জন্যে আস্তে আস্তে চালিয়ে বাইরের মাঠটায় পড়ে আবার জোরে ছুটলাম। ঝল্লুটোলার সামনে দিয়ে কলাইক্ষেতগুলোর পাশ দিয়ে এসে একটা উঁচু আল পার হলাম—সে জায়গাটি বড় নির্জন, একটা ছোট অশ্বত্থ গাছ, বনঝোপ, সন্ধ্যার ঘন ছায়া ও নির্জনতা বড় ভাল লাগল। পরেই এসে গঙ্গার ধারে প্রায়ান্ধকার পাহাড়টার দিকে চোখ রেখে দূরে দিকচক্রবালের ধূসর সান্ধ্য মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ঘোড়ার ওপর বসে রইলাম। সেই দিনটার কথা মনে পড়ে—সেই জেঠামশায়ের সঙ্গে কুঠীর মাঠে গিয়ে ফিরে এসে ভেবেছিলাম কত দূর না গেছি! সেই দিনটি থেকে আজ কত দূর কোথায় চলে এসেছি! মায়ের কথা মনে হোল—ঠিক এই সময় মা বলতেন, আমায় শীগগির যেতে হবে, ছেলের আবার বিয়ে দোব।

কি অপূর্ব এই জীবন! এই দুঃখের, আনন্দের, শোকের, স্নেহের, আশার, পুলকের; ভালবাসার স্মৃতি জড়ানো—এই অপূর্ব গতিশীল সুখদুঃখের মধুর এই সুন্দর জীবন-দোলা! ধূসর পাহাড়টার ওপরকার সন্ধ্যায় অন্ধকার-ঘেরা বনরাজির মাথার দিকে চেয়ে এক অপূর্বতা অনুভব করে গা যেন শিউরে উঠল—চোখে জল এল। তারপর কতক্ষণ আপন মনে ঘোড়ার উপর বসে রইলাম। সন্ধ্যা যখন বেশ হয়ে গিয়েছে তখন আবার ঝল্লুদালু টোলা দিয়েই অন্ধকার মাঠের বনঝোপের পথ বেয়ে অড়হর ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে এসে লছমন মণ্ডলের টোলায় পৌঁছানো গেল।

তাই এইমাত্র অন্ধকারে কাছারীর পথটায় বেড়াতে বেড়াতে মনে মনে ভাবছিলাম, ভগবান, আমি তোমার অন্য স্বর্গ চাই না—তোমার দেবলোক পিতৃলোক বিষ্ণুলোক—তোমার বিশাল অনন্ত নক্ষত্র জগৎ তুমি পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের জন্যে রেখে দিও। যুগে যুগে তুমি এই মাটির পৃথিবীতে আমাকে নিয়ে এস, এই ফুল-ফল, এই শোক-দুঃখের স্মৃতি, এই মুগ্ধ শৈশবের মায়া-জগতের মধ্যে দিয়ে বার বার যেন আসা-যাওয়ার পথ তোমার আশীর্বাদে অক্ষয় হয়। এই অমূল্য দানের কৃতজ্ঞতার বোঝাই বইতে পারি না—এর চেয়ে আর কোন্ বড় দান চাইবার সাহস করবো? বড় ভালবাসি এই মাটির জীবনকে—এই মাধুর্য যে লোভী বালকের মত বার বার আস্বাদ করে সাধ মিটাতে পারি না, একে এত

সহজে ছেড়ে দিতে পারি কি করে?

॥ ১১ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ ॥

ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিনটা। কত কথাই মনে হয়, দেখতে দেখতে হু-হু করে অগ্রসর হচ্ছে—এই সেদিন ১৯২৩ সালের এসময় ওদের ওখানে পড়াতে গেলাম—দেখতে দেখতে সে আজ পাঁচ বছর।

কাল সকালে ইসমাইলপুর থেকে খুব ভোরে বেরিয়ে হাতীর ওপর করে নবীনবাবু ও অমরবাবুর বাড়ি হয়ে ভাগলপুর গেলাম। সন্ধ্যার ট্রেনে অমরবাবুকে রওনা করে এসেই উদয়বাবু ও বেচুবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সুরেনের ওখানে গান শুনতে গেলাম। বড় ভাল লাগে সুরেনবাবুর গান আমার কাছে—এমন শুদ্ধ প্রাচীন সুর আমি কোথাও শুনিনি—যে সব পর্দায় সাধারণের কণ্ঠ নামে না, তাঁদের ওপর সুরেনবাবুর অপূর্ব দখল—সুরলক্ষ্মীর সকল রকম মান-অভিমানের খোঁজ তিনি রাখেন।

আজ সকালে উদয়বাবু স্টেশনে উঠিয়ে দিয়ে গেল। সত্যবাবুর ছেলে ভাদুর সঙ্গে একসঙ্গে এলাম—ভারী সুন্দর দেখতে, বাবার মত একটু বাজে বকে, একটু হামবড়া ভাব।

ক'দিন বড় হৈ-চৈ গেছে—আমি ভালবাসি না। জগতের পেছনের যে নির্জন জগৎটা আছে, তা শুধু শান্ত সন্ধ্যায়, স্নিগ্ধ বনের লতাপাতার সুরভিতে আমার কাছে ধরা দেয়—গভীর রাত্রের জ্যোৎস্নায় আসে। এটর্নি অফিসের ব্রিফসঙ্কুল কলকোলাহল কর্মমুখর জীবন আমার বিষের মত ঠেকে। তাই আজ শান্ত বৈকালে যখন কলবলিয়া নদীতে নৌকা পার হচ্ছিলাম তখন বড় ভাল লাগল। এই আকাশ, এই বৈকাল, এই শ্যামল শান্তি, এই অপূর্ব উদার জগৎ—সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না আমার জীবনে এরাই অক্ষয় হয়ে থাকুক! চাই না তোমাদের দশ হাজার টাকার চেক্, মিনার্ভা মটরগাড়ী, পোলিটীর বাড়ীর খানা, অমুক এটর্নির অত আয়ের বিষয় সম্পত্তি! তোমাদের মর্টগেজ ট্রান্সফার প্রপার্টিজ এ্যাক্ট, কোবালা, ওআর বন্ড তোমাদের থাকুক—এই নিঃসীম নীল শূন্য, ওই তারকারাজি, শেষ-রাত্রির জ্যোৎস্নায় নাগকেশর ফুলের সুরভি, কতদিন-হারা ছেলেমেয়েদের অস্পষ্টপ্রায় মুখগুলো আমার আপনার হয়ে থাকুক।

বেশ মনে আছে, বহুকাল আগের শৈশবে, সেই শিউলিফুলের তলায় ওদিককার ঘাসবনে যখন চড়াই পাখী বসতো, এই শীতের দিনে প্রথম প্রভাতের রাঙা রৌদ্রে পিঠ পেতে বসে মায়ের হাতের পিঠে খেতে যে অপূর্ব কল্পনা জগতের স্বপ্ন দেখেছি—আমার বাঁশবনের ভিটার প্রতি ধূলিকণায় তার লিখন আছে—কোন্ এটর্নি অফিসের মর্টগেজ দলিল দস্তাবেজের মধ্যে তার জুড়ি খুঁজে মিলবে? সেই "নন্দসুত নীল নলিনাও" গান, সেই বালক কীর্তন, সেই বকুলতলা, নট্‌কান গাছ, বিল্‌বিলে, পুবমুখো যাওয়া, ভরত—সেই অদ্ভুত শৈশব স্বপ্ন—আমার সে-সবই চিরদিনের সম্পদ হয়ে থাকুক।

আর সম্পদ হয়ে থাকুক, এমার্সন শেলি শেকভ রবীন্দ্রনাথ, আমার ঐ ছেঁড়া কালি-দাসখানা, রামায়ণ, বার্নার্ড শ—এঁদেরই আমি চাই, এঁরাই আমার ঐশ্বর্য।

আজ আবার শান্ত গ্রাম্যজীবনের মধ্যে এসে পড়েছি। আবার প্রশান্ত জীবন, সুন্দর নাক্ষত্রিক শূন্য, সন্ধ্যার বিচিত্র কর্ণকদম্ব, বলোয়া এসে গল্প করছে, বলছে—ম্যানেজার-বাবু, তুমি যখন আসছিলে তখন আমি কুলোকুমারের কলাইক্ষেতে বসেছিলাম, তার পর ভাই কড়ুরিয়া এসেছে, আনন্দিয়া এসেছে—এই সব গল্প করছে।

আজ নববর্ষের প্রথম দিনটা যেমন শান্তিতে কাটল—সারা বছরটা এই রকম কাটুক।

॥ ১লা জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আবার সে শান্ত জীবন আরম্ভ হয়েছে। কাল ও আজ আবার আজমাবাদের কুলবন দিয়ে পাকা কুল খেতে খেতে ঘোড়া ছুটিয়ে, সহদেব টোলার সেই তেলাকুচো ঝোপবনের ভেতর দিয়ে অস্তসূর্যের আলোয় ধীরে ধীরে কুতরুতোলা দিয়ে গঙ্গার ধারের দূরের পাহাড়গুলোর ধূসর দৃশ্য দেখতে দেখতে গঙ্গার ধারে গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানটাতে ঘোড়া দাঁড় করালাম। সন্ধ্যার ধূসর আলোয় নদীজল, পাহাড়, বহুদূরের দিক্‌চক্রবাল কোন মায়াজগতের ইন্দ্রজালময় স্বপ্নছবির মত অপরূপ দেখাচ্ছে। আবার সেই মাথার উপরে প্রায়ান্ধকার আকাশের প্রথম নক্ষত্রটি লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের জগতের অজানা কুহক নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে—শৈশবের বাঁশবনের গভীর রাত্রে লক্ষ্মীপেঁচার ডাকের মত গভীর রহস্যভরা জীবনকে আবার ফিরে পেলাম।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে বাব্‌লা গাছের পাশের সরু খালের পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিই, ক্ষেতে ক্ষেতে লোক গান গাচ্ছে, কলাই-এর বোঝা মাথায় করে ক্ষেত থেকে ফিরছে—ভীমদাস টোলার ঘরের উঠানে কলাই-এর ভূষায় আগুন করে গোল হয়ে লোকে বসে আগুন পোহাচ্ছে আর গল্প করছে, ঝল্লুটোলার ইঁদারায় মেয়েরা জল তুলছে—দেখতে দেখতে বাইরের মাঠে পড়ি, একটু একটু জ্যোৎস্না ওঠে, হু-হু পশ্চিমে বাতাসে কন্‌কনে শীত করে, বাঁধটার ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে ডানদিকের অস্পষ্ট দিক্‌চক্রবালের দিকে চেয়ে চেয়ে দেশের কথা ভাবি—ঠাকুরমা, পিসীমা, বড় চারা আমগাছতলায়, নদীর ঘাটে কি করে আনন্দ ভোগ করে গিয়েছেন গত পুরুষে, সে কথা ভাবি—জ্যোৎস্নায় পথের পাশের আকন্দগাছ চক চক করে, ধুতুরার ফুল সুন্দর দেখায়—কাছারী এসে পৌঁছাই।

॥ ৩রা জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

একটু বেশী বেলা থাকতে আজ বেরিয়ে সুখাটিয়ার কুলবনে এগাছে ওগাছে কুল খেতে খেতে বনঝোপ, অস্তমান সূর্য, আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ, ঘুঘু-মিথুন, সবুজ গমক্ষেত দেখতে দেখতে গিয়ে গঙ্গার ধারে গেলাম। চতুর্দশীর চাঁদের আলো গঙ্গার জলে অল্প অল্প পড়ে চিক্ দিক্ করছে——ওপারের কুয়াশাচ্ছন্ন তীরভূমি দেখে হঠাৎ মনে হল—আমি সুনীল ভূমধ্যসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দূরের কোন দ্বীপের দিকে চেয়ে আছি—হাজার দু'হাজার বছর আগেকার জীবনযাত্রা আবার যেন চোখে পড়ে—কত সম্রাট সম্রাজ্ঞী সেনাপতি মন্ত্রির দল—গ্রেস্‌দেশীয় সামান্য গৃহস্থঘরের শান্ত, সহজ জীবনযাত্রা, কত এল্‌ম্, ওক্, মার্টল গাছের ছায়া, বন্য আঙুরলতার ঝোপঝাপ, জুনিপার গাছের বন—হাজার বছর আগের যে লোকদল, তাদের সভ্যতা গর্ব, সোনা রূপার রথ নিয়ে ঐ অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন দূর তীরভূমির মতই ছায়া হয়ে হাজার বছর আগে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। অনন্ত জীবন কেবল এই নীল জলধিরাশির মতো অনন্ত পানে বেয়ে চলেছে একটানা--বড় বড় সাম্রাজ্যের কঙ্কাল, তীরস্থ শেওলা, জলজ উদ্ভিদের মত একপাশে হেলায় ফেলে রেখে দিয়ে উদাসীর মত চলেছে। আবার এখন থেকে হাজার বছর কেটে যাবে...সে দূর ভবিষ্যতের নবোদিত প্রভাত সে যুগের তরুণ বংশধরদের কাছে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান, মোটর এরোপ্লেন, বেতায়যন্ত্র, ট্যাঙ্ক প্রভৃতি নিতান্ত আদিম যুগের পণ্য বলে বিঘোষিত হবে। প্রাচীন রোমানদের স্বর্ণরৌপ্যে জাঁকজমকওয়ালা স্প্রিংবিহীন গাড়ীর মত।

মানুষকে শুধু চলতে হবে। চলাই তার ধর্ম—পথের নেশা তোমাকে আশ্রয় করুক। যুগে যুগে তোমাকে আসতে যেতে হবে—নব নব প্রভাতে নব নব ফুলফল, হাসিমুখ তরুণ, শৈশব-স্নেহ প্রেম আশা হাসি জ্যোৎস্না—পথের বাঁকে বাঁকে ডালি সাজিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে—অনন্ত জীবনপথে কতবার তুমি তাদের পাবে, আবার পেছনে ফেলে

চলে যাবে—আবার পাবে।

চরণ বৈ মধু বিন্দতি। চরণ স্বাদুসুম্ভূ স্বয়ম্—এই চলার বেগের অমৃত তোমার আপনার জীবনে সত্য হোক।

জীবনে অনন্তকে চিনতে হবে, নতুবা আত্মার দৈন্য ঘোচাতে পারবে না। গতির মধ্যে দিয়ে অনন্তের স্বরূপ চোখে ধরা দেবে। হে জীবন-পথের পথিক, পথের ধারে ঘুমিয়ে প'ড়ো না।

॥ ৬ই জানুয়ারী, ১৯২৮॥

আজ পূর্ণিমার দিনটা পূর্ণচন্দ্রকে ভাল করে উপভোগ করবার জন্যই একটু দেরি করে বেড়াতে বেরুলাম। সুখটিয়া কুলবনেই বেলা গেল। সহদেবটোলায় তেলাকুচা ঝোপে ভরা সেই পথটায় যখন গেলাম তখন সূর্যের রাঙা রোদ ঝোপেঝাপের গায়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে আসছিলাম, প্রতি আকন্দ গাছ, তেলাকুচা লতা, নাটা-কাঁটার ঝোপ, ছায়াশ্যামল তৃণভূমি উপভোগ করতে করতে মুখে দোদুল্যমান আলোক-লতার স্পর্শ মেখে, পিছনের মাঠে অস্তসূর্যের রক্তগোলাকটা পিঠের ওপর দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে দেখতে কুতরুটোলায় এসে পোঁছলাম। তারপর পাখীর কাকলী শুনতে শুনতে ডাইনের শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, একটু দূরেই সন্ধ্যার কুয়াশায় অস্পষ্ট গঙ্গার ওপারের পাহাড়টা দেখতে দেখতে গঙ্গার ধারে এলাম। পূর্ণচন্দ্র ততক্ষণ উঠে গিয়েছে—গঙ্গার জলে দীর্ঘ রশ্মি পড়ে কাঁপছে। দিয়ারা থেকে মাথায় করে লোকে কলাই-এর বোঝা নিয়ে ফিরছে—মাঠে খুপড়ী থেকে কলাই-এর ভূষার সাঁজাল দিয়েছে—তারই ধোঁয়ার গন্ধ বেরুচ্ছে।

জীবনটা কি অপূর্ব, শুধু তাই আমার মনে পড়ে। সেই কতদিন আগে—মনে পড়ল, এমন দিনটিতে বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম আড়ংঘাটার ঠাকুরবাড়ীতে। সেই ছোট ঘরটাতে থাকতাম, মোহন্ত ভোরবেলা উঠে কি স্তোত্রপাঠ করত, আর পিতলের লোটায় ঝোল রেঁধে আমাদের খেতে দিত। সেই তেঁতুলতলার দিকে বেড়াতে যাওয়া—সেই ওপরের ছাদে বসে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ভিক্টর হিউগোর লা মিজারেবল পড়া স্বপ্নের মত মনে আসে। এই আজকার পূর্ণিমায় সেই আড়ংঘাটার ছাদটা কি রকম দেখাচ্ছে? বাবার করুণ স্মৃতি-মাখা আড়ংঘাটার কথা কি কখনো ভুলবো? ওপারের ধূসর পাহাড়শ্রেণী, কুয়াশাচ্ছন্ন উদাস গঙ্গাবক্ষ, সুদূর পূর্ব দিকচক্রবাল...এদের সামনে রেখে কেবলই মনে পড়ে আমার দেশের ভিটায় এমনি জ্যোৎস্না আজ উঠেছে—চাঁপা পুকুরের পুকুরঘাটে, বেলেঘাটা ব্রিজের মাঠে, ইছামতীর ধারে, চাঁটগাঁয়ের মণিদের বাড়ী পুরোনো স্মৃতির সব জায়গাগুলোতে। কুঠির মাঠের কথা হঠাৎ মনে পড়ে—দেশের জন্যে মন কেমন করে। তারপর পূর্ণচন্দ্রকে পেছনে রেখে ঘোড়া ছেড়ে দিলাম। চারধারের মাঠ কুয়াশায় ঘিরে রয়েছে, সারাদিনের পশ্চিমে বাতাসের পর এত ঠান্ডা পড়েছে যে হাতে দস্তানা পরেও আঙুল কন্‌কন্ করছে—ভীমদাসটোলায় ঘরে ঘরে লোকে কলাই ভূষার 'ঘুর' লাগিয়ে আগুন পোয়াচ্ছে—ইন্দারায় মেয়েরা জল তুলছে। গত বর্ষাকালে যে খালটা দিয়ে নৌকা বেয়ে ভগু সিং-এর বাড়ীর পিছনের ঘাট দিয়ে বেড়াতে এসেছিলাম সে খালটার জল এখন শুকিয়ে গিয়েছে। বালির ওপর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে এলাম। বাঁধের ওপরে উঠে আবার আড়ংঘাটার কথা মনে এল। বাঁধ ছাড়িয়েই এক দৌড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে একেবারে ঘোড়া নিয়ে এলাম রাসবিহারী সিং-এর টোলার অশত্থ গাছটার কাছ পর্যন্ত। এত জোরে এলাম যে পরমেশ্বরী কুমারের যে খুপড়ীতে লোকজন আগুন তাপছিল—তারা হাঁ করে চেয়ে রইল।

॥ ৭ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ নতুন পথে গেলাম। সীমানায় চলে গিয়ে অযোধ্যা সিং-এর বাড়ীর কাছের পথ ধরে মহারাজির জঙ্গলের পাশের পথ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম। আজকার মত একদৌড়ে অতটা পথ কোনো দিন ঘোড়া যায় নি। ফাঁকা মাঠ, দুপাশে ঘন কাশের ও নলখাগড়ার বন পার হয়ে বড় বাবলা বনটার পাশ দিয়ে সোজা উত্তর-পূর্ব কোণে ঘোড়া ছাড়লাম। বটেশপুর দিয়ারা দিয়ে রাস্তা। মাঠ জঙ্গলের ধার দিয়ে গিয়ে সোজা পেঁছানো গেল কলবলিয়ার কিনারায়। কাটারিয়ার এপারে কলবলিয়া যেখানে গিয়ে কুশীর সঙ্গে মিশেছে তার একটু এদিকে জল কম। বটেশপুর দিয়ারা থেকে কলাই-এর বোঝা মাথায় নিয়ে মেয়েরা হেঁটে নদী পার হচ্ছে—সেই পথে ঘোড়াসুদ্ধ পার হয়ে গিয়ে কাটারিয়ার সামনে নতুন রেলপথের ধারে এক বাবলা-বনের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। বেশ সুন্দর ছায়া, পশ্চিমে সূর্য অস্ত যাচ্ছে—উঁচু-নীচু ভূমি—দুটি মেয়েতে কাঠ ভাঙছিল। তারা বললে, এ রাস্তা নয় পুলে যাবার—সামনে দিয়ে পথ। সেখান থেকে নেমে নতুন বাঁধের নীচে যেতে হবে। কাটিহারের ট্রেনখানা বেরিয়ে গেল। একটা জলাতে দুটো বড় বড় জাঙ্গিঘল পাখি বসেছিল। বটেশপুর দিয়ারাতে এক ঝাঁক ঘুঘু পথের পাশ দিয়ে উড়ে গেল—বন্দুকটার জন্যে হাত নিসপিস করে।

তারপর খাড়া উঁচুপথে বাঁধটার ওপর ঘোড়া ছুটিয়ে পুলটার কাছে গেলাম। ডাইনে বাঁয়ে ঘন বাবলা বন ও তেলাকুচা ও অন্য অন্য লতাপাতার ঝোপ—সন্ধ্যার ছায়ায় শ্যামল শীতল। কাটারিয়ার স্টেশনের ওপারে লাল টকটকে সূর্যটা অস্ত গেল। তারপর সেখান থেকে ঘোড়া ফিরিয়ে আবার ঢালু দিয়ে তেলাকুচাঘেরা বাবলা বনটার মধ্যে নামলাম। জেলে দুটো যেখানে রেলবাঁধের নীচে খুপড়ী বেঁধে আছে, সেখান দিয়ে নেমে এলাম। তারপর বাবলা বনের পাশ দিয়ে এসে কলবলিয়া পার হয়ে জোরে ঘোড়া ছাড়লাম। খুব বেলা গেলে আজ বেরিয়েছিলাম কিন্তু এতটা পথ গিয়ে আবার ফিরে এসে ভাল করে অন্ধকার হবার আগেই আজমাবাদ সীমানা ছাড়িয়ে জনকধারী সিং-এর বাসার কাছে এসে পেঁছে গেলাম।

॥ ৮ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ দুপুরের পর বটেশ্বরনাথ পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। অন্য অন্য বার যে পথ দিয়ে যাই আজ সেই পথ দিয়ে যাইনি। গুহাটার সামনে দিয়ে একটা পথ গভীর বনের দিকে চলে গিয়েছে, সেদিকে গেলাম। কত কি বনের গাছ—একটা পাথরের ওপর বসে বসে দূর পাহাড়ের ওপরকার বাঁশবনের শোভা দেখলাম। পাহাড়ের ওপর অনেক কাঞ্চনফুল গাছে ফুটে আছে। সেখান থেকে তলা দিয়ে গিয়ে গিয়ে গভীর একটা বনের কাছে পেঁছলাম। কল্পনা করছিলাম—চাবুকটা যেন আমার ধনুক—বটগাছের যে ডালটা ভেঙে নিয়েছিলাম সেটা যেন আমার বাণ। সভ্য জগৎ থেকে দূরে এক বন্য আদিম মানুষের জীবন যাপন করতে আমার বড় ভাল লাগে। তাই গাছ যেখানে বড় ঘন. ঝোপ খুব নিবিড়—তারই নীচে দিয়ে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে মচ মচ করতে করতে যাচ্ছিলাম। এক জায়গায় দেখলাম পাহাড়ের ওপর বন্য বেতের গাছ হয়েছে—এর আগে বটেশ্বর পাহাড়ে বন্য বেতের গাছ কখনও দেখি নি। অনেকক্ষণ পাথরটার ওপর বসে বসে ভাবছিলাম—শৈশব শুধু পিসিমা, হরি রায় এরাই আমার সঙ্গী ছিল না। সেই সঙ্গে সঙ্গে সত্যভামা, ভীষ্ম, সাত্যকি, অশ্বত্থামা এই সব পৌরাণিক চরিত্রও আমার কাছে জীবন্ত ছিল। আমাদের গ্রামে আশে-পাশে বনেবাদাড়ে তাদেরও স্মৃতি শৈশবের সঙ্গে জড়ানো আছে যে। রোদ রাঙা হয়ে এলে পাহাড় থেকে নেমে নৌকায় উঠলাম। একটা স্টীমার সকাল থেকে চড়ায় আটকে আছে। একটা মেয়ে আমাদের সঙ্গে পার হচ্ছিল, তার বাপের সঙ্গে নতুন শ্বশুরবাড়ী

যাচ্ছে। ঘোমটা খুলে কৌতূহলী চোখে স্টীমারটা দেখতে লাগল। নিজে হাল ধরে নৌকা ঠিক ঘাটে লাগিয়ে দিলাম। রাম সাধোকে বললাম, তুমি ঝল্লুটোলা হয়ে চলে যাও। তারপর আমি ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের অভ্যস্ত স্থানটিতে এসে দাঁড়ালাম। কত কথা মনে হয়—সেই আড়ংঘাটায় বাবার সঙ্গে যাওয়া, সেই চাঁপাপুকুর, কত কি! জীবনটা কি বিচিত্র, তাই শুধু ভাবি। সত্যবাবুদের বাড়ী থেকেও এর বিচিত্রতা যেমন দেখলাম—বাংলা-দেশ থেকে বহুদূরে এই বিদেশে পাহাড় নদী বন গঙ্গা অস্তগামী রক্তসূর্যে বিচিত্রতার মধ্যেও তেমনি দেখছি।

খুব অন্ধকার হয়ে গেল। আকাশ-ভরা তারার নীচে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে ভীমদাসটোলা দিয়ে বাঁধের উপর দিয়ে কাছারি ফিরলাম। পথ দেখতে পাই না—ঘোড়া শুধু আপনার ঝোঁকে কদমে চলে। শুধু আমি আর নির্জন মাঠ, একরাশ অন্ধকার, নতুন জিনটার মস মস শব্দ ও মাথার ওপরে জ্বলজ্বলে বৃহস্পতি, দীর্ঘ ছায়াপথ।

কাল সকালে এখান থেকে ভাগলপুর যাবো।

॥ ৯ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ কাঞ্চনগড়ে গাড়ী করে গিয়ে বিভাসবাবুর সঙ্গে সব কথাবার্তা কইলাম। তারপর ফিরে এসে ক্লাবে চণ্ডীবাবু ও অমূল্যবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে সাহিত্যচর্চা করা গেল। কাল সকালে এক বোতল জ্যাম কিনে নিয়ে ইসমাইলপুর যাবো।

ক্লাবে মডার্ন রিভিউ পড়ছিলাম। সিসিলিয়া মরলের লেখা বড় ভাল লাগল। প্রাচীন দর্শন, উপনিষদের এই তত্ত্ব বিদেশিনীর এত ভাল লেগেছে—বড় আনন্দ হ'ল। জীবনে জ্ঞানপিপাসু উন্নতিপিপাসু আধ্যাত্মিক পবিত্রতার জন্যে ব্যগ্র, ক্ষুধার্ত আত্মা খুব কম। দু'একজনের সঙ্গে পরিচয় হ'লে বড় আনন্দ পাওয়া যায়।

এই কৌতূহল, এই ব্যগ্রতা, একটা কিছু হবো, আরও উন্নতি করবো...এইটাই আঁক-বার। টমাস হেনরী রাদারফোর্ডের মত শত শত সুন্দর তরুণ যুবক প্রাচীন দিনের রাইনের প্রাসাদে প্রাসাদে—তাদের জীবন, দুঃখ, অদৃষ্ট মনে বড় লাগে। যে মেয়েটি কর্নেল বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পড়ছে তার কথা জেনে মনে একটা বড় উৎসাহ হয়। এই জ্ঞান-সুধা যে জাতির মধ্যে আছে তারা যদি বড় না হয় তবে বড় হবে কে?

শৈশবের সে স্বপ্নের দিন আর নেই। উত্তর জীবনে এই আধ্যাত্মিক ব্যগ্রতা, এই কৌতূহল, এই স্বপ্ন, এই জীবনকে realise করবার মত ক্ষুধা—এইটাই আঁকবার।

॥ ১২ জানুয়ারী, ১৯২৮, ভাগলপুর ॥

পৌষ সংক্রান্তি। সকালে উঠে অনেকক্ষণ ধরে পড়াশুনা করা গেল। তারপরে বেলা হ'লে আমরা চার-পাঁচজনে গঙ্গাস্নান করতে গেলাম। রোদ বড় প্রখর লাগতে লাগল। ছোট জলাটা পার হয়ে আমি ও নায়েববাবু ওপারের চড়ার পারে বড় গঙ্গায় নাইতে গেলাম। আমি আসবার সময় গল্প করছিলাম, সেদিন বটেশ্বরনাথের পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে নেমে আসবার সময় অত্যন্ত তৃষ্ণায় সেই বৈকালের ছায়াভরা পাথরের ঘাটটিতে পাণ্ডাঠাকুরের গেলাসে করে সেই নির্মল শীতল গঙ্গার জল যে খেয়েছিলাম—তার কথা। ফিরে এসে নতুন ঘরের নিকানোপোঁছানো দাওয়ায় চেয়ার পেতে বসে ভাবছিলাম, বাংলা-দেশে বসন্তদিন আসছে—সেই প্রথম গা-নাচানো মন-মাতানো দখিন হাওয়া, সেই পাতা-সাজানো বৈঁচিগাছ, বাতাবীলেবু ফুলের গন্ধ, কোকিলের ডাক, সেই দিনগুলো। জীবনকে প্রাণভরে ভোগ করাই জীবনের সার্থকতা; উদারভাবে প্রসারিত মনে ভোগ বা বেঁচে থাকবার আর্ট। এটুকুও শিখতে হয়।

॥ ১৪ই জানুয়ারী, ১৯২৮, ইসমাইলপুর ॥

বৈকালে ঘোড়া করে বেড়াতে বেরুলাম। লোধাইটোলার ওদিকে জলার ধারের রাঁইচী-ক্ষেতের দিকে আকাশটা কি সুন্দর দেখাচ্ছিল—এত রাঁইচীফুল ফুটে আছে—দূরে সন্ধ্যার ধূসর আকাশের নীচে উন্মুক্ত দূরপ্রসারী হলুদ রং-এর রাঁইচীক্ষেত কি সুন্দরই দেখাচ্ছিল! এই শুকনো কাশবনে সোঁদা সোঁদা ছায়াভরা গন্ধ, এই উদার নীল আকাশ, এই ঘনশ্যাম শস্যক্ষেত্র, এই নির্মল বাতাস, চখাচখির সারি, দূরের ধূসর পাহাড়রাজি, এই গতির বেগ—সবসুদ্ধ মিলে জীবনকে পরিপূর্ণতা ও সাফল্যের তৃপ্তিতে ভরিয়ে দেয়। আমি না ভেবে পারিনে যে এই উন্মুক্ত উদার গতিশীল যাত্রাপথের পথিক যারা নয়, জীবন-সম্পদে তারা দীন।

বসিরহাট থেকে পত্র এসেছে বহুদিন পরে পাটালি পাঠানোর জন্যে। বহুদিনের কথা মনে পড়ে। ৬০, মির্জাপুরের কলেজ হোস্টেলে এই শীতের দিনের যে অপূর্ব দিনগুলো—সেই প্রথম যৌবনের দীপ্ত উৎসাহ, মায়াজগতের স্বপ্ন, শিশিরবাবুর অভিনয় 'ইনস্টিটিউটে' দেখে এসে পথের মোড়ে ফুটপাথে তাই নিয়ে যে মেতে থাকা! তারও আগে এই প্রথম বসন্তের দিনে রমাপ্রসন্নের জন্যে ফাল্গুনী দেখতে যাওয়া—সেই 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে'—সেই ভূতনাথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তার সঙ্গে Landor পড়ার দিন-গুলো! সেই গ্রামের বসন্ত দেখেছি ১৯১৭ সালে এই দশ বৎসরের মধ্যে তা আর হয়নি।

॥ ১৬ই জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

আজ এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে না এলে কি স্টীমার ধরতে পারতাম? জঙ্গল থেকে বার হয়েই দেখি স্টীমার এপারে। ভাগ্যিস ছিল ছোট ঘোড়াটা—বালির চর বেয়ে ঝড়ের বেগে ঘোড়া উড়িয়ে তবে এসে স্টীমার ছাড়বার ঘণ্টা দেবার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম ঘাটে।

দেবীবাবুর ধর্মশালায় উঠেছি আজ। একবার সরাইখানার অভিজ্ঞতাটা হোক না? দুনিয়াটা তো একটা বৃহৎ ধর্মশালা—বড়র মধ্যে যে জিনিসটা ছোট অথচ বড়রই প্রতীক সেটাকে চিনে নিই।

পাশের ঘরে কে একজন গান গাচ্ছে আর বেহালা বাজাচ্ছে—বাঙালী মনে হচ্ছে। 'ওগো মাঝি তরী হেথা' গান ধরেছে।

একটা জিনিস নতুন ঠেকছে। কয়দিন হাতে অনেক কাজ, দেখি কি করি!

আজ ছিল বৃহস্পতিবার—আমাদের দেশের হাটবার। স্টীমারের ডেকে ব'সে ব'সে কেবল মনে ভেবেছি আমাদের বাঁশবনে ঘেরা ভিটাটিতে দূর শৈশবের একদিনে সামনের পুরানো পাঁচিলটা দেখতে দেখতে হাটে বেরুচ্ছি। খানসামা চা দিয়ে গেল, চুমুক দিতে দিতে বার বার সেই কথাই মনে আসতে লাগল। উপরের ডেক আজ ছিল বড় নির্জন, ব'সে ভাববার বড় সুবিধা।

মানসিক ঘুম ব'লে একটা জিনিস আছে...শারীরিক ঘুমের চেয়েও তাতে মানুষকে লক্ষ্মীছাড়া ক'রে ফেলে। দেহে সজাগ থাকা কঠিন না হ'তে পারে, কিন্তু মনে সজাগ থাকা কঠোর সাধনার ওপর নির্ভর করে। সেটা মাঝে মাঝে বুঝতে পারি।

॥ ১৮ই জানুয়ারী, ১৯২৮, ভাগলপুর ॥

এই দিনটাতে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম সাজকীর টিলায়। দুপুরের পর আজ হেঁটে সাজকী চ'লে গেলাম। উঁচু টিলাটার ওপর তেঁতুলগাছটার তলায় চুপ ক'রে অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে চারদিকের রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নের অপূর্ব শান্তির মধ্যে শ্যামল তালশীর্ষগুলোর

দিকে চেয়ে রইলাম। কত বছর আগেকার সে শৈশব সুরটা যেন বাজে—এক পুরোনো শান্ত দুপুরের রহস্যময় সুর। কত দিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে এই শান্ত দুপুরে কত বটের তলা, কত মধ্যাহ্ন আবার যেন ফিরে আসে পঁচিশ বছর পরে।

এই শান্ত স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবলই মনে পড়ে জীবনটা কি—তা ভেবে দেখতে হবে। এই পঞ্চাশ-ষাট বছরের এবারকার মত জীবনে কি সারাজীবন ফুরিয়ে গেল? এই দুপুর, এই প্রথম বসন্তের আবেশ, এই নীল আকাশ, এই বাঁশের শুকনো পাতা ও খোলার আহ্বান, তেলাকুচালতার দুলুনি—এ সব যে বড় ভাল লাগে।

কে জানে হয়ত যদি আসতেই হয় তবে হাজার বছর পরে। কারণ পার্থিব জীবন ছাড়া আরও একটা অপার্থিব জীবনধারা কল্পনা করতে পারা যায় যাতে আনন্দ বা সৌন্দর্য আরও ক্রমপরিস্ফুট হবে—সৌন্দর্যের সত্যের উপভোগই জীবনের উদ্দেশ্য, এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই।

তা যদি হয় তাতে সময় নেবে। হাজার বছর না হয় পাঁচশো বছরও হ'তে পারে। এসব বিষয়ে কিছুই নিশ্চয়তা নাই। চিন্তার গোঁড়ামি আমি বড় অপছন্দ করি, স্থিতি-স্থাপক মন না হ'লে সত্যদর্শী হওয়া বড় শক্ত। কাজেই যদি ধ'রে নেওয়া যায় ওপরের কথাটাই সত্য তো এই পৃথিবীর আলো হাওয়া জল মাটির কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে? তাই নীরব রহস্যভরা মধ্যাহ্নে সেই বিদায়-বেদনার সুর বড় বাজে।

অমরবাবু, উপেনবাবুর সঙ্গে রণজিৎবাবুর বাড়ী যাওয়া গেল। ফিরে আসতে আসতে কথা হ'ল, আমরা বেদের দল, তাঁবু ফেলে ফেলে বেড়াচ্ছি। রাখালবাবু চলেন কলেজে—উপেনবাবু তল্পি নিয়েই মঙ্গলবারে কলকাতা। ভাগলপুর শূন্য হয়ে পড়েছে। কাল আবার সংগীতসমাজে Recitation-এ বিচারকের আসন গ্রহণ করতে হবে।

॥ ২১শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

সঙ্গীতসমাজে আবৃত্তির প্রতিযোগিতার বিচারকগিরি করতে গেলাম বেলা তিনটার সময়। সেখানে একটা ছেলে বড় সুন্দর আবৃত্তি করলে। সেখানে থেকে চণ্ডীবাবু অম্বিকাবাবু ও আমি গেলাম ক্লাবে। সেখান থেকে চা-এর নিমন্ত্রণে গেলাম। সারাদিন Engagement-এর ভিতর দিয়ে দিনটি বেশ গেল।

একদিকে যেমন সরল সহজ জীবন দরকার, অন্যদিক থেকে আলো শিল্প সৌন্দর্য সঙ্গীতও যে বিশেষ প্রয়োজনীয় এটা ভুলে গেলেও তো চলবে না।

কাল যেমন সারাদিনটি বাদলা গিয়েছে, ঘোরাও গিয়েছে সারাদিন খুব। বেলা চারটার সময় বেরিয়ে ভিজতে ভিজতে উপেনবাবুর বাড়ী, সেখান থেকে স্টেশনে উপেনবাবুর টিকিট বিক্রী করতে। সেখান থেকে ধর্মশালায় খেয়েই বেরুনো হ'ল চণ্ডীবাবুর বাড়ী। সেখান থেকে অমরবাবুর বাড়ী হয়ে উপেনবাবুর বাড়ী গিয়ে রাত কাটানো গেল। সকালে উঠে চা খেয়ে সেখান থেকে এলাম সুরেনবাবুর বাড়ী। তারপর ধর্মশালায় ব'সেই ইস-মাইলপুর রওনা হওয়া গেল। খুব মেঘ মাথায়, ঘোড়াটা জোরে ছুটিয়ে ভিজে কাশের গন্ধ উপভোগ করতে করতে এলাম কাছারীতে।

পরদিন বৈকালে বর্ষণসিক্ত সবুজ কচি গমের ক্ষেত ও হলুদ রং-এর ফুলে ভরা রাই ক্ষেতের ভিতর দিয়ে ঘোড়াটা নিয়ে বেড়াতে গেলাম। দূরের পাহাড়গুলোয় আবার পরিষ্কার নীল রং ধরেছে—বৃষ্টি-ধোয়া আকাশের তলে সবুজ গমক্ষেত ও হলুদ রং-এর সমুদ্রের মত ফুলে ভরা রাইক্ষেত আমার চোখে কি মোহ-অঞ্জন যে পরিয়ে দিল! ঈশ্বর ঝা লোধাইটোলা থেকে বেরিয়ে দুঃখের কথা বলতে বলতে আমার ঘোড়ার পিছু পিছু কুণ্ডীর কাছাকাছি গেল। সেখান থেকে সে পথে গঙ্গা দেখে ফিরলাম। বালা মণ্ডলের

টোলা আসতে আসতে অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু ঘোড়াটা যা ছুটল! শুয়োর যেসব ক্ষেত খুঁড়ে ফেলেছে তার মধ্য দিয়ে খুব জোরে ঘোড়া ছুটল।

॥ ২৪শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

এ জীবনে প্রথম দেখলাম সরস্বতী পুজোর দিন এভাবের বাদল হয়। দুপুর থেকে আকাশ অন্ধকার ক'রে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। এখন সন্ধ্যাবেলা টেবিলে আলো জ্বলছে, আমার বাংলো ঘরটায় ব'সে আপন মনে লিখছি—চারধার অন্ধকার ক'রে বেশ জোরে বিষ্টি পড়ছে—ঠিক যেন ছেলেবেলার এক শ্রাবণ মাসের বর্ষণমুখর সন্ধ্যা। অথচ এটা বসন্ত-কালের প্রথম দিনটা—যে সময় কলকাতায় গান করতাম 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে'। আজ অনেক লোক খাবে, ব'লে দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু দই আসেনি বলে ঘোড়া নিয়ে মুকুন্দী চ'লে গেল বাসনাকুণ্ডু। বায়না ক'রে সরস্বতী পুজোর আয়োজন হ'ল ঠিক আর বছরের মত। ঈশ্বর ঝা পুজো করতে এল, আমি ও গোষ্ঠবাবু ঠাকুর সাজালাম। নায়েব মশায়ের বাসা থেকে আলপনা দিয়ে পিঁড়ি নিয়ে আসা হ'ল। বাবার পশ্চিম ভ্রমণের ডায়েরীটা ও রামায়ণখানা বার ক'রে দিলাম ঠাকুরের পিঁড়িতে। বাবার খাতাখানা নিজের হাতে চন্দন মাখিয়ে ও ফুল সাজিয়ে বড় আনন্দ পেলাম। তিনি কি জানতেন তাঁর মৃত্যুর পনের বছর পরে প্রথম যৌবনে তাঁর লেখা ছেঁড়া-খোঁড়া খাতাখানা বিহারের এক নির্জন কাশবনের চরের মধ্যে ফুলচন্দন দিয়ে অর্চিত হবে?

ঈশ্বর ঝা ও তার ভাইকে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালাম। ওরা রসগোল্লা এদের দিতে চায় না—হুকুম দিয়ে আনালাম, এদের দিলাম। রামচন্দ্র সিং আমীনকে লোক পাঠিয়ে আনিয়ে নিয়ে প্রসাদ খাওয়ালাম। তারপর গাঙ্গোতারা বাইরে বৃষ্টি মাথায় খেতে বসলো। আমি গিয়ে দাঁড়িয়ে তাদের খাওয়ালাম। প্যাঁড়া মহুয়া দই ও একটু একটু ক'রে গুড় পেয়ে সেই টিপ টিপ বাদলের দিনে ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়ায় বর্ষণমুখর আকাশের নীচে অনাবৃত মাঠে বসে খেতে খেতে তাদের উৎসাহ লোভ আনন্দ দেখে চোখে জল এল।

করুয়া চামার ছেলেপিলে নিয়ে অন্ধকারে ঘোর বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিজে ময়লা গামছা পেতে চিঁড়ে খাচ্ছে ও চেঁচাচ্ছে—শুখা ছে মালিক, হে মালিক থোড়া গুড়! সিকন্দা পরিবেশন করছে, কিন্তু তার কথায় কেউ কান দিচ্ছে না। ওরা যখন ভিজছে তখন আমার ঘরে ব'সে আরাম করবার কোন অধিকার নেই ভেবে আমিও ভিজতে ভিজতে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালাম ও হুকুম দিয়ে তাকে ও তাদের ছেলেদের আরও দই-গুড় আনিয়ে দিলাম।

অন্ধকার বৃষ্টিধারায় ধোঁয়াকার ধূ ধূ মাঠের দিকে চেয়ে মনে পড়ল, কতকালের সেই জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে সরস্বতীপুজোতে কুঠির নীলকণ্ঠ পাখী দেখতে যাওয়া।

কতকাল—কতকাল—আগে—

জীবন কি অদ্ভুত, তাই মনে মনে ভাবি—

সেদিন সাজকীর সেই অপূর্ব দুপুরটা মনে পড়ছে। সেই রৌদ্রদীপ্ত তালবৃক্ষশ্রেণী, সেই অপূর্ব শৈশব স্মৃতিটা—সার্থক ছিল সে যাত্রা আমার। শুভক্ষণে ধর্মশালা থেকে বেরিয়েছিলাম।

বড়লোকের বাড়ীর অভিজ্ঞতাটুকু লিখছি।

রামচন্দ্র সিং আমীনকে আমার বড় ভাল লাগে। একা জঙ্গলের ধারে থাকে। আমোদ-উৎসবে ওকে কেউ ডাকে না। বড় শুদ্ধ-সত্ত্ব লোক। তাই আজ ওকে ডেকেছি। প্রসাদ পেয়ে স্ফূর্তিতে কাছারীঘরে বসে গান করছে—

তেরা গতি লখি না পারিয়া—
হরিচন্দর রাজা...পিয়ে ডোম ঘরে শনি—দয়া হোইজী..

আরবারের মত। সেই আমার ভয়ানক Home-sickness, পশ্চিমে হাওয়া—হীরেনবাবু, কালীঘরে লিখবার টেবিল...ঘুর পোয়ানো...জঙ্গলের মাথায় চাঁদ ওঠা।

খুব হাসছে, আর গাইছেঃ

এক লাখ পুত সওয়া লাখ নাতি—
সর্কার কোই নাম আয়ী—
দয়া হোইজী...

'কোই নাম আয়ী' অংশটা বার বার জোর দিয়ে গাইছে। গোষ্ঠবাবুও মহা উৎসাহে কীর্তন করছে। রামচরিত ভিজতে ভিজতে নওগাছিয়া ডাকঘর থেকে এসে বললে, চিঠিপত্তর কিছু নেই।

॥ ২৭শে জানুয়ারী, ১৯২৮॥

আজ সবুজ গম রাঁইচীক্ষেতে অনেকক্ষণ বেড়িয়ে এলাম। ফিরে এলে গোষ্ঠবাবু ঘরে এসে অনেকক্ষণ গল্প করলে। ছটু সিং-এর পাঠানো পেয়ারা খাওয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা অনেক দিন পরে দেশের কুঠীর মাঠের একটা দিনের ঘটনার ছবি অস্পষ্ট মনে এল। নতুন বোষ্টমীর আখড়ার পেছন দিকের রাস্তাটা দিয়ে একদিন সকালে কুঠীর মাঠের দিকে যাওয়া। আটির নীচের ক্ষেতে কে নতুন চষেছে—জ্যাঠামশায় না কে সঙ্গে আছেন—ফিরে এলাম।

সে কি প্রথম দিনটা কুঠী যাওয়া? ভাল মনে হয় না।

সেই সময়ের মনের ভাবগুলো বেশ ধরা যায়। ঐ দিনটা স্পষ্ট মনে এলে ঐ দিনের—পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার শৈশবের এক হারানো দিনের ভাবনাটাও স্পষ্ট মনে পড়ে। দুটো এক ফোটোগ্রাফের প্লেটে তোলা ছবি একত্রে মস্তিষ্কের কোথায় যেন আছে—এতদিন কত অন্য প্লেটের তলে চাপা পড়ে ছিল—আজ হঠাৎ হাত পড়েছে।

॥ ২৮শে জানুয়ারী, ১৯২৮ ॥

অপূর্ব জ্যোৎস্না রাত্রি! এরকম রাত্রি দিয়ারা ছাড়া অন্য কোথাও দেখা যায় না—আর দেখা যায় বড় বাসার ছাদে। চারধার নিস্তব্ধ, সামনের কাশবনের মাথায় দুগ্ধ-শুভ্র জ্যোৎস্নাধৌত আকাশে রহস্যময় তারার দল। শুধুই মনে পড়ে, জীবনটা কি বিচিত্র রহস্য—এ শুধু একটা বিচিত্র অনন্ত রহস্য, এর সব দিকেই অসীমতা—যেদিকে যাওয়া যায়। চাঁপাপুকুরের সেই যে বাড়ীটাতে নিমন্ত্রণ করেছিল, আমাদের গ্রামের সেই দশ-বিঘা দানের বাঁশবন, বড় চারা আমতলায়, জাঙ্গিপাড়ার স্কুলের সামনের মাঠে—এরকম জ্যোৎস্না পড়েছে আজ—যখন এই সব বিভিন্ন স্থান ও তৎসংশ্লিষ্ট স্মৃতির কথা মনে ভাবি তখনই হঠাৎ জীবনের বিচিত্রতা প্রগাঢ় রহস্য আলোকে অভিভূত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখ গিয়ে পড়ে অনন্ত আকাশের নক্ষত্ররাজির উপর—কে জানে ওর চার-পাশের অন্ধকার গ্রহদলের মধ্যে মধ্যে কি বিচিত্র-জীবন-ধারা-প্রবাহ চলেছে! কোন্ দেববালকের মায়াময় শৈশবস্বপ্ন দেশের গাছপালা ভূমিশ্রীর মধ্যে কাটছে যুগে যুগে—অপূর্ব দেবতার লীলাভূমি কত সৌন্দর্য ভরা নব নব জগৎ—কত উচ্চস্তরের জীবকুল!

হাজার হাজার বর্ষ স্থায়ী বিচিত্র প্রেম তাদের, জন্ম-জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে অনন্ত জীবন-মৃত্যু বিরহমিলনের ভিতরে অক্ষুণ্ণ, চির সজীব ধারায় বয়ে চলে—কত সভ্যতার উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে, কত পৃথিবীর ধ্বংসসৃষ্টির তালে তালে। প্রাচীন ইজিপ্টের সে রাজকন্যার আত্মার কথা মনে পড়ে। এক বত্রিশ বৎসরের জীবনে যদি এই আনন্দের এই প্রাচুর্য, অনন্ত জীবনপথের পথিকদের হাজার হাজার বৎসর স্মৃতির মধ্যে কি অমৃত

সঞ্চিত আছে—যদি অমৃতের পুত্রেরা তাদের সত্যকার অধিকার না হারিয়ে ফেলে? জন্মে জন্মে যুগে যুগে হারানো প্রেম ফিরে পাওয়া স্বপ্ন কল্পনা, না বাস্তব?

মৃত্যুর ওপারেও কি কল্পনা ধ্যান চলবে? সেখানে তো লেখা নাই—আধ্যাত্মিকতায় আগ্রহ নাই, তবে কোন্ উদ্দেশ্যে মানুষের কর্মপ্রবাহ? হয়ত সেখানে তার উত্তর মিলবে।

আমি এই আকাশ, এই তারাদল, এই অপূর্ব জ্যোৎস্নারাত্রি, এই নির্জন মুক্ত জীবন ভালবাসি। প্রাণভরে ভালবাসি। বাংলোর বারান্দায় ডেকচেয়ার পেতে বহুদূরের জ্যোৎস্না-ভরা আকাশের দিকে একমনে চেয়ে রইলাম—কালীঘরের নীচেই যে জঙ্গল আরম্ভ হয়েছে তার মাথা দিয়ে জ্যোৎস্নার ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে। অনন্ত দেশের রহস্যবার্তার মত একটা বড় নক্ষত্র, নির্জন ঝাউঝাড়ের মাথায় জ্বলজ্বল করছে—হু-হু পশ্চিমে হাওয়া বইছে—কি এক অপূর্ব রহস্য মনে যে নিয়ে আসে! কি সব চিন্তা আনে! কি মাধুর্য...মনকে কোথায় যে নিয়ে গিয়ে ফেলে! কেবল বহুদূরের কথা মনে পড়ে। আজ কাছারীর সামনে কাশ-জঙ্গলে সূর্যাস্তের সময় বেড়াতে গেলাম। গভীর নির্জনতা শুকনো কাশের ভরপুর গন্ধ—বাঁকাভাল বড় ঝাউএর ঝোপ—শুকনো খটখটে মাটির গন্ধ—সোঁদা সোঁদা—অনেক-দূরে ভাগলপুরে গঙ্গার ওপর রাঙা সূর্যটা হেলে পড়ছে।

এই অপূর্ব সূর্যাস্ত এদেশের নিজস্ব সম্পত্তি।, এর সঙ্গে পরিচয় এদেশে এসে—বিহারের এই দিগন্তব্যাপী মাঠ, চরের মধ্যেই দিগন্তলক্ষ্মীর ললাটরক্ত-সিন্দূর-বিন্দুর মত অপূর্ব অস্তসূর্য সবুজের সমুদ্রের মত শস্যক্ষেতের ওপর যখন ঢলে পড়ে তখনই মনে হয় অনন্ত অন্তরতম অন্তরকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিচ্ছে—আমার উদ্দাম মুক্তি-কামী স্বাধীনতাপ্রিয় মন এই প্রসারতা এই নির্জন বন্য সৌন্দর্যের কর্কশ প্রাচুর্যে মুগ্ধ হ'ল, সার্থক হ'ল।

তাই আজ ভাবছিলাম জীবনে কেউ শত্রু নয়—অল্পদিনের ব্যবধানে যাকে মনে হয় অমিত্র, দূরের ব্যবধানে তাকে দেখা যায় সে জীবনে পরম মিত্রের কাজ করছে। রাজকুমার-বাবু, খুকী—এ দু'জনের মত মিত্র কে?

আমার প্রসারতাপ্রিয় নির্জনতাকামী মনকে ধ্যানের অবসর এরাই না যুগিয়েছে? ভগবান এঁদের আত্মাকে আজকালের জ্যোৎস্নাধারার মত শুভ্র করুন।

কাল সকালে উঠে জোয়ান ক্ষেত দেখতে দেখতে মুক্তিনাথের স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে বাসনাপুর যাবো। সকালে রামগিরিতে রামের ঘোড়াটা যাবে ঠিক হ'ল আর রাম-ধনিয়া চাকর ব্যাগ নিয়ে যাবে। ভার্টলি গোটা দেখে আমি ঘোড়া নিয়ে ঐ পথে অমনি চ'লে যাবো জোয়ান ক্ষেতে, সেখানে গণপৎ তহশীলদার ও মোহনীবাবু আমীন উপস্থিত থাকবেন। পরে কাছারীতে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে আহারাদির পর বৈকালে ফিরবো।

বড় ভাল লাগে এই উন্মুক্ত জীবন, বড় ভাল লাগে এই দিয়ারা, এই অপূর্ব জ্যোৎস্না রাত্রি, এই বন, কাশঝোপ, দূরের নীল পাহাড় দুটি, এই ঘোড়ায় চড়া, এই শর্ষেফুলের গন্ধ, সকলের চেয়ে মনকে চারপাশে ছড়িয়ে দেবার এই অপূর্ব অবকাশ।

বাঙ্গালী মণ্ডল আজ এক ঝুড়ি কুল নিয়ে আজমাবাদ থেকে এসেছে। ওদের বকশিশের কম্বল নিয়ে যাবে।

সকালে বার হয়ে ঘোড়া ক'রে রাই ক্ষেত দেখে পরশু রামপুর চ'লে গেলাম। সেখানে বহুদিন পরে কলবলিয়ায় অবগাহন স্নান করা গেল। দূরে কহল-গাঁয়ের নীল পাহাড়টা বড় ভাল লাগছিল। খাওয়া-দাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করার পরেই গোষ্ঠবাবু ও আমি হেঁটে বার হলাম। সত্যি, হাঁটার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যা ঘোড়ায় চ'ড়ে পাওয়া যায় না! নাঢ়াবইহারের কাছে দূরপ্রসারী ঘন শ্যাম যব-গমের ক্ষেত, আকাশে উড্ডীয়মান বলাকার সারি বড় ভাল লাগছিল—বহুকাল পরে অনেক দূর পায়ে হেঁটে যাওয়ার সুখ

অনুভব করলাম। পথের পাশেই নীল ফুলে ভরা খেঁসারীর ক্ষেত, চন্দন রং-এর ফুলে ভরা মটর ক্ষেত, কোথাও আধশুকনো দূর্বা ঘাসের ক্ষেত। গোষ্ঠবাবু আসতে আসতে আবার কল্লর চৌধুরীর ক্ষেতের কাছে এসে পথ হারিয়ে ফেললে। আধশুকনো দূর্বা ঘাসের বন কাশবনের মধ্যে দিয়ে সুঁড়ি পথ বেয়ে অনেক দূরে এলাম—আর বছরে সেই তেলির ক্ষেতে (যেখানে নীল গাই দেখেছিলাম) যাবার সময় যে রকম সুঁড়ি পথ দিয়ে যেতাম সেরকম। তারপরে কেবলই সবুজ সমুদ্রের মত শস্যক্ষেত্র—দিগ্‌দিগন্তহীন দূর, দূর সুদূরপ্রসারী আকাশ। অপূর্ব এ দিয়ারার দৃশ্য! এরকম নীল আকাশ, এরকম পাহাড়, এরকম দূরপ্রসারী শ্যামলতার সমুদ্র আর কোথায়? মাঝে মাঝে বন্য শুয়োরে শস্যক্ষেত খুঁড়ে ফেলেছে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে নির্জন ফসলের ক্ষেত। এই গভীর বনের ধারে একটা কাশের তৈরী কুঁড়ে—তাতেই চাষী রাত্রে শুয়ে এই ভীষণ হিমবর্ষী রাত্রে ফসল চৌকি দেয়। ওরা পথ হারিয়ে গেল—মালী ঘোড়া নিয়ে আসছিল। সে বললে, এ কোথায় এলাম? গোষ্ঠবাবুও দিশাহারা হয়ে গেল। আমিও প্রথমটা ঠাহর করতে পেরে উঠলাম না। পরে সিধা পথ পেয়ে খানিকটা আসতে আসতে দূরে কতকগুলো কাশের ঘর দেখে আমি বললাম, এই বালা মণ্ডলের টোলা। গোষ্ঠবাবু বললেন, না। আমি কিন্তু আর খানিকটা এসে বাঁ-ধারে যে পথে লোধাইটোলা, ঘোড়া ক'রে গিয়ে সে পথটা দেখতে পেলাম। তারপর হেঁটে খানিকটা পার হয়ে হুকুমচাঁদের বাসার কাছ দিয়ে মানুষসমান উঁচু রেড়ীক্ষেত দিয়ে এলাম। মুকুন্দী ও জহুরী আজই বৈদ্যনাথ থেকে ফিরে এসেছে। প্রসাদ দিয়ে গেল। মুকুন্দীকে বললাম, তুমি আমার কাছে আজ রাত্রিতে গল্প করবে। বড় আনন্দের দিনগুলো এসব।

অভিজ্ঞতায় এটা বুঝলাম, আজ যে স্থানটা নতুন, ভাল লাগে না, মন বসে না, যত দিন যায় তার সঙ্গে স্মৃতির যোগ হ'তে থাকে, ততই সেটা মধুর হয়ে ওঠে। এই ইসমাইল-পুর ১৯২৪ সালে আন্দামান দ্বীপের মত ঠেকতো। আজমাবাদকে তো মনে হোত (১৯২৫ সালেও) সভ্য জগতের প্রান্তভাগ—জঙ্গলে ভরা বেলজিয়াম কঙ্গোর কোন নির্জন উপনিবেশ—আজকাল সেই আজমাবাদ, এই ইসমাইলপুর ছেড়ে যেতে হবে ভেবে কষ্ট হচ্ছে।

আজ এমার্সনের "Immortality" প্রবন্ধটা প'ড়ে মনে হ'ল আমার মনের কথা অবিকল তাতে লেখা আছে। কতদিন ব'সে ব'সে ভেবেছি, অন্য জগতের জীবনেও নিশ্চয় চিন্তা, পড়াশুনা, একটা কিছু কাজ নিয়ে থাকবার প্রচুর অবকাশ আছে। হাজার বছর কেটে যেতে পারে তবুও ব্যক্তিত্ব নষ্ট হবার কারণ কি? ত্রিশ-বত্রিশ বছরের স্মৃতিভাণ্ডার যদি এ মধুকে পরিবেশন করে তবে অনন্ত জীবনপথে দুশো-তিনশো বছরের স্মৃতির ঐশ্বর্য কি, তা ভাবলেও পুলকে শিউরে উঠতে হয়— হাজার বছরের? দুই হাজার বছরের? বিশ হাজার কি লক্ষ বছরের?

॥ নবমী, ৩১শে জানুয়ারী, ১৯২৮॥

কাল রাত্তির থেকে খুব বৃষ্টি চলছিল। ভাবলাম বুঝি সকালে বটেশ্বরনাথ মেলা দেখতে যাওয়া হবে না। সকালে উঠে হু-হু পশ্চিমে বাতাস দিচ্ছে। ভাগলপুরে বন্দুর উঠছে, মেঘ উড়িয়ে নিয়ে ফেলছে পূর্ব-উত্তর কোণে। কন্টু মিশ্র যাবার জন্য তৈরী হ'ল—অনেক লোক বটেশ্বরনাথে স্নান করতে চলেছে। আমিও স্নান ক'রে নিয়ে ঘোড়ায় উঠবো।

ঘোড়া নিয়ে বালাটোলার মাঠে খুব যব খাওয়ালাম। সেখান থেকে খানিকটা যেতে ঘোড়ার পেটি আলগা হয়ে গেল কিন্তু একটা লোককে ডাকিয়ে সেটা ঠিক করে নিয়ে আবার ঘোড়া ছাড়লাম। কলবলিয়ার মাহতাম্ সহিস দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে দিয়ে পেটি

কষিয়ে ঘোড়া ছেড়ে দিলাম। তিনটাঙার পথটা বেশ ভাল—গাছপালা, আলোকলতার জঙ্গল, ছায়া—খানিকদূরে যেতে যেতে মেলায় লোক সারবন্দী হয়ে যাচ্ছে দেখলাম—রাঙা কাপড় পরা মেয়ের দল, গরুরগাড়ীর সারি! মেলায় পৌঁছে এদিকে ওদিকে খুব বেড়ানো গেল। পরে ঘোড়া ছেড়ে লোকপূর্ণ পথ দিয়ে রওনা হলাম। একস্থানে অতি নিরীহ গোবেচারী ভীতু প্রকৃতির একজনকে দেখলাম। ব্রহ্ম মন্ডলের তাঁবুতে সে টাকা-পয়সা কাপড়ে বেঁধে নিয়ে এসেছিল। মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে দেখা হ'লে মড়াকান্না কাঁদে—এ আগে কখনো দেখি নি। যখন কুড়ারী তিনটাঙার ওধারের পথে আছি, তখনই সূর্য হেলে পড়েছে—খুব ঝাঁড়া গাছের ছায়া, পাশেই সবুজ গমক্ষেত সুগন্ধভরা। ঘুঘু পাখী বনের ছায়ায় ডাকছে—মনে হ'ল কেমন সেই গত পঞ্চমীতে দেশের কুঠীর মাঠ থেকে কুল খেয়ে এসে আজ পঁচিশ বছর পরে বাড়ীর পিছনে বাঁশবনে ব'সেছিলাম। সে স্থানটিতে এরকম বাঁকা রদ্দুর প'ড়েছে—রবিবার আজ যে, দেশে পঞ্চাননতলার কাছ দিয়ে হাট ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। বলছে, বেগুনের কত দর আজ হাটে। ঝুরি দোলানো পথ দিয়ে মাধবপুর নতিডাঙ্গার হাট ক'রে ফিরছে।...আরও খানিকটা এসে একজন বললে, বড় রাস্তার খানিকটা গিয়ে পশ্চিম দিকে বাসনাপুকুর রাস্তা পাওয়া যাবে। সে পথে আসতে আসতে জয়পাল কুমারের বাড়ী। কাছের জঙ্গলে দুটো বন্যশুয়োর একেবারে সামনে পড়ল। তারপরই সোজা পশ্চিমমুখে পথ—ঘন ছায়াভরা। ওধার থেকে অস্তসূর্যের রাঙা ম্লান আলো বাঁকা হয়ে মুখে প'ড়েছে। সেই ঘুঘুর ডাক বড় ভাল লাগছিল। পথ ঠিক আছে কিনা জানতে সামনের একদল মেলাফেরতা যাত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে তারা বললে, বাসনা-পুকুর যাবে। একেবারে পড়লাম কলবলিযার ধারে। বাসনাপুকুর আসতে রাঙা সূর্যটা বহুদূরে দিয়ারার পেছনে অস্ত গেল। ওদিকে পূর্ণিমার চাঁদটা পিছনে চেয়ে দেখলাম বটেশ্বরনাথের পাহাড় ছাড়িয়ে অনেক ওপরে উঠেছে। কল্বলিয়া পার হবার সময় পূর্ব-দিকে পাহাড়েব ধূসর ছবি, ওপরে উঠা পূর্ণচন্দ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে বাড়ীর ভিটের কথা ভাবছিলাম—সেই ভাঙা কলসী হাঁড়ি পড়ে আছে—কোন্ কালের এই সজিনা ফুলভরা বসন্ত দিনের বার্তা। পিসীমার কাছে কাটানো সেই সব দূরের দিনগুলো। ছোট্ট এক নোনাগাছের ধারেব ওপরের ঘরে কত পূর্ণিমার রাত চলে যাওয়া। সামনে দিয়ারার মধ্যে এখান থেকে এখনও ছমাইল এই রাত্রে যেতে হবে। ঘোড়া ছেড়ে চ'লে যখন নাঢ়া বইহারে পড়েছি তখন খুব জ্যোৎস্না ফুটেছে—বাঁয়ে বালিয়াড়ীর ওপরে কাশবন একটা। আশে-পাশে কাশের ঝাড়। নির্জন, ধূ ধূ করছে মাঠ আর কাশবন—কোন দিকে মানুষের সাড়া-শব্দ নেই। পরে আন্দাজে ঘোড়া চালিয়ে এসে দেখি সামনে সেই পাড়-দেওয়া জলাটা পড়েছে। ঘোড়া টপকে পাব হ'ল—প্রতি মুহূর্তেই ভয় হচ্ছিল, বুঝি পথ হারাবো। পরে জঙ্গলটা পার হয়ে লোধাইটোলার নীচের তলাটার ধারে এসে গমক্ষেতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে অনেকক্ষণ জ্যোৎস্না-ভরা জলাটার দিকে চেয়ে রইলাম। চাঁপাপুকুরের পুকুরঘাটে যাবার ইমাদি-ওয়ালা জমিটুকুতে ওই রকম জ্যোৎস্না পড়েছে। দীর্ঘ শস্যক্ষেতের মধ্য দিয়ে ঘোড়া ছাড়লাম—যবের শীষে পা লেগে সির্সির্ শব্দ হচ্ছিল। লোধাইটোলা ছেড়ে ঘোড়া খুব দৌড় করালাম—Ranchman's Ride-এর মত খুব। গম-যবের ক্ষেত দিয়ে এঁকেবেঁকে খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে এলাম। কাছারী পৌঁছালাম সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পরে।

অপূর্ব জ্যোৎস্নার রাত্রি। দাওয়ায় চেযার পেতে ব'সে আছি। সামনের কাশবনে জ্যোৎস্না এসে প'ড়ে অপূর্ব দেখাচ্ছে। কাছারীর অনেকে বটেশ্বরনাথে গঙ্গাস্নান করতে গিয়েছে এখনও ফেরেনি। কত কি পাখী ডাকছে! বিহাবের দিকদিশাহারা মাঠ, তার নির্জনতা, দু'একটা সাথীছাড়া রব, কাশবন বালিয়াড়ী, অস্তসূর্যের রাঙা-আলো; অপূর্ব

জ্যোৎস্না,—এই সবের মোহ ক্রমে ক্রমে মাথায় পেয়ে ব'সেছে। বড় আনন্দে দিন আজ কাটল। যাতায়াতে চব্বিশ মাইল ঘোড়া-চড়া হ'ল আজ।

আজ জয়পালটোলার নির্জন ছায়াপথটা দিয়ে আসতে আসতে কেবলই মনে হচ্ছিল,—দূরে সেই হাটবার, পূবমুখো যাওয়া থেকে বহুদূর জীবনপথে চলেছি। সেই কুলক্ষেতে যাওয়ার দিন, সেই বাঁশবন পোড়ার দিনগুলো—কত কত পিছিয়ে পড়ে গিয়েছে! এই উদাস ঘুঘুর ডাক, রাঙা অস্ত-সূর্যের রোদ, এই গতির বেগ—এ এক সংগীত। অপূর্ব জীবনসংগীতের নব মূর্ছনার মত মাদকতাময়।

॥ ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

কয়দিন ধরে ক্রমাগত জঙ্গলের পথে ঘোড়া নিয়ে বেরুই। উপরি উপরি দু'দিন পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম—সেদিন বড় কুন্ডীটার কাছে গিয়ে পথ হারানোতে রাদু মিশ্র পথ দেখিয়ে আনে। আর একদিন লোধাইটোলার রাস্তা না খুঁজে পেয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে সুঁড়ি পথ বেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে কালামন্ডলের বাড়ীর কাছে এসে পড়েছিলাম—সে পথ দেখিয়ে আনে।

আজ রামজোতকে সঙ্গে নিয়ে নারায়ণপুরে দামড়ীকুন্ডীর ফসল দেখতে যাই। লছমী-পুর ঘাট পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে মানুষসমান উঁচু কাশজঙ্গলের মধ্যে সুঁড়িপথ বেয়ে কুন্ডীর ধারে যখন এলাম, তখন নির্জন জঙ্গলের মাথায় পূবদিকে একটিমাত্র সন্ধ্যাতারা উঠেছে। ওঃ, কি ঘন নির্জন জঙ্গলটা! শুধু উঁচু বালিয়াড়ি ও কাশের বন। ফিরে আসতে আসতে বেশ লাগল। দু'ধারে মানুষের গতিবিহীন নির্জন কাশ-ঝাউ-এর বন। শুকনো কাশ-জঙ্গলের গন্ধে ভরপুর, সোঁদা সোঁদা, বেশ লাগে। মাথার ওপরে তারা এখানে ওখানে—এখানে ওখানে উঁচু-নীচু ঢিবি, বালিয়াড়ি—অন্ধকার। বিশাল নির্জনতা, যেন চার-পাশের জঙ্গলে আকাশের নক্ষত্র-জগৎ তার রাজত্ব বিস্তার করেছে—Vast wilderness! ...তার মধ্যে ঘোড়ায় আমরা দু'টি প্রাণী—ঘোড়াটা পথ দেখতে না পেয়ে টক্কর খাচ্ছে। গভীর জঙ্গলের দিকে কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই—কোনো কোনো জায়গায় জঙ্গল খুব ঘন নয়। চকচকে বালি, এখানে ওখানে বন-ঝাউ-এর ঝোপ—উঁচু-নীচু, পিছনে কাশ-জঙ্গলের মাথায় তারাভরা পূর্বদিকের আকাশ, সোঁদা সোঁদা কাশবনের গন্ধ।

এই জঙ্গলের জীবন নিয়ে একটা কিছু লিখবো—একটা কঠিন শৌর্যপূর্ণ গতিশীল, ব্রাত্য জীবনের ছবি। এই বন, নির্জনতা, ঘোড়ায় চড়া, পথ হারানো—অন্ধকার—এই নির্জনে জঙ্গলের মধ্যে খুপড়ী বেঁধে থাকা। মাঝে মাঝে যেমন আজ গভীর বনের নির্জনতা ভেদ ক'রে যে সুঁড়িপথটা ভিটেটোলার বাথানের দিকে চলে গিয়েছে দেখা গেল, ঐরকম সুঁড়িপথ এক বাথান থেকে আর এক বাথানে যাচ্ছে—পথ হারানো, রাত্রের অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ক'রে ঘোরা. এদেশের লোকের দারিদ্র্য, সরলতা, এই Virile, active life, এই সন্ধ্যায় অন্ধকারে-ভরা গভীর বন, ঝাউবনের ছবি—এই সব।

দূরে বাংলাদেশে এখন বসন্ত পড়ছে। গ্রামে গ্রামে বাতাবী লেবুফুলের সুগন্ধ, সজনে-ফুল প'ড়ে আছে, আমের বউল, কচিপাতা ওঠা গাছপালা, দক্ষিণা হাওয়া বইছে - কোকিল ডাকতে শুরু ক'রেছে, তার সঙ্গে মনে পড়ে গৃহে গৃহে এই মঙ্গল সন্ধ্যায় শান্ত-চোখে গৃহলক্ষ্মীদের হাতে আনা সন্ধ্যাদীপ...জানালায় ধূপগন্ধ...দেবতার মন্দিরে আরতি।

॥ ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

প্রায় এক মাস পরে দিয়ারায় একঘেয়ে কাশ ও বন-ঝাউয়ের বনের নির্বাসন থেকে,

বালি, সবুজ গমযবের ক্ষেত, ঘোড়ায় চড়া লোধাইটোলার খুপড়ী—এসব থেকে আজ ভাগলপুরে এলাম। অনেকদিন পরে ভারি চমৎকার লাগছিল। সব যেন নতুন নতুন। কাল এসেই চণ্ডীবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বার হ'লাম—ক্লাব থেকে মাঠে বেড়াতে গেলাম। কমিশনারের বাড়ীর কাছটাতে যখন এসেছি তখন চণ্ডীবাবুর সঙ্গে গল্প করতে করতে মনে হ'ল অনেক কালের কথা—সেই যে সব দিনের বনগ্রাম স্কুল থেকে Homesick হয়ে বাড়ী ফিরতাম। ভরতদের বাঁশতলা, কালীদের বাগানের কোণটা গাবতলাটা আমার কাছে স্বপ্নপুরীর মত লাগত। কালীর সঙ্গে ইছামতীর ধারে বসে মনে হোত, কতদিন পরে আবার এসব সুপরিচিত স্থানে এসেছি! নভেলে এইসব শৈশবকালের স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি করছি মাত্র—কারণ মনের অভিজ্ঞতা, জীবনের অভিজ্ঞতা ছাড়িয়ে কোনো লেখকই যেতে পারেন না—গেলেই সেটা কৃত্রিম, Tour de force হয়ে পড়বে।

আজ বৈকালে কলেজের ঘাসবনের পথ দিয়ে বেড়াতে গিয়ে প্রথম ফাল্গুনের গাঢ় আম্রবউলের সৌরভে, বাতাবী লেবুফুলের গন্ধে, অপরাহ্নের ছায়ায় কত কথাই মনে আসতে লাগল। কি অপূর্ব জীবনপুলক! বহুকাল পরে দিয়ারার কাশবন থেকে এসে এ-কি অপূর্ব পরিবর্তন! চারধারে ঘেঁটুফুল ফুটে আছে, ঝোপে ঝোপে ছায়া নেমে এসেছে—আম্র-বউলের গন্ধে, পাপিয়ার ডাকে বাতাস অবশ। নেবুফুলের গন্ধে, মনে পড়ে কতকাল আগে কোন কৈশোরের দিনে, স্নিগ্ধ ছায়াভরা বৈকালে যেন গোপলা গয়লার বাড়ীর সামনের চড়কতলার পথটা দিয়ে যাচ্ছি।

যাক, তারপর লাইনের ওপরকার সাঁকোর ওপর গিয়ে বসলাম, মনে হ'ল এই অপূর্ব শিল্প যাঁর হাতের—এই পৃথিবী-পারের নক্ষত্রজগতে হয়তো কত উন্নত বিবর্তনের জীব-জগৎ আছে। তিনি তার অপূর্ব শিল্পপ্রতিভা সে সব উন্নততর জগতে না-জানি কত অপূর্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন! অনন্ত সৌন্দর্যভূমি এই নক্ষত্র-জগৎ—কত এ ধরণের উন্নত বসন্ত, আরও কত অজানা ঋতুবিলাস তার ধূলায় ধূলায়। যুগে যুগে যে সব শিল্পী, কবি এই সৌন্দর্যসৃষ্টির গান ক'রে গিয়েছেন—গ্রীকযুগ, রোমকযুগ, রামায়ণ, কালিদাস, শেলি, শেক্সপিয়র, কীট্‌স, রবীন্দ্রনাথ—এইসব দ্রষ্টাদের কথা ভাবি। ভগবানের সৃষ্টিকে এরা আরও কত মধুময় করেছে। ঐসব জগতে কত উন্নত ধরণের কবি, দ্রষ্টা, ভাবুক আছেন—কে জানে? আমি বেশ কল্পনা করতে পারি, নির্জন জ্যোৎস্নাময়ী, অজানা গ্রহ-জগতে তাঁদেব কল্পনার সে অপূর্ব বিলাস।

॥ ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

এখানকার এক-একটা দিন এক-একটা সম্পদ হয়ে উঠছে—কলকাতায় এরকম দিন কটা আসে? আমারই বা এর আগে কটা এসেছিল? স্কুল-কলেজেব রুটিনবাঁধা কাজ বা স্কুল-মাস্টারীর রুটিনবাঁধা কাজের সময় এসেছিল বটে দিনকতক, League-এর কাজের সময়ে। কিন্তু সেও বড় ভ্রমণশীল, বেদুইনের মত জীবন ছিল বলে সেও ততটা ভাল লাগেনি।

আজকালকার প্রত্যেক দিনটি এক-একটা উৎসব দিনের মত সুন্দর। এত সুপ্রচুর অবসর, এত বৈচিত্র্য আর কখনো কি জীবনে পাব?

আজ তিনটার সময় চণ্ডীবাবু এল, তার সঙ্গে বার হয়ে গেলাম—অস্ফুট আম্রমুকুলের গন্ধভরা বৈকালের বাতাসের মধ্য দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে রোমান ক্যাথলিক গির্জাটাতে ঢুকলাম। দুধারে বৈকালের ছায়ায় সুন্দর গাছগুলো। আমরুল, কামিনীফুল, আমগাছ, দু'চারটা বিলাতী ফুলের গাছ, চিনি না। গঙ্গার ধারে কেমন সুন্দর বাঁশঝাড়, গোলাপের বাগান; Priest-এর সঙ্গে ব'সে অনেকক্ষণ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। রোমান ক্যাথলিক

পবিত্র Beautitude সম্বন্ধে আমাকে যা বোঝালেন তা অন্যভাবে আমি নিজের চিন্তার মধ্যে পেয়েছি। মানুষের মধ্যে একটা শক্তি বেড়ে যাবে, যাতে করে সে ভগবানের বিরাট সত্তা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ংগম ক'রে বিরাটের আনন্দ পাবে। বললেন Inquisition সম্বন্ধে বিশ্বাস করো না—ওটা আমাদের শত্রুদের লেখা, অনেক সত্য আছে বটে কিন্তু অতিরঞ্জনও খুব। বললেন, আমরা Truth সম্বন্ধে controversy করি না—দুটো-একটা doctrine যারা বাদ দিয়েছে তাদেরও বাদ দিয়েছি। রাজা বিয়ে করতে চাইলেন (Henry VIII)—সেই জন্যে আমরা ইংলণ্ডের মত দেশকে ছেঁটে বাদ দিলাম! St. Lewis বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, এতদূর এসেছেন, বললেন, আমরা আর দেশে ফিরবো না, মৃত্যু হয় তো এখানেই হবে।

সেখান থেকে বেরিয়ে কলেজের পথে অন্ধকার ঘন আমবনটা দিয়ে রেল লাইনে এসে উঠলাম। জ্যোৎস্না উঠেছে, পাতার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়েছে—এই পাশের তালতলায় গত ভাদ্র মাসে কল্পনা করেছিলাম দুর্গার তাল কুড়ানো, শৈশবে তাল প'ড়ে থাকলে গাছ-তলায় কি আনন্দ হোত। কি অপূর্ব আম্র-বউলের গন্ধ মাখা জ্যোৎস্না রাত্রিটা! সাঁকোটার উপর অনেকক্ষণ ব'সে স্টেশনে এলাম। কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে অনেককাল পরে দেখা—তিনি সংকীর্তন করতে যাচ্ছেন স্টেশনের বাসায়। বাজারে একটা শার্ট কিনে গ্রামোফোনের দোকানে রবি ঠাকুরের আবৃত্তি শুনলাম—আজি হ'তে শতবর্ষ পরে। বৃদ্ধ কবিবরের গম্ভীর গলায় উদাত্ত সুর বড় ভাল লাগল। তারপরে চন্ডীবাবু চ'লে গেল তার বাড়ী, আমি আসতে আসতে পথে ভোলাবাবুর সঙ্গে দেখা। ভোলাবাবু দীপুবাবুর বাড়ী যাচ্ছেন Electric fitings-এর canvass করতে। তাঁকে বললাম, দীপুবাবু এখন ব্রীজ খেলতে ব্যস্ত, সকালে না গেলে কি দেখা হবে!

দিনটা বেশ কাটল।

॥ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৮ ॥

সকালে নায়েবের সঙ্গে গেলাম কমলাকুন্ডু। বেশ ঘোড়া ছুটিয়ে সকালের হাওয়ায় রণচুর ক্ষেতের পাশ দিয়ে দিয়ে গেলাম। কয়েকদিনের জড়তাটা কেটে গেল। ক্ষেতে ক্ষেতে যব পেকেছে। পাকা ফসলের সুগন্ধ চারধার থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কখনো আমি ঘোড়া ছোটাই কখনো নায়েব মহাশয় ঘোড়া ছোটান। ফুলকিয়ার সীমানা ছাড়িয়েই জংগল থেকে একটা বুনো মহিষ বার হ'ল। সেটার মূর্তি দেখেই আমি বললাম, এটা মারতে পারে, ঘোড়া ঘোরান মশাই। খুর দিয়ে মাটি খুড়ে সেটা শিং নেড়ে লাল চোখে আমাদের দিকে চাইতে লাগলো। যদি তেড়ে মারতে আসে—দুজনে ঘোড়া ফিরিয়ে চালিয়ে খানিকটা এসে আবার দাঁড়িয়ে গেলাম—ততক্ষণ মহিষটা চলে গিয়েছে। তারপর আমরা ঘোড়া ফিরিয়ে কমলাকুন্ডু পৌঁছলাম। খুব রোদ চ'ড়েছে, কলবলিয়াতে স্নান করতে গেলাম। ঠান্ডা জলে নাইতে নাইতে ভাবছিলাম—ঐ আমাদের ইছামতী নদী। আমি একটা ছবি বেশ মনে করতে পারি—এই রকম ধূধূ বালিযাড়ী পাহাড় নয়, শান্ত, ছোট, স্নিগ্ধ ইছামতীর দু'পাড় ভ'রে ঝোপে ঝোপে কত বনকুসুম কত ফুলে ভরা ঘেঁটুবন, গাছপালা, গাঙ-শালিকের বাসা সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ। গাঁয়ে গাঁয়ে গ্রামের ঘাট, আকন্দ ফুল। গত পাঁচশত বৎসর ধ'রে কত ফুল ঝ'রে প'ড়ছে—কত পাখী কত বনঝোপ আসছে যাচ্ছে। স্নিগ্ধ পাটা শেওলার গন্ধ বার হয়, জেলেরা জাল ফেলে, ধারে ধারে কত গৃহস্থের বাড়ী। কত হাসিকান্নার মেলা। আজ পাঁচশত বছর ধ'রে কত গৃহস্থ এল, কত হাসিমুখ শিশু প্রথম মায়ের সঙ্গে নাইতে এল—কত বৎসর পরে বৃদ্ধাবস্থায় তার শ্মশানশয্যা হ'ল ঐ ঠান্ডা জলের কিনারাতেই, ঐ বাঁশবনের ঘাটের নীচেই। কত কত মা, কত ছেলে, কত

তরুণ-তরুণী সময়ের পাষাণবর্ত্ম বেয়ে এসেছে গিয়েছে মহাকালের বীথিপথ বেয়ে। ঐ শান্ত নদীর ধারে ঐ আকন্দ ফুল, ঐ পাটা শেওলা, বনঝোপ, ছাতিমবন।

এদের গল্প লিখবো, নাম হবে ইছামতী।

সন্ধ্যার পর কমলাকুণ্ডু থেকে বেরুলাম। দিব্যি জ্যোৎস্না উঠেছে। বালুর উপর চক্‌চকে জ্যোৎস্না! জয়পালের নৌকাতে পার হ'তে হ'তে বড় ভাল লাগছিল আর ভাবছিলাম—আজ বৃহস্পতিবার, এই জ্যোৎস্নায় আমাদের দেশে দারিঘাটের পুলের কাছ দিয়ে এসময় হাট ক'রে কেউ হয়তো ফিরছে। রাত্তিরে কারা মাছ ধ'রছে—রাজু সিং জালসমেত ধ'রে নিয়ে এল, ছেড়ে দিলাম। তারপর ফিনিকফোটা জ্যোৎস্না রাত্রে কাশবনের মধ্য দিয়ে আমি ও নায়েব পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সীমানার কাছে যেখানে ওবেলা মহিষ দেখেছিলাম ওখানে এলাম। মনে হ'ল দূরে আমার বাড়ী। এই জ্যোৎস্না-ওঠা সন্ধ্যায় মার সঞ্চিত হাঁড়িকলসীগুলো প'ড়ে আছে জঙ্গলভরা ভিটেতে। মার হাতের সজনে গাছটা এই ফাগুন দিনে জঙ্গলের মধ্যে ফুলে ভর্তি হয়ে উঠছে। কেউ দেখছে না, কেউ ভোগ করছে না। হরি রায়ের জমিটুকু নেবার কথা মা যখন সইমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি জানতেন না যে ছেলে তাঁর ঘরকুনো গেরস্ত গোছের ছাপোষা গেঁয়ো মানুষ হবে না। সে দেশে দেশে বহু দূরে বহু সমাজে পাহাড়ে পর্বতে ঘোড়ায় স্টীমারে ট্রেনে—সারা জগতের অধিবাসী হয়ে বেড়াবে। জীবনের যাত্রাপথের সে হবে উৎসাহী উন্মত্ত পথিক—পথের নেশাতেই ভোর। মা ছিলেন গৃহলক্ষ্মী, দরিদ্র ঘরে বিবাহ হওয়া পর্যন্ত এসে অল্প জিনিস সাজিয়ে গুছিয়ে চালিয়ে গিয়েছেন। সেই চাল ভাজা—সেই সব। ঘরকন্না সাজাবার বুদ্ধি যেমন মেয়েদের থাকে, তার বেশী তারা কিছু জানে না, বোঝেও না, মাও ছিলেন তেমনি। মা চিরদিন ঐ বাঁশবনের ঘাটে, তেঁতুলতলার শান্ত জীবনযাত্রা, সংকীর্ণ ছোট গণ্ডীর মধ্যেই কাটিয়ে গিয়েছেন—সে জীবনের বাইরে তিনি অন্য কোনো জীবনের সন্ধানও জানতেন না। তাই তাঁর সজনে গাছ পোঁতা, হরি রায়ের জমি নেবার পরামর্শ, বিয়ে না করতে চাওয়ায় সংসার উল্টে গেল এই ভাবে কান্না—যেন সত্যই তাঁর সংসার উল্টেই গেল—তাঁর সংসার—আমার সংসার নয়।

মাথার উপরের নক্ষত্রজগতের দিকে চেয়ে দেখলাম, এই জীবন ঐ পর্যন্ত বিস্তৃত। কত এরকম জ্যোৎস্না রাত্রি, কত এরকম যাওয়া আসা, কত জীবনানন্দ।

যে যাই ভাবুক আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি—শুধু বিশ্বাস বলে নয়—যেন দেখতেও পাই, হাজার হাজার বছর পরে ঐ আমার শৈশব-আনন্দভরা ভিটার মত আর কোন দেশে জন্মে অপূর্ব আনন্দভরা শৈশব যাপন ক'রবো—পৃথিবী-মায়ের বুকে নতুন হয়ে ফিরে আসবো!

সে যাক, দুর্বল-দৃষ্টি লোকে ভাবে আমি হয়েছি Theosophist.

জীবন ভোগ করতে হলে হৈ হৈ করে কাটিয়ে দিলে ভোগ হয় না—চাই চিন্তা, ধীর চিন্তা। গভীর চিন্তাতে জীবনরহস্যের গভীর অনুভূতি হয়। সেই ছেলেবেলার এই ফাল্গুনে বেল কুড়ানো, চড়কগাছ খেলা, সেই মা, জেঠীমা, নেড়া, ভরত—সে জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। সেই চাঁপাপুকুরের ধার, সেই যে কাদের বাড়ী বেড়াতে গেলাম, সেখানেও আজকার মত জ্যোৎস্না উঠেছে—সে জীবনও শেষ হয়ে গিয়েছে।

আমায় দূরে যেতে হবে—বহুদূর। তা'হলে ভারী চমৎকার জীবনের উপভোগ হবে। জ্যোৎস্না রাত্রি ফুজিসান পর্বতে, কি প্যারিসের কোনো বুলভার-এর ধারে, কি সমুদ্রের উপর জাহাজে, কি ইজিপ্টের লুক্সর, কি করনাকের মন্দিরের মধ্যে, নুবিয়া মরুভূমির উপরে—এইসব ভাবি।

॥ ১লা মার্চ, ১৯২৮ ॥

কাল সন্ধ্যার পর ভাবলাম, দোলপূর্ণিমার রাত্রে ঘোড়ায় বেড়াতে হবে। খুব বেলা গেলে বেরিয়ে রামজোতের বাগানের কাছে যেতেই জ্যোৎস্না উঠে গেল। রামচন্দ্র সিং-এর সঙ্গে কথা ক'য়ে বড় কুণ্ডীটার ধার দিয়ে নির্জন কাশ-জঙ্গলের পথে ঘোড়া চালিয়ে দিলাম। খুব জ্যোৎস্না উঠেছে! নির্জন। বহুদূর পর্যন্ত কেউ কোথাও নেই। শুধু কাশ-জঙ্গল, আর জলের ধার। লোধাইটোলার জঙ্গল পেরিয়ে জলাটার ওপর বড় সুন্দর জ্যোৎস্না প'ড়েছে—খানিকক্ষণ ঘোড়া ইচ্ছামত ছেড়ে দিয়ে বসে রইলাম। তারপর খুব জোরে ঘোড়া চালিয়ে ফিরে এলাম।

আজ পূর্ণিমার রাত্রি। সারাদিন ভীষণ পশ্চিমা বাতাস ব'য়েছে—এখনও সমানে বইছে। ধুলো-বালিতে চারধার ভরপুর, পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, বালি-ধুলোর পর্দায় ম্লান করে দিয়েছে—ঘোলা ঘোলা জ্যোৎস্না। সামনের ধু ধু কাশবনগুলো জ্যোৎস্নায় অদ্ভুত দেখাচ্ছে, হাওয়ায় নুয়ে নুয়ে পড়েছে—বহুদূর জঙ্গলে আগুন লেগেছে, সেদিকের আকাশটা রাঙা হয়ে উঠেছে। আর মাঝে মাঝে দাউ দাউ ক'রে লকলকে আগুনের শিখা খুব উঁচু হয়ে আকাশটাকে লেহন করতে ছুটছে।

বাংলাদেশের শান্ত দৃশ্যের কাছে এই নির্জন বাত্যাক্ষুব্ধ ধু ধু জ্যোৎস্নাভরা মাঠ জঙ্গলের দৃশ্য, ঐ বনের আগুন, এই ধুলোভরা আকাশ কি অদ্ভুত মনে হয়।

॥ ৬ই মার্চ, ১৯২৮ ॥

রামবাবুর ঘোড়াটা চ'ড়ে বড় আরাম পাওয়া গেল। কাল বৈকালে, পরশু রামপুরের মাঠে একেবারে সোজা কদমচালে চলে গেল—আজ তেলির সাক্ষী দিতে নওগাছিয়া হয়ে এলাম—কি সুন্দর, লছমীপুরের ধাপটার কাছে এসে দেখি রূপলাল সবে ধাপটা পার হচ্ছে, লোকারা চামার মোট নিয়ে পিছনে। ঘোড়াটা হু হু করে উঁচু পাড়টার ওপর উঠে গেল—কি সুন্দর কদমই ধরলে! এরকম ঘোড়া চড়া কখনো হয়নি, এ কয়দিন বেশ হ'ল। নওগাছিয়া ইঁদারার কাছে ঘোড়া জল খেলে—তারপর একেবারে রামবাবুদের গোলা। তারপর ভাগলপুরে এসেই চণ্ডীবাবুদের বাড়ী এলাম। অনাদিবাবুর সঙ্গে গল্প করলাম, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মনে হ'ল সেই পাশের পথটা—পিসিমা জল নিয়ে প্রথম এল—আমি বাবার সঙ্গে কলকাতা থেকে সেই প্রথম এলাম—দেখতে দেখতে কতকাল হ'ল!

Goethe-এর কথাটা ভাল লাগে—Those who cannot hope about a future life are already dead in this life. সন্ধ্যাবেলা অনিলবাবু উকিলের সঙ্গে মুকুন্দ দাসের যাত্রা শোনা গেল।

॥ ১৪ই মার্চ, ১৯২৮ ॥

আজ ভণ্ড সিং-এর জাহাজে বিকালের দিকে ভাগলপুর থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার পূর্বে এলাম মহাদেবপুর ঘাট। মেঘান্ধকার সন্ধ্যা—মুকুন্দ, মাগব, পূরণ, ছটু সিং এবং সিপজী ও রূপলাল—এই কয়জন সঙ্গে। অন্ধকারের মধ্যে ঘোড়া চালিয়ে আসতে সাহস না পেয়ে আস্তে আস্তে এলাম। বালির চরে আসতে না আসতে অন্ধকার হয়ে গেল—বাঁ ধারে পর্বতের জঙ্গলে আগুন জ্বলছে। গঙ্গার ঘড়িয়ালগুলো আমাদের পায়ের শব্দে হুড়ুম হুড়ুম ক'রে জলে নেমে গেল। আমি নেমে হেঁটে চললাম। মুকুন্দকে বললাম, গল্প বল—সে গল্প আরম্ভ করে দিলে। খানিকটা এসে দিকভ্রম লাগল বালির চরের ওপরে। এত ঘন অন্ধকার যে, দু'হাত তফাতের মানুষ দেখা যায় না—আমার বড় লণ্ঠনটা জেবলে নিয়ে তবু অনেকটা সুবিধে হ'ল। মুকুন্দ বললে, রাক্ষসের আলো জ্বলছে—এদেশে আলেয়াকে রাক্ষসের আলো বলে। কত ভূতের গল্প হ'ল!

'দেবতার ব্যথা'য় এইরকম লিখতে হবে যে, কোন উন্নততর গ্রহের জীবেরা অসীম-শূন্য বেয়ে দূর গ্রহের উদ্দেশে যাত্রা ক'রে—পথও হারিয়ে যায়। অসীম শূন্য বেয়ে, অসীম অন্ধকারে তাদের যাত্রা, দুর্জয় সাহসী Pioneers!

॥ ১৫ই মার্চ, ১৯২৮ ॥

আজ বিকালে ঘোড়া ক'রে পরশুরামপুর কাছারী এলাম। কুলিরা আগেই রওনা হয়ে গিয়েছিল। মুনেশ্বর ধ'রে-বেঁধে একজন কুলিকে শেষে যোগাড় ক'রে তাকে দিয়ে টেবিল চেয়ার পাঠালে। আমি একটু বেলা গেলেই রওনা হলাম। কাল Imperial Library থেকে Conrad-এর বইখানা পাঠিয়ে দিয়েছে—আজ সেইটা পড়ছিলাম। আজকাল ইস্মাইলপুর কাছারীটা বড় সুন্দর লাগে। দুধলীঘাসের ফুল, কণ্টিকারীর বেগুনী ফুল, বনমূলোর ফুল, আকন্দের ফুল। বৈকালে আজ বেড়াতে গেলাম, ক্ষেতে ক্ষেতে পাকা শস্যের গন্ধ, কার্টুনি মজুরেরা ফসল কাটছে। কাছারীর ওপর দিয়ে দুবেলা মেয়েমানুষেরা যাচ্ছে—সকালটা বেশ লাগে। কি অদ্ভুত দুপুরটা—দুপুর রোদে ঝাউ ও কাশবন যেন কোন রহস্যের গভীর মায়া-যবনিকায় ঢাকা থাকে। কত অসম্ভব আর আজগুবী চিন্তা মনে নিয়ে এসে ফেলে। বিহারের ঐ সুদূরপ্রসারী প্রান্তর, দূরের রৌদ্রে ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্ট নীল পাহাড় দুটো—পীরপৈঁতির পাহাড়শ্রেণী, দিলবরের খুবড়ীর পিছন দিয়ে, রামবাবুদের বাসার পিছন দিয়ে একেবারে এতমাদপুরের কাছারীর দিকে বিস্তৃত থাকে। বড় মৌন, রহস্যময় মনে হয় এই খররৌদ্র-প্লাবিত চৈত্র-দুপুর।

আসতে আসতে রণপাল মণ্ডলের ক্ষেতের কাছে জঙ্গলটার সামনেই দেখলাম জমাদার আসছে পরশুরামপুর থেকে—বললে, কুলীরা সব পৌঁছে গিয়েছে। জঙ্গলটার কি সোঁদা সোঁদা গন্ধ! বার হয়েই লোধাইটোলার ধাপটার ওপারে উন্মুক্ত প্রান্তর, দূরের পাহাড়, হু হু উন্মুক্ত হাওয়া, আবার সেই পাকা ফসলের গন্ধ—আঃ, এই জীবন! ভাবছিলাম সেই কত দিন আগে পিসিমা এল, ঠাকুরমাদের পাশের পথটা দিয়ে—আমি ও বাবা এসেছি মামার বাড়ী থেকে, পিসিমা কাওঘাটে—সেই সব দিনগুলো। নেড়ার বাবা এখনও নতিডাঙ্গা মাধবপুর ক'রে বেড়াচ্ছে—আর আমাদের বাংলার গাছে গাছে ফুল ফুটেছে। কচিপাতা গজিয়েছে, কোকিল ডাকছে, কাঞ্চনফুল গাছ আলো ক'রেছে...অবসন্ন গ্রীষ্ম-বেলায় ঝোপে ঝোপে সুমিষ্ট বনফুলের বাস—বেলের পাতা—চড়কের ঢাক—গোষ্ঠবিহার—কোকিলের কুহু, পাপিয়ার মনমাতানো সুর, রামনবমী।

অন্ধকার হবার সঙ্গে সঙ্গে বালিতে পড়লাম—রাজু সিং এপারেই দাঁড়িয়ে ছিল—জল পার ক'রে ঘোড়া নিয়ে গেল। দুবে এসে অনেক দুঃখ করতে লাগল যে, সে তার মেয়ের বিয়ে জমাদারের সঙ্গে দেবে না, তবুও কেন নায়েব তার জন্যে পীড়াপীড়ি করছে!

॥ ২০শে মার্চ, ১৯২৮ ॥

পরশুরামপুর কাছারিতে অনেকদিন পরে বাস করছি। সেই প্রথম ভাগলপুরে এসে হেমন্তবাবুর আমলে কিছুদিন ছিলাম বটে, তারপর সেই একবার এসে বস্তির মধ্যে ঘরটায় ছিলাম। অনেকদিন পরে এখানে কিছুদিনের জন্যে বাস করতে এসে বড় ভাল লাগছে। আজ সকালে উঠে দেখি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বড় মন-খারাপ হয়ে গেল—কিন্তু একটু বেলা হলেই মেঘটুকু কেটে খুব কড়া রোদ উঠল। গরমও। গৈফুর তহশীলদারের সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে স্নিগ্ধ গভীর শীতল অবগাহন স্নান ক'রে বড় আরাম পেলাম বহুদিন পরে। স্নান করতে করতে কেবলই মনে হচ্ছিল, আমাদের গাঁয়ের ইছা-বাঁশবনের ছায়ায় কোকিলের ডাক শুনতে শুনতে ফিরে আসা। বালি তেতে বড় গরম

হয়েছে—পা পুড়ে যাচ্ছে। রাখালবাবু মারা গিয়েছেন। শুনে বৈকালে ঘোড়া নিয়ে তাঁর বাড়ী তিনটাঙাতে দেখতে গেলাম। জয়পাল সাধুর বাড়ীর কাছে গিয়ে একজন স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করলাম—ডাক্তারবাবুর বাড়ী কোথায়? সে কথা বললে না। তারপর একটা লোককে জিজ্ঞাসা করাতে সে রাস্তা বলে দিলে। এর ওর বাড়ীর সামনে দিয়ে একটা বাড়ীর কাছে এলে, একটা ফসামত ছেলে বললে, ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে কেউ নেই। সেখানে দেখি, মটুকনাথ পণ্ডিত কি করছে। সেই মটুকনাথ—যে তৌজির দিন কাছারী গিয়ে কানের পোকা বার করবার যোগাড় করেছিল। ফিরলাম যখন বেলা পড়ে গিয়েছে। বহু-দিন দিয়ারায় থাকবার সময় চোখে যখন হঠাৎ এই বড় বট অশ্বত্থগাছ দেখি তখন একঘেয়ে কাশ-ঝাউবনের দৃশ্যের সঙ্গে তুলনায় মনে হয়, যেন কোন অঙ্গারযুগের পৃথিবী থেকে হঠাৎ উচ্চে বিবর্তনের জগতে এসে পৌঁছেছি।

স্নিগ্ধ বৈকাল। ঝোপে ঝোপে পাখী কিচ্ কিচ্ করছে, আলোকলতা দুলছে। আস্তে আস্তে ঘোড়া চালিয়ে এসে পথের ধারে একটা রোদপোড়া ঘাসেভরা মাঠ পেলাম—বড় ভাল লাগল। মাঠের একটা বড় অশ্বত্থ গাছে নতুন কাঁচ রক্তাভ পাতা গজিয়েছে। অনেক শকুনির বাসা—মাঠে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম। এই স্নিগ্ধ বৈকালে আমাদের ইছামতীর ঘাটের পথ বেয়ে গ্রামের মেয়েরা সব গা ধুয়ে আসছে। যারা ছিল বিশ বছর পূর্বে নববধূ তারা আজ প্রৌঢ়া, জীবনের কত সুখ-দুঃখের ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। সেই কুলগাছ দেখে এসে বাঁশতলায় বসা—পিসিমার সেই কাণ্ডকাটা বাঁশবন, মার হাতের হাঁড়ি কলসী পোড়ো ভিটায় পড়া—মার হাতের পোঁতা সজনে গাছ—এই স্নিগ্ধ বৈকালে কচিপাতা ওঠা অদ্ভুত ধরনের আঁকাবাঁকা গাছটার সীমারেখার দিকে চেয়ে মন-মাতানো কোকিল, পাপিয়ার উদাস ডাক শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল জীবনটা কি অপূর্ব করুণ সঙ্গীত! সন্ধ্যার পূরবী গৌরী রাগিণীর মত নির্লিপ্ত নির্বিকার, অথচ চারু-শিল্পের চরম দান। বিহারের এই ধূ-ধূ উদাস মাঠ প্রান্তর, দূরপ্রসারী দিক্-চক্রবাল, দু'একটি পুরোনো শিমুলগাছ—রক্ত সুর্যাস্ত বড় ভাল লাগে। দূরের নীল পাহাড়টা—যেন এক মায়ারাজ্যের সীমা এঁকেছে সন্ধ্যাধূসর পূর্ব আকাশপটে। সারাদিনের খররৌদ্রদগ্ধ মাটির সোঁদা সোঁদা রোদপোড়া গন্ধ, তারপরেই কলবলিয়ার ঠাণ্ডা জলের গন্ধ—বড় আনন্দ পেলাম আজ।

এখানকার জলের গুণ বড় ভাল দেখছি।

দুপুরবেলা কমলাকুণ্ডুর কাছারীতে বসে বসে লিখি—খর-প্রচণ্ড চৈত্র-রৌদ্র—পাশের ঘর যেন আগুনের মত দাউ দাউ জ্বলে—হু-হু পশ্চিমে হাওয়া বয়, আমার খোলা দরজার ঠিক সামনে দূরের ঐ কচিপাতা ওঠা শিশুগাছটির দিকে ও তার পেছনকার উটের পিঠের কুঁজের মত ধূসর পাহাড়টার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি—কেবল মনে পড়ে, এই মধ্যাহ্নে বাংলাদেশের কত অজানা মাঠ—ঘেঁটুফুলে ভরা, উলুখড়ে ভরা, কত মোটা মোটা গুলঞ্চ-লতা-দুলানো, রাঙাফুলে ভরা শিমুলগাছ। এ গাছের ও গাছের তলায় যেন বসলাম। অজানা গ্রাম্যপথে মাঠের ধারের বনে গাছতলায় স্নিগ্ধ ছায়ায় ব'সতে ব'সতে পথ হাঁটা, রেলপথ থেকে বহু-বহুদূরে সব গ্রাম—কত দরিদ্র পল্লীতে শান্ত নিভৃত জীবনযাত্রা। কত ঘরে কত সুখ-দুঃখ—কত বধূ কত কন্যার শান্ত চোখ।

॥ ২১শে মার্চ, ১৯২৮ ॥

আজকার বেড়ানোটা সবচেয়ে অপূর্ব। কলবলিয়া পার হয়ে মুকুন্দপুরের পথে বেড়াতে গেলাম। বেলা একেবারে গিয়েছে। বাঁ ধারে কলবলিয়ার ওপারে সিমানিপুরের দিয়ারাতে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কমলাকুণ্ডু পার হয়েই পথের ধারে বড় বড় শিমুল পাকুড়-

গাছ, ঘেঁটুফুলের তেতো গন্ধ—বাঁশঝাড়, কোকিলের ডাক, গ্রামসীমার গাছপালার মধ্যে পাপিয়া ডাকছে। বসন্তের দিনে বেশ লাগল। অজানাপথে আকন্দফুল কচি ওড়াফুলের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে যেতে এমন লাগছিল! যেতে যেতে একটা গ্রাম প'ড়লো—লবটুলিয়া, পরে বোচাহি। পথে কীর্তনীয়া বৃন্দাবন হেঁটে আসছে—বললে, নাগেরা গিয়েছিল কীর্তন করতে। আমি বললাম—রামবাবুর ওখানে? তারপর সে চ'লে গেল। ক্রমে ডিমুহী পেলাম। তারপর চৌধুরীটোলা। সেইখানটায় গিয়ে পথের ডানধারে একটা সরু মাটির পথ—দু'ধারে ঘন শিশুগাছের শ্রেণী—ছায়াভরা মাটির গন্ধ। রাস্তা ছেড়ে দিয়ে সেই পথ ধরলাম। একটু দূরে গিয়ে একটা পোড়ো ভিটামত—ঘেঁটুফুলের একেবারে জঙ্গল। ঘেঁটুফুলের গন্ধে একেবারে ভরপুর। ওদিকে আর একটা বাঁশঝাড়, একটা পাড়া। সেইখানটা গিয়ে মনে প'ড়ল অনেকদিন আগে সেই যে গিয়েছিলাম বাগান-গাঁয়ে রাখালী পিসিমার বাড়ী গিয়ে, ওদিকে কোদলার ধারে একটা পুরোনো ভিটেতে—সেই কথা মনে পড়ল। ঠিক যেন সেই স্থানটা—এ স্থানটা ঠিক যেন বাংলাদেশ! বিহারে এতদিন পরে বাংলার সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম—কোন্ বিদেশে আছি—আজ আমার দেশে বৃহস্পতিবারের হাট, পঞ্চাননতলা দিয়ে মনো শ্যামাচরণ দাদা ফণীকাকা হাট ক'রে ফিরছে—কেউ জিজ্ঞাসা করছে—আজ বেগুনের সের কত? তুমি বুঝি এখন হাট থেকে এলে? আমার মায়ের হাতে পোঁতা সজনেগাছ—ভাঙা কলসী—হরি রায়ের বিষয়—

সে সব থেকে কতদূরে বিদেশে ঘোড়া করে বেড়াচ্ছি—অজানা গ্রামের পথে পথে, অজানা ঘেঁটুফুলের ঝোপের ধারে ধারে—আমার কি সাজে কলকাতার অফিসে ব'সে বন্ধ হাওয়ায় কাজ? আমার জন্যে এই আকাশ ওই সূর্যাস্ত ওই নদী ওই মুক্তহাওয়া, স্বাধীনতা—অপূর্ব অপরাহ্ণ! ডেস্কে ব'সে শুধু লেখবার কাজ আমার নয়!

॥ ২২শে মার্চ, ১৯২৮ ॥

কাল বৈকালে পরশুরামপুরে দিয়ারায় লবটুলিয়ার এপারে খুব দাঙ্গা হয়ে গেল। দাঙ্গার হৈ হৈ শব্দ কাছারী থেকে শোনা যাচ্ছিল। নারায়ণকে ঘোড়া দিয়ে পাঠানো হ'ল। খুব ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে খবর দিলে—আজ সকালে আমি ও নুটু ঘোড়া ক'রে জঙ্গলের পথে ইসমাইলপুর চ'লে এলাম। পাঁচটার সময় ঘুম থেকে উঠে চেয়ার নিয়ে বারান্দাটাতে বসলাম। দূরে নীল পাহাড়টার দিকে চেয়ে মনে হ'ল, সুন্দর ইছামতী—আমাদের গ্রাম—এই বৈশাখের সুগন্ধভরা প্রভাত, অপরাহ্ণ, সেই আম-জাম-তলা, মাঠ, নদী—ঠাকুরমাদের বেলতলাটা বেলফুলের গন্ধ—কতদিনের কত আনন্দ!

খুব জ্যোৎস্না—বড় সুন্দর লাগল।

॥ ২৮শে মার্চ, ১৯২৮ ॥

পরশু গেল রামনবমী। বসে বসে ভাবছিলাম এই দুপুরে এতক্ষণে পা ছড়িয়ে বালির ওপর দিয়ে সব খেতে চলেছে কারা? রাখাল রায়, হরিশ বাঁড়ুয্যে, বাবা এঁরা নন। তাঁদের পৌত্রের দলেরাই বেশী। সন্ধ্যার সময় বাদা ময়রার দোকান খুলবে—এই জ্যোৎস্নায়। জীবনটা একটা অবান্তর রূপকথার কাহিনীর মত মধুর ও রহস্যময় ঠেকে।

তারাভরা আকাশের দিকে চাইলে সেই চাঁপাপুকুরের নিমন্ত্রণ খাওয়ার বাড়ী, আড়ংঘাটার ঠাকুরবাড়ীর ছাদ মনে হয়। সমুদয় আকাশ, তারাগুলো অপূর্ব রহস্যঘেরা মনে হয়। কাল গেল ১লা এপ্রিল। "সেই ১লা এপ্রিলের শান্তোজ্জ্বল ঊষালোকে" ছেলেবেলাকার

কথা। কাল নুটু চ'লে গেল এখান থেকে। বড় পশ্চিমে বাতাসটা দিয়েছে কাল।

॥ ২রা এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজ গুডফ্রাইডে। অনেককাল আগে মনে পড়ে এইদিন বনগাঁ স্কুল থেকে সন্ধ্যাবেলা আমি আর ভরত ঝাড়ী চ'লে এসেছিলাম। সেইরাতেই যেন ভরত মারা গেল। কতকালের কথা সে সব, তবু মনে হয় সেদিন। তারপর কত গুডফ্রাইডে কেটে গেল। কালের চক্রটা ভয়ানক বেগে ঘুরে চলেছে।

এইমাত্র হঠাৎ বড় ঝড় এল। আমি আর গোষ্ঠবাবু আমার ঘরের সামনে বসে আছি—এমন সময় দেখা গেল উত্তর-পশ্চিম কোণে ঘন কালো মেঘের পাড়। হাওয়াটা যেন একটু জোর—এমন কি আমরা বলছিলাম বেশ হাওয়া তো! দেখতে দেখতে মেঘের পাড়টা গুমরে উঠলো—তার পরই হু হু ক'রে ঝড়টা এল—সঙ্গে সঙ্গে ধুলো ও দিয়ারায় বালির চরের সমস্ত বালি উড়ে আসতে লাগল—কমে না—এক এক দমকায় আমার ঘরখানা তো কাঁপতে লাগল।

॥ ৬ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজ খুব বর্ষা ঘনিয়ে এল ভাগলপুরের দিক থেকে বিকেলটাতে। ছেলেবেলাকার মত কালবৈশাখী যেন। ঘন-কালো মেঘটা ঘুরে গঙ্গার দিক থেকে পৈঁতির পাহাড়ের দিকে ছড়িয়ে প'ড়তে লাগল, কালকের সকালে যে চারধারে পরিষ্কার বাদামে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল—বোংশী, জামালপুর—সব ঢেকে দিলে।

ঘনান্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে মনে হল, এই তো জীবনের সম্পদ—হয়তো তিন হাজার বছর পরে আবার পৃথিবীর বুকে আসবো—তিন হাজার বছর আগের ষাট বৎসরের প্রতিদিন কি অবদানে, সুষমায়, স্মৃতিতে মণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল—কত কালবৈশাখীর মেঘে, কত চোখের হাসিতে, চাঁপাফুলের গন্ধে, কত দুঃখে, কত গানে—সে সব তখন কি মনে থাকবে? এই একটা একটা দিন জীবনের মণিহারে গাঁথা অপূর্ব সম্পদ—প্রতিদিনের হাসিকান্না, সুখ-দুঃখ বন্ধতা—সব। দূরে হয়তো মায়ের হাতে পোঁতা সজনে গাছে এতদিনে বনের মধ্যে ডাঁটা ধরে আছে—কে জানে? হয়তো কেউ তুলে নিয়ে গিয়েছে—নয়তো নয়। গতির অপূর্ব বিচিত্রতা আমি লক্ষ্য করছি—সে আমার চোখে প'ড়েছে।

বসে আছি—কিন্তু কি বিশালবেগে চলেছি।

॥ ৯ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

কাল থেকে কি একরকম অজানা খুশিতে মন থেকে থেকে ভরে উঠছে—ওই দূরের নীল পাহাড়টার পাশের দিকে চেয়ে থাকলেই সে আনন্দটা পাই। কাল তাই ভাবছিলাম, হে বিশ্বদেব, কি অপূর্ব কাণ্ড সৃষ্টিই করেছ এই মানুষের জীবনে, এই বিশ্বে!

আজ সকালে উঠে গেলাম গঙ্গাস্নান করতে। ফিরে এসে কালীঘরে কলসী উৎসর্গ ক'রে ভারী তৃপ্তি পাওয়া গেল। শুয়োরমারী থেকে সিদ্ধেশ্বর নাপিতকে রামচরিত ডেকে আনলে, কারণ মোহনের অসুখ ক'রেছে। তারপর খাওয়ার পর একটু ঘুমোনো গেল। বড় গরমটা প'ড়ে গিয়েছে।

দুপুরে রেড়িক্ষেতের কাছটা থেকে ফিরে আসতে হঠাৎ মনে হ'ল, আজ চড়ক, তিরিশে চৈত্র অমনি সারা গা-টা যেন শিউরে উঠল—শত-স্মৃতির দ্বার এক ঝাপ্‌টা হাওয়ায় খুলে গেল। দুপুরের খররৌদ্রভরা আকাশের তলায় হলুদরং-এর বনমুলোর ফুল, আকন্দফুল, বেগুনী-কণ্টিকারী ফুল পোড়ো জমিটাতে অজস্র ফুটে অনন্তের

সন্ধান এনেছে—আমার খড়ের বাংলাঘরের পিছনে। ঐখানটায় দাঁড়িয়ে দূরের নীল পাহাড়-গুলোর দিকে চেয়ে মনে প'ড়ল, এতক্ষণ আমাদের চড়কতলায় হয়তো দোকান-পসার ব'সে গিয়েছে—হয়তো সেই গাছটায় ছেলেবেলার মত কাঁটা ভাঙছে—কাল গিয়েছে নীলের দিন। হয়তো গাঁয়ে যাত্রা হবে—হয়তো কত আনন্দ হচ্ছে—পুরোনো দলের কেউ কাঁটা ভাঙছে না। নতুন দলের ছেলেপিলেরা, শ'ত জেলে এখনও বেঁচে আছে।

আমাদের বাড়ীর ভিটেটাতে নতুন পোতা প'ড়ে আছে, কতকাল আগের এক নববর্ষের জলদানের চিহ্ন—দাতা হয়তো বেঁচে নেই। কত যত্নে তোলা ছিল—সেই সজনে গাছটার মত, কত যত্নে সঞ্চয় করা সামনে বাঁশতলার ভিটেটাতে যে-সব খোলা-খাপরা প'ড়ে আছে, কতকাল আগেকার কোন বিস্মৃত নব-বর্ষের ঘটদানের ভাঙা কলসীর খোলা-খাপরা সে-সব? ভাবতেও—এতকালের অনন্ত-প্রবাহের চিন্তা করেই গা কেমন শিউরে ওঠে।

সূর্য আছে, চন্দ্র আছে, অসীম বস্তুপিণ্ডগুলো আছে—কিন্তু মানুষ যদি না থাকতো, তবে কিছু না। মানুষ আছে ব'লেই এই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব, সুখের-দুঃখের আনন্দ-উৎস। অজানা গ্রহে-নক্ষত্রে কি আছে জানি না, কিন্তু মনে হয় সে-সব স্থান মরুভূমি নয়—তরুণ-মুখের হাসিকান্নায়, সে-সব অজানা দূরের জগৎও জাগ্রত প্রাণস্পন্দনে ভরা, সেখানেও বিচিত্র সন্ধ্যাকাশে বিচিত্র বন-পর্বতের নির্জনতায় বিরহী একা বসে প্রিয়ার কথা ভাবে, মা হারানো-ছেলের স্মৃতিতে চোখের জল ফেলেন, দেশকর্তারা বড় বড় কাজ করেন, বড় বড় যুদ্ধবিগ্রহ হয়।

এই পৃথিবীতে এই মানুষের মনের সুখ-দুঃখ নিয়েই ভগবানের অপূর্ব কাব্য। এর সংগে জীব জন্তুর, গাছপালার দুঃখ তাঁর মনে আসে যদি, তবে তাঁর আনন্দের তুলনা কোথায়?

॥ ১৩ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥ ৩০শে চৈত্র, ১৩৩৪ ॥

নব-বর্ষের দিনটা।

অনেককাল আগের শৈশবের সেই-সব কালবৈশাখীর দিনের কথা মনে পড়ে। সেই বৃষ্টির গন্ধ, মেঘান্ধকার! আকাশের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে ঘরের কোণে বসা, কাঁথা পাতা, শিল-পড়ার আশায় আগ্রহে আকাশের দিকে ঘন-ঘন চাওয়া, ঘরের দাওয়ায় চেয়ার পেতে মেঘান্ধকার আকাশের দূর পূর্বপ্রান্তে চেয়ে বিদ্যুৎ-চমক, বৃষ্টির গন্ধ উপভোগ করতে করতে মনে পড়ল, কত কথা। অনেক দূরে আজ আমার গ্রামে হয়তো চড়কের গোষ্ঠবিহার, ছেলেবেলার মত মেলা হচ্ছে, কত হাসিমুখ ছেলেমেয়ে, পাড়াগাঁয়ের কত মাটির ঘর থেকে এসেছে—এতক্ষণ লাঠিখেলা চলেছে—পঁচিশ বৎসর আগের মত হয়তো। পঁচিশ বৎসর আগের সে বালকের কথা মনে হয়, যার মনে কালবৈশাখী অপূর্ব বার্তা আনতো!

ত্রিশ পঞ্চাশ একশো হাজার তিন হাজার বছর কেটে যাবে। তিন হাজার বছর পরেকার যে বাংলার ছবি আমি এই মেঘান্ধকার নির্জন সন্ধ্যাটিতে বাংলা থেকে দূরের দেশে এক জংগল-পাহাড়ের ধারে ঘরটিতে ব'সে মনে আনতে চেষ্টা করি। হয়তো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সভ্যতা, যার বিষয় আমরা কল্পনা করতেও সাহস পাই না, সম্পূর্ণ নতুন ধরণের রাজনৈতিক অবস্থা তখন জগতে এসেছে। হয়তো ইংরেজজাতির কথা, প্রাচীন গ্রীক রোমানদের মত ইতিহাসের গল্পের বিষয়ীভূত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেল স্টীমার এরোপ্লেন টেলিগ্রাফ তখন প্রাচীন যুগের মানব সভ্যতার কৌতূহলপ্রদ নিদর্শন-স্বরূপ—সে ভবিষ্যৎযুগের মানবের চিত্রশালিকায় রক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান বাংলাভাষা, তখন আর কেউ বুঝতে পারবে না, হয়তো এ ভাষা একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়ে এর স্থানে সম্পূর্ণ নতুন এক ধরণের ভাষা প্রচলিত হবে। বহুদূরে ভবিষ্যতের ছবি!

তখনও এই রকম কালবৈশাখী নামবে, এই রকম মেঘান্ধকার আকাশ নিয়ে, ভিজে মাটির গন্ধ নিয়ে, ঝড় নিয়ে, বৃষ্টির শীকরসিক্ত ঠান্ডা জলো হাওয়া নিয়ে, তীক্ষ্ম বিদ্যুৎ-চমক নিয়ে—তিন হাজার বছর পরের বৈশাখ-অপরাহ্নের উপর।

তখন কি কেউ ভাববে তিন হাজার বৎসর পূর্বের প্রাচীন যুগের এক বিস্মৃত কাল-বৈশাখীর সন্ধ্যায় এক বিস্মৃত গ্রাম্য বালকের ক্ষুদ্র জগৎটি এই রকম বৃষ্টির গন্ধে, ঝোড়ো হাওয়ায় কি অপূর্ব আনন্দে দুলে উঠতো? এই মেঘান্ধকার আকাশের বিদ্যুৎচমক—সকলের চেয়ে এই বৃষ্টির ভিজে সোঁদা সোঁদা গন্ধটা কি আশা, উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা, দূর দেশের, দূরের উত্তাল মহাসমুদ্রের, ঘটনাবহুল অস্থির জীবনযাত্রার কি মায়া-ছবি তার শৈশবমনে ফুটিয়ে তুলতো?

কোথায় লেখা থাকবে তার তিন হাজার বৎসর পূর্বের এক বিস্মৃত অতীতের সে সব আনন্দভরা জীবনযাত্রা, বহুদিন পরে বাড়ী ফিরে মায়ের হাতে বেলের পানা খাওয়ার মধুময় চৈত্র অপরাহ্নটি, বাঁশবনের ছায়ায় অপরাহ্নের নিদ্রা ভেঙে পাপিয়ার যে মন-মাতানো ডাক- গ্রাম্যনদীটির ধারে শ্যাম তৃণদলের উপর ব'সে ব'সে কত গান গাওয়া, কত আনন্দ কল্পনা, এক বৈশাখের রাত্রিতে প্রথম বর্ষণসিক্ত ধরণীর সেই মৃদু সুগন্ধ যা তার নব-বিবাহিতা তরুণী পত্নীর সঙ্গে সে উপভোগ করেছিল? কোথায় লেখা থাকবে বর্ষাদিনের বৃষ্টিসিক্ত রাত্রিগুলোর সে সব আনন্দকাহিনী?

দূর ভবিষ্যতের যে সব তরুণ বালক-বালিকার মনে এই কালবৈশাখীর নব আনন্দের বার্তা আনবে, কোন্ পথে তারা আসবে?

এই সন্ধ্যায় ব'সে গভীর-ভাবে এ কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কোন্ গভীরের মধ্যে ডুবে গেলাম! মেঘভরা নির্জন সন্ধ্যা—বিদ্যুৎচমক—ঝড়ের শব্দ—হঠাৎ এই জলের গন্ধে এক অপূর্ব বার্তার আনন্দে মন শিউরে উঠলো।

এই ঘন মেঘের পরপারে কোথায় যেন আছে অনন্ত প্রাণধারার উৎস, দিকে দিকে যুগে যুগে প্রবহমাণ জীবনের উৎসব, নিত্য শাশ্বত আনন্দলীলা ও অনন্তের গভীর রহস্য, বিশালতা, আর যা আছে, তাদের বর্ণনা মানুষের ভাষায় নেই—কোনো ভাষার ব্যাকরণে তার প্রতিশব্দ গ'ড়তে পারেনি। 'অনন্ত' 'শাশ্বত' 'নিত্য' 'বিরাট' প্রভৃতি মামুলী একঘেয়ে কথায় তার বর্ণনা শেষ হয়ে যায় না, বোঝানো যায় না প্রকৃত রূপ—যে শুধু এই কালবৈশাখীর বৃষ্টির গন্ধ মিশানো দূর হাওয়ায়, ঘন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎচমকে, ঘনান্ধকার আকাশের রহস্যে মনে আসে—অনন্তের সে বেণুগীত।

মানুষের চিন্তা বড় পঙ্গু, তার শক্তি নেই সেখানে পৌঁছয়। নক্ষত্রলোকে যদি কোনো দুঃসাহসিক মানুষ যেতে চায় তবে রেল কি মোটর বাহন নির্দিষ্ট করলে তাকে চলবে না। তাকে যোগাড় করতে হবে আলোকের রথ—একমাত্র আলোকের গতি তাকে আশ্রয় করতে হবে সেখানে পৌঁছাতে হলে। এমন একটা জিনিস আছে, যা মনোজগতে আলোর রথের কাজ করে। মনোজগতের সুদূরের বাহন এই জিনিসটা Logic-সঙ্গত। শান্ত, সুষ্ঠু ক্রমবদ্ধ, হুঁশিয়ার চিন্তাপদ্ধতি অবলম্বনে সেখানে পৌঁছতে তুমি লীলাসম্বরণ ক'রে ফেলবে তবুও হয়তো পৌঁছতে পারবে না।

সে জিনিসটা কি তা বোঝানো মুশকিল, শুধু অনুভব ক'রে আস্বাদ করবার জিনিস সেটা। Bergson তাকেই Intuition ব'লেছেন বোধ হয়—আমি ঠিক জানি না।

আমাদের এই দেহটা যেমন এই পৃথিবীর, মৃত্যুটাও তেমনি এই পৃথিবীর। পৃথিবীর দেহটার সম্বন্ধ ঠিক জন্মের মতনই। মৃত্যুটা শাশ্বত জিনিস নয়, পৃথিবীর সঙ্গেই তার সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এদের পারে—এই অনিত্য মৃত্যুর পারে, পৃথিবীর পারে এক অনন্ত-জীবন—পৃথিবীর এই মৃত্যু স্পর্শ না হয়ে অক্ষুণ্ণ অপরাজিত দাঁড়িয়ে আছে,

তা তোমার আমার সকলের। যুগে যুগে চিরদিন এই জ্ঞানটাই শুধু মানুষের দরকার—আর কিছু না। দেশে আজ অন্ন নাই, জল নাই—যাঁরা সে সব দেবার ভার নেবেন বা নিয়েছেন, অত্যন্ত মহৎ তাঁদের উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই। তাঁরা তা দিন। কিন্তু তার চেয়েও বড় দান হবে এই জ্ঞানটা—শুধু এই অনন্ত অধিকারের বার্তা মানুষের প্রাণে পৌঁছিয়ে দেওয়া। দেহের খাদ্য অনেকেই যোগাতে পারে—আত্মার খাদ্য ক'জন যোগায়?

শুধু এই জ্ঞানটা মানুষ মনে যখন বরণ ক'রে নেবে, তার দৈন্য দূর হবে, হীনতা কেটে যাবে, সঙ্কীর্ণতা ধুয়ে মুছে পবিত্র হবে।

কালবৈশাখীর শীকরসিক্ত স্নিগ্ধ আশীর্বাদের মত এই অনন্ত অধিকারের বার্তা মানুষের বুভুক্ষু, অজ্ঞানতান্ধ মনে অমৃতের বর্ষণ করুক। দূর অজানা স্বপ্নজগতের কোণ থেকে বয়ে আনুক।

মনোজগৎ মানুষের অপূর্ব সম্পদ। একে অবহেলা না ক'রে দুঃসাহসিক আবিষ্কারকের উৎসাহ নিয়ে এক অজানা দেশসমূহে যদি অভিযান করতে বার হওয়া যায়, বিশ্বে বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা হবে।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি অনেকদূরের আমার গ্রামের চড়ক-তলার মেলা থেকে হাসিমুখে ছেলে-মেয়েরা মেলা দেখে ফিরে যাচ্ছে—কারুর হাতে বাঁশের বাঁশী, কারুর হাতে মাটির খেলনা ঘোড়া, মাটির পাখী।

একদল গেল গাঙ্গুলীপাড়ার দিকে, একদল নীলকুঠির মাঠের পথ বেয়ে ঘেঁটু ও নোনাবনের ধার দিয়ে জ্যোতির বনের ছায়াময় ছায়ায় মধুখালীর মাধবপুরের খেয়া ঘাটে যাচ্ছে—পার হয়ে ওপারের চাষা-গাঁয়ে যাবে। পঁচিশ বৎসর আগে যারা ছোট ছিল, এই রকম মেলা দেখে ভেঁপু বাজাতে বাজাতে তেলেভাজা জিলিপি খেতে খেতে ফিরে গিয়েছিল—তারা এখন মানুষ হয়ে অনেক দিন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে, কেউ কেউ মারা গিয়েছে, কারুর জীবন ব্যর্থতার দীনতায় ভ'রে গিয়ে কোথাও থেকেও নেই—আজকার এই নিষ্পাপ, অবোধ, চিন্তাহীন জীবনদেবতাগুলোর পঁচিশ বৎসরের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি কল্পনা করতে বড় ভাল লাগে। দিদি দুর্গা যেন এখনও দুলে হাসিমুখে আঁচলে খাবার বেঁধে নিয়ে মুচকুন্দ-চাঁপার অন্ধকার তলাটা দিয়ে বাড়ী ফিরছে—

—অপু—ও অপু—তোর জন্যে কত খাবার এনেছি দ্যাখ রে—ও অপু।

পঁচিশ বৎসর-এর পার থেকে ডাক আসে।

॥ ১লা বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল ॥

আজকার দিনটি সত্যিই মনে ক'রে রাখবার মত—সেই সকালে আটটার সময় ঘোড়া ক'রে বার হওয়া গেল। কমলাকুণ্ডু গ্রামের বাড়ী বাড়ী রুগী দেখে বেড়ালাম। কৈসুর মেয়ে, বেহারীদের বাড়ী—বেলা প্রায় বারোটার সময় ফিরে এসে গণপৎদের গাঁয়ে গেলাম। সেখানে যাবার সময় বাঁদিকের ওদিকে কাশের মাঠটা থেকে পাহাড় বেশ দেখাচ্ছিল! ভাবলাম সব লোকে আমাদের গাঁয়ে নীলপুজোর দিন দুপুরে কাদামাটি দেখতে গিয়েছে—ছড়ানো ধানগুলো এখনও কাদার ওপরে, ভাল ক'রে গাছ বার হয়নি। ঝাঁ ঝাঁ করছে দুপুর—গণপৎদের বাড়ী গিয়ে ওদের বাড়ীর মধ্যে সব ঘুরে ঘুরে দেখা গেল—তারপর দই-এর শরবৎ খেয়ে ঠান্ডা হলাম। এপারে যুগল শিশি হাতে ক'রে ঔষধ নিতে এল—সব কাজ মিটিয়ে আমি বেরিয়ে এলাম ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা করতে দিয়ারা কাছারীতে। সেখানে তরমুজের শরবৎ ও লুচি ইত্যাদি ললিতবাবু খাওয়ালেন—কিছুতেই ছাড়লেন না। সাড়ে তিনটার সময় সেখান থেকে বেরুলাম—পথে ললিতবাবুর সঙ্গে Einstein সম্বন্ধে কথা-বার্তা হ'ল। ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর—আমরা গেলাম কমলাকুণ্ডু, সেই বস্তীটার কাছে তিন

সীমানার মীমাংসা করতে। সেখানে হরিবাবুর তহশীলদারও এল। সেখান থেকে বার হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম—বেলা প'ড়ে গেল—পাহাড়টার দিকে চাইতে চাইতে ভাবছিলাম—গাছটায় দু'একদিন হ'ল চড়কের কাঁটা ভাঙা হয়েছে। আজ যদি হঠাৎ যাই তবে সে সব দেখে মনে হবে আবার ছোট হয়ে বনগাঁয়েই পড়ি। ক্রমে বেশ রৌদ্র গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল। নাঢ়াবইহারের দিকে সূর্যটা লাল হয়ে ডুবে যেতে লাগলো। ঘোড়াটা কি চমৎকার ছোটে! কি আরাম! মুক্তমাঠের মধ্যে হাওয়ায় ওরকম ঘোড়া ছুটিয়ে আসা কি আনন্দের! পথে গণপৎ ঝা ও সহদেব ভকতের সঙ্গে দেখা। ইসমাইলপুর জঙ্গলে একজন কে আগুন দিয়েছে—নাম বললে হংসরাজ—আসরাফি আমিন জমি মেপে দিয়েছে বললে। দিয়ারায় যব গম সব কাটা হয়ে গিয়েছে—তার পর এসে সেই যে জায়গাটা আমি রোজ ঘোড়া নিয়ে পাহাড় দেখি, সেখানে এলাম। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম—বড় ভাল লাগল—মুক্ত উদার মাঠ, হু হু নির্মল হাওয়া—দূরবিসর্পিত দিক্‌চক্রবাল—জঙ্গলের খানিকটা খুঁড়ে ফেলেছে। তারই পাশ দিয়ে এসে লোধাইটোলার ঐ পথটা দিয়ে ঘোড়াটা যা ছুটলো! ফিরে এসে স্নান করলাম। দিনটা ভাল লাগল—এগার ঘণ্টা ঘোড়ার ওপর কেটেছে আজ। এত ক্লান্ত কোন দিন হইনি।

॥ ১৬ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজ বৈকালের দিকে ছোট ঘোড়াটা ক'রে ললিতবাবুর দিয়ারা কাছারী গেলাম। বেশ লাগল—বাইরে টেবিল পেতে ললিতবাবু ও মোহিনীবাবু বসে—হু হু করে পুবে হাওয়া আসছে। সারাদিন গরমের পরে বেশ লাগল। টেলিস্কোপে নক্ষত্রটা দেখে নিলাম। Orion Nebula-টাও দেখলাম। তাঁরা Observation-এর জন্য টেলিস্কোপটা খাটিয়ে রেখে দিয়েছেন। এখন মনে পড়লো ছেলেবেলায় কলকাতা থাকতে দেখেছিলাম, চীৎপুর রেলের ধারে একটা লোক এই রকম টেলিস্কোপ দিয়ে মাপ করছেন—বাবা বললেন, দূরবীন। না- জানি সে লোকটা এখন বেঁচে আছে কি-না। তারপর গল্পগুজব করবার পর রাত্রি সাড়ে-ন'টার সময় সেখান থেকে বেরুলাম। লোধাইটোলা পর্যন্ত একজন আলো দিয়ে পৌঁছে দিয়ে গেল। ভগনি ভগৎ খাতির ক'রে সুপারি ও সিগারেট দিলে। তারপরই অন্ধকার—পথ দেখা যায় না—মাথার ওপর নক্ষত্রভরা আকাশ—নক্ষত্রের আলোয় একটু একটু পথ দেখা যাচ্ছিল। ঘোড়া বেশ ছুটল। এক জায়গায়—এমন Romantic লাগছিল—বালা মণ্ডলের টোলার ওদিকের ঘেরাক্ষেত থেকে একটা বুনো শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ ক'রে চলে গেল। বামা বৌরিজের বাসাটা ছাড়িয়ে মাঠের মধ্যে প'ড়ে ঘোড়াটা যা ছুটলো—একেবারে জঙ্গল—মাথার ওপরে নক্ষত্রভরা আকাশ। কাছারীতে এসে দেখলাম ললিতবাবু Traverse টেবিলের জন্যে Draft-টা পাঠিয়ে দিয়েছেন। মানী ভাগলপুর থেকে এসেছে। টেবিলের ওপর গ্লাসের জলে তিনটে বড় ম্যাগ্‌নোলিয়া সাজানো।

॥ ১৭ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

বৈকালের দিকে ঘোড়া নিয়ে বেড়াতে গেলাম। এক দৌড়ে এতটা পথ কোনো ঘোড়াকে আমি যেতে দেখিনি। লোধাইটোলার ওপারের মাঠে অনেক খেড়ীর গাছ গত বৎসরের বীজ থেকে বেরিয়েছে। সেখানে ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপর সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে ও কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়াটা নাকের সামনের বাতাসে ক্রমে ক্রমে মিশে যাচ্ছে দেখতে দেখতে—ধীর, শান্ত ভাবে ঘোড়া চালিয়ে লোধাইটোলার খামার দিয়ে নিয়ে এলাম। আজ খুব হাওয়াটা।

॥ ১৮ই এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজও খেড়ীক্ষেত গিয়ে ঘোড়া ছেড়ে দাঁড়ালাম। পাহাড়টা বড় সুন্দর দেখা যাচ্ছে—
—আসরফিকে কাল বড় রেগে গিয়ে চাবুক নিয়ে মারতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে ক্ষেত দেখিয়ে নিয়ে বেড়ালে।

আজকাল এই অপরাহ্নগুলো যে কি সুন্দর লাগে! প্রতিদিন লেখার কাজ সেরে এই পাহাড়ের এপারে লোধাইটোলায় খেড়ীক্ষেতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াই। আজ অপূর্ব ভাব মনে এল। সেই বোর্ডিং থেকে গ্রীষ্মের ছুটিতে এসে সোঁদালি ফুলভরা ঝোপের তলা দিয়ে সকালবেলা মাঠে বেড়াতে যাওয়া—সেই ওধারের মাঠটা—স্নিগ্ধ নদীজলের গন্ধ—উমা পদ্মফুল দিয়ে শিবপুজো করতো—সেই গ্রামের হাওয়ায়, মাঠের রূপে, নদী-জলের স্নিগ্ধতায়, ফুলেফলে আত্মা গড়ে উঠেছিল—কি অপূর্ব আনন্দই এরা জীবনে এনে দিয়েছিল একদিন! আজও সে সব আছে—কিন্তু—তাদের যেন ছেড়ে দিয়েছে, আর তারা আমার নয়। শৈশবের সে গ্রাম এখন আমার কাছ থেকে বহুদূর চলে গিয়েছে—সে সব পুরোনা পাখীর ডাক, ফুলফলের সুগন্ধ, স্নেহময় মুখের হাসি স্বপ্ন হয়ে দূর অতীতে মিশিয়ে গিয়েছে। দশ বৎসর আগে এমন দিনে সকালে উঠে শিয়ালদহে ট্রেনে চড়ে ৬০, মির্জাপুরের কাছে শেষ রাত্রির জ্যোৎস্নায় বিদায় নিয়ে ভোরের বাতাসে কচিপাতা ওঠা বসন্ত দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে রওনা হয়েছিলাম। সেই প্রথম বৃষ্টির সোঁদা সোঁদা ভিজা মাটির গন্ধ—তারও আগে সেই P. C. Roy-এর ওখানে নেমন্তন্ন, বৃন্দাবন চাকর—দেশে ফিরে Scott-এর বই পড়তাম শুয়ে শুয়ে—জীবনের প্রথম-যাত্রা—বড় মধুর স্বপ্নমাখা সে দিনগুলো—

আমি জানি আমার কাছে যা মধুর বলে মনে হবে অপরের কাছে তার মাধুর্য বিশেষ কিছু বোঝা যাবে না—তবু ভবিষ্যতে এই ছত্র কয়টি যদি কেউ পড়ে তবে সে যেন ভুলে না যায় যে জীবনের আনন্দ অতি রহস্যময়—কারো কোনো দিনের স্মৃতি তুচ্ছ নয়। তারা যেন মনে রাখে ঐ সব দিনগুলো এক গ্রাম্য বালককে যে সুখ একদিন দিয়েছিল, দুনিয়ার রাজৈশ্বর্য তার কাছে তুচ্ছ।

সন্ধ্যা হয়েছে। বনঝাউ গাছের বনের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে ফিরে এলাম। বন-ঝাউ গাছের মাথায় চতুর্থীর চাঁদ উঠেছে। অল্প অল্প মেটে জ্যোৎস্না এখনও ফোটেনি—নির্জন কাশজঙ্গল—বনঝাউ গাছ—মাথার ওপরে চাঁদ—দ্রুতগামী ঘোড়া—বেশ লাগে।

॥ ২৪শে এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

আজ আমার সাহিত্য-সাধনার একটা সার্থক দিন—এইজন্যে যে আজ আমি আমার দুই বৎসরের পরিশ্রমের ফলস্বরূপ উপন্যাসখানাকে (পথের পাঁচালী) 'বিচিত্রা'তে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ঘোড়া করে বনের মধ্যে দিয়ে বেড়াতে গেলাম। খুব বন—খুব বন—এত বনের পথ আমার জানা ছিল না। সেই বনঝাউয়ের বনে সুন্দর জ্যোৎস্না যখন উঠেছে, তখন সোঁদা সোঁদা গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে ধীরে ধীরে ঘোড়া চালিয়ে নিয়ে এলাম। সুন্দর—অপূর্ব জ্যোৎস্নায় মনে ভাবছিলাম ভরতদের ঘরে বসতো যে বালকটি, কঞ্চি নিয়ে খেলা করত সে—এসব Egotism ছেড়ে এলাম। তবুও এই ঘোড়া চড়ে জ্যোৎস্না ওঠা জঙ্গলের মৃদু সুঘ্রাণ উপভোগ করতে করতে ঐ কথাটা কেবলই মনে হচ্ছে।

॥ ২৬শে এপ্রিল, ১৯২৮ ॥

সাহিত্য যদিও সর্বসাধারণের মধ্যে আন্তরিকতম মিলনের যোগসূত্রস্বরূপ এবং যদিও চারিপাশের মানুষকে বাদ দিয়ে এখানে কোন সৃষ্টি সার্থক হওয়া দূরে থাক, প্রায় সম্ভবই নয়,—তবুও সাহিত্য-সৃষ্টি লোকালয়ের হাটের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে করবার নয়। কবি সাহিত্যিক আর্টিস্টদের মধ্যে এক ধরনের সহজাত নিঃসঙ্গতা থাকে। সার্থক রস-সৃষ্টি, সাধারণ দৈনন্দিন-জীবনোত্তীর্ণ বৃহৎ আনন্দলোকের আবাহন,—যার জন্য প্রতি শক্তিশালী কবি-মানসেই আত্মপ্রকাশের প্রেরণাময় এক ধরনের অনির্দেশ্য ভাবাবেগ তার শ্রেষ্ঠ মুহূর্তগুলিতে সঞ্চারিত হয়, এর জন্যে আর্টিস্টের প্রয়োজন আপন 'আইডিয়া'র আবহাওয়ায় যত বেশীক্ষণ সম্ভব এবং যত গভীরতমরূপে সম্ভব বাস করা। দুঃখবেদনা, হাসি-অশ্রু, সমস্যা-বিজড়িত অপরূপ মানুষের জীবন এবং জগৎ তাঁর লেখার মাল-মশলা, —কিন্তু নিরাসক্ত আনন্দে তিনি সৃষ্টি করে চলেন। কবি-সাহিত্যিক আপনার জন্য লেখেন, সে হচ্ছে তাঁর আত্মপ্রকাশ, অস্তিত্বের সেই একমাত্র রূপের মধ্য দিয়ে তিনি আপনাকে উপলব্ধি করেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি সকলেরই জন্য লেখেন। কারণ তিনি জানেন ভালবাসার আলোকক্ষেপ ব্যতীত দৃষ্টিতে সত্যকারের বর্ণ ফোটে না, প্রেম ও এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি ব্যতীত বাস্তব জগৎ এবং মানব-হৃদয়ের গহনতম রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ার নয়। আপনাকে প্রতি মুহূর্তে পূর্ণ করে ও প্রতি মুহূর্তে তিনি আপনাকে অতিক্রম করে যাবেন। চারিপাশের মানব-সমাজ সম্বন্ধে তিনি শুধু চিন্তা করেন এই নয়, এর অন্তরতম হৃদয়-স্পন্দনকে তিনি একান্তভাবে অনুভবের চেষ্টা পান,—তাই তো তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেরণার ক্ষণে যখন কথা বলেন, তখন তাতে সব দেশ সব কালের বিশ্বমানবের কণ্ঠ বাজে, জীবনের মূলতম রহস্যের আবেগ সেখানে একান্তভাবে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং সকলেরই সঙ্গে আপনাকে নিরন্তর যুক্ত রেখে তার সাধনা। তবুও, মনের দিক দিয়ে তাঁর পক্ষে চরম একাকীত্ব একটি প্রকাণ্ড সত্য—অপরিহার্য এবং প্রয়োজনীয়। 'রিয়্যালিটি'কে বুঝতে হলে, বা বুঝে তাকে যথাযথ আঁকতে হ'লে তাতে জড়িয়ে গিয়ে আমরা তা পারি না—কর্মকোলাহলের ঠিক মাঝখানে অথবা লোকলোচনের অত্যন্ত স্পষ্ট পাদপ্রদীপের সামনে অনুক্ষণ থেকে আমরা তা পারি না।

সাহিত্যের কী মূল্য। ঘন এক টুকরো কবিতা, অনবদ্য একটি ছোট গল্প, নিবিড় রেশময় একটি 'লিরিক', ঠাসবুনোট একখানি উপন্যাস, বিপুলতম যার ব্যঞ্জনা, সেখানে বাস্তব জীবননাট্যের বিচিত্র কলকোলাহল, উত্তেজনা ধ্বনিত হয়েছে,—আমাদের জীবনে এ সবের জন্যে বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট করে রাখা কি এতই দরকার? উত্তর হচ্ছে, দরকার, —অত্যন্ত বেশী দরকার আরো এই জন্যে যে, এইসব প্রশ্ন এখনো আদৌ ওঠে। তেল-নুন-লকড়ির কারবার করতে করতে আমাদের অনেকেরই দিন আসে মিলিয়ে। বাঁধা রাস্তায় আমরা জন্মাই এবং মরি—দু'পাশের এই দুই রকম পরিচ্ছেদের মাঝখানের রাস্তাটায় আমরা অনেকেই যে ভাবে চলি, তাতে যেন আমাদের স্রষ্টাকেই ব্যঙ্গ করা হয়। সাহিত্য তাই আমাদের এই অতিঅভ্যাসে বদ্ধ ঝিমিয়ে আসা মনের পক্ষে আকাশ-স্বরূপ, দিগন্ত এখানে অত্যন্ত বিস্তৃত, আবহাওয়া সর্বদাই উজ্জ্বল, অজস্র খোলা জানলা দিয়ে অদৃশ্য কেন্দ্র থেকে প্রতিক্ষণে দিব্য যৌবনময় আলো আর চেতনা এসে ঝরে ঝরে পড়ে। এখানে জীবন অহরহ আপনাকে অত্যন্ত ঘন সুরে বিকশিত করে। জীবনের এই অতি-বিরাট পটভূমিকার জগতে এসে পাঠক এক মুহূর্তে আপনাকে বড় করে যায়। দৈনন্দিন জীবনে বৈপার্শ্বিকতার সহস্র ক্ষুদ্রতা ক্লেদ গ্লানি পিছনে পড়ে থাকে—মানুষ খানিকক্ষণের জন্য

অন্ততঃ খণ্ড কাল ও দেশের অতীত এক জ্যোতির্ময় চেতনাস্তরের মধ্য দিয়ে অববাহিত হয়ে আসে। প্রত্যেকের আত্মসম্ভার এই যে বিস্তারের সম্ভাবনা, কাব্য ও সাহিত্য, তথা আর্টের অন্যান্য বিভাগ, এতে প্রত্যেককে অত্যন্ত প্রত্যক্ষরূপে সহায়তা করে।

সাহিত্য আরো অনেক কিছু করে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কম বেশী পরিমাণে একটি মানুষ আছে—যে নাকি স্বপ্ন দেখে, যে নাকি অন্ততঃ কোন কোন ক্ষণের জন্যেও আদর্শবাদের তীব্র প্রেরণা অনুভব করে, যে অতীত স্মৃতির অনুধ্যানে সহসা উন্মনা হয়, ভবিষ্যতের কল্পনায় নেশার মতন হয় আসক্ত—রস-সাহিত্যের একটি প্রধানতম কাজ হচ্ছে, প্রত্যেকের ভেতরকার এই স্বপ্নালু লোকটির তৃপ্তিবিধান করা। তা ছাড়া,—কথা-সাহিত্যিক সমসাময়িক সমাজ বা রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেশকালান্তরিত জীবনের ছবি আঁকেন। তাতে করে, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে মানুষটি তার নিজ যুগের মানুষ আর ঘটনাবলী সম্বন্ধে খুব উৎসুক, তার কৌতূহল মেটে। সাহিত্য আমাদের কল্পনা ও অনুভব-বৃত্তিকে উজ্জীবিত করে। এর মননশীল দিক প্রধানতঃ জীবন-সংগ্রামে ও সভ্যতার সংগঠনে আমাদের শক্তি যোগায়, এবং রস-সাহিত্যের সাধনা হচ্ছে অবিচ্ছিন্নভাবে সে আনন্দের রূপীকরণ ও পরিবেশন, যে মূল লীলার আনন্দের প্রেরণায় জীবনের হল উৎপত্তি,—সুখদুঃখ হর্ষবেদনা প্রেমকীর্তি ক্ষয়মৃত্যু সব ব্যেপে এবং ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক আনন্দসত্তা জীবনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রতিক্ষণে আপনাকে প্রবাহিত করে চলেছেন, একটু একটু করে মেলে ধরছেন। কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পী যত কথা বলেন তার মর্ম এই যে, আমাদের ধরণী ভারী সুন্দর—একে বিচিত্র বললেই বা এর কতটুকু বোঝানো হল, আমাদের এই দৃষ্টিটি বারে বারে ঝাপসা হয়ে আসে, প্রকৃতির বাইরেকার কাঠামো-টাকে দেখে আমরা বারে বারে তাকে রিয়ালিটি বলে ভুল করি, জীবন-নদীতে অন্ধ গতানুগতিকতার শেওলাদাম জমে, তখন আর স্রোত চলে না, তাই তো কবিকে, রসস্রষ্টাকে আমাদের বার বার দরকার—শুকনো মিথ্যা-বাস্তবের পাক থেকে আমাদের উদ্ধার করতে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য ও শিল্পকে সর্বসাধারণের উপযুক্ত করে দাও—এই একটি আধুনিক ধুয়োর কোন মানে হয় না। এ কথার অর্থ তো এই যে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের রস অত্যন্ত ঘন, একে খানিকটা জোলো করে দাও—এর শিল্পের বুননীতে অত সূক্ষ্ম তন্তুব বদলে মোটা দড়ির ব্যবহার প্রচলিত কর। কারণ, তা হ'লে তখন শিক্ষা ও শক্তি নির্বিশেষে এ সাহিত্য যাবতীয় জনের হয়ে উঠবে, রসের মন্দিরে ভিড়ের আর কমৃতি থাকবে না। আমাদের বক্তব্য এই যে, এ রকম কোন আদেশের উপর যদি জোর দেওয়া হয় তবে সাহিত্যের সর্বনাশ করা হবে, যাদের দিকে চেয়ে সাহিত্যে এই ভুয়ো গণতন্ত্রের সুর আমদানির জন্য আমরা এ করতে যাব—তাদেরও শেষ পর্যন্ত উপকার কিছু হবে না। রসসাহিত্যের উপভোগ-সামর্থের দিক দিয়ে যারা 'হরিজন', সাহিত্যকেও জোর করে 'হরিজন' মার্কা করে তাদের স্তরে না নামিয়ে উক্তরূপে তথাকথিত 'হরিজন'দের আর্ট ও সংস্কৃতিগত শিক্ষার এমন সুযোগ ও সাহায্য দিতে হবে, যাতে করে তারা মনের দিক দিয়ে ক্রমশঃ উঠে আসতে পারে, সূক্ষ্মতম রসের স্বাদ-গ্রহণে পারগ হয়। যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও অধিকার মানতে হয়। বাস্তবিকপক্ষেও আমরা দেখতে পাই যে, চিন্তামূলক বা সৌন্দর্যমূলক সত্য, ইন্দ্রিয়জয় অতীন্দ্রিয় রসের আবেদন, অথবা একই শ্রেষ্ঠ কাব্য উপন্যাস বা নাটক, জন্মগত ক্ষমতা তথন অনুশীলনবৃত্তির চর্চাভেদে বিভিন্ন পাঠকের মনে—প্রধানতঃ 'ইনটেনসিটি'র দিক দিয়ে বিভিন্ন রকমের সাড়া জাগায়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে, সাহিত্যের যে একটি স্বাভাবিক আভিজাত্য আছে, এমন কিছু না করা যাতে তা এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়, পরন্তু আমাদের সবাইকে তার উপযুক্ত হতে শিক্ষিত করা।

দ্‌দিন বা দশদিন পরে কেউ আমার বই পড়বে না, এ ভয় কোনো সত্যিকার কথা-সাহিত্যিক করেন না। করেন তাঁরা, যাঁরা একটা মিথ্যা ভবিষ্যতের ধূম্রলোকে নিজেদের চিরপ্রতিষ্ঠ দেখতে গিয়ে বর্তমানের দাবীকে অস্বীকার করেন। কেউ বাঁচে নি, বড় বড় নামওয়ালা কথাসাহিত্যিক তলিয়ে গিয়েছেন কালের ঘূর্ণিপাকের তলায়—সেই যুগের প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে পরবর্তী যুগের লোকেরা ধুলো ঝেড়ে ছেঁড়া পাতাগুলো উদ্ধার করবার কষ্টও স্বীকার করে না। দু'দশজন সাহিত্য-রসিক, দু'পাঁচজন বৈদগ্ধ্যগর্বী মানুষ ছাড়া আজকালকার যুগে কথাসরিৎসাগর কে পড়ে, গোটা অখণ্ড আরব্য উপন্যাস কে পড়ে, ডন কুইকজোট কে পড়ে? চসার, দান্তে, মিল্টন এ'দের কথা বাদ দিই—ছাত্র বা অধ্যাপক ছাড়া কেউ এ'দের পাতা ওল্টায় না—সকলে তো কাব্য-প্রিয় নয়—কিন্তু অত বড় যে নামজাদা ঔপন্যাসিক বালজাক, তাঁর উপন্যাসরাশির মধ্যে কখানা আজকাল লোকে শখ করে পড়ে? স্কট, হেনরি জেম্‌স, থ্যাকারে, ডিকেন্স সম্বন্ধেও অবিকল এই কথা খাটে। ফিল্মে না উঠলে অনেকের অনেক উপন্যাস কি নিয়ে লেখা তাই লোকে জানত না। নামটাই থেকে যায় লেখকের, তাঁর রচনা আধমরা অবস্থায় থাকে, অনেক ক্ষেত্রেই মরে ভূত হয়ে যায়।

জানি, একথা আমাদের স্বীকার করতে মনে বড় বাধে। খোলাখুলিভাবে বললে আমরা এতে ঘোর আপত্তি করি—'বিশ্ব', 'অমর', 'শাশ্বত' প্রভৃতি বড় বড় গালভরা কথা জুড়ে জুড়ে দীর্ঘ ছাঁদে সেণ্টেন্স্‌ রচনা করে তার প্রতিবাদ করি। কিন্তু আমরা মনে মনে আসল কথাটি সকলেই জানি।

যে সাহিত্য টবের ফুল—দেশের সত্যিকার মাটিতে শিকড় চালিয়ে যা রস-সঞ্চয় করছে না, দেশের লক্ষ লক্ষ মূক নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা দুঃখ-বেদনা যাতে বাণী খুঁজে পেলে না, তা হয় রক্তহীন, পাণ্ডুর, থাইসিসের রোগীর মত জীবনের রসে বঞ্চিত, নয়তো সংসার-বিরাগী, উর্ধ্ববাহু, মৌনী যোগীর মত সাধারণ সাংসারিক জীবনের বাইরে অবস্থিত। মানুষের মনের বা সমাজের চিত্র হিসেবে তা নিতান্তই মূল্যহীন।

পূর্বেই বলেছি, মিথ্যাকে আশ্রয় করেও কথাসাহিত্যিক রসসৃষ্টি করতে পারেন। কিন্তু সে রস হয় মানুষকে ক্ষণকালের জন্য ভুলিয়ে রাখবার সাহিত্য—সমাজের ও জীবনের সত্য চিত্র হিসাবে তার মূল্য কিছু থাকে না।

গভীর রহস্যময় এই মানব-জীবন। এর সকল বাস্তবতাকে এক বহুবিচিত্র সম্ভাব্যতাকে রূপ নেওয়ার ভার নিতে হবে কথাশিল্পীকে। তাকে বাস করতে হবে সেখানে, মানুষের হট্টগোল, কলকোলাহল যেখানে বেশী ; মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে ; তাদের সুখ-দুঃখকে বুঝতে হবে। যে বাড়ীর পাশের প্রতিবেশীর সত্যিকার জীবনচিত্র লিখেছে, সে সকল যুগের সকল মানুষের চিত্রই এ'কেছে—চাই কেবল মানুষের প্রতি সহানুভূতি, তাকে বুঝবার ধৈর্য। ফ্লবেয়ার বলেছেন, মানুষে যা কিছু করে, যা কিছু ভাবে, সবই সাহিত্যের উপাদান, তাই তাকে লিখতে হবে ; শোভনতার খাতিরে তিনি যদি জীবনের কোন ঘটনাকে বাদ দেন, চরিত্রের কোন দিক ঢেকে রেখে অঙ্কিত চরিত্রকে মাধুর্য-মণ্ডিত বা শ্রেষ্ঠ করবার চেষ্টা করেন—ছবি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

'এমা বোভারি'র স্রষ্টার উপযুক্ত কথা বটে!

কিন্তু এই বাস্তবতার কি একটা সীমা নেই? জীবনের নগ্ন চিত্র—দিগ্বসনা ভীমা ভয়ঙ্করী ভৈরবীর মত করাল—সে চিত্র মানুষের মনে ভয় সঞ্চার করে, অবসাদ আনে, জুগুপ্সার উদ্রেক করে—সাধারণ রসবিলাসী পাঠকের সাধ্য নয় সে কঠিন নিষ্ঠুর সত্যের সম্মুখীন হওয়া। সূর্যের অনাবৃত তাপ পৃথিবীর মানুষে সহ্য করতে পারে না, তাই বহুমাইলব্যাপী বায়ুমণ্ডলের আবরণের মধ্য দিয়ে তা পরিস্রুত হয়ে, মোলায়েম হয়ে

তবে আমাদের গৃহ-অঙ্গনে পতিত হয় বলে রৌদ্র আমাদের উপভোগ্য, প্রাণীকুলের উপজীব্য।

সে আবরণ দেবেন শিল্পী তাঁর রচনায়। নির্বাচনের স্বাধীনতা তিনি ব্যবহার করবেন শিল্পীর সংযম ও দৃষ্টি নিয়ে।

সাহিত্য-সংশ্লিষ্ট আর দুই একটি মাত্র কথা বলে আমি শেষ করব। সাহিত্যে প্রোপাগাণ্ডার স্থান সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। আমাদের বক্তব্য এই যে, সমাজ-সংস্কারই হোক, দেশপ্রেমই হোক, অথবা অন্য কোন সমস্যাদি সম্বন্ধে মতবাদই হোক, সব কিছুই প্রোপাগাণ্ডা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে একটা বিশেষ সীমার ভেতরে থেকে করা যেতে পারে, যদি তা তারপরও সাহিত্যই থাকে, কোন প্রচারবিভাগের বিশদ চিত্তাকর্ষক প্যাম্ফ্লেটের মতন না হয়ে ওঠে। সাহিত্য ও আর্টের জাত নষ্ট হয় তখনি, যখন এ অপরতর কোন উদ্দেশ্য সাধতে গিয়ে আপনার মূল সাধনা—অর্থাৎ সমসাময়িক সমস্যারও অতীত শাশ্বত সৌন্দর্য-সৃষ্টির প্রেরণা থেকে বিচ্যুত হয়। মনে রাখতে হবে স্বধর্ম ত্যাগ করা ভয়াবহ—অনেক কিছুর মত এক্ষেত্রেও। তারপর আমরা আনতে পারি—সাহিত্যের সঙ্গে নীতি ও কল্যাণবুদ্ধির সম্পর্কের কথা। সাহিত্যে সুনীতি, দুর্নীতি, শ্লীলতা, অশ্লীলতা ইত্যাদি নিয়ে প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই অনেক ঝড় বয়ে গিয়েছে। শ্লীলতা ও অশ্লীলতা সম্বন্ধে আমরা এই বলতে পারি যে, বাইরের পৃথিবী এবং মানুষের জটিল জীবন-কাহিনী তাদের অন্তর্নিহিত রসরূপে তখনই আমাদের অভিভূত করতে পারে, যখন আমরা এদের একই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে এবং ইন্দ্রিয়াতীতরূপে আমাদের মানসে-চেতনায় পাই। এইজন্য আদিরসও যখন মধুর রসে পরিণত হয়, তখন তা হয় আর্ট। কামজ প্রেমের কথা বলতে গিয়েও কবি যখন নিরাসক্ত কুতূহলে অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে চলেন, তখনই তা হয় আর্ট। তখন তা শ্লীলও থাকে না, অশ্লীলও নয়। সঙ্কীর্ণ অর্থে নৈতিকতার মানদণ্ড সাহিত্যের প্রতি প্রয়োগ করা যায় না অবশ্য, কিন্তু যে বৃহৎ কল্যাণ-বুদ্ধি আমাদের সকলের স্রষ্টার মনে তাঁর জগৎসৃষ্টির বেলায় ছিল বলে আমরা কল্পনা করি, রসস্রষ্টাকে ধ্যাননেত্রে তাকে পেতে চেষ্টা করা প্রয়োজন। কারণ, কি জীবনে, কি সাহিত্যে—শক্তি ও প্রতিভার সঙ্গে প্রেম ও সত্যবুদ্ধি যুক্ত না হ'লে স্থায়ী কিছুর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। সমাজের প্রচলিত নীতি-প্রথাকে সাহিত্যিক নির্মম আঘাত করতে পারেন, কিন্তু শুধু সত্যের জন্যই পারেন, ব্যক্তিগত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য নয়। সাহিত্যিক বাস্তব জগতের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তার চিত্র আঁকবেন। কিন্তু তাঁর অন্তর্দৃষ্টি যথেষ্ট পরিষ্কার হ'লে তিনি দেখবেন যে বাইরের জগতে যা ঘটে, তার চেয়ে লেখকের মনের জগতে আর এক মহত্তর ব্যঞ্জনাময় বাস্তব আছে ; এবং যদিচ মানুষের জীবনও মোহনীয়রূপে জটিল, কারণ পাপ দুর্বলতা পদস্খলনের কাহিনী তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, তবুও সে যেখানে বড় সেখানে তার রূপ কেবল এই-ই নয়। তা ছাড়া, বৃহত্তর অর্থে নীতিবোধ, জীবন সমাজের মূলসত্তার সঙ্গে জড়িত ; সাহিত্য থেকে তাকে কি আমরা বিচ্ছিন্ন করতে পারি!

মাঝে মাঝে একটা কথা শোনা যায় যে, আমাদের মত পরাধীন দরিদ্র দেশের সঙ্কীর্ণ সমাজের মধ্যে কথাসাহিত্যের উপাদান তেমন মেলে না। "আমাদের দেশে কি আছে মশাই, যে এ নিয়ে নতুন কিছু লেখা যাবে, সেই থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়"—একথা অনেক বিজ্ঞ পরামর্শদাতার মুখে শোনা যায়।

এই ধরনের উক্তির সত্যকার বিচার করতে বসলে দেখা যায়—এসব কথা মাত্র আংশিক ভাবে সত্য। বাংলাদেশের সাহিত্যের উপাদান বাংলার নরনারী, তাদের দুঃখদারিদ্র্যময় জীবন, তাদের আশা-নিরাশা, হাসি-কান্না-পুলক—বহির্জগতের সঙ্গে তাদের রচিত

ক্ষুদ্র জগৎগুলির ঘাত-প্রতিঘাত, বাংলার ঋতুচক্র, বাংলার সন্ধ্যা-সকাল, আকাশ-বা
ফলফুল—বাঁশবনের, আমবাগানের নিভৃত ছায়ায় ঝরা সজনে ফুল বিছানো পথে
যে সব জীবন অখ্যাতির আড়ালে আত্মগোপন করে আছে—তাদের কথাই বলে
তাদের সে গোপন সুখদুঃখকে রূপ দিতে হবে।

* "সাহিত্যের কথা" স্মৃতির রেখা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ছিল না। ক
পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ প্রকাশিত পরবর্তী সংস্কর
সংযোজন করা হয়। উহা বিভূতিভূষণ প্রদত্ত অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত রূপ। নিবন্ধটি
অঙ্গীভূত হইবার পূর্বে আনন্দবাজার পত্রিকা'র "সাহিত্যের খবর" নামক
প্রকাশিত হয়। ১৩৬৮ সালের ২৮ ভাদ্র বিভূতিভূষণের জন্মদিনে প্রকাশিত
কথা" গ্রন্থেও "সাহিত্যের কথা" অন্তর্ভুক্ত হয়।